ভারতের অর্থনীতি

কলিকাতা, উত্তরবঙ্গ, বিশ্বভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের
বি. এ. ও বি. কম. শ্রেণীর জন্য লিখিত।

অধ্যাপক হরশংকর ভট্টাচার্য এম্, এ,
প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
বর্ধমান রাজ কলেজ, বর্ধমান

চ্যাটার্জি পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
বি, চ্যাটার্জি
চ্যাটার্জি পাব্‌লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

নূতন সংযোজন : জুলাই ১৯৬০

মূল্য : দশ টাকা

লেখকের অন্যান্য পুস্তক

১। আধুনিক ধনবিজ্ঞান

২। ধনবিজ্ঞান

৩। অর্থতত্ত্ব

৪। Theory of International Trade & Finance.

৫। Aspects of Indian Economic History, 1750—1950.

মুদ্রাকর :
এস্, চ্যাটার্জি
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
২৬, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

নূতন সংযোজনের ভূমিকা

এই বৎসরের নূতন সংযোজনে চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট, বর্তমান খাদ্য ঘাট্তি ও উহার প্রতিকার, দেশরক্ষা ও উন্নয়ন, টাকার বহির্মূল্য হ্রাস, প্রভৃতি আধুনিকতম বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

হরশংকর ভট্টাচার্য

বিষয় সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃঃ

১

অনুন্নত অর্থনীতি

Underdeveloped Economy

ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of the economic structure of an under-developed economy like India) :

পৃথিবীর সকল দেশের দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকাইলে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, প্রতিটি দেশ অর্থ নৈতিক বিষয়ে সমান স্তরে উন্নত নয়। কোন দেশ বিশেষ উন্নত, আবার অনেক দেশ খুবই অনুন্নত। ভারতবর্ষ একটি অনুন্নত (undeveloped) বা অপূর্ণোন্নত (underdeveloped) দেশ, পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত ও অপূর্ণোন্নত দেশের মত এই বিষয়ে তাহার কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সকল প্রত্যেকটি দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা, কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগত অনেক পার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে কতকগুলি দিক আছে যাহা সর্বত্র মোটামুটি সমান। নাইজিরিয়া ও গ্রীস, ব্রেজিল ও থাইল্যাণ্ড, মিশর ও স্পেন, ভারত ও পাকিস্তান প্রত্যেকের অর্থ নৈতিক অবস্থা পৃথক হইলেও ইহাদের মধ্যে সকলের ক্ষেত্রে প্রকাশমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া বাহির করা যায়*।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজিয়া তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে

অর্থ নৈতিক অনুন্নতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায় সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপকরণের স্বল্প উন্নতি। সকল অনুন্নত দেশে উপকরণের পরিমাণ অল্প নয়, উপকরণের পরিমাণের অভাব উন্নতির পথে বাধা—এমন বলা যায় না। আসল কথা হইল কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই আপনা-আপনি উন্নতি হয় না, অন্যান্য শক্তির চাপে যখন উন্নয়নের পরিবেশ দেখা দেয়, একমাত্র

১। প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার

*"...While it may be true that no two countries face identical difficulties in the industrialization process, it is also true that countries at a similar developmental stage face difficulties of much the same kind, and, being subjected to much the same economic forces, often find themselves in very similar situations."

Processes and Problems of industrialization of underdeveloped countries. *U. N. Report.*

তখনই সেই দেশের উপকরণগুলির উপযুক্ত ও পূর্ণতর ব্যবহার হইতে থাকে। যতদিন না উন্নয়নী শক্তিগুলির আবির্ভাব ঘটে, ততদিন হয় উপকরণসমূহের খোঁজ খবর অথবা তাহাদের ব্যবহার অজানা থাকে। অনেক সময় জানা থাকিলেও পরিবেশের অভাবে উহাদের ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

অনুন্নতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল মূলধনের অভাব। দেশে প্রকৃতির দেওয়া উপকরণগুলির ব্যবহার হয় নাই বলিয়া মূলধন বা যন্ত্রপাতির অভাব দেখা দেয়। মূলধনের অভাব হইল আপেক্ষিক ধারণা, অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে প্রচলিত যন্ত্রবিদ্যা ও মূলধনের পরিমাণের তুলনায় অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধনের পরিমাণ কম থাকে। সাধারণত এই অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জনঘনত্ব বেশি থাকে। জনবৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা করিলে মূলধনের অভাব আরও সুতীব্র হইয়া দেখা দেয়।

২। মূলধনের পরিমাণ ও ব্যবহার কম

মূলধনের অভাবের সহিত অনুন্নতির আরও অনেক দিক জড়িত আছে। মূলধন কম তাহার কারণ লোকের হাতে সঞ্চয় কম, সঞ্চয় কম কারণ মাথাপিছু আয় কম, মাথাপিছু আয় কম কারণ চাষী মজুর মধ্যবিত্ত সকলের গড় উৎপাদন-ক্ষমতা কম, গড় উৎপাদন ক্ষমতা কম কারণ আমরা উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ খুব কম ব্যবহাব করি। মূলধন কম বলিযাই আমরা আরও বেশি পরিমাণ মূলধন তৈয়ারী কবিতে পারিতেছি না। এই দুষ্টচক্র অনুন্নতির একটি বৈশিষ্ট্য এবং ইহার ধারকও বটে। ভারতে মূলধনের অভাবের অন্যতম প্রধান একটি কারণ হইল দেশে সঞ্চয়ের হার কম, পরিকল্পনার শুরুতে ইহা ছিল বৎসরে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ। দুইটি পরিকল্পনার ফলে সঞ্চয়ের হার কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও ইহা এখনও তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যে-হারে পৌঁছিলে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের জয়যাত্রা শুরু হইতে পারে (**take-off to self-sustained growth**), এখনও আমরা সেই হারে পৌঁছাই নাই।

কম আয়, কম সঞ্চয় ও কম মূলধনের দুষ্টচক্র

মূলধনের অভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায় অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের ধরন এবং উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে। এই সকল দেশের কৃষি-কার্য প্রধানত কোনোমতে খাদ্য সংস্থানের স্তরে পরিচালিত হয় এবং বিনিয়োগের বেশির ভাগ অংশ কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতে থাকে। উৎপাদনের পদ্ধতিও তাই

মূলধনের অভাব কতরূপে প্রকাশ পায়

শ্রম-প্রগাঢ় অবস্থায় চলিতে থাকে। মজুরির হার কম বলিয়া উৎপাদনপদ্ধতি মূলধন প্রগাঢ় করার দিকে ঝোঁক আসে না। মূলধনের অভাবের দরুণ শস্য-সামগ্রী মজুত করার ক্ষমতা কম থাকে, পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকে, বিক্রয় সংগঠন ক্রটিপূর্ণ থাকে, উৎপাদক উপযুক্ত মূল্য পায় না।

মূলধনের পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল অনুন্নত দেশে সুদের হার বেশি থাকে। সারা ভারত গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধানী কমিশনের হিসাব ভারতে সুদের হার ২৫% হইতে ৭০%। প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনিশ্চিত বলিয়া এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই সকল সঞ্চয় স্বর্ণে পরিণত হয়, অলঙ্কারের আকারে অনুৎপাদক রূপ ধারণ করে। সুদের হার বেশি অথচ অনুৎপাদকরূপে মূলধন আবদ্ধ করার ঝোঁক বেশি—এই আপাতবিরোধী অবস্থা এই সকল দেশের বিশেষ লক্ষণ।

অনুন্নতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় আমদানি-রপ্তানির কাঠামোতে। সাধারণত এই সকল দেশের রপ্তানির মধ্যে থাকে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী এবং আমদানির মধ্যে থাকে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্যাদি। তাহা ছাড়া, সাধারণভাবে, অনুন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামো রপ্তানির উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠে। মাত্র দুই একটি কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভবশীলতা ইহাদের রপ্তানির আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে উন্নত ক্রেতা দেশগুলি নিতান্ত কম দামে এই দ্রব্যগুলি ক্রয়ের সুবিধা পায়। আমদানি রপ্তানির মধ্যে বাণিজ্য হার (terms of trade) ইহাদের বিরুদ্ধেই থাকে। বিদেশের বাণিজ্য সংকট এই সকল পণ্যকে ভর করিয়া অনুন্নত দেশে প্রবেশ করে এবং তাহাদের অর্থ নৈতিক দেহে সংকটের আবর্ত সৃষ্টি করে।

৩। আমদানি-রপ্তানির বৈশিষ্ট্য

রপ্তানির উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়া এই সকল দেশে বৈদেশিক মূলধন প্রবেশ করে এবং সেই মূলধন নিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র থাকে রপ্তানির উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন এবং রপ্তানি বাণিজ্য। জাতির অর্থ নৈতিক অগ্রগতির নানাদিকে নিযুক্ত না হইয়া ইহারা বিদেশী শিল্পের প্রসারের উপযোগী কাঁচামাল (যেমন, ভারতের পাট) উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে। বাগিচা, খনি, ব্যাঙ্ক ও জাহাজ-শিল্প প্রভৃতি বিদেশী মূলধন ও মালিকানায় পরিচালিত হয় বলিয়া দেশীয় শিল্পপতিদের আত্মবিকাশের পথ থাকে না। শিল্পবিপ্লব ও ধনতন্ত্রের বিপুল প্রসার ঘটে না, অথচ শিল্পে একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও কৃষিতে সামন্ততন্ত্র পাশাপাশি বিরাজ করিতে থাকে।

কোন অর্থনৈতিক দেহে উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি পূর্ণমাত্রায় চলনশীল হয় (perfect mobility of factors of production), তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত উহাদের প্রান্তিক প্রতিদান সকল ক্ষেত্রে সমান হয় ততক্ষণ উহারা এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে গমনাগমন করিতে থাকে। দেশে অর্থ নৈতিক গতিশীলতা থাকিলে তাই উপাদানের আদর্শ-স্থানীয় নিয়োগ বিন্যাস ঘটে এবং উহাদের উৎপাদনক্ষমতা সর্বাধিক স্তরে পেঁৗছে। অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক দেহে এই গতিশীলতা থাকে না, দ্রব্য ও উপকরণের বাজারে বহু অপূর্ণতা (imperfections) দেখা দেয়। এইরূপ দেশে উপকরণগুলি অনেকাংশে অচলনশীল (immobile)। জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ও বহুবিধ কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন শ্রমিকেরা পূর্বপুরুষ নির্ধারিত জীবিকা বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খায়, বৃত্তচ্ছেদ করিয়া নূতন জীবিকার সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হয় না।

৪। উপকরণগুলির চলনশীলতা কম

অনুন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। প্রতিটি অনুন্নত দেশের অবস্থা সমান না হইলেও এই বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ সকল দেশে পাওয়া যায়। ইহারা হইল : (ক) অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণত জনাধিক্যতার সমস্যা প্রকট, (খ) উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা এই সকল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সাধারণত বেশি, (গ) অন্যান্য দিকে বিশেষ চেষ্টা না করিয়াও কেবল জনসংখ্যা হ্রাস করিলে মাথাপিছু আসল আয় বৃদ্ধি পাইবে, (ঘ) জনসংখ্যার যে কোন বৃদ্ধি দেশের অর্থ নৈতিক অসুবিধা আরও বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া তোলে, (ঙ) যিনি আয় করেন তাহাকে বেশিসংখ্যক শিশু, বেকার, ও অনুৎপাদক ব্যক্তির ভরণ পোষণ করিতে হয়, ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের পরিমাণ কম থাকে।

৫। জনসংখ্যা সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্যগুলি

অনড় ও অচল কৃষি কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে অনুন্নত দেশগুলিতে বহুপ্রকার বেকারি দেখা দেয়। এই সকল দেশের বেকারির প্রধান রূপ হইল প্রচ্ছন্ন বেকারি। যে কৃষি-কার্য পাঁচ ভাই মিলিয়া করিতেছে, তাহা চার জনেও করা সম্ভব ; পাঁচজনের মধ্যে একজন একেবারে অপ্রয়োজনীয়। সে উৎপাদন হইতে সরিয়া আসিলে উৎপাদনের পরিমাণ কমে না বা সে উৎপাদনে যোগ দিলে উৎপাদন বাড়ে না, অর্থাৎ তাহার প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা একেবারেই শূন্য। উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে ইহাদের সরাইয়া আনিলে মোট উৎপাদন

কমে না বলিয়া ইহাদের অপূর্ণ ব্যবহার হইতেছে। ইহাদের উদ্বৃত্ত উপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়া সরাসরি মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ করা চলে।* অনেক সময় ইহাদের উৎপাদনক্ষমতা ঋণাত্মক (negative) ; অর্থাৎ ইহাদের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিলে তবেই মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

প্রচ্ছন্ন বেকারি বা অপূর্ণ কর্মসংস্থান তিন রূপে দেখা দেয়। অনুন্নত দেশটি মাত্র একটি বা কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির উপর নির্ভর করে বলিয়া যখন উন্নত ক্রেতা-দেশটিতে বাণিজ্যচক্রের সংকটকাল আসে তখন কৃষিপণ্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়া সেই সংকট অনুন্নত দেশে প্রবেশ করে। রপ্তানি পণ্যটির উৎপাদন (যেমন, পাট বা তুলা প্রভৃতি) ও রপ্তানির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বেকার হইয়া পড়ে এবং অনেকে সহর হইতে গ্রামে গিয়া খাদ্যোৎপাদনের প্রচেষ্টায় চাষের কাজে যোগ দিতে চায়। অপূর্ণ কর্মসংস্থানেব দ্বিতীয় রূপ কাঠামোগত বেকারি। যখন অর্থ নৈতিক কাঠামোতে সহযোগী অন্যান্য উপাদানের যোগান কম থাকে তখন শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, এই বেকারি কাঠামোগত অসম্পূর্ণতার ফল। ইহার তৃতীয় রূপ হইল প্রসার জনিত বেকারি। অনুন্নত দেশে কৃষি উৎপাদন প্রসারের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারির ঢাকনা খুলিয়া পূর্ণ বেকারি শুরু হয়। এই প্রসার জনিত বেকারি ভয়াবহ রূপ নেয় যদি দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন ও জীবিকাসংস্থানের সুযোগ সমতালে প্রসারিত না হয়। পূর্ণ বেকারি শুরু হইলেও অনুন্নত দেশে তাহার সর্বগ্রাসী রূপ দেখা দেয় না। তাহার কারণ এই সকল দেশে যৌথ পরিবার, গ্রামীণ নির্ভরশীলতা ও আত্মীয়তার সম্পর্কগুলি এই সকল বেকারদের বহুল পরিমাণে আত্মস্থ করিয়া ফেলে।

অনুন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামোর এই সকল বৈশিষ্ট্য আমরা ভারতের ক্ষেত্রে কম বেশি পরিমাণে দেখিতে পাই। ইহা ঠিকই যে আমাদের দেশ অপেক্ষা

* "An ideal, or optimum, distribution of workers does not exist so long as some workers would be more productive in employments other than those in which they were at present, in more technical terms, so long as the marginal product of labour is higher in some occupations and industries than in others, net national product may be increased by transfer of labour from less productive to more productive situations. As long as such transfers remain possible, 'hidden', or 'disguised' unemployment may be said to exist." J. J. Spengler. *Demographic Pattern.*

আরও অনেক বেশি অনুন্নত দেশ পৃথিবীতে আছে। অনেক দেশের অর্থনীতি একেবারে স্থিতিশীল, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে গত দুইশত বৎসর ধরিয়া অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে; স্বাধীনতা লাভের পর হইতে, বিশেষ করিয়া পরিকল্পনাগুলির প্রভাবে শিল্প প্রসারের গতিও কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তবুও 'উন্নত' দেশগুলির সমান স্তরে পৌঁছাইতে আরও অনেক দ্রুত ও মৌলিক পরিবর্তন দরকার আছে। অনুন্নত সকল বৈশিষ্ট্যের ফলস্বরূপ আমাদের দেশের মাথাপিছু আয় এখনও খুব কম। ১৯৫৭ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল বছরে ২৭৬ টাকা, আমেরিকায় ছিল ৯৬৮০ টাকা, ইংলণ্ডে ৪৫২০ টাকা এবং পশ্চিম জার্মানীতে ছিল ৩৫১৩ টাকা।

ভারত একেবারে অনুন্নত নয়, ইহা উন্নয়নশীল

পৃথিবীর সকল অনুন্নত দেশেই এখন অর্থনৈতিক জড়ত্ব ভাঙিয়া সচেতন গতিশীলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আর কোন দেশ পিছাইয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়। শিল্পপ্রসার ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এখন প্রায় সকল অনুন্নত দেশেরই বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ইহাও লক্ষ্যণীয় যে এই অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নত দেশগুলিতে উন্নয়নের হার বেশি, ফলে ইহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের পার্থক্য না কমিয়া বরং কিছুটা বাড়িয়াই যাইতেছে। ভারতবর্ষের সম্মুখেও প্রধান সমস্যা হইল এই অনুন্নতির লক্ষণগুলি দূর করিয়া কত দ্রুত আমরা উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মানের কাছাকাছি পৌঁছিতে পারি।

সকল দেশেই সাড়া পড়িয়াছে

ভারত কিরূপে অপূর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইল (How India became an underdeveloped country)

সুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো কখনই এক রকমের ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলের কাঠামোকেই এক বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্র বলা চলিত। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সহিত বহুক্ষেত্রে ইহার প্রভেদ ছিল, প্রধানত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র দাঁড়াইয়াছিল। গ্রামে বংশগত বৃত্তি বিভাগ ছিল; আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মোটামুটি গ্রামের মধ্যেই ঘটিত; জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইত না। ইহা বৃদ্ধি পাইলেও নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়া উহা সমাজের মধ্যেই গৃহীত হইয়া যাইত, কোনরূপ গতিশীল শক্তি (dynamic force) হিসাবে ইহা পরবর্তী স্তরে সমাজের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করিতে পারিত না।

গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই বিনিময় হইত, স্থিতিশীল সমাজের ভোগ, বিনিয়োগ মূলধন ও সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থ নৈতিক কাঠামোকে উপ্‌চাইয়া মূলধন গঠনের বিপুল গতিবেগ সৃষ্টি করিতে পারিত না। রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ার অন্তরালে বর্ণাশ্রম ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ এইরূপ অর্থ নৈতিক অচলাবস্থা (stagnation) ও স্থিতিশীলতা—ইহাই সামন্ততন্ত্রের এক বিশেষ ভারতীয় রূপ।*

ইংরাজ আসিবার পূর্বে ভারতের অর্থ নৈতিক স্থিতিশীলতা

চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই ভারতের সমাজজীবনে গুরুতর পরিবর্তন আসিতেছিল। দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তদানীন্তন মুঘল সম্রাটগণও ব্যবসায়ীদের সাহায্যার্থে বহু উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে বণিকী পুঁজির কোন অভাব ছিল না এবং মুঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগে প্রধানত রাজনৈতিক বিশৃংখলার দরুণই ভারতে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হইল না। কিন্তু ভারতে প্রভূত বণিকী পুঁজির সঞ্চয় ছিল, এবং নিজেদের শ্রেণীগত প্রয়োজনেই বণিকেরা নিশ্চয় এই শিল্প বিপ্লব ও উপযুক্ত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইত। রাণী এলিজাবেথ এবং তাঁহার পরবর্তী ইংলণ্ডের রাজাদের মত ভারতের রাজারাও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

মুঘল আমলে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনা

পশ্চিম ইউরোপের মতই ভারতীয় সমাজও ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতেছিল, বরং তাহাদের তুলনায় (দক্ষতায় ও নিপুণতায়) ব্যবসায় বাণিজ্যের অনেক উন্নত স্তরেই ভারতের সমাজ-বিবর্তন সম্ভব হইত। নবজাগ্রত বণিকী পুঁজি রাজা ও নবাবদের আশ্রয়ে পুষ্ট হইতেছিল, স্থানীয় বাজার ছাপাইয়া দেশ বিদেশে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন বহুদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেশে রাজনৈতিক বিশৃংখলা, বণিকশ্রেণীর অসম্বদ্ধতা এবং কোন নিজস্ব সামরিক

---

* "সরল উৎপাদন সংগঠন লইয়া গঠিত এই সব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজগুলি—যাহারা অবিরত ঠিক সেই একইরূপে নিজেদের পুনরুৎপন্ন করিয়া চলিত, দৈবাৎ ধ্বংস হইলে ঠিক একই স্থানে একই নামে আবার মাথা তুলিতে—উৎপাদন-সংগঠনের সেই সারল্যই প্রাচ্য-সমাজব্যবস্থার অপরিবর্তনশীলতার রহস্যের চাবিকাঠি—এই অপরিবর্তনশীলতার বিরোধী চিত্র হিসাবে আমরা দেখিতে পাই প্রাচ্যরাষ্ট্রসমূহের অবিরাম ধ্বংস ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন রাজবংশের বিরামহীন পরিবর্তন। রাজনৈতিক আকাশের ঝঞ্ঝাবাত্যা সমাজের অর্থনৈতিক উপাদানগুলির কাঠামো স্পর্শ করিত না।"

জাহাজ না থাকা—এই সকল মিলিয়া ধনতন্ত্রে উত্তরণের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। এইরূপ অবস্থাতেই বৃটিশ বণিকী পুঁজি ও বণিকী রাষ্ট্রের প্রতিভূ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল।

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রবেশের পর হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে ভারত লুণ্ঠিত হইয়াছে, সেই ইতিহাস আমাদের অতি সুপরিচিত। করুণা করিয়া অনুন্নত দেশ ভারতবর্ষকে মূলধন ঋণ দেওয়া উচিত কি উচিত নয়,—আজকালকার এইরূপ বিতর্কের দিনে ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের স্বাভাবিক বিবর্তন কিরূপে ইহারাই রুদ্ধ করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না। ইহা সর্বজনবিদিত যে, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতি এই ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্রমাগত লুণ্ঠন করিয়া আজ ইংলণ্ড পূর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে শুরু হইল ব্রিটিশ লুণ্ঠন

শ্রীমতী ভেরা আন্‌ষ্টে লিখিতেছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নতই ছিল এবং ভারতের উৎপাদন-পদ্ধতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সংগঠন পদ্ধতি পৃথিবীর যে কোন অংশের সহিত তুলনায় অগ্রসর ছিল· যখন ব্রিটিশ জাতির পূর্ব-পুরুষেরা নিতান্ত আদিম জীবনযাপন করিত তখন সে দেশ সূক্ষ্মতম মসলিন ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানী করিত,—সেই দেশ ওই আদিম বর্বরদের বংশধরদের দ্বারা আনিত অর্থ নৈতিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল না।"

যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং যে নিষ্ঠুর উপায়ে ভারত হইতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ১৮৭৫ সালে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট, স্যালিস্‌বেরীর মার্ক্‌ইস্ বলিয়াছেন, "ভারতকে যখন রক্তশূন্য করিতেই হইবে তখন বিচক্ষণতার সহিতই তাহা করা ভাল" ("as India must be bled the bleeding should be done judiciously")। পলাশীর যুদ্ধ এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ ভারত হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতের বার্ষিক স্থুল জাতীয় আয়ের ১০% প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। গরীব ও অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক উদ্বৃত্ত হইতে এই পরিমাণ অপসৃত হইলে অনুন্নত না হইয়া উহার আর কোন উপায় থাকিতে পারে কি?

ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপর ব্রিটেনের এইরূপ প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয়ের কি ফল হইয়াছিল তাহা আমরা রমেশচন্দ্র দত্তের "ভারতের অর্থ-নৈতিক ইতিহাস" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে দেখিতে পাই। "অর্থনীতির যে নিয়ম ভারতে কার্যকরী হয় তাহা পৃথিবীর অন্য সকল দেশের নিয়মের সমান; যে কারণে পৃথিবীর অন্য সকল দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় সেই কারণে ভারতের সম্পদও বাড়ে; যে কারণে অন্যান্য দেশ গরীব হয় তাহাতে ভারতও গরীব হইয়া পড়ে ·····"

লুণ্ঠনের অর্থ নৈতিক ফল

"দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য ঘটনা যে, ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের উৎসগুলিকে নানা উপায়ে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যেমন বিরাট কৃষি-প্রধান, তেমনি বিরাট শিল্প প্রধান দেশ ছিল। ভারতীয় তাঁতশিল্পজাত দ্রব্যাদি এশিয়া ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হইত। দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য যে, একশ' বছর আগেকার স্বার্থপর বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের উঠ্তি কারিগরদের উৎসাহ দিবার জন্য ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম দিকেই ভারতীয় কারিগরদের নিরুৎসাহ করিতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে তাঁহাদের অনুসৃত স্থির অনড় নীতিই ছিল ভারতবর্ষকে বৃটেনের শিল্পের অনুগত করিয়া তোলা, এবং বৃটেনের তাঁত ও কলকারখানায় যোগান দিবার জন্য ভারতীয় জনসাধারণকে কেবলমাত্র কাঁচামাল উৎপন্ন করিতে বাধ্য করা। অনড় অটল ভাবে এই নীতি অনুসরণ করা হইত এবং তাহার সাফল্যও মারাত্মক রকমের হইয়াছিল; কোম্পানীর কারখানায় ভারতীয় কারিগরদের কাজ করিতে বাধ্য করিবার নির্দেশ পাঠানো হইত; গ্রামবাসী ও তাঁতি-সম্প্রদায়ের উপরে প্রয়োগের জন্য বাণিজ্য প্রতিনিধিদের হাতে ব্যাপক আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হইত; প্রতিরোধক শুল্ক দ্বারা ভারতীয় রেশম ও কার্পাসজাত দ্রব্যগুলিকে ইংলণ্ড হইতে দূরে রাখা হইত; বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে বৃটেনের শিল্পদ্রব্য ভারতবর্ষে আনা হইত ·····ইউরোপে বাষ্প-চালিত তাঁত আবিষ্কারে ভারতীয় শিল্পের অবনতি-পর্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে; আর, সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে যখন বাষ্প চালিত তাঁত বসানো হইয়াছে, তখন ইংলণ্ড আর একবার ভারতবর্ষের প্রতি তাহার ঔচিত্যহীন ঈর্ষার পরিচয় দিয়াছে। ভারতবর্ষে তুলা কারখানাগুলির উপরে যে এক শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের নূতন বাষ্প চালিত কারখানাগুলির শ্বাসরোধ করা হইতেছে। কৃষিই

এখন ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের কার্যত একমাত্র অবশিষ্ট উৎস·····কিন্তু ইংরাজ সরকার····· বর্তমান ভূমি-কর হিসাবে যাহা আদায় করেন কোন কোন সময়ে তাহা পুরাপুরি বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনার সমান হইয়া দাঁড়ায়····· ইহাতে কৃষি পঙ্গু হইয়া পড়ে, সঞ্চয়ে বাধা ঘটে, যাহারা জমি চাষ করে তাহাদিগকে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ত করিয়া রাখে···ভারতবর্ষে রাষ্ট্রই কার্যত ভূমি-জাত সম্পদ সঞ্চয়ে হস্তক্ষেপ করে, চাষীর আয় লাভে বাধা সৃষ্টি করে· ফলে চাষীরা চির দরিদ্রই থাকিয়া যায়···ভারতবর্ষে রাষ্ট্র কোন নূতন শিল্পকে পোষণ করে নাই, জনসাধারণের জন্য, পুরাতন শিল্পকেও পুনরুজ্জীবিত করে নাই, যে ভাবেই হউক অতিমাত্রায় ধার্য করের সাহায্যে ভারতবর্ষে যাহা কিছুটা তোলা সম্ভব হইয়াছে এক বুভুক্ষু শাসনব্যবস্থার ক্ষুধা মিটাইবার পর, তাহাই ইউরোপে প্রবাহিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের বৃষ্টিপ্রসূ মৌসুমী মেঘই অন্য দেশগুলিকে আশীর্বাদপূত ও উর্বর করিয়া তুলিয়াছে।"

সমাজের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত এইরূপে অপহৃত হইবার পথে যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয়া পার হইতে হয়, ভারতের ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। নিরন্ন, বস্ত্রহীন, আবাসহীন দরিদ্র নরনারীর প্রভূত পরিশ্রমজাত এই

ইহারই ফলে অনুন্নতি

উদ্বৃত্ত যদি দেশের বাহিরে চলিয়া না গিয়া দেশেই বিনিয়োগ হইতে পারিত তবে ভারতের অর্থনৈতিক অনুন্নতি আজিকার স্তরে থাকিতে পারিত না, তাহার অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতি দ্রুততর হইতে পারিত। ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রশক্তির অনুপ্রবেশ পুরাণো ভারতীয় সমাজের ভিত্তি নাড়াইয়া দিয়া গেল, কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকারী বণিকনীতি নূতন সমাজের কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারিল না। মার্ক্স বলিয়াছেন:

"সকল প্রকার গৃহযুদ্ধ, বিদেশী আক্রমণ, বিপ্লব, রাজ্যজয়, আশ্চর্য জটিল যত দুর্ভিক্ষ একের পর এক দ্রুতগতিতে হিন্দুস্তানকে ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া যতই মনে হউক না কেন, ইহারা সমাজের নিছক বহিরঙ্গেই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, কোনরূপ গভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামো ভাঙিয়া দিয়াছে, অথচ নূতন কিছু গড়িয়া ওঠার লক্ষণ এখনও দেখা দেয় নাই। পুরাণো দুনিয়ার অপহরণ, অথচ নূতন পৃথিবী না পাওয়া—ইহাই হিন্দুদের বর্তমান দুঃখের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের বিষাদ আনিয়া দিয়াছে এবং ব্রিটিশ শাসিত হিন্দুস্তানকে উহার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভারতের সমগ্র ইতিহাস হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে।"

ব্রিটিশের ভূমি ও করনীতি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পরভোজী জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের বাণিজ্যনীতি ভারতীয়

শিল্পীর অন্ন কাড়িয়া লক্ষ লক্ষ অনাহারী অর্ধাহারী নরনারী অধ্যুষিত ভারতীয় সহর গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাদের অর্থ নৈতিক নীতি ভারতের নিজস্ব স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া ফাটকাবাজ দালালশ্রেণীর একদল মতলববাজ শোষণকারী ব্যবসাদার গজাইয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক ভারতের সকল সমস্যাই মূলত ইংরাজ শাসনের ফল ; আমাদের সকল অনুন্নতির মূল কারণই হইল ইংরাজ কর্তৃক ভারতের অর্থ নৈতিক উদ্‌বৃত্ত অপহরণ।

অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও গতিধারার বিশ্লেষণ, কেন অপূর্ণোন্নত থাকিয়া যাইতেছে ও উন্নতি হইতেছে না (Analysis of the economic structure and movement of an underdeveloped economy, why underdevelopment continues and obstacles to development.)

অপূর্ণোন্নত দেশগুলির উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হইল তাহাদের আধা-ধনতান্ত্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো। পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলিতে নিজস্ব গতিতে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রকে জোরালোভাবে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাই ওই দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক রূপান্তরণ ও অগ্রগতির বেগ ছিল তীব্র। কিন্তু ভারতে বা অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে বিদেশী মূলধন ও পরিচালনার আঁওতায় গঠিত আধা-ধনতান্ত্রিক কাঠামো প্রায় সর্বদাই দেশের সর্বাপেক্ষা অনুন্নতিকামী জরাজীর্ণ সামাজিক শক্তিগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। পুরাণো সামাজিক সম্বন্ধগুলি ভাঙে নাই, নূতন সামাজিক সম্বন্ধ গড়িয়া তোলে নাই ; সামন্ততান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পূর্ণ দূর করে নাই, ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির বেগ সৃষ্টি করে নাই।

অনুন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রের ও সমাজের নূতন রূপ

তাহার উপর বর্তমান কালে "সমাজতন্ত্রের" নামে একরূপ মিশ্রিত কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের (State Capitalism) উদ্ভব হইতেছে। পূর্ণোন্নত দেশে ধনতন্ত্রের গতি রুদ্ধ হইলে যদি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ না ঘটে তবে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক সামরিক অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে, যাহাকে কেহ কেহ ফ্যাসিবাদ বলেন। সেইরূপ অনুন্নত দেশ পূর্ণ সমাজতন্ত্র বা পূর্ণ ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর না হইলে এইরূপ রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠে। ইতিহাস কখনই একই স্থানে "স্থিতিশীল ভারসাম্য" রক্ষা করে না, মাটির তলা হইতে বাহির হইতেছে

নদী আপন স্রোত হারাইলে তাহাকে সহস্র শৈবাল দলে ঘিরিয়া ধরে

এইরূপ ফোয়ারার একটি ছিদ্রপথ আঙুল দিয়া চাপিয়া রাখিলে উহা অপর কোন নিজস্ব কুটিল পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়।

পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে ক্লাসিকাল রূপ ছিল, তাহার নিখুঁত ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই সকল দেশে আর কখনই দেখা যাইতে পারে না। যেমন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির অগ্রগতির পথের সহিত ভারতের বাস্তব অবস্থার মিল থাকিতে পারে, কারণ সকলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় সমান স্তরে রহিয়াছে (almost at the same stage of economic development); কিন্তু ভারতীয় সমাজের নিজস্ব গতিবেগ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, উহা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান।

রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র দেখা দেয়

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিশীল রূপ বা উহার অন্তর্নিহিত গতিচিত্র (motion picture) বুঝিতে হইলে তাই ইতিহাস হইতে আমাদের অল্প একটু শিক্ষা পাওয়া নিশ্চয় দরকার। ক্লাসিকাল যুগ মন্থন করিলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি মৌলিক সর্ত দেখিতে পাই: (ক) উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হওয়া (generation of surplus), (খ) সেই উদ্বৃত্ত ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে উপযুক্তভাবে ভাগ হইয়া যাওয়া (allocation of surplus); এবং (গ) সেই উদবৃত্তের উপযুক্ত ক্ষেত্রে (অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার জন্য) ব্যবহার হওয়া (utilisation of the surplus);* অপূর্ণোন্নত দেশে উন্নয়নের এই সর্তগুলি উপস্থিত আছে কি? আমাদের এখন তাহা সর্বপ্রথমে বিচার করিতে হইবে।

ক্লাসিকাল ক্রমবৃদ্ধির তিনটি মৌলিক সর্ত

উদ্বৃত্ত-সৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে মোট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই কম। মনে রাখা দরকার, ইহার মোট পরিমাণ কম হইলেও জাতীয় আয়ের অনুপাতে ইহার অংশ মোটেই কম নহে। দেশের সকল উপাদান ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না বলিয়া জাতীয় আয় কম, সুতরাং উদ্বৃত্তও কম। কিন্তু জাতীয় আয়ের তুলনায় বিচার করিলে এই উদ্বৃত্তকে মোটেই কম বলা চলে না। জনসাধারণের

উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, ভোগের স্তর নীচুতেই থাকে, কিন্তু উদ্বৃত্তের ব্যবহার উন্নয়ন ঘটায় না

* এই তিনটির পদ্ধতিতে পরিবর্তনই (changes in mode of generation, allocation and utilisation of the economic surplus) একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনে।

ভোগের মাত্রা (scale of consumption) খুবই নিচু, কোনমতে কায়ক্লেশে জীবনধারণের পক্ষে যতটুকু দরকার সমাজের অধিকাংশ লোকেরা তাহার বেশি আয় করে না। উপকরণগুলির পূর্ণ ব্যবহার হইলে আরও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য বর্তমানের উদ্বৃত্তকে উপযুক্ত উপায়ে খাটান দরকার। অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এই উদ্বৃত্ত উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত (utilised) হইয়া এবং দ্রুত মূলধনে রূপান্তরিত হইয়া অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে পারে না।

(ক) অনুন্নত দেশের কৃষি-কাঠামো:

অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, শ্রমশক্তির অধিকাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে মোট জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ উৎপন্ন হয়। জীবনযাপনের জন্য কৃষিকার্য (subsistence farming) চলিতে থাকে, চাষীর হাতে জমির পরিমাণ খুব কম থাকে, শ্রমিক প্রতি ও একর প্রতি উৎপাদনীশক্তি (productivity per man or per acre) খুব কম। যে সকল দেশে জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার বেশি (absolute volume and rate of increase) সেখানে কৃষকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (marginal productivity of labour in the subsistence sector) নাই বলিলেই চলে, অর্থাৎ কিছু পরিমাণ লোককে উৎপাদন হইতে সরাইয়া আনিলেও মোট উৎপন্ন কমে না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ (volume of disguised unemployment) খুবই বেশি থাকে।

জীবনযাপনের কৃষিকার্য, উৎপাদনক্ষমতা কম, প্রচ্ছন্ন বেকারি, তাই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি কম

অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে জীবনধারণের স্তরের কৃষিকার্য হইতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত যত কমই হউক না কেন, তাহা উৎপাদনকারী চাষীর হাতে থাকে না। খাজনা ও মহাজনী সুদে উৎপাদনের বৃহৎ অংশ অপরের হাতে চলিয়া যায়। তাহা ছাড়া, অপূর্ণোন্নত দেশে চাষীকে সর্বদা অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় প্রতিকূল বাণিজ্যহারের (unfavourable terms of trade) মধ্য দিয়া উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। বিক্রয় ব্যবস্থা অতিশয় ত্রুটি পূর্ণ থাকে, নিজের দ্রব্যের জন্য যৎসামান্য দাম পাইয়া তাহাকে বেশি দামে শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। এইরূপে কৃষিক্ষেত্রে চাষীদের হাত হইতে অর্থ নৈতিক উদ্বৃত্ত সরিয়া আসিয়া

চাষীর হাতে সেই স্বল্প উদ্বৃত্তটুকুও থাকে না

জমিদার, মহাজন, জোতদার (ধনী চাষী ও সুদখোর মহাজনের এক মিশ্রিত রূপ), অসাধু বণিক এবং কিছুটা পরিমাণে রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসে।*

এই উদ্বৃত্ত যাহাদের হাতে পৌঁছায়, তাহারা ইহাকে কিরূপে ব্যবহার করে, সেই পদ্ধতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। একথা সকলেই জানেন যে, এই অপহৃত উদ্বৃত্তের অধিকাংশ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াইবার কাজে নিযুক্ত হয় না।

যাহারা সেই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে তাহারা কোথায় ব্যয় করে এবং কেন উহা বিনিয়োগ করে না

অপহৃত এই উদ্বৃত্তের অধিকাংশই ব্যয় হয় অতিভোগের (excess consumption) উদ্দেশ্যে। সামাজিক পদমর্যাদা ও সম্মান বাড়াইবার জন্য মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তরাদি, সুবৃহৎ প্রাসাদ ও অট্টালিকা, দাসদাসী সংগ্রহ করা, বিলাসব্যসন—এই সকল কাজেই সেই উদ্বৃত্ত নিযুক্ত হইতে থাকে। উৎপাদক-বিনিয়োগে ইহা (productive investment) নিযুক্ত না হওয়ার প্রধানত চারিটি কারণ থাকে: (ক) আমদানি করা যন্ত্রপাতির দাম বেশি, কিন্তু কম দামে প্রচুর পরিমাণে কৃষি মজুর খাটান সম্ভবপর, (খ) জমিতে খাটাইলে উহা হইতে প্রতিদান (return) আসে অনেক দেরিতে, তাহার তুলনায় সুদে খাটাইলে বেশি ও দ্রুত প্রতিদান পাওয়া যায়। (গ) কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর দামে ঘন ঘন ও তীব্র উঠানামা হয় বলিয়া কৃষিতে বিনিয়োগের ঝুঁকি ইহারা বহন করিতে চাহে না। (ঘ) কৃষিক্ষেত্রগুলি চাষীদের হাতে ছোট ছোট ক্ষেতের আকারে ছড়াইয়া থাকে, তাই উহাদের একত্র না করিলে বৃহদায়তন কৃষিকার্য (large scale farming) সম্ভবপর নয়। খাজনার হার এমন বেশি ও চাষীদের ভোগের স্তর এমন নিচে যে, জমি হইতে খাজনা আর বেশি বাড়ানো সম্ভব হইবে না—ইহাও উৎপাদক বিনিয়োগ না হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই

উদ্বৃত্তের প্রবাহপথ: কাহারো সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের আধার

সকল কারণে অতিভোগে নিয়োগের পরে বড় চাষীরা অবশিষ্ট উদ্বৃত্তের নিয়োগ করেন মহাজনী কারবারে এবং ক্রম-নিঃস্ব চাষীদের হাত হইতে আরও বেশি জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এই সকল অনুৎপাদক ব্যয়ের মধ্যেই সমাজের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত (potential surplus) লুক্কায়িত আছে; অতিভোগে ও সকল প্রকার

* দেশ যত অপূর্ণোন্নত থাকে, দেশের মোট উদ্বৃত্তের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্তের অংশ তত বেশি থাকে। অপূর্ণোন্নতি যত কমিতে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও অনুপাত তত বৃদ্ধি পায়।

অনুৎপাদক ব্যয় বন্ধ করিতে পারিলেই এই উদ্বৃত্তকে উৎপাদন বাড়াইবার কাজে খাটান সম্ভব হইতে পারে।

ছোটখাট কৃষি সংস্কারের সাহায্যে এই সকল দেশে কৃষির উন্নতি করার যে সকল প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধেও কোন আশাবাদী মোহ না রাখা উচিত। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া চাষীর হাতে জমি তুলিয়া দেওয়ার নামে যে ধরনের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে, তাহাতে ভূমিহীন চাষীর একাংশ কিছু পরিমাণ জমি পাইলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ কিছুমাত্র প্রশস্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ কি কি? (ক) ছোট ছোট জমি খণ্ড হইতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা ইহাতে নাই। উপরন্তু, খাজনার পরিমাণ বাদ দিলে চাষীর হাতে বিনিয়োগের উপযুক্ত উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না।

তথাকথিত কৃষি-সংস্কারের ফলাফল

(খ) আয় অল্প কিছুটা বাড়িলেও তাহা খুবই ক্ষণস্থায়ী, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে চাষীর হাতে জমির পরিমাণ আবার কমিয়া যাইতে থাকিবে। (গ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ও বিচ্ছিন্নভাবে চাষীদের মধ্যে জমি বিভক্ত থাকায় বৃহৎ মাত্রায় কৃষিকার্য অসম্ভব হইয়া উঠিবে। (ঘ) চাষীদের খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে খাদ্যাভাব ও দামবৃদ্ধির দরুণ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি হইবে। এইরূপে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সাধারণ অনুন্নতির অবস্থায় ছোটখাট কৃষিসংস্কার অর্থনৈতিক অগ্রগমনের পথ সংকুচিত করে।

অপূর্ণোন্নত দেশের কৃষিক্ষেত্র উন্নত হয় না, কারণ শিল্পোন্নয়নের গতি খুবই শ্লথ। ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লব যাহাই হউক না কেন—সারা দেশে দ্রুত শিল্পায়নই কৃষির উন্নতি ঘটাইবার একমাত্র পথ। আবার কৃষিতে রূপান্তর না ঘটাইলে কোনমতে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর করা চলে না। যেমন, ধনতান্ত্রিক দেশে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়াই কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি হয়। (ক) ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বড় বড় কৃষি ফার্মে কম মজুর ও মূলধন-প্রধান যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন শুরু হয়, কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্র প্রবেশ করে। (খ) জমি জমা উৎসন্ন দিয়া নিঃস্ব চাষীর দল কারখানার মজুর হইবার উদ্দেশ্যে সহরে প্রবেশ করে, শিল্পে নিয়োগোপযোগী মজুত সৈন্যদল (Industrial reserve army) গড়িয়া উঠে। (গ) শিল্প ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সহরে কাঁচামাল ও খাদ্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়—উহা বিক্রয় করিয়া কারখানাজাত যন্ত্রপাতির

কৃষিতে ধনতন্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে না।

সাহায্যে কৃষি পুঁজিপতি তাহার জমির উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়াইতে পারে। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ দ্রুত নয় বলিয়া কৃষির উন্নয়ন ঘটিতে চাহে না। তাই এইরূপ দেশে কৃষির অনুন্নতি ও শিল্পের অনুন্নতি পরস্পরকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।*

(খ) অপূর্ণোন্নত দেশের শিল্পের কাঠামো— পূর্ণ ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের যুগে নিজস্ব গতিবেগেই শিল্প সম্প্রসারিত হইতে থাকে এবং অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হয়।† সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অচলাবস্থা দূর করিয়া মূলধন নিজেই ক্রমে নিজের বাজার সৃষ্টি করে। ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে সামন্ততন্ত্র অনেকখানি ভাঙিয়া গিয়াছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-কার্যের পরিবর্তে বাজারমুখী কৃষিকার্য শুরু হইয়াছে, গ্রাম্যশিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে কারখানাজাত দ্রব্যের বিনিময় কিয়দংশে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সামন্ত-তন্ত্র যতখানি ভাঙিয়াছে, সেই তুলনায় দেশীয় শিল্পের প্রসার বিশেষ হইতে পারে নাই, বরং শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের উপনিবেশে পরিণত হইযাছে। ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিকই, কিন্তু অনুন্নত দেশ-গুলির নিজস্ব শিল্পোন্নয়নের পথ সংকুচিত হইয়াছে। অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের আয় কম, সুতরাং দ্রব্য-সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা কম, শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী বাজার নাই বলিয়া এইরূপ বিনিয়োগ ঘটিতে পারে নাই। মূলধনের চাহিদা কম, কারণ বাজার নাই, এবং বাজার নাই কারণ মূলধনের চাহিদা কম. মূলধনের যোগান কম কারণ সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত নাই, এবং উদ্বৃত্ত নাই কারণ মূলধনের যোগান কম—চাহিদা ও যোগান উভয় দিকেই এইরূপ দুষ্টচক্র (vicious circle) অপূর্ণোন্নতির কাঠামোকে একই সঞ্চারপথে

শ্রমবিভাগের প্রসার নির্ভর করে শ্রম-বিভাগের প্রসারের উপর

দুষ্টচক্রের আপন গতি

* **এই সকল দেশে কৃষিসংস্কারের ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার না করিয়া বলা চলে না, কি অবস্থায় এবং কোন্ শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষিসংস্কার ঘটিতেছে সেই ঐতিহাসিক স্তর ও পরিবেশের উপরই তথাকথিত কৃষিসংস্কারের ফলাফল নির্ভর করে।**

† **"Capital rapidly creates for itself an internal market by destroying all handicrafts that is by spinning, weaving, making clothes etc. for all, in fine by transforming into exchange values commodities that were hitherto reproduced as direct use values—a process that results spontaneously from the severance of the worker (albeit a serf) from land and ownership of his means of production".**

আবর্তিত করাইতেছে। বিনিয়োগ যেরূপ নিজেই নিজের চালকশক্তি, বিনিয়োগের অভাবও সেইরূপ নিজেই নিজের অবস্থার ধারক ও বাহক।

অনেক সময় এই সকল দেশে বিদেশীরা শিল্প প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশের অধিবাসীদের মধ্য হইতে কাঁচামাল ও দক্ষশ্রমিক সংগ্রহ করিয়া উৎপাদন সুরু করে। নিজদেশে উৎপাদন না করিয়া তাহারা উপনিবেশেই কলকারখানা স্থাপন করে। কিন্তু এইরূপ বিদেশী বিনিয়োগের কোনো স্বয়ং চালিত গতি (self-propelling movement) সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ সেই বিনিয়োগের যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা তাহারা দেশ হইতে লইয়া আসে। শুধু তাহাই নহে। আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত থাকায় একবার বৃহৎমাত্রায় কোন শিল্প স্থাপিত হইলে অপর কোন ফার্ম সেই শিল্পে বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হয় না। সেই শিল্পে প্রভূত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের ঝুঁকিও অপর কেহ সহসা লইতে পারে না। সংরক্ষণী শুল্ক প্রভৃতির সাহায্যে অপর কোন বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনাও সংকুচিত রাখা হয়। এইরূপে অপূর্ণোন্নত দেশের সংকুচিত বাজারে একধরণের একচেটিয়া ধনতন্ত্র (Monopoly Capitalism) গড়িয়া উঠে এবং একচেটিয়া ধনতন্ত্রের নিজস্ব গতির নিয়ম অনুযায়ীই সে শিল্পোন্নয়নের পথে অধিকতর বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে।*

বিদেশী বিনিয়োগে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পোন্নয়নের গতি সৃষ্টি হয় না

বরং অকালে এক-চেটিয়া ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়

এই সকল কারণে ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশগুলির ধনতন্ত্রের প্রকৃতি এইরূপ অকালপক্ক এবং আকৃতি এত জটিল। জন্মক্ষণের বেদনা ও বাল্যের অভাববোধ পাইয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রাবল্য ও মত্ততা উপলব্ধি করে নাই, তৎক্ষণাৎ বার্ধক্যের জরা ও শক্তিহীনতা ইহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এই সকল দেশের ধনতন্ত্র বণিকযুগ (merchant phase) হইতে শিল্পযুগে (industrial phase) পৌঁছায় নাই, শ্রম ও মূলধন জিনিস কেনাবেচার স্তর হইতে (from sphere of circulation) শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগ হওয়ার স্তরে

* শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, সমাজদেহে প্রতিযোগিতার তাগিদে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে (প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারেই) প্রতিযোগিতা লুপ্ত হইয়া একচেটিয়ার উদ্ভব হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধা পাইতেছে। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে প্রথম হইতে একচেটিয়া স্থাপিত হওয়ায় ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল যুগের সুফলগুলি পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থারই স্বাভাবিক গতিতে বর্তমানে এই সকল দেশে রাষ্ট্র ও কতিপয় পুরাতন ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের মিলিত এক ধরনের মিশ্র একচেটিয়া ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

(to sphere of industrial production) পৌঁছাইতে পারে নাই। কৃষির জন্য বাজার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, "উদ্‌বৃত্ত" কৃষিশ্রমিকের শিল্পে নিযুক্ত হইবার পথ উন্মুক্ত হয় নাই, কৃষিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ অনড় ও অচল করিয়া রাখিয়াছে, কাঠামোগত বেকারি (structural unemployment) সৃষ্টি করিয়াছে, কুটিরশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে ও মহাজনী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল ক্ষুদ্র অথচ ধনী ব্যবসায়ীশ্রেণী তৈয়ারী করিয়াছে।

অপূর্ণোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর

অনুন্নত দেশের একচেটিয়া; ধনতান্ত্রিকশ্রেণী যে প্রভূত মুনাফা করে, সেই উদ্‌বৃত্ত কিন্তু মূলধনে রূপান্তরিত হয় না। সেই শিল্প বা অপর শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উহার বিনিয়োগ হয় না। বিদেশের শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশরূপে কিছুটা বিদেশে চলিয়া যায়। বাকিটা ঠিক পুরানো জমিদারদের অনুৎপাদক ব্যয়েরই অনুরূপ কাজকর্মে ব্যয় হইতে থাকে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অট্টালিকা, গাড়ী, দাসদাসী, আমোদ প্রমোদ, কুকুরের দৌড় ও ঘোড়দৌড়ে উহার ব্যয় হয়; অনুন্নত দেশটি স্বাধীন হইলে "স্বাধীন" রাজনৈতিক নেতাদের নিজস্বার্থে নিয়োগের কাজে, তাহাদের 'নির্বাচনের' ব্যয়ভার বহন করিতে এবং উচ্চপদস্থ দেশীয় চাকুরিয়াশ্রেণী সৃষ্টি করার কাজে উহার কিছু অংশ ব্যয়িত হয়। যে অপূর্ণোন্নত দেশের শ্রম ও প্রকৃতিদত্ত সম্পদ আহরণ করিয়া সেই উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টি, সেই দেশ অপূর্ণোন্নতই থাকে।

একচেটিয়া ধনতন্ত্রজাত উদ্‌বৃত্ত কেন অপূর্ণোন্নতি ঘুচাইতে পারে না

অনুশীলনী

1. Discuss the main features of underdevelopment to be witnessed in India's economy to-day. (C. U., B. A. 1962)

২

জাতীয় আয় ও দূরপ্রসারী পরিকল্পনা

National Income & Perspective Planning

কোন দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে এক বৎসরের মধ্যে যে-পরিমাণ বস্তুজাত ও বিভিন্ন কার্যের সমষ্টি উৎপাদন করে তাহার মোট মূল্যকে সেই দেশের সেই বৎসরের স্থূল জাতীয় আয় বলে। ইহা হইতে সেই বৎসরের মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। সাধারণত, তিনটি উপায়ে কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া (final products totalisation); দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কাজে সহায়তার দরুন উপাদানসমূহের সকল পাওনা যোগ করিয়া (factor payments totalisation); এবং তৃতীয়ত, এক বৎসরে জনসাধারণের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া (Consumption-saving totalisation)।

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ও ইহা পরিমাপের পদ্ধতি

জাতীয় আয় এমনভাবে পরিমাপ করা হয়, যাহাতে জাতীয় আয়ের গঠনকারী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের পরিমাণ ও উহাদের পারস্পরিক অনুপাত আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, পরিবহণ, বণ্টনব্যবস্থা প্রভৃতি কাজকর্মের পারস্পরিক গুরুত্ব ও নির্ভরশীলতার চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর নানা বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে ফুটিয়া বাহির হয়। এই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে জাতীয় আয়ের যে যে অংশ পাওয়া যায় তাহাতে পরিবর্তন আসিলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসিতেছে বোঝা যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপের সুবিধা, প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব

যেমন, উন্নয়ন কালে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতির তুলনায় শিল্প হইতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধির হিসাব করিয়াই দেশের উন্নয়নের হার পরিমাপ করা হয়। আয় ব্যয়ের ধরন, কোন্ ক্ষেত্রে কত শ্রম ও মূলধন নিযুক্ত থাকিয়া কত পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করিতেছে, শ্রমিকের বা যন্ত্রের উৎপাদনক্ষমতা কোন্ ক্ষেত্রে বেশি বা কোন্ ক্ষেত্রে কম—সকল কিছু আমরা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বুঝিতে পারি। ভারতের ন্যায় দেশে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব আরও বেশি। আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে অথবা উন্নয়নের ও ক্রমোন্নতির নির্দিষ্ট ধারাপথে ও গতিবেগে দেশ অগ্রসর হইতেছে কিনা বুঝিতে হইলে অবশ্যই আমাদের জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা দরকার।

ভারতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Estimates of National Income in India) :

বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং কয়েকজন ইংরাজ আমাদের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আর্থিক আয়েব পরিমাপ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল হিসাবগুলিকে একেবারে সঠিক বলা চলে না এবং ইহাদের সাহায্যে আমাদের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি কিছুই স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। তথ্য সংগ্রহের অসুবিধা ছিল খুবই বেশি। প্রকাশিত পুস্তক বা সরকারী কাগজপত্রে তথ্যের উপর নজর দেওয়া হইত না। ফলে অনেকাংশে আন্দাজী হিসাবমত গণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকে হিসাবের সময় সকল বিষয়ে সমান মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। ইংরাজ শাসিত ভারত, দেশীয় রাজ্যগুলি, অন্যান্য বিদেশী পকেট প্রভৃতি থাকাতে বিভিন্ন ব্যক্তির হিসাবে পার্থক্য দেখা দিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে তুলনা করিবার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর একই মানদণ্ডের সাহায্যে হিসাব করা হয় নাই, তাই এই সকল হিসাব হইতে জাতীয় আয়ের গতিবিধির নির্দিষ্ট কোন ধারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি না।

এ সকল ইতিহাসের ত্রুটি

জাতীয় আয় কমিটির হিসাব (Estimate of National Income Committee)

স্বাধীনতা পাইবার পর দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সামগ্রিক তথ্য আহরণের জন্য ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় আয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন[১]। কমিটি প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮—৪৯ সালের জাতীয় আয়ের হিসাব দেন এবং সর্বশেষ রিপোর্টে ১৯৪৮—৪৯ সালের পরিবর্তিত হিসাব এবং ১৯৪৯—১৯৫০ ও ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব দেন। উহার পর হইতে আমরা জাতীয় আয়ের হিসাব পাই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের বার্ষিক বিবরণী হইতে।

জাতীয় আয় কমিটির প্রতিষ্ঠা

কমিটির প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব বাহির হইয়াছিল। সেই বছরের জাতীয় আয়ের হিসাব ছিল ৮৭১০ কোটি টাকা। কৃষি ও তদনুরূপ ক্ষেত্র হইতে ৪১৫০ কোটি; খনি, যন্ত্রশিল্প ও হস্তশিল্প প্রভৃতি হইতে ১৫০০ কোটি; বাণিজ্য ও পরিবহণ হইতে ১৭০০ কোটি; এবং অন্যান্য কাজকর্ম হইতে ১৩৮০ কোটি। মোট ৮৭৩০ কোটি টাকা হইতে ২০ কোটি টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স বাদ দিয়া ৮৭০০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল[২]। মোট জনসংখ্যা ধরা হইয়াছিল ৩৪ কোটির কিছু বেশি, ফলে ১৯৪৮-৪৯ সালে মাথাপিছু আয়ের হিসাব ছিল বৎসরে ২২৫ টাকা। সর্বশেষ রিপোর্টে এই হিসাব সংশোধিত করিয়া বলা হয় যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৮৬৫০ কোটি টাকা এবং বৎসরে মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৬·৯ টাকা।

প্রথম রিপোর্টের এবং সংশোধিত রিপোর্টের দুই প্রকার হিসাব

১। অধ্যাপক মহলানবীশ, গ্যাডগীল; ভি, কে, আর, ভি, রাও, বিদেশী পণ্ডিত যেমন অধ্যাপক সাইমন কুজনেটস্ প্রভৃতি ব্যক্তিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল, ইহারা জাতীয় আয় ইউনিটের কর্মীবৃন্দের সাহায্যে গণনা করিয়াছিল। প্রথম রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে, শেষ রিপোর্ট ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

২। অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহন এবং কাজকর্ম হইতে যথাক্রমে মোট জাতীয় আয়ের ৪৭·৬·২%, ১৭·২%, ১৯·৫% এবং ১৩·৮% অংশ উৎপন্ন হইয়াছিল।

তাহার পর হইতে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণে প্রতি বৎসর কিরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা নীচে তালিকার আকারে দেওয়া হইল :

বৎসর	নীট জাতীয় আয় (কোটি টাকার হিসাবে)	মাথাপিছু আয় (টাকার হিসাবে)
	১৯৪৮-৪৯ সালের দামস্তরের হিসাবে	১৯৪৮-৪৯ সালের দামস্তরের হিসাবে
১৯৪৮—৪৯	৮,৬৫০	২৪৬.৯
১৯৪৯—৫০	৮,৮২০	২৪৮.৬
১৯৫০—৫১	৮,৮৫০	২৪৬.৩
১৯৫১—৫২	৯,১৬০	২৫০.১
১৯৫২—৫৩	৯,৪৬০	২৫৬.৬
১৯৫৩—৫৪	১০,০৩০	২৬৮.৭
১৯৫৪—৫৫	১০,২৮০	২৭১.৯
১৯৫৫—৫৬	১০,৪৮০	২৭৩.৬
১৯৫৬—৫৭	১১,০৩০	২৮৩.৫
১৯৫৭—৫৮	১০,৮৯০	২৭৭.১
১৯৫৮—৫৯	১১,৬৯০	২৯৩.৬
১৯৫৯—৬০	১১,৭৬০	২৯১.৬

চল্‌তি দামস্তরের হিসাবে জাতীয় আয় যত পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী হইল দামস্তরে বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামস্তর অনুযায়ী হিসাব করিলে মাথাপিছু আয় ততটা বাড়ে নাই, কারণ লোকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির বিবরণী হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, কৃষি ও পশুপালন হইতে আয়ের অনুপাত মোটামুটি সমানই আছে (প্রায় ৫০%), এবং মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প-ক্ষেত্রের অনুপাতও (৮%) ততটা বাড়ে নাই। ক্ষুদ্র ব্যবসায়, কুটিরশিল্প ও গৃহ-সেবার কাজকর্ম মিলিয়া যে অনুপাত (২৩%) তাহাও বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ইহাতে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশেষ ঘটে নাই বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি ও অসুবিধা
(Methods and difficulties of estimation of National Income in India):

সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়: উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি, আয়-সুমারী পদ্ধতি ও ভোগ সঞ্চয় পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর নীট উৎপাদনকে যোগ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল ব্যক্তির সকল প্রকার আয় যোগ করা হয়। তৃতীয় পদ্ধতিতে মোট বৎসরে দেশের অধিবাসীদের মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

উন্নত দেশের তিনটি পদ্ধতি

ভারতের জাতীয় আয় কমিটি এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোনো একটির সাহায্যে পরিমাপ করিতে পারেন নাই, তৃতীয় পদ্ধতি তাঁহারা ব্যবহারই করেন নাই, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পদ্ধতি একযোগে ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষি, অরণ্য, পশুপালন, শিকার, মাছধরা, খনি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উৎপাদন সুমারী পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যাদির নীট পরিমাণ যোগ করা হইয়াছে। ব্যবসায়, বাণিজ্য, সরকারী ও বেসরকারী অফিস আদালতের বিভিন্ন প্রকার চাকুরি প্রভৃতি হইতে আয় যোগ করিয়া আয় সুমারী পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব করা হইয়াছে।

ভারতের মিশ্রিত পদ্ধতি

জাতীয় আয় কমিটি নিজেই কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে এইরূপ তথ্য সংগ্রহের বহুবিধ অসুবিধা। এই সকল অসুবিধাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা চলে: (ক) তত্ত্বগত, (খ) তথ্যগত, ও (গ) তুলনাগত।*

প্রথমত, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে বা কাজকর্মকে হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বহু মতভেদ দেখা যায় এবং স্পষ্ট কোন মানদণ্ড পাওয়া যায় না। যেমন, অনেক সময় নিজের বা পরিবারের জন্য যে সকল কাজকর্ম করা হয় তাহাদের বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু পরিবারের মধ্যে যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় বা ভোগ করা হয় তাহাদের হিসাবে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলিতে 'পরিবারসমূহ'

তত্ত্বগত অসুবিধাগুলি

---

* The Economics of underdeveloped countries—*Bauyer and Yamey*: Chap, II & III. P. 16—42.

গঠিত হয় বহুপ্রকার সম্পর্কযুক্ত অধিকসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া, কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে পরিবারের সংজ্ঞা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট। ফলে অধিক পরিমাণ পারিবারিক কাজকর্ম হিসাব হইতে বাদ পড়িয়া যায়। ভারতের বহু অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কাজ স্ত্রীলোকেরাই করে, তাহার দাম যোগ দেওয়া হয় না। পুরুষেরা বিক্রয়ের কাজ করিলেও সেই কাজ পৃথকভাবে হিসাব করা হয় না। তৃতীয়ত, অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির ন্যায় ভারতবর্ষেও অধিকাংশ দ্রব্য-সামগ্রী বাজারে আসে না; উৎপাদক হয় নিজেই ভোগ করে বা অপর উৎপাদকের দ্রব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। সুতরাং বহু পরিমাণে আন্দাজের সাহায্যে কাজ চালাইতে হয় এবং ফলে হিসাব নিখুঁত হইতে পারে না। চতুর্থত, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ (specialisation) অধিক প্রসার লাভ করে নাই। যেমন একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, মজুর খাটিয়া আয় করে। ফলে জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (classification of sectors), অর্থাৎ কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না।

সর্বোপরি, যে-দামে চাষীরা বা উৎপাদকেরা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে সেই দাম বৎসরের সকল সময়ে সকল স্থানে সমান থাকে না এবং ক্রেতারা যে দামে ক্রয় করে সেই দাম হইতে উহার পার্থক্য খুবই বেশি। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের আর্থিক মূল্য হিসাব করার অসুবিধা কম নয়।

তথ্যগত অসুবিধাগুলি

তথ্যগত অসুবিধার মধ্যে প্রধান হইল তথ্যের অসম্পূর্ণতা। ইহা অনেক ধরনে দেখা দেয়। যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা সঠিক নয় এবং দক্ষ কর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত হয় না। তথ্যের আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও পার্থক্য এত বেশি যে, একটি অঞ্চলের সম্পূর্ণ তথ্য পাইলেও উহার সাহায্যে সারা দেশের হিসাব বাহির করা চলে না। সর্বোপরি, দেশের রাজ্যক্ষেত্রে (Territory) অনবরত পরিবর্তন হইতে থাকায় সারা ভারতের তথ্যগুলিতে প্রায়ই পরিবর্তন করিতে হয়।

তুলনাগত অসুবিধাগুলি

এই সকল অসুবিধার জন্যই তুলনাগত বহু অসুবিধা আসিয়া পড়ে। যখন আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সহিত অপর কোন দেশের জাতীয় আয়ের তুলনা করা হয় তখন দুইটি দেশের হিসাব একই মানদণ্ডের ভিত্তিতে গণনা করা হইয়াছে কি না তাহা

লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য থাকায় এইরূপ তুলনা করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা সমাজতান্ত্রিক নয়, ধনতান্ত্রিক; ইহাই মৌলিক অসুবিধা

আমাদের দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হইল । পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, সোবিয়েত, চীন প্রভৃতি দেশে উৎপাদক শ্রম হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির মূল্যকেই হিসাবে আনা হয়, অনুৎপাদক হিসাবে আনা হয় না। সমাজে আয় কর ফাঁকি শিখাইবার উপযুক্ত উকিলের বা হিসাব রক্ষকের আয় বৃদ্ধি পাইলে, ধনিক শ্রেণীর গৃহপরিচারক বা মোটরগাড়ি চালকের সংখ্যা ও তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় প্রকৃত পক্ষে বাড়ে না। তৃতীয় স্তরের কাজকর্মে (Tertiary occupation) নিযুক্ত এইরূপ বহু ব্যক্তির আয় জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ক্রমোন্নতির পথে দেশের অগ্রগমন পরিমাপ করিতে হইলে অনুৎপাদক কাজকর্ম যথাসম্ভব বাদ দেওয়া প্রয়োজন।*

দূর-প্রসারী পরিকল্পনা ও ভারতের জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি (Perspective Planning and increase in India's National Income) :

কোন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে সর্বদাই চলমান। পাঁচ বৎসর, সাত বৎসর প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ডকালের মধ্যে ইহাকে পৃথক ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। তবুও পরিকল্পনার সুবিধার জন্য আমরা পাঁচ বৎসরকে এক একটি কালাংশ বা যুগ বলিয়া ধরিয়া লই। এই কালাংশ বা যুগের মধ্যে সরকারের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা হয়, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়, উহার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, সেই ব্যয়ের উপযোগী অর্থসংস্থানের জন্য উৎস নির্ণয় করিতে হয়। তাই ইহাদের পৃথক পৃথক পরিকল্পনা রূপে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ওই সকল

* "In the eastern European countries services not directly connected with the production and transport of goods are not regarded as productive and their value is thus excluded from National Income. For a poor country which is trying to develop its industry and so reduce the under-employment common in service trades, the marxist definition of national income has some obvious advantages over the more inclusive concept suited to wealthy industrialised economies and now commonly adopted in under-developed countries"—*United Nation's*, Economic Survey of Europe since the war (1952).

খণ্ডকালের অন্তর্গত "পৃথক" এক একটি পরিকল্পনাকে বিস্তৃততর কোন পরিপ্রেক্ষিতে-বড় কোন পটভূমিতে স্থাপনা করিয়া বিচার করিতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘকালীন চিত্র অংকন করিয়া উহাকে সম্মুখে রাখিয়া বর্তমান উন্নয়নের কর্মসূচী বা নীতি-কৌশল বিচার ও গ্রহণ করিতে হয়। তাহা না হইলে বর্তমানের কোন এক সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের উন্নয়ন কমাইয়া দিতে পারে; বা ভবিষ্যতে তখনকার প্রয়োজনে কোনদিকে গুরুতর ও কষ্টসাধ্য পরিবর্তন ঘটাইবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রচনা করিতে পারিলে উহার সাহায্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরস্পর-নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় এবং উন্নয়নের সম্ভাব্য বাধাগুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। জাতীয় আয় ও উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং সামাজিক আদর্শগুলি রূপদানের চেষ্টার ফলে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগান ও চাহিদার নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এইরূপ দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার মধ্য দিয়া এই সমস্যাগুলির কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্টতর হইলে উপকরণগুলির সর্বোত্তম ও সময়োপযোগী ব্যবহারে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। দীর্ঘকালীন চিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাই প্রতিটি কালাংশের পৃথক পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তোলা দরকার; শক্তি, পরিবহন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও টেক্‌নিকাল শিক্ষা সকল কিছুর পাঁচশালা পরিকল্পনা এইরূপে খণ্ডকালের গণ্ডী ছাড়াইয়া বৃহত্তর পটভূমিতে নিজেদের বিস্তারিত করে।

প্রতিটি 'স্বল্পকাল' লইয়াই 'দীর্ঘকাল' গঠিত হয়

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। নীতি ও কার্যসূচী রচনার ব্যাপারে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা দরকার ইহা যেমন ঠিকই; তেমনই প্রতি বৎসর বা কিছু সময় অন্তর অন্তর নূতন অভিজ্ঞতা ও নূতন তথ্যের ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন চিত্র বা তাহার রূপরেখায় পরিবর্তন আনিতে হয়। প্রতিটি স্বল্পকালীন পরিকল্পনার রূপায়নের মধ্য দিয়া পূর্বে অচিন্তিত অনেক নূতন শক্তি দেখা হয়, হিসাবে তথ্যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয়, চক্ষের সম্মুখে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার কাঠামো বদলাইতে হয়।

স্বল্পকালের অভিজ্ঞতার আলোকেই 'দীর্ঘকাল' সম্পর্কে ধারণা নিয়ত বদলাইতে হয়

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা—উভয়কেই দেশের দীর্ঘকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বল্পকালীন কার্যসূচী বা এক একটি স্তর বলিয়া রচনা

করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনাটি রচনার সময়ে যে দীর্ঘকালীন পটভূমি ধরা হইয়াছিল তাহার বিস্তার ছিল ১৯৫১ হইতে ১৯৮১ পর্যন্ত। এই চিত্রাংকনের সময় তিনটি বিষয়ের হিসাব ধরিয়া লইতে হইয়াছিল, যে হিসাবগুলি এই চিত্রাংকনের ভিত্তি। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে জাতীয় আয়ের কত অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইবে, এবং এই বিনিয়োগ হইতে কিরূপ প্রতিদান বা ফল আমরা পাইতে পারি—এই সকল বিষয়ে কতকগুলি হিসাব ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার উন্নয়নের এই মডেলে ধরা হইয়াছিল যে ১৯৫০-৫১ সালের জাতীয় আয়ের স্তর ১৯৭০-৭১ সালে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে ১৯৭৭-৭৮ সালে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জাতীয় আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাত এবং মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত সম্পর্কে অনুমানগুলি দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে সংশোধন করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার মডেলটি তৈয়াব করা হয়। ইহাতে দেখা যায় জাতীয় আয় ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যেই দ্বিগুণ হইতে পারে এবং মাথাপিছু আয়ও ১৯৭৩-৭৪ সালে দ্বিগুণ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা গিয়াছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃত হার অনুমিত হারের তুলনায় বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনার মডেলে তাই জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির গতিবেগ এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ভিন্নরূপ ধরিয়া লইয়া দীর্ঘকালীন উন্নয়নের চিত্ররেখা বদল করা হইয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার এবং অন্যান্য বিষয়ে গতির অনুমান সমান থাকিবে ধরিয়া লইলে দেখা যাইতেছে যে যদি বাৎসরিক ৬% হারে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির বেগ রক্ষা করা যায়, তবুও ১৯৫০-৫১ সালের মাথাপিছু আয় পঞ্চম পরিকল্পনার মাঝামাঝি দ্বিগুণ করা খুবই শক্ত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাব নিকাশ তাই অনেকটা বদলান দরকার। দেখা গিয়াছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরে ২%-এর বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের ফলে বর্তমানের ১৪৫০০ কোটি টাকা হইতে জাতীয় আয় এই পরিকল্পনার শেষে হইবে ১৯০০০ কোটি টাকা; চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে হইবে ২৫০০০ কোটি টাকা; এবং পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে হইবে ৩৩০০০/৩৪০০০ কোটি টাকা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মনে করিয়া দেখা যায় যে এই হিসাব মত মাথাপিছু আয় ১৯৬০-৬১-

জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশনের ধারণা

সালের বাৎসরিক ৩৩০ টাকা হইতে ১৯৬৬, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ এ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৩৮৫, ৪৫০ এবং ৫৩০ টাকা।

উন্নয়নের এই হার পাইতে হইলে দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কিরূপ করা দরকার তাহা আলোচনা করাও প্রয়োজন। বর্তমানে নীট বিনিয়োগ হইল বৎসরে জাতীয় আয়ের প্রায় ১১% ; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ইহা দাঁড়াইবে যথাক্রমে ১৪/১৫, ১৭/১৮, ও ১৯ ২০। টাকার অংকে প্রকাশ করিলে বলা চলে যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ১০৫০০ কোটি টাকা ; চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ১৭০০০ কোটি এবং ২৫০০০ কোটি টাকা। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে না বাড়িলে এই বিনিয়োগ সম্ভব হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হইল জাতীয় আয়ের ৮'৫%, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা হইবে ১১'৫%, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ইহা হইবে ১৫/১৬ এবং ১৯/১৯। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে মোট বিনিয়োগের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিবে। এইরূপে চলিলে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে দেশের উৎপাদন কাঠামো এমন শক্তিশালী হইবে যাহাতে ভারতবর্ষ "স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে" প্রবেশ করিবে। "স্বনির্ভরশীল উন্নয়ন" (self sustained growth) বলিলে বুঝা যায়, দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এমন হারে ঘটিতে থাকিবে যাহাতে দ্রুত উন্নয়নের হার বজায় থাকে, বাহির হইতে মূলধন আনিয়া সমাজদেহে প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হয় না।

অনুশীলনী

1. Briefly discuss the National Income of India.
2. Discuss the importance and difficulties in the way of a satisfactory estimate and analysis of national income in India.
3. Give a description of India's Longterm economic plan.
4. Define and discuss the need for Longterm or Perspective Planning in Indian conditions.
5. Analyse the course of Savings, Investment and National Income in our five year plans. What are the prospects for future ?

৩

প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার

Natural Resources & their Utilisation

প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Natural Resources and economic development)

প্রকৃতিদত্ত উপকরণসমূহ লইয়াই কোন দেশের মানুষ নিজস্ব অর্থনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তোলে এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টার মধ্য হইতেই জাতীয় চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে মানুষের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হইল তাহার বিভিন্নমুখী অভাব মিটাইবার উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন। আর উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্মের রূপ ও কাঠামো প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইত। বলা চলে, প্রাচীনকালে অনেক সময় প্রাকৃতিক উপকরণের স্বল্পতা বা উহার ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসাবে কাজ করিয়াছে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রয়োগ পদ্ধতির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে, আধুনিক কালে, প্রাকৃতিক উপকরণের অভাবকে আর গুরুতর বাধা হিসাবে গণ্য করা চলে না। বর্তমানে প্রকৃতির নিকট হইতে ক্ষমতা আহরণ করিয়াই মানুষ প্রকৃতিকে বশ মানাইয়াছে, মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মে ও সমাজগঠনে প্রকৃতির প্রভাব ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে এখনও প্রকৃতির শক্তি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে ; জলবায়ুর দ্বারা নির্ধারিত হয় খাদ্য বস্ত্র পরিধেয়, কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী, শ্রমের ক্ষমতা। মাটির গুণ বা উর্বরতাশক্তি দ্বারা স্থির হয় শস্যের ও শ্রমের প্রকার-ভেদ ; অরণ্য ও পর্বতের ফলে বৃষ্টিপাতের সময়, পরিমাণ ও বণ্টন নির্ধারিত থাকে ; সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির উপর নির্ভর করে বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা।

প্রাচীনকালে একটি দেশের অর্থনীতি প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ও গুণ, উহার সহজলভ্যতা, গুরুত্বপূর্ণ অনেক উপকরণের একত্র অবস্থান, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উহাদের বণ্টন—অর্থনৈতিক

উন্নয়নের সময়ে ইহাদের কোনটিকেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বরু হয় না। বহু প্রকার ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ মিলিয়া একটি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রাপথ প্রশস্ত হইয়া উঠে, উহার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।* তখন যে শিল্পবিপ্লব ঘটে তাহার ফলেই অন্যান্য উৎপাদক উপকরণের (যেমন মূলধন শিল্পদক্ষতা প্রভৃতি) দ্বারা প্রাকৃতিক উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার হইতে থাকে। দেশে মূলধনের পরিমাণ, টেক্‌নোলজির রূপ, উহার উন্নয়নের স্তর, উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-কাঠামোর চরিত্র, সরকারের নীতি ও কর্মদক্ষতা, এবং এই ধরনের প্রভাবে প্রাকৃতিক উপকরণগুলি বিক্রয়যোগ্য সম্পদে বা পণ্যে পরিণত হইতে থাকে। কোন বিশেষ উপকরণকে পণ্যে পরিণত করিতে হইলে অন্যান্য অনেক উপকরণ দরকার হইয়া পড়ে। তাহাদের চাহিদা দেখা দেয়, উহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। এইরূপে উহারাও ক্রমে পণ্য হইয়া উঠে। মূলধন প্রধান সমাজে মূলধনই উৎপাদনের কর্তা, শ্রম ও উপকরণ উহার আজ্ঞাবহ। মূলধনের পরিমাণ বাড়ানই মূলধনের উদ্দেশ্য, প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহার বা উন্নয়ন তাহার প্রধান লক্ষ্য নয়। যদিও কোন অনুন্নত দেশে বর্তমানে প্রাকৃতিক উপকরণের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু মূলধন খাটাইয়া খনি ও সমুদ্র হইতে সে নূতন বা পুরাতন প্রাকৃতিক উপকরণ আবিষ্কার করিতে পারে। প্রাকৃতিক উপকরণকে আহরণ করা যায় কিরূপে, উহা ব্যবহার করা যায় কিরূপে—সেই অবস্থা অনুযায়ীই দেশটিতে বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির উন্নতির

বর্তমানকালে মূলধনই প্রধান, উহারই উপর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনা নির্ভর করে

* "It is, of course, the case that prosperous nations either possess some valuable natural resources in their own territories or directly concerned in the exploitation of such resources in other countries or have access to them. But in most cases they have largely raised the value of these resources by discovering and developing them through the application of capital, organising and technical skills and labour. The necessary and previously lacking cooperant factors of production have been supplied, and the natural resources clothed with economic usefulness and value. In large measure, the prospertiy of a nation as well as the active development of its natural resources can both be seen as results or aspects of the operation of other causes, though the presence of the natural resources may serve to stimulate and reinforce their operation." *Bauyer & Yamey ;* Economics of under-developed countries P. 47.

রূপ নির্ধারিত হইতে থাকে। দেশে কোন্ ধরনের শিল্প এবং কি পদ্ধতিতে তাহারা পরিচালিত হইবে, ইহা অনেক সময় প্রাকৃতিক উপকরণের প্রাচুর্য ও স্বল্পতার দ্বারা নিরূপিত হয়। প্রভূত উপকরণ লইয়া আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতির লোকেরা নিতান্ত আদিম অবস্থায় বহু শতাব্দী অতিবাহিত করিয়াছে। রুশিয়ার প্রভূত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত মূলধন গঠনের পূর্বে তাহার অবস্থা ছিল একান্ত অনুন্নত। বরং দেখা গিয়াছে যে, অনেকক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবই উন্নয়নের উপযোগী অর্থ নৈতিক তাগিদ, মানসিক চেতনা ও উদ্যোগ আনিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড ও জাপানই ইহার উদাহরণ। তাই আমরা বলিতে পারি যে, কোন দেশের সমৃদ্ধির এবং উপকরণগুলির উন্নয়নের মূলে অন্যান্য প্রভাবই প্রধান।

প্রাকৃতিক উপকরণের প্রাচুর্য বা স্বল্পতা শিল্পের চরিত্র নির্ধারণ করে

এইরূপ সিদ্ধান্তের পরেও আমরা একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারি না। নিজের দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের স্বল্পতা ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবকে বহির্মুখী ও রপ্তানি নির্ভর করিয়া তুলিয়াছে, সে ঔপনিবেশিক শোষণের পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু নিজের দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের প্রাচুর্য আমেরিকার শিল্পপ্রসারকে অন্তর্মুখী করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন না করিয়া তাহার পক্ষে শিল্পবৃদ্ধি গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতের প্রাকৃতিক উপকরণ (Natural Resources of India) :

আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল সামগ্রিকভাবে দেশের সকল অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। এই লক্ষ্য সফল করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জাতির প্রাকৃতিক ও মানবিক সকল উপকরণের উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার প্রসার ঘটিয়া আধুনিক কালে এমন যান্ত্রিক উন্নতি দেখা দিয়াছে যাহার দরুণ আংশিক ভাবে হইলেও উপকরণগুলির অভাব দূর করা সম্ভব হইয়াছে। উপকরণের যোগান এইরূপে প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল গতিশীল শক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদায় ও যোগানে পরিবর্তন আনিতেছে, সেই সকল শক্তিগুলিকে সদাসর্বদা দৃষ্টিগোচর না রাখিলে প্রাকৃতিক উপকরণ সম্পর্কে কোনও নীতি নির্ধারণ করা চলে না। প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে সামগ্রিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং জাতির দীর্ঘকালীন প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া তাহাদের অনুসন্ধান ও

ব্যবহারের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন দেখা দিবার পূর্বে বর্তমান উপকরণগুলি সম্বন্ধে আমাদের খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন এবং উহা ব্যবহারের সম্ভাবনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রসারিত করা দরকার। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার কত দ্রুত হইবে তাহা অনেকাংশে ইহার উপর নির্ভর করে। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন প্রাকৃতিক উপকরণ সম্পর্কে একটি সংস্থা (Natural Resources Unit) স্থাপন করিয়াছে। উহার কাজ হইল এই সকল সম্পদগুলির পরিমাণ জানা এবং উন্নয়নের বহুবিধ সমস্যার বিচার করা, যাহাতে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান সাহায্য পায়।

ভূমি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Land and economic development):

কোন দেশের ভূমির পরিমাণ ও প্রকৃতি সেই দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে কতভাবে প্রভাবিত করিতে পারে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। ইহা বিশ্লেষণ করাও শ্রমসাধ্য, কারণ ভূমির নানা বৈশিষ্ট্য আমরা নানা দিক হইতে আলোচনা করিতে পারি। ভূমির প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক আছে; আবার ইহার অর্থ নৈতিক দিকও আছে। ইহাকে বহু দৃষ্টিতে দেখা যায়: কৃষি উৎপাদনের উপকরণ, শিল্প উৎপাদনেব উপকরণ, পরিবহনের উপকরণ, শ্রমিক বা জনসংখ্যার সহিত ইহার সম্পর্ক, মূলধনের সহিত ইহার সম্পর্ক প্রভৃতি।

ভূমিকে নানা দিক হইতে দেখা যাইতে পারে

কৃষি উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ভূমিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই দেখা যায় যে, কোনো দেশের সকল ভূমিখণ্ড সমান উর্বর নয়, তাহাদের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক সম্পদে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের দরুণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ইহাদের ভূমিকা ও গুরুত্বে তারতম্য ঘটে। কোনো কোনো দেশে ভূমির পরিমাণ ও উর্বরতা এত বেশি যে শিল্পপ্রসারের যুগে খাদ্য সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই দেশের ভূমিই লইতে পারে। এমনকি, কৃষিপণ্য রপ্তানি করিয়া কলকারখানার যন্ত্রপাতি আমদানি করা এবং মূলধন-গঠনে সাহায্য করাও সম্ভবপর। আবার অনেক দেশে ভূমির খাদ্য যোগাইবার বা মূলধন-গঠনে সাহায্য করার ক্ষমতা নাই। এই সকল দেশে প্রথমে কিছুটা অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটিলে, অর্থাৎ মূলধন সংগৃহীত হইলে তবেই তাহার দ্বারা ভূমির উন্নয়ন ঘটান সম্ভবপর।

ভূমি: কৃষি-উৎপাদনের উপকরণ

শিল্প-উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ভূমিকে বিশ্লেষণ করিলেও স্পষ্ট দেখা যায় বিভিন্ন দেশে ভূমির এই ক্ষমতা বিভিন্ন। যে খনিজ দ্রব্যগুলি ভূমি হইতে উত্তোলিত হয় তাহার পরিমাণ নিশ্চয় সকল দেশেরই উন্নয়নের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিজাত কোন শিল্পোপকরণের গুরুত্ব নির্ভর করে উহা কতটা গুণসম্পন্ন বা কোন মাত্রার (grade), উহার পরিবহনের সুবিধা বা অসুবিধা, পরিবহনের উপায়গুলির নিকটে বা দূরে অবস্থান, সহযোগী অন্যান্য উপকরণের নিকটে বা দূরে অবস্থান, এবং বাজারের নিকটবর্তিতা বা দূরবর্তিতা। শিল্পের এই উপকরণগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দুই ভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, এই উপকরণগুলিকে বিদেশে রপ্তানি করিতে পারে, যেমন ইরান, ইরাক, সৌদি আরব প্রভৃতি খনিজ তৈল রপ্তানি করে। ইহা হইতে বোঝা যায় কেবল উপকরণ থাকিলেই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে না। দ্বিতীয়ত, দেশটি এই উপকরণসমূহ নিজ দেশেই ব্যবহার করিয়া কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু কোনো দেশে কাঁচামাল থাকা উন্নয়নের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য নয়। ব্রিটেনে খনিজ তৈল, তামা, অভ্র প্রভৃতি নাই, সুইজারল্যাণ্ডে কেবল জলবিদ্যুৎশক্তি আছে, জাপানে কয়লা এবং লোহা নাই বলিলেই চলে, নিউজীল্যাণ্ডে কোন শিল্পোপকরণ নাই, ইহা আমরা সকলে জানি। অবশ্য ইহা ঠিকই যে, এই অবস্থায় এই সকল দেশকে বহির্বাণিজ্যের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হইলে দেশের শিল্পোপকরণগুলির প্রয়োজন ও ব্যবহার ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। উন্নয়নের উচ্চস্তরে শ্রম ও মূলধনের দক্ষতা প্রভূত বৃদ্ধি পাইলে কম উপকরণের সাহায্যে অধিক সম্পদ উৎপাদন হয়, অন্য দেশ হইতে উপকরণ লইয়া আসার ক্ষমতা বাড়ে, যান্ত্রিক বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে নূতন উপকরণের আবিষ্কার সম্ভবপর হইতে থাকে।

ভূমি : শিল্প উৎপাদনের উপকরণ

পরিবহনের উপকরণ হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমি বিশেষ সাহায্য করে, ইহা বলাই বাহুল্য। দেশের মধ্যে পর্বতমালা সুষ্ঠু পরিবহনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। নদী নালা বেশি থাকিলে পরিবহনের কাজে সুবিধা। সমভূমি যত বেশি, দেশে পথ, রেল ও খাল ইত্যাদি গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা তত বেশি। প্রাকৃতিক বন্দরের সংখ্যা যত বেশি, কৃত্রিম বন্দর উন্নয়নে দেশের মূলধন ব্যয় তত কম।

শ্রমিকের সহিত ভূমির সম্পর্কও অর্থনৈতিক উন্নয়নে একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জমির সঙ্গে শ্রমের যে-অনুপাত থাকে, দেখা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাত পাল্টাইতেছে। প্রতি জমিখণ্ডে শ্রমের অনুপাত কমিতেছে এবং মূলধনের অনুপাত বাড়িতেছে। জমি : শ্রম : মূলধন ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টির অনুপাত কমিয়া আসা এবং তৃতীয়টির অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়াকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। কেবল শ্রমিকের সংখ্যা নয়, তাহার সাংস্কৃতিক স্তর এবং ধরনও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহারে সাহায্য করে। উত্তরাধিকার আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির অধিকার পাইলে চাষের জোতের আয়তন হ্রাস পায় না, বড়ই থাকে। আর সকল পুত্র সমান পাইলে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা দেখা দেয়। জোতের আয়তন বড় হইলে উহা হইতে উদ্বৃত্ত আহরণ ও মূলধন গঠনের সম্ভাবনা বেশি, কম হইলে ইহার সম্ভাবনা কম।*

ভূমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ। প্রকৃতির দেওয়া সমতল ভূমি নিছক ভূমি, কিন্তু মানুষের পরিশ্রমে জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করা জমিকে অনেকাংশে মূলধন বলা চলে। সমস্যা আরও গভীরে, কারণ ভূমি ও মূলধন একে অন্যের পরিবর্ত-সামগ্রী। ভূমিক্ষয় হইয়া নির্ভূমিতে পরিণত হইলে মূলধন প্রয়োগ করিয়া উহাকে পূর্বের অবস্থায় লইয়া আসা চলে। রাসায়নিক সার ক্ষয়িত উর্বরতা পূরণ করে, অরণ্যীকরণ ভূমির জলসংরক্ষণের ক্ষমতা বাড়ায়, জলসেচ ঊষর মরুকে চাষের উপযোগী করিয়া তোলে। অবশ্য ইহা মনে রাখা দরকার যে, ভূমির পরিবর্তে মূলধনকে ব্যবহার করা সম্ভব হইলেও ভূমির গুরুত্ব মোটেই কম নয়। মূলধনের পরিমাণ এবং টেক্‌নোলজির স্তর—এই দুইটি বিষয়ের উপব ভূমির পরিবর্তে মূলধনের ব্যবহার নির্ভর করে। দেশ যত অনুন্নত, মূলধনের পরিমাণ তত কম, এবং ভূমির গুরুত্ব তত বেশি।

* Interaction of land and people occurs in agriculture. But the problem is more general. The significant question is that posed by Huntington in his view that climate determines the level of civilization. Huntington attributed the difference in the level of civilization between the tropics and the temperate zones to the average temperature and to moderate changes in temperature from one day to the next, which are a function of storms. Not only do moderate temperatures and storm patterns account for differences in civilization today. He explained further that the path of ancient civilizations starting in the middle East and Far East and working westward through the Mediterranean, follows the path of storm peak density. In the Toynbee version, creativity requires a challenge and response. In the tropics the challenge is too weak; in the Arctic zones, too great.

ভারতে জমির পরিমাণ (Land resources in India):

দেশের সর্বপ্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হইল ভূমি, ইহাই কৃষি উৎপাদনের ভিত্তি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু ভূমির আয়তন সমান থাকে, ফলে ক্রমশ ইহার স্বল্প অংশ চাষের কাজের জন্য পাওয়া যায়। জলসেচ এবং কৃষি উন্নয়নের অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনেকখানি বাড়াইয়া তোলা চলে। পতিত জমিকে অনেকটা আবাদযোগ্য করিয়া তোলা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষের জমিতে ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, কলকারখানা, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শহরাঞ্চল প্রসারিত হইতে থাকে, কৃষিক্ষেত্র সংকুচিত হয়। জলসেচের জন্য বাঁধ বাঁধিলে উর্বর জমি জলাধারে পরিণত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন বলিতেছেন যে, এইরূপ সকল পরিকল্পনার সময়ই উর্বর জমি যতটা সম্ভব বাঁচানো যায় তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমাদের পঞ্চপবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে জমি ব্যবহারের সুগঠিত কোন কার্যসূচী দেখা যায় না। মূলধনের ন্যায় জমিও আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য উপাদান। এই স্বল্প পরিমাণ উপাদানটিকে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা রচনায় কোন প্রচেষ্টা আমাদের দেশে দেখা যায় নাই। মূলধন-নিয়োগের ন্যায় জমি-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার তালিকা (priorities), বিনিয়োগের উপযুক্ত মানদণ্ড (investment criteria) এবং সঠিক টেক্‌নিক্ নির্বাচন (choice of techniques) দরকার। আমাদের দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ জমির পরিমাণ সমানই আছে। এই অবস্থায় সমগ্র ভূমিকে একটি ভাণ্ডার (Fund) রূপে মনে করিয়া দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন পরিকল্পনা রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সেরূপ কোন পরিকল্পনা রচিত হয় নাই। নানাপ্রকার কার্যে জমি ব্যবহারের ধরন বর্তমানে একেবারেই অপরিকল্পিত ভাবে চলিতেছে।

ভারতের ভৌগোলিক আয়তন হইল ৮০৬ মিলিয়ন একর, ইহার মধ্যে ৭২১ মিলিয়ন একর সম্পর্কে হিসাব পাওয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, আবাদ-করা জমির পরিমাণ হইল ৩১৮ মিলিয়ন একর। জমি ব্যবহারের বর্তমান ধরন বা কাঠামো এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা কি হইতে পারে তাহা নিচের তালিকায় দেওয়া হইল ঃ

১৯৬৫-৬৬ সালে জমি ব্যবহারের ধরন

মিলিয়ন একরের হিসাবে

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
মোট হিসাব পাওয়া গিয়াছে ...	৭২০·০	৭২১·০	৭২১
বনাঞ্চল	১২৫·৬	১৩১·০	১৩২·০
বিবিধ বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়ে আবৃত	১৩·৯	১৪·০	১৫·০
স্থায়ী গোচারণ ভূমি ...	২৮·৪	৩২·০	৩২·০
আবাদযোগ্য পতিত জমি ...	৫৪·৮	৪৭·০	৪০·০
বন্ধ্যা, অকর্ষিত এবং অকৃষিতে ব্যবহৃত জমি	১১৮·৭	১১৪·০	১১৪·০
পতিত জমি, স্থায়ী ধরনের ...	৩০·৯	২৮·০	২৬·০
চলতি বৎসরের পতিত জমি ...	২৯·৫	২৮·০	২৫·৫
শস্যরোপিত নীট এলাকা ...	৩১৮·২	৩২৭·০	৩৩৫·০
একাধিকবার শস্য রোপিত জমি ...	৪৪·৪	৫১·৫	৬৭·০
শস্যরোপিত স্থূল এলাকা ...	৩৬২·৬	৩৭৮·৫	৪০২·০

উপরের হিসাব হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতে মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হইল ০·৮২ একর। ইংলণ্ডে ইহা ০·৪২, জার্মানীতে ০·৪৮, জাপানে ০·১৭, চীনদেশে ০·৫০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২·৬৮ এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় ২·৫৯ একর।

প্রাকৃতিক ভাবে ভারতবর্ষকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। (ক) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল—পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রায়-সমান্তরালে প্রবাহিত তিনটি পর্বতমালার সমষ্টি হইল হিমালয়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০০ মাইল হইতে ২০০ মাইল। পর্বতশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে অনেক মালভূমি ও উপত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থে এই অঞ্চল যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইলেও এখানে উত্তোলন কার্য এখনও আরম্ভ হয় নাই।

নগাধিরাজ হিমালয় বহুভাবে ভারতবাসীর অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম, চিন্তাধারা-সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহার আড়ালে থাকিয়া আমরা তিব্বতের তীব্র তুষার-শীতল বায়ুপ্রবাহ হইতে রক্ষা পাই, ইহারই বরফ-গলা জলে অসংখ্য নদ-নদীর উৎপত্তি। ইহারই অরণ্যাঞ্চল মৌসুমী বায়ু

ও অন্যান্য বায়ু প্রবাহের নিয়ামক। হিমালয় নিঃসৃত জলধারাই পর্বতগাত্র হইতে সারবান মৃত্তিকা বহন করিয়া ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে, ইহার উপত্যকায় প্রচুর ফলমূল ও কৃষি-শস্যাদি উৎপন্ন হয়, ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশীরা ভারতে আসে ও আমাদের বিদেশী মুদ্রাগমের পথ প্রশস্ত করে। সংক্ষেপে বলা চলে, বৃষ্টি, বাতাস, গ্রীষ্ম, শীত, আর্দ্রতা ও কৃষিশস্যাদি প্রভৃতির উপর ইহার প্রভাব অর্থনৈতিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (খ) সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি— উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ বাদ দিয়া সমগ্র (অর্থাৎ সমগ্র বিহার, হিমালয় অঞ্চল বাদ দিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল): পঞ্জাব, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের সমভূমি; এবং পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমি—দৈর্ঘ্যে ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০০ হইতে ২০০ মাইল বিস্তৃত এই অঞ্চলই সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি নামে পরিচিত। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদীসমূহ লইয়া গঠিত এই অঞ্চল খুবই পলিমাটিসম্পন্ন এবং মোটামুটি সকল প্রকার কৃষিদ্রব্যই এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। খনিজ সম্পদেও এই অঞ্চল বিশেষ সম্পদশালী। (গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি—আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মৈকাল এবং অজন্তা প্রভৃতি পর্বতমালার দ্বারা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি উত্তরের সমভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহার পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা ও উপকূল অঞ্চল; এবং ইহার পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও উপকূল অঞ্চল। উড়িষ্যার উপকূল ভাগ, মাদ্রাজের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল লইয়া উহার পূর্বদিক গঠিত। সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, বোম্বাই-এর কিছু অংশ, কুর্গ ও কেরল প্রভৃতি লইয়া ইহার পশ্চিম দিক গঠিত। এই পশ্চিমাঞ্চলে লবণ, তুলা, তৈলবীজ, ভুট্টা ও ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পূর্বাঞ্চলেও ধান, তৈলবীজ, বাজরা ও জোয়ার প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। লোহা, চুনাপাথর, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজদ্রব্য এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

হিমালয়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আর্যাবর্ত

দাক্ষিণাত্য

ভারতের মৃত্তিকা (Soils of India): দেশের সকল অঞ্চলেই প্রায় চারি প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়: পলি মৃত্তিকা (Alluvial Soils) কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black Soils), গৈরিক মৃত্তিকা (Red Soils), ও প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা (Laterite Soils)।

পলিমাটি প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায় উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজের কোন কোন অংশ, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে।

এই মাটিতে বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন পরিমাণে আছে এবং বহুপ্রকার শস্য উৎপাদনের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী। কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রধানত তুলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রের অধিক অংশে; মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজের কিছু কিছু অংশে এইরূপ কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত, এই সকল মাটিতে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের কিছুটা অভাব আছে। গৈরিক মৃত্তিকা প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায় মাদ্রাজ, মহীশূর, দক্ষিণপূর্ব বোম্বাই, হায়দরাবাদের পূর্বদিক, বিহারের সাঁওতাল পরগনার কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলায়। এই জমি সর্বত্র একপ্রকার নয় এবং ইহার রাসায়নিক সম্পদও বিশেষ নাই, তবে উপযুক্ত জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে এইরূপ মাটিতে কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করিতে পারা যায়। প্রস্তরীভূত মৃত্তিকাতে সাধারণত পটাশ, ফস্‌ফরিক্ এসিড ও চুনের অভাব দেখা যায়। উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে, বোম্বাই, মালাবার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উর্বরতা শক্তি নাই। অবশ্য প্রচুর জলসেচ বা বৃষ্টিপাত হইলে কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন হইতে পারে।

১৯৫৫ সালে একটি সর্বভারতীয় ভূমি অনুসন্ধান পরিকল্পনার সূত্রপাত করা হয়। উহার কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং শ্রেণীবিভাগ করা। এই কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান চারিটি শ্রেণীর ভূমি অনুযায়ী প্রতিটি অঞ্চলে একটি করিয়া গবেষণাগার স্থাপন করা হইয়াছে: (১) পলিমৃত্তিকা অঞ্চলের জন্য দিল্লীতে, (২) কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলের জন্য নাগপুরে, (৩) গৈরিক ও প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার জন্য কলিকাতায়, এবং (৪) ব্যাঙ্গালোরে। বর্তমানকালে কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ডের কাজকর্মের সহিত ইহাদের যুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতের জলবায়ু (Olimate in India):

ভারতের আয়তন ও অবস্থানের দরুন ইহার সকল অংশের জলবায়ু ঠিক একরূপ নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপরই নির্ভর করে এবং সেই অনুযায়ী ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা চলে: (ক) বাৎসরিক ৮০'' ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন পশ্চিম উপকূল, বাংলাদেশ ও আসাম; (খ) ৪০'' ইঞ্চি হইতে ৮০'' ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন

বৃষ্টিপাত অনুযায়ী আঞ্চলিক বিভাগ

উত্তর পূর্ব উপত্যকা এবং মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা ; (গ) ২০" ইঞ্চি হইতে ৪০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন মাদ্রাজ, দক্ষিণ ও উত্তরপশ্চিম দাক্ষিণাত্য এবং উচ্চ-গাঙ্গেয় সমভূমি। ইহাদের সহিত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এরূপ হিমালয়ের অঞ্চলসমূহকে যোগ করা চলে।

জলবায়ু ও অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল মৌসুমী বায়ু। যে সকল মরসুমী বায়ুপ্রবাহ বৎসরে দুইবার দিক পরিবর্তন করে এবং যাহাদের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটে সাধারণত তাহাদের মৌসুমী বায়ু বলা হয়। মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তির কারণাবলী খুবই জটিল। তবুও ইহার উৎপত্তির প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায়, গ্রীষ্মকালে ভারত-সাগরের জলের তুলনায় ভূমি অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠা এবং শীতকালে অধিক ঠাণ্ডা হওয়া। গ্রীষ্মকালে উত্তরের পর্বতমালা অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে সেখানে বায়ুর চাপ কমিয়া যায় অর্থাৎ উত্তপ্ত বাতাস ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়।

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

হিমালয় অঞ্চলে এইরূপ তুলনামূলক শূন্যস্থান পূরণের জন্য দক্ষিণ পশ্চিমে আরব সাগরের উপর দিয়া প্রবহমান বৃষ্টিগর্ভ আর্দ্র বায়ুস্রোত হিমালয়ের দিকে আসিতে থাকে। ইহাই দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু। দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়া ইহা ভারতে প্রবেশ করে: বঙ্গোপসাগর-স্রোত (Bay of Bengal current) এবং আরবসাগর-স্রোত (Arabian Sea current)। শীতকালে ভারতের জমি সমুদ্রের জলের তুলনায় অধিকতর শীতল হওয়ায় হিমালয়ের দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ু। জমির উপর ইহার উদ্ভব বলিয়া জলকণার অংশ এই বাতাসে কম এবং ফলে উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুতে বৃষ্টি কম হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুরই প্রত্যাবর্তন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শীতকালীন শস্যাদির পক্ষে এই প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে ইহাদের কালিদাস বর্ণিত পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বলিয়া মনে করেন।

ভারতের অধিবাসীর ৬৯.৮% জন কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় ৪৫% ভাগই কৃষিজাত উৎপাদন হইতে আসে। আমাদের জমিও শুষ্ক এবং জল বিনা অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত পরিমাণে (Time, Place, and Quantity) বৃষ্টিপাত না হইলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখিতে পাওয়া যায়। বৃষ্টিপাতের স্থান, কাল ও পাত্র সঠিক না হইলে কৃষিজাত শস্যসামগ্রীর

মৌসুমী বায়ুর অর্থনৈতিক ফলাফল

উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপন্ন শস্যের বৃহদংশ আত্মভোগে (Self-Consumption) ব্যবহৃত হয়, অল্প অংশই বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত হয়। সুতরাং, কৃষির অবনতির ফলে প্রথমেই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং কৃষকের আয় হ্রাস পায়। তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে না পারায় শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ও বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন (যেমন, তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি) কমিয়া যাওয়ায় উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, অথচ উহাদের প্রধান ক্রেতাগণ অর্থাৎ চাষীদের হাতে ক্রয়শক্তি থাকে না। কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি কমিয়া যায়, এবং আমদানি বাড়ে, ফলে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলিরও বিশেষ অসুবিধা হয়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারী ব্যয় বাড়িতে থাকে; কিন্তু ভূমি রাজস্ব, আয় কর, বিক্রয় কর, আবগারী, আমদানী-রপ্তানি, বাণিজ্য শুল্ক সবই কমিয়া যায়, ফলে সরকারী আয় হ্রাস পায়। এইরূপে বাজেটে ঘাটতি পড়িতে থাকে। রেলপথে কম যাত্রী ও মাল চলাচল করে, সুতরাং উহারও আয় কমে। এই কারণে বলা হয় যে, ভারতীয় বাজেট বৃষ্টি লইয়া জুয়াখেলা। অপূর্ণোন্নত দেশের ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উঠানামা; অর্থাৎ বাণিজ্যচক্রের গতিবিধি প্রধানত নির্ধারণ করে এই মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ।

আমাদের অর্থ নৈতিক সংগঠনের অন্যান্য দিকের উপরও মৌসুমী বায়ুর যথেষ্ট প্রভাব আছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব অতীতে প্রধানত ইহার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে অবশ্য শিল্পসম্প্রসারণের দরুন জনবসতির ঘনত্ব নির্ধারণে বৃষ্টিপাতের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, মৌসুমী বায়ুর দরুন ভারতীয় জনসাধারণের ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতার মনোবৃত্তি খুবই প্রবল। আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা এবং উদ্যমহীনতার মনোভাব জাগাইতেও ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য।

ভারতের কৃষিসম্পদ (Agricultural Resources in India) :

ভারতে বহুপ্রকার জলবায়ু ও ভূমি থাকায় এখানে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার কৃষিপণ্যই উৎপন্ন হয়। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতের আর্থিক সম্পদের প্রধান উৎস হইল কৃষিজাত পণ্য। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেকই (৪৮%) কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী। জনসাধারণের প্রায় ৭০% প্রত্যক্ষভাবে কৃষিতে নিযুক্ত এবং ৭৫%-এর বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের বেশির ভাগই কৃষিজাত পণ্য। দেশীয় শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল প্রধানত আমাদের কৃষিজাত পণ্য হইতেই পাওয়া যায়।

কৃষিজাত পণ্য দুই শ্রেণীর : খাদ্যশস্য (Food crops) ও বাণিজ্যিক শস্য (Commercial crops)।

(ক) খাদ্যশস্য : খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে ধান্য, গম, জোয়ার, বাজ্‌রা, বার্লি, ডাইল, ভুট্টা ও ইক্ষু। ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে দেখা যায় যে মোট কর্ষিত জমির ৮০% অংশেই খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়, এবং অবশিষ্ট ২০% অংশে বাণিজ্যিক শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে মোট ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার হিসাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১০ কোটি টন ধার্য করা হইয়াছে। (১) ধান্য : খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউলই প্রধান সুতরাং মোট কর্ষিত জমির শতকরা ৩০ ভাগে ধান্য উৎপন্ন হয়। অধিক ফলনের হিসাব অনুসারে তালিকাবদ্ধ করিলে মাদ্রাজ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম ও বোম্বাই খাদ্য উৎপাদনের প্রধান এলাকা। বাংলা, আসাম, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় ভাতই প্রধান খাদ্য। ভারতে প্রায় ৪০০০ ধরনের ধান দেখা যায়। একর-প্রতি গড় ধান্যোৎপাদন ভারতে কম, ইহার পরিমাণ হইল ৭২২ পাউণ্ড আর জাপানে একর-প্রতি উৎপাদন ২৩৫০ পাউণ্ড। অবশ্য মোট ধান উৎপাদনের বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বিদেশে বসবাসী ভারতবাসীর খাদ্যের জন্য, বিদেশের পশুখাদ্য হিসাবে এবং মদ চোলাই-এর জন্য কিছু চাল রপ্তানিও হইয়া থাকে। (২) গম : ধানের পরেই গমের স্থান। উত্তর ভারতে গমই প্রধান খাদ্য। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মায়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মৃত্তিকা ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া গম উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। মোট কর্ষিত জমির ১০ ভাগ অংশে গমের চাষ হয় এবং সমগ্র পৃথিবীর গম উৎপাদনের ১০ আমরা উৎপাদন করি। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, কানাডা, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষে গম আমদানি হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ১ কোটি টনের উপরে গম উৎপন্ন হইয়াছে। গম উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ। মোট কর্ষিত জমির ৯% অংশে জোয়ারের চাষ হয় এবং ৫%

অংশে বাজ্‌রার চাষ হয়। মানুষ এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে যব ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে ডাইল, ভুট্টা, ছোলা, বহুবিধ ফল, শাকসবজি, মসলা প্রভৃতি উৎপন্নহইয়া থাকে। (৩) ইক্ষু: ভারতের মোট কর্ষিত জমির মাত্র ২ ভাগে ইক্ষুর চাষ হয়। প্রচুর জল ও উষ্ণ আবহাওয়া ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিহার ও উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক পরিমাণ ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯৬০-১৯৬১ সালে ৮০ লক্ষ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি টন পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তখন বিদেশ হইতে আমদানি করার প্রয়োজন হইবে না, এবং ভারত ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে। (খ) **বাণিজ্যিক শস্যাদি** (Commercial Crops): যে সকল শস্য খাদ্য হিসাবে সরাসরি ভোগকার্যে আসে না, যাহা বিক্রয় করিয়া কৃষকের হাতে নগদ অর্থ আসে এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় উহাদের বাণিজ্যিক শস্য বলা হয়। ইহাদের আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যেমন, (ক) আঁশজাতীয় (Fibres), অর্থাৎ তুলা, পাট প্রভৃতি; (খ) তৈলবীজ (Oilseeds), যেমন সরিষা, তিসি, রেড়ি প্রভৃতি, (গ) ঔষধ ও পানীয় জাতীয় (Drugs and beverages), যেমন, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি। (১) তুলা: গুজরাট, পঞ্জাব, বিহার ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলার চাষ হয়। পূর্বে ভারত তুলা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরে এখন আর ভারতে লম্বা আঁশযুক্ত ভাল তুলা বা পরিমাণে বেশি তুলা উৎপাদন হয় না। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৫১ লক্ষ টন গাঁইট। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭০ লক্ষ গাঁইট উৎপাদনের লক্ষ্য হিসাবে ধরা হইয়াছে। ভারতে একর-পিছু তুলা উৎপাদনের হার আমেরিকার অর্ধেক এবং মিশরের এক-পঞ্চমাংশ। (২) পাট: ভারত বিভাগের পূর্বে পাট ছিল ভারতের একচেটিয়া পণ্য; পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর হইতে ভারতের পাটকলগুলির প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও পূর্বাপেক্ষা উন্নত আঁশযুক্ত পাট প্রধানত পশ্চিমবঙ্গেই উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৬০-৬১ সালে পাটের উৎপাদন হইয়াছে ৪০ লক্ষ গাঁইট; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন বাৎসরিক ৬২ লক্ষ ২০ হাজার গাঁইট হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। আসাম ও উড়িষ্যাতেও অল্প পরিমাণে পাটের চাষ হইয়া থাকে। (৩) রেশম: গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত করা ভারতের একটি প্রধান শিল্প। প্রধানত

কাশ্মীর, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বীরভূম জিলায় এবং উত্তর প্রদেশে প্রতাপগড় জেলায় এই শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতা, কৃত্রিম রেশমের প্রতিযোগিতা ও গুটিপোকার নানারূপ ব্যাধি এই শিল্পের প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিয়াছে। (৪) তৈলবীজ: সরিষা, রেড়ি, নারিকেল, চীনাবাদাম, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজের অন্তর্ভুক্ত। তিসি বীজ প্রচুর রপ্তানি হয়। চীনাবাদাম প্রধানত মাদ্রাজে এবং তিসি প্রধানত বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিলের চাষ হয়। সরিষা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হইল উত্তরপ্রদেশ ও বিহার। যুদ্ধপূর্বকালে তৈলবীজ প্রচুর রপ্তানি হইত, অর্থাৎ তেল এবং চাষের কার্যে ব্যবহৃত খইল উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। সেইজন্য অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলিতেন যে, "তৈলবীজের রপ্তানি জমির উর্বরতা-শক্তি রপ্তানির ন্যায় ক্ষতিকারক।" ১৯৬০-৬১ সালে তৈলবীজের মোট উৎপাদন হইল ৭১ লক্ষ টন, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৯৮ লক্ষ টন। ৫) চা: পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সর্বাধিক পরিমাণে চা উৎপাদন করে। উহার মধ্যে একা আসামই অর্ধেক। অবশিষ্ট অংশ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চল, পঞ্জাবের কাঙ্গড়া উপত্যকা ও উত্তর প্রদেশের দেরাদুন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। যে অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল মোটেই জমে না এরূপ আর্দ্র অঞ্চলে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও আসামে অধিক চা উৎপাদন হইয়া থাকে। ভারতে উৎপন্ন চা-এর ৮০% ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টন চা উৎপাদন হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক ৯০ কোটি টনে পৌঁছানো যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ইহা ছাড়া ভারতে তামাক ও নীলেরও প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহারের ত্রিহুত জিলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রচুর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। উহার পরিমাণ বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ টন। পৃথিবীতে তামাক উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়, আমেরিকা ও চীন ভারতের উপরে। কৃত্রিম রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ প্রায় অবলুপ্ত। বর্তমানে বিহার ও উত্তর প্রদেশে কিছু কিছু নীলের চাষ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত দক্ষিণ ভারতে কফির চাষ উল্লেখযোগ্য। দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সিন্‌কোনার চাষ হয়। উত্তর প্রদেশের সরকারী

পরিচালনায় আফিমের চাষ হয়, আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে আফিমের চাষ ক্রমে ক্রমে একেবারেই কমাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। মহীশূর, মাদ্রাজ ও কুর্গে রবারের চাষ হয়।

ভারতের খনিজ সম্পদ (**Mineral Resources in India**):

ভারতের খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব ও তথ্যালোচনা এখনও হয় নাই। বর্তমানে ভারত সরকার জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার হস্তে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের ভার দিয়াছেন।

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোন কোন খনিজ দ্রব্য ভারতে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ উপকরণ আমাদের দেশে কম, যেমন তামা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপা, চীনামাটি প্রভৃতি। সুতরাং ভবিষ্যতে শিল্পোন্নয়নের পক্ষে পর্যাপ্ত খনিজ উপকরণ থাকিলেও বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণে খনিজ দ্রব্য আমদানি আমাদের করিতেই হইবে।

আমাদের খনিজ সম্পদকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি: (১) ধাতব খনিজ দ্রব্য, যেমন লোহা, তামা, সোনা প্রভৃতি, (২) অধাতব খনিজ দ্রব্য, যেমন লবণ, অভ্র, গন্ধক প্রভৃতি, (৩) জ্বালানি বা শক্তিসম্পদ, যেমন কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি।

(১) **ধাতব খনিজ সম্পদ**: (ক) লোহা: শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু হইল লোহা। পশ্চিম বাংলায় বরাকর অঞ্চলে, বিহারের সিংভূম পরগনায়, উড়িষ্যার বোনাই, ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝর অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশে উৎকৃষ্ট ধরনের লৌহ-মাক্ষিক (Iron-ore) পাওয়া যায়। উড়িষ্যার উত্তরে পর্বতমালায় এবং বিহারের সিংভূম জিলায় আরও লোহা আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও মাঝারি ও নীচু শ্রেণীর লৌহ-মাক্ষিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে দামোদরের উপত্যকা অঞ্চলে, সালেম, মহীশূর, রত্নগিরি এবং কুমায়ুনে। ভারতের মোট লৌহ-মাক্ষিকের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার অধিক হইবে।

ভারতের বর্তমান পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, সুতরাং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। ভারতে তিনটি ইস্পাত কারখানা চলিতেছিল: জামসেদপুরে, বার্নপুরে এবং মহীশূরে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে আরও তিনটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণ শেষ হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা-

কালের মধ্যেই উহাতে পূর্ণ উৎপাদন শুরু হইবে স্থির হইয়াছে। উহারা হইল এক ব্রিটিশ কোম্পানীর সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, জার্মান কোম্পানীর সহায়তায় উড়িষ্যার রুরকেলায় এবং রুশীয় সরকারী সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে। সম্প্রতি রুশ দেশ বোকারোতে আমাদের চতুর্থ সরকারী ইস্পাত কারখানা গড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের ভারতে ১ কোটি টনের উপর লৌহ-মাক্ষিক প্রস্তুত হয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদন ৩ কোটি টনে তোলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। (খ) ম্যাঙ্গানীজ : ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রাশিয়া প্রথম এবং ভারত তৃতীয় স্থানের অধিকারী। মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, উড়িষ্যা ও সিংভূম জেলায় প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ইস্পাত প্রস্তুত করিতে খাদ হিসাবে ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন হয়, ইহাকে তাই গাঠনিক ধাতু (Structural metal) বলা চলে। অনুমান করা যায়, ভারতের মাটিতে প্রায় ১$\frac{১}{২}$ কোটি হইতে ২ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত আছে। পূর্বে অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইত, বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইস্পাতের উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশের ভিতরে ইহার ব্যবহার তত বাড়িবে। ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উৎপন্ন হইয়াছে। (গ) বক্সাইট : বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে বক্সাইট পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে ও ত্রিবাংকুরে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা আছে। (ঘ) তাম্র : সিংভূম, গাড়ওয়াল, আলমোড়া ও মাদ্রাজে তামা পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। (ঙ) স্বর্ণ : ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণের ৯৫% অংশই মহীশূরের কোলার খনি হইতে উত্তোলিত হয়। হায়দরাবাদে হাটি নামক খনি হইতে এবং কোন কোন নদীর বালি হইতে অতি অল্প পরিমাণ সোনা পাওয়া যায়। বর্তমানে স্বর্ণের উৎপাদন প্রায় আড়াই লক্ষ আউন্স।

(২) অধাতব খনিজ : ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল লবণ, গন্ধক ও জিপসাম্ ও অভ্র। (ক) লবণ : ভারতবর্ষে লবণ পাইবার প্রধান তিনটি উৎস হইল : (১) পঞ্জাবের কোহাট খনি হইতে প্রাপ্ত সৈন্ধব লবণ, (২) রাজপুতানার লবণাক্ত হ্রদের জল হইতে প্রাপ্ত লবণ, ও (৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজ উপকূলে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া প্রাপ্ত লবণ। লবণের উৎপাদন বর্তমানে ৩০ লক্ষ টনের অধিক, ভারত এখন লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ। (খ) গন্ধক ও জিপসাম্ :

গন্ধকের সাহায্যে সাল্‌ফিউরিক্‌ অ্যাসিড তৈয়ারি হয়। বালুচিস্তানে অল্প পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। পঞ্জাব ও রাজপুতানায় জিপসাম্‌ পাওয়া যায়। ইহা হইতে গন্ধক উৎপন্ন হয়। (গ) অভ্র: অভ্র উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, মোটরযান, বৈদ্যুতিক শিল্প ও বেতার যন্ত্র প্রভৃতিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়। এই সকল ব্যবহার মিটাইয়াও প্রভূত পরিমাণ অভ্র প্রতি বৎসর রপ্তানি করা হয়। সমগ্র ভারতে উৎপন্ন অভ্রের ৯০ ভাগ বিহারের হাজারীবাগ, গয়া, মুঙ্গের, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজের নেলোর জেলাতে ও রাজপুতানায় অভ্র পাওয়া যায়।

(৩) জ্বালানি খনিজ: (ক) কয়লা: শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইল কয়লা। বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্র চালাইবার কার্যে কয়লার প্রয়োজন খুবই বেশি। ইহার শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম বাংলা ও বিহারের রানীগঞ্জ ঝরিয়া, গিরিডি ও ডালটনগঞ্জ অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয়; ইহাকে 'গণ্ডোয়ানা কয়লা অঞ্চল' বলা হয়। আসাম, মধ্য ভারত, পঞ্জাব ও হায়দরাবাদে কিছু কিছু কয়লা আছে। ১৯৪৬ সালের কয়লা খনি কমিটির মতে আমাদের মোট ৭০ বা ৮০ কোটি টন কয়লা মজুত আছে। সাধারণ গুণবিশিষ্ট কয়লার যোগান প্রচুর হইলেও উৎকৃষ্ট কয়লার সরবরাহ খুবই কম, আমাদের তাই কয়লা ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। তাহা ছাড়া দেশের সমস্ত অঞ্চলে কয়লা সমভাবে বন্টিত নাই। পূর্ব ভারতেই কয়লা পাওয়া যায় কিন্তু উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়লার খনি নাই। ভারতবর্ষে প্রায় ১০০০টি কয়লা খনি আছে। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ হইল ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার লক্ষ্য বার্ষিক ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন উৎপাদন করা। (খ) পেট্রোলিয়াম: আসামের ডিগবয়ে ও পঞ্জাবের আটক জিলায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। বিদেশী কোম্পানীর সহায়তায় ভারত সরকার বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তৈল অনুসন্ধানের কার্য শুরু করিয়াছেন। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের হাজার ভাগের এক ভাগও ভারতে উৎপাদন হয় না। বৎসরে তাই প্রায় ৩০ কোটি গ্যালন তৈল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল দেশের মধ্যে ৬০ লক্ষ গ্যালন উৎপাদন করা।

কয়েক বৎসর হইল ভারত সরকার আমেরিকার তিনটি কোম্পানীর সহিত (স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম, ক্যালটেক্স ও বার্মা শেল) পৃথকভাবে তিনটি চুক্তি করিয়া

তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যপ্রাচ্য হইতে অপরিস্রুত তৈল লইয়া আসিয়া ভারতে পরিস্রুত করার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাদের সহিত ভারতের মাটিতে তৈল অনুসন্ধানের কার্যও আরম্ভ হইয়াছে। দুইটি তৈল শোধনাগারের কার্যও শুরু হইয়াছে তৃতীয়টি এখনও স্থাপিত হয় নাই। বর্তমানে পেট্রলের দাম সম্পর্কে সরকারের সহিত এই কোম্পানীগুলির বিরোধ বাধিয়াছে।

সরকারী খনিজ-নীতি (Mineral policy of India government):

ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে কোন 'জাতীয় নীতি' ছিল না—একমাত্র নীতি ছিল যথেচ্ছ মুনাফা লাভ। ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়ন বা জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে না তাকাইয়া যে-কোন উপায়ে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা ও বিদেশে রপ্তানি করা, ইহাই ছিল বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু তাহাই নহে, উত্তোলন-পদ্ধতি ছিল অতি প্রাচীন ধরনের। আধুনিক যন্ত্রপাতি বা শ্রমিকদের জীবনহানি না ঘটে এইরূপ সাবধানতার ব্যবস্থা—খুব কমই ব্যবহার করা হইত।

স্বাধীনতার পূর্বে

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় স্বার্থ ও শিল্পোন্নয়নের কথা বিবেচনা করিয়া 'জাতীয় খনিজ নীতি' (Nation Mineral Policy) গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের গুণ, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রভৃতি নিরূপণের জন্য খনিজ দ্রব্য গবেষণা সংক্রান্ত ব্যুরো এবং জ্বালানি খনিজের গবেষণাগার (Indian Bureau of Mining Research and National Fuel Research Laboratory) স্থাপিত হয়। ১৯৫২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে ভারত সরকার এই সম্পর্কে ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন ও ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (Geological Survey of India), ভারতীয় খনি ব্যুরো (Indian Bureau of Mines), জাতীয় ধাতু নিষ্কাশন গবেষণাগার (National Metallurgical Laboratory) এবং আরও বহু সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যের

স্বাধীনতার পরে

জন্য বিদেশী কোম্পানীসমূহের সহিত ভারত সরকার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রক (Ministry of Natural Resources and Scientific Research) স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার অধীনে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উহার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

বনসম্পদ ও বননীতি (Forest Resources and Forest Policy :

দেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হইল অরণ্য। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের আয়তনের তুলনায় উহার অরণ্য-সম্পদ তত বেশি নহে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ভারতে মোট বনভূমির পরিমাণ হইল ২ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গ মাইল অর্থাৎ মোট জমির ২১·৮%। রাশিয়া, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের মোট জমির প্রায় ৪০% অংশে অরণ্য আছে।

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ

ভারতবর্ষের প্রধানত পাঁচ প্রকার বন দেখা যায়ঃ জমির উচ্চতা, বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে বনের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। (১) শুষ্ক বন (Arid Forests)—এই প্রকার বন রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। (২) পর্ণমোচী বন (Deciduous Forests)—ইহারা প্রতি বৎসর পত্রত্যাগ করে, যেমন, হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের বনভূমি। (৩) চিরহরিৎ বনভূমি (Evergreen Forests)—যে সকল বনাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় বনভূমি চিরহরিৎ থাকে, বাঁশ, ফার্ন, পাম প্রভৃতি। (৪) পার্বত্য বনভূমি (Hill Forests)—হিমালয়ের উচ্চতর অংশে অবস্থিত দেওদার, পাইন, ফার ওক, অ্যাশ প্রভৃতি বৃক্ষবিশিষ্ট বনভূমি। (৫) উপকূল অঞ্চলের বনভূমি (Coastal Forests)—যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমি।

সরকার অরণ্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেনঃ (১) সংরক্ষণশীল অরণ্য (Protective Forests)—যাহা বন্যা ও মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ করে। (২) কাষ্ঠ উৎপাদনকারী অরণ্য (Timber Forests)—যে-অরণ্য হইতে সরকারের প্রচুর আয় হয়। (৩) ছোটখাট বন (Minor Forests)—যাহা হইতে জ্বালানি, জীবজন্তুর খাদ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং (৪) গোচারণ ভূমি (Pasture Lands)—জীবজন্তুর খাদ্য মিটাইবার উপযোগী জঙ্গল। আর একটি উপায়ে বনভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (ক) সংরক্ষিত বন (Reserve Forests)—ইহার ব্যবহার জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

(খ) রক্ষিত বন (Protected Forests)—জনসাধারণ কর্তৃক ইহার ব্যবহার সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (গ) সাধারণ বনভূমি (Public Forests)—ইহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে।

প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে অরণ্যের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। বনভূমি হইতে আমরা জ্বালানি কাঠ, ঘরবাড়ি বা আসবাবপত্র নির্মাণের কাঠ পাইয়া থাকি। বিভিন্ন শিল্পের জন্য কাঁচামাল অরণ্য হইতে সংগৃহীত হয়, যেমন কাগজ তৈয়ারীর উপযুক্ত ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি, চামড়ার তৈয়ারীর উপযুক্ত বাবুল প্রভৃতি, দিয়াশলাই, এর উপযুক্ত কাঠ, রজন প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, লাক্ষা, তারপিন, মধু, বহুপ্রকার ফলমূল গবাদির খাদ্য ও নানা প্রকার তৈল অরণ্য হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে বহু ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়। এইগুলি গোচারণের সাহায্য করে। এই সকল প্রত্যক্ষ (direct) উপযোগিতা ছাড়াও অরণ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ (indirect) উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। "পরোক্ষভাবে ইহা ভারতের প্রাকৃতিক সেচ-ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ"। মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ করিয়া, ভূমির উর্বরাশক্তি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করে। বনের পাতা পচিয়া সারের সৃষ্টি হয়। অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। বায়ুর প্রাবল্য, শীতাতপের আধিক্য—ইহাদের হাত হইতে ফসল রক্ষা পায়।

অর্থ-নৈতিক গুরুত্ব

ভারতের বনভূমির প্রধান ত্রুটি হইল : (ক) ইহার পরিমাণের স্বল্পতা, (খ) দেশের সমগ্র ভূ-ভাগে ইহার অসম বণ্টন (uneven distribution), এবং (গ) পশ্চিমী দেশগুলির বনভূমির তুলনায় ইহার সম্পদ উৎপাদনের স্বল্প ক্ষমতা। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, দ্রুত নগরীকরণ, রেলপথের প্রসার ও ব্যবসায়ীদের নীতিহীনভাবে জঙ্গল কাটা—এই চারিটি বিষয় মিলিয়া আজ ভারতের বনভূমি ধ্বংসপ্রায়।

বনের গুরুত্ব থাকায় এই সকল ত্রুটি দূর করাব উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে জাতীয় অরণ্যনীতি প্রস্তাবে (National Forest Policy Resolution) বলা হয় যে, মোট জমির ৩৩% অংশে অরণ্যাঞ্চল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে ; পার্বত্য অঞ্চলে ৬০% এবং সমতল ভূমিতে ২০%। এই সালেই বন্য জীবজন্তুর জন্য ভারতীয় বোর্ড (Indian Board for wild life) স্থাপিত হয়। বনমহোৎসব, বিভিন্ন বনজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার, বনকে রক্ষা করা অথচ উৎপাদনশীল করিয়া তোলা প্রভৃতি কার্যে রাজ্য সরকারসমূহ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে

অরণ্য-নীতি

যাইতেছে, খাদ্যোৎপাদনও পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ১৯৫১ সাল হইতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে, জনসংখ্যা ২১·৪৯% বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ গত দশ বৎসরে ৭ কোটি ২২ লক্ষ লোক বাড়িয়া গিয়াছে।

নিচের তালিকা হইতে এই শতাব্দীতে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির রূপ বুঝা যাইবে :

বৎসর	জনসংখ্যা (মিলিয়নের হিসাবে)	বৃদ্ধি (মিলিয়নের হিসাবে)	বৃদ্ধির %
১৯০১	২৩৮	...	...
১৯১১	২৪৯	১৩·৫৫	+৫·৮
১৯২১	২৪৮	−১·৮৭	−০·৩
১৯৩১	২৭৫	২৭·৩৪	+১১·০
১৯৪১	৩১৯	৩৯·৩১	+১৪·৩
১৯৫১	৩৫৯	৪৩·০০	+১৩·৪
১৯৬১	৪৩৬	৭২·২	+২১·৪৯

জনসংখ্যার এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধির উপর তিনটি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে : (ক) জন্মহার, (খ) মৃত্যুহার, ও (গ) যৌন-অনুপাত।

আমাদের দেশে জন্মহার খুবই বেশি। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত জন্মহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার পরে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য এখনও ইহা পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। নিচের তালিকা হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের জন্মহারের তুলনা করা চলে। এই হিসাবে ১৯৫১ সালের তথ্য লওয়া হইয়াছে।

দেশ	প্রতি হাজারে জন্মহার
ভারত	২৪·৯
পশ্চিম জার্মানী	১৫·৭
ইতালী	১৮·১
সুইডেন	১৫·৬
ইংলণ্ড	১৫·৯
বেলজিয়ম	১৬·১

আবার কতকগুলি দেশের জন্মহার আমাদের তুলনায় খুবই বেশি; যেমন সিংহল (৪০·৬), মিশর (৩২·৬), মেক্সিকো (৪৪·৬), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (৩২·৪),। ভারতের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার দরুন দেশের সকল জন্ম বার্তা সরকারের নিকট পৌঁছায় না। তাঁহাদের মতে আমাদের জন্মহার অনেক বেশি, প্রায় ৪০। ১৯৬১ সালের আদম-সুমারিতে এত জনবৃদ্ধি তাঁহাদের কথার সত্যতা কিছুটা প্রমাণ করিতেছে। এত অধিক জন্মহারের কারণ হইল ভারতে প্রায় সকলে বিবাহ করিয়া থাকেন। বিবাহ না করিলে আত্মা নরকগামী হইতে পারে, এই ভয়ে সকলে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়ত, এই বিবাহ অল্প বয়সেই ঘটে। ফলে সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁহারা অধিক সময় পান (longer span of reproductive period) এবং অল্প বয়সে অধিক সন্তানবতী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তৃতীয়ত, ভারতবাসীর অসীম দারিদ্র্যই জন্মহার বৃদ্ধির কারণ। দারিদ্র্য অধিক থাকায় আরও সন্তান হইলে জীবনযাত্রার মান কমিবে এইরূপ চিন্তাও তাহাদের মনে আসে না। অধিক সন্তান হইলে পারিবারিক আয় বাড়িবে বহু ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাও করিয়া থাকেন। চতুর্থত, উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, যৌথ পরিবার প্রথাজনিত দায়িত্বহীনতা, বহুবিবাহ প্রথা এবং সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নীচু থাকাও জন্মহার বৃদ্ধির কারণ। কৃত্রিম জন্মনিরোধ ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। খাদ্যে প্রোটিনের অভাব, বাসগৃহে স্থানের অভাব, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাপনে অজ্ঞতা, উচ্চ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার আকাংক্ষার অভাব প্রভৃতি জন্মহার বাড়াইয়া রাখিয়াছে।

জন্মহার বেশি কেন

দ্রুত কমিয়া গেলেও আমাদের দেশে মৃত্যুহারও বেশি, প্রতি হাজারে ১২·৫। সাধারণত এই হার শিশু ও প্রজননশীল বয়সের স্ত্রীলোকের মধ্যেই অত্যধিক। প্রতি হাজার শিশুর হিসাবে ইংলণ্ডে ১ বছর বয়সের মধ্যে ৬৫টি ও সুইডেনে ৫১টি মারা যায়, ভারতবর্ষে গড়ে ২০০টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, জীবনযাত্রার নিম্নমান, জীবন সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা, অবহেলা ও হতাশা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতা, নারীজীবনের প্রতি ঔদাস্য, বাল্যবিবাহজনিত জীবনীশক্তির অপচয়, স্ত্রীরোগ, উপযুক্ত ধাত্রীর অভাব এই সকল বিষয় মিলিয়া মৃত্যুহার বাড়াইয়া রাখিয়াছে।

মৃত্যুহার বেশি কেন

জনসংখ্যার গতিশীলা (Dynamics of Population) নির্ধারণে জন্মহার ও মৃত্যুহার ছাড়া আরও বিষয় দেখা যায়, তাহা হইল জনসংখ্যার বয়স-কাঠামো ও স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত (age and sex composition of Population) এবং স্ত্রীলোকের সন্তান-উৎপাদনের উর্বরতা (Fertility)। শিল্পোন্নত দেশসমূহে মোট জনসংখ্যার মধ্যে সন্তান উৎপাদনশীল বয়সের স্ত্রীলোকের অনুপাত কম এবং ইহা ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। ভারতে কিন্তু এই অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসর সন্তান উৎপাদনশীল বয়স ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালে প্রতি দশ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কের সংখ্যা ছিল ১৬৯৬; কিন্তু ১৯৩১ সালে ইহার পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৯২৩। সুতরাং আমাদের নীট প্রজনন হার (Net Reproduction Rate) বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। হিসাব করা হইয়াছে যে, ভারতের নীট প্রজনন হার হইল ১'৩৫।

নীট প্রজনন হার কিরূপ

মনে হয় যে, আগামী কয়েক বৎসরে ভারতে জনসংখ্যা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ হইল : (ক) শিল্পসম্প্রসারণের প্রথম যুগে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, (খ) উন্নত চিকিৎসা শাস্ত্রের ও ব্যবস্থার দরুন মৃত্যুহার কমিয়া যায়, (গ) মৃত্যুহার কমিবার দরুন সন্তান প্রজননশীল স্ত্রীলোকের সংখ্যা এবং তাহাদের প্রজনন-কাল বৃদ্ধি পায়, (ঘ) বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা রমণীদের ক্রমশ অধিক সংখ্যায় বিবাহ হইতে থাকে। জনসংখ্যা কমাইবার দিকে কয়েকটি শক্তি প্রধানত কাজ করিবে : (ক) অধিক বয়সে বিবাহ, (খ) বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনে অনিচ্ছা, (গ) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আগ্রহ, (ঘ) স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি অবহেলা হ্রাস, (ঙ) অধিকতর নগরীকরণ (urbanisation), অর্থাৎ পরিবার হইতে বাধ্য হইয়া পৃথক থাকা, এবং সর্বোপরি, (চ) কৃত্রিম পদ্ধতির বিপুল প্রসার, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে।

ভবিষ্যতে কোন্ শক্তিসমূহ কার্যকরী

ভবিষ্যতে ভারতের জনসংখ্যা কি দাঁড়াইবে সেই সম্পর্কে ধারণা করা দরকার, কারণ উহারই ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি রচনা করা হয়। ১৯৫৮ সালে কোল ও হুভার (Coale & Hoover) ভারতের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার গতিবিধি লইয়া হিসাব রচনার প্রয়াস

পাইয়াছিলেন।* তিন প্রকার অনুমানের ভিত্তিতে তাঁহারা তিন ধরনের হিসাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম অনুমানে বর্তমান উর্বরতার হার (fertility rate) ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে; এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াইবে ৭৭৫ মিলিয়ন, প্রতি বৎসর ২'৬% হারে বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় অনুমানে এই উর্বরতার হার ১৯৫৬ হইতে ১৯৮১ সালের মধ্যে বর্তমানের তুলনায় অর্ধেক থাকিলে ১৯৮১ সালে দাঁড়াইবে ৫৯০ মিলিয়ন, প্রতি বৎসর ১% হারে বাড়িবে। তৃতীয় অনুমানে এই উর্বরতার হার হ্রাস পাইবে ১৯৬৬ সালের শেষভাগ হইতে, ঐ সময় হইতে ১৯৮১ সালের মধ্যে উহা বর্তমানের অর্ধেক হইবে। এই হিসাবে মোট জনসংখ্যা হইবে ৬৩৪ মিলিয়ন। ১৯৬১ সালের আদম স্থমারির ভিত্তিতে নূতন অনুমানের সাহায্যে পরিকল্পনা কমিশন ভবিষ্যৎ জনবৃদ্ধি সম্পর্কে মনে করেন যে, ১৯৬৬ সালের আমাদের জনসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৯ কোটি ২০ লক্ষ; ১৯৭১ সালে ইহা হইবে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ১৯৭৬ সালে ইহা হইবে ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ। অন্য হিসাব না পাওয়া গেলে এই হিসাবের ভিত্তিতে ভারতের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনা রচিত হইবে।†

ভবিষ্যতে কিরূপ জনবৃদ্ধি ঘটিতে পারে: বিভিন্ন হিসাব

(খ) জনঘনত্ব (Density of Population)

দেশের প্রতি বর্গমাইলে গড়ে কি-পরিমাণ লোক স্থায়িভাবে বসবাস করে, তাহাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বা জনঘনত্ব বলা হয়। শিল্পপ্রধান দেশে শহর ও কারখানায় অধিকসংখ্যক লোক কাজ করে, সেখানে অধিক লোকই নগরে বাস করে—সেইরূপ দেশে জনঘনত্ব সমৃদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশে জনসংখ্যা অধিক ঘন হইলে উহা অনুন্নতিরই প্রকাশ; কারণ কম জমিতে চাষীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রত্যেক চাষীর মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম পড়ে, তাহার আয় ও জীবনযাত্রার মান কম থাকে। আমাদের দেশে অধিক জনঘনত্ব প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ প্রকাশ করে; ইহা হইতে দেশের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও জীবনযাত্রার ধরন ও মানও বুঝিতে পারা যায়।

জনঘনত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

---

* Population Growth and Economic Development in Low-income Countries 1958. A. J. Coal & E. M. Hoover.

† Third Five Year Plan P. 22, and P. 750—2

বহু কারণের উপর জনঘনত্ব নির্ভর করে, যেমন, অঞ্চলের ভৌগোলিক কাঠামো (configuration), বারিপাতের পরিমাণ, শিল্পের প্রসার, সেচ ব্যবস্থার সুবিধা, নদনদীর উপত্যকার উর্বরতা, রাজধানীর নিকটবর্তিতা, রেলপথে যাতায়াতের সুবিধা, জীবনধারণের নিরাপত্তা প্রভৃতি।

ঘনত্ব নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব হইল ৩৮৪। ইংলণ্ডে গড় ঘনত্ব হইল প্রায় ৬০০, বেলজিয়ামে ৬৫৪ এবং জার্মানীতে ৪৪৯। ভারতের এক এক রাজ্যে ঘনত্ব এক এক প্রকার। সর্বাধিক ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হইল কেরল (১১২৫), উহার পরেই পশ্চিম বাংলা (৯০৩০), বিহার (৬৯১), সর্বনিম্ন ঘনত্ব হইল আন্দামানে (১০)।

(গ) জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের ধরন (Occupational pattern of Population)

দেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ কোন ধরনের জীবিকাতে নিযুক্ত আছে তাহা দেখিয়া দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর পরিমাপ করা চলে। মিঃ কলিন্ ক্লার্ক সকল প্রকার জীবিকাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন: প্রথম স্তরের জীবিকাশ্রেণী (Primary occupations), দ্বিতীয় স্তরের জীবিকাশ্রেণী (Secondary occupations), ও তৃতীয় স্তরের জীবিকাশ্রেণী (Tertiary occupations)। প্রথম স্তর বলিলে বোঝা যায়, কৃষি, ফলমূল আহরণ, মৎস্য শিকার প্রভৃতি; দ্বিতীয় স্তর হইল কলকারখানার সাহায্যে উৎপাদন; তৃতীয় স্তরের মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি, যেমন পরিবহন, কেরানীগিরি, গৃহকর্মাদি, দোকানপাট করা বা ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষকতা প্রভৃতি। তাঁহার মতে দেশের অধিকাংশ লোক প্রথম স্তরের জীবিকাতে নিযুক্ত থাকিলে সেই দেশ শিল্প ও ব্যবসায় অনুন্নত, উহা কৃষিপ্রধান এবং সমৃদ্ধ নহে। যত অধিক লোক তৃতীয় স্তরের জীবিকাশ্রেণীতে নিযুক্ত থাকে, সেই দেশকে অর্থনৈতিক দিক হইতে তত সমৃদ্ধ বলা চলে।

কলিন ক্লার্কের শ্রেণীবিভাগ

আমাদের জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেই ভারতবর্ষের অনুন্নতির রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুত, পূর্বের তুলনায় গত কিছুকাল যাবৎ কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার বা অনুপাত বাড়িয়া চলিয়াছে। জনসংখ্যার দ্রুত

অপূর্ণোন্নতির প্রকাশ জীবিকা-কাঠামোতে

বৃদ্ধি, কুটীর-শিল্পের বিনাশ অথচ কারখানা-শিল্পের প্রসার না হওয়া, অর্থাৎ অনমনীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির দরুনই এইরূপ জীবিকা কাঠামোর রূপ দেখা দিয়াছে। দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেকারির (disguised unemployment) অবস্থিতিও ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভারতের ভবিষ্যৎ

১৯৫১ সালের আদম সুমারি হইতে জানা যায় যে, ভারতের শতকরা ৬৯.৮ জন ব্যক্তি কৃষিতে নিযুক্ত আছেন, শিল্পে ১০.৫%, এবং অপরাপর জীবিকাতে (বিশেষত, গৃহকর্মাদিতে) নিযুক্ত আছেন ১২%। সুতরাং ভারতের শিল্পোন্নয়ন অত্যন্ত দ্রুত হারে না হইলে এইরূপ জীবিকা কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে শিল্প ও ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইলেই জীবিকা-কাঠামোতে উন্নত ধরনের পরিবর্তন আসা সম্ভবপর। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখানো হইয়াছে তাহাতে কৃষিতে আরও অধিক লোক নিয়োগের কথা বলা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও একই অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং আগামী কয়েক বছরের মধ্যেও এইরূপ কাঠামোতে বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন আশা করা যায় না।

(ঘ) ভারত কি অতি জনাকীর্ণ? (Is India over-Populated)?

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আবেগ এই সমস্যার প্রকৃত বিশ্লেষণে বাধা দিতেছে

ভারতের মত অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নতির ও অচলাবস্থার (economic backwardness and stagnation) কারণ হিসাবে অনেকে জনসংখ্যার আধিক্যকে দেখাইয়া দেন। শুধু তাহা নহে, ইহাই বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু করার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক, ইহাও অনেকে বলিতে চান। উন্নয়নের কাজ সফল হইলে জাতীয় আয় বাড়ে, কিন্তু ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বাড়িয়া যায় বলিয়া মাথাপিছু আয় বাড়িতে পারে না, তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করা হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনিয়া লাভ নাই, সমাজের উৎপাদনশক্তিকে সর্বাধিক দ্রুতগতিতে বাড়াইয়া উন্নয়নের বেগ বাড়াইয়া লাভ নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার মান কিছুতেই বাড়িবে না, সুতরাং জননিয়ন্ত্রণই প্রাথমিক কাজ—এইরূপ কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন যাহাতে ভারতবাসী সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে, সেই চিন্তাই

আজ ইহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।† এই ধরনের প্রচারই জনাধিক্যের সমস্যাকে যুক্তিসহ বিচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় ও মূলত আবেগপ্রধান করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মৌলিক গড়ন বজায় রাখিয়া উহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কতকগুলি বিষয় বিচার করিলে আমাদের নিশ্চয় মনে হইবে যে, ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে। যেমন আমাদের দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ২% হারে

চলতি উন্নয়নের হারে জনাধিক্য কেন মনে হইতে পারে

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের জন্মহার বেশি মৃত্যুহারও বেশি। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই, জীবনযাত্রার মানও খুবই নিচু। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান ; মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে ইহা ছিল ১·১১ একর ; ১৯৩১ সালে ১·০৪ একর ; ১৯৪১ সালে ·৯৪ একর ; ১৯৫১ সালের আদম সুমারীর হিসাবে ইহা হইল ·৮৪ একর। এই সকলই জনাধিক্যের লক্ষণ, সুতরাং ভারতে এই সমস্যা আছে বলা চলে।

তবুও কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদ্ বলেন যে, ভারতে এখনও জনাধিক্যের সমস্যা দেখা দেয় নাই। তাঁহাদের মতে, প্রথমত, আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইউরোপীয় অনেক দেশ হইতে কম। দ্বিতীয়ত, আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক ইউরোপীয় দেশ হইতে কম। তৃতীয়ত, খুব ধীরে হইলেও

কেন অনেকে ইহাকে জনাধিক্য বলিতে চাহেন না

মাথাপিছু আয় আমাদের দেশে ক্রমে বাড়িতেছে। চতুর্থত, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপকরণ আছে, এরূপ অনেক দেশেই নাই। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখিয়া উহাদের সঠিকভাবে উন্নয়ন করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থায় বণ্টন করিতে পারিলে জীবনযাত্রার মান উন্নত

† "Of late, population problem of India and other countries of South East Asia has become a part of world tensions and a number of Americans —some of them in high places—regard checking the growth of population in this area as a necessary dyke against the menace of communism. The gloomy line of Malthusian view is being revived and poverty of the people in the area is taken to be due mainly to over-populatton......and the fact that our syndicated press and the interest behind it are in favour of family planning, is largely due to the fact that they regard it as alternative to social revolution or rather as a protection against it."—*Dr. Gyanchand*—Some Aspects of the Population Problem in India. P. 4—5.

হইবে। পঞ্চমত, অনুন্নত দেশসমূহে জনাধিক্য থাকিলে উহা ভবিষ্যৎ মূলধন-গঠনের (capital formation) পক্ষে খুবই উপকারী ; সেইরূপ দেশে কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে কৃষি হইতে সরাইয়া আনিয়া শ্রমপ্রগাঢ় পদ্ধতির সাহায্যে মূলধনী-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিলে ভোগদ্রব্য উৎপাদন হ্রাস পায় না। সুতরাং ভারতে প্রকৃতপক্ষে জনাধিক্যের সমস্যা নাই—ভারতের জনশক্তিকে 'অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত' (Potential surplus) বলিয়া গণ্য করা উচিত।

কিন্তু এই সকল যুক্তি সম্পূর্ণ ঠিক নহে। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোন কোন দেশের তুলনায় কম হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার পরিমাণই এত বেশি যে বৃদ্ধির হার অল্প হইলেও মোট জনসংখ্যা প্রতি-বৎসর অনেকখানি বাড়িয়া যায়। ফলে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হয়। ১৯৬১ সালের আদমসুমারি কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ভারতে ৭০ হইতে ৭৫ লক্ষ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানের সহিত যুক্ত হইয়া আগামী বৎসরগুলিতে জনবৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত করিতেছে। ইউরোপীয় দেশের জনবৃদ্ধির হারের সহিত তুলনা করিয়া লাভ নাই, কারণ আমাদের তুলনায় তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বেশি, খাদ্য উৎপাদনও দ্রুততর হারে বাড়িতে পারে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই বলা চলে। দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশে জনঘনত্ব বেশি থাকিলে ক্ষতি নাই, আমাদের মত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে বর্তমান ঘনত্বই জনাধিক্যের পরিচায়ক। তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয় বাড়িলেও উহা আর্থিক আয়, প্রকৃত আয় খুব বেশি বাড়ে নাই। তাহা ছাড়া, জনবৃদ্ধির হার কম হইলে মাথাপিছু আয় আরও বাড়িতে পারিত। চতুর্থত, অব্যবহৃত অনেক উপকরণ আছে, সুতরাং জনাধিক্য ঘটে নাই, ইহা বলা চলে না। বর্তমানে যে-হারে উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে সেই অনুযায়ী বর্তমানে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্বশেষে, উদ্বৃত্ত জনশক্তি মূলধন-গঠনের প্রচ্ছন্ন আধার মানিয়া লইলেও বর্তমানে জনাধিক্য ঘটিয়াছে ইহা অস্বীকার করা চলে না।*

বর্তমান কাঠামোর মধ্যে উন্নয়ন—এই দৃষ্টিতে নিশ্চয় জনাধিক্য

* তাহা ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক কৃষিকাঠামো ছাড়া কৃষির উৎপাদনী শক্তি বাড়াইয়া প্রচ্ছন্ন বেকারদের শিল্পে নিযুক্ত করার মত খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়—তাই বর্তমান কাঠামো বজায় রাখার দৃষ্টিভংগীতে জনাধিক্য স্বীকার করা চলে।

তবে ভারতের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে জনাধিক্যের সমস্যা নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। বর্তমান সমাজের কাঠামো ডিঙাইয়া নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ফল সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদনী শক্তি খুবই বাড়ানো যায় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের জনশক্তিকে পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারা যায়. ইহা আমাদের মনে রাখা দরকার।

বর্তমান কালের গণ্ডী ভাঙিয়া চিন্তা করা দরকার

অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইতে পারিলে এবং সামান্য বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাহায্যে খাদ্যের অভাব মিটানো কতখানি সম্ভবপর সে-বিষয়ে কলিন ক্লার্ক বলিতেছেন: 'পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে ১% হারে বাড়িবে বলিয়া ধরা যায়, কিন্তু কৃষি উৎপাদন কৌশলের উন্নতি বৎসরে ১½% হারে উৎপাদন বাড়াইবে মনে করা চলে (কোন কোন দেশে বৎসরে ২% হারে)। কোনরূপ ম্যালথুসীয় বিচক্ষণ হতাশাবাদ তাই সম্পূর্ণভাবে নিন্দিত—একমাত্র বিজ্ঞানের উন্নতিই পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমাধান করিতে পারে।"

সুতরাং, সাধারণভাবে ভারতে 'জনাধিক্য' ঘটিয়াছে এবং এখন জনবৃদ্ধি রোধ করাই সর্বাগ্রগণ্য কাজ এইরূপ বলা চলে না। জনসংখ্যা কিসের তুলনায় অধিক তাহা বলা দরকার। ভারতে কি প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে? তাহা কেহই বলিতে চাহেন না। বলা চলে যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান স্তরে উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের পরিমাণ এবং উহাদের ব্যবহারের তুলনায় জনাধিক্য দেখা যাইতেছে (relative overpopulation)।

ইহাকেই আপেক্ষিক জনাধিক্য বলে

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে জননিয়ন্ত্রণ ঘটিবে কি ঘটিবে না. এই সম্পর্কেও তাই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, দেশের ও জাতির অবস্থা বিচার করিয়াই এই নীতি স্থির হইবে। দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে জন-পরিকল্পনার স্থান কিছুতেই কম নয়। সকল বিষয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে আর জনসংখ্যার উপর পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইবে না, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। লর্ড কেইনস্ বলিয়াছিলেন যে, অধিক

সমাজতান্ত্রিক দেশে জননিয়ন্ত্রণ দরকার হইতে পারে

জন্ম হারের দরুনই রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়াছে।* ঐতিহাসিক ঘটনা অবশ্য তাঁহার কথা ভুল প্রমাণ করে। ১৯১৭ সালের এই বিপ্লবের পরে রাশিয়ার জন্মহার অনেক বেশি বাড়িয়াছিল। দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দরুন সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান আজ খুবই উন্নত। সেখানে জমি ছিল প্রচুর, জনঘনত্ব ছিল কম। তাই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে তাহারা সম্পূর্ণ জয় করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা জনবৃদ্ধির নীতিকে সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। চীন বা ভারতে জমির তুলনায় জনসংখ্যা খুবই বেশি হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার নীতির মধ্যেই জননিয়ন্ত্রণের নীতিও যুক্ত থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের পরিকল্পনাও তাই সঠিক পথেই জনসংখ্যা হ্রাসের নীতি গ্রহণ করিয়াছে তবে এই নীতির দোহাই দিয়া অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের গতি হ্রাস করায় ম্যালথুসীয় যুক্তি একান্তভাবে অবৈজ্ঞানিক।

কিন্তু জনবৃদ্ধির দোহাই দিয়া পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচার সঠিক নহে

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক (Relation between Population and Economic Development)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পারস্পারিক সম্পর্ককে দুইদিক হইতে বিচার করা চলে : (ক) অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর জনবৃদ্ধির প্রভাব, (খ) জনবৃদ্ধির উপর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রভাব।

(ক) অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কি প্রভাব হইবে তাহা প্রধানত নির্ভর করে জনসংখ্যা ও অন্যান্য উপকরণ, যেমন জমি ও মূলধনের অনুপাতের উপর। যেমন জনসংখ্যার তুলনায় জমি খুব বেশি, সেখানে জনবৃদ্ধি হইলে ভোগ্য দ্রব্যের বাজার বাড়ে বলিয়া এবং শ্রমবিভাগের প্রসার হয় বলিয়া উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে পারে, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এইরূপ উন্নয়ন ঘটিয়াছে। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর বাহির

অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর জনবৃদ্ধির প্রভাব

* "The great events of history are often due to secular changes in the growth of population and other fundamental economic causes." রাশিয়ার সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, "in upheavals of society......the disruptive power of excessive national fecundity may have played greater part in bursting the bonds of convention than either the power of ideas or errors of autocracy." *J. M. Keynes*—"Economic Consequences of the Peace"—Chapter on "Europe before the war."

হইতে লোক আসার (immigration) প্রভাব খুব বেশি হয়, কারণ কার্যক্ষম বয়সের লোকেরা দেশে প্রবেশ করে, এবং বেশির ভাগ সময়ে নিজেদের সঙ্গে কিছুটা দক্ষতা ও মূলধন লইয়া তাহারা আসে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুবিধা তত ভালভাবে গ্রহণ করা যায় দেশে যত বেশি বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধন থাকে। কারণ তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের মাথাপিছু মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ বেশি বরাদ্দ করা সম্ভব হয়। যে-দেশে মাথাপিছু আয় ও মূলধনের পরিমাণ কম, সেখানে জনসখ্যার বৃদ্ধি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমস্যা বাড়াইয়া তোলে। এইরূপে দেশে নূতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, ফলে শ্রমিক-প্রতি মাথাপিছু মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ, আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িতে পারে না।*

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল নির্ভর করে দেশে বিনিয়োগের যোগ্য মূলধনের উপর

যদি বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধন দ্রুত বাড়ানো না হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা না হয় তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিশ্চয়ই কয়েকটি কারণে বাধা বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িলে উহার কম অংশ কর্মক্ষম বয়সের গণ্ডীতে থাকে। শিল্প-প্রধান সমাজে কর্মক্ষম বয়সের লোকেরাই উৎপাদনক্ষম; অথচ দ্রুত জনবৃদ্ধি ঘটিলে সমাজে মোট জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত কমিতে থাকে।† এই অবস্থার ফলে, শিশু-মৃত্যুর হার খুব বেশি থাকে বলিয়া মৃত্যু পর্যন্ত উহাদের ভরণপোষণ করিতে জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ ব্যয় হইয়া যায়। এই অংশ সঞ্চিত ও বিনিয়োজিত হইতে পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চয়ই

কর্মক্ষম ব্যক্তি কম: শিশুমৃত্যুর দরুন উদ্বৃত্তের অপচয়

* "In an underdeveloped economy with very little capital per person, a high rate of population growth makes it even more difficult to step up the rate of saving which, in turn, largely determines the possibility of achieving higher productivity and income. Moreover, for a given investment, a large proportion will need to be devoted to the production of essential consumer goods at the expense of investment goods industries, thereby still further slowing down the potential rate of growth." *Third Five Year. Plan* P. 22.

† অর্থনৈতিক দিক হইতে উৎপাদনক্ষম বয়স হইল ১৫ হইতে ৬৪ বৎসর; অনুন্নত দেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে এই বয়সের লোকসংখ্যার অনুপাত হইল ৫৭%, অথচ শিল্পপ্রধান দেশে উহা ৬৭% (U. N. Demographic year Book 1953)। অর্থাৎ, কর্মক্ষম ১০০ জন লোক উন্নত দেশে ৫৬ জনকে ভরণপোষণ করে, আর, অপূর্ণোন্নত দেশে (যেমন ভারতে) ৮২ জন লোকের ভার বহন করিতে বাধ্য হয়।

দ্রুততর হইতে পারিত। ভারতে এই অপচয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ২২·৫%।*

(খ) দ্বিতীয়, জনবৃদ্ধির উপরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব আলোচনা করা দরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ে কারণ প্রথমেই জন্মহার হ্রাসের তুলনায় মৃত্যুর হার হ্রাস পায়।† চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং দেশে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি চলিতে থাকার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সকল কিছু মিলিয়া উন্নয়নের প্রথম যুগে মৃত্যুহার কমে। ইহাতে শিশুমৃত্যুজনিত জাতীয় সঞ্চয়ের অপচয় কম ঘটে, কিন্তু মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম লোকের অনুপাত বাড়ে না, কারণ শিশুরা বড় হইয়া কর্মক্ষম হওয়ার মধ্যে মোট জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে।

২। প্রথম যুগে মৃত্যুহার কমে, কিন্তু জন্মহার বাড়ে, অথচ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে না বলিয়া উন্নয়নের হার কমাইয়া দেয়

মৃত্যুহারের হ্রাস এবং জন্মহারের বৃদ্ধি উভয়ে মিলিয়া উন্নয়নের প্রথম যুগে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ বাড়াইয়া চলে; এবং ইহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক রূপেই কাজ করে। ভারতে এখন এই যুগ চলিতেছে।

মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম থাকিলে সেই দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নের পথ রুদ্ধ করার সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়। এই সকল দেশে জমিতে নিযুক্ত চাষীর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা-শূন্য বলিলেই চলে। তাহাদের মাথাপিছু আয় কম, শিল্পদ্রব্যের জন্য চাহিদা কম, সঞ্চয় কম, সুতরাং শিল্পে নিযুক্ত হইবার মত মূলধনও কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বল্প আয় ও স্বল্প মূলধন—এইরূপ দুষ্ট চক্রের পরিধি প্রসারিত হয়। কৃষিক্ষেত্র হইতে কিছু চাষী সরাইয়া

মাথাপিছু জমি কম, আয় কম, মূলধন কম—এই দুষ্ট চক্র ভেদ করার ছিদ্র কই?

* "From the economic point of view, the manner of our growth involves an immense waste of national resources and productive capacity. First, we nurse, feed, clothe, house and train every batch of newly born population only to lose 45% of them before they reach the age of 15 at which they can make contribution to National Income. If the cost of maintaining a young person up to the age of 15 is assumed to be half that of a adult, we throw away some 22·5% of our national income on rearing up persons from whom the community gets little or no return."—*D. Ghosh*—Pressure of population and economic efficiency in India.

† জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় না, উৎপাদনশক্তি বাড়াইতে হয় না, সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের দরকার হয় না, তাই উন্নয়নের প্রথম যুগে উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় মৃত্যুহারের হ্রাস দ্রুত ঘটে।

আনিলে খাদ্যের উৎপাদন কমে না বটে, কিন্তু শিল্প-শ্রমিকদের জন্য সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য গ্রামাঞ্চল হইতে সরাইয়া আনার অসুবিধা বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে খুবই বেশি থাকে, তাই সামাজিক পরিকল্পনা ছাড়া দেশের জনবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধারূপে কাজ করে।

কৃষিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ না ঘটিলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা আরও একটি কারণে কমাইয়া দেয়। মাথাপিছু আয় বাড়ে না বলিয়া শিল্পদ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায় না, প্রধানত খাদ্য ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক কাঠামো আবদ্ধ থাকে।* যদি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতা এবং আয় প্রথম হইতেই বাড়ানো না যায়, তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিশ্চয় শিল্পোন্নয়নের গতিরোধ করিতে থাকিবে।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা বিনা কৃষিক্ষেত্রে আয় বাড়ে না, অথচ উহা না হইলে শিল্প-প্রসার ঘটিতে পারে না

কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুটা অগ্রসর হইতে থাকিলে দেশে জনবৃদ্ধির হার কমিয়া আসে। দুঃখের বিষয়, ভারতে আমরা এই স্তরে এখনও পৌঁছাইতে পারি নাই। মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইলে দেশে জন্মের হার হ্রাস পায়। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানুষের মনে নূতন ধরনের আমোদ-প্রমোদ ও জীবন-যাপন পদ্ধতি লইয়া আসে। বৃহৎ পরিবারই আনন্দের একমাত্র উৎস বলিয়া গণ্য হয় না। তাহা ছাড়া, সন্তানসন্ততিকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়া আরও উন্নততর সামাজিক স্তরে প্রতিষ্ঠা পাওয়াইতে হইবে, মাতা-পিতার মনে এইরূপ চিন্তার ফলে অধিক সংখ্যক সন্তানসন্ততি আর লোকে পছন্দ করে না। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি ফল হইল লোকের মনে প্রদর্শন-প্রভাব (Demonstration-effect) জাগাইয়া তোলা, অর্থাৎ উন্নততর স্তরের জীবনযাত্রার মানে পৌঁছাইবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়া। ইহার দরুনও সন্তানের সংখ্যা কম রাখা দরকার বলিয়া অনেকে মনে করিতে থাকেন। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরীকরণ (urbanisation) বাড়িতে থাকে, ফলে বৃহৎ পরিবার গড়িয়া তোলা বাধা পাইতে থাকে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুটা অগ্রসর হইলে জনবৃদ্ধির হার কমে কেন

* এই সকল দেশে খাদ্যের দাম কমিলে বা খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইলেও লাভ নাই, কারণ যাহারা আধপেটা খাইত, তাহারা এখন পুরাপেট খাইতে আরম্ভ করিবে। ব্রিটেন বা পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে খাদ্যের উৎপাদন বা যোগান-বৃদ্ধি শিল্পোন্নতির সহায়ক ছিল, কারণ শিল্পপুঁজি তখন কৃষিতে এবং অন্যান্য শিল্পে রূপান্তর শুরু করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি মূলকথা হইল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার। শিক্ষিত ও স্বাধীন স্ত্রীলোকেরা অতিরিক্ত সন্তান চাহেন না। সমাজের এই অবস্থায় স্ত্রীলোকদের বিবাহের বয়স ছাড়িয়া যায়, ফলে তাহাদের প্রজননশীল বৎসরের সংখ্যা কমিয়া আসে। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহে অনিচ্ছাও বৃদ্ধি পায়। এই সকল কারণে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন লোকের আয় ও জীবনযাত্রার মান কিছুটা বাড়াইতে পারিলে জন্মহার কমাইতে পারে।

বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামো অনেক দিন ধরিয়া টি঳িকিয়া থাকিবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের নিকট তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হয়। সকল পুরাতন কাঠামো ভাঙিয়া ধনতন্ত্র যেমন বিরাট সৃষ্টির সম্ভাবনা লইয়া আসিয়াছিল, আজ ঠিক সেইরূপ সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে—বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর বেড়া ডিঙাইয়া, উহা ছাপাইয়া দূর-ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুত হারে অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ঘটানো সম্ভবপর।*

একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আজ যদি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমিয়াও যায় তাহা হইলেই কি আমাদের মাথাপিছু আয় বিপুলবেগে বাড়িয়া যাইবে? ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনশন ও হতাশার হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাইবে? তাহা কিন্তু সত্য নয়। এই সকল দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী আমাদের অর্থ নৈতিক অনুন্নতি ও অচলাবস্থা। তাই একমাত্র অতি দ্রুত এই অর্থ নৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়াই উন্নয়নের হার বাড়ানো সম্ভব—জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইলে আপনা-আপনিই আমাদের উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে না।

*......the view that improvements in the standard of living, in the words of the Planning Commission, are not likely to materialise if there is a concurrent increase of population" is based upon the assumption that the present frame-work of our economy is likely to remain more or less intact and the pace of our economic development may be accelerated but its tempo cannot exceed the limits suggested by our experience. This view is mistaken; for the fact of the matter is that the present economy of India being itself such a limiting factor in our progress has to be superseded and replaced by another which would be materially free from its repressions. It is, therefore, wrong to project the recent past and the present into the future and forecast the rate of economic development on that basis. The present economy is its own anti-climax and has to be taken to have come to a dead end," *Dr. Gyanchand*—Some aspects of the Population problem of India—Page 9.

যদি আমরা প্রচারের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইয়া উন্নয়নের হারের সমান করিতে পারি, তবেই কি আমাদের কোটি কোটি লোকের অন্নবস্ত্র, কর্ম ও নিরাপত্তার সংস্থান হইবে? তাহাতে কি অতিনিম্ন জীবনযাত্রার মান আপনাআপনি উন্নত হইয়া উঠিবে, অথবা, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে? ভারতের আদমসুমারী কমিশনার বলিতেছেন, "১০% হইতে ১৫% জনবৃদ্ধি জৈবিক দিক হইতে স্বাভাবিক এবং পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই এইরূপ ঘটিয়াছে, এবং এখনও ঘটিতেছে।"*

কমিশনার ঠিকই বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় স্বাভাবিক; ভারতের জনসাধারণ জৈবিক দিক হইতে অস্বাভাবিক নয়। দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপযোগী নূতন অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে যাহারা অপারগ এবং জনবৃদ্ধি কমানোই সমাজতন্ত্র রোধের উপায় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন—বরং তাহাদেরই কিছুটা 'অস্বাভাবিক' বলিয়া মনে করা চলে।†

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Economic Growth)

অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ধারা সফল হইতে হইলে কোন দেশের সমাজকে তাহার জন্য পূর্ব হইতে কিছুটা প্রস্তুত হইতে হয়। অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির ধারার মধ্যেই সেই প্রস্তুতি চলিতে থাকে, এবং সমগ্র সমাজদেহ ও সমাজ-মন উন্নয়নের গতিবেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। এই সময়ে সকল প্রকার উৎপাদন, পরিবহন, অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শেয়ারবাজার, জিনিসপত্রের পাইকারী ও খুচরা বাজার, মূলধনের বাজার, মালিকসংঘ, কৃষকসংঘ, ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমিতি প্রভৃতির) কাজকর্ম চালাইবার পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্তন আসিতে থাকে; সমাজদেহ বা সামাজিক কাঠামো দ্রুত রূপান্তরিত হয়।

অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন হয়—সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনও খুব দরকার

* All India census 1951 P. 131—38.

† "There is no need to fight the Malthusian devil all the time. Time is long past when this was necessary, now it is essential to take a more positive and constructive view of population and treat it as a major problem of radical social reconstruction, of ringing in the new social system and developing it rapidly and successfully." *Dr. Gaynchand*, Bannailli Readership Lectures, University of Patna, March 1954.

এই রূপান্তর সফল করিবার জন্য, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন মনোভাব, পরিবর্তনশীল চিন্তা ও ধারণাগুলি গ্রহণ ও অবলম্বন করার মত যোগ্যতা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিমানসে থাকা দরকার। সমাজ-দেহ যেমন শিল্পপ্রধান ও অধিকতর যন্ত্রনির্ভর হইয়া উঠে, সমাজ-মনও সেইরূপ অর্থনৈতিক চুলচেরা হিসাব-নিকাশে আন্দোলিত হওয়ার মত গুণ আয়ত্ত করে (appreciated and sensitive to crude economic calculus)। সমাজ-মনের এইরূপ পরিবর্তন ও উপযুক্ত দিক-নির্দিষ্টতা আসিয়া পড়িলে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথ সরল হয় ও ইহার গতি দ্রুত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাবে কম-বেশি হারে পরিবর্তন হইতে পারে; যে শ্রেণী আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে লাভবান হয়, তাহাদের মধ্যে দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মনোভাব তৈয়ারী হয়; যাহারা ততটা লাভবান হয় না তাহাদের সেইরূপ মনোভাব দ্রুত গড়িয়া উঠে না। ফলে এই সময়ে সমাজ-মন নিজের মধ্যেই বহু বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তবু যদি সমাজ-মানসের বৃহত্তর এবং চলনশীল (mobile) অংশে উন্নয়নশীল ও উহার উপযোগী বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তিগুলি গড়িয়া ওঠে তবেই সেই উন্নয়ন সাফল্য লাভ করিতে পারে। ভিক্টোরীয় সামন্ততন্ত্রী ইংলণ্ড, রাজতন্ত্রী জার্মানী, ধর্ম-সমাজতন্ত্রী জাপান, অতি আধুনিক আমেরিকা, সামন্ততন্ত্রী রুশিয়া ও চীন, আধাধর্মীয়, আধা-সামন্ততন্ত্রী ও আধা-আধুনিক ভারতবর্ষ—এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উৎপত্তিকালীন পরিবেশ (সমাজ-দেহ ও সমাজ-মন) পৃথক এবং প্রত্যেকটি দেশে সেই পরিবেশের প্রভাব ও পরিবেশ-পরিবর্তনের গতিও পৃথক। অনুন্নত বা অপূর্ণোন্নত দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিষ্ঠান থাকে যাহার দরুন দ্রুত উন্নয়নের বেগ লাভ করিতে অসুবিধা হয়। উপযুক্ত পরিমাণে শিল্পনেতা, শ্রমিক ও মূলধন না পাইলে দ্রুত উন্নয়ন হইতে পারে না এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও আচার ব্যবহার ইহাদের যোগান সংকুচিত রাখে। শিল্পপ্রসারের মনোভাব সৃষ্টিতেও ইহারা প্রচুর বাধা দেয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আসে সামাজিক মনে পরিবর্তনের প্রভাবে

প্রথমত, সকল দেশের সমাজের মধ্যেই সকলে মানিয়া লয় এইরূপ কতকগুলি নিয়মকানুন ও নিষেধাজ্ঞা থাকে (series of protective and prohibitive social taboos)। অপূর্ণোন্নত দেশে সামাজিক নিয়ম-

কানুন ও নিষেধাজ্ঞাগুলির প্রকৃতি এমন যে দ্রুত উন্নয়নের হারে ইহারা বাধা দিতে থাকে। অনেক সময় কোন কোন দ্রব্যের ব্যবহার বা কোন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে ইহারা মনোভাব সৃষ্টি করে। কোন কাজকে উঁচু মনে করা হয়, কোন কাজকে নিচু বলিয়া ঘৃণা করা হয়। কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক বা জীবজগতের প্রতি এক বিশেষ ধরনের সামাজিক মনোভাব (যেমন ভারতের অধিবাসীদের গরু-প্রীতি বা cattle-complex) উহাঁর উপযুক্ত অর্থ নৈতিক নিয়োগে বাধা দেয়। স্ত্রীলোকের পর্দা-প্রথা দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তির অনুপাত কমাইয়া দিতে পারে।

ধর্মীয় বা সামাজিক বিনিনিষেধ ও বিশ্বাস

দ্বিতীয়ত, এইরূপ সমাজে বহুদিন ধরিয়া উন্নয়ন ঘটে নাই বলিয়া প্রাচীন ঐতিহ্য বা জীবনযাপন-প্রণালী এমন মজ্জাগত হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় তাহা বাধার রূপেই দেখা দেয় (Obstacles due to traditional modes of life fixed through generations of comparative static economic conditions)। গ্রাম্য কাজকর্মের ধরনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের শহরে নিয়োগ করিতে যন্ত্রশিল্পের উপযোগী অভ্যাস ও মানসিক বৃত্তি গড়িয়া ওঠা দরকার। কৃষিতে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মিত কাজের অভ্যাস (punctuality and regularity) ততটা না থাকিলেও চলে; কিন্তু যন্ত্রশিল্পে তাহা চলে না। কাপড় জামা ও তাহা পরিধানের ধরন হইতে শুরু করিয়া চলাফেরার রকমসকম সবই বদলাইতে হয়। ইহাদের দ্রুত বদলানো গেলেও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই গুরুত্বপূর্ণ।

অভ্যস্ত জীবন যাপন প্রণালী

তৃতীয়ত, সামাজিক দল ও উপদল, জনসমষ্টি ও উপসমষ্টি (attitudes bred out of social formation and groupings) যেমন পরিবার, গোষ্ঠী (clan), গ্রাম সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্য হইতে ব্যক্তিমানসের কতকগুলি দৃষ্টিভংগী গড়িয়া ওঠে। কোন বিশেষ বিষয়ে এইরূপ দল ও উপদল জনসমষ্টি-ও উপসমষ্টির স্বার্থ ও দৃষ্টিভংগীর সহিত ব্যক্তির দৃষ্টিভংগীকে মিলাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। পরিবর্তনের যুগে এই সকল উপসমষ্টির অনেক উপকারিতাও থাকে, অসংগঠিত ব্যক্তিরা যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে তাহা হইতে কিছুটা রক্ষা পাইতে

সামাজিক উপদল ও উপসমষ্টি

পারে। কিন্তু সাধারণত দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভংগী ও জীবনযাপন প্রণালী গ্রহণ ও আত্মস্থ করিতে হইলে (adaptation and assimilation) ব্যক্তিমানস যত দ্রুত চলনশীল হওয়া দরকার—তাহাতে ইহারা বাধা দিতে থাকে।

চতুর্থত, সমাজে এই সকল উপসমষ্টি ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক শ্রেণী থাকে এবং এইরূপ শ্রেণীভেদ হইতে কিছু কিছু দৃষ্টিভংগী গড়িয়া উঠে (attitudes bred out of class-division)। বিভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভংগীতে পার্থক্য থাকায় সমাজ নিজের মধ্যে বহুধা বিভক্ত থাকে, বহুভূত সমাজে (plural societies) পরিণত হয়। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ভয় সৃষ্টি হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইতে পারে। পর-শ্রমভোজী ও ধনিকশ্রেণীকে সামাজিক পদমর্যাদা ও অর্থ-নৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে সরাইবার মধ্য দিয়া একই সঙ্গে শ্রমের যে সম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠে তাহা অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি করে। রাশিয়া ও চীনে মালিকশ্রেণী সম্পর্কে ঘৃণা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের আত্মবিশ্বাস মিলিয়া শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বহুলাংশে বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণী ও উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

সর্বশেষে, বর্তমানের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে ব্যক্তির যে দৃষ্টিভংগী গড়িয়া উঠে (attitudes derived from the recent history, political and economic) তাহার প্রভাবও কম নয়। ঔপনিবেশিক শোষণ চলিতে থাকিলে বা উহা হইতে মুক্ত হইলে প্রধানত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগীর উদ্ভব হয়। এই জাতীয়তাবাদ যত উগ্র হইবে (উন্নয়নের উপযোগী অন্যান্য সকল বিষয় সমান থাকিলে), অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। জাতীয়তাবাদের প্রভাব প্রধানত দুইটি : (ক) নিজেদের উন্নয়নের কাজ নিজেরাই করিব, এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতা জাগানো, এবং (খ) পৃথিবীর জাতিদের মধ্যে নিজের জাতিকে সম্মানজনক ও উচ্চস্থানে তুলিবার আংকাংক্ষা জাগানো। পশ্চিমী দেশগুলি যন্ত্রশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া উন্নত হইয়াছে, আমাদের উন্নত হইতে হইলে দ্রুত শিল্প-প্রসার চাই—এইরূপ প্রতিযোগিতার মনোভাব অনেকাংশে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাকে, ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারকে, প্রভাবান্বিত করে। গ্রাম্য মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া যন্ত্রশিল্প গ্রহণের উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

সাম্প্রতিক ইতিহাসজাত ভাবাদর্শ

উন্নয়নের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব

অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশে, এবং ভারতেও গণইচ্ছার (will of the people) মধ্যে দুইটি প্রধান ভাবাদর্শ দেখা যাইতেছে; প্রথমত, দেশের সম্পদ ও জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নত করার ইচ্ছা এবং দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে এই উন্নতি ঘটানো ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়িয়া তোলা। সমাজ-মানসের অধিকাংশের দৃষ্টিভংগী এই দুইটি ভাবাদর্শের দ্বারা সঞ্চালিত ও রূপায়িত হইতেছে। কিছু অংশ এখনও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভংগী গড়িয়া তুলিতে বাধা দিতেছে। সকল দেশের রাষ্ট্রই জনমানসের শক্তিশালী ও মুখর অংশের স্বার্থ ও ইচ্ছার বাহক ও সঞ্চালক। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র—সকল কিছুর উপযোগী প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানজাত দৃষ্টিভংগী মিলাইয়া গঠিত মিশ্র অর্থনীতির ভাবাদর্শ গ্রহণ করায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত করার মত তীক্ষ্ণ ও একাগ্র সমাজমানস গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ভারতে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

অনুশীলনী

1. Is India over-populated? If so, what remedies would you suggest to solve the problem?

2. "The ancient land of ours is awfully over-crowded". Comment.

3. "A rapidly growing population is the most fundamental obstacle to economic progress in India." Discuss in the light of the statement, how the alarming growth of population is standing in the way of economic progress in India.

4. Discuss carefully the interrelation of economic development and growth of population in the present Indian context.

5. Discuss the problem of population growth in India in the context of Planning.

6. Discuss fully the effects of economic development on the growth of population in the present India context.

7. Examine the socio-economic factors impeding economic growth in India.

8. Write a critical note on the population problem in India.

৫

কৃষির গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা

Improtance of Agriculture & Present Situation

অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা (Role of Agriculture in Economic Development): অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথা হইল শিল্প-প্রসার। উন্নয়নের প্রথম যুগে দেশের শিল্পপ্রসার অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উন্নয়ন ও শিল্পের প্রসার পরস্পর নির্ভরশীল, তাই দেশের কৃষিক্ষেত্র অনুন্নত রাখিয়া শিল্পের প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলত কৃষিনির্ভর। এই কৃষি-কেন্দ্রিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া দেশে শিল্পপ্রসারের গতিবেগ সৃষ্টি করার জন্য যে-মূলধন নিয়োগ করা দরকার, তাহার অনেকাংশ কৃষি হইতেই আসে। কৃষি যখন প্রধান উপজীবিকা. তখন কৃষি হইতে বিভিন্নরূপে ও বহুবিধ ধরনে নিয়োগযোগ্য উপকরণগুলি সরিয়া আসিয়া শিল্পে নিযুক্ত না হইলে সহজে শিল্পপ্রসারের ধারা শুরু হইতে পারে না। কৃষির উন্নয়ন হইতেই শিল্পপ্রসারের সূত্রপাত। বর্তমানের শিল্পোন্নত দেশগুলি সকলেই কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত মূলত কৃষিপ্রধান ছিল। কিরূপে কৃষির প্রসার শিল্পের প্রসার ঘটাইতেছে তাহা অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।*

কেবল যে শিল্প উন্নয়নের প্রথম যুগে কৃষির গুরুত্ব আছে তাহা নয়; অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে সকল দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সকল সময়েই কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা ভারসাম্য দেখা যায়। জাতির অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন কাঠামোতে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে. কিন্তু সকল স্তরেই ঘনিষ্ঠ পরস্পর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়া কৃষি ও শিল্প

* "The agricultural sector served in various roles. It provided a large part of the sustenance of the growing urban population. It also supplied a market for manufactured goods bought out of higher real incomes, a source of capital for industry, (often through medium of the capital accumulated by traders), and a source of foreign income to pay for imported capital goods for industry."—Bauer & Yamey—*The Economies of underdeveloped countries*; P. 235.

অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদের মতে দেশের কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই ভারসাম্যের মধ্যে কখনও কখনও বিচ্যুতি আসে এবং এই বিচ্যুতির ফলে বহু প্রকার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে আর এই সকল পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হইল পুনরায় সেইরূপ ভারসাম্যে পৌঁছানো। ধনবিজ্ঞানী চাং (Chang) বলেন যে "কোন একটি দেশ যতই শিল্পোন্নত হউক না কেন, ইহা নিজের অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালাইতে বা উন্নত করিতে পারে না, যদি-না সে নিজের দেশের মধ্যে বা বাহিরের কোন দেশের সহিত আমদানি-রপ্তানির যোগসূত্রের মাধ্যমে, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সঠিক ও পরিবর্তনশীল-ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে।"*

। কৃষি হইতে শিল্পের মজুরের যোগান

প্রথমত, কলকারখানার প্রসারের জন্য প্রয়োজন হইল অল্প মজুরিতে প্রভূত পরিমাণ শ্রমিকের যোগান। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িলে, অর্থাৎ কৃষির কিছু পরিমাণ উন্নয়ন ঘটিলে কিছুসংখ্যক শ্রমিক কৃষিক্ষেত্র ছাড়িয়া শহরে আসার সুযোগ পায়। এইরূপে শহরের শিল্পগুলিতে মজুরের যোগান হয়। আবার কৃষিক্ষেত্র হইতে প্রচ্ছন্ন বেকার অথবা অর্ধবেকারগণ শিল্পক্ষেত্রে সরিয়া আসিলে সেখানকার উৎপাদনপদ্ধতির ও উপাদান সম্মিলনের পরিবর্তন ঘটে, ফলে কৃষিজীবীদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

। খাদ্য ও কাঁচামালের যোগান

দ্বিতীয়ত, কৃষিক্ষেত্র ছাড়িয়া শহরাঞ্চলে যে শ্রমিক ও কর্মচারীশ্রেণী গড়িয়া উঠে তাহাদের খাদ্য যোগাইবার ভার প্রকৃতপক্ষে কৃষিক্ষেত্রের উপর। দেশে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা বাড়ে মোট জনসংখ্যার মধ্যে অকৃষিজীবীর অনুপাত বৃদ্ধি পায়। কৃষির উন্নতি না ঘটিলে বিক্রয়যোগ্য খাদ্যের যোগান বাড়িতে পারে না, শিল্পপ্রসারের ধারা শ্লথ হইয়া পড়ে। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি ও ফলে মজুরি বৃদ্ধির দরুন মূলধন-গঠনের হার এইরূপ দেশে কমিয়া আসে। ইহা ছাড়াও শিল্প ও কলকারখানা প্রসারের জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন হয় তাহা কৃষি হইতেই আসে। কৃষির উন্নয়ন এইরূপে শিল্পপ্রসারে সাহায্য করে।

***"However highly industrialised a country may be, it cannot continue its economic activities and develop them without, at the same time, either maintaining a fair and changing balance between agriculture and industry within its own boundaries, or securing a close contact, through export and import, with agricultural enterprises of other countries." P. R. Chang, *Agriculture and Industrialisation.* P. 23.**

তৃতীয়ত, দেশের শিল্পপ্রসারের জন্য যে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় তাহার অনেকাংশ আসে কৃষি হইতে। অপূর্ণোন্নত দেশে ক্ষুদ্র চাষীর হাতে জমি ও মূলধনের পরিমাণ কম হইলেও বৃহৎ চাষী বা ব্যবসায়ী ও মহাজনের হাতে কিছু কিছু পুঁজির সঞ্চয় ঘটে। কৃষি উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী বিনিয়োগে এই উদ্বৃত্ত বা পুঁজির একাংশ নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অংশ ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান, শেয়ার-মূলধন প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য চলিয়া আসে। দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চলিতে থাকিলে এই শ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায় হইয়া উহা সরকারী বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে থাকে।

৩। উদ্বৃত্ত বা পুঁজির উৎস

চতুর্থত, অপূর্ণোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্যের মধ্যে বেশির ভাগ হইল কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী। কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীই মোট রপ্তানির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। কৃষির উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানি-আধিক্য বা বৈদেশিক পাওনার বৃদ্ধি ঘটাইতে পারিলে উহার সাহায্যে দেশটি বিদেশ হইতে মূলধনী যন্ত্রপাতি পাইতে পারে।

৪। মূলধনী দ্রব্যের আমদানি

পঞ্চমত, অপূর্ণোন্নত সকল দেশে শিল্পপ্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হইল বাজারের অভাব। দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিজীবী, তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা কম। কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় না বাড়িলে কলকারখানাজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় হইবে কোথায়? তাই কৃষির উন্নয়ন শিল্পপ্রসারে সহায়তা করে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। যদি দেশে পরিকল্পনা না থাকে, তবে শিল্পপতিরা তাহাদের দ্রব্যসামগ্রীর দাম কৃষিজাত দ্রব্যাদির তুলনায় এমন উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখে যে চাষীর বা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হাত হইতে অধিক আয় তাহারা টানিয়া লইতে পারে। ধনতান্ত্রিক শিল্প-প্রসারের প্রথম যুগে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বাণিজ্য-হার (the terms of trade between agricultural and industrial sector) মোটামুটি কৃষকের প্রতিকূল থাকে। জমিতে উৎপাদন বাড়াইলেও কৃষকের আয় যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহার তুলনায় কারখানাজাত দ্রব্যাদির দাম বেশি পরিমাণে বাড়ানো হয় বলিয়া তাহার অবস্থা ততটা উন্নত হইতে পারে না। অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষক শ্রেণীকে এইরূপে শোষণ করিয়া শ্রেণী হিসাবে শিল্পপতিদের প্রসার

৫। বাজার প্রসারিত করা

ঘটে। পরিকল্পিত সমাজে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্য-হার স্থির করা হয় অনেক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও আলোচনা করিয়া এবং দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন হারের কথা স্মরণ রাখিয়া।

এই সকল কারণে দেশে শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ অনেকাংশে নির্ভর করে কৃষির উন্নয়নের উপর। জাতি সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টে ঠিকই বলা হইয়াছে যে, "কৃষির উন্নতি না ঘটাইয়া অত্যধিক শিল্পপ্রসার ঘটাইবার চেষ্টা করিলে এমন অনেক ঘটনা দেখা দিবে যাহাতে দীর্ঘকাল অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়—বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, মুদ্রাস্ফীতি, মাত্রাতিরিক্ত নগরীকরণ ও চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোর ভাঙন, সকল কিছু দেখা দিতে থাকে।"*

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of India Agriculture) : অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক ইতিহাস হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক দেশেই প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয় ঘটে দেশের কৃষিকাঠামোর মধ্যে। সেই মূলধন লইয়া উদ্যোক্তা শ্রেণীর লোকেরা বা রাষ্ট্র নিজেই কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়। এই সকল কলকারখানা বা শিল্প কাঠামোর প্রসারের জন্য কৃষিজাত যে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল দরকার হয়, তাহা শিল্পে নিযুক্ত লোকজনেরা নগদ টাকা দিয়া কৃষিক্ষেত্র হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে শুরুকরে। এতদিন চাষীরা নিজের পরিবারের উপযোগী শস্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল, এখন তাহারা উহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য-উৎপাদনে রূপান্তরিত করে। উহাদের লইয়া কেনা-বেচার 'বাজার' গড়িয়া উঠে ; কৃষিকার্য আর কেবলমাত্র জীবনযাপনের প্রণালী (way of life) থাকে না, উহা এক ধরনের ব্যবসায় বা শিল্পে পরিণত হয়। শিল্পজাত উদ্বৃত্ত বা মূলধন এখন শহর-হইতে গ্রামের দিকে ছোটে, কৃষির উৎপাদন-পদ্ধতিকে ক্রমশ অধিক মাত্রায় পুঁজি-প্রধান বা মূলধন-প্রগাঢ় করিয়া তোলে কৃষিতে উৎপাদন বাড়াইলে মুনাফা বেশি, এই তাগিদেই ধনী চাষী বা ব্যবসায়ীরা কৃষিক্ষেত্রে তাহাদের পুঁজির বিনিয়োগ শুরু করে। কৃষির উন্নয়ন শিল্পকে শ্রমিক কাঁচামাল মূলধন

কৃষি হইতে শিল্পের উৎপত্তি ও ফলে কৃষির উন্নতি

* "Over-rapid and unbalanced growth of the industrial sector, unaccompained by complementary changes in the agricultural sector, may give rise to phenomena which in the long run are likely to retard economic development—balance of payments difficulties, inflation, excessive urbransation, "the disruptian of accepted social patterns." *Processes and Problems of Industrialisation in underdeveloped countries*, P. 3.

দিয়া সাহায্য করে ও আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটায়; অপর পক্ষে সার, বীজ, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পুঁজি দিয়া শিল্পক্ষেত্র কৃষি উন্নয়নের রসদ জোগায়। কৃষিক্ষেত্রের তুল তায় শিল্পক্ষেত্র অনেক বেশি গতিশীল, অনেক বেশি সম্পদ ও উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী এবং অনেক বেশি ক্ষমতাশীল। তাই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে শিল্পক্ষেত্রই নেতার ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর কাল হইতেই ভারতে সামন্ততান্ত্রিক কৃষির পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তরণ ত্বরান্বিত হইয়াছে। তবে শিল্পপ্রসারের গতিবেগ দ্রুত না থাকায় এই রূপান্তরণ কৃষি-কাঠামোতে আমূল কোন পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। এখনও অনুন্নত কৃষিকাঠামোর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শিল্পের অনুন্নতিই কৃষির অনুন্নতির কারণ

কৃষিকাঠামোর অনুন্নতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদন-ক্ষমতার স্বল্পতায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের একর-প্রতি উৎপন্নের পরিমাণ এত কম যে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। নিচের তালিকা হইতেই ইহা বোঝা যাইবে।

একর প্রতি উৎপাদন: পাউণ্ডের হিসাবে

১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব

ধান		গম	
ব্রহ্মদেশ	১২১৬	অস্ট্রেলিয়া	৯০৯
জাপান	৩৩২১	যুক্তরাষ্ট্র	১০৭৯
চীন	২২৩৩	ভারত	৫৮৫
ভারত	৬৯০		

তুলা		ইক্ষু	
মিশর	৫৯০	মরিসাস	৬১৩২
যুক্তরাষ্ট্র	৩১২	কিউবা	৪৫৬৭
ভারত	৭২	ভারত	৩০৪৯

ভারতে কৃষির অনুন্নতির দ্বিতীয় লক্ষণ হইল যে, ইহার অনেক অংশ এখনও 'জীবনধারণের জন্য চাষ' এই স্তরে রহিয়াছে। এখনও অনেক অংশে চাষী নিজের ও পরিবারের অন্যান্য লোকের খাদ্য-সংস্থানের জন্য কোনমতে চাষ-আবাদ করে। এই অংশে উৎপাদনের মূল তাগিদ হইল আত্মভোগ; বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বিশেষ সৃষ্টি হয় না। মিশ্র চাষ, পশুপক্ষীপালন, মাছের

চাষ প্রভৃতি জীবিকা আমাদের দেশের খুব কম। তৃতীয়ত, কৃষিকাঠামোর অনুন্নত অংশে উৎপাদন-পদ্ধতি এখনও প্রাচীন ধরনের। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন-পদ্ধতি পরিত্যাগের কোন লক্ষণ এখনও পর্যন্ত দেখা যায় না। ধনতান্ত্রিক বা সমবায়ী প্রথায় বৃহৎমাত্রায় যান্ত্রিক চাষ শুরু হওয়ার বাস্তব ভাগিদের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদের প্রচলন খুবই শ্লথ। চতুর্থত, ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকার আইন অপরিবর্তিত রাখায় মাথা-পিছু চাষের জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বিকল্প জীবিকা সংস্থাপনের অভাব, জমির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মমতা—এই সকলের দরুন জমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় সরকার ছোট চাষীর জন্য সার, বীজ ও ঋণের সাহায্য উন্মুক্ত রাখিলেও তাহারা উহার উপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে না। পঞ্চমত, যুদ্ধের সময় হইতেই ভারতের কৃষিকাঠামোতে নিঃশব্দে জমির মালিকানা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে, ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষষ্ঠত, আমাদের কৃষিকাঠামোতে দেখা যায় যে, দেশে প্রচুর পরিমাণ চাষের যোগ্য জমি আছে যাহাতে এখনও চাষ আবাদ হয় না। আমাদের মোট ভৌগোলিক সীমানা ৮১১ মিলিয়ন একর; ইহার মধ্যে জমি-ব্যবহারের হিসাব দেখানো হইয়াছে ৬১৫ মিলিয়ন একরের। ইহার মধ্যে চাষ আবাদ হইতেছে এইরূপ নীট অঞ্চলের পরিমাণ হইল ২৬৬ মিলিয়ন একর। সর্বশেষে বলা চলে যে, আমাদের কৃষির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হইল আমাদের কৃষিজাত শস্যসামগ্রীর পুষ্টিক্ষমতার স্বল্পতা (low nutritional value)। ডাঃ রাধাকমল মুখার্জির হিসাবমত সাধারণ ভারতীয়ের পক্ষে ২৮০০ ক্যালোরির খাদ্য দৈনিক গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু গড়ের হিসাবে প্রত্যেকে ৪২৩ ক্যালোরি কম পাইতেছে। ইহার একটি প্রধান কারণ হইল অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের শস্যদ্রব্যে পুষ্টিক্ষমতা কম। অন্যান্য উন্নত বা অনুন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি-সংগঠনের এই সকল বৈশিষ্ট্য আমরা দেখিতে পাই।

অনুন্নত কৃষির বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ

ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন-ক্ষমতার স্বল্পতা (Low productivity of Indian Agriculture):

ভারতীয় কৃষির সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল চাষী-প্রতি কম উৎপাদন। অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক হিসাব করিয়াছেন যে, প্রাথমিক স্তরের জীবিকাতে নিযুক্ত শ্রমিকের

গড় উৎপাদনের পরিমাণ হইল : নিউজিল্যাণ্ড—২২৪৪ আ.ই.*, অস্ট্রেলিয়া—১৫২৪ আ.ই., আর্জেন্টিনা ১২৩৩ আ.ই., উরুগুয়ে ১০০০ আ.ই., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৬০ আ.ই., ডেনমার্ক ৬৪২ আ.ই., জাপান ১২০ আ.ই., রুশিয়া ৮৮ আ.ই. এবং চীন ৪৬ আ.ই.। ভারতের হিসাবে পৃথকভাবে পাওয়া না গেলেও মনে হয় ইহা চীনের হিসাব হইতে বেশি হইতে পারে না।

উৎপাদনক্ষমতার এই স্বল্পতার ফলে ভারতে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইতেছে; আবার কৃষিতে এই জনাধিক্যের ফলেই উৎপাদন-ক্ষমতার এই স্বল্পতা দেখা যাইতেছে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বল্পতা

অন্যান্য দেশে কৃষিকার্যে জনসংখ্যার অনেক কম অংশ নিযুক্ত থাকে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা ও হল্যাণ্ডে প্রায় ১৯%, অস্ট্রেলিয়াতে ১০%, নিউজিল্যাণ্ডে ২০% এবং পশ্চিম জার্মানীতে ২৯%।

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে ভারতে চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন-ক্ষমতার এই স্বল্পতার কারণ হইল প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা, উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা এবং সার ও বীজের অভাব এবং জোতের ক্ষুদ্র আয়তন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চাষীদের মতই সে পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান। তাহার সাধারণ শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে। কিন্তু চিরাচরিত কৃষিকার্যের খুঁটিনাটিতে তাহাকে সুশিক্ষিত বলা চলে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, অথচ শিল্পোন্নয়নের অভাব ইহারাই প্রকৃতপক্ষে কৃষির অনুন্নতির মূল কারণ।

উন্নত দেশগুলির কৃষিতে এত অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার পিছনে মূল কথা হইল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং কৃষিক্ষেত্রে অধিক মূলধন নিয়োগ করিয়া কৃষি-পদ্ধতিকে ক্রমশ পুঁজি-প্রধান করিয়া তোলা। অতীতে তিনটি প্রধান কারণের ফলে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ ও মূলধনীকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল: জমির মালিকানা ছিল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের হাতে, তাঁহারা ইহার বিরোধী ছিলেন; দেশে আর্থিক ও প্রকৃত মূলধনের (যন্ত্রপাতি, সার, বীজ প্রভৃতি) অভাব ছিল; এবং জমির খণ্ডীকরণ ও অসংবদ্ধতার দরুন জমিতে মূলধন-প্রবাহের গতি রুদ্ধ ছিল। বর্তমানে দ্বিতীয় অসুবিধাটি অনেকাংশে দূর হইয়াছে বা

অনুন্নতির কারণ: মূলধনের অনুপ্রবেশ হয় নাই

---

* আন্তর্জাতিক ইউনিট বা international unit.

সেইরূপ অবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সম্পূর্ণ না হইলেও পূর্বে যে বাধা ছিল তাহার গুরুত্ব বর্তমানে অনেকটা কমিয়া আসিতেছে; কারণ এখনকার আইনে জমিদাররাই 'প্রজা' নামে গৃহীত হইতেছেন, তাঁহারা জমিতে পুঁজির নিয়োগ করিয়া মাটি ও মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইতে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছেন। আর্থিক মূলধনের অভাব এখন আর আছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে কৃষিপণ্যের দাম উর্ধ্বমুখী। ফলে যাহাদের হাতে জমি ছিল তাহারা এত বৎসর কাল ধরিয়া পণ্যশস্য সুউচ্চদামে বিক্রয় করিতে পারিয়াছে। তাহাদের প্রাথমিক সঞ্চয়ের যুগ শেষ হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে ও তাহার পরেও কয়েক বৎসর এই সঞ্চিত টাকা দিয়া তাহারা বিত্তহীন চাষীর জমি নিজের হাতে লইয়া আসিয়াছে, এইরূপে জমির মালিকানায় কেন্দ্রীকরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার ভূমিস্বত্ব আইনের দরুন এইরূপ আরও অধিক ভূমি ক্রয়ের গতিবেগ হ্রাস পাইয়াছে মাত্র। তাই বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে এই আর্থিক মূলধন কৃষিতে নিয়োগের উৎসাহ খুঁজিয়া পাইতেছে। একমাত্র বাধা হইল জমির ছোট ছোট খণ্ড ও উহারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার হইতে স্বেচ্ছামূলক 'সমবায়' গঠন করার কথা ঘোষিত হইতেছে। সমবায়ের মাধ্যমে জোতের আয়তন বড় বড় করা এবং বেশি মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন করা সম্ভবপর। বর্তমানে তাই সমবায় প্রথার স্বল্প প্রসারই কৃষির অনুন্নতির মূল কারণ।

বর্তমানের ক্ষুদ্র জোত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও শ্রমপ্রগাঢ় চাষের পদ্ধতি বজায় রাখিয়াও একর প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদন কিছুটা বাড়ানো সম্ভবপর। উন্নত ধরনের কৃষি বীজ ব্যবহার করিয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণে ও আধুনিক পদ্ধতিতে জলসেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া, কীটপতঙ্গ-পঙ্গপালের হাত হইতে শস্য রক্ষা করিয়া বর্তমানের স্বল্প উৎপাদন-ক্ষমতাকে অনেকটা বাড়ানো চলে। আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে, ছোট জোতে উপযুক্ত চাষের উপযোগী উন্নত ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রচলনের কথা আমরা নিশ্চয় কল্পনা করিতে পারি। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উহার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবহার পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে হইলে এইরূপ আবিষ্কার ও উহার পূর্ণ প্রচলন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে অনুন্নতি বা অনগ্রসরতার জন্য ভারতের চাষী দায়ী নয়, ইহার কারণ—ভারতের শিল্পে

ক্ষুদ্র জোত থাকিলেও সীমাবদ্ধ উন্নতি কেন হইতেছে না

অনগ্রসরতা শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের অভাব এবং দেশের বিজ্ঞান-চর্চাকে সমাজের প্রয়োজনাভিমুখী করিয়া না তোলা। আধুনিক টেক্‌নোলজি, কৃষি-বিজ্ঞানের চর্চা এবং ইহাদের ব্যাপক প্রয়োগ তাই কৃষি উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

অনুশীলনী

1. Discuss the role of agriculture in the economic development of a country.
2. What in your opinion should be the main lines of agricultural reorganisation in India ?
3. Explain the causes of low productivity of Indian agriculture, and suggest measures by which the level or productivity may be raised.
4. Describe the nature of the defects in the organisation Indian agriculture and suggest remedies.

৬

জমি ও জল : জলসেচের অর্থনীতি

Land & Water : Economics of Irrigation

চাষের জমির পরিমাণ (Cultivable land in India) :

ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হইল ৮১ কোটি ১০ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে প্রায় ৭২ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই জমি ব্যবহারের নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে :

	কিরূপ অবস্থায় আছে	একর (কোটির হিসাবে)
১।	বন	১০'৩৩
২।	নীট কর্ষিত জমি	৩১'৫০
৩।	বর্তমানে অনাবাদী জমি	২'৫০
৪।	চাষযোগ্য অপচয় (পুরাতন অনাবাদী)	২ ৮০
৫।	কৃষিকার্যে পাওয়া যাইবে না (ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, নদীনালা প্রভৃতি)	১'২২
৬।	অকর্ষিত জমি (অপচয় বাদে)	৯'৫০
৭।	অন্যান্য	১৩ ৯৫
		৭১'২০

উপরের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ২ কোটি ৮০ লক্ষ একর বর্তমানে অনাবাদী পড়িয়া আছে। সুতরাং এই সকল জমিতে চাষের প্রসার ঘটানো সম্ভব। ৯ কোটি ৯০ লক্ষ একর চাষ যোগ্য অপচয়ের মধ্যে একটু চেষ্টা করিলে ৯ কোটি একর জমিতে লাভজনক কৃষি শুরু করা চলে। যে-সকল জমির হিসাব পাওয়া যায় নাই, অথবা উন্নয়ন করা খুবই ব্যয়সাধ্য, তাহাদের বাদ দিলেও এই তিন কোটি ৮০ লক্ষ একরে চাষ শুরু করা চলে। যে-সকল কারণে এই পরিমাণ জমি পতিত রহিয়াছে তাহা দূর করা দরকার, অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবহনের সুবন্দোবস্ত এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো—এই সকল কাজই প্রধান।

কতখানি জমি এখনই পাওয়া যাইতে পারে

দেশে শিল্পপ্রসার বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যত অগ্রসর হইতে থাকে জমি ব্যবহারের ধরন (Pattern of land utilisation) তত বদলাইতে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিতেছে। বন কমিয়া আসিতেছে, নীট কর্ষিত জমি বাড়িতেছে, বর্তমানে অনাবাদী জমি কমিয়া আসিতেছে। চাষযোগ্য অপচয় কমিয়া আসিতেছে, কৃষিকার্যে পাওয়া যাইবে না এরূপ জমির দরকার বাড়িতেছে, অকর্ষিত জমির পরিমাণ কমিতেছে। জমির ব্যবহারের ধরনের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এতদিন ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পের অনুন্নতি এবং মুনাফাহীন কৃষিকার্য এই তিন প্রভাবেই জমি ব্যবহারের ধরন নিরূপিত হইয়া আসিতেছে।

জমি ব্যবহার : পুরানো ও নূতন প্রভাবসমূহ

জলসেচের গুরুত্ব (Importance of Irrigation) :

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। আবাদী জমি হইতে অধিক ফসল ফলাইবার জন্য এবং অনাবাদী চাষযোগ্য জমিকে আবাদযোগ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ভারতে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ডাঃ ভোয়েলকার বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডের জমির প্রকৃতি যেমন আর্দ্রতা, ভারতের জমির প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত, ইহা হইল অত্যন্ত শুষ্কতা।" তাহা ছাড়া, বর্ষার বারিপাত বিভিন্ন অঞ্চলে সমান নয়। বৃষ্টিপাতের এই অসমতার ভিত্তিতে আমরা ভারতকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি : (ক) 'বৃষ্টিহীন অঞ্চল' যেমন সিন্ধু, রাজপুতানা, পঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ। এই অঞ্চলে সেচ ব্যবহার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। (খ) 'অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল,' যেমন বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও যুক্তপ্রদেশ। এই সকল অঞ্চলেও সেচ ব্যবস্থা একান্ত দরকার, (ক) 'নিশ্চিত বারিপাত অঞ্চল,' যেমন বাংলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চল। এই সকল অঞ্চলে অনেক সময় বারিপাতের আধিক্য দেখা যায়, ফলে সুষ্ঠুভাবে জল ব্যবহারের জন্য (নিকাশ ও প্রবেশ উভয়ের জন্যই) খাল খননের দরকার। শীতকালীন শস্য (রবিশস্য) বর্ষার জল পায় না, অতএব কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ দরকার। জলপথ বিস্তার করিলে পরিবহনের কাজও অগ্রসর হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কৃষির প্রসারের জন্য ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার। ট্রেভিলিয়ান ঠিকই বলিয়াছেন, "এখানে জল জমি অপেক্ষাও

উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব

মূল্যবান।" তৃতীয় পরিকল্পনার ভাষায় বলা চলে, "Large scale development of irrigation & power helps to rebuild the agricultural economy and to prove the way for the rapid industrialisation of the countries."*

কিন্তু এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে সেচ ও শক্তি উৎপাদনের কাজে জলের ব্যবহার অনেক কম। ১৯৫০ সালে দেশে নদীর জলের সম্পদ হিসাব করা হইয়াছিল. ইহার পরিমাণ ছিল ১৩৫৬ মিলিয়ন একর ফিট। দেশের ভূপৃষ্ঠের গঠনই এমন যে ইহার মধ্যে মাত্র ৪৫০ মিলিয়ন একর ফিট সেচের কাজে খাটানো যায়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭৬ মিলিয়ন একর ফিট জল ব্যবহৃত হইত ; অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য জলধারার ১৭% বা বাৎসরিক মোট জলস্রোতের ৫৬% মাত্র ব্যবহৃত হইতেছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে হিসাব করা হইয়াছিল যে, প্রায় ১২০ মিলিয়ন একর-ফিট, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য জলের প্রায় ২৭% ব্যবহৃত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও প্রায় ৪০ মিলিয়ন একর-ফিট জল ব্যবহৃত হওয়ার মত পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে ; ইহার শেষে এই অনুপাত দাঁড়াইবে ৩৬%।

বিভিন্ন প্রকার সেচব্যবস্থা (Types of Irrigation Works in India) :

ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত চারি প্রকারের সেচপ্রণালী প্রচলিত আছে : (ক) পুষ্করিণী, (খ) কূপ, ও (গ) খাল দ্বারা সেচব্যবস্থা।

(ক) **পুষ্করিণী :** ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে পুষ্করিণীর সাহায্যে সেচব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সাধারণত নদীর বক্ষে বাঁধ দিয়া এই সকল জলভাণ্ডার বা পুষ্করিণী (storage works) সৃষ্টি করা হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে নদীগুলি বর্ষার পর শুষ্ক হইয়া যায় সেজন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সিন্ধু ও পঞ্জাবের উত্তর অঞ্চল ছাড়া প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে জলসেচের জন্য পুষ্করিণী আছে। মাদ্রাজে পুষ্করিণীর সংখ্যাই সর্বাধিক। প্রায় ৪০,০০০ পুষ্করিণী মাদ্রাজ ও অন্ধ্ররাজ্যে বর্তমান।

(খ) **কূপ :** সাধারণত কূপ হইতে মানুষের বা বলদের সাহায্যে জল উত্তোলন করা হয়। নালার সাহায্যে এই জল চাষের ক্ষেত্রে পরিবেশিত হয়।

* *Third Five year Plan* P. 380.

বিদ্যুৎ-চালিত নলকূপের সাহায্যে সেচব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে প্রচলিত হইয়াছে। এ প্রথার সম্ভাব্যতা প্রচুর। কূপ দ্বারা সেচের ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, পঞ্জাব ও বোম্বাইতে প্রচলিত। কূপ দুই প্রকারের, অস্থায়ী (যেগুলি ২।১ বৎসর ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত হয়) এবং স্থায়ী।

(গ) **নলকূপ :** ভারতে নলকূপের সংখ্যা ২৫ লক্ষ এবং কূপের সাহায্যে কর্ষিত জমির শতকরা ছয় ভাগ সেচের জল পাইয়া থাকে। বেশির ভাগ কূপই বেসরকারী সাহায্যে খনিত হয় এবং তজ্জন্য কৃষককে 'তাকাবি' ঋণ দেওয়া হয় ও টেকনিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ৩৫৮১টি নূতন নলকূপ খননের জন্য ২০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে ১ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে জল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ—এই তিন প্রকার মিলাইয়া পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা (Minor Irrigation Works) নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহারা মিলিয়া নূতন ১ কোটি একর জমিতে জল-সেচ করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহাদের সাহায্যে আরও ৯০ লক্ষ একর জমি সেচসমন্বিত হইয়াছে।

(গ) **খাল :** খালই সেচের প্রধান উপায়। সাধারণত, সরকারী অর্থে সেচের খাল কাটা হয়। সেচের খাল তিন প্রকারের :—(১) নিত্যবহ খাল (Perennial cannal); (২) প্লাবন খাল (Inundation cannal); (৩) সঞ্চিত জলভাণ্ডার খাল (Storage canal)। নিত্যবহ খালগুলিতে বারমাস জল থাকে। ভারতের নিত্যবহ খালগুলিই প্রধান, যেমন সারদা খাল, সুক্কুর বাঁধ প্রভৃতি। যে নদী হইতে উহারা জল সরবরাহ পায় তাহার জলস্তর (water level) হইতে 'প্লাবন' খালগুলির তলদেশ উচ্চ। ফলে বর্ষা বা অন্য কোন কারণে উক্ত নদীর জল স্ফীত হইয়া উঠিলে তবেই সেই খালে জল প্রবেশ করিতে পারে, নচেৎ তাহারা শুষ্ক পড়িয়া থাকে। তাই কেবল বর্ষাকালেই এই সকল খাল কার্যকরী হয়, শীত ও গ্রীষ্মে উহারা জলবিহীন থাকে। উপত্যকার মধ্যে বাঁধ দিয়া 'সঞ্চিত খালের জলভাণ্ডার' সৃষ্টি হয়। নালা বা খাল কাটিয়া ঐ জল ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

খালগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, মুখ্য (major) ও ক্ষুদ্র (minor)। মুখ্য খালগুলি দুই প্রকারের, (ক) 'উৎপাদনশীল' (productive) ও

(খ) 'দুর্ভিক্ষ প্রতিষেধক' (productive)। যে খালগুলি নির্মাণকার্যের দশ বৎসরের মধ্যে পরিচালন-ব্যয় ও নিয়োজিত মূলধনের সুদ অর্জন করিতে পারে তাহাদিগকে 'উৎপাদনশীল' খাল বলে। আর যে খালগুলি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য নির্মিত হইয়াছে এবং যাহাদের নির্মাণের ব্যয় চলতি (current) রাজস্ব হইতে বা Famine Insurance Grant হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহাদের বলে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিষেধক' খাল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নির্মিত খাল আর্থিক দিক হইতে লাভজনক হয় নাই।

জলসেচ সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণা ছিল পুষ্করিণী, কূপ, নলকূপ বা খাল-খনন। কিন্তু ইহাতে মাত্র এক ধরনের কার্যেই জলশক্তিকে ব্যবহার করা যাইত। অথচ জলের সাহায্যে শুধুমাত্র জলসেচ ব্যতীত আরও বহু প্রকার কাজ করা যায়। এক একটি নদীর দুই তীরের অঞ্চলসমূহের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম কি ভাবে জলের সাহায্যে করা যায়, অর্থাৎ জলশক্তির সাহায্যে কি ভাবে বহুপ্রকার লাভ করা যায়, আধুনিককালে উহা লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। একটি উদ্দেশ্যের স্থলে বহু উদ্দেশ্যে নদীর জল ব্যবহারের প্রচেষ্টা হইতেছে—বন্যারোধ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মাল ও যাত্রী চলাচল, বিদ্যুৎ হইতে শিল্পোন্নয়ন, মৎস্য চাষ—সকল উদ্দেশ্য মিলাইয়া একটি পরিকল্পনার মাধ্যমেই বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধন করাকে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা বলে।' পরিকল্পনা কমিশন স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই সরকার এইরূপ অনেক পরিকল্পনার কার্য শুরু করিয়াছেন —বর্তমান এই প্রকার বহুসংখ্যক বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জলসেচের প্রসার (Progress of Irrigation under the Plans):

দেশ-বিভাগের সময়ে ভারতের অংশে যে-পরিমাণ জমি পড়ে, উহার মধ্যে ৪·৮০ কোটি একরে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পনা শুরু হওয়ার মধ্যে উহা বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫·১৫ কোটি একরে। অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে মোট কর্ষিত জমির ১৭·৫% জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় নূতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণ মোট ১·৫০ কোটি একর বৃদ্ধি পায়। বৃহৎ ও মাঝারি সেচব্যবস্থা দ্বারা ৬০ লক্ষ (ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ একরে পূর্বে ছোট সেচ-ব্যবস্থা ছিল) এবং ছোট খাট সেচ ব্যবস্থা দ্বারা ১ কোটি একত্র জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে কর্ষিত

জমির পরিমাণও বাড়ে। মোট কর্ষিত জমির অনুপাতে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে ২০% হইয়া পড়ে।

প্রথম পরিকল্পনা

প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব হইতে এবং প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট ৭২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মোট ৮০ কোটি টাকা পরিকল্পনা শুরুর পূর্বেই ব্যয় হইয়াছিল এবং পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৩০০ কোটি টাকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পূর্বে শুরু করা জলসেচের কার্য চালাইয়া যাওয়া ছাড়াও নূতন সেচ ব্যবস্থার জন্য ৩৯০ কোটি টাকার ব্যয় হিসাব করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই ১৭২ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনাতে বাকী ২১৮ কোটি টাকা লইয়া যাওয়া হইবে। নূতন ১৭২ কোটি টাকা এবং পুরাতন ২০৯ কোটি টাকা—মোট ৩৮১ কোটি টাকা—দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৃহৎ ও মাঝারি সেচ কার্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ। সিন্ধু নদে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার জন্য আরও ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় মোট ব্যয়বরাদ্দ ৪১৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। ইহা ছাড়া ছোটখাট সেচকার্যেও বহু অর্থ বরাদ্দ হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে জলসেচ খাতে ব্যয়বরাদ্দও সংশোধিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ মাঝারি ও ছোট সকল প্রকার সেচকার্য দ্বারা নূতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণ ২·১০ কোটি একর বাড়াইবার কথা হইয়াছে। সংশোধিত পরিকল্পনার ফলে এই হিসাবও কিছুটা সংশোধিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনাতে জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধার্য ব্যয় হইল ৬৬১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শুরু হইয়াছিল কিন্তু বর্তমানেও চালাইয়া যাওয়া হইবে এইরূপ কার্যসূচীর পরিমাণ হইল ৪৩৬ কোটি টাকা এবং নূতন প্রকল্পের জন্য ১৬৪ কোটি টাকা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৬১ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার নূতন কর্মসূচীর মধ্যে আছে: (ক) প্রায় ৯৫টি নূতন ও মাঝারি আকারের সেচব্যবস্থা, কৃষি এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন উভয় দিকেই ইহা সাহায্য করিবে; (খ) ১৯৬০ সালের সিন্ধুর জলের চুক্তি অনুযায়ী পঞ্জাবের বিয়াস নদীতে জল মজুত পরিকল্পনা; (গ) বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির জলসেচ অংশের কার্যসূচী সমাপ্ত করা।

সেচ পরিকল্পনার কয়েকটি ত্রুটির কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেচকার্যে ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে উচ্চ হারে জল কর, ভূমি-কর এবং বিদ্যুৎ কর প্রভৃতি আরোপ করা হইতেছে তাহাতে দেশের অনেক অঞ্চলে চাষীর মনে সেচ সম্পর্কে আশংকা দেখা দিয়াছে। উচ্চহারে বাধ্যতামূলক জল-কর আরোপ করিলে চাষী ফসল বাড়াইতে বাধ্য হইবে এই যুক্তি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নহে। জলসেচের ফলে বর্ধিত উৎপন্নের কত অংশ চাষীর হাত হইতে তুলিয়া আনিতে হইবে তাহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা দরকার। তাহা ছাড়া, সময় ও পরিমাণমত জল দেওয়া যখন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতেছে না তখন এইরূপ বাধ্যতামূলক কর আরোপণ সঠিক নীতি কি না তাহাও আলোচ্য বিষয়। আমাদের দেশে বড় বড় সেচব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বিদেশ হইতে লোক আনিতে হয়, দেশে এইরূপ কাজের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। ভারতের চাষীদের জল দিলেই হইবে না, জলের ব্যবহারও শিখাইতে হইবে। জলের অপচয় না ঘটাইয়া ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে জলের ব্যবহার শেখানো দরকার। চাষীরা বৃষ্টিপাতের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, বৃষ্টি হইলে জল নিতে চায় না এবং বৃষ্টি না হইলে একসঙ্গে সকল চাষী প্রায় এক-দুই দিনের মধ্যেই সকল জল তুলিতে চেষ্টা করে। এই অভ্যাসের পরিবর্তন দরকার। অবশ্য বাধ্যতামূলক জলকর বসাইলে এই অভ্যাসে পরিবর্তন আসিতে পারে। তবে সমবায় চাষ প্রথা প্রচলন করিলে চাষীর মনের এই সকল উৎকেন্দ্রিকতা দেশের কৃষি উৎপাদনে আর বাধা দিতে পারে না।

সেচব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি

জলসেচের অর্থনৈতিক প্রভাব ও জলকরের সমস্যা (Economic effects of irrigation Projects & problems of Irrigation tax) :

পূর্বে ইংরাজ আমলে কোন বিশেষ জলসেচ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা হইতে যে-পরিমাণ বেশি ভূমি-রাজস্ব আদায় করা যায়, তাহাই প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাব বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু একটি অঞ্চলের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ও কাজকর্মের উপর সেচব্যবস্থা বা বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার অর্থনৈতিক প্রভাব বহুদূর প্রসারী। অন্যত্র কাজ পাইতেছে না, এইরূপ বহু ব্যক্তির নূতন কর্মসংস্থান হয় অর্থোপার্জনের বহু নূতন পথ উন্মুক্ত হয়, দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে;

সেচব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রভাব শুধু সেচেই আবদ্ধ নয়

চাষীর, ব্যবসায়ীর, পরিবহন ব্যবস্থার মালিকদের কাজ ও আয় বৃদ্ধি পায়, কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারের আয়তন প্রসারিত হয় এবং বিক্রয় নিশ্চিত হইয়া উঠে। বীজবপন ও ফসল কাটার সময়ে কিছু পরিবর্তন আসে। নূতন ধরনের ফসল বোনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ওই অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের আমদানি, রপ্তানি ও বাণিজ্যহারে পরিবর্তন আসে। অঞ্চলটির শিল্প ও উৎপাদন-শক্তির প্রসার ঘটে। একটি প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাব হইল জমির দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং সেচাঞ্চলের জমিদারী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আয় বৃদ্ধি পাওয়া (জমির বর্ধিত দাম ও বর্ধিত ফসলের ভাগ পাওয়ার ফলে)।

প্রভাব বিচারে বড় সাবধানতা থাকা দরকার

সেচাঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রভাব বিচার করার সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেচব্যবস্থা গড়িয়া তোলার সময়ে মোট প্রভাবের মধ্যে তদানীন্তন উৎপাদনের বা কাজকর্মের প্রভাব জড়িত থাকে; সেচব্যবস্থা তৈয়ারি হইবা যাইবার পরে উহার স্থায়ী প্রভাবগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই মূলত দরকার। তাহা ছাড়া, প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রভাব, স্বল্পকালীন প্রভাব ও দীর্ঘকালীন প্রভাব, সকল কিছু পৃথক করিয়া বিচার করা প্রয়োজন।

জলকর আরোপের মাপকাঠি

জলসেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য রাষ্ট্র কি পরিমাণ সেচকর (Irrigation charges or water taxes) ধার্য করিবে তাহা নির্ধারণ করার জন্য কোনরূপ মাপকাঠি বা মানদণ্ড দরকার। (ক) পাশের শুষ্ক জমিতে ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণের সহিত জল-সিঞ্চিত জমিতে ব্যয় ও উৎপাদন-পরিমাণের তুলনা করিয়া জলসেচ হইতে লাভ বাহির করা যায়। এইরূপে হিসাব করা বর্ধিত আয়ের কত অংশ রাষ্ট্র তুলিয়া লইবে তাহা সরকারী নীতির উপর নির্ভর করে। (খ) আমেরিকার একটি বিখ্যাত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সেচব্যবস্থার ফলে জমির দাম কতখানি বাড়িল সেই হিসাব করিয়া সেচ-কর ধার্য করা উচিত।*

(গ) অনেকে বলেন যে, চাষীর কর প্রদান ক্ষমতার (ability to pay) উপর প্রভাবশীল এইরূপ বহু বিষয় একত্রে বিচার করিয়া জলকর ধার্য করা

* "The farmer's repayment should be fixed at the irrigation value. In addition, the farmer should be able to obtain the land title at unirrigated value, free from speculative increase." *Report of an Economic Survey of certain Federal and Private Irrigation Projects* (The Haw and Schmit Report P. 99)

উচিত, বিশেষ করিয়া, সেচব্যবস্থাটির যোগ্যতা, জমি ও জলের সঠিক ব্যবহার কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা, বিক্রয়-ব্যবস্থার পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, কিছুদিন অন্তর জলকরের হার ও করপ্রদান পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখাও দরকার।

উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধিই জলকরের উপযুক্ত মাপকাঠি

ইহার মধ্যে তৃতীয় নীতিকেই গ্রহণ করা ভাল, কারণ জমিতে ব্যয় ও উৎপাদনের সঠিক হিসাব কিছুতেই পাওয়া সম্ভব হইবে না। উপরন্তু, সকল জমি যদি সমবায়ী গ্রাম-পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে উহার দামের উপর বাজারী শক্তিসমূহ আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমরা তাই এই মানদণ্ড গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং বহু বিভিন্ন শক্তি মিলাইয়া গঠিত চাষীর কর প্রদান ক্ষমতাই এই বিষয়ে নিশ্চিত মান হওয়া উচিত। সেচব্যবস্থাদির ফলে জমির উপর দীর্ঘকালীন প্রভাব কি দাঁড়াইল তাহা জমি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যে এবং চাষীর অর্থনৈতিক উন্নতি হইতেই বুঝা যায়।

অনুশীলনী

1. What are the different types of irrigation that are to be found in the different parts of the country? Critically estimate their importance.
(C. U. B. Com, 1955)

2. Discuss the progress of irrigation in India.

3. Review the progress of irrigation in India under the Five Year Plans.

4. Discuss the economic effects of an irrigation project. What criteria should we use to fix water rates in an irrigated area?

৭

জমি ও চাষী : মালিকানাস্বত্ব

Land and cultivator : Land Tenure

বর্তমান ভূমিস্বত্ব কাঠামোর প্রকৃতি : অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক (The nature of present land tenure structure : a hindrancs to economic development) :

বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা লইয়া গঠিত ভারতের ভূমিব্যবস্থা বহু বিষয়ের সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ বর্তমানে পিরামিডের আকারে দাঁড়াইয়া আছে। প্রাক্-ব্রিটিশ সামন্ততন্ত্র (যেখানে রাষ্ট্র ফসলের কিছু অংশ দাবী করিত) হইতে শুরু করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে আধুনিকতম ধনতান্ত্রিক ধারণা ইহার মধ্যে মিশিয়া আছে।

রাষ্ট্র, মালিক, কিষাণ ও মজুর

ভাবতে রাষ্ট্র হইল সর্বোচ্চ-জমিদার (Super Landlord), উহার নীচে বহু স্তরের চাষীশ্রেণী—নিচের ব্যক্তির তুলনায় উপরের ব্যক্তির হাতে মালিকানা-সম্পর্কিত দলিলটি আইনের চক্ষে একটু বড় বা উঁচু ধরনের—এই কাঠামোতে ভারতের কৃষিকার্য চলিতেছে। উপরের শ্রেণীর কাজই হইল ঠিক পরবর্তী নীচু শ্রেণীর নিকট হইতে টাকায় বা ফসলের হিসাবে উৎপাদনের কিছু অংশ আদায় করা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাষ্ট্রের নিচে তিন শ্রেণীর লোক লইয়া এই স্বত্বকাঠামো (tenure structure) দাঁড়াইয়া আছে : মালিক, যাহারা প্রধানত চাষের কাজ না করিয়া খাজনা আদায় করে ; কিষাণ, যাহারা প্রধানত কোন না কোন স্বত্বের বা দলিলের সাহায্যে নিজের জমি চাষ করে বা কিছুটা অন্যকে দিয়া করাইয়া লয় ; এবং কৃষি-মজুর, যাহারা প্রধানত অপরের জমি চাষ করে এবং উহার বদলে ফসলের অংশ বা নগদ টাকা পায়।

পিরামিডের আকারে গঠিত এই ভূমিব্যবস্থার মূল কথা হইল উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ যাহারা উৎপাদন করে না এইরূপ লোকের হাতে চলিয়া যায় এবং তাহা জমির বা কৃষি-যন্ত্রপাতি উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয় না। উৎপাদনের কাজে আসে না এইরূপ অনুৎপাদক শ্রেণীর ভরণপোষণের ভার হইল উৎপাদক শ্রেণীর হাতে। উৎপাদক শ্রেণীর ভূমিস্বত্ব নীচু স্তরের এবং

অনিশ্চত ধরনের বলিয়া (inferior and insecure property rights) জমিতে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কথা তাহারা চিন্তাও করে না এবং তাহার উদ্বৃত্ত অপহরণের পর এইরূপ কোন ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট থাকে না। দেশের বর্ণভেদ প্রথার সঙ্গে জড়িত হইয়া এই ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ভারতের সামাজিক পরিবেশে সামন্ত-যুগীয় অনড়তা ও অচলতা আনিয়া দিয়াছে। চাষের কাজ বা কোনরূপ শ্রমের কাজই নিম্নবর্ণের বা নিম্ন জাতির কর্তব্য, এই মজ্জাগত ধারণা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে বিপুল বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় সকল শ্রেণীর লক্ষ্যই হইয়াছে শ্রম বা উৎপাদনী কাজ না করিয়া উহা হইতে কতটা দূরে থাকিয়া সামাজিক পদ মর্যাদার সিঁড়ির উপরের কোন্ ধাপে উঠিতে পারা যায়।

এই পিরামিডের অর্থ নৈতিক তাৎপর্য

উৎপাদনের কত বিরাট অংশ অনুৎপাদক শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায় তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে। ১৯৪৯-৫০ সালে কৃষি হইতে মোট ৪৮০০-এর কোটি টাকার জাতীয় আয় সৃষ্টি হইয়াছিল ধরা হয়। খাজনার হার নীট উৎপাদনের ১০% হইতে ৬০% মধ্যে ধরা চলে। মালব্যের মতে খাজনার পরিমাণ ৩৩% হইতে ৭৫%-এর মধ্যে।* চাষীদের খাজনার গড় হার উহাদের নীট আয়ের ২৫% ধরিয়া লইলে, দেশে মোট খাজনার পরিমাণ ছিল বৎসর ১২০০ কোটি টাকা।†

উৎপাদক শ্রেণীর হাত হইতে উদ্বৃত্তের অপহরণ

এইখানেই হিসাব ক্ষান্ত করিলে চলিবে না। চাষীর নিকট হইতে বে-আইনী বহু রকমের আদায় যে কি পরিমাণ হইতেছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ফসলের অর্ধেক দিয়া ভাগচাষীরা চাষ করে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে, বোম্বাই-এ, নীট উৎপাদনের কত অংশ তাহাতে দেওয়া হইল, কে তাহার হিসাব করিবে? ঠিকা-চাষী ও স্বেচ্ছা-চাষীর নিকট হইতে কতখানি খাজনা এবং বেআইনী আদায় চলে তাহার হিসাব করাও চলে না। মালব্য ইহাকে

কিরূপে এই ভূমি-ব্যবস্থা উন্নয়নকে ব্যাহত করে

* *H. D. Malaviya*, Land reforms in India A. I. C. C. Publication, P. 450.

† এই হিসাব খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা মালব্যের উপরোক্ত বই হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়: "Professor Brijnarayan calculated that the landlords in the Punjab took as much as 80 per cent of the net produce of tenant under the batai system of cultivation. In bombay, the rents ranged between 40 and 60 per cent of the net produce". P. 36.

১০০ কোটি টাকার বেশি হইবে বলিয়াছেন এবং তাঁহারই মতে "ইহা কমের হিসাব" ("this was an underestimate")। উচ্চ সুদের হারের দ্বারা, গ্রামে মুদির দোকান-পাট স্থাপন করিয়া, বন্ধকীর দোকান খুলিয়া ইহারা যে পরিমাণ আদায় করে, তাহা যোগ করিলে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা খুব সুখের নিশ্চয়ই বলা চলে না। বিনিয়োগ-যোগ্য অর্থাভাবের দরুন যখন পরিকল্পনাতে বাৎসরিক বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭% হইতে ১১%-এ ওঠানো সম্ভব হইতেছে না তখন অনুৎপাদক শ্রেণীই জাতীয় আয়ের ১২% অপহরণ করিতেছে ; অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাইবে কিরূপে ? ইহাই সমাজের প্রধান সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (chief potential economic surplus)। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা, জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করিলে তবেই এই উদ্বৃত্ত বিনিয়োজিত হইয়া জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বা ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়াইতে পারে। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ যাহা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পিছন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে তাই "অনুন্নতির ধারক" বা অগ্রগতির "সংকোচক" (depressor) বলা হইয়াছে। এই "দমক" বা "সংকোচকের" অপসারণই অর্থনৈতিক প্রসার পরিকল্পনার প্রথম কাজ।*

ভূমিস্বত্ব সংস্কার ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Land Reform and Economic Developmement in India)

ভারতের গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বন্ধ করিতে না পারিলে দেশের শিল্প প্রসার কখনই সম্ভব নয়। খাদ্য, কাঁচামাল প্রভৃতির উৎপাদন-ক্ষেত্র এত অনুন্নত রাখিয়া কখনই বিরাট শিল্প কাঠামো গড়িতে পারা যায় না। দেশে শিল্প বিস্তারের উপযুক্ত অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইলে, শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইলে এবং কৃষি ও শ্রমিকের মনে আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অবিলম্বে কৃষি হইতে জমিদারী ও সকল মধ্যস্বত্ব অপসারণ করা দরকার। এই

সংস্কার খুবই প্রয়োজন

বিষয়ে জাতিসংঘের একটি কমিটি বলিয়াছেন যে, দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা "উচ্চ খাজনা বা সুদের হার চাপাইয়া চাষীর জীবন যাত্রার মান

* "This complex of legal, economic and social relations uniquely typical in the Indian countryside served to produce an effect which I should like to call that of a built-in "depressor" .... It is difficult to see how India's current plans for economic development can get very far without a concerted effort to remove the depressor". *Daniel Thorner.* The Agrarian Prospect of India. P. 13.

কমাইয়া দিতে পারে; অগ্রসর হইবার সুযোগ ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে; কোন স্থায়িত্ব (security) না থাকায় বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; ভালভাবে চাষের পক্ষে খুব ছোট বা প্রগাঢ়ভাবে চাষের পক্ষে বড় কৃষিক্ষেত্রগুলি জিয়াইয়া রাখিতে পারে।"*

ভারতের দ্রুত শিল্পপ্রসারের গতি-পথে আমরা একপ্রকার দুষ্ট-চক্রের প্রভাব দেখিতে পাই। জাতীয় সঞ্চয় বা মূলধন-গঠনের পরিমাণ দ্রুত বাড়ানো দরকার, কিন্তু জনসাধারণের হাতে ক্রয়শক্তি না বাড়িলে এইরূপ মূলধন-গঠন সম্ভব হয় না, এবং কৃষিসংস্কার ও শিল্পপ্রসার না ঘটাইলে দেশের ক্রয়শক্তি বাড়িতে পারে না। দেশের চাষীরা ক্রমশ গরীব হইতে থাকিলে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত থাকে; শিল্প-প্রসারের প্রথম যুগেও দ্রব্য সামগ্রী অবিক্রীত থাকিয়া এই প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয়।

কৃষি সংস্কারই শিল্পোন্নয়নের প্রধান শর্ত

যতদিন জমিতে ব্যক্তিগত মালিকদের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে এবং ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে ততদিন কৃষির উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না। তাই কৃষির উন্নয়ন শিল্প বিস্তারের একমাত্র প্রথম স্তর। বর্তমানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িতেছে, কিন্তু দেশের মধ্যে বিক্রয় হইতেছে না। তাই বিদেশে বিক্রয় করার চেষ্টা চলিতেছে। অবিক্রীত বিদ্যুৎশক্তি রপ্তানি করা যায় না বলিয়া পড়িয়াই আছে। চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হইতেছে না, কারণ আখ উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণ (quality) কমিয়া গিয়াছে। খাদ্যসমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে, খাদ্যের আমদানি বৈদেশিক মুদ্রা সংকট বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অসম্পূর্ণ কৃষিবিপ্লব বা কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের অবস্থান দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে প্রতি পদে বাধা হতেছে।

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ভারত কৃষি-বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা মনে রাখা দরকার। একটি উদাহরণ দিলে ইহা বুঝা যাইবে। আমরা জানি যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হইল, নূতন তৈয়ারি ভারি শিল্প হইতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কোথায় যাইতেছে? বলা যায়, আমাদের

* **Land Reform, Defects in Agrarian Structure as obstacles to Economic Development. U. N, 1951. P. 5.**

চলতি প্রয়োজন মিটাইতে উহা ব্যবহৃত হইতেছে, আমদানি করার প্রয়োজন আর নাই। কিন্তু ক্রমে উহাদের উৎপাদন আরও বাড়িবে, এবং সেই সকল ইস্পাত, সিমেণ্ট বা মূল ধাতু ও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী কল-কারখানা নিশ্চয় তৈয়ার করিতে হইবে, অথবা সারাজীবন উহাদের গুদামে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হইবে। তখন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে। কিন্তু এই নূতন তৈয়ারি ভোগ্য দ্রব্যগুলি যাইবে কোথায়? এই কারণেই কি তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব বাড়াইবার কথা ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই? আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করা তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই একান্তভাবে দরকার হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে হইলে ভারতের কৃষিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন এই কারণেই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে যন্ত্রযুগ শুরু হইতেছে, সেই যন্ত্র নিজের তাগিদেই সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া নিজের নিয়োগের পথ যথাসম্ভব শীঘ্র বাহির করিয়া লইবে, তাই এই পরিবর্তন আসন্ন। কেবলমাত্র মধ্যস্বত্ববিলোপের আইন করিয়া এই গুরুতর পরিবর্তন আসিবে না ইহাও বুঝা যায়, কারণ সরকারের প্রতিটি আইনই জমিদারেরা ফাঁকি দিয়াছে, ভূমিসংস্কার আইনগুলির ফলে গ্রামের উৎপাদনসম্পর্কগুলিতে পরিবর্তন আসে নাই বলিলেই চলে।* প্রশ্ন হইল, এই পরিবর্তন কাহাদের নেতৃত্বে হইবে? মালিকেরা একত্র হইয়া সমবায়ের নামে যৌথ মালিক সমিতির আকারে কৃষিতে পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে অথবা প্রকৃত চাষীদের নেতৃত্বে তাহাদের মালিকানায় সমাজতান্ত্রিক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে? এই প্রশ্নই আজিকার দিনে ভূমিস্বত্ব সংস্কারের মূল দিক-নির্ণয় করিতেছে।

শিল্পপ্রসার দরকার, কিন্তু বাজার কই?

---

* "Land reform laws ostensibly passed for the benefit of the underprivileged have not basically altered India's village structure. The small minority of oligarchs have had wit and resource enough to get around these laws in which, in any event, the loopholes were so large as to give them ample manoeuvering ground. By passing themselves off, whether legally or illegally, as tillers and cultivators, the village oligarchs have gone on running India's rural life. Their uninterrupted presence in power means that the forces of the "depressor" continue to operate strongly in the country side," *Daniel Thorner*, The Agrarian Prospect of India.

ভূমিসংস্কারের কার্যসূচী ও অগ্রগতি (Programme and Progress of land Reforms in India)

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে ভূমিসংক্রান্ত বহু আইন-কানুন রচিত হইয়াছে। বাংলা দেশে ১৮৫৯ সাল হইতেই ইহার শুরু। এই সকল আইনে প্রধানত জমিদারের অত্যাচর হইতে চাষীকে রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রচেষ্টার কোনটিই বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ হইল, গ্রামাঞ্চলের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক শক্তিকেন্দ্রগুলি না ভাঙিলে, জমির উপর একচেটিয়া মালিকানার প্রভাব হ্রাস না করিলে এবং দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিয়া জমির উপর নির্ভরশীলতা না কমাইলে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আইনের দ্বারা প্রজার উপকার করা সম্ভব হয় না।

স্বাধীনতার পূর্বে কৃষি-সংস্কার সম্ভব হয় নাই

ভারতীয় কৃষির এই অবস্থা দূর করার জন্য বহুদিন হইতেই জাতীয়তাবাদী নেতারা জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের দাবী করিয়া আসিয়াছিলেন। বাংলার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, রাজস্থানের জায়গীরদার, মধ্যপ্রদেশের মালগুজার, পঞ্জাবের বিশ্বেদার, কাশ্মীরের ইলাকদার, ইহাদের কাহারও কৃষি-উৎপাদনের ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় যোগ ছিল না। ইহারা অর্থ নৈতিক দিক হইতে শোষণ-কারী পরভোজী এবং দেশের অর্থ নৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুন্নতির ধারক, ইহাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী। এই কথা বলিয়াই ভারতের দরিদ্র নিরক্ষর চাষীকে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনা সম্ভব হইয়াছিল এবং স্বাধীনতার পরে চাষী জমির মালিক হইবে, মধ্যস্বত্ব লোপ পাইবে, খাজনার হার কমিবে, রাষ্ট্রের সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, এই সকল কথা বলা হইয়াছিল।

স্বাধীনতার পূর্বে কৃষি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কারের কার্যসূচীগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। ইহার মধ্যে প্রথম হইল অতীতকালের চিহ্ন হিসাবে প্রাপ্ত কৃষিকাঠামো হইতে উদ্ভূত কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির বাধাগুলির অপসারণ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল কৃষিব্যবস্থায় শোষণ ও সামাজিক অবিচারের সকল চিহ্ন দূর করিয়া প্রকৃত চাষীকে জমির নিরাপত্তা দেওয়া এবং গ্রাম্য জনসাধারণের সকল অংশকে সমান সুবিধা ও সম্মানের অধিকারী করা।

স্বাধীনতার পরে ভারতে ভূমিসংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার প্রধান কার্যসূচীকে এইরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় :

(১) মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপসাধন : এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান। (২) জমিদার প্রজা ব্যবস্থার সংশোধন : এই উদ্দেশ্যে ন্যায্য খাজনা (fair rent) স্থির করা। যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি জমিদার নিজে ব্যক্তিগত চাষের জন্য পাইবে সেখানে প্রকৃত চাষীদের স্থায়ী স্বত্ব দিবার ব্যবস্থা করা। যে জমি জমিদারের হাতে রহিল না সেখানে সরাসরি চাষীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং চাষীকে সেইরূপ জমির মালিক করা। (৩) জমির বণ্টন করা : এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ জমির মালিকানা ও বর্তমান জোতের উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করা (placing ceilling upon future acquisition and existing holding)। উর্ধ্ব-সীমার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত জমিগুলিও ভূমিহীন কৃষি-মজুরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং অনর্থনৈতিক ছোট ছোট জোত-এর (uneconomic small holdings) আয়তন বাড়ানো। (৪) বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডীকৃত জোতগুলিকে একত্র করা : যাহাতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা পাওয়া যায়; এই উদ্দেশ্যে যাহাতে ভবিষ্যতে জমির খণ্ডীকরণ না হয় সেই ব্যবস্থা করা। (৫) সমবায় চাষ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা : এই উদ্দেশ্যে ছোট ছোট জমিখণ্ডগুলি একত্র করিয়া যুক্তভাবে চাষের ব্যবস্থা করা, যাহাতে বৃহৎমাত্রায় চাষের ব্যয়সংকোচগুলি পাওয়া যায়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমবায় গ্রাম পরিচালনা গড়িয়া তোলা।*

ভূমিসংস্কারের উপরোক্ত কার্যসূচী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতদূর কার্যকরী করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা দরকার।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সম্পর্কে দেখা যায়

* 'Land reform programmes, which were given a place of special significance both in the first and in the second Plan, have two specific objects. The first is to remove such impediments to increase in agricultural production as arise from the agrarian structure inherited from the past. This should help to create conditions for evolving as speedily as possible an agricultural economy with high levels of efficiency and productivity. The second object, which is closely related to the first, is to eliminate all elements of exploitation and social injustice within the agrarian system, to provide securities for the tiller of the soil and to assure equality of status and opportunity to all sections of the rural population." *Third Five Year Plan*, P. 220.

যে, সমগ্র ভারতে জমিদারী, জায়গীরদারী এবং ইনামদারী প্রভৃতি দ্বারা দেশের ৪০% পরিব্যাপ্ত ছিল। ইহার সম্পূর্ণ অবলোপ করা হইয়াছে। এই সকল সংস্কারের ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে দুই কোটি প্রজার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নতি আসিয়াছে।

মধ্যস্বত্ব বিলোপ

অনেকগুলি রাজ্যসরকারেরই উপযুক্ত খাজনা বিভাগ (Revenue department) ছিল না। গত কয়েক বৎসরে তাহারা রেভিনিউ বিভাগ ক্রমশ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দানে বহু বিলম্ব হইতেছে; ৬৭০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ১৬৪ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে, প্রধানত সরকারী বণ্ডের আকারে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাব বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনাকালের মধ্যে ক্ষতিপূরণের জন্য বণ্ড দেওয়ার কাজ শেষ করিতে হইবে এবং জমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিল ও কাগজপত্রের কাজ কর্ম অসম্পূর্ণ রাখা চলিবে না।

ক্ষতিপূরণ দান

প্রজাস্বত্ব সংস্কার (tenancy reforms) সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু কাজ করা হইয়াছে। খাজনার হার সম্পর্কে পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে যে, ইহা স্থূল উৎপাদনের (gross produce) $\frac{1}{4}$ অথবা $\frac{1}{5}$ অংশের বেশি হইবে না। সকল রাজ্যেই খাজনার হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন রাজ্যের খাজনার হারের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।*

খাজনার হার

জমিতে প্রজাদের স্বত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এগারটি রাজ্য এবং সকল কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, চারিটি রাজ্যে আইন সভার সম্মুখে বিল উপস্থিত আছে, শীঘ্রই উহা পাস হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, এই সকল আইনের সাহায্যে প্রজাদের স্বত্ব বা অধিকার স্থায়ী করা সম্ভব হয় নাই, জমিদারগণ অবাধে তাহাদের উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

স্বত্বের স্থায়িত্ব

---

* **"In some states, as in Gujarat, Maharashtra and Rajasthan, the maximum rent now stands at one sixth of the produce. In Assam, Kerala, Orissa and Union Territories, the rate payable is only one fourth of the produce or less. In several states, the normal level of rent is still about a third of the produce. It is to be hoped that in these states rents will be reduced to the level envisaged in the first two plans so as to facilitate more rapid improvement in the economic conditions of tenants."** ***Third Five Year Plan*, P. 222.**

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদের পরে প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা দেওয়া হইবে। রাজ্য সরকারসমূহ এই বিষয়ে বেশি অগ্রসর হন নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজ্য-সরকার আইন পাস করিলেও অধিকাংশ চাষীর পক্ষে জমি কেনা সম্ভবপর হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহা ত্বরান্বিত করার কথা বলা হইয়াছে।

ভূমি বণ্টন

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য জমির হিসাবপত্র করা দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হইয়াছে, পারিবারিক জোতের তিনগুণ পরিমাণ জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করা উচিত (ceiling at three family holdings)। এই বিষয়ে প্রায় সকল রাজ্যসরকার আইন পাস করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে উহার পরিমাণ ২৫ একর। বিহার, মাদ্রাজ ও মহীশূরে এইরূপ বিল উপস্থাপিত হইয়াছে।

জোতের উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করা

আইন পাস করার পর এই বিষয়ে প্রধান কাজ হইল ইহাকে দ্রুত কার্যকরী করিয়া তোলা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাই বলা হইয়াছে।*

বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডীকৃত জমিগুলির একত্রীকরণ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই, কারণ জমিদারী উচ্ছেদ ও চাষীকে স্বত্ব প্রদানের কাজ শেষ করা যায় নাই। ঐ সকল আইন জমিদারেরা ফাঁকি দিয়াছে বলিয়া এখনও জমিদারেরা একত্রীকরণে বাধা দিতে পারিতেছে। তবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ এই বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৫৯ ৬০ সালের শেষে প্রায় ২৩ মিলিয়ন একর জমির একত্রীকরণ হইয়াছে এবং আর ১৩ মিলিয়ন একরে এই বিষয়ে কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল আরও ৩০ মিলিয়ন একর জমিতে একত্রীকরণ করা।

ভূমিখণ্ডের একত্রীকরণ

সমবায় চাষ সম্পর্কে পৃথকভাবে এখন পর্যন্ত কোন রাজ্য সরকার আইন

* "As stated earlier, the impact of tenancy legislation on the welfare of tenants has been in practice less than was hoped for. One of the principal reasons for this is that in a number of states ejectments of tenants have taken place on a considerable scale under the plea of voluntary surrenders." *Third Five Year Plan* P 224

প্রণয়ন করে নাই। তবে চাষীরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সমবায়সমিতি স্থাপন করিলে খাজনার হার, জল ও সারের দাম, সরকারী উপদেষ্টার সাহায্য, ট্রাক্টর ব্যবহারের সুযোগ প্রভৃতি সুবিধা দেওয়া হইবে, কয়েকটি রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে (যেমন পশ্চিমবাংলা এইরূপ বলা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

সমবায় চাষ

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কারগুলির বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন: "Yet, the total impact of land reform has been less than had been hoped for. For this there are several reasons. *In the first place*, there has been too little recognition of land reform as a positive programme of development and it has been only too often regarded as extraneous to the scheme of community development and the effort to increase agricultural production. *Secondly*, there has been insufficient attention to the admistrative aspects of land reform. Frequently, at the lower levels of the administration collusion and evasion have gone unchecked and there has been failure also to enlist the support and sanction of the village community in favour of effective enforcement of legal provisions. *In the third place*, it has not been sufficiently realised that the reform of land tenures and the early enforcement of ceilings are an essential foundation for the building up of the co-operative rural economy."[*]

ভারতে ভূমিসংস্কারের সমালোচনা (A Critique of Indian Land Reforms)

ভারতের যে কোন ভূমি সংস্কার আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, আইন সভায় বিল পেশ করা হইতে শুরু করিয়া সেই আইন পাস হইতে প্রচুর সময় প্রয়োজন হয়। তাহাতে সেই আইনের কার্যকারিতা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। যুক্তপ্রদেশে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে আইন সভা জমিদারী উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ করিয়া একটি কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করে। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে কমিটি উহার রিপোর্ট দেয়। ১৯৪৯ সালের জুন

বেশি সময়ক্ষেপ হওয়ায় আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য

---
* *Third Five Year Plan, p. 221.*

মাসে আইন সভায় জমিদারী উচ্ছেদের বিল আসে। বিতর্ক, আন্দোলন ও সংশোধনের নিয়মিত পদ্ধতির মধ্য দিয়া সেই বিল শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে পাস হয়। তাহার পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রণাক্রমে রাষ্ট্রপতি উহাতে সম্মতি দেন। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আনিবার সময় বিপদ ঘটে। যেমন হিমাচল প্রদেশে, ১৯৫৩ সালের প্রথমেই জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাস হইয়া রাষ্ট্রপতির নিকটে সম্মতির জন্য প্রেরিত হইল। কয়েকমাস ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, বিলের কয়েকটি ধারা কিছু নরম করা ভাল। শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হিমাচলপ্রদেশ আইন দিল্লীতে পাঠাইবার প্রায় এক বৎসর পরে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া মুক্তিলাভ করে*।

এত দেরী হইলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে জমিদারদের বিচ্যুত করা কোনমতে সম্ভব হয় না। উঁচুদরের মালিকানা স্বত্ব যাহার আছে সে নিজের পরিবারের লোকের নামে, বিশ্বাসী চাকরবাকরদের নামে জমিদারী ভাগ করিয়া দিয়া, এবং অবশিষ্ট জমি নিজের আত্মীয়স্বজনকে প্রজা হিসাবে দেখাইয়া, বহুপ্রকার কাগজপত্র পাল্টাইয়া, ভাগচাষী ও প্রজাদের ভয় দেখাইয়া, ভৃত্য হিসাবে সাজাইয়া প্রায় পুরা জমিদারী পূর্বের ন্যায় রক্ষা করিতে পারে। বহুদিনকার প্রজা ও ভাগচাষীরা জমি হইতে উৎখাত হইয়া যায়, চিরাচরিত স্বত্ব করিতে পারে না। ভারতে জমিদারী উচ্ছেদের আইনগুলি প্রধানত এই পথে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও

---

* এইরূপে আইন পাস হইলেই সেই অনুযায়ী সংস্কার কার্য শুরু হইবে এমন কথা নাই। ৪ বৎসর ধরিয়া যে আইন বিহারে পাস হইল সেই আইন প্রয়োগ করার সময়েই বিহারের জমিদারেরা আদালতের আশ্রয় লইল। জমিদার পক্ষ জয়ী হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধন করিলেন। জমিদারপক্ষ সুপ্রীম কোর্টে গেল এবং এইবার তাহারা পরাস্ত হইল। বিহার সরকার সেই আইন কার্যকরী করিতে উদ্যত হইলে জমিদারেরা আবার ছোট আদালত হইতে শুরু করিয়া সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত ধাবিত হইল। জমিদারেরা মামলায় হারিয়া গেল। ১৯৫২ সালে তৃতীয় বারের মত যখন আইন কার্যকরী হইতে গেল, তখন জমিদারপক্ষ অসহযোগিতা করিয়া জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারের হাতে দিতে সরাসরি অস্বীকার করিল। সরকারী কর্মচারীরা তখন নিজেরাই এই সকল কাগজপত্র তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিল। ইহার পরে যখন জমিদারদের উপর জমিদারী ছাড়িয়া দেওয়ার সরকারী নির্দেশ আসিল, তখন জমিদারেরা আদালতে কিছুদিন সময় চাহিল : ইহাতে আবার দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এইরূপে মাত্র আট বৎসর সময়ের দরকার হইয়াছিল।

সামাজিক শক্তিকেন্দ্রগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই. গ্রামাঞ্চলের মধ্যস্বত্ব লোপ পায় নাই, বণ্টনের উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় নাই। ভূমিহীন চাষী জমি পায় নাই, প্রকৃত চাষী কোন চাষস্বত্ব পায় নাই, অবস্থা পূর্বের তুলনায় খারাপ হইয়াছে, কারণ জমিদারেরা পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশি সংঘবদ্ধ ও সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা চাষ করে না, সেই জমিদার শ্রেণীর হাতে কিছু জমি নিজে বা প্রজা বা মজুরের সাহায্যে চাষ করাইবার অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে সকল ভূমি সংস্কার আইন বিফল হইয়া গিয়াছে।*

যাহারা নিজে চাষ করে না, তাহাদেরও চাষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে বিচার করিলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া খুবই অনুচিত হইয়াছে বলা চলে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রভূত অর্থ দরকার—এই অবস্থায় অনুৎপাদক শ্রেণীর হাতে এত অর্থ দেওয়া কিছুতেই অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়াইতে পারে না।†

ক্ষতিপূরণের ভার চাষীর উপরই পড়িয়াছে

* 'In sum, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition Act has provided for a new hierarchy of tenure-holders in place of the old one; but the two are all too recognizably similar. At the top are the bhumidars, below them the sirdars, and still futher down the asamis. At the bottom of the heap remain the mass of cropsharers and landless labourers. The zamindars have disappeared but those same persons have been confirmed as landholders often of very substantial tracts of the best quality of land. Intermediaries as such are not allowed and the leasing out of land is prohibited. But it is possible to retain the status of a "cultivator," while tilling solely with the labour of hired workers, or by giving out one's field to cropsharers. For the great bulk of the peasantry who were classified as sirdars the tenure remains substantially the same, the rent remains exactly the same, and the most important new feature is that the rent is collected by Government rather than by the zaminder"—*Daniel Thorner:* Agrarian Prospect of India p. 25.

† উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থের অভাবের দিকে তাকাইয়া বিবেচনা করা দরকার যে, ক্ষতিপূরণের হার কঠোরভাবে কমানো দরকার কি না। মোট টাকার পরিমাণ ৬৭০ কোটি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের প্রায় ২৫%—ইহা খুবই বেশি এবং ভবিষ্যতের কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজ্য সরকারের তহবিলসমূহের গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়া থাকিবে। কয়েকটি রাজ্যে ২০, ৩০ এমন কি ৪০ বৎসর পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। *H. D. Malaviya:* Land reforms in India P. 435. "Compensation at current values will lead the present tenants with considerable debts."—*Kenneth H. Parsons,* Pofessor of Agricultural Economics in the University of Wisconsin, U. S. A., P. 436.

প্রজা উচ্ছেদের অভিযান সুরু হওয়ার ফলে জমিদারের হাতে পূর্বাপেক্ষা বেশি জমি আসিয়া গিয়াছে। নিজেরা বা মজুরের সাহায্যে চাষ করিতে পারিবে এই অবস্থা থাকায় বহুদিনকার প্রজার হাত হইতেও জমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে জমিতে বৃহদায়তন চাষব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, চাষী-উচ্ছেদের সেই ঐতিহাসিক ধারা-পথেই ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সঠিকভাবে হইতে পারিতেছে না, কারণ দেশে প্রকৃত শিল্পের প্রসার ঘটে নাই এবং সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের কার্য সম্পূর্ণ হয় নাই। দেশের ভূমিসংস্কার আইনসমূহ সামন্ততন্ত্রকে পূর্ণ উচ্ছেদ না করিয়া উহাকে ধনতান্ত্রিক রূপদানের চেষ্টা করিতেছে, পুরানো কাঠামোতে নূতন চরিত্র গড়িয়া উঠিতেছে।

প্রজা উচ্ছেদ ও গ্রাম্য বেকারির পরিমাণ বৃদ্ধি

দেশে শিল্পপ্রসার দ্রুত না হইলে ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিতে পারে না, এই চাপ গ্রাম্য বেকারির রূপে প্রকাশ পায়। এই বেকারি যতদিন থাকিবে ততদিনই চাষীর খরচায়, কম মজুরিতে অথবা বেশি খাজনায় জমিদার চাষ করাইয়া লইতে পারিবে: নিছক মালিকানার জোরে চাষীর হাত হইতে 'উদ্বৃত্ত' শস্য অপহরণ করিয়া লইতে পারিবে। তাহা ছাড়া দেশের মধ্যে যতদিন ট্রাক্টরের উৎপাদন শুরু না হইবে, সস্তায় জলসেচ ও ঋণ পাওয়া না যাইবে, জমির একচেটিয়া মালিকানা ভাঙিয়া জমি সস্তা না হইবে, ততদিন জমিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হইবে না—ছোটখাট বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু হইলেও অধিকাংশ অঞ্চলেই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিরাজ করিতেছে।

এই আইনগুলি ধনতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করে নাই

সরকারী কৃষিসংস্কার আইনগুলি যতই ভাল হউক না কেন উহা কার্যকরী করা কখনই ভালভাবে হয় না, কারণ উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ একদল ব্যক্তির নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ছাড়া ইহা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকেন্দ্র এমনই রহিয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই শক্তিবিন্যাসকে মানিয়া এবং উহার সহিত নিজেকে মানাইয়া চলিতে বাধ্য হয়। যতদিন না পর্যন্ত গ্রাম-জনতা স্বাধীনতার বিদ্যুৎস্পর্শে সকল শোষণ ও বাধা দূর করিয়া উঠে, নিজ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া

পুরাতন অর্থনৈতিক সামাজিক শক্তি কেন্দ্র বজায় রাখিয়াছে

না উঠে, নিজেই নিজের চালনশক্তি সৃষ্টি করিতে না পারে, ততদিন অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী ভূমি বিপ্লব সফল হইতে পারে না।*

জোতের ঊর্ধ্ব-সীমা নির্ধারণ (The Problem of Land ceilings):

জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা উচ্ছেদের পর রাষ্ট্রের সঙ্গে চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। জমিতে যাহাতে একচেটিয়া মালিকানা পুনরায় গড়িয়া উঠিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন জোতের ঊর্ধ্ব সীমা নির্ধারণের কথা বলিয়াছেন। অর্থনৈতিক জোত বা পারিবারিক জোতের (economic holding or family holding) পাঁচগুণ পর্যন্ত এক ব্যক্তির মালিকানায় থাকিতে পারিবে এইরূপ সুপারিশ করিয়া ইহার কার্যকরী করার ভার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।†

ভারতে ব্যক্তির হাতে জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহু ধরনের যুক্তি দেখানো হইতেছে। প্রথমত, বলা হইতেছে যে, জোতের ঊর্ধ্ব-সীমা স্থির করিলে বড় বড় ফার্মগুলি ভাঙিয়া যাইবে, ছোট ছোট খণ্ড-ছিন্ন জোতের উদ্ভব হইবে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত, বড় জমিদারের সংখ্যা কম এবং তাহাদের হাতে জমির পরিমাণ এমন বেশি নয় যে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া নিঃস্ব চাষীদের হাতে খুব বেশি জমি দেওয়া যাইবে। জমিহীন কৃষি-মজুরের পরিমাণও বেশি কমিবে না।

বিরুদ্ধ যুক্তিসমূহ

* "The bigger landlord has ways which conform with those of the moneylender, and indeed, as we have said, he is often the moneylender or trader himself. The village headman is often drawn from the same class, and it is usual for these to have connexions which link them not only to the sources of finance but to the seats of administrative power. Subordinate officials, revenue and other—including those of the relatively low-paid co-operative department—have no alternative but to stay with these village leaders, and be dependent on them for ordinary amenities when they visit the village or come in it for few days. In this and other ways is initiated a process of association with those who wield power and influence in the village and who for that reason have their own use as the local instruments of an adminstration which resides in town and cities and which in various degrees is inaccessible to the ordinary villager..... frequently the directions merely remain on paper, especially when they involve some disadvantage to the more powerful in the village. *All India Rural credit Survey:* The General Report P. 277-8.

† ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্স্টিটিউট-এর জাতীয় নমুনাঅনুসন্ধান-এর বিবরণী হইতে এই যুক্তির স্বপক্ষে তথ্য সরবরাহ করা হইতেছে। 'প্রতিটি পরিবারকে কিছু পরিমাণ, অন্তত ২ একর

তৃতীয়ত, ব্যক্তির হাতে ভূমিগত আয় বা গ্রাম্য আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া জোতের ঊর্ধ্ব-সীমা কিরূপে স্থির করা যায়? বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উর্বরতা, জলবায়ু বা জলসেচ ব্যবস্থাতে (অর্থাৎ একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণে) এত পার্থক্য থাকে যে, সমান একরের হিসাবে সারা দেশে এইরূপ ঊর্ধ্ব-সীমা নির্ধারণ সম্ভব হয় না। সারা দেশের অন্যান্য সকল উৎপাদনক্ষেত্রে আয়ের বা মূলধনের ঊর্ধ্ব সীমা নির্দিষ্ট হইল না, কিন্তু যাহারা বংশপরম্পরায় কেবল জমির উপর নির্ভর করিয়া চাষের কাজ করে তাহাদের ক্ষেত্রে কি দোষ হইল? কেবল মাত্র তাহাদের ক্ষেত্রেই আয়-বৃদ্ধির সীমা নির্দিষ্ট হইবে কেন?

চতুর্থত, বাড়তি জমির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হইতেছে তাহা খুবই কম, ইহাকে উৎখাত বলা চলে। আর যদি বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাই হয় তবে রাষ্ট্রের পক্ষে আরও ভালভাবে টাকা খাটাইবার উপায় কি দেশে নাই?

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে ঊর্ধ্ব-সীমা স্থাপনের সমর্থনকারীরা কি বলেন তাহা জানা দরকার। অনেক সময়ই ঊর্ধ্ব সীমা স্থাপনের সমর্থনকারীরা কেবল মাত্র গণতন্ত্রের প্রসার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেন। তাঁহারা বলেন, ভূমির বণ্টন না হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতরা ধনী চাষীর কুক্ষি হইতে বাহির হইতে আসিতে পারে না, দেশে সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যায় না।

এই প্রকার যুক্তি ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক হইতে ঊর্ধ্ব-সীমা নির্ধারণের পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। প্রথমত, সকল চাষীর ভূমি ক্ষুধা মিটানো না গেলেও ভূমি বণ্টন করার দরকার নেই, এই কথা ঠিক নয়। নূতন স্বাধীন সকল দেশেই কৃষিসংস্কারের প্রথম যুগে জমি বণ্টন করিয়া চাষীর মনে তীব্র উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। জমিদারদের স্থান হইতে বিচ্যুত না করিলে এই নীতি গ্রহণ করা আমাদের দেশে সম্ভব নয়।

করিয়া জমি দিতে হইলে সরল হিসাবেই দেখা যায়, ভূমিহীন এবং ২ একরের কম যাহাদের আছে তাহাদের জন্য মোট ১০ কোটি একর জমি দরকার। ২০ একর জমিতে ঊর্ধ্বসীমা স্থির করিয়া উহার অধিক সরল জমি লইয়া লইলে মাত্র ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, মাত্র ২০ একর জমিতে ঊর্ধ্বসীমা স্থির করিয়া উহার অধিক জমি বণ্টন করিলে ছোট ছোট ২ একরের জোত তৈয়ারী হইতে পারে বটে, কিন্তু এইগুলি অর্থনৈতিক দিক হইতে ভাল হইতে পারে না।"

দ্বিতীয়ত, জোতের ঊর্ধ্ব-সীমা নির্ধারণের বিষয়ে কেবলমাত্র উৎপাদনের দিকে তাকাইলেই চলিবে না, বণ্টনের দিকও মনে রাখিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় বেশি পরিমাণ জমির মালিক ধনী চাষী বা জমিদারদের হাতেই বিক্রয়-যোগ্য শস্য জমিয়া যায়, এবং খাদ্যশস্য লইয়া তাহাদের মজুতদারি ও ফাটকাদারি দেশে দুষ্প্রাপ্যতা ও দামবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই জমির উপর এবং ফসলের উপর অল্পসংখ্যক ধনী চাষীর একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া দেওয়া খুবই দরকার।*

তৃতীয়ত, বড় বড় জমিদারী ভাঙিলে ছোট ছোট জোত দেখা দিবে, এই যুক্তিও সঠিক নয়, কারণ বড় জমিদারদের জমি একসঙ্গে এক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নাই, উহা খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবেই ছড়াইয়া আছে। বর্তমানে চাষের দিক হইতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা ইহাতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহা ছাড়া, ইহা সকলেই জানেন যে, দেশে মূলধন বেশি থাকিলে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা পাওয়া যায়, আর শ্রমিক বেশি থাকিলে শ্রমপ্রগাঢ় পদ্ধতি নিয়োগ করিতে হয়, ফলে ছোট জোতই সুবিধাজনক। শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন বেশি বাড়ানো না গেলেও একর-প্রতি উৎপাদন ইহাতে কিছুটা বাড়ানো চলে।

স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

চতুর্থত, জোতের সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দিলে এবং খাদ্যশস্যের ব্যবসায় সরকার নিয়ন্ত্রণ করিলে ক্ষতিপূরণের টাকায় এবং সঞ্চিত অর্থে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হওয়ার মত সম্ভাবনা দেখা দিবে, ইহাও মনে রাখা দরকার।

জোতের ঊর্ধ্ব-সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার যে সকল অসুবিধা আছে, তাহাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, জোতের ঊর্ধ্ব-সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার অর্থ হইল চাষীর বা জমিদারদের আর্থিক আয় নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা। যদি শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বাড়িয়া যায়, তবে এই নির্দিষ্ট আয়ের চাষীদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। শিল্পজাত দ্রব্যের দামস্তর যত বৃদ্ধি পাইবে ইহাদের উপর অবিচার তত বাড়িবে। সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর সাধারণ দামস্তর কতখানি স্থির রাখা সম্ভব হইবে তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়।

কার্যকরী করার বাস্তব অসুবিধা

* "Stark economic reality and not ideology, therefore, demands a break-up of the monopoly. When mere 5 per cent of the population account for 33 per cent of land holding and 45 per cent of the land holding account for only 8 per cent of the total cultivated acreage, the possibility of hoarding is immense." A. I. C. C. *Economic Review* Dec, 1. P. 13.

দ্বিতীয়ত, ভারতে জমির পরিমাণ, উর্বরতা এবং আয় প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক তথ্যের অভাব এত বেশি যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একর-প্রতি গড় আয় স্থির করা সম্ভব হইবে না। তৃতীয়ত, যেখানেই এইরূপ উধ্ব'-সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানে জমির মালিকেরা বিভিন্ন উপায়ে ভুয়া সম্পত্তিভাগ প্রভৃতি। উহা ফাঁকি দিয়াছে। পরিবারের মধ্যে বা বিশ্বস্ত চাকর-বাকর ও কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামে ঠিক উধ্ব'-সীমা পর্যন্ত জমি লিখাইয়া লওয়া প্রায় সকল রাজ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে। কমিশনের ভাষায় বলা চলে: "On the whole, it would be correct to say that, in recent years, transfer of land have tended to defeat the aims of legislation for ceilings and to reduce its impact on the rural economy."*

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার, পরিকল্পনা কমিশন জোতের উধ্ব'-সীমা নির্ধারণ করিবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো জোত ইহা হইতে বাদ দিবার কথা বলিয়াছেন। মিশ্র জোত—যেমন বাগিচা, বাগান, দুধ, মাখন পনীরের ব্যবসায়স্থল প্রভৃতি একত্রীভূত জোতগুলি তাঁহারা বাদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ফলে এই আইনগত ফাঁকের মধ্য দিয়া অনেক ধনী চাষীই এই আইন এড়াইয়া গিয়াছে।

ভূদান যজ্ঞের অর্থনীতি (Economics of Bhoodan Yagna)

ভারতের ভূমিহীন চাষীরা যাহাতে জমি পায় এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পদ-বৈষম্য হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্যে বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার হিসাব মতে ভারতে ৫ কোটি ভূমিহীন চাষী আছে। প্রত্যেক ভূমিহীন চাষীর জন্য ১ একর হিসাবে জমি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তিনি এই আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৫ জন হিসাবে লোক ধরিয়া পরিবার-পিছু ৫ একর জমি তিনি লক্ষ্য হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন। গান্ধীপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি জমিদারের মনে ভূমিহীন কৃষকের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সহানুভূতির বাস্তব প্রকাশ হিসাবে প্রত্যেক জমিদারকে নিজ মালিকানার ⅙ অংশ দান করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। ভারতে

ভূদানের লক্ষ্য

* *Third Five Year Plan p, 221.*

মোটামুটি ৩০ কোটি একর জমি চাষ হয়, সারা দেশে এইরূপ নির্দিষ্ট অনুপাতে দান হইলে ৫ কোটি একর পাওয়া যাইবে এবং তাহার পরে ভূদান কর্মীদের নেতৃত্বে এই জমি উপযুক্তভাবে বণ্টন করা হইবে।

১৯৪৯-৫০ সালে ভারতীয় সাম্যবাদী দল তেলেঙ্গানায় জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি নিজেরা অধিকার করিয়া চাষ আবাদ করার জন্য সেই অঞ্চলের ভূমিহীন চাষীদের আহ্বান করিয়াছিলেন। ধনী চাষী ও জমিদারেরা ইহার বিরোধিতা করে এবং তাহাদের বিতাড়িত করিয়া ভূমিহীন ও গরীব চাষীরা নিজেদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া লয়। উহার পরে পুলিস ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে জমিদখলকারী চাষীদের সরাইয়া দিয়া জমিদারগণ সেই জমি পুনরায় নিজেদের দখলে আনে। ১৯৫১ সালে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকদের বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বিকল্প পথের আভাস দিতে সচেষ্ট হইলেন।

আন্দোলনের উৎপত্তি

আন্দোলনের সূত্রপাত খুব আশাজনক দেখা গেল; ১৯৫২ হইতে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমি দান হিসাবে পাওয়া গেল। ইহার মধ্যে বেশি পরিমাণ হইল বিহারে, ১৯৫৩ সালে। কিছুদিন পরে এই আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চাশা ক্রমে কমিয়া আসিল এবং এই আন্দোলনের সার্থকতা, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা দেখা দিল।

অগ্রগতি

দেখা গেল যে, (ক) বিহারে দান করা বেশির ভাগ জমিই পাথুরে, বন্ধ্যা, কৃষির দিক হইতে অনুপযোগী অথবা জটিল ধরনের স্বত্বসংক্রান্ত মামলা-বিবাদের অধীন। অন্যান্য রাজ্যে দেখা গেল, দান-করা জমিগুলি আইন-নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ জোত পরিমাণের ঠিক উদ্বৃত্ত অংশ। ভূমিসংস্কার আইন কার্যকরী হইলে যতটুকু জমি রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে জমিদারেরা ততটুকু ছাড়িয়া দিয়াছে, উহার বেশি নয়। (খ) কিন্তু আরও বেশি অসুবিধা দেখা গেল সেই জমি বণ্টনের ব্যাপারে; যে জমি পাওয়া গিয়াছে উহার ৫% এর বেশি এখনও পর্যন্ত বণ্টন করা হয় নাই। (গ) ভূদান আন্দোলনের মূল কথা—সম্পদ বণ্টন ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস—মোটেই সফল হয় নাই। যে সকল জমি বা উৎপাদন কেন্দ্র হাতে রাখিলে গ্রামের অর্থনীতির উপর ধনী চাষী ও জমিদার শ্রেণীর

কিন্তু ততটা সফল হয় নাই

অকুণ্ঠ প্রভাব বিস্তৃত থাকে, তাহাদের নিজেদের হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট কিছু কিছু জমি চাষীরা ছাড়িয়া দিয়াছে।*

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভারতীয় কৃষির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে ভূদান আন্দোলন সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। এই মূল বিষয় হইল পাঁচটি, ইহার একটিও ভূদান আন্দোলনের দ্বারা সমাধান হয় নাই :

(১) অত্যন্ত জটিল সম্পত্তিগত কাঠামো, যাহার সর্বশীর্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রধান মালিক হিসাবে 'খাজনা' আদায় ;

প্রকৃত সমস্যা কি কি

(২) ভূমিসংস্কার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের "বিলোপসাধনের" পরেও, চাষের কাজ না করিয়া কেবল মালিকানা-স্বত্বের জোরেই একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রাখা, যাহারা প্রকৃত চাষীর—প্রজা, বা ভাগচাষীর নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে খাজনা এখনও পাইতেছে. অথবা যদি মজুর খাটাইয়া চাষ করে তবে অত্যন্ত কম হারে মজুরি দিতেছে ;

(৩) ভূমিসংস্কারের পরেও, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব বজায় থাকা এবং সত্যসত্যই হাতে-কলমে চাষ করার মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে ;

(৪) প্রকৃতপক্ষে যে চাষীরা চাষ করে তাহারা নিয়মিতভাবে এবং খুব বেশি পরিমাণে মূলধনী দ্রব্য ও অর্থসঙ্গতির ব্যাপারে অভাবগ্রস্ত ; উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে, এবং ফলে গড় ফলন খুবই কম ;

(৫) এইরূপ অবস্থা দূর হইয়া অর্থনৈতিক পুনঃসংগঠনের দিকে অগ্রসর হওয়ার মত অন্তর্নিহিত কারণের বা ঝোঁকের অভাব ; খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন জমি ; উৎপাদনক্ষেত্রের আয়তন খুবই ছোট।

এই পাঁচটি অবস্থা মিলিয়া গঠিত কৃষি-অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাণকেন্দ্রে প্রকৃত চাষীর অবস্থান নাই। সকল চাষীকে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে প্রতি গ্রামে একটি দুইটি বা

* "For political purposes they may associate their names directly with Bhoodan works. Some have attempted to gain control over Bhoodan redistribution so as to enlarge or strengthen their following...when the Bhoodan campaigners march into their village, these well-off folk make a good show by giving away a few patches of land. But they are careful to retain securely in their grasp the holdings and associated economic operations upon which their control of the village rests". *Daniel Thorner*. Agrarian Prospect P, 15.

কয়েকটি পরিবার। তাহাদের হাতে গ্রামের সমস্ত জমি তো নাই-ই. অর্ধেকও হয়তো নাই। কিন্তু তাহাদের হাতের জমিগুলি গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সর্বাধিক মূল্যবান। তাহাদেরই উপর নির্ভর করিয়া প্রজা বা ভাগচাষীকে জমি পাইতে হয়, ভূমিহীন মজুরকে কাজ পাইতে হয়। তাহাদের উপর এই বাধ্যতামূলক নির্ভরশীলতাই তাহাদের শক্তির উৎস। তাহারাই ঋণ দেয়, দাদন দেয়, ফসল কেনে, উহাকে বিক্রয়োপযোগী শোধন করে এবং বিক্রয় করে। অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির এইরূপ ভারসাম্য কি ভূদান আন্দোলনের দ্বারা কিছু মাত্র ব্যাহত হইয়াছে অথবা সেইরূপ কোন সম্ভাবনা আছে ?

কৃষি-সমস্যার মূল কেন্দ্রে ভূদান পৌছিতে পারে নাই

অনুশীলনী

1. What are the principal defects of the system of Permanent Settlement? What would be the most economical method of removing these defects?

2. Examine the principal types of land tenure in India and discuss the economic bearings of each.

3. Discuss the effects of Zamindari abolition on the rural economy of India.

4. Discuss the present land tenure structure in India. How far that is conducive to economic development in the countryside. ?

5. Discuss the need for Land Reforms at the present stage of Indian economic development.

6. Discuss the programme of Land Reforms under the Five Year Plans in India.

7. Examine the progress of Land Reforms in India.

8. Critically examine the nature of Indian Land Reforms.

9. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricultural holdings in India.

10. Write short notes on :

(a) Land ceilings in India.

৮

জমি ও চাষী ঃ জোতের আয়তন

Land and Cultivator : the unit of cultivation

একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদন-মাত্রা সর্বোত্তম স্তরে (optimum scale of production) উঠানো দরকার। ভারতে চাষী-প্রতি চাষের জমির পরিমাণ খুবই কম এবং পুরুষ-পরম্পরায় উত্তরাধিকার-সূত্রে গড় জোতের আয়তন হ্রাস পাইতেছে। তাহা ছাড়া, প্রতিটি চাষী পিতার প্রত্যেক জমি খণ্ড হইতে অংশ দাবী করায় সকল চাষীর হাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, "জোতের আয়তন, তাহাদের মালিকানা এবং চাষ—এই সকল বিষয়ে সংবাদ খুবই অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ"। তাহা সত্ত্বেও চাষীর হাতে জোতের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে হিসার পাওয়া যায়। কয়েকটি রাজ্যে জোতের গড় আয়তন হইল ঃ

রাজ্য	গড় জোতের আয়তন
বোম্বাই	১৩·৩ একর
পঞ্জাব	১·০ একর
মহীশূর	৬·২ একর
উড়িষ্যা	৪·৯ একর
আসাম	৪·৮ একর
মাদ্রাজ	৪·৫ একর
পশ্চিমবঙ্গ	৪·৪ একর

উপরের এই হিসাবের তুলনায় বাস্তব অবস্থা আরও খারাপ, কারণ ইহা গড়ের হিসাব এবং বড় বড় জোতও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে সারা ভারত কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধানের বিবরণীতে (Report of All India Agricultural Labour Enquiry) বলা হইয়াছে যে, ২ একরের কম জোতের পরিমাণই সংখ্যায় সর্বাধিক। মোট জোতের তুলনায় ৫ একরের কম

জোতের সংখ্যা মাদ্রাজে ৬৭.৬%, অন্ধ্রে ৬৬.৮%, মধ্যপ্রদেশে ৫৯.৪%, মধ্যভারতে ৪৫.৬% এবং হায়দরাবাদে ৩২%।

উপরের এই হিসাব হইতে প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না, কারণ ইহা মালিকানার হিসাব। চাষের জোতের আয়তন আরও অনেক কম, কারণ মালিকানার হিসাবে চাষীর হাতে বেশি জমি থাকিলেও খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য প্রত্যেকটি জোতের আয়তন খুবই কম হইয়া পড়ে।

খণ্ডীকরণকে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে সমর্থন করা হয়। বলা হয় যে, কয়েকজনের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত না হইয়া অনেকের মধ্যে সম্পত্তির বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া ভাল। অসম্বদ্ধতার পক্ষে অনেক বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে জমি ছড়াইয়া থাকার সুফল হইল ফসল লোকসানের ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখা, বাৎসরিক ফসল-পরিবর্তনের (annual crop rotation) সুবিধা বেশি পাওয়া।

খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার সুবিধা

কিন্তু ত্রুটির তুলনায় এই সকল সুবিধা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খুব ছোট ছোট জোতে কখনই চাষীর পক্ষে জমিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া কতকগুলি স্থির ব্যয় (fixed cost) যেমন গরু লাঙ্গল প্রভৃতির খরচা চাষীকে বহন করিতেই হয়, জমি কম থাকিলে এই সকল মূলধনী দ্রব্যগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হয় না, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিটি ইউনিটে স্থির ব্যয়ের অংশ বেশি পড়ে। পরিবর্তনীয় ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি দরকার হয়। অনেক সময় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনীয় ব্যয় (যেমন জমিতে বেড়া দেওয়া) নির্বাহ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার মত বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয় না। রাস্তা, আইল প্রভৃতিতে প্রচুর জমি নষ্ট হয়। সর্বাপেক্ষা অসুবিধা হইল ইহার দরুন কৃষির যন্ত্রীকরণ সম্ভব হয় না। কৃষিজাত উদ্বৃত্ত চাষের কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হইয়া কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা আরও বাড়াইবার সুযোগ পাইতে পারে না।

খণ্ডীকরণের অসুবিধা

অসম্বদ্ধতার ফলে এই সকল দোষ ও ত্রুটি আরও প্রকট হইয়া পড়ে। অতি ক্ষুদ্র জোতের সকল ত্রুটিই অসম্বদ্ধতায় দেখা যায়, যেমন যন্ত্র ও শ্রম-সঞ্চয়ী পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র জোতের কোন সুবিধা এই অবস্থায় নাই, নিজ হাতে চাষী ক্ষুদ্র জোতের যতটা প্রগাঢ় চাষ করিতে পারে ; অসম্বদ্ধতার দরুন তাহাও সম্ভব হয় না। প্রচুর পরিমাণ জমি নষ্ট হয়, দূরের জমিখণ্ড ভাল চাষ হয় না, এই

অসম্বদ্ধতার অসুবিধা

জমির উপর ভাল নজর রাখা চলে না। মূলধনী দ্রব্য ও শ্রমিকের যাতায়াতের দরুন ব্যয় বাড়িয়া যায় প্রচুর সময় নষ্ট হয়, পথঘাটে যাতায়াতের অধিকার ও সীমানার বেড়া লইয়া মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়, অন্যান্য কাজে অসমবায়ী মনোভাবের ঝোঁক দেখা দেয় একটি পুকুর বা কুয়া কাটিয়া একজন চাষী নিজের সকল ভূমিখণ্ডে সেচ দিতে পারে না। রাত্রিদিন সকল খণ্ডের জমিতে সমান পাহারা দেওয়া সম্ভব হয় না।

মূল কারণগুলি

এই অবস্থা উৎপত্তির প্রধান কারণ হইল, কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকা এবং উহার দরুন কৃষির অনগ্রসরতা। জমিদারের হাতে জমি থাকায় সে একসঙ্গে বেশি জমি চাষীকে দিতে চাহে না, নিজের জনবল বাড়াইবার জন্য অধিকসংখ্যক চাষীর মধ্যে জমি ভাগ করিয়া দিতে চায়। গ্রামের অধিকাংশ চাষীর উপর ক্ষমতা বিস্তারের ইহা একটি অন্যতম প্রধান উপায়। অন্যান্য দেশে কৃষিতে ধনতন্ত্র প্রসারের পথে এই সকল ক্ষুদ্র জোত ভাঙিয়া একত্র মিলাইয়া জমিদারেরা বৃহৎ কৃষিফার্ম গঠন করিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় জমিদারগণ অধস্তন মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট জমি বণ্টন করিয়া নিশ্চিত রাজস্বের বিনিময়ে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানের ভূমিসংস্কার আইনগুলি জমিদারী প্রথা সম্পূর্ণ তুলিয়া দেয় নাই, জমিদারের অধিকার বহুলাংশে বজায় রাখিয়াছে, ফলে খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার মূল ভিত্তি অপসারিত হয় নাই।

আনুষঙ্গিক কারণগুলি

ইহা ছাড়া আরও অনেক কারণ দেখানো হইয়া থাকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও দ্রুত শিল্পোন্নয়ন না হওয়ার ফলে চাষের জোত ক্রমশ ছোট হইয়া আসিয়াছে, খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে প্রচ্ছন্ন বেকারির সম্পত্তিগত প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রভাব বাড়িয়াছে, যৌথপরিবার ভাঙিয়া গিয়াছে, সম্পত্তি ভাগ করিয়া লওয়ার ইচ্ছা প্রবলতর হইয়াছে। দেশের উত্তরাধিকার আইন খণ্ডীকরণে সাহায্য করিয়াছে। দেশের ভূমিস্বত্ব ও ভূমিব্যবস্থায় অসম্পূর্ণ রূপান্তরণ এই ব্যবস্থাকে আরও বহুদিন জিয়াইয়া রাখিবে বলিয়া মনে হয়।

আর্থিক জোত (The Economic Holding): আর্থিক জোত বলিলে কি বোঝা যায় সেই সম্পর্কে বহু বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। কিটিঞ্জ (Keatinge) বলেন, "যে জোত হইতে উৎপাদন করিয়া সকল প্রয়োজনীয় ব্যয়

মিটাইয়া চাষী নিজেকে এবং পরিবারকে মোটামুটি আরামে রাখিতে পারে তাহাই আর্থিক জোত"। ডাঃ ম্যান্ (Dr. Mann) বলেন যে, আর্থিক জোত হইল, একটি গড় আয়তনের চাষী পরিবার যাহা হইতে নিম্নতম ন্যায্য জীবনযাত্রার মান পাইতে পারে। স্ট্যান্‌লি জেভনস্ বলেন যে, আর্থিক জোত হইতে হইলে 'ন্যায্য' বা 'মোটামুটি' হইলে চলিবে না, উহা দ্বারা চাষী যেন 'উন্নত' জীবনযাত্রার মান লাভ করিতে পারে।

কাহাকে বলে

এই সকলই ক্ষুদ্র চাষীর হাতে জমি রাখার ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিভিত্তিক চাষ-প্রথা মানিয়া আলোচনা করা। কিন্তু আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, সেচ, গো-পালন, উন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি—এই সবকিছু অনুযায়ী যতখানি জমি হইলে সর্বনিম্ন ব্যয়ে একর-প্রতি উৎপাদন সর্বাধিক বাড়ানো যায় সেই হিসাবেই আর্থিক জোতের পরিমাপ বাঞ্ছনীয়। এই মানদণ্ড অনুযায়ী আর্থিক জোতের হিসাব করিলে ব্যক্তিভিত্তিক চাষ ও জমিদারীর বাধানিষেধ ডিঙাইয়া সমবায় চাষ এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ সকল কিছুকে ধারণার মধ্যে আনা দরকার।

পরিকল্পনা কমিশন এক একটি গ্রামে একটি বা দুইটি সমবায় সমিতির ভিত্তিতে ১০০০ একর বা ১৫০০ একর জমিকে আর্থিক জোত হিসাবে গণ্য করিয়া সেই ভাবে কৃষি রূপান্তরের চেষ্টা করিলে ভাল করিতেন। তাহা না করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে তাঁহারা 'পারিবারিক জোত' (family holding) নামে একটি নূতন ধারণা প্রচলন করিয়াছেন। ভূমিসংস্কার প্যানেলের একটি কমিটি পারিবারিক জোতকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে-পরিমাণ জমি হইতে ফসল ফলাইয়া বাৎসরিক স্থূল ১৬০০ টাকা বা নীট ১২০০ টাকা পাওয়া যায় (পারিবারিক শ্রমের পাওনা ইহার মধ্যে যোগ করিয়া) এবং একটি লাঙলের পূর্ণ ব্যবহার হয়, তাহাই পারিবারিক জোত। অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কমিশন উহার ধারণা বদ্‌লাইয়া বড় বড় সমবায় চাষ সমিতি গঠনের উপরই জোর দিয়াছেন।

পারিবারিক জোত কাহাকে বলে

আর্থিক বা পারিবারিক জোতের আয়তন স্থির করার সময়ে বহু বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সকল জমির উর্বরতা সমান নয়, সর্বত্র জলসেচের সুবিধা সমান নাই, কিরূপ যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে, নিজের ভোগের জন্য অথবা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন হইতেছে, বাজার হইতে দূরত্ব কি, চাষী নিজে মালিক অথবা জমিদারকে ফসলের অংশ দিয়া চাষ করে, সেই অংশ কতখানি, মজুরের দাম কি, তাহাদের ক্ষমতা কি এবং উৎপাদনের অন্যান্য

ব্যয় কিরূপ,—এই সকল ও আরও বহু বিষয় মনে রাখিয়া এইরূপ আর্থিক বা পারিবারিক জোত হিসাব করা দরকার।

প্রতিকারের চেষ্টা (Remedies & attempts): খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা দূর করিয়া কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সকল জমি রাষ্ট্রের বা সমবায় চাষ সমিতির অধীনে লইয়া আসিয়া বড় বড় কৃষি-ফার্ম স্থাপন করিয়া কৃষিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোই এই সকল দোষত্রুটি দূর করার একমাত্র উপায়। তাহার জন্য কোন প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত চাষীর অধীনে রাখিয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর এই বৃহৎ অংশে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র চলিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহাতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য সম্ভব হয় না এবং শিল্প-ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইয়া পড়ে। সকল উন্নত দেশের ইতিহাস হইতেই এই কথা জানা যায়, তবুও এখন পর্যন্ত সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ছোট ছোট সংস্কারমূলক ব্যবস্থার দ্বারা ইহার ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হইয়াছে এবং প্রায় সকল ব্যবস্থাই বিফল হইয়াছে অথবা খুব সীমাবদ্ধ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

সত্য প্রতিকার রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বা সমবায়ী সমাজ তান্ত্রিক কৃষি-ফার্ম

সংস্কারের প্রচেষ্টা ইংরাজ শাসনের আমল হইতেই শুরু হইয়াছে। ১৯২১ সালে পঞ্জাবে মিঃ ক্যালভার্ট প্রথমে সমবায় সংহতি সমিতির মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলকভাবে খণ্ডীকৃত ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতির (voluntary consolidation of holdings) আইন পাস করেন। ইহা তেমন কার্যকরী না হওয়ায় কিছুটা বাধ্যতামূলক করিয়া মধ্যপ্রদেশে ১৯২৮ সালে আইন রচিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পঞ্জাবে ১৯৩৭ সালে পঞ্জাব জোতের সংহতি আইন (Punjub Consolidation of Holdings Act) পাস হয়। যদি ভূস্বামীর ⅔ অংশ, যাঁহারা কমপক্ষে গ্রামের ¾ অংশ জমির মালিক, এইরূপ সংহতি চান, তবে অবশিষ্ট সংখ্যালঘু ভূস্বামীদের বাধা দিবার ক্ষমতা থাকিবে না, আইনে এইরূপ বলা হইল। অনেক জিলায় সংহতি অফিসার (consolidation officers) নিযুক্ত হইল।

স্বাধীনতার পূর্বে

১৯৪৭ সালে বোম্বাই রাজ্যে বাধ্যতামূলক সংহতি আইন পাস হইল;

১৯৪৮ সালে পঞ্জাবে এইরূপ আইন গৃহীত হইল। ক্রমে অন্যান্য রাজ্যেও এইরূপ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। জোতগুলিকে একত্রীভূত করার কাজ অগ্রসর হইয়াছে প্রধানত পঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশে। অন্যান্য রাজ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম। ১৯৫৯-৬০ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রায় ২৩ মিলিয়ন জমির সংহতি সাধন হইয়াছে এবং ১৩ মিলিয়ন একরে এই কাজ চলিতেছে। রাজ্যগুলি যে-হিসাব দিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনা কালে প্রায় ৩০ মিলিয়ন একর জমির একত্রীকরণ করা যাইতে পারে। সকল রাজ্যের নিকট সংহতি সাধনের অভিজ্ঞতা পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন এই বিষয়ে দুইটি বিশেষ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় পরিকল্পনাতে আরও গভীরভাবে এই বিষয়ে গবেষণা করা হইবে বলা হইয়াছে এবং জলসিঞ্চিত অঞ্চলগুলিতে অধিকতর জোর দেওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহাতে আরও খণ্ডীকরণ না হয় এই উদ্দেশ্যে নিম্নতম জোতের আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া উহা আর হ্রাস পাইতে পারিবে না এইরূপ আইন করা হইয়াছে; কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, উত্তরাধিকার আইন না পাল্টাইলে খণ্ডীকরণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। সকল প্রকার আইন সত্ত্বেও জমিদারদের বিরোধিতায় এবং ব্যক্তিগত চাষপ্রথার উপর জোর দেওয়ার ফলে খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার ত্রুটি দূর করা সম্ভব হইতেছে না।

স্বাধীনতার পরে

সমবায় চাষ কাহাকে বলে (What is Co-operative farming):

নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যকে একত্র করিয়া সংঘবদ্ধভাবে সাধারণ স্বার্থের সহিত জড়িত কাজকর্ম করাকে সমবায় পদ্ধতি বলে। বহু বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্রামের চাষীরা একত্র হইয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে পারে। শস্য বিক্রয়, সার ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। এই সকল সমিতিকে অনেক সময় সেবা-সমবায় (service co-operatives) বলে। কৃষি-উৎপাদনের বা জীবনধারণের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিকে আমরা একত্রে কাজ করিব—এইরূপ সম্মিলনী মনোভাব লইয়া এই সকল সেবা-সমবায় গঠিত হইয়া থাকে।

সমবায় সেবা সমিতি

যদি তাহাদের মধ্যে সমবায়ী মনোবৃত্তি ও অভ্যাস আরও একটু গভীর হয়, তবে তাহারা সমবায়ী কাজকে আরও এক উন্নত স্তরে লইয়া যাইতে পারে। কৃষি উৎপাদনের প্রায় সকল কাজই সমবেতভাবে করা হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে সমবায় যুক্তচাষ (Co-operative joint firming) বলে। বিভিন্ন জমিখণ্ডের সীমারেখা ভাঙিয়া দিয়া সকল জমিকে একত্রে মিশাইয়া, উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারাকে ছোট ছোট অংশ ভাগ করিয়া নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রসার ঘটাইয়া, সেচ দেওয়া, বীজ বোনা, ক্ষেত নিড়ানো, ফসল কাটা, শস্যকে শোধন করিয়া বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করা (Processing), বিক্রয় করা—সকল কাজই নিজেদের সমিতির তত্ত্বাবধানে নিজেরা করা—ইহাই সমবায় চাষ। সমিতির নিয়ম হইল যে, সভ্যরা কাজের জন্য মজুরি পাইবে এবং বৎসরের শেষে জমির পরিমাণ অনুযায়ী লাভের অংশ পাইবে। যে-কোন সভ্য এইরূপ সমিতিতে ইচ্ছামত যোগদান করিতে পারিবে এবং খুশিমত নিজের জমি লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে।

সমবায় যুক্ত চাষ বা সমবায় চাষ

সমবায় চাষের সমাজতান্ত্রিক রূপ একটু ভিন্নপ্রকার। পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির মালিকানা রাষ্ট্রের, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে চাষ করা ও সেই চাষ পরিচালনা করার দায়িত্ব সেই অঞ্চলের চাষীদের লইয়া গঠিত যৌথ-খামার সমিতির উপর (Collective farm society)। এইরূপ ব্যবস্থায় কে কি পরিমাণ জমির মালিক ছিল সেই অনুযায়ী তাহাদের প্রাপ্য নির্ধারিত হয় না, তাহাদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃক অথবা যৌথ-খামার কর্তৃক তাহা স্থির হয়। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অবসান হয়, অবশ্য চাষী নিজের ঘরবাড়ি এবং শাকসবজির বাগানের উপযোগী ভূমি নিশ্চয় রাখিতে পারে। যতটুকু ভূমি সে অবসর সময়ে নিজের পরিশ্রমে, অপরের শ্রম ভাড়া না করিয়া চাষ করিতে পারে, ততটুকু তাহাকে রাখিবার অধিকার দেওয়া হয়; সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সে পুত্রকন্যাকে বণ্টন করিয়া দিতে পারে; রাষ্ট্র, যৌথ-খামার বা অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে, কিন্তু তাহাকে উৎপাদনের উপায় (means of production) হিসাবে ব্যবহারের সুবিধা থাকে না, অপরের শ্রম ভাড়াতে খাটাইয়া সেই সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত আয় বাড়াইবার পথ খোলা থাকে না।

যৌথ চাষ বা যৌথ খামার সমিতি

আর একরূপ সমবায় পদ্ধতির কথা প্রচারিত হইতেছে, তাহাকে বলা হয় সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Co-operative Village Management)। এই ব্যবস্থায় গ্রামের সকল জমি একত্রে মিলাইয়া উহার পরিচালনা গ্রাম্য সমিতি সমূহ, পঞ্চায়েত বা গ্রামসভার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই গ্রাম্য-পরিচালকবৃন্দ স্থানীয় অধিবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এবং ইহাদের উপর উৎপাদন ও গ্রাম্য-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দায়িত্ব ন্যস্ত—যেমন, কি ফসল কোন্ জমিতে উৎপন্ন হইবে; ফসল ঘোরানোর (crop-rotation) ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কোথা হইতে টাকা, উন্নত ধরনের বীজ সার যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে কোন শ্রমিক কোথায় কাজ করিবে, কি আনুষঙ্গিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সমগ্র জমিকে একই ফার্মের মত চাষ করা যাইতে পারে, অথবা কয়েকটি সুবিধামত ব্লকে ভাগ করা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত কোনো পরিবারকে বা কয়েকটি পরিবারকে এক একটি ব্লকে ভাগ করিয়া দেওয়া চলে, স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহা স্থির করা হয়। গাঁয়ের পতিত জমি, পুকুর, মেছোঘেরী, বনজঙ্গল এবং ছোটখাট জলসেচ ব্যবস্থা সবই পঞ্চায়েত বা গ্রাম্যসভার পরিচালনায় আসিবে।

সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা

সমবায় চাষ-সমিতি হইতে চাষী যেরূপ জমি লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থায় তাহা পারে না, সেইদিক হইতে ইহা যৌথ খামার প্রথার ন্যায়। কিন্তু যৌথ খামারের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর; উৎপাদনের লক্ষ্য, উৎপাদন-পদ্ধতি, এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। সমবায় গ্রাম পরিচালনার কাঠামোতে ব্যক্তিগত মালিকানা রহিল বটে, কিন্তু তাহার রূপ পৃথক হইয়া গেল। মোট জমির এক অংশের উপর জমির মালিকের মালিকানা আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জমিখণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ মালিকানা আর ছিল না। যৌথ-মূলধনী কোম্পানির শেয়ারের মত, কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র বা জিনিসের উপর শেয়ার-ক্রেতার প্রত্যক্ষ মালিকানা নাই, কিন্তু কোম্পানির মোট সম্পত্তির মধ্যে তাহার একটি অংশ আছে। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সমান উত্তরাধিকার—এই দুইটি নীতি এই ব্যবস্থায় বহাল থাকে। এই প্রথা এই দুইটি বিশেষ নীতি মানিয়া চলে এবং ফলে ভারতীয় বিশেষ অবস্থার সহিত ইহা খাপ খায় বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে নিজ মালিকানার জমি পুত্রকলত্রের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে, কিন্তু চাষের জোত ক্রমাগত খণ্ডীকৃত

অন্যান্য প্রকার সমবায়ের সহিত ইহার তুলনা

ও অসম্বন্ধ হইতে থাকে না। যাহারা জমিতে কাজ করে তাহারা মজুরি পায় এবং মালিকেরাও জমির পরিমাণ অনুযায়ী লভ্যাংশ পাইতে থাকে।

সমবায় গ্রাম্য-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা আছে বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে বৃহৎ-মাত্রায় কৃষি উৎপাদনের সকল ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায়, একর-প্রতি ও চাষী প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাঁয়ের পতিত জমি উদ্ধার হয়। ফসল-পরিকল্পনা (Crop planning) বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয়। পূর্ণ বেকারি, মরসুমী বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর করা সম্ভব হইয়া উঠে। দ্বিতীয়ত, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে সমতা আসে এবং বৈষম্য দূর হয় বলিয়া মনে করা হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাম শাসন পরিচালিত হয় এবং সকলে সমান স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়—এরূপ বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, শ্রেণী সংঘর্ষ ও শ্রেণী-বিরোধ দূর হইয়া গ্রামের জীবনে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আসে—এমনও মনে করা চলে। চতুর্থত, ভারতে গ্রামসভা বা পঞ্চায়েত-এর হাতে গ্রামশাসন বা রাজস্ব আদায়ের ভার বহু পূর্বকাল হইতেই ছিল, ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য বা কীর্তি রক্ষা করাও এই পথে সম্ভব হইয়া উঠিবে।

সুবিধা

অবশ্য এই ব্যবস্থার কয়েকটি অসুবিধার কথাও অনেক উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের গ্রামাঞ্চল এত বড় বিপ্লব গ্রহণ ও ধারণের উপযোগী হইয়া উঠে নাই। জমির তুলনায় উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বেকার হইয়া পড়িবে ইহাও বলা হইয়া থাকে। দেশে ব্যক্তিভিত্তিক চাষ প্রথা না থাকিলে চাষীদের উৎসাহ ও প্রেরণা অবলুপ্ত হইবে এমন কথাও বলা হয়। সর্বোপরি, গ্রামের চাষীদের মধ্যে এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাইবার মত শিক্ষা দীক্ষার অভাব আছে, ফলে ইহা কার্যকরী হইবে না, ইহাও বলা হইতেছে। পরিকল্পনা কমিশন তাই এই ব্যবস্থা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া স্তরে স্তরে গড়িয়া তোলার পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথমে পতিত জমি, পরে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে দেওয়া জমি, ভূদান যজ্ঞে পাওয়া জমি, ক্রমে ক্রমে যাহারা উপযুক্ত চাষ করিতে পারে না সেই অনুপযুক্ত চাষীর জমি, যদি গ্রামের চাষীদের সংখ্যাধিক অংশ রাজি থাকে তবে বা বাধ্যতামূলকভাবে সংখ্যালঘু অংশের জমি—এইরূপে পঞ্চায়েত-এর হাতে জমির পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পাকা করিয়া তোলার কথা পরিকল্পনা কমিশন বলিতেছেন। তাঁহারা এই ব্যবস্থাকেই ভবিষ্যৎ

অসুবিধা ও ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য

ভারতের সমাজতান্ত্রিক গ্রামীণ ও কৃষি সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনও এই চিত্র গ্রহণ করিয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও ইহা পুনরায় ঘোষিত হইয়াছে। প্রথমে সেবা সমবায়, ক্রমে সমবায় চাষ এবং সর্বশেষে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা—কৃষি কাঠামো ও গ্রাম জীবন রূপান্তরণের স্তরক্রম হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

আপাত দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবে ইহা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, উন্নত স্তরের গ্রামজীবন এবং সারাদেশের অর্থনৈতিক দেহে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে আধাসামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে মাত্র। সদিচ্ছা প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলেই কোন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে না, বাস্তব অবস্থাপ্রসূত অর্থনৈতিক নিয়মের তাগিদেই দেশে উহার উপযোগী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইতে থাকে। চাষীদের নিকট হইতে যতটা সম্ভব খাজনা আদায় করিয়া সেই অর্থে সহরে বা গ্রামে আরামে যে সকল জমিদার পুরুষানুক্রমে কাল কাটাইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ অপসারণ না করায় এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে—এই কথা স্পষ্ট জানিয়া রাখা দরকার। যাহারা প্রকৃত চাষ করে না তাহাদের "চাষী" বলিয়া ধরা হইয়াছে, প্রজা উচ্ছেদ করিয়া তাহারা জমি খাসে আনিবার সুযোগ পাইয়াছে, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই পুরানো প্রজাদের মজুর হিসাবে খাটাইতে পারিতেছে, বেনামী করিয়া পূর্ণ বা প্রায়-পূর্ণ জমিদারী রক্ষা করিতে পারিতেছে—এই চিত্রই বাস্তব, তাহাতে ভুল নাই। এই অবস্থায় সমবায় গ্রাম্য ব্যবস্থাতে অনুপস্থিত মালিকদের জমি গ্রামের চাষী চাষ করিবে এবং নিছক মালিকানা-স্বত্বের জোরে শহরে ও গ্রামে বসিয়া জমিদার ও জোতদারেরা তাহার ফলভোগ করিবে। গ্রামের অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে জমিদারেরা মোটেই বিচ্যুত হয় নাই সুতরাং, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাহারা প্রভুত্ব করিবে? যৌথ মূলধনী ব্যবসাতে কি যাহাদের হাতে বেশির ভাগ শেয়ার তাঁহারাই প্রভুত্ব করে না? উৎপাদনক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিয়াও নিছক মালিকানার জোরে মালিক মজুরকে শোষণ করে—এই ধনতান্ত্রিক নীতিই এই পরিকল্পনার ভিত্তি। সামন্ততান্ত্রিক মহালওয়ারী বন্দোবস্ত এবং মজুরের

কেন এই ব্যবস্থা বিফল হইবে

সাহায্যে ধনতান্ত্রিক চাষ, উভয়ের সংমিশ্রণে কখনই সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামো গড়িয়া উঠে না।

সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে কি অবস্থায়? যদি জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র ততটুকু থাকে যাহা অপরের সাহায্য ছাড়া নিজে চাষ করা যায় এবং গ্রামের বেশির ভাগ জমিই কেবলমাত্র প্রকৃত চাষী হইয়া গঠিত সমবায় সমিতির হাতে থাকে একমাত্র তাহা হইলে প্রকৃত চাষী সমাজ-তান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার মত অর্থনৈতিক নিয়মের কার্যকারিতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা সংগঠনের পরিকল্পনায় সেইরূপ কিছু দেখা যায় না।*

সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামোর রূপ ও উহা গঠনের উপযোগী বাস্তব অবস্থা কি

সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক কৃষিকাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে তখনই যখন গ্রামে দ্রুত কৃষি উন্নয়ন ঘটাইবার উপযোগী নেতৃত্বের উদ্ভব হয় এবং সেই নেতৃত্ব যদি কৃষি-সমাজের পরিবর্তন হইতেই সঞ্জাত হইয়া সেই পরিবর্তনকে ধারণ, বহন এবং চালনা করার শক্তি নিজের মধ্যেই আয়ত্ত করে। তাই সমাজতান্ত্রিক গ্রাম-নেতৃত্ব সৃষ্টি হইতে পারে সেই স্তর হইতে যাহারা প্রকৃত চাষ করে, এবং সর্বনিম্ন স্তরের চাষীদের অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষি-মজুর এবং ভাগচাষীদের মধ্য হইতে। তাহারাই বর্তমানে সর্বাধিক শোষিত বলিয়া এবং চাষের কাজের খুঁটিনাটি জানে বলিয়া, সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামোতে সর্বাপেক্ষা লাভবান ও গতিশীল শ্রেণী—তাই কৃষিসংস্কারের মধ্য হইতে ইহাদেরই পরিবর্তনের এবং নূতন কাঠামোর নেতৃত্ব লইয়া আগাইয়া আসার কথা। ভারতের ভূমিস্বত্ব সংস্কার বা সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় এইরূপ নেতৃত্ব উদ্ভব হইবার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে কি না, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইহাদের সার্থকতা বিচার করিতে হইবে।

ভারতের সমবায় চাষ-প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব (Proposal of introducing Co-operative Farming in India)

চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষির যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকতম উপায়ে মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে চাষ করা দরকার। এই

* শিল্পক্ষেত্রেও ইহা সত্য; তাই একমাত্র শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে ও পরিচালনাতেই সমাজতান্ত্রিক শিল্পকাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে—শ্রমিক শ্রেণীকে বাদ দিয়া কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপিত হইলে উহা সমাজতন্ত্র নয়।

উপায়ে চাষের পথে বর্তমানে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডীকৃত জোত ও উহাদের অসম্বদ্ধতা। এই ত্রুটি দূর করার জন্য ভারতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত সমবায় চাষ-প্রথা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব করা হইতেছে। সমবায় চাষ-ব্যবস্থার বিকল্প হইল দুইটি : (ক) সকল জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লইয়া যৌথ খামার-ব্যবস্থা গঠন করা, এবং (খ) বড় বড় জমিদারেরা মজুর খাটাইয়া বৃহৎ মাত্রায় চাষ করিয়া কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ করা। কিন্তু পূর্ণ সমাজতন্ত্র ও পূর্ণ ধনতন্ত্র—উভয় ব্যবস্থার মাঝামাঝি মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দর্শন অনুযায়ী সমবায় চাষ প্রথা গড়িয়া তোলার কথা বলা হইতেছে।

প্রস্তাব

সমবায় চাষ সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনায় অল্প কথায় আলোচনা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সমবায় চাষ-প্রথা গড়িয়া তোলার ভিত্তি প্রস্তুত করা, যাহাতে দশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের বেশ কিছু পরিমাণ জমি সমবায় চাষের অন্তর্ভুক্ত হয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং কৃষি-উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইবার প্রয়োজন থাকায় সারা দেশে সমবায় চাষের প্রসার ঘটানো দরকার, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ করা প্রয়োজন। প্রধানত, সমাজ উন্নয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাফল্য হইতেই সমবায় চাষ প্রথা গড়িয়া উঠুক, ইহাই কমিশনের ইচ্ছা। ইহার মতে এই আন্দোলন যতটা গ্রামস্তরে, স্বেচ্ছামূলকভাবে, গণআন্দোলনের রূপে, খাঁটি স্থানীয় নেতৃত্বে এবং সমাজ-উন্নয়নের স্বাভাবিক স্তর রূপে দেখা দেয়, ততটাই ইহার পক্ষে গ্রামের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হইবে।*

সমবায় চাষের উপকারিতা অনেক। কৃষিজোতের আয়তন বড় হওয়ার ফলে বৃহৎমাত্রায় চাষের সকল ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যাইবে—ব্যক্তিগত চাষীর তুলনায় সমবায় সমিতি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে। বেশি আর্থিক সঙ্গতি থাকিলে ভাল যন্ত্রপাতি, এমন কি ট্রাক্টর পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পারিবে, উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহার করা সম্ভব হইবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি জল-সেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যাইবে, বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি দূর হইবে, কম শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে, সরকারী কৃষিদপ্তর হইতে উপকরণ ও শিক্ষাদীক্ষার সাহায্য পাওয়া সহজ হইয়া

উপকারিতা

* *Third Five Year Plan.* P 209.

উঠিবে, মরসুমী বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর করার উপযুক্ত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন সম্ভবপর হইবে। বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটি ও ফাঁকগুলি দূর হইবে, খাদ্য ও ফসল লইয়া মজুতদারির অবসান ঘটিবে। গ্রামের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের অচলায়তন ভাঙিয়া নূতন ধরনের উন্নত স্তরের জীবনযাত্রার মান প্রতিষ্ঠিত হইবে।†

সমবায় চাষ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের অসুবিধাগুলিও দেশে আলোচিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলা চলে যে, "The main problems of co-operative farming are-organisational, technical, and educational." চাষীদের মধ্যে সাধারণ উদ্যমহীনতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব প্রবল। সমবায়ী জীবনযাত্রার পুরাতন প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন পঞ্চায়েৎ ও যৌথ পরিবার প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সমবায়ী মনোভাব আর ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালক ও নেতার অভাব, মূলধনের অভাব, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতির কথাও মনে রাখিতে হইবে। সর্বোপরি বলা হইতেছে, কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে প্রচ্ছন্ন বেকারির আবরণ উন্মোচিত হইয়া শ্রমের খোলা বাজারে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে।

অসুবিধা

ভারতের গ্রামাঞ্চলে সমবায় চাষ প্রবর্তনের ফলে বেকারি বাড়িয়া যাইবে —এই সমালোচনার সম্পর্কে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সমালোচনার মূল ত্রুটি হইল যে ইহা বর্তমানের স্থিতিশীল অবস্থা ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লয়। সমবায় চাষের দরুন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, খাদ্য ও মজুরির বিনিময়ে সেই গ্রামেই বহু বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর

† "In soviet Russia, in Mexico, in Palestine, the Co-operative farming has been effective in introducing the more advanced farming methods into the former backward rural areas. By pooling of resources, peasants have availed themselves of the advantages of large-scale farming and have thereby increased production and raised their standard of living. These Co-operatives have brought medical care, improvement in diet and more decent and sanitary housing to the people who formerly lived in dirt and squalor, suffering from malnutrition or other diseases of poverty. Destitute farm-folk as full-fledged members of a co-operative group have acquired for the first time in their lives, a sense of economic and social progress this system, has finally helped to redress the most distressing evil of rural existence, the idiocy of village life." *Henrik F. Infield*—Co-operative Communities at work.

ডাকিয়া আনিয়াছে। অথচ সমবায় দপ্তর হইতে ইহারা প্রচুর অর্থসাহায্য ও অন্যান্যরূপ সুবিধা পাইয়াছে। অনুপস্থিত ধনী মালিকেরা আরও ধনী হইয়াছে, গরীব চাষীদের দারিদ্র্য বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে অসম্পূর্ণ ভূমিবিপ্লবের ভিত্তিতে সমবায় চাষ গড়িয়া তোলা কতখানি সম্ভব তাহা পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টের ফলে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে।*

সর্বোন্নত পারিবারিক জোত অথবা সর্বোন্নত সমবায়ী জোত
(Optimum Family Farm or Optimum Co-operative Farm)

ছোট ছোট পারিবারিক জোত ও সেবা-সমবায়ের নানাবিধ সাহায্য—এই দুই মিলিয়া সর্বোন্নত পারিবারিক জোত পাওয়া যাইবে এবং ভারতের পক্ষে ইহাই কল্যাণকর, আজকাল অনেকেই এইরূপ বলেন। হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে ইহা সত্য হইতে পারে, কারণ জনসংখ্যার চাপ সেই সকল দেশে ভারতের ন্যায় এত বেশি নয়। শুধু তাহাই নহে, জমির গড় উৎপাদন-ক্ষমতা আমাদের দেশে খুবই কম। উপরন্তু, সেবা-সমবায়ের সাহায্যে আনুষঙ্গিক কতকগুলি সুযোগ লাভ একান্তই স্বল্পকালীন সুবিধা—উহা দেশের স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হইতে পারে না। আর সেবা সমবায়ের সুবিধা প্রধানত বড় চাষীরাই পাইতে পারে।

অনেকে বলেন যে, ছোট জোতের ফলে প্রগাঢ়-চাষ সম্ভব হইবে এবং আবাদী জমির সহিত গরু, ঘোড়া বা মহিষের অনুপাত বেশি থাকায় (higher live-stock ratio per unit of cultivated area) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ইহা সত্য নয়। ডাঃ অটো শিলার (Dr. Otto Schiller) দেখাইতেছেন যে, জমিতে চাষের প্রগাঢ়তা (intensivity of exploiting land) ক্রমে কমিয়া আসে, বিশেষত ক্ষুদ্র জোতের ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশি সত্য।

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র জোতের অবস্থা আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে আধুনিক কালে ক্ষুদ্র জোত সম্পূর্ণ অচল হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম জার্মানিতে ক্ষুদ্র জোতের মালিকগণ চাষের জীবজন্তু বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। ক্ষুদ্র জোতের নিয়মিত চাষ তাহারা ক্রমে বন্ধ করিয়া দিতেছে কারণ উহা হইতে পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় আয় হইতেছে না, কারখানায় কাজ খোঁজার উদ্দেশ্যে শহরে চলিয়া যাইতেছে। কয়েক

---

* **Studies in Cooperative Farming, Programme Evaluation Organisation.** ***Planning Commission.***

বৎসর ধরিয়া সুইডেন, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডেও এইরূপ ঘটিতেছে। ইহার কারণ দুইটি : (ক) সর্বোন্নত আয়তনের জমি কম থাকায় ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা ইহারা পায় না, এবং (খ) সমগ্র পৃথিবীতে অন্যান্য সকল প্রকার জীবিকা হইতে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র যৌথ হইতে তত দ্রুত আয় বাড়ানো যাইতেছে না। যদি উন্নত দেশগুলিতেই ক্ষুদ্র জোত হইতে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব না হয়, তবে অনাহারের স্তরে চাষ করে এইরূপ ভারতীয় চাষীকে ক্ষুদ্র জোতের চাষে আবদ্ধ রাখা উচিত, এই কথা কি করিয়া বলা হইতেছে তাহা বোঝা শক্ত।

বিদেশে ক্ষুদ্র জোতে এখনও যাহারা চাষ করে তাহারা প্রধানত বেকার অথবা অন্যত্র কাজ করার অনুপযুক্ত। ফ্রান্স, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের অনুসন্ধান হইতে দেখা গিয়াছে যে, ক্ষুদ্র জোতই নিম্ন উৎপাদন-ক্ষমতার কারণ এবং ইহারই ফলে অপূর্ণ কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। জোত ক্ষুদ্র থাকার জন্যই স্বল্প-উৎপাদন ও স্বল্প-নিয়োগ পাশাপাশি চলে। প্রধানত বৃদ্ধ এবং বিধবা মিলিয়াই ইউরোপের ক্ষুদ্র জোতগুলিতে চাষ করিতেছে। তাহাদের অর্ধেকের বেশির ভাগ রাষ্ট্র হইতে পেন্‌শন, বেকার-ভাতা বা বার্ধক্য-সাহায্য পাইতেছে। অকৃষিগত কাজকর্ম হইতে আয়ই ক্ষুদ্র জোতের চাষীদের ক্ষেত্রে বেশি। জাপানে মোট ভূমি-পরিমাণের মাত্র ১৬% চাষযোগ্য, তাই ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা এত বেশি হইতে বাধ্য।

সুতরাং আমাদের একমাত্র উপায় হইল সমবায় চাষ এবং এই উদ্দেশ্যে সর্বোন্নত সমবায়ী জোত (optimum co-operative farm) গঠন করা। একটি গ্রামকেই একটি ইউনিট ধরা ভাল, তবে গ্রামটি খুব বড় হইলে উহার মধ্যে দুই তিনটি সমবায় চাষ সমিতি থাকিতে পারে। সমবায়ী চাষের জোত কত বড় হইলে উহা সর্বোন্নত হইবে তাহা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে—জমির গুণ, জলসেচ ব্যবস্থা, বাজারের দূরত্ব, কি শস্য উৎপাদন হওয়া সম্ভব এবং আরও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ। উহা ততটা বড় হওয়া দরকার যাহাতে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সময় ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি লাভ করিয়া উহাদের প্রতিটি বিষয়ের সর্বোন্নত স্তরে ফার্মটি থাকে। যেমন যন্ত্রজনিত, পরিচালনগত ও বাজারগত সর্বোন্নত স্তরে ফার্মটি যেন উন্নীত হয়, তাহাতেই সর্বাধিক দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির হার পাওয়া যাইতে পারে।

কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির যন্ত্রীকরণ (Mechanisation of Agriculture) : ভারতে কৃষি-উৎপাদনে আধুনিক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ কৃষি-উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধানত মূলধন-প্রগাঢ় নয়। প্রাচীন ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উৎপাদন হয় বলিয়া চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কম। আজকাল ইহা সকলেই জানেন যে, উন্নত ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ করিলেই উৎপাদন বাড়িতে পারে।

কৃষি-পদ্ধতির যন্ত্রীকরণ বলিলে বোঝা যায় পশুশক্তি বা মনুষ্যশক্তির পরিবর্তে কৃষিক্ষেত্রের শ্রমসাধ্য কাজগুলি যন্ত্রশক্তির সাহায্যে করা। কাঠের লাঙল ও গরু-মহিষের বদলে ট্রাক্টর (Tractor) ব্যবহার করা, বীজ বপন ও সার দেওয়ার কাজ একসঙ্গে করার জন্য কম্বাইন ড্রিল (Combine-drill) ব্যবহার করা, ফসল কাটা ও ময়লা বা খোসা ছাড়াইবার জন্য হারভেস্টার-থ্রেসার (harvester-thresher) ব্যবহার করা, ফসল বিক্রয়ের জন্য গরুর গাড়ির বদলে লরী ব্যবহার করা— ইহাই কৃষির যন্ত্রীকরণ। ফসল উৎপাদন ও বিক্রয়ের সকল কাজ প্রধানত যন্ত্রের সাহায্যে করাকেই কৃষির যন্ত্রীকরণ বলে।

যন্ত্রীকরণ কাহাকে বলে

এই যন্ত্রীকরণের সুবিধা অনেক। উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পায়; মানুষের অপ্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব ঘটে। অর্থনৈতিক দিক হইতে অপচয়মূলক বহু গরু-মহিষ ভরণপোষণ করার ব্যয়-বাহুল্য বর্জন করা যায়। ফসলের রোগ বা কীটপতঙ্গ দেখা দিলে যন্ত্রের ব্যবহারে উহা রোধ করা সম্ভব হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের ও শ্রমবিভাগের ফলে বিশেষায়ণের ব্যয়সংকোচগুলি কৃষিতে ভোগ করা যায়। একর-প্রতি মোট ব্যয় বাড়িলেও শস্যের ইউনিট-প্রতি ব্যয় বা গড় ব্যয় হ্রাস পায়। সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে উহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কৃষির এইরূপ উন্নয়নের ফলে কৃষকের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, খাদ্যাভাব দূর হয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

যন্ত্রীকরণের সুপ্রভাব : কৃষির ও সামগ্রিক অর্থনীতির উপর

যন্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে বলা হয় যে ইহাতে কৃষির উৎপাদন-পদ্ধতি মূলধন-প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে, ফলে বর্তমানের তুলনায় কম শ্রমিক দরকার হইবে এবং দেশে বেকারি বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি শ্রমিকের কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকার দিনের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। যদি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ

এবং কৃষিজাত শস্যের চাহিদা উভয়ই বেশি থাকিত তবে কৃষির যন্ত্রীকরণে বেকারি দেখা দিত না। ভারতে চাষযোগ্য জমি আর বেশি নাই, ফসলের উৎপাদন বাড়িলে দাম দ্রুত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। তাই বর্তমান অবস্থায় যন্ত্রীকরণের প্রত্যক্ষ ফল হইবে গ্রামাঞ্চলে বেকারি। ইহাদের সকলকে শিল্পে নিয়োগ করার মত দ্রুত শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে না, আর তাহা ছাড়া ইহাদের শিল্পজ্ঞান, দক্ষতা ও যন্ত্রবিদ্যার স্তর দ্রুত প্রসারমান দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়োগের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয়।

বর্তমান কাঠামো বজায় রাখিলে যন্ত্রীকরণের কুপ্রভাব : বেকারি বৃদ্ধি

ইহা ছাড়া, যন্ত্রীকরণের কিছু কিছু বাস্তব অসুবিধার কথাও বলা হয়। ভারতে গড় জোতের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, যন্ত্রের ব্যবহার হইতে পারে বড় জোতে। যন্ত্রীকরণের ফলে ভারতের প্রচুর পরিমাণে গরু-মহিষ উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িবে। বর্তমানে চাষীদের আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যেরূপ তাহাতে যন্ত্রীকরণের উপযুক্ত মূলধন নাই বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া, বর্তমানে জীবন-ধারণের স্তরোপযোগী চাষ (Subsistence farming) ছাড়াইয়া বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদন শুরু না হইলে যন্ত্রীকরণ করিয়া কি লাভ হইবে ? আরও একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা দরকার। ভারতে আবাদী জমির বেশির ভাগ এখন পর্যন্ত জলসিঞ্চিত হইয়া উঠে নাই, প্রকৃতির খেয়াল-খুশির উপর যেখানে নির্ভরশীলতা এত বেশি সেখানে এত প্রচুর বিনিয়োগ করিয়া যন্ত্র ব্যবহার করা আর ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ি জুড়িয়া দেওয়া একই কথা। উপরন্তু, এত ট্রাক্টর তৈয়ারি ও মেরামতির উপযুক্ত কারখানা ভারতে স্থাপিত হয় নাই।

অন্যান্য অসুবিধা

ভারতের কৃষি-অর্থনীতির অল্প একটু অংশে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে মজুর খাটাইয়া চাষ হয়। বিদেশী ও দেশীয় মালিক পরিচালিত বাগিচাগুলিও (plantations) অনেক সময় যন্ত্র ব্যবহার করে। রাষ্ট্র কিছু কিছু প্রদর্শনী ফার্ম খুলিয়াছে, সেখানেও যন্ত্রের ব্যবহার হয়। এই সকল বিভিন্নক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এবং পতিত জমি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কিছু ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি বাহির হইতে আমদানি হইয়া আসিয়াছে। লোহার লাঙল, তৈল-ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ও কৃষি-উৎপাদন সংক্রান্ত আরও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির পরিমাণ ভারতে কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সারা

খুবই সীমাবদ্ধক্ষেত্রে সামান্য যন্ত্রীকরণ ঘটিয়াছে

দেশের জমি ও চাষীর তুলনায় ইহা এত কম যে, দেশের কৃষির গড় উৎপাদন-ক্ষমতার উপর উহার প্রভাব বিশেষ হয় নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পতিত জমি, উদ্ধার, জলসেচ, সার, বীজ ঋণ, বিক্রয় প্রভৃতির উপর জোর দিয়া কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রধানত এই সকল বিষয়েরই উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে; যন্ত্রীকরণের কথা চিন্তা করা হয় নাই। বেকার সমস্যা দেখা দিবার ভয়ে এবং জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের নীতি বিফল হওয়ায় ঐ দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই, শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিসমূহ অবলুপ্ত করার কথা বলা হয় নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাস্তব অবস্থা তৈয়ারী ছিল না

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বলা যায়, যে-সকল বাধাবিপত্তির কথা বলা হইতেছে তাহা একমাত্র ভারতবর্ষের কৃষিকাঠামোকে নিশ্চল ধরিয়া লইলেই দেখা দিবে। স্থিতিশীল আলোচনা পদ্ধতির পরিবর্তে সামগ্রিক উন্নয়নের গতিশীল পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, যন্ত্রীকরণের সহিত কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চাষী প্রতি ও একর প্রতি উৎপাদন-ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়া দিবে এইরূপ যন্ত্রীকরণ বর্তমান কৃষি কাঠামোর মধ্যে কখনই সম্ভব নহে। ক্ষুদ্র ও জোত জীবনধারণের চাষ, কম মূলধনের প্রয়োগ ও আত্ম-ভোগকেন্দ্রিক কৃষি—এই ধরনের কৃষিকাঠামোকে উত্তরণ না করিলে যন্ত্রীকরণ কিছুতেই সম্ভব নহে। উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ কৃষি-ক্ষেত্রের এই প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবন্ধকগুলির অবসান ঘটান একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে ভারত সরকারের কৃষি নীতি যে পথে চলিয়াছে তাহাতে যন্ত্রীকরণের সম্ভাবনা কতখানি তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান কৃষিসংস্কারের ধরন অনুসারে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। জমিদার বা ধনী চাষীগণ বিভিন্ন নামে বা বেনামীতে প্রত্যেকে সেই সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত জমি রাখিতে পারিয়াছে, খুব অল্প পরিমাণ জমি ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিলির জন্য পাওয়া গিয়াছে। এই সকল জমিদারগণ দীর্ঘকাল হইতে মধ্যস্বত্বভোগী, গ্রামে অনুপস্থিত, নিজেরা কখনই চাষ করেন না, প্রজা বা

বর্তমানে সেই বাস্তব অবস্থা তৈয়ারী হইতেছে, ধনীদের হাতে প্রচুর জমি

মজুর দিয়া চাষ করান, শারীরিক পরিশ্রমের উর্ধ্বে থাকিয়া পদমর্যাদা অটুট রাখিতে চাহেন। কিন্তু ভূমিসংস্কারের আইনগুলিতে ইহাদেরই 'চাষী' (cultivator) বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সকল বৃহৎ "চাষীরা" এবং গরীব দুই তিন একরের প্রকৃত চাষীরা মিলিয়া সমবায় চাষ-সমিতি গঠন করার কথা সরকার বলিতেছেন। এই সমবায় সমিতির মধ্যে বেশি জমির মালিকেরা যুক্ত থাকায় এই বড় চাষীরাই বেশি লভ্যাংশ পাইবে, ফলে তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টাতে যন্ত্রীকরণ ঘটাইয়া লইবে। জমির মালিকানা যদি বাঁধিয়া দেওয়া হয় তবে নির্দিষ্ট জমি হইতেই যথাসম্ভব অধিক আয় করিতে হইবে—উৎপাদনের এই মৌলিক নিয়মের কার্যকারিতা ভারতে শীঘ্রই শুরু হইয়া যাইবে। সমবায় চাষ সমিতির নামে তাই সমগ্র কৃষি কাঠামোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ মুনাফা কারবার গড়িয়া উঠিতেছে এবং এইরূপেই ধনতান্ত্রিক কৃষিকাঠামো ও যন্ত্রীকরণের বাস্তব ভিত্তি রচিত হইতেছে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এই বাস্তব অবস্থার তাগিদে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইস্পাত লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় সস্তা ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের জন্য এই সকল বৃহৎ "চাষী"রাই চাপ দিতে থাকিবে। সমাজতান্ত্রিক যৌথখামার স্থাপিত হইলে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত কৃষি পরিকল্পনায় বেকারির সম্ভাবনা এড়াইয়া ধীরে ধীরে যন্ত্রীকরণ ঘটিত (যেমন, চীন); কিন্তু মুনাফা একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় বেসরকারীক্ষেত্রের কৃষিকার্যে অপরিকল্পিত যন্ত্রীকরণই ঘটিবে, কেবল বেকারি বৃদ্ধির সামাজিক ব্যয়ভার বাড়িবে আর সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়-বৈষম্যের পরিধি প্রশস্ত হইতে থাকিবে।

সেই ধনীরাও আইনত চাষী ও সমবায়ে যোগদানের অধিকারী

সুতরাং ধনী চাষীর নেতৃত্বে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক যন্ত্রীকরণ ঘটিবে

অনুশীলনী

1. Discuss the possibilities and limitations of mechanised farming in India.

2. Examine the case for cooperative farming in India. What methods would you suggest for the development of cooperative farming in this country.

3. Discuss the case for and against Cooperative Farming in India.

Mod. 1964)

4. Discuss the different proposals which have been made to solve the problems of subdivision and fragmentation of agricultural holdings in India.

5. What is cooperative farming? Do you think that cooperative farming is suitable to the Indian economy? Give reasons for your answer.

৯

চাষী ও মূলধন

Cultivator and Capital

চাষী ও ঋণ (Cultivator and credit)

কৃষির কলাকৌশলের কথা এবং ইহা এক বিশেষ ধাঁচের জীবনযাপন প্রণালী, তাহা মানিয়া লইয়াও বলা চলে যে প্রধানত ইহা ব্যবসায়,—উৎপাদন, বিক্রয়, আয় বা মুনাফা লইয়াই ইহার কাজকর্ম। সকল ব্যবসায়ের মত কৃষিকার্যেও মূলধনী দ্রব্য রক্ষা করা, অদল-বদল করা ও উন্নত করা এবং চল্‌তি কাজকর্ম করার জন্য নগদ টাকা বা জিনিস-পত্র প্রভৃতি ঋণ করার প্রয়োজন আছে। জমিকে রক্ষা করা, উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় পরিণত করা ; ঘরবাড়ি নির্মাণ করা ও রক্ষা করা, জল, সার, বীজ, আইল ও বেড়ার বন্দোবস্ত করা, গরু ঘোড়া মহিষকে খাওয়ানো, বাঁচানো, আগাছা নিড়ানো, অসুখ নিবারণ, চাষীর নিজের বা কর্মচারীদের ভরণপোষণ, উৎপন্ন শস্য মজুত করা, বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা—সকল কাজই ছোট ছোট চাষীকে করিতে হয় এবং তাহার জন্য প্রায়ই ঋণ করিতে হইতে পারে।*

ঋণের দরকার

জীবনধারণের উপযোগী চাষের স্তর হইতে কৃষিকার্য ক্রমশ যত ব্যবসায়ের স্তরে উঠিতে থাকিবে ততই দেশে এইরূপ কৃষিঋণের প্রয়োজন বাড়িতে থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, পরিবর্তনের মুখে এইরূপ ঋণের প্রকৃতিও বদলাইতে থাকিবে, অনুৎপাদক ভোগ-মুখী ঋণের পরিবর্তে উৎপাদক ও বিনিয়োগমুখী ঋণের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে।

পুরানো একটি ফরাসী প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'ফাঁসির দড়ি যেমন আসামীকে, ঋণও তেমনি চাষীকে ঝুলাইয়া রাখে।† ভারতেও এইরূপ

* অপুর্ণোন্নত দেশগুলিতে ক্ষুদ্র চাষীদের দ্বারা জীবনধারণের স্তরোপযোগী চাষব্যবস্থা (subsistence farming) প্রচলিত থাকে, এবং ফলে কৃষিতে শ্রমবিভাগের প্রসার খুব কমই থাকে বলা চলে।

† "Credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged."

বলা হয় যে, সেই গ্রামই বাসের উপযুক্ত যেখানে প্রয়োজনে ঋণ পাইবার মত মহাজন, অসুখের সময় বৈদ্য, পূজা-অর্চনার কাজে ব্রাহ্মণ এবং গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায় না এইরূপ একটি নদী আছে।

চাষী ও ঋণের সম্পর্ক কি

কৃষিঋণ পাওয়া না গেলে সমস্যা তো বটেই, কিন্তু পাওয়া গেলেও উহা লইয়া সমস্যার শেষ নাই, কারণ অনেকক্ষেত্রে এরূপভাবে ঋণ পাওয়া যায় যাহা উপকারের তুলনায় অপকারই বেশি করে। ভারতে কৃষিঋণের সমস্যা দুইটি : প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কম এবং যে ভাবে ইহা পাওয়া যায় তাহা চাষীর পক্ষে বিপজ্জনক। স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটনের ভাষায় বলিতে গেলে ভারতে উন্নয়নের প্রধান বাধা হইল শয়তানী টাকার শক্তি (power of evil finance)।

কারখানা-শিল্পের সহিত কৃষিকার্যের চরিত্রগত তারতম্য খুব বেশি, তাই শিল্পঋণ কাঠামো ও কৃষিঋণ কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের মধ্যেই কৃষিঋণ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিহিত আছে। শিল্পসমূহ শহরে স্থাপিত এবং কেন্দ্রীভূত, কৃষিকার্য চলে গ্রামে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে ; কৃষিঋণ কাঠামোতে তাই সুসংগঠিত কোনরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উৎপাদনের ইউনিটই বড়, যৌথমূলধনী কারবারের রূপে গঠিত ; ইহাদের মূলধনের প্রয়োজন হইলে শেয়ার বিক্রয় করিয়া বা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া পাওয়া সম্ভব। কৃষিকার্য অসংগঠিত ও ছোট ছোট, ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রধান এবং বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা তোলা সম্ভব নয়। বৃষ্টিপাত বা প্রকৃতির খেয়াল-খুশির উপর ইহা অনেকাংশে নির্ভরশীল, তাই ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য পচনশীল, মজুত দ্রব্য হিসাবে উহাকে বন্ধকীর উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে না। কৃষি-উৎপাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, সারা বৎসব ধরিয়া সমান তালে উৎপাদন হয় না। তাহা ছাড়া, কৃষক নিজে শস্যের দাম স্থির করিতে পারে না, দাম তাহার উপর চাপানো হয়, তাহার আয় সীমাবদ্ধ, প্রায়ই লোকসান হয়। ইহাতে ঋণ দেওয়ার অসুবিধা।* সর্বোপরি,

কৃষি ও শিল্পের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ও কৃষিঋণের ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব

* এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কৃষিঋণ যোগান দিবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের টাকা শীঘ্র ফেরৎ চায় (quick turnover)। জমি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ দরকার, গরু বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যেও মাঝারিকালীন ঋণ প্রয়োজন—ইহারা সকলেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের বাহিরে। চাষীরা দুর্গম স্থানে এবং ছড়ানো অবস্থায় থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কর্মচারীরা তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখিতে পারে না।

জীবনধারণের স্তরোপযোগী কৃষিকার্য এমন ক্ষুদ্র চাষের ভিত্তিতে চলে যে, ইহা কখনই বেশি পরিমাণ মূলধন আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং বেশির ভাগ ঋণই দরকার হয় চাষীর ভোগের উদ্দেশ্যে।

কৃষিঋণের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা দরকার। অর্থের অভাব এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা নয়; মূল কথা হইল, এই অর্থের দাম খুবই বেশি (ইহার সুদের হার এবং ইহার দরুন মহাজনের নিকট চাষীর অন্যান্য ধরনের বশ্যতা)। অর্থের দাম (অর্থাৎ সুদের হার) অনেক কারণেই বেশি, উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঋণকারী চাষীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থান ও মর্যাদা।

কৃষিঋণের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

কৃষিঋণ-কাঠামো পরিকল্পনার সময়ে তাই চাষীর জীবনের সকল প্রয়োজনের পূর্ণ চিত্র গ্রহণ করা দরকার, নিছক কৃষিকার্যে দরকারের হিসাব গ্রহণ করিলে চলে না। দীর্ঘকালীন সুদের হার খুব কমাইয়া কি লাভ হইতে পারে, যদি স্বল্প-কালীন সুদের হার বেশি থাকে অথবা জমিদার, মহাজন, দালাল বা ফড়িয়ার নিকট চাষী কম দামে ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়? গ্রামের মুদি দোকান হইতে যদি ১০০% বা তদূর্ধ্ব হারে ঋণ করিয়া জিনিস কিনিতে হয়, তবে স্বল্পকালীন সুদের হার কম করিলেও উহার কতটুকু প্রভাব হইতে পারে? সুদের হার কম রাখিয়া প্রচুর ঋণ পাইবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইল, কিন্তু ধর্মীয় ও গার্হস্থ্য জীবনের ব্যয়বহুল উৎসবের কি হইবে? কৃষিকার্যের খুঁটিনাটি বিচার করিলেই তাই কৃষকের জীবন ভরিয়া উঠে না, চাষের কাজের বাহিরেও তাহার সামাজিক পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের বন্ধকীর দোকান, গ্রাম্য বিপবাদের নিকট হইতে ঋণ, আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বহুবিধ সাহায্য, যাত্রা, থিয়েটার, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পণপ্রথা ও বর্ণভেদ প্রথা সকল কিছু মিলাইয়াই চাষীর জীবনের অর্থনৈতিক পরিবেশ—কৃষিঋণ পরিকল্পনার সময়ে তাই সামগ্রিক উন্নয়নের দিক সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

চাষীর ঋণের উৎস (Sources of Rural Finance)

ভারতে চাষীদের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ঋণের পরিমাণ কত তাহা লইয়া অনেক হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হিসাব করিয়াছিল যে, স্বল্প ও মধ্যকালীন ঋণের প্রয়োজন হইল বৎসরে মোট ৫০০ কোটি টাকা। ১৯৫২ সালে খাদ্য-বাড়াও-অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছিল যে, বাৎসরিক প্রয়োজনীয় মোট

ঋণ-প্রয়োজনের পরিমাণ

ঋণের পরিমাণ হইল ৮০০ কোটি টাকা। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত সর্বভারতীয় ঋণ অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছে যে, স্বল্পকালীন, মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণরূপে বৎসরে মোট ৭৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন।

সর্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটি ১৯৫৪ সালের রিপোর্টে মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় চাষীরা কোন্ কোন্ সূত্র হইতে ঋণ পায়। নিম্নে উহাদের তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।*

	উৎস	মোট ঋণের কত অংশ
১।	সরকার	৩.৩
২।	সমবায় সমিতি	৩.১
৩।	আত্মীয়স্বজন	১৪.২
৪।	জমিদার	১.৫
৫।	কৃষি-মহাজন	২৪.৯
৬।	পেশাদার-মহাজন	৪৪ ৮
৭।	ব্যবসায়ী ও দালাল	৫.৫
৮।	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক	০.৯
৯।	অন্যান্য	১.৮
	মোট	১০০.০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সরকার ও সমবায় সমিতিগুলি সম্মিলিত মোট কৃষিঋণের ৬.৪ সরবরাহ করিয়া থাকে, এবং অন্যান্য সকল বেসরকারী ও অসংগঠিত সূত্র হইতেই ৯০% ঋণ পাওয়া যায়। বেসরকারী সূত্রের মধ্যে কৃষিজীবী ও পেশাদার মহাজনেরাই ৭০% ঋণ সরবরাহ করে।

কেন মহাজনই প্রধান ও ভহাব বিপদ কোথায়

মহাজনেরা চাষীদের কাছাকাছি থাকে এবং প্রয়োজন হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চাষীদের নিকট ঋণ লইয়া হাজির হইতে পারে। তাহাদের সঙ্গে চাষীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং খুব সাদাসিদা ভাবেই তাহারা কাজ চালায়। চাষীর ঋণযোগ্যতা, তাহার জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ, ফসলের দাম সকল কিছু সম্পর্কে তাহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, বিনা বন্ধকীতে বা

* —All India Rural Credit Survey—*General Report* Ch, 14. P. 161.

খুব কম বন্ধকীতে চাষী ঋণ পাইতে পারে। কিন্তু মহাজনের এই প্রতিপত্তি কখনই সুফলদায়ী নয়। সহজে ঋণ পায় বলিয়া চাষী অনেক সময় অনুৎপাদক কাজে ঋণ করার জন্য প্রলুব্ধ হয়। ইহারা অতিরিক্ত সুদ আদায় করে। গড়ে ২৫% হইতে ৫০% সুদের হার চাষীকে বহন করিতে হয়। অধিকাংশ মহাজন অসৎ, তাই নিরক্ষর চাষীকে ঠকাইয়া ইহারা ধনসম্পদ ও আধিপত্য বৃদ্ধি করে। অনেক মহাজন ব্যবসাদার বা দালাল, তাহারা অল্প মূল্যে ফসল কিনিয়া লওয়ার সুযোগও পায়।

ব্যবসায়ী ঋণের প্রকৃতি

ব্যবসায়ীরা ও তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ ফসল লইয়া ব্যবসায় করিতে গিয়া চাষীকে অগ্রিম দাম বা দাদন দেয়। ইহাতে চাষীর সাময়িক সাহায্য হয়, এবং ফসলের দামের উঠানামার ঝুঁকি সে কিছুটা বীমাবদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণত ব্যবসায়ীরাই শক্তিশালী হয় এবং চাষীই উৎপন্নের দাম কম পাইয়া থাকে। এই দাদনের উপর অনেক ক্ষেত্রেই সুদ লওয়া হয় না।

সরকারী ঋণের ত্রুটি

সরকারী ঋণ পরিমাণে কম, বণ্টনের দিক হইতে অন্যায্য এবং নিরাপত্তার দিক হইতে অনুপযুক্ত। ঋণ দেওয়া ও আদায়ের ব্যাপারে ইহা অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল। তদারকের দিক হইতে ইহা দায়িত্বহীন এবং এখনও পর্যন্ত অনেকাংশে অসংগঠিত।

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা

ভারতের সমবায় আন্দোলন যে অনেকাংশে বিফল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল সমবায় সমিতিসমূহ মোট ঋণের মাত্র ৩.১% সরবরাহ করিয়া থাকে। এই ঋণ বেশির ভাগই পায় খুব বড় চাষীরা এবং তাহাও শেষ পর্যন্ত পরিশোধ হয় না।

অবস্থা উন্নতির উপায়ঃ সর্বভারতীয় ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ (How to improve the situation: Recommendation of All India Rural Credit Survey Report)

সর্বভারতীয় ঋণ অনুসন্ধান কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ভারতের কৃষিঋণ-ব্যবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিসমূহের পুনর্গঠনই প্রধান প্রয়োজন। এতদিনে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতার দরুন উহাদের প্রসার হইতে পারে নাই। জমিদারী প্রথায় চাষীর পৃথক অস্তিত্ব বিশেষ থাকে না, প্রতি-বৎসর চাষের অধিকার পাইবার জন্য জমিদারের বা

জোতদারের নেতৃত্বে তাহাকে চলিতে হয়, তাহারই নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে চাষীরা বাধ্য থাকে। বিভিন্ন জমিদারের অধীনে চাষীরা বিভক্ত থাকিলে কিরূপে তাহারা সমবায়ে মিলিত হইবে? তাহা ছাড়া, বেসরকারী মহাজনী ব্যবসাদাররাও ইহার বিরোধিতা করিয়াছে। ভারতে সরকার সমবায় আন্দোলনকে গাছের মত দুই হাতে চাপিয়া মাটিতে ধরিয়া রাখিয়াছে, কারণ ইহার শিকড় জমিতে প্রবেশ করিতে চাহে নাই*। সমবায়ের শিকড়ের বদলে মহাজনের নখ ও দন্তই কৃষিসমাজের গভীরে প্রবেশ করিয়াছে।

কমিটি এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুসম্বদ্ধ গ্রাম্য ঋণ কাঠামো (An Integrated Rural Credit Scheme) গড়িয়া তোলার কথা বলিয়াছেন। ইহার প্রধান ভিত্তি দুইটি; (ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির ঋণ নীতি পরিবর্তন করা দরকার। যে কোন চাষী তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ফসলের দাম অনুযায়ী সেই ফসল জমা দিবার প্রতিশ্রুতিতেই সমবায় সমিতির সভ্য হইয়া ঋণ পাইতে পারিবে। (খ) সমবায় সমিতিগুলির কাজে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার দরকার, যাহাতে (১) বড় চাষীর মত ছোট চাষীরাও সমবায় হইতে সাহায্য পায়, (২) সমিতিসমূহ বড় চাষীর কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে (৩) ব্যবসায়ী ও মহাজনের কায়েমী স্বার্থ এমনভাবে সংকুচিত হয় যাহাতে সকল দিকেই সমবায়ী কাজকর্মের ক্রমপ্রসার হইতে পারে, (৪) প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি উপরের সমিতিসমূহ হইতে প্রয়োজনমত প্রচুর অর্থ সাহায্য পায়, (৫) প্রতি জিলাতে কেন্দ্রীয় অর্থসংস্থানের সূত্রগুলি (the central financing agencies in the district) যথাসাধ্য জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করে এবং শস্যঋণ ব্যবস্থা (crop-loan system) কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হয়।

কৃষিঋণের সুসম্বদ্ধ কাঠামো গড়িয়া তোলার জন্য কমিটির প্রধান সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম হইল (ক) সমবায় বাজার-সমিতির সহিত সমবায়ী ঋণের সম্পর্ক স্থাপন করা। মহাজনকে কৃষিঋণের বাজার হইতে অপসারণ করার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির প্রসার করা দরকার। অতীতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে কারণ ইহা ছিল দুর্বল, ইহাকে সবল করার জন্য

* "A plant held in position with both hands by Government since its roots refused to enter the soil."

ইহার সকল স্তরের সমিতির সঙ্গে রাষ্ট্রের অংশীদায়িত্ব দরকার। ঋণ-সমিতি ও বাজার-সমিতিগুলির একত্রে কাজ করা দরকার, যাহাতে বাজার-সমিতির মারফত ভাল দামে ফসল বেচিয়া ঋণসমিতি ঋণ শোধ করিতে পারে। এইরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই ছোট ও মাঝারি চাষীর পক্ষে ফসল বা জমি-বন্ধকের বিনিময়ে উপযুক্ত ঋণ পাওয়া সম্ভব হইতে পারে।

(খ) গুদাম পরিকল্পনা—যখন শস্যের দাম বাড়িবে তখনই চাষী বিক্রয় করিবে—এই অবস্থা আনয়নের জন্য দেশে প্রচুর-সংখ্যক গুদাম স্থাপন করা দরকার। গুদাম স্থাপন করিলে সমবায় বিক্রয়-সমিতিসমূহের কাজের অনেক সুবিধা হইবে। তাই, এই "জাতীয় সমবায়ী উন্নয়নমূলক গুদাম নির্মাণ বোর্ড" (National Co-operative Development and Warehousing Board) স্থাপন করার কথা কমিটি বলিয়াছেন। এই বোর্ডের হাতে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ফাণ্ড থাকিবে (National Co-operative Development Fund), ইহা হইতে রাজ্য সরকারসমূহকে দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা সমবায়ী বাজার ও অন্যান্য সমিতির মূলধন-ভাণ্ডারে অংশগ্রহণ করিতে পারে। রাজ্য গুদাম নির্মাণ কোম্পানি (State Warehousing Companies) এবং একটি সর্বভারতীয় গুদাম নির্মাণ করপোরেশন (All India Warehousing Corporation) স্থাপনের কথাও কমিটি বলিয়াছেন। বেশি ঋণ পাওয়া, সহজে পাওয়া, বড় ও ভাল সমবায় সমিতি, কেবল ঋণ ছাড়াও অন্যান্য কাজ করে এমন সমিতি, সরকারী অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পুষ্ট সমবায় সমিতি সরকারী গুদাম নির্মাণ পরিকল্পনা—সকল কিছু মিলিয়া কমিটির মতে ভবিষ্যতে সমবায় আন্দোলন সাফল্য লাভ করিবে।

(গ) রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন : সারা দেশ জুড়িয়া ছোট ছোট সমবায় সমিতি ও গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে এবং উহাদের অর্থসংগ্রহ ও পরিচালনার সুবিধার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank) স্থাপন করা দরকার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়া গ্রামাঞ্চলে উহার শাখার সংখ্যা আরও বাড়ানো হইবে যাহাতে সমবায় ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সমিতিগুলি আরও বেশি ও সস্তায় ঋণ পাইতে পারে এবং গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় (ব্যাঙ্কে আমানতের মাধ্যমে একত্রে সংগৃহীত হইতে পারে।

(ঘ) তিনটি ভাণ্ডার স্থাপন : কমিটি তিনটি বিশেষ ধরনের ভাণ্ডার

স্থাপনের কথা বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে দুইটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে এবং একটি খাদ্য ও কৃষি দফ্‌তরের অধীনে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে যে-ভাণ্ডার দুইটি স্থাপিত হইবে উহার মধ্যে প্রথম হইল জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) ভাণ্ডার বা National Agricultural Credit (Long term Operations) Fund। প্রথমে ৫ কোটি টাকা লইয়া ইহা স্থাপিত হইবে এবং প্রতি বৎসর ৫ কোটি টাকা উহাতে জমা দেওয়া হইবে। রাজ্যসরকারের অংশীদারত্বে পরিচালিত সমবায় ব্যাঙ্ক, বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও ঋণসমিতিগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাণ্ডারের সাহায্যে ঋণ দিতে পারিবে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘকালীন (৫ বৎসরের অধিককালের জন্য) ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাণ্ডারকে ব্যবহার করিবে। দ্বিতীয় ভাণ্ডারটি নাম হইল জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্ববিধানকারী) ভাণ্ডার বা National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund। ইহাতে প্রতি বৎসর ১ কোটি টাকা জমা দেওয়া হইবে। এই ভাণ্ডারের সাহায্যে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যকালীন ঋণ দেওয়া হইবে, যখন দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও অনাবৃষ্টির দরুন তাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বল্পকালীন ঋণ শোধ দিতে পারে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষিদফ্‌তরের অধীনে বাৎসরিক ১ কোটি টাকা জমা লইয়া স্থাপিত হইবে জাতীয় কৃষিঋণ (রিলিফ ও গ্যারাণ্টি) ভাণ্ডার বা National Agricultural credit (Relief and Guarantee) Fund। এই ভাণ্ডার হইতে রাজ্যসরকারের মারফত সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়া হইবে। দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির পরে অপরিশোধ্য বকেয়া ঋণ তামাদি করার উদ্দেশ্য ওই ভাণ্ডার ব্যবহৃত হইবে। এই তিনটি ভাণ্ডার মিলিয়া পুনর্গঠিত সমবায় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

(ঙ) এইরূপ নূতন সুসম্বন্ধ গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত একদল কর্মী চাই। সমবায় দফতর, সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণ, বিক্রয় বা অন্যান্য সমিতির কর্মীদের দক্ষতার মান বাড়াইতে হইবে, তাহাদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অধিক অর্থ ব্যয় করা দরকার। গ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল একদল শিক্ষিত কর্মী অবশ্যই দরকার।

ভারত সরকার এই সকল ও আরও অন্যান্য সুপারিশ অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন। (ক) ১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্

ইণ্ডিয়াকে জাতীয়করণ করিয়া উহার নাম রাখা হইয়াছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া।. প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৪০০টি নূতন ব্রাঞ্চ খোলার দায়িত্ব ইহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। (খ) রাষ্ট্র যাহাতে সমবায় সমিতিগুলিতে অংশীদারিত্ব পাইতে পারে তাহার সুবিধার জন্য ১৯৫৫ সালে ১০ কোটি টাকা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার জাতীয় সমবায়ী উন্নয়ন ভাণ্ডার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। (গ) সরকার একটি কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করপোরেশন স্থাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্য গুদাম নির্মাণ করপোরেশন স্থাপনের কথাও চিন্তা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করপোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি জায়গায় গুদাম নির্মাণ করিবে। এক গুদামে মাল রাখা হইয়াছে এই রসিদের ভিত্তিতে সমবায় সমিতিসমূহ ঋণ দিবে। (ঘ) ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একত্রে সমবায়ী শিক্ষার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিয়াছেন। সমবায় দপ্তর এবং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। মাঝারি কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য পুনা, রাঁচী মীরাট, মাদ্রাজ এবং ইন্দোরে পাঁচটি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই বিপুল কার্যসূচী গ্রহণ করা উচিত কি না সেই বিষয়ে স্যার ম্যালকম ডারলিং বিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।* অতীতে সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী হইতে পারে নাই এবং বর্তমানেও ইহার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—এই কারণে দুর্বল ভিত্তির উপরে দ্বিতীয় পরিকল্পনার এত বৃহৎ কার্যসূচীর কাঠামো গড়িয়া তোলা অনুচিত হইবে, তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।† তিনি দেখাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠান বা প্রাথমিক ঋণ দান সমিতিগুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ দুর্বল অবস্থায় আছে। ইহাদের বকেয়া ঋণের ও সুদের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। নয়টি রাজ্যের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যের ২৫% সমিতি লোকসান দিতেছে।

পুরাতন পন্থী মিঃ ম্যালকম ডারলিং এর সমালোচনা

* "Report on certain aspects of co-operative movement in India 1957—Sir *Malcolm Darling*.

† 'It follows......that without strong primary units, effective organisations cannot be built. Yet it is proposed to add an imposing new storey...... to a structure...no where strong and in some states deplorably weak".
—*Darling Report* P. 1.

তাহা ছাড়া, এই আন্দোলন ভারতের সকল অঞ্চলে সমান ভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, বহু অনগ্রসর অঞ্চল রহিয়া গিয়াছে। এই পার্থক্য অস্বীকার করিয়া সকল অঞ্চলের জন্য সমান উন্নয়নের কর্মসূচী ও ভার গ্রহণ করা উচিত নহে। রেইফেসন-ধরনের ছোট ছোট প্রাথমিক সমিতির বদলে বৃহৎ সমিতি গঠন করিলে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব ক্ষুণ্ণ হইবে, সীমাবদ্ধ দায়িত্বের ফলে গরীব চাষী যোগ দিবে না ও প্রধানত ধনী চাষীরাই অর্থ নিয়োগ করিবে। সর্বোপরি, সরকারী সাহায্য ও পরিচালনা সমবায় আন্দোলনকে নিজস্ব গতিবেগ ও ধরন হইতে সরাইয়া আনিয়া নিছক সরকারী বিভাগে পরিণত করিবে, এইরূপ সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শিক্ষা প্রসারের ভিত্তি হিসাবে খাদ্যক্ষেত্র বা জীবন ধারণ ক্ষেত্রের বিপুল প্রসারের দরকার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা অনেকাংশে যে খাদ্য ঘাটতির বাধার সম্মুখীন হইয়াছে কৃষিসংস্কারের অসম্পূর্ণতাই তাহার মূল কারণ। সুতরাং কৃষির উন্নতি করা প্রয়োজন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইল কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটি ঠিক পথে অগ্রসর হইয়াছেন কি না। আমাদের মনে হয় যে, কোন সঠিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায় সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হইয়া গিয়াছে। যে ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ছোট ছোট চাষীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডগুলিকে স্বাধীন ভাবে চাষ করিতে থাকিবে, তাহাদের নিকট সহজে ও সস্তায় ঋণ পৌঁছাইয়া দেওয়া আসল কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গী রিপোর্টের প্রতিটি বিশ্লেষণ ও সুপারিশের ভিত্তি। শুধু তাহাই নহে, ভূমিস্বত্ব সংস্কারের (অবশ্য যদি তাহারা সম্পূর্ণ হয়) ফলে গ্রামাঞ্চল যে নূতন রূপ গ্রহণ করিবে সেই পশ্চাৎপটও অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে দরকার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত চাষ-প্রথা বিলোপ করিয়া রাষ্ট্রের মালিকানায় কৃষিমজুরদের লইয়া যৌথ চাষ সমিতি (State Collective farms) গঠন এবং উহারই পাশাপাশি স্বাধীন চাষীদের স্বেচ্ছাকৃত মিলনে গঠিত সমবায় চাষ সমিতি (Co operative farming Societies) গড়িয়া তোলা। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সকল চাষীর কাজকর্ম নব-প্রেরণায় উজ্জীবিত হইতে পারে. এই সমবায় চাষ সমিতিরাই সমাজোন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়ন ঘটাইতে পারে, ইহারাই উৎপাদন সংগঠন, উৎপাদন-বৃদ্ধি ও বণ্টনের

নব্য পন্থীদের সমালোচনা

পুরোধা প্রতিষ্ঠানরূপে দেশের কৃষি অর্থ নৈতিক কাঠামোতে স্থান করিয়া লইতে পারে। এই বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখে শুধুমাত্র ঋণদানের উদ্দেশ্যে "সুসম্বন্ধ ঋণ-কাঠামো" সুপারিশ করা কখনই ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না।

কিছুদিন পূর্বে মিঃ নেহরু (১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে) বলিয়াছিলেন যে, সর্বভারতীয় ঋণ অনুসন্ধান কমিটির অনেক সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার ভুলই করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এতটা না থাকাই ভাল। কিন্তু তিনিও সমস্যাটিকে পুরাতন "স্বাধীন সমবায়" অথবা "রাষ্ট্রীয় সমবায়" এই স্তরে রাখিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভূমি সংস্কারের পর ভারতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ চাষ সমিতি ও সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া উঠিবে। ইহাদের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব নিবিড় থাকিবে এবং কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্র সরাসরি সেই সমিতিগুলিকে ঋণ দিবে এবং ঋণ পরিশোধ পাইবার ব্যবস্থা করিবে। রাষ্ট্রের নেতৃত্বে স্থাপিত ও পরিচালিত সমবায় সমিতিগুলির জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে এবং পৃথকভাবে প্রচুর সহুরে কর্মচারী পরিশোভিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা তাই কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বরং বলা যায়, ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে যে সকল বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান (Specialised institutions) গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহারা ক্রমে অকেজো হইয়া পড়িবে. বহু অর্থব্যয় বিফল হইবে, ইহাদের নূতন অবস্থায় খাপ খাওয়ান যায় কি করিয়া—কিছুদিনের মধ্যে সেই সমস্যারই উদ্ভব হইবে।

মিঃ নেহরুর বক্তব্য সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অনুকূল নয়

অনুশীলনী

1. What are the main objects of debt legisiation in India? How far they have been successful? (C. U. B. A. 1952)

2. What are the main sources of supply of rural credit in India. Suggest some measures for improving the organisation of rural credit. (C. U. B. A. 1955)

3. Examine the agencies for the supply of rural credit in India. How would you reorganise the system. (C. U. B. A. 1957)

4. Examine the problem of indebtedness of Indian agriculturist and suggest measures for checking such indebtedness. (C. U. B. com. 1955)

5. What are your suggestions for the reorganisation of rural credit in India? (C. U. B. com. 1957)

6. Give your own evaluation of the scheme of "integreted structure of rural credit" recommended by the All India Rural credit Survey. (C. U. B. com. 1959)

7. Discuss the main features of the "Integrated scheme of Rural credit" as recommended by the All-India Rural Credit Survey Committee.

১০

সমবায় আন্দোলন

The Cooperative Movement

সমবায় কাহাকে বলে ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার ভূমিকা (What is Cooperation and its role in Indian Economic Development)

দরিদ্র চাষীদের হাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ ছোট ছোট জোত— ইহাই ভারতের কৃষি-কাঠামোর রূপ। এইরূপে কৃষিকার্য চলিতে থাকিলে কৃষকের শ্রমশক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না, বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে শ্রমশক্তিকে বিভিন্নপ্রকার কাজকর্মের মধ্যে বণ্টন ও নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় না। অধিক পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে বৃহৎ মাত্রায় চাষ আবাদ করার সুবিধাগুলি ইহাতে পাওয়া যায় না, মিশ্র-চাষ প্রথা প্রবর্তন করা চলে না, বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার হইতে কৃষিক্ষেত্র বঞ্চিত থাকে। সুদ ও খাজনার চাপে কৃষকেরা চিরদরিদ্র থাকে। কোন দরিদ্র চাষী কোনমতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলে সেই মূলধন জমি কিনিতেই ব্যয় হইয়া যায়, উহা হইতে উপযুক্ত প্রতিদান (return) পাওয়া যায় এমন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ গ্রামাঞ্চলে থাকে না। উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অব্যবহার ও অপব্যবহার ঘটে। সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ চাষীর মনকে আচ্ছন্ন রাখে। দেশের শ্রমশক্তি ও ভূমি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক মূলধন ; এই প্রথায় ইহার অপচয় ঘটে।

বিচ্ছিন্নভাবে চাষের অসুবিধা

এই প্রথার কুফলগুলি দূর করিবার জন্য অনেকে দরিদ্র কৃষিজীবিদের সমবায় সমিতি গঠন করার উপর জোর দেন। সমবায় কাহাকে বলে ?

কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, পারস্পারিক সহানুভূতি ও সাহায্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘ বা সমিতি গড়িয়া তোলাকে সমবায় বলে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে উৎপাদকগণ প্রধানত মুনাফার উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করেন, নিজেদের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। সমবায় সমিতিতে

সমবায় কাহাকে বলে

উন্নততর কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সভ্যরা কাজ করে, পরস্পরকে সাহায্য করিয়া একযোগে সকলের সম্মিলিত অর্থনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটাইতে চেষ্টা করে। সাধারণত, অর্থনৈতিক দিক হইতে ধনী ব্যক্তিগণ আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বিতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু গরীব ব্যক্তিগণ একে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিলে একার শক্তিতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন না।

অনেকে পূর্ণ সমাজতন্ত্রের সহিত সমবায়ের পার্থক্য করেন। ধনতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন: প্রধানত ফড়িয়া বা মধ্যস্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে কাঁচামাল উৎপাদনকারীগণ বা ভোগকারীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, উপায় বা মূলধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ঘটান হয় না। এই সকল সমবায় সমিতি প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র যৌথ মূলধনী কারবারে পরিণত হয়; ইহারা নিজেরাই মজুর খাটাইয়া মুনাফা বাড়াইতে ব্যাপৃত হন। অপরপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বদলে উৎপাদনের সকল উপায়, যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিকদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গরীব চাষীর ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য সম্ভব হইতে পারে না; সেবা-সমবায়ের ভিত্তিতে নানারূপ কাজকর্ম হইলেও আধুনিককালের উন্নত যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সমবায় প্রথায় কৃষি উৎপাদন শুরু করিলে তবেই প্রকৃত সমবায়ী মনোভাব এবং বিজ্ঞানসম্মত উন্নতস্তরের কৃষিকার্য দেখা দিতে পারে।*

সমাজতন্ত্র ও সমবায়

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ সেবা-সমবায় সমিতি (service co-operatives) গঠিত হইতে পারে। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া কোন দ্রব্য বা দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন; ইহা হইল উৎপাদনী সমবায়

* "Cooperatives i.e. associations of small peasants, while playing an unusually progressive bourgeois role, only weaken this tendency without eliminating it. One must not forget besides that these cooperatives do much for the well-to-do peasants, and very little, almost nothing, for the mass of the poor peasants, also that the associations themselves become exploiters of wage labour."

(Producers' Co-operation)। কয়েকজন ভোগকারী ক্রেতা একত্রে মিলিয়া পাইকারী দরে মালপত্র ক্রয় করিয়া দোকানদারদের মুনাফা নিজেরাই লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারেন ; ইহা হইল ভোগকার্যের সমবায় (Consumers' Co-operation)।

বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি

এইরূপে চাষীরা নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারেন ; কয়েকজন মিলিয়া একত্রে সভ্য হইয়া সমিতি গঠন ও পরিচালনা খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিগুলি একত্রে চাষ করিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। আমাদের দেশে এতদিন কেবলমাত্র প্রয়োজনের সময়ে ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যেই প্রধানত সমবায় সমিতিগুলি স্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য উদ্দেশ্যে সমবায়ের প্রসার ঘটে নাই। বর্তমানে উৎপাদন ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ প্রভৃতি সকল ধরনের কাজকর্ম করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করার কথা বলা হইতেছে। ইহাকে সেবা-সমবায় সমিতি (Service co-operatives) বলে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে স্থাপিত হইলেও সমবায়ের কয়েকটি মূলনীতি আছে। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে পরস্পর জানাশোনা থাকা আবশ্যক। কারণ, যাঁহারা মিলিত হইবেন তাঁহারা পরস্পরের প্রকৃতি, চরিত্র, আর্থিক অবস্থা ও কার্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণ না জানিলে বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে না। সেইজন্য একটি গ্রামের, আশে-পাশের কয়েকটি গ্রামের বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের লইয়া (যেমন কামার, কুমোর, চাষী, ছুতার প্রভৃতি) ইহা গঠিত হয়। একই বর্ণ বা জাতির (caste) লোক হইলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সমষ্টিগত দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার কাজকর্মের সাফল্য নির্ভর করে নিবিড় ঐক্যবোধ ও বোঝাপড়ার উপর। প্রত্যেক সভ্যের মর্যাদা অন্যের সমান, বড় ছোট বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক সভ্যই স্বেচ্ছায় সমিতিতে যোগ দেয়, কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই। সমবায় সমিতিতে অসাধু সভ্যের স্থান নাই ; জুয়াচোর মদ্যপ প্রভৃতি সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারে না। অতি অল্প খরচে সমিতি পরিচালনার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। সমিতির সভ্যদের অর্থ যাহাতে অপব্যয় না হইতে পারে সেই চেষ্টা সকল পরিচালকেরই থাকা দরকার। সমিতির কাজ পরিচালনাতে সকলের অধিকার সমান থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট থাকা উচিত।

সমবায়ের মূলনীতি

পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর দার্শনিক ভিত্তি হইল সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। "In a planned economy pledged to the values of Socialism and Democracy Cooperation should become progressively the principal basis of organisation in many branches of economic life".* আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবনের অনেক শাখা প্রশাখাতেই সমবায় সমিতি ক্রমশ প্রধান স্থান অধিকার করিবে। বিশেষভাবে কৃষিকার্য, ও ক্ষুদ্র জলসেচ, ক্ষুদ্রশিল্প ও শস্যশোধনকার্য, বিক্রয়, বণ্টন ও যোগান, গ্রাম্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, গৃহ ও নানাবিধ নির্মাণকার্য এবং স্থানীয় জনসমষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি ; এমন কি মাঝারি ও বৃহৎশিল্প এবং পরিবহন কার্যেও ক্রমশ অধিক সংখ্যক কাজকর্ম সমবায়ের ভিত্তিতে শুরু করা চলে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ কাঠামোতে কৃষি, শিল্প ও সেবাকার্যাদির ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত প্রচুর সংখ্যক উৎপাদন কেন্দ্র সৃষ্টি করা দরকার। সমবায়ের সুবিধা হইল দরিদ্র ব্যক্তির জীবনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাধীন সুযোগ বজায় থাকে এবং ইহারই সহিত সে বৃহৎমাত্রায় পরিচালনা ও সংগঠনের সুবিধাগুলি পাইবে। উপরন্তু, সে স্থানীয় জনসমষ্টি ও সমাজের শুভেচ্ছা এবং আনুকূল্য লাভ করিবে। তাই, কৃষক, শ্রমিক এবং ক্রেতা সাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করে এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়; ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিক্ষেত্র—উভয়ের পাশাপাশি প্রসারশীল সমবায়ক্ষেত্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে, সামাজিক কাঠামো ও জাতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে, দেশের সম্মুখে উন্নততর মানবিক আদর্শ চিত্রিত থাকে।

বর্তমান ভারতে ইহার বিভিন্নমুখী ব্যবহার

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন উভয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ইহার আভ্যন্তরীণ দেহতটে এবং সামগ্রিক চরিত্র-গঠনে মৌলিক পরিবর্তন আনার অন্যতম একটি প্রধান উপায় হইল সমবায়-প্রথা। দ্বিতীয়

* *Third Five Year Plan. P. 200 201*

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, যে-দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল শিকড়গুলি গ্রামাঞ্চলে প্রোথিত সেখানে সমবায়ের তাৎপর্য বহুদূর-প্রসারী, কেবলমাত্র সমবায়ী প্রথায় কয়েকটি কাজকর্মের মধ্যে ইহার প্রভাব আবদ্ধ নয়। মূলত, ইহার লক্ষ্য হইল জীবনের সকল দিক স্পর্শ করে এইরূপ একটি সমবায়ী সমষ্টিমূলক সংগঠন উদ্ভাবন করা। বিশেষত, গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কৃষকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা এবং কর্মসংস্থানের প্রসার করা—এই সকল উদ্দেশ্যে সমবায় প্রধান পথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার ভূমিকা

গ্রামের স্তরে, সমবায়ের তাৎপর্য হইল জমি. অন্যান্য উপকরণ ও সকল কাজকর্মকে সারা গ্রামের সর্বজনীন স্বার্থে পরিচালিত করা এবং গ্রাম্যজনসমষ্টির মধ্যে ইহার অন্তর্গত প্রতিটি মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ। ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনকার্যে গ্রামকে একটি ইউনিট হিসাবে ধরা হইবে। এই গ্রাম্য জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি হইতে পারে এইরূপ চাষবাস ও অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল কাজকর্ম এই গ্রামকে ভিত্তি করিয়াই পরিচালিত হইবে। অবশ্য এই গ্রামীণ জনসমষ্টি বৃহত্তর সমবায়ী জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবে উন্নত হইতে থাকিবে। ইহারই পাশাপাশি কুটিরশিল্পী বা এইরূপ বিশেষায়িত কার্যে দক্ষ শ্রমজীবিরা নিজ নিজ বৃত্তির প্রয়োজন অনুসারে সমবায় সংগঠন গড়িয়া তুলিবে। ভূমি সংস্কার, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার, পঞ্চায়েত-গঠন এবং সমষ্টিউন্নয়ন পরিকল্পনায় সমষ্টিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের উপর জোর দেওয়া—সকল কিছুর লক্ষ্য হইল সমবায়মুখী জীবনাদর্শের প্রসার। কিছুকাল পরে, কৃষি ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্নপ্রকার জীবিকার্জনের পথ উন্মুক্ত হইতে থাকিলে আরও বেশি সংখ্যায় ও বৃহৎ এলাকাযুক্ত সমবায় সমিতি গঠনের পথ প্রশস্ত হইবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিবেগ দ্রুত হইয়া উঠিবে এবং গ্রাম্য জনসাধারণ উন্নততর স্তরের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা লাভ করিলে সমবায় আন্দোলনকে অধিকতর ও জটিলতর চাহিদা মিটাইতে হইবে। নূতন প্রয়োজন এবং নূতন সম্ভাবনার সহিত তাল মিলাইয়া সমবায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ গড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা (A short history and present position of the Co-operative movement)

গত শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৯২ সালে মাদ্রাজ সরকার স্যার ফ্রেডারিক

নিকলসনকে মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সমগ্র রিপোর্টটিকে একটি কথায় সংক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইল "র‍্যাফিসিনকে অনুসরণ কর।" এই সময়ে যুক্ত-প্রদেশে ডুপারনেক্স, পাঞ্জাবে এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান ও ক্যাপ্টেন ক্রস্থ্‌ওয়েট ঋণদান সমিতি সংগঠিত করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য উপযুক্ত আইন ছিল না। ১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনও গ্রাম্য ঋণদান সমিতি স্থাপনের কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হইল। এই আইনের লক্ষ্য হিসাবে বলা হইল "চাষীদের, কারিগরদের এবং অল্পবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সমবায়ী মনোভাবে উৎসাহ দেওয়া।" এই আইনানুসারে সমবায় ঋণদান সমিতি 'গ্রাম' ও 'পৌর' এইভাগে ভাগ করা হয়। 'গ্রাম' সমিতিগুলি র‍্যাফিসিন ধরনে এবং 'পৌর' সমিতিগুলি 'স্থলজে ডেলিজ' ধরনে গঠিত হইবে স্থির করা হয়।

পূর্বের ইতিহাস

সমিতিগঠন সম্বন্ধে বলা হয় যে, দশ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়া সমিতি গঠন করা যাইবে। প্রত্যেক সমিতির একটি কার্যকরী সভা ও সভাপতি থাকিবে। সভ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ, আমানত ও ঋণ গ্রহণ দ্বারা সমিতির ধনভাণ্ডার গঠিত থাকিবে, সভ্যগণকে উহা হইতে ঋণদান করা চলিবে। পৌর সমিতির পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা চলিবে। গ্রাম্য সমিতিতে লভ্যাংশ বন্টিত হইবে না, পৌর সমিতিতে লাভের তিন-চতুর্থাংশের অধিক বন্টিত হইবে। গ্রাম্য সমিতির প্রত্যেক সভ্যের আর্থিক দায়িত্ব সীমাহীন (unlimited liability), পৌর-সমিতির সভ্যের পক্ষে উহা সীমাবদ্ধ (Limited liability)। কোন সভ্য এক-পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার বা এক হাজার টাকার বেশি মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না। যে-প্রয়োজনে ঋণ গৃহীত হইবে সেই উদ্দেশ্যে উহা ব্যয় করিতে হইবে। ঋণ শোধের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাকে দুইজন করিয়া প্রতিভূ (security) দিতে হইবে। সুদের হার বাজার-হার হইতে বিশেষ কম হইবে না।

প্রাথমিক সমিতির গঠন পদ্ধতি

শীঘ্রই ১৯০৪ সালের আইনের কিছু দোষ ত্রুটি ও অসুবিধা দেখা দিল,

যেমন (১) ইহা কেবল ঋণদান সমিতি প্রবর্তনের কথা বলিয়াছে, (২) পরিদর্শন ও মূলধন সরবরাহের জন্য কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সীর ব্যবস্থা ইহাতে নাই, এবং (৩) 'গ্রাম' ও 'পৌর' এইরূপ শ্রেণীবিভাগ অবৈজ্ঞানিক এবং অসুবিধাজনক। এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য ১৯১২ সালে একটি নূতন আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে ঋণদান ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করার কথা বলা হইয়াছে। মূলধন সরবরাহ ও পরিদর্শনের জন্য, (ক) প্রাথমিক সমিতিগুলির যুক্ত সংগঠন (Unions of Primary Societies), (ক) জিলা স্তরে কেন্দ্রীয় সমিতি এবং (গ) প্রাদেশিক স্তরে প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হইল, 'গ্রাম' ও 'পৌর'—এই শ্রেণীবিভাগ-পরিবর্তন করিয়া 'সীমাহীন' ও 'সীমাবদ্ধ' দায়সম্পন্ন হিসাবে নূতন শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তিত হইল। সীমাহীন দায়িত্বপূর্ণ সমিতিতে কার্যনির্বাহকগণ মাহিনা পাইবে না। সীমাবদ্ধ দায়িত্বপূর্ণ সমিতিগুলিতে সভাপতি ব্যতীত একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রতি বৎসর সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষকগণ হিসাব পরীক্ষা করিবেন। এই আইনের ফলে বহুপ্রকার সমবায় সমিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু সরকার বুঝিতে পারেন, সমবায় আন্দোলনের প্রসার অপেক্ষা উহার সংহতি বিধান আশু প্রয়োজন। ১৯১৪ সালে নিযুক্ত ম্যাক্‌লেগান কমিটি এই বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন; ১৯১৯ সালে সমবায়বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের অধীনে হস্তান্তরিত হয়। প্রাদেশিক সরকারসমূহ প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক আইন বিধিবদ্ধ করে। পাঁচ বৎসরে সমিতির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায়।

গ্রাম ও পৌর, সীমাহীন ও সীমাবদ্ধ

কিন্তু সমবায় আন্দোলনের নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি ছাপাইয়া চলিয়া যাওয়ায় দুর্বলতাসমূহ ক্রমশ পরিস্ফুট হইতে থাকে। ১৯২৯-৩৫ সালের অর্থনৈতিক মন্দা বা সংকট সমবায় আন্দোলনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষিঋণ বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইল, পুরাণো দেনা কিছু কিছু পরিশোধ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল। আন্দোলনের পরিধি প্রশস্ত হইল, ঋণ ছাড়া অন্যান্য দিক লইয়া বহু সমিতি স্থাপিত হইতে শুরু হইল। কিন্তু বহু

বর্তমান অবস্থা

দোষ ত্রুটি ও অসুবিধার দরুণ আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিল না। ১৯৫৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটি দেখাইয়াছেন যে, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি চাষীদের ঋণ-প্রয়োজনের শতকরা মাত্র ৩·১% অংশ মিটাইয়া থাকে। এই আন্দোলনের প্রসারের জন্য কমিটি বহু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করিয়াছেন। সকল স্তরে রাষ্ট্রীয় অংশীদারত্ব এবং গুদামনির্মাণ ও কৃষিবিপনন ব্যবস্থার প্রসার ঘটাইয়া বহুমুখী সমবায় সমিতির উপর জোর দিয়া সমবায় উন্নয়নের সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ শাখাগুলিকে জাতীয়করণ করিয়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক প্রধানত গ্রামাঞ্চলে ৪০০ নূতন শাখা খুলিবে স্থির হইয়াছিল। গ্রামাঞ্চলের সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের এক একটি শাখার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ব্যাপকভাবে গ্রাম্যঋণের প্রসার করিবার চেষ্টা করিবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় খাতে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৩৪ কোটি টাকা, আর তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ৮০ কোটি টাকা। কেবলমাত্র ঋণদান সমিতি নহে, বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হইয়াছিল। সমষ্টি উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা বিভাগের (Community Development Work and National Extension Service) কার্যের সহিত সমবায় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য হইল ইহার সাহায্যে গ্রাম্য জীবনের ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পুনর্গঠন এবং ইহার জন্য সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Co-operative Village Management) প্রবর্তন করা। এই ব্যবস্থায় গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীনে বিভিন্ন কার্যের জন্য পৃথক সমিতি থাকিবে; কুটিরশিল্প, চাষ, ক্রয়, বিক্রয় সকল বিষয়ই সমবায় সমিতিগুলি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ইহার স্থান

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৫ সালের রিজার্ভব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া ভারতে জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন কাজকর্ম) ভাণ্ডার [The National Agricultural Credit (longterm operations) Fund] স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূলধন ছিল প্রথমে ১০ কোটি টাকা;

উহার পরে প্রতি বৎসর (১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭ ৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯) ৫ কোটি টাকা হিসাবে বাৎসরিক জমা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে : (ক) যাহাতে রাজ্য সরকারসমূহ সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনের অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য-সরকারদের দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া ; (খ) মাঝারি পরিমাণ সময়ের জন্য কৃষিঋণ দেওয়া ; (গ) কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া ; এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ডিবেঞ্চার ক্রয় করা।

কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ কতদূর কার্যকরী হইতেছে

১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্বসাধনকারী) ভাণ্ডার [The National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] প্রথমে ১ কোটি টাকা লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, পরবর্তী দুই বৎসরে উহার মূলধন আরও ১ কোটি টাকা বাড়ান হইয়াছে। অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ বা এইরূপ দুর্ঘটনার দরুণ রাজ্যসরকার সমূহ যদি স্বল্পকালীন ঋণকে মাঝারি পরিমাণ সময়ের জন্য বা দীর্ঘ-কালীন ঋণে রূপান্তরিত করিতে চায়, তখন এই প্রতিষ্ঠান তাহাদের ধার দিবে।

১৯৫৬ সালে (১লা সেপ্টেম্বর) একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম-নির্মাণ-বোর্ড (National Co-operative Development and Ware-housing Board) স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থ-সাহায্যপুষ্ট এই বোর্ডের কাজ হইল সাধারণভাবে সমবায় কাজকর্মের উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে কাঁচামাল শোধন (Processing), গুদামনির্মাণ (Warehousing) এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা (Marketing)। এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ কর্পোরেশন (Central Warehousing Corporation) এবং ১১টি রাজ্য গুদাম নির্মাণ কর্পোরেশন (State Warehousing Co-operation) গঠিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়া যুক্তভাবে সমবায় শিক্ষণের উদ্দেশ্যে যে কেন্দ্রীয় কমিটি (The Central Committee for Co-operative Training) গঠন করিয়াছে, তাহা সকল স্তরের সমবায় কর্মচারীদের জন্য সমবায় শিক্ষার বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

সমবায় আন্দোলনের মূল্য নির্ণয় (Evaluation of the Co-operative movement in India) :

সারা ভারত ঋণ অনুসন্ধান কমিটির বিবরণীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ভারতে সমবায় আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে নাই। "উন্নততর কৃষি, উন্নততর

ব্যবসায় ও উন্নততর জীবনযাপন''—ইহারা সমবায় আন্দোলনের লক্ষ্য থাকিলেও অর্ধ শতাব্দী পরে একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সমবায় আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার অনেক কারণ আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত ভারতে ঋণদান-সমিতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। যতদিন চাষের কাজকে মোটামুটি অর্থকরী ব্যবসায় পরিণত না করা যায়, ঋণের সহিত বীজ ক্রয়, ফসল বিক্রয়, শস্য শোধন (Purchase, marketing and processing) প্রভৃতি কাজও সমবায়ের সাহায্যে শুরু না হয় ততদিন কেবলমাত্র সমবায় ঋণদান আন্দোলন সফল না হইবার সম্ভাবনা। প্রাথমিক সমিতিগুলির স্বল্প আয়তনের দরুণ উহার কাজকর্মের পরিধি বাড়িতে পারে নাই, দায়িত্ব সীমাহীন থাকায় অর্থবান ব্যক্তিরা ইহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহেন নাই। পরিচালনার উপযোগী শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীসংখ্যার অভাব ছিল। সমিতিগুলি রাজনৈতিক ও গ্রাম্য দলাদলির উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় প্রতিটি সমিতিতেই বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল খুব বেশি, অনুৎপাদক উদ্দেশ্যে প্রভূত পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইয়াছে। খাতায় পত্রে যে কোন উপায়ে হিসাব মিলাইয়া দেখান হইয়াছে (window-dressing)। অসাধু পরিচালকেরা অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, এমন উদাহরণও প্রচুর। বাহিরের উৎস হইতে অর্থ পাওয়ার উপর নির্ভরশীলতা এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ত্রুটি; কেন্দ্রীয় অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এই নির্ভরশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ সভ্যদের নিকট ইহার ফলে সুদের হার বাড়াইয়া রাখিতে হয়।

আভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতি

উপরের এই সকল আভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াও মৌলিক কয়েকটি কারণে ভারতে সমবায় আন্দোলন বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান হইল দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক শক্তি বিন্যাসের ধরন। চাষীরা বিভিন্ন জমিদারের নিকট সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, তাহারা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নিজেরা জমিদারের নিকটে উপস্থিত হইতে বাধ্য। বিভিন্ন ধরনের মালিক-শ্রেণীর অবস্থানের দরুণ সমবায় আন্দোলনের প্রসার হওয়া কোনমতে সম্ভব নয়। জোতদার, মহাজন ও ব্যবসাদার একই ব্যক্তি, তাহার নিকট হইতে জমি লইয়া, কাজ পাইয়া তাহারই নিকট ফসল

মৌলিক দুইটি কারণে সমবায় আন্দোলন বিফল হইতে বাধ্য

বিক্রয় করিয়া, এবং ঋণ পাইয়া চাষীকে বাঁচিতে হয়। কয়েকজন "স্বাধীন চাষী" মিলিয়া সমবায় গঠন করিতে পারে, কিন্তু গরীব চাষীর স্বাধীনতা কোথায়? তাহা ছাড়া, আরও একটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার আধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যে আত্ম-নির্ভরশীলতা, ব্যবসায় বুদ্ধি, সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি ও ব্যয় কুণ্ঠা সমবায় আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি, তাহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় জাগিয়া উঠিতে পারে না, নিজেদের তাগিদেই উহাদের উদ্ভব হইতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও সমবায় আন্দোলন (Third Plan and the Co-operative Movement)

সমষ্টি উন্নয়ন আন্দোলন ও ব্যাপকভাবে কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে সমবায় আন্দোলন নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের এক বৈঠকে সমবায়ী নীতি সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাউন্সিল স্থির করেন যে, প্রাইমারী ইউনিট হিসাবে গ্রাম্য জনসমষ্টির ভিত্তিতে সমবায়গুলি গঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং গ্রামস্তরে গ্রামের সমবায় ও পঞ্চায়েতের হাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগ পূর্ণরূপে ন্যস্ত করা উচিত। সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েত সমিতি—এই দুইটি হইল গ্রামস্তরে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করার অতিপ্রয়োজনীয় অঙ্গ ও পথ। দেশের গ্রামাঞ্চলে, সমাজের সর্বনিম্নস্তরে, একেবারে ভূমিসংলগ্ন এই দুইটি প্রতিষ্ঠান, গ্রাম-সমবায় ও গ্রাম-পঞ্চায়েত, জনসাধারণের নিজ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রাম্যজীবনের সকল দিকে একযোগে উন্নয়ন ঘটাইবার প্রচেষ্টায় রত থাকিবে। গ্রামের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাই সমবায় উন্নয়নের কার্যসূচীর ভিত্তি হইবে এবং উহাকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। পূর্বের ন্যায় কেবল মাত্র ঋণদানেই সমিতির কাজ আবদ্ধ থাকিবে না, উৎপাদন বাড়ান, নূতন যন্ত্র, বীজ ও পদ্ধতির প্রচলন করা, সার বীজ প্রভৃতি ক্রয় করা, ফসল গুদামজাত করা ও বিক্রয় করা—সকল কাজই এই গ্রাম্য সেবা-সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সমবায় আন্দোলন ক্রমশ নূতন রূপ লইতেছে

এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায়ী ঋণের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি কমিটি কাজ আরম্ভ করে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল এই কমিটির

রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে। কমিটির মতে, যদিও একটি গ্রামের ভিত্তিতে একটি সমবায় গঠিত হইবে, তবুও গ্রামগুলি অনেক ক্ষেত্রে খুবই ছোট, ফলে সমবায় সমিতিগুলি আত্মনির্ভর হইতে পারে না। তাই এইরূপ ক্ষেত্রে কতিপয় গ্রাম মিলিয়া একটি সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে।

সমিতির আকার ছোট কি বড় হইবে

এই বিষয়ে লক্ষ্য হইল যত কমসংখ্যক গ্রাম লইয়া গঠিত হইলে সমিতিটি আত্মনির্ভর হইতে পারে তাহাপেক্ষা বেশি গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত না থাকা, কারণ আকারে ছোট হইলেই সমবায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকিতে পারে, যেমন, স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে গঠিত হওয়া, ঘনিষ্ঠ পরিচিতি, সামাজিক সংহতি এবং পরস্পর দায়িত্ববোধ প্রভৃতি। এই সকল কারণে যাহাতে সমিতিগুলির আকার বিশেষ বড় না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সর্বাধিক ৩০০০ অধিবাসী এবং ৬০০ বা ৫০০ চাষী পরিবারের অধিক যেন ইহার অন্তর্ভুক্ত না হয়, সমিতির প্রধান কার্যালয় হইতে ৩।৪ মাইলের মধ্যে যেন সকল গ্রামগুলি অবস্থিত থাকে।

আত্মনির্ভরশীলতার প্রধান মানদণ্ড হইল প্রথম দিকের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হইতে সমিতিটি সরকারী সাহায্য-বিনা নিজের খরচা নিজেই মিটাইয়া লইতে পারে কি না। কোন একটি সমিতি ভবিষ্যতে আত্মনিভরশীল হইয়া উঠিতে পারিবে কি না সেই সম্ভাবনা প্রধানত কতকগুলি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন গ্রামের সকল পরিবারকে সমিতির মধ্যে লইয়া আসা, গ্রামের কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনাকে উপযুক্তভাবে কার্যকরী করা, উৎপাদন ও বিক্রয়ের সহিত ঋণকে সংযুক্ত করা, ঋণ ব্যবহারের উপর নজর রাখা, বণ্টন ও যোগানের কাজকর্ম সমিতির মধ্যে লইয়া আসা, সর্বাধিক সম্ভব

আত্মনির্ভরশীলতার মানদণ্ড কি

পরিমাণে স্থানীয় সঞ্চয়কে সমিতির হাতে শেয়ার ও আমানতের রূপে আকৃষ্ট করা। কোন প্রাথমিক গ্রাম্যসমিতির পক্ষে ৩০০০ লোক খুবই বেশি সন্দেহ নাই। তাই সমিতির সংগঠন ও আকারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন আইন কানুন ও বিধিনিষেধের গণ্ডী না-দেওয়াই ভাল। সাধারণত এইরূপ কাঠামোর মধ্যে সমিতিগুলি নিজস্ব প্রয়োজনে স্বকীয় রূপ লইয়া গড়িয়া উঠুক, তাহাই বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে যে সাংগঠনিক রূপের কথা চিন্তা করা হইতেছে, তাহার মধ্যে প্রাচীন ধরনের সমিতি-গুলিকে জোর করিয়া খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে উহাদের নূতন কাঠামো গড়িয়া তোলা ভাল।

উপরের আলোচিত সাংগঠনিক রূপ রক্ষিত হইবে শেয়ার-মূলধনে রাষ্ট্রীয় অংশীদারত্বের দ্বারা। সমিতির সভ্যদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন এবং সমিতি যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত সে সম্মতি প্রকাশ করিলে রাষ্ট্র কোন প্রাথমিক সমিতির শেয়ার-মূলধনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। সমিতিতে রাষ্ট্রীয় মূলধনের পরিমাণ সভ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনের সমান হইবে, সাধারণ অবস্থায় ইহার সর্বাধিক পরিমাণ হইল ৫০০০ টাকা এবং বিশেষ অবস্থায় ১০০০০ টাকা। রাষ্ট্রপ্রদত্ত টাকা ৫ হইতে ৮ বৎসর পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রাথমিক সমিতিতে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ হইবে পরোক্ষ রূপে, অর্থাৎ উচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। বিশেষ কোন অবস্থায়, শেয়ার মূলধনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ রূপ হইলেও প্রাথমিক সমিতিগুলির পরিচালক সমিতিতে কোন প্রতিনিধি মনোনয়ন করার পদ্ধতি ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ মনোনয়ন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হইলে সেই মনোনয়নের কর্তৃত্বভার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল।

রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যের রূপ

প্রান্তিক ও প্রান্তনিম্ন আর্থিক অবস্থায় চাষীদের, এবং ভূমিহীন চাষীদের, অর্থাৎ সকল প্রকার চাষীদেরই সমবায় সমিতিদের মধ্যে লইয়া আসার জন্য এবং উৎপাদনের প্রয়োজন ও পরিশোধ ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ দেওয়ার জন্য ইহাও স্থির হইয়াছে যে রাজ্যসরকারগুলি প্রতিটি সমিতির অর্থভাণ্ডারে পূর্ববৎসরেব ঋণ অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে বাড়্তি ঋণ দানের ৩% ভাগ সাহায্য হিসাবে দিয়া দিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির বাড়তি ঋণদানের দরুণ রাজ্যসরকার ১% তাহাদের চির-অনাদায়ী ঋণ-ভাণ্ডারে সাহায্য করিবে। যে সকল কৃষি-প্রধান জিলায় প্রগাঢ়ভাবে চায আবাদের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, এই সকল অঞ্চলে এইরূপ সরকারী সাহায্যের অনুপাত কিছু বেশি: প্রাথমিক সমিতিগুলির ক্ষেত্রে ৪% ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ২%। এইরূপ সরকারী সাহায্যদানের শর্ত হইল এতদিন সমাজের দুর্বল ও অক্ষম যে সকল ব্যক্তিরা আর্থিক ঋণ ও সাহায্যের সুবিধা পায় নাই, তাহাদের সমিতির মাধ্যমে সাহায্য করিতে হইবে। প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই সকল সরকারী সাহায্যসমূহ তাহাদের বিশেষ চির অনাদায়ী ঋণ ভাণ্ডারে

সরকারী চিরকালীন অর্থসাহায্য

জমা রাখিবে; লাভ হইতে স্বাভাবিক অনাদায়ী ঋণভাণ্ডারের উপরে এই ভাণ্ডার তৈয়ারী করা হইবে। কিছুকাল পরে, সুবিধামত সময়ে, এইরূপ সরকারী সাহায্যের ফলে ঋণদান কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

শেয়ার-মূলধন ও সাহায্য—এই দুই উপায়ে সরকারী অংশগ্রহণ ছাড়াও নূতন ও পুনরুজ্জীবিত সেবা সমবায় সমিতিগুলি নূতন ধরনের কাজকর্ম হাতে লওয়ার জন্য ৩ হইতে ৫ বৎসর ব্যাপিয়া সর্বাধিক ৯০০ টাকা পরিচালন সাহায্য (management grant) পাইবে। এই পরিচালন সাহায্য দেওয়া হইবে একমাত্র সেই সকল সমিতিদের যাহারা সত্য সত্যই বিভিন্ন প্রকার কাজকর্ম হাতে লয়, যেমন ঋণ দান, উৎপাদক উপকরণগুলির সরবরাহ, এবং কৃষি পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন।

পরিচালন-সাহায্যের ব্যবস্থা

প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালের মধ্যে প্রাথমিক কৃষি ঋণ দান সমিতির সংখ্যা ১০৫,০০০ হইতে প্রায় ২১০,০০০ হইয়াছে এবং তাহাদের সভ্য সংখ্যা ৪.৪ মিলিয়ন হইতে প্রায় ১৭ মিলিয়নে পরিণত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মোট ঋণদানের পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটি হইতে প্রায় ২০০ কোটি টাকায় অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাকালের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অগ্রগতির বেগ ছিল অনেক বেশি। সেই সময় বকেয়া দীর্ঘকালীন ঋণের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

দুইটি পরিকল্পনায় অগ্রগতির পরিমাণ

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায়ী ঋণ প্রসারের কর্মসূচী রচনার সময়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল পরিকল্পনায় সুউচ্চ কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যগুলি সফল করার উপযোগী প্রচেষ্টাকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করা। তৃতীয় পরিকল্পনার ধারণা অনুযায়ী প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ৩৭ মিলিয়ন, অর্থাৎ মোট কৃষিজীবি জনসাধারণের প্রায় ৬০% ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সমিতির সংখ্যা হইবে ২৩০,০০০; অর্থাৎ ভারতের সকল গ্রামকে ইহা আচ্ছাদিত করিবে। হিসাব করা হইয়াছে যে, স্বল্প ও মধ্যকালীন মোট ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইবে প্রায় ৫৩০ কোটি টাকায় এবং দীর্ঘকালীন ঋণ (বকেয়া ঋণ) হইবে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী অনেকাংশে নির্ভর করিবে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার এই কার্যসূচী সফল করার উপরে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ১৬০,০০০ প্রাথমিক সমিতির মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ দুর্বল ও মৃতপ্রায় অবস্থায় কাল কাটাইতেছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে সবল সক্ষম করার উদ্দেশ্য ৪২০০০টি সমিতিকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল আরও ৫২০০০ প্রাথমিক সমিতিকে সচল করিয়া তোলা। পুরাতম সমিতিগুলিতে প্রাণসঞ্চার করান এবং আন্দোলনের আরও প্রসার ঘটান নির্ভর করিবে কতটা পরিমাণে সভ্য সংখ্যা বাড়ান যায়, স্থানীয় সঞ্চয় সংগ্রহ করা যায়, পরিচালনার মান উন্নয়ন করা যায় এবং ঋণদানের সহিত বিক্রয় ও উৎপাদনের কাজের সংযুক্তি ঘটান যায়—ইহাদের উপর। প্রাথমিক ও উর্ধ্বস্তরে ঋণদান সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য এই সকল ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়; যে সকল রাজ্যে সমবায় আন্দোলন দুর্বল রহিয়া গিয়াছে সেখানে তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী কার্যকরী করার প্রথম কাজই হইল এইরূপ সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা।

এই বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় কি কি করণীয়

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের বিভিন্নস্তরে আভ্যন্তরীণ অর্থভাণ্ডার প্রসারিত করা হইবে। যেমন, প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ (সরকারী সাহায্য বাদে) ১৯৫৯-৬০ সালের ৪২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে হইবে ৮৫ কোটি টাকা; কেন্দ্রীয় সমবায়ী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে ইহা হইবে ২৩ কোটি টাকা হইতে প্রায় ৬২ কোটি টাকা এবং শিখরে অবস্থিত বা সর্বোচ্চ ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে ইহা হইবে ৯ কোটি টাকা হইতে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। ইহাও হিসাব করা হইয়াছে যে, ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং শিখর-ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ১২ কোটি হইতে ৪২ কোটি, ৯৫ কোটি হইতে প্রায় ২১৩ কোটি এবং ৬০ কোটি হইতে ১৪২ কোটি টাকা।

শেয়ার মূলধন ও আমানতের পরিমাণ কতদূর বাড়িবে

সেবা সমবায়গুলি যে স্বল্প ও মধ্যকালীন ঋণ দেয় তাহার উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের চলতি খরচার প্রয়োজন মিটান। জমির উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার

উদ্দেশ্যে দীর্ঘতম সময়ের জন্য ঋণ দেওয়াও সমান প্রয়োজন। এই প্রয়োজন প্রধানত মিটাইবে সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় রাজ্যেই কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক অথবা সমবায় শিখর-ব্যাঙ্কের অঙ্গ হিসাবে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কিং দফ্‌তর সংলগ্ন ছিল। ১৯৫৯ সালে ৪০৭টি প্রাইমারী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার সঙ্গে নূতন আরও ২৬৫টি যোগ করার কথা বলা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাহাদের অনুমোদিত প্রাইমারী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যে ঋণ দিত সেই টাকার প্রধান উৎস হইল ডিবেঞ্চার বিক্রয়। ১৫০ কোটি টাকার দীর্ঘকালীন ঋণ তোলা সম্ভব হইবে কি না তাহা অনেকাংশ নির্ভর করিবে এই জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি ডিবেঞ্চার বিক্রয়ে গ্রাম্য জনসাধারণ ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে কিরূপ সমর্থন লাভ করে তাহার উপর। এই বিষয়ে খুব বেশি সাহায্য আসিবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক এবং জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির লক্ষ্য

দীর্ঘকালীন ঋণদানের উপযুক্ত অর্থের সংগ্রহ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে একটি উন্নয়ন অর্থসংগ্রহ কর্পোরেশন (Agricultural Development Finance Corporation) প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি প্রস্তাব আলোচনা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি যে সকল ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়িবেন এই কর্পোরেশন উহা ক্রয় করিবে। তাহা ছাড়াও, এমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করিবে যাহা হইতে আয় সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হয় অথবা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়, যেমন রবার, কফি ও বাদামের বাগিচা, জলসেচ, বাঁধ নির্মাণ এবং ভূমিক্ষয় রোধ ও ফলের বাগান প্রভৃতি। কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির মারফৎ বন্টিত হইবে।

কৃষি উন্নয়নের অর্থসংগ্রহ তহবিল

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে সমবায় আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইহার সাহায্যের রূপ ছিল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম তদারক করা, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারের ঋণ দেওয়া, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ ঋণ দেওয়া প্রভৃতি। ইহার ঋণদানের

পরিমাণ ছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৪ কোটি টাকা, তাহা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৯-৬০ সালে দাঁড়াইয়াছে ৮৫ কোটি টাকা। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কৃষিগত লক্ষ্য ও ঋণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাপকতর ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইবে। ঋণদানের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বভাবতই নির্ভর করে ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শক্তি ও পরিচালনগত দক্ষতার উপর, এবং সেই সঙ্গে ঋণ ব্যবহারের উপর তদারকী ও ঋণ পরিশোধের বিষয়ে অতীত কার্যকলাপের উপর। প্রতিটি রাজ্য আমানত সংগ্রহ করার কাজে ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় অর্থসংগ্রহ করার কাজে কতটা সফল হইয়াছে, তাহাও ঋণদানের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিচার করে। যে সকল রাজ্যে প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে উপযুক্ত অগ্রগতি হয় নাই সেখানকার সমবায় আন্দোলনের আর্থিক কাঠামো পুনর্গঠন করার কাজে সেই রাজ্য সরকারদের সাহায্য করার বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ প্রচেষ্টা করিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা কিরূপ

স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ভারতের সমবায় আন্দোলনকে বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে। সমবায় সংগঠনগুলির, বিশেষত বিক্রয় ও শোধন কার্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক বিনাব্যয়ে টাকা পাঠাইবার সুবিধা এবং সহজ শর্তে ঋণদান করিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া অথবা যতদিন বিক্রয়ের টাকা পাওয়া যাইবে সেই সময়ের জন্য ঋণ দিয়া ইহাদের সাহায্য করিয়াছে। একদিকে বিক্রয় ও পরিশোধন সমিতিগুলির কাজকর্ম প্রসারিত হইবে, অপরদিকে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে—ফলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে স্টেট ব্যাঙ্ক আরও অধিক মাত্রায় সাহায্য করিতে পারিবে।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা কিরূপ

অনুশীলনী

1. What are the various ways in which cooperation can help (a) agricultural marketing, and (b) rural industries in India.
(C. U. B. A. 1955, B. Com. 1952)

2. Trace briefly the history of the Cooperative movement in India. What factors have been responsible for the slow progress of the movement in the country? (C. U. B. A. 1956)

3. Discuss the causes of the inadequate development of the cooperative credit movement in India. (C. U. B. A. 1961)

4. Give a brief appraisal of the progress and prospects of cooperative movement in India. (B. U. B. A. Comp. 1961)

১১

চাষী, বাজার ও দাম

Cultivator, Market and the Price

কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা (Marketing Organisation of Agricultural Commodities)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে হইলে বেশির ভাগ কৃষিজাত দ্রব্যকে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরাইয়া লইয়া আসা দরকার; সুতরাং কৃষিজাত পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থার উপর শিল্পোন্নয়নের গতি অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতে কৃষিকার্য বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State-trading in food grains) সংগঠন এখনও পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। প্রধানত ছোট ছোট চাষীরা সারা দেশে ছড়ান অবস্থায় উৎপাদন করে ও বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ বিক্রয় সংগঠন একবারেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী নয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি বাজার সংগঠনের ভূমিকা

বাজারে কি পরিমাণ শস্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইবে তাহা নির্ভর করে চাষীর হাতে বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্তের উপর। ভারতে মোট খাদ্যোৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে।* বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত হইল মোট উৎপাদনের ৯০% হইতে ৯৫%। খাদ্যোৎপাদনের খুব কম অংশ বাজারে আসে বলিয়া এই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণে অল্প কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হইলেই অকৃষিগত ক্ষেত্রে (non-agricultural sector) খাদ্যের যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং দামে প্রচুর উঠানামা হইয়া থাকে। খাদ্যের দাম বাড়িলে অল্প পরিমাণ খাদ্য বিক্রয় করিয়াই চাষী তাহার প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য কিনিতে পারে। চাষীরা বেশি ফসল হাতে রাখে (বা নিজেরা ভোগ করে) বলিয়া দামবৃদ্ধি প্রখরতর হয়। অপরপক্ষে, দাম,

বাজারযোগ্য কৃষিপণ্য ও উহার দাম

* ধান উৎপাদনের ৩২%, গম ৩৫% এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য ২৫%।

হ্রাসের সময়ে, চাষী অন্যান্য দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বেশি ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, দাম-হ্রাস প্রখরতর হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও অকৃষিগত অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-সংখ্যার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাই চাষীকে বাজারযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াইতে হয়, অথবা যাহাতে চাষী ইহা বাড়ায় সেইরূপ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হয়।

চাষীর বেশির ভাগ ফসলই গ্রামের মধ্যে বিক্রয় হয়। সারা ভারত ঋণ অনুসন্ধানী কমিটির রিপোর্টে জানা যায় যে, মোট ফসল বিক্রয়ের ৬৫% অংশ গ্রামে ঘটে। বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার পরিমাণে কিছুটা তারতম্য দেখা দিতে পারে। গ্রামে বিক্রয়ের কারণের মধ্যে প্রধান হইল, খাজনা দিবার তাড়া বা চাপ; ঋণ ও উহার সংলগ্ন অন্যান্য দেনা, মহাজনের নিকট পূর্বের ঋণ পরিশোধ, কৃষিক্ষেত্রে বা গ্রামে মজুত রাখার অসুবিধা এবং পরিবহনের অসুবিধা। ঠিক ফসল উঠার সময়েই বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া জমিদার মহাজন বেপারী চক্র চাষীকে খুব কম দাম দিতে চায় এবং এই কারণে দামও এই সময় খুব কম থাকে।

বিক্রয়ের স্থান, কাল পাত্র—তিনটিই ত্রুটিপূর্ণ

কৃষিজাত পণ্যের বাজারের কাঠামো আলোচনা করিলে ভারতে আমরা প্রধানত যে কয়েক ধরণের বাজার দেখিতে পাই, তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে, (ক) হাট ও মেলা (খ) পাইকারী বাজার ও গ) খুচরা বাজার। সপ্তাহে নির্দিষ্ট দুই বা তিন দিন হাট বসে, কিছু বেশি সময় অন্তর অন্তর বা নির্দিষ্ট কোন উপলক্ষ্যে মেলা বসে। কৃষিজাত পণ্য বা জীবজন্তু উভয়ই এই ধরনের বাজারে লেনদেন হয়, ভারতের অভ্যন্তরে এইরূপ প্রায় ২২০০০ বাজার আছে। কখনও একটি গ্রাম লইয়া, কখনও বা ৬০।৭০ মাইল ব্যাসার্ধ লইয়া হাট বসে। ভারতে প্রায় ১৭০০ পাইকারী শস্যের বাজার আছে। এইরূপ বাজারের কোনটির ব্যাসার্ধ ১০ হইতে ৩০ মাইল, অনুন্নত অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে উহার পরিসীমা (perimeter) আরও বিস্তৃত। বিক্রয়ের পদ্ধতি সকল বাজারে সমান নয়, নিয়ন্ত্রিত বাজার ছাড়া (regulated market) নীলামে বা সর্বসাধারণের গোচরযোগ্য চুক্তি দ্বারা বিক্রয় বেশির ভাগ বাজারেই হয় না।

বাজারের শ্রেণী বিভাগ

এইরূপ বাজারে বিক্রয়ের কাজের সহিত জড়িত বহু ধরনের লোকজন থাকে, যেমন কমিশন এজেণ্ট, সাধারণ দালাল, এবং বিশেষ কোন বিক্রয় কার্যের সঙ্গে জড়িত দালাল। কমিশন এজেন্টদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, কাঁচা এজেণ্ট ও পাকা এজেণ্ট। কাঁচা এজেন্টদের কাজ হইল প্রধানত পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা। অনেক সময় সে গ্রামের বণিক ও ব্যবসাদারদের টাকা অগ্রিম দেয় এই শর্তে যে পাইকারী বাজারে তাহার মারফৎ উহাদের জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে। সাধারণত ইহাদের তরীতরকারী ও ফলের বাজারেই প্রধানত দেখা যায়। পাকা এজেণ্টরা দূরের ক্রেতাদের প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিজের জন্য ফসল ক্রয় করে। পাকা এজেণ্ট অনেক সময় কাঁচা এজেণ্টকে অর্থ অগ্রিম দেয়। দালাল হইল অল্পসঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি, নিজেদের কোন ঘর বা প্রতিষ্ঠান নাই; তাহার কাজ হইল ক্রেতা ও বিক্রেতাকে একত্রে মিলিত করা।

মধ্যবর্তী স্তরের লোক জনের শ্রেণীবিভাগ

এইরূপ বাজার-সংগঠনের ফলে চাষী তাহার ফসলের উপযুক্ত দাম পায় না। রাস্তাঘাটের অভাব, দারিদ্র্য প্রভৃতির জন্য দূরের হাটে, বাজারে বা সহরে যাওয়া সম্ভব হয় না গ্রামে ব্যাপারী বা কাঁচা দালালের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত দামে, যে কোন বাজারে যে কোন ব্যক্তির নিকট ফসল বিক্রয়ের স্বাধীনতা হইতে চাষী বঞ্চিত থাকে। বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলেও সে উপযুক্ত দাম পায় না। দেশের অন্যান্য স্থানের দাম সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতার জন্য, ওজন সম্পর্কীয় বিভিন্নতা ও অসাধুতার জন্য এবং বাজারের বহুপ্রকার আদায়ের বা আবওয়াবের জন্য। বাজার পরিচালনার সকল খরচ, শেষ ক্রেতার কাছে পৌঁছিবার মধ্যে ওজন হ্রাস এবং শস্যের কোন ত্রুটি—সকল কিছুর জন্য চাষীর নিকট হইতেই আদায়ের চেষ্টা করা হয়। বহুপ্রকার সামাজিক বর্ণ বৈষম্য, অর্থ বৈষম্য ও পরিচয়-সূত্র অনুযায়ী দাম স্থির হয় এবং গোপনে বিনাচুক্তিতে লেনদেন হয়। বেপারী, ফড়িয়া কাঁচা ও পাকা কমিশন এজেণ্ট, দালাল—চাষী ও শেষ-ক্রেতার মধ্যে বহু স্তরের এই সকল মধ্যস্থানীয় ব্যক্তিরা চাষীর হাতে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত কেবল কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা খাদ্যশস্যে ভেজাল দেয়, অস্বাভাবিক দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি করে এবং খাদ্যশস্য লইয়া ফাট্‌কাদারী করে।

বিক্রয় সংগঠনের ত্রুটি সমূহ

ক্রেতার দামের কত অংশ উৎপাদক হাতে পায় বাজারে সেই মূল্য ব্যবধানের (Price-Spread) দ্বারা এত প্রকার মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির অবস্থিতির অর্থনৈতিক ফলাফল প্রকাশ পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোগকারীর প্রতি-ডলারে উৎপাদক পায়, ডিম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৬১ সেণ্ট, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৪৯%, তেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৩৪% এবং ফল ও শাকসবজির ক্ষেত্রে ৩২%। ভারতে উৎপাদকেরাও মোটামুটি এই অংশ পায় বটে, কিন্তু দুই দেশে পার্থক্য অনেক। আমেরিকাতে মধ্যস্তরের ব্যক্তিরা প্রতি স্তরে দ্রব্যটিকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ভোগ-যোগ্য করিতে থাকে; আর ভারতে তুলনামূলকভাবে পরিবহনের ব্যয় ও স্তরের সংখ্যা বেশি থাকায় উৎপাদক এত কম অংশ পায়। বিভিন্ন হিসাব হইতে সাধারণভাবে দেখা গিয়াছে উৎপাদকেরা ক্রেতার টাকার কি অংশ পায় :*

উহার ফলাফল

	ধান			গম
মূল্য-ব্যবধানের পরিমাণ	কটকের উৎপাদক কটকের ক্রেতা	বোলপুরের উৎপাদক. দিল্লীর ক্রেতা	হাপুরের (U.P.) উৎপাদক দিল্লীর ক্রেতা	সৌগরের উৎপাদক, বোম্বাই-এর ক্রেতা
উৎপাদকের অংশ ...	৭৭.৮	৫৭.৮	৮৩.২	৬৩.১
পরিবহণ ব্যয়	—	১৩.২	২.১	২১.৭
বিবিধ ব্যয় ... (গোছানো, বাঁধাই, ওজন করানো প্রভৃতি—ইহার মধ্যে পাইকারদের কিছু অংশ পাওনা থাকে)	১২.৯	২২.৮	৮.৯	১০.৬
পাইকারদের অংশ	২.৯	২.৫	১.০	০.৮
খুচরাদারদের অংশ	৬.৪	৩.৭	৪.৮	৩.৮
	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, উৎপাদন-কেন্দ্র ভোগ-কেন্দ্রের যত নিকটে, ক্রেতার টাকার তত বেশি অংশ উৎপাদক পাইয়া থাকে।

* Article by *Poduval* on Prices, Trade & Marketing in Studies in Indian Agricultural Economics'—P. 80.

কৃষিপণ্যের বিক্রয়-কাঠামো কত বেশি অসম্পূর্ণ তাহার আর একটি সূচক হইল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং একই অঞ্চলে বৎসরে বিভিন্ন সময়ের বা মরসুমের মধ্যে দামের তীব্র পার্থক্য। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট বলিতেছেন "ইহা হইতেই ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর চলনহীনতা ও অসংলগ্ন চরিত্র বোঝা যায়। সারা ভারতীয় গড় দামস্তরের মধ্যে দামের আঞ্চলিক পার্থক্য ধরা পড়ে না—১৯৫৭ সালের জুন মাসে পাটনায় চালের দাম ছিল প্রতি-মণ ২৩ টাকা, কটকে ১৬·৭৫ টাকা, ইম্ফলে ৭·২৫ টাকা। সেই সময়ে গমের দাম ছিল বোম্বাই-এ ১৯·২৫ টাকা, অথচ কানপুরে ১২·৮১ টাকা। প্রকৃতপক্ষে গত পাঁচ বৎসরে দামে আঞ্চলিক ও মরসুমী এত বেশি পার্থক্য থাকাতেই অর্থনৈতিক কাঠামোতে এত কষ্ট ও চাপ সহ্য করিতে হইয়াছে।"*

আঞ্চলিক ও মরসুমী পার্থক্য

বর্তমান বিক্রয়-সংগঠন উন্নত করার উপায় ও কার্যসূচী (Methods & programmes of improving present marketing organisation)

ক্রেতার টাকার বেশি অংশ উৎপাদকের হাতে আসার অন্যতম প্রধান উপায় হইল বিক্রয় সংগঠন উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে প্রথমত ১৯৩৭ সালের কৃষি-উৎপন্ন (মান নির্ণয় ও নিরূপণ) আইন অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের গুণগত মান নিরূপণ করার ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আরও অধিক সংখ্যক দ্রব্যকে গুণগত নিয়ন্ত্রণের (quality control) অধীনে লইয়া আসার জন্য নাগপুরে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আরও আটটি গুণগত নিয়ন্ত্রণের গবেষণাগার (quality control laboratory) স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুসংগঠিত বাজার (regulated markets) গড়িয়া তোলার উপর অধিক পরিমাণে জোর দেওয়া শুরু হইয়াছে। এই সকল সুসংগঠিত বাজারে বাজারী আদায়ের (Market charges) পরিমাণ স্পষ্ট উল্লিখিত থাকে এবং অতিরিক্ত কমিশন, বিভিন্ন প্রকার আদায়, কম ওজন প্রভৃতি থাকিতে পারে না। ফাট্‌কাদারি (speculation) বা ভবিষ্যৎ-বাজারের

১। গুণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

২। সুসংগঠিত বাজার স্থাপন

* **Report of the Food Grains Enquiry Committee, P. 14-15.**

(Future markets) ফাটকাদারি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৫২ সালে ভারত সরকার অগ্রচুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন (Forward Contract Regulation Act) বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই চুক্তি কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য ১৯৫৩ সালে অগ্রবাজার কমিশন (Forward Markets Commission) স্থাপিত হয়। দামের তীব্র উঠানামা বন্ধ করার জন্য এবং একচেটিয়া ফাটকাদারি রোধ করার উদ্দেশ্যে এই কমিশন বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বাজার স্থাপন করেন এবং উহাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। দেশের ২৫০০টি বাজারের মধ্যে প্রথম পরিকল্পনার শেষে সুসংগঠিত বাজারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৪৭০টি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭২৫টি। তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে অবশিষ্ট সকল বাজার এইরূপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনিয়া সুসংগঠিত করা হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে। অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহের কাজকর্ম (Market intelligence service) বর্তমানে ৫০০টি বাজারে প্রচলিত আছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহা আরও প্রসারিত হইয়া দেশের সকল অঞ্চলে বাজার সংক্রান্ত খবরাদির লেনদেন বাড়াইয়া তুলিবে।

৩। গুদাম উন্নয়ন

তৃতীয়ত, সরকারী, আধা-সরকারী এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির চেষ্টায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গুদাম নির্মাণ এবং উহাতে মাল রক্ষণের ক্ষমতা প্রসারের বিভিন্ন চেষ্টা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে খাদ্যশস্য মজুতের উপযোগী নূতন গুদাম নির্মাণের জন্য ২৫ কোটি টাকা এবং গুদাম সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্মের জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। মজুত করার ক্ষমতা প্রসারণ দেশের দামস্তরকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রাখিতে সাহায্য করিবে বলিয়া কমিশন মনে করিতেছেন।

৪। সমবায় বিক্রয় সমিতি

চতুর্থত, কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য কৃষি ঋণ অনুসন্ধান রিপোর্টে সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব সুপারিশ করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ বাজারে প্রাথমিক বিক্রয় সমিতিগুলি স্থাপিত হইবে এবং উহাদের সহিত প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলিকে সংযুক্ত করা হইবে। এইরূপ বিক্রয় সমিতি পরিচালনার কাজে সরকার কর্মচারী পাঠাইয়া ও তাহার ভার বহন করিয়া সাহায্য করিবে, এবং এই সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনে কিছুটা অংশগ্রহণ করিবে। মোটামুটি এই ধারায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম নির্মাণ বোর্ডের মাধ্যমে ১৮৬৯টি প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি সাহায্য

পাইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও প্রায় ৬০০টি প্রাথমিক বিক্রয় সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে বলা হইয়াছে। ইহাতে দেশের ২৫০০ বাজারের প্রায় প্রতিটিতে একটি করিয়া সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়িয়া উঠিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত ইক্ষু, তুলা ও দুগ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে বহু সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে। আশা করা যায় এই সমবায় সমিতিগুলি একদিকে চাষী-উৎপাদককে উপযুক্ত দাম পাইতে সাহায্য করিবে, অপরদিকে খাদ্যশস্য ও বাণিজ্যিক শস্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াইতে সাহায্য করিবে। খাদ্যশস্যের দামে মরসুমী উঠানামার বিরুদ্ধে চাষীর ধারণ ক্ষমতা (staying power) বাড়াইয়া তুলিবে।

কৃষি পণ্যের দামে তীব্র উঠানামা বন্ধ করা ; সকল প্রধান দ্রব্যের বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ করা ; শস্যের গুণগত মান নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নত করা ; ঋণ, শস্যশোধন (Processing) ও বিক্রয় কার্যগুলি কেন্দ্রীভূত করা ; মজুত ও গুদামজাত করার সুযোগ দান—এই সকল কিছুর উদ্দেশ্য হইল চাষীর আয় বাড়ানো এবং তাহাকে ক্রমশ বেশি পরিমাণে বাজার-মুখী (market-oriented) করিয়া তোলা। কৃষিকে বেসরকারী-ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং কোটি কোটি ক্ষুদ্র চাষীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপরই কৃষিজ উৎপাদন ও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করিতে হইলে কৃষি-ক্ষেত্রকে কতদূর অপরিকল্পিত ও বেসরকারী রাখা যায় সে-বিষয়ে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র বেসরকারী রাখিতেই হয়, তবে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়াইবার ও সংগ্রহের সুবিধার জন্যই স্বেচ্ছাকৃত সমবায় চাষ সমিতি ও সমবায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দরকার। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে সমবায় চাষ সমিতি ও সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়িয়া উঠিলেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ সফল হইতে পারে না। এই সকল সমিতি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত. ইহাদের গ্রামাঞ্চলিক যৌথ মূলধনী কারবার বলিলেও বিশেষ ভুল হয় না। সমবায় চাষ ও বিক্রয় সমিতিদের মিলিত সংগঠন যদি কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ায়, যোগান সংকুচিত রাখিয়া দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে কি অবস্থা সৃষ্টি হইবে? সেই দিক দিয়া বিচার করিলে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যনীতি নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য এবং ইহার

সমবায় বিক্রয় কাঠামো অথবা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ?

প্রসারই দেশের মধ্যবিত্ত, চাষী ও মজুর সকল শ্রেণীকে একযোগে রক্ষা করিতে পারে।

কৃষি পণ্যের মূল্য-নির্ধারণ নীতি (Agricultural Pricing Policy):

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কালে কৃষি পণ্যদ্রব্যাদির দাম সম্পর্কে সঠিক নীতি গ্রহণ না করিলে উন্নয়নের বেগ দ্রুততর হইতে পারে না। অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে পণ্যের বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নিরূপণ হইতে থাকে। পরিকল্পনার সাহায্যে উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইলে কৃষিপণ্যের দাম বাজারের শক্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কিরূপ তাহার উপর নির্ভর করে চাষী উৎপাদনের খরচপত্র তুলিতে পারিল কি না। উৎপাদনের পরিমাণে উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে তাই এই মূল্য-নীতিকে প্রয়োগ করা চলে। শুধু তাহাই নহে। যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী সেখানে বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রার মান, তাহাদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ—সকল কিছুকে এই মূল্য-নির্ধারণের নীতি দ্বারা অনেকাংশে নিযন্ত্রিত করা চলে। চাষীরা কেবল বিক্রেতা নহে, তাহারা ক্রেতাও বটে। নিজস্ব পণ্য সম্ভার বিক্রয় করিয়া তাহারা শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। তাহাদের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে একই পরিমাণ শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে তাহাদের বেশি পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়; আবার শিল্পজাত দ্রব্যের দাম কমিলে তাহারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ কৃষি-পণ্য ও বিক্রয় করিয়া পূর্বের ন্যায় সম পরিমাণ শিল্পদ্রব্য পাইতে পারে। কৃষি-পণ্য ও শিল্প-পণ্যের মধ্যে এই বাণিজ্য-হার (Terms of trade between agricultural and industrial commodities) তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা কমিশনের হাতে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্রবিশেষ, ইহার সাহায্যে কৃষিজীবী জনসাধারণকে অনিচ্ছামূলক সঞ্চয়ে বাধ্য করাইয়া সমাজের কৃষি-কাঠামো হইতে উদ্বৃত্ত তুলিয়া আনিয়া শিল্পকাঠামোতে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। কৃষকের হাত হইতে ভোগ্যদ্রব্য সরাইয়া আনিবার জন্য এই বাণিজ্য হারকে ব্যবহার করা চলে, কারণ তুলনামূলকভাবে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া রাখিলে চাষী বেশি শস্যদ্রব্য বাজারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য

মূল্য-নির্ধারণের গুরুত্ব
১। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা

২। মূলধন গঠনে সাহায্য করা

প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয়ের ইহা একটি অন্যতম প্রধান উপায়। অর্থ ও উপকরণের আকারে কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্তের অপসারণ বা মূলধন-গঠন তাই অনেকাংশে নির্ভর করে কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য-নির্ধারণ নীতির উপর।

ভারতে কৃষিপণ্যের মূল্য-নির্ধারণ সম্পর্কে সরকার বা পরিকল্পনা কমিশন কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ না করায় বহুবিধ অসুবিধা দেখা দিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল এমন একটি সুসম্বন্ধ দাম কাঠামো রক্ষা করা যাহাতে পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী উপকরণ-গুলির নিয়োগ বিন্যাস ঘটে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ত্যাগ স্বীকারে সমতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও এই কথা পুনরায় ঘোষণা করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে যে, "The level of prices now is more than 20 per cent above the level at the commencement of the Second Plan and it is essential to ensure that for the Third Plan period a suitable price policy is formulated and carried out."

দুঃখের বিষয় ভারতে কোন সুচিন্তিত মূল-নীতি নাই

তৃতীয় পরিকল্পনার এই উক্তি হইতেই জানা যায় যে, এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন কৃষিজাত শস্যদ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক নীতি নিরূপণ করিতে পারেন নাই। দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে কিরূপ দাম থাকিবে সেই সম্পর্কেও কোন সঠিক নীতি ঘোষিত হয় নাই। কৃষিজাত পণ্য, অকৃষি-জাত কাঁচামাল এবং শিল্পজাত দ্রব্য—এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম সম্পর্কে একযোগে সুচিন্তিত নীতি নিরূপণ করা দরকার এবং সেই সঙ্গে দেশের আর্থিক ও ফিসকাল নীতির রূপও বিচার করা প্রয়োজন।

কৃষিজাত পণ্যের মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ নীতি গ্রহণ না করার ফলে আমাদের দেশে বহুপ্রকার বিপদও দেখা যাইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজ পণ্যের দামে অধিকতর উঠানামা ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, পণ্যদ্রব্য-সামগ্রীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উঠানামার পরিধি সমান হয় নাই। দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ক্ষেত্রগত ব্যালান্স (sectoral balance) রাখা দরকার, কৃষিক্ষেত্রের বাণিজ্যহার উহা রক্ষা করিতে পারে নাই। গত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ এই বাণিজ্যহার কৃষিক্ষেত্রের অনুকূলে ছিল। মূল কথা হইল, অকৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রের অনুকূলে পক্ষপাতমূলক

কৃষিজাত পণ্যের দামস্তর শিল্পায়নের অনুকূল নয়

আচরণ করিলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। বর্তমানে পশ্চিমী দেশগুলিতে, যেমন, আমেরিকায় কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য সরকারী সাহায্য ও অর্থে পুষ্ট হয়; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, তাহারা উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে নাই এবং বহুকাল যাবৎ সামগ্রিক উন্নয়নের ফলে বর্তমানে সেই সকল দেশে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। তাহাদের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে বেশির ভাগ সময়েই কৃষিজ দ্রব্যের দাম ছিল খুব কম অথবা ইহাকে সেইরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে এইরূপ অর্থসাহায্য দিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করা চলে না।

কেন কৃষিজ পণ্যদ্রব্যের মূল্য কম রাখা দরকার

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন ভারতের ন্যায় দেশে আরও বেশি। ইহার অনেক কারণ আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কম। পাইকারী দামস্তরের সাধারণ সূচকে আমাদের দেশে কৃষিজ পণ্যগুলির গুরুত্ব মোট সকল দ্রব্যের উপর গুরুত্বের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি। প্রায় সকল জনসাধারণের ক্ষেত্রেই মোট ভোগব্যয়ের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় হয় $\frac{1}{2}$ হইতে $\frac{2}{3}$ অংশ। অন্যান্য দ্রব্যের দামের তুলনায় খাদ্য ও কৃষি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি তাই জীবনযাত্রার ব্যয়ের উপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

ইহাতে অধিক সংখ্যক চাষীর স্বার্থই রক্ষিত হইবে

অনেকে মনে করিতে পারেন যে. এই নীতি অবলম্বন করিলে ক্রেতার স্বার্থ রক্ষিত হইবে. কিন্তু উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। তাঁহাদের মতে চাষীরা উপযুক্ত দাম না পাইলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, এই ধারণা সঠিক নহে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ উৎপাদকই ক্ষুদ্র চাষী, তাহারা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের অতি অল্প অংশ বিক্রয়ের জন্য বাজারে হাজির করে। অনেককেই কয়েক মাস পর হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া দিন চালাইতে হয়। কম দাম থাকিলে ইহাদের সুবিধা হওয়ারই কথা। ফসল উঠার পরেই ইহাদের বিক্রয় করিতে হয়, তাই যে ৮।৯ মাস খাদ্যদ্রব্যের দাম বেশি থাকে উহার সুবিধা সে ভোগ করিতে পারে না। তাহাদের উৎপাদন পরিকল্পনাও তাই দামে উঠানামার সম্ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। স্বল্পসংখ্যক বৃহৎ চাষীরাই দাম বিচার করিয়া উৎপাদনের কর্মসূচী নির্ধারণ করে। তাহাদের বিক্রয়-পরিকল্পনাও বাজার-দামের দ্বারা নিরূপিত হয়। কিন্তু

অন্যান্য দেশের এবং ভারতের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইল এই যে, উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য এত বেশি দাম বজায় রাখার প্রয়োজন নাই। বরং দাম কম থাকিলেই তাহারা উৎপাদন বাড়াইতে সচেষ্ট হয়, ইহা সকলেরই অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতির কথা মনে রাখিয়া এই কথা বলা চলে যে. যদি চাষীদের হাতে হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া বাজারে আনিতে হয়, তবে তুলনামূলকভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অতি অবশ্যই কমাইয়া রাখা প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় বৃহৎ চাষী যাহাদের বিক্রয়যোগ্য উদ্‌বৃত্ত থাকে তাহাদের স্বার্থে কৃষিজাত পণ্যমূল্য নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করা চলে না।

বর্তমানের দামস্তর মুষ্টিমেয় ধনী চাষীকে সাহায্য করে

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য খুব নিচুতে ধার্য করা প্রয়োজন এই কথা বলিলেই যেন মনে না হয়, উহা একেবারে অনড় অচল বা সদানির্দিষ্ট। একেবারে অপরিবর্তনশীল দাম-কাঠামো বজায় রাখা কোন মতে সম্ভব নয়, আর তাহা উচিতও নহে। বিভিন্ন মরসুমে দামে যে উঠানামা ঘটিবে, ইহার পরিধি মূল্য-নির্ধারণ নীতির মধ্যেই গৃহীত থাকিবে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আঞ্চলিক দাম-পার্থক্য বহু বিভিন্ন কারণে দেখা দেয় নগরায়ণ, কৃষি-উৎপাদন পথঘাট ও বাজারের প্রসার প্রভৃতির স্তর); ইহা মানিয়া লইতে হইবে। আঞ্চলিক মূল্য নির্ধারণের সময়ে সেই অঞ্চলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা এবং ক্রয়-শক্তির কথাও মনে রাখা দরকার। এইরূপে নির্দিষ্টতা ও নমনীয়তা উভয়ের গণ্ডী বাঁধিয়া মূল্য নির্ধারণ নীতি অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মরসুমী ও আঞ্চলিক পার্থক্যের পরিধিও সুনির্দিষ্ট থাকিবে

অনুশীলনী

1. What measures would you suggest for removing the existing difficulties in the marketing of agricultural crops ?

2. Discuss the present agricultural price policy in India. How far is it conducive to economic development? What should be the constituents of such price policy ?

কৃষিমজুর : আয় কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ

Agricultural Labourers : their income, employment and future

কৃষিমজুর শ্রেণীর উদ্ভব (Growth of Agricultural labourers)

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে চাষী ও কুটীরশিল্পীরা পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় বসবাস করিত। কৃষি ও কুটীরশিল্পের এই ভারসাম্যের মধ্যে ভূমিহীন বা শিল্পহীন একদল গ্রাম্য সর্বহারা (rural proletariat) বা কৃষি-মজুর শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই। উপরে ভাঙন ধরিলেও সুদূর গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র অটুট থাকায় চাষীরা জমির সহিত সংলগ্ন অবস্থাতেই ছিল। ভাড়া করা মজুরের সাহায্যে চাষের কাজ হইত না।

সামন্ততন্ত্রে 'স্বাধীন' কৃষি মজুর থাকে না

ইংরাজ শাসনের ফলে দ্রুত এই প্রকার গ্রামসমাজ ভাঙ্গিয়া যাইতে শুরু করিয়াছিল এবং সেই ভাঙনের প্রকাশ হইল দেশে একদল ভূমিহীন কৃষি-মজুর শ্রেণীর উদ্ভব। ১৮৬৫ সালে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ কমিশন এই শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিতেছেন। "আমাদের সকল বাণিজ্য এবং প্রচেষ্টা আমাদের সুবৃহৎ কাজকর্ম এবং উন্নত ধরনের ব্যবস্থা কেবল এমন একদল মজুর শ্রেণীর সৃষ্টি করে বা উহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দেয় যাহারা মজুরির উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত সম্পদের বৃদ্ধির ফলে ধনীরা এই মজুর দল পোষে, ইহারা আর দাসও নয়, ভূমিদাসও নয়।" উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে দেশের মোট কৃষি জনসংখ্যার কম অংশই কৃষি মজুর ছিল বলিয়া মনে করা চলে। ১৮৭১-৭২ সালে ইহা ছিল ১৮%, ১৮৮১ সালে ১৫% এবং ১৮৯১ সালে ১৩%।

ব্রিটিশ আমলে ইহার উদ্ভব

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৮৯৬—৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ এবং সেই ক্ষতি কাটাইয়া উঠিবার পূর্বেই ১৮৯৯—১৯০০ সালের দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ। বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে পাঁচবৎসরের এই দুর্ভিক্ষগুলি তথাকথিত কৃষিসমৃদ্ধির যুগ শেষ করিয়া দিল এবং ভূমিহীন নিরন্ন কৃষিমজুরের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দিল। গরীব চাষী ও ভূমিহীন কৃষক সর্বাধিক কষ্ট ও দুর্দশার মধ্য দিয়া পার হইল।

১৯০১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় কৃষিমজুরের সংখ্যা হইয়াছে ২৫%, অর্থাৎ দশ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সাময়িকভাবে দুর্ভিক্ষরোধ হওয়ায় ১৯১১ সালে ইহা দাঁড়াইল ২২%, ১৯২১ সালে ইহা হইল ২৬·২% এবং যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ১৯৩১ সালের আদমসুমারি কমিশনার বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন "অনুপাতে এত বেশি পরিবর্তন কিছুটা আশ্চর্যজনক।"

এবং কৃষি-অর্থনীতির ভাঙনে ইহার বৃদ্ধি

১৯৩১ সালের আদমসুমারিতে কৃষিমজুরের সংখ্যা ধরা হইয়াছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এক লেখক ইহাদের নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিয়াছিলেন: (ক) ভূমিসংলগ্ন মজুর (Bonded Labourers) ৩০ লক্ষ; (খ) অপূর্ণ নিযুক্ত মজুর (Under-employed Labourers) ৩ কোটি ৫০ লক্ষ; গ) সারাবৎসরের "স্বাধীন" মজুর (Full-time "Free" wage Labourers) ৪০ লক্ষ।

কৃষিমজুরদের বর্তমান অবস্থা: কৃষিমজুর অনুসন্ধান কমিটির বিবরণী (Present position of Agricultural Labourers: Report of the Agricultural Labour Enquiry, 1950-51)

১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর সারা দেশের কৃষিমজুরদের কাজকর্ম ও জীবনযাপন সম্পর্কে একটি ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য পরিচালন করেন। এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে 'পরিবার'-কে একটি অর্থনৈতিক ইউনিট ধরা হইয়াছিল। কৃষিমজুর পরিবার বলিলে বোঝা যায় এমন পরিবার যাহার কর্তা বা অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিমজুর। অপরপক্ষে, কৃষিমজুর হইল সেই ব্যক্তি যে মোট কর্মে নিযুক্ত দিনের অর্ধেকের বেশি অপরের কৃষিকার্যে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করে। এইরূপে যাহাদের অল্প-কিছু জমি আছে কিন্তু প্রধানত মজুরির সাহায্যে জীবনধারণ করে, তাহাদেরও মজুর হিসাবে ধরা হইয়াছিল।

কৃষিমজুর কাহাকে বলে

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, (ক) মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০·৪টি পরিবারই কৃষিমজুর পরিবার। এই ১ কোটি ৭৬ লক্ষ কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে অর্ধেকের অল্প কিছু জমি আছে, বাকি অর্ধেকের কোন জমি নাই। যাহাদের জমি আছে, তাহাদের গড় মালিকানার পরিমাণ ২·৯ একর।

পরিমাণ

(খ) সংলগ্ন (Attatched) ও অসংলগ্ন (Casual) দুই শ্রেণীতে কৃষি-মজুরদের ভাগ করা হইয়াছে। সংলগ্ন মজুরদের মোটামুটি নিয়মিত কাজ থাকে এবং কাজের সময় মালিকের সঙ্গে কোন না কোন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। এই সংলগ্ন শ্রমিকেরা প্রকৃতপক্ষে দাসশ্রেণীর। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদের সহিত বিভিন্ন ধরনের "চুক্তি", থাকে। যেমন, বিহারে কোন না কোন সময়ে অভাবের তাড়নায় ইহারা ঋণ লয় এবং সেই ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত দাস হিসাবে কাজ চালাইয়া যায়, মালিককে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। পশ্চিমবাংলার ভাগ চাষীরাও প্রকৃত পক্ষে এইরূপ সংলগ্ন কৃষিমজুর। কেরালাতে "সংলগ্ন" মজুরেরা গৃহভৃত্যের কাজও করিতে রাজি থাকিলে তবে তাহার থাকার জায়গা ও খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে চুক্তির কথা উঠে। অসংলগ্ন মজুররাই "স্বাধীন", তবে সারা বৎসরে কতদিন কাজ থাকিবে তাহার কোন নির্দিষ্টতা নাই। "অসংলগ্ন" শ্রমিকদের অবস্থা তাই অর্থনৈতিক দিক হইতে আরও শোচনীয়। এই অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, "অসংলগ্ন" কৃষিমজুরের সংখ্যা ভারতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। মোট কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে ৮৫·২%, অর্থাৎ ১½ কোটি কৃষিমজুর পরিবারই অসংলগ্ন, অবশিষ্ট সংলগ্ন।

দুই প্রকার—সংলগ্ন ও স্বাধীন

(গ) অনুসন্ধানের বিবরণী হইতে কৃষিমজুরদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে এই তথ্য জানা যায় যে, বৎসবে "সংলগ্ন" পুরুষ-শ্রমিকেরা ৩১২ দিন এবং "অসংলগ্ন" পুরুষ-শ্রমিকেরা ২০৭ দিন কর্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট সময়ে ইহারা মোটামুটি বেকার থাকে বলা চলে।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কর্মসংস্থান ও বেকারির পরিমাণে পার্থক্য আছে। সাধারণত এই পার্থক্য দেখা যায় বহু কারণে, যেমন জলসেচ ও দুই-ফসল উৎপাদন, উর্বরতা, ফসল উৎপাদনের ধরন (cropping pattern), জমিতে জনসংখ্যার চাপ, আঞ্চলিক ভূমিস্বত্ব, শিল্পের নৈকট্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে বিভিন্নতার জন্য। কৃষিমজুরদের বেকারির প্রধান কারণ হইল কাজের অভাব, কর্মহীন মোট দিবসগুলির মধ্যে ৭৪·৪% দিনই কাজের অভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। অন্যান্য দিন অসুস্থতা, ঝড়বাদল প্রভৃতির জন্য বেকার অবস্থায় কাটে।

ইহাদের বেকারির পরিমাণ

(ঘ) কৃষি-মজুরদের আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, বৎসরে গড়ে পরিবার-প্রতি আয়ের পরিমাণ হইল ৪৮৭ টাকা। মাথাপিছু গড়

আয়ের পরিমাণ ১০৪ টাকা। যখন ভারতের সকল অধিবাসীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২৬৫ টাকা (১৯৫০-৫১ সালে), তখন গ্রামাঞ্চলের এত বিপুল পরিমাণ লোকের আয় মাসে ৯ টাকারও কম, ইহা মনে রাখা দরকার।

ইহাদের আয়

গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের তুলনায় কৃষিমজুরদের অবস্থা অনেক খারাপ। মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ অন্যান্য সকল পরিবারের তুলনায় অনেক কম। সারা দেশের গ্রাম্য পরিবারের বাৎসরিক গড় ব্যয় হইল ২০৪ টাকা, কৃষি-মজুরদের ক্ষেত্রে ইহা হইল ১০৭ টাকা। অন্যান্য গ্রাম্য পরিবার খাদ্যের পিছনে আয়ের ৭৪% ব্যয় করে, কৃষিমজুর পরিবার ব্যয় করে ৮৫%। বস্ত্রের উপর অন্যান্য পরিবার ব্যয় করে ১৩ ৪%, কিন্তু কৃষিমজুর পরিবার ব্যয় করে ৬৫%।

ইহাদের ব্যয়

ভারতের মোট কৃষিমজুর পরিবারের আয় ৭৯০ কোটি টাকা ধরা যাইতে পারে; সেই সময়ের জাতীয় আয়ের (৯৫৩০ কোটি টাকা) তুলনায় হিসাব করিলে দেখা যায় ভারতের মোট পরিবার-সংখ্যার ২২ ৭% ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র ৮ ৩% পাইয়া থাকে।

জাতীয় আয়ের তুলনায় ইহাদের আয়

১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতীয় শ্রমদপ্তর কর্তৃক দ্বিতীয় কৃষিশ্রমিক অনুসন্ধানের বিবরণী প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, কৃষিমজুরদের জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে। পুরুষ-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১০৯ নঃ পঃ, উহা কমিয়া হইয়াছে ৯৬ নঃ পঃ। স্ত্রী-শ্রমিকের ক্ষেত্রে ইহা ৬৮ নঃ পঃ হইতে ৫৯ নঃ পঃ হইয়াছে। কমিশনের বিবরণীতে আরও ভয়াবহ চিত্র দেখা গিয়াছে। গত কয়েক বৎসর কৃষিমজুরের একাংশ কার্যত দাস-স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, যেমন বোম্বাইতে হালি, বিহারে কামিয়া, প্রভৃতি শ্রেণী।

দ্বিতীয় অনুসন্ধান কমিটির বিবরণী

সমস্যার সমাধান ও কৃষিমজুর সম্পর্কে সরকারী নীতি (Solution of the Problem and Government Policy regarding the Agricultural Labourers)

পরিকল্পনা কমিশনের মতে, কৃষিমজুরদের সমস্যা গ্রামাঞ্চলিক বেকারি ও অর্ধবেকারির বৃহত্তর সমস্যার অংশ। জলসেচ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যের

দরুন উৎপাদন বাড়িয়াছে বটে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাপাইয়া ইহা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই, তাই বর্ধিত উৎপাদন অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। জমির মালিক-চাষীদের তুলনায় জমিহীন কৃষিমজুরদের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, কোন কোন অঞ্চলে তাহাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে খারাপই হইয়াছে। গ্রাম্য অর্থ নৈতিক কাঠামোর মৌলিক সমস্যা হইল কম আয়, কম উৎপাদন-ক্ষমতা এবং অবিচ্ছিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগাভাব। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিক কর্মসূচী যত দ্রুত সফল হইবে ততই কৃষিমজুরদের সমস্যার সমাধান ঘটিতে পারে।

সামগ্রিক উন্নয়নের ফলেই এই সমস্যার সমাধান

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিমজুরদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছিল এবং উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের নিম্নতম মজুরি আইন কৃষি-কর্মক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এইরূপ বলা হইয়াছিল। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, কৃষিমজুরির অনেকাংশে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ কৃষিতে মূলধন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাত্রার দ্বারা ইহা নিরূপিত। ইহা আরও নির্ভর করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে টাকাকড়ির প্রচলন কিরূপ তাহার উপর।

প্রথম পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলসেচ, কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়নের কর্মসূচী ছাড়াও ২০০ কোটি টাকা কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। আরও কতকগুলি কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল যাহাতে কৃষিমজুরদের ন্যায় গ্রাম্য জনসাধারণের দুর্বলতর অংশ উপকৃত হইতে পারে, যেমন বাসস্থানের ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণে সাহায্য, শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গঠন প্রভৃতি। ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, এবং ভূদান প্রভৃতির দরুন যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে তাহা ৩০০,০০০ কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে বণ্টনের কথাও বলা হইয়াছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কাজ ততটা অগ্রসর হয় নাই *

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

* "Difficulties regarding the title to the lands donated and other procedural and organisational matters account for slow progress,"............"It is apparent from the experience of the first two Plans that while special schemes in the interest of agricultural labourers are useful, they can touch only the fringe of the problem. Ultimately, it is by achieving rapid and

গত দুইটি পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, কৃষিমজুরদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কর্মসূচী কোন কোন ক্ষেত্রে উপকার আনিলেও ইহারা সমস্যাটির মূলে পৌঁছায় না, কিনারায় আঘাত করে মাত্র। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক ও দ্রুত উন্নতি ঘটানোই এই সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান করিতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায়, গ্রাম্য অর্থ নৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে। কৃষি, জলসেচ ও সমষ্টি উন্নয়ন—সবকিছু মিলাইয়া ১৭০০ কোটি টাকার উপরে ব্যয় করা হইবে। কৃষি-উৎপাদন ৩০% বাড়াইবার কথা। জলসেচের দ্বারা উপকৃত হইবে ২০ মিলিয়ন একর এবং ভূমি-ক্ষয় নীতি দ্বারা ১১ মিলিয়ন একর জমি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের জন্য বিপুল ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উদ্বৃত্ত জমি কৃষিমজুরদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে স্থির হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে পথঘাট ও অন্যান্য নির্মাণ কার্যের পরিমাণ বাড়ানো হইবে; এই সকল কাজকর্মের ভার যতটা সম্ভব শ্রমিক-সমবায়ের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী কার্যকরী করার সময়ে সেই অঞ্চলের কৃষিমজুরদের কর্মসংস্থানকে অবশ্যই অন্যতম প্রধান কর্তব্য হিসাবে মনে করিবে। ভবিষ্যতের গ্রাম্য অর্থ নৈতিক কাঠামোতে সমবায়মুখী জীবনাদর্শের প্রসার ঘটিবে, তাই আশা করা যায় অন্যান্য গ্রাম্য জনসাধারণের সহিত সমতার ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষিমজুরেরা সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। ইহাই পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন।*

তৃতীয় পরিকল্পনা

বর্তমান অবস্থার গতি পর্যালোচনা (Review of the Present Trend):

১৯৫৬-৫৭ সালের অনুসন্ধানের পরে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। কৃষিমজুর শ্রেণীর অবস্থা এই কয় বৎসরে বর্তমানে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা আলোচনা করা দরকার। বিভিন্ন সরকারী সূত্র হইতে জানা যায় যে, ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থার সংস্কারের চাপে ভারতের জমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা এবং "অসংলগ্ন" মজুরের সংখ্যা অভূতপূর্ব

পরিমাণ বাড়িতেছে

---

intensive developments in the rural areas as part of the process of economic development for the country as a whole that the landless sections of the population can be substantially benefitted.

Third Five Year Plan, P. 376.

* *Third Five Year Plan*, P. 379.

পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, জমিদারেরা চাষের স্বত্ব আছে এমন চাষীদেরও সম্ভব হইলে উচ্ছেদ করিতেছে। ভূমি-সংস্কার আইনের সাহায্যে এই উচ্ছেদ চলিতেছে।

কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতেছে? পরিকল্পনা কমিশনের নীতি হইল ব্যক্তির হাতে জমির পরিমাণ বাঁধিয়া বাকিটা চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা (মনে রাখা দরকার যে ইহার জন্য চাষীদের দাম দিতে হইবে, বিনামূল্যে পাইবে না)। কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের আইনে ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সর্বোচ্চ পরিমাণের সীমা খুবই উঁচুতে ধরা হইয়াছে এবং নিজ-চাষের জন্য সেই পরিমাণ জমি রাখিতে পারিবে বলা হইয়াছে। "নিজ-চাষ" ব্যাখ্যা করা হইয়াছে নিজের জন্য চাষ হিসাবে, নিজের দ্বারা চাষ নয়।

কেন ও কিরূপে

ফলে মজুর লাগাইয়, ভৃত্য খাটাইয়া, ভাগ-চাষী নিয়োগ করিয়া বা নগদ খাজনার বিনিময়ে স্বেচ্ছা-চাষীর দ্বারা সেই সকল জমি চাষ করানো চলে—ইহা আইনেই স্বীকৃত হইয়াছে। এই ধরনের আইনের অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছে যাহাতে জমিতে অপর কাহারও স্বত্ব থাকিতে না পারে সেই জন্য তাহাদের উচ্ছেদ এবং মজুর হিসাবে জমিতেই পুনর্নিয়োগ।* তাহা ছাড়া, আরও অনেক কারণে উচ্ছেদ সম্ভব হইবে। যেমন আইনে বলা হইয়াছে, ঠিক সময়মত খাজনা না দেওয়া, গ্রামের অন্যান্য জমির সমান পরিমাণ উৎপাদন না করা প্রভৃতি। আইন ছাড়াও বেআইনী ভাবে, কাগজপত্র পাল্টাইয়া এবং সরাসরি জোর করিয়া উচ্ছেদের পরিমাণও ভারতে এমন কিছু কম ঘটিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে চাষীদের সাদা কাগজে টিপ সহি দেওয়াইয়া লিখাইয়া লওয়া হইতেছে, যে তাহারা ভাগচাষী নয়, মজুর। এই ধরনের মজুর-কবুলিয়তকে সরকার স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির মর্যাদা দিতেছেন। এইরূপে ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রত্যক্ষ ফলই হইল ভূমিহীন অসংলগ্ন কৃষিমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি। আইনের চক্ষে বর্তমানে তাঁহারা স্বাধীন মজুর, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাত হইতে তাহাদের পূর্ণ মুক্তি এখনও ঘটে নাই, ইহাই বাস্তব চিত্র।

সুতরাং বর্তমানের সরকারী নীতি ভূমিহীন চাষীর কোন উপকার করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। বলা হইতেছে, যে-পরিমাণ জমি (অনুন্নত, পতিত বা

---

* "The landlords, therefore retain the right to eject all or any tenant on the ground of personal cultivation."—*H. D. Malaviya,* Land Reforms p. 451.

চাষের অযোগ্য) জমিদারেরা ছাড়িয়া দিবে বা ভূদান যজ্ঞে পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে। যুক্তপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় বলা যায় বহু মাঝারি চাষীও জমি কিনিবার মত টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, ভারতে কোথাও পারিবে না। পরিকল্পনা কমিশন পর্যন্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন, জমি বিক্রয় করা হইবে। ভূমিহীন কৃষিমজুর যাহার মাথাপিছু মাসে ৯ টাকার কম আয়—সে কি এই জমি কিনিয়া লইবে? ইহা কেহই আশা করে না। তবে এই জমি কে কিনিবে? নিশ্চযই তাহারা, যাহাদের নিজস্ব নামে, বেনামে, চাকর-বাকরের নামে, দেবতার পূজার নামে জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমার কম আছে।

ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক কাঠামোর রূপ

এইরূপে যখন জমি বণ্টন শেষ হইবে তখন জমিসম্পন্ন এই সকল বৃহৎ জমিদারদের লইয়া—ইহারা এখন আইনের চক্ষে "চাষীতে" পরিণত হইয়াছে —সমবায় চাষ সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে। এই সকল তথাকথিত "চাষী" নিজেরা চাষ করে না, তাই এই সকল সমবায় চাষ সমিতি প্রকৃতপক্ষে যৌথ মূলধনী কারবারে পরিণত হইবে এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজুর খাটাইয়া ইহাতে চাষের কাজ শুরু হইবে। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে এই দিকেই ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছে।

সেই কাঠামোতে কৃষি মজুরের স্থান

সেই নূতন কৃষি অর্থ নৈতিক কাঠামোতে কৃষিমজুরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। ধনতন্ত্রের বিকাশে শ্রমিকের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যত বেশিসংখ্যক ভূমিসম্পন্ন ও "সংলগ্ন" কৃষিমজুর ভূমিহীন ও "অসংলগ্ন" কৃষিমজুরে পরিণত হয়, মজুরির হার ও কার্যের শর্ত ততই "সমবায়ী চাষীদের" উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সাহায্য করিবে। ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটিতে সাহায্য করাই ক্রমবর্ধমান কৃষিমজুর শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

দুঃখের কথা এই যে, ভারতে শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুত নয়, ফলে কৃষিজ দ্রব্যের বাজার আরও দ্রুত বাড়িতেছে না এবং কৃষির পূর্ণ যন্ত্রীকরণ সম্ভব হইতেছে না। তাই কৃষিতে পূর্ণ ধনতান্ত্রিক বিকাশে দেরি হইতেছে। তাহা ছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত থাকায় কৃষিমজুরের সংখ্যা বেশি। ফলে, শ্রম প্রগাঢ় পদ্ধতিতে ধনতান্ত্রিক চাষ এখনও কম ব্যয়শীল। তাই কৃষিমজুর শ্রেণীকে আরও কিছুকাল প্রায় ভূমিদাস থাকিতে হইবে। মন টন

একর বিঘা ও লক্ষ-কোটির অন্তরালে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির কাঠামোতে ও শ্রেণী বিন্যাসে এই পট পরিবর্তন ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

অনুশীলনী

1. Discuss the condition of Agricultural Labourers in Indian Economy. What measures are being taken to improve their condition ?

2. Briefly summarise the report of Agricultural Labour Enquiry. What steps are being taken to improve their conditions in our Five Year Plans ?

১৩

সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতালুক পরিকল্পনা

Community Development Projects and Industrial Estates

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমষ্টি উন্নয়নের ভূমিকা (Role of the Community Development in the growth of the Indian Economy)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে গেলে যতটা ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন দরকার তাহার জন্য প্রথমে কৃষির উন্নতি কিছুটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিনিয়োগযোগ্য প্রাথমিক উপকরণসমূহ প্রধানত কৃষি হইতে আসিতে পারে। প্রথমত, অকৃষিগত কাজকর্ম করার মত শ্রমিক; দ্বিতীয়ত, শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার মত খাদ্য ও কাচামাল; তৃতীয়ত, কৃষিতে ও শিল্পে নিযুক্ত হইবার মত বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বৃত্ত; এবং চতুর্থত, কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করিয়া প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা—এই সকল পাইতে হইলে কৃষিপদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন (Rationalisation) খুবই দরকার। কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পুনর্গঠনের ফল হইল কৃষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি, একর প্রতি ও চাসী-প্রতি উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি। সেই উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিয়া কৃষিকার্যে বা শিল্পক্ষেত্রে মূলধন-গঠন ত্বরান্বিত করা যায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে কৃষির উপর

কিন্তু ভারতের কৃষি কাঠামো এখনও অনুন্নত অবস্থায় আছে, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপযোগী খাদ্য কাচামাল ও সস্তা শ্রমিক যোগান দিতে পারিতেছে না। এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন, তাহা না হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব হইবে না। পরিকল্পনা কমিশন এই উদ্দেশ্যে জলসেচ, পতিত জমির উদ্ধার, সার, বীজ ও ঋণদান—এই পঞ্চমুখী কার্যসূচীর কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। উহা হইল শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে সুসংগঠিত গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলা, যাহাতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি উচ্চস্তরে

কৃষি উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হইল উপযুক্ত নেতার অভাব

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে। ইহার উদ্দেশ্য হইল গ্রামাঞ্চলে যে নূতন পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতে হইবে তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করার উপযোগী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়িয়া তোলা।

নেতৃত্ব কাহাকে বলে?

নেতৃত্ব কাহাকে বলে? প্রতিটি গ্রামে এমন একজন বা একদল লোক গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহারা সদাসর্বদা উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে জল, বীজ সার, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি প্রয়োগ করার প্রযোজন অনুভব করিবে এবং তাহাদের তাগিদে এই উন্নয়নের কার্যসূচী সফল হইতে পারিবে। নিজেদের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখিয়া দ্রুত কৃষি উন্নয়নকে তাহারা পরিচালিত করিতে পারিবে। এই নেতৃত্ব উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না; গ্রাম্য জনসাধারণ নিজেরাই স্বতস্ফূর্তভাবে ইহার উদ্ভব ও পুনর্গঠন করিতে থাকিবে। গ্রামের মাটি ও মানুষের উৎপাদনক্ষমতা অবিরাম ধারায় বাড়াইয়া তোলাই ইহার লক্ষ্য। গ্রামাঞ্চলের স্থিতিশীলতার ভিত্তি নাড়াইয়া ইহা ক্রমাগত সেই পরিবর্তনের ধারক শক্তি হিসাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

সাধারণত এইরূপ নেতৃত্বের তিনটি রূপ দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক পূর্ণোন্নত দেশসমূহে গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা, সামন্ততান্ত্রিক আত্মকেন্দ্রিকতা সকল কিছু দূর করিয়া কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই সকল দেশে ধনীচাষী বা জমিদার শ্রেণী ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির পরিমাণ বাড়াইয়া কৃষিকার্যে মূলধন নিয়োগ করিয়াছে। অর্থ ও যন্ত্রপাতির আকারে মূলধন বা পুঁজি গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে সুস্পষ্টভাবে বাজারমুখী (market-oriented) করিয়া তুলিয়াছিল। নিজের বিস্তারের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় যৌথখামার গড়িয়া তুলিয়া উহাদেরই হাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী

ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নিজেই সেই নেতৃত্ব গড়িয়া লয়

গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো গড়িয়া তোলার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিল। যেমন, চীনে সারা দেশ ব্যাপিয়া যে কমুন গড়ার আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়া দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপযোগী কৃষি ও গ্রামকাঠামো গড়িয়া উঠিতেছে। এই কমুন বা সুবৃহৎ সমবায়-সমিতিগুলি চাষবাস এবং ক্ষুদ্র শিল্পের একত্রে প্রসার ঘটাইতেছে; শ্রমবিভাগ ও শ্রম প্রগাঢ়

পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া মাটি ও মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া চলিয়াছে।

ভারতের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী গ্রামীণ কাঠামো গড়িয়া তোলার প্রয়াস। গ্রামপঞ্চায়েত ও বহুমুখী কৃষি-সমবায় সমিতি গঠন করিয়া উহার উপর কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ভার অর্পণ করা এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী এতদিন গ্রাম হইতে সহরে চলিয়া আসিয়াছে. গ্রামের নেতৃত্ব ক্ষয় হইয়াছে। সহরের সুযোগসুবিধা (পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, কলের জল, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল) গ্রামাঞ্চলেই তৈয়ারী করিয়া দিলে তাহারা গ্রামে বসবাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিতে পারে। তাহাদের নেতৃত্বে কৃষির পুনর্গঠন একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর জোর দিলে ধনতান্ত্রিক কৃষির উদ্ভব হইবে। আবার পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হইয়া সামাজিক মালিকানা স্থাপিত হইবে, উহাতে ব্যক্তিগত প্রেরণা ও উদ্যোগ নষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক হইতেও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (democratic decentralisation) দরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন দেশের মাটি ও মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়াই এই পরিকল্পনার সার্থকতা নয়, ইহার সর্বশেষ লক্ষ্য হইল সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তন করা। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমষ্টি-উন্নয়নের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়।

ভারতে উহার দারিদ্র লইবে পঞ্চায়েতগুলি

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects)

মোটামুটি সমস্বার্থসম্পন্ন সমদৃষ্টিভঙ্গীবিশিষ্ট একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জনসমষ্টির যন্ত্রজ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ ও কাজকর্ম; এবং সামাজিক শিক্ষা সংস্কার ও মনোবৃত্তি—সকল দিক হইতে একযোগে উন্নতি করিতে পারিলে সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতি সম্ভবপর হয়। সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও তাই। নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে একযোগে সকল দিকে উন্নয়নের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিলে দ্রুত অধিক উন্নতি হওয়া সম্ভবপর; বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন স্তরের উন্নতি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অগ্রসর হইতে পারে। প্রত্যেক-

ভারতের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃতি

গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত এক একটি জনসমষ্টিতে একটি বহুমুখী সংগঠন থাকিবে এবং এই অঞ্চলের প্রতিটি গৃহে সেই সংগঠন তাহার উন্নয়ন-প্রচেষ্টা চালাইতে থাকিবে। জনসাধারণ নিজেরাই নিজ অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করায় অংশ গ্রহণ করিবে; উপর হইতে উন্নতি না চাপাইয়া তাহাদের নিজেদের মনের মধ্যে সামগ্রিক ও সমষ্টিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আবেগ সৃষ্টি করিবে। গ্রামাঞ্চলে স্বতঃসঞ্জাত উৎসাহ ও দৃঢ় মনোভঙ্গী আনিয়াই সমাজোন্নয়ন ঘটাইতে হইবে—এই পরিকল্পনার ইহাই মূলনীতি।

সাধারণত দুই ধরনের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতে স্থাপিত হইয়াছে মূল প্রজেক্ট ও মিশ্র প্রজেক্ট (Basic Project and composite Projccts)। মূল প্রজেক্ট প্রধানত কৃষি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে; মিশ্র প্রজেক্টে ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প এবং আধাসহর আধাগ্রাম জাতীয় ছোট ছোট নগরাঞ্চল গড়িয়া তোলার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

মূল ও মিশ্র প্রজেক্ট

প্রত্যেকটি প্রজেক্ট এলাকা গঠিত হইবে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া ৩০০ গ্রাম লইয়া, ১২ লক্ষ একর কর্ষিত ভূমি ব্যাপিয়া এবং ২ লক্ষ অধিবাসী লইয়া। এইরূপ এক একটি প্রজেক্ট এলাকাকে আবার ৩টি করিয়া উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হইয়াছে; প্রত্যেকটি উন্নয়ন ব্লক গঠিত হইবে ১০০ গ্রাম জুড়িয়া এবং আনুমানিক ৭০০০১ অধিবাসী লইয়া। প্রত্যেকটি উন্নয়নব্লককে বিভক্ত করা হইবে ৫টি গ্রাম লইয়া এক একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলে। এক একটি এইরূপ ক্ষুদ্রাঞ্চলে গ্রাম্যস্তরের এক একজন কর্মী উন্নয়নমূলক কার্যাদি চালাইয়া যাইবে।

সংগঠন

প্রত্যেকটি প্রজেক্টে এক একজন প্রজেক্ট অফিসার থাকিবেন এবং প্রত্যেকটি ব্লকে এক একজন ব্লক অফিসার থাকিবেন। ইহাদের সহিত ১২ জন বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ অফিসার থাকিবেন। প্রজেক্ট অফিসারকে সাহায্য করার জন্য একটি প্রজেক্ট উপদেষ্টা কমিটি (Project Advisory Committee) থাকিবে, ইহা গঠিত হইবে রাজনৈতিক নেতা, জনকল্যাণকর্মী, প্রতিনিধিস্থানীয় চাষী, সংসদ ও আইনসভার স্থানীয় সদস্যগণ, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান সরকারী কর্মচারীগণ প্রভৃতি লইয়া।

পরিচালনা

প্রত্যেক জেলাতে জেলা উন্নয়ন অফিসার থাকিবেন. জেলা উন্নয়ন বোর্ড তাহাকে সাহায্য করিবে। রাজ্যের সকল কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একজন রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার থাকিবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রীদের লইয়া একটি রাজ্য উন্নয়ন কমিটি থাকিবে। পরিকল্পনা কমিশন হইতে সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিটসমূহের প্রধান কাজ হইল কৃষি উন্নয়ন, পথঘাট উন্নয়ন, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার, সেই এলাকার অধিবাসীদের কর্মসংস্থান বাড়ান, জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিক্ষাদান এবং জনকল্যাণ বৃদ্ধি করা। কৃষি উন্নয়নের কার্যসূচীর মধ্যে আছে পতিত জমির উদ্ধার, ছোট খাট জলসেচের ব্যবস্থা করা, উন্নত ধরনের বীজ, সার ও চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রভৃতি। পথঘাট উন্নয়নের কাজ যাহাতে জনসাধারণের স্বেচ্ছাদত্ত শ্রমে হয় সেই প্রচেষ্টা করা দরকার এবং লক্ষ্য হইল প্রজেক্ট এলাকার প্রতি গ্রামে অন্তত একটি প্রধান রাস্তা গড়িয়া তোলা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, হাতের কাজ ও যন্ত্রবিদ্যার প্রসার, প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে প্রাথমিক ইউনিট, দ্বিতীয় স্তরের চিকিৎসা ইউনিট—ইহাদের সহিত প্রজেক্ট পরিচালনা কেন্দ্রে হাসপাতাল, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র ও ঔষধালয় প্রভৃতি স্থাপন করা, ইহার কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রধান কাজ কর্ম

প্রথম পরিকল্পনাতে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা পরিকল্পনার জন্য মোট ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মোট ৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছিল। ভারত-মার্কিন টেকনিকাল সহযোগিতা স্কীম (Indo-U. S. Technical Co-operation Scheme) অনুযায়ী এই ব্যয়ের প্রায় ১১% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে। যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রকৌশলগত উপদেশের আকারে প্রধানত এই সাহায্য আসে।

অর্থ সংগ্রহ ও বরাদ্দ

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য প্রথমে ভারত সরকার আরও-খাদ্য বাড়াও কমিটির (Grow more food Committee) সুপারিশে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। গ্রাম জীবনের সকল দিকে সুসংহত উন্নয়ন আনিয়া সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করাই জাতীয়

সম্প্রসারণ কার্যের লক্ষ্য ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় এইরূপ ১২০০ ব্লক স্থাপন করা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সারা ভারতের সকল গ্রামকে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা পরিকল্পিত হইয়াছিল। আমেরিকাতে এইরূপ প্রসার-কার্য (extension) বা উপদেশমূলক কার্য দেখিতে পাওয়া যায়—উহার অনুরূপ এই কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। জাতীয় সম্প্রসারণ বা সেবা এমন ধরনের এক সংগঠন যাহার মাধ্যমে প্রতিটি চাষীর গৃহে তাহার নিকটে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সচেতনতা পৌঁছাইবার চেষ্টা করা হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। গণচেতনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করাই ইহার প্রধান নীতি।

সমষ্টি উন্নয়নের তুলনায় কম ব্যাপক ও কম ব্যয়শীল

এক একটি মহল্লায় ১০০ হইতে ১২০টি গ্রাম লইয়া উন্নয়ন ব্লক গঠিত হইবে এবং এই এলাকায় একজন উন্নয়ন অফিসার বা সম্প্রসারণ অফিসার থাকিবে; তাহাকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ অন্যান্য অফিসার থাকিবে; প্রতি গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া এই কার্যে শিক্ষিত গ্রামসেবক থাকিবে।

গঠন

পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বলবন্ত্রী মেহতা কমিটির অনুসন্ধান
(Progress of Community Development Projects aud findings of Balawantri Mehta Committee)

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার দিকে সর্বদা নজর দিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি কার্যসূচী মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluation organisation) নিয়োগ করিয়াছেন, উহা প্রতি বৎসর রিপোর্ট দিয়া আসিতেছে। উহার চতুর্থ রিপোর্টে দেখা যায় যে, কার্যসূচীর তুলনায় প্রকৃত কাজ কম হইয়াছে; জলসেচ, জমি উদ্ধার, ভূমিক্ষয় রোধ ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতি সাধন প্রভৃতি কাজ কমই হইয়াছে। কুটিরশিল্পের প্রসার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (স্কুল, সমবায় প্রভৃতি) গড়িয়া তোলার কাজ তৃতটা অগ্রসর হয় নাই। জনসাধারণের মনে উৎসাহ ও আত্মনির্ভরশীলতা ততটা জাগে নাই। সকল ব্লক সমান সুবিধা পায় নাই, ব্লকের মধ্যে গ্রামগুলিতে অসমান বণ্টন হইয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকল শ্রেণী ইহার সুবিধা সমান ভোগ

কার্যসূচী মূল্যায়ন সংগঠনের রিপোর্ট

করে নাই, বর্ণগত ও অর্থগত কুলীন শ্রেণীর ব্যক্তিরাই নীচু ও গরীব শ্রেণীর তুলনায় অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে।*

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সংসদ উহার সদস্য শ্রীবলবন্ত্রী মেহ্‌তার সভাপতিত্বে একটি ষ্টাডি টীম (Study Team) নিযুক্ত করেন। এই টীমের প্রধান সুপারিশ হইল "গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের" (Democratic Decentralisation) জন্য গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জিলা স্তরে জিলা পরিষদ স্থাপন করা। গ্রাম সেবককে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পাদক করা উচিত। একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি (Multipurpose Co-operative Society) স্থাপিত হইয়া স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা উচিত। কল্যাণমূলক কাজের ঝোঁক একটু কমাইয়া অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া উচিত। বর্তমানের তিন স্তরের কার্যক্রম বাদ দিয়া অবিচ্ছিন্ন ছয় বৎসরের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা যে কার্যসূচীতে সম্মতি দিয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্মতি পাইবার জন্য পাঠাইবার রীতি বাদ দেওয়া উচিত।

সংসদের ষ্টাডি টীমের রিপোর্ট

বলবন্ত্রী মেহ্‌তা কমিটির এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংশোধিত কার্যসূচী কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করে। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, প্রগাঢ় সমাজোন্নয়ন, এবং প্রগাঢ়োত্তর সমাজোন্নয়ন—এইরূপ বর্তমানের ত্রিস্তর ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া উহার স্থলে ৫ বৎসরের দুইটি স্তর রাখা হইল। এখন হইতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইল। যাহাতে সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে এই উদ্দেশ্যে ব্লক স্তরের কর্মীদের একটি কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। পঞ্চায়েতের হাতে অধিকতর ক্ষমতা আরোপ করা হইল, এবং ব্লক উন্নয়ন কার্যসূচীর বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ গৃহীত হইল। সমগ্র দেশকে এই

সংশোধিত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা

* বিশ্বভারতী কৃষি অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রের অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা যায়, যে অঞ্চলে বর্ণগত বা অর্থগত সমতা বেশি, সেই অঞ্চলে এই পরিকল্পনা কিছুটা সফল হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাতে উচ্চ শ্রেণী বা ধনী শ্রেণী অধিকতর সুবিধা লাভ করিয়াছে।

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার সীমারেখা ১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে সরাইয়া ১৯৬২ সালের অক্টোবর ধার্য করা হইয়াছিল।

পরিকল্পনার অগ্রগতি ও তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী (Review of development and the Programme of the Third Plan)

তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে বলা হয় যে, এই সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৩১০০-র বেশি উন্নযন ব্লক আছে, প্রায় ৩৭০,০০০টি গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে ৮৮০টি ব্লক পাঁচ বৎসরের অধিকাল পূর্ণ করিয়াছে এবং সমষ্টি-উন্নয়ন কার্যসূচীর দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনা দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পৌছিতে পারিবে। সমষ্টি-উন্নয়ন কার্যে প্রথম দুইটি পরিকল্পনায মোট ব্যযের পরিমাণ হইল প্রায় ২৪০ কোটি টাকা। তৃতীয পরিকল্পনায মোট ২৯৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে; ইহা ছাড়াও গ্রাম পঞ্চাযেতের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ২২৮ কোটি টাকা।

দ্বিতীয পরিকল্পনার কার্যকালেব মধ্যে সমষ্টি-উন্নযন কার্যসূচীর তিনদিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নযন ঘটে। পরিকল্পনার শুরুতে, ৯৫০টি উন্নয়ন ব্লকে কাজ শুরু হইযাছিল; উহার মধ্যে প্রায় ৩৭০টি ছিল প্রজেক্ট স্কীম এবং প্রায় ৫৮০টি ছিল জাতীয় সম্প্রসারণ স্কীমের অন্তর্গত। সেই সময়কার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রতিটি ব্লক প্রথমে গঠিত হইত জাতীয সম্প্রসারণ সেবা হিসাবে, প্রতিটি স্কীম পিছু ৪৫০ ০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে (১ হইতে ২ বৎসর), জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা স্কীমগুলির কিছু অংশ সমষ্টি-উন্নয়ন স্কীমে উন্নীত হইল, এখানে প্রজেক্ট-পিছু বরাদ্দ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। এইরূপে জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমষ্টি উন্নয়ন একই কার্যসূচীর অন্তর্গত দুইটি স্তর বা ধাপরূপে গণ্য হইল। ১৯৫৮ সালের স্টাডি টীমের (Study Team set up by the Committee on Plan Projects) পর্যালোচনা অনুযায়ী এই স্তরভেদ তুলিযা দেওয়া হয়। তখন হইতে একই পরিকল্পনার দুইটি স্তর বা ধাপ হিসাবে আমরা ইহাদের গণ্য করি—প্রতিটি ধাপ ৫ বৎসরকাল ধরিয়া চলিবে। প্রথম স্তরে প্রতি ব্লকের বাজেট হইবে ১২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় স্তরে উহার পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা।

ত্রিমুখী উন্নয়ন :
১। প্রতিটি ব্লকের কার্য-সূচীকে দুইটি স্তরে গণ্য করা

উন্নয়নের দ্বিতীয় দিক হইল পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা করা। দেখা গিয়াছে

উন্নয়নের কাজ প্রধানত স্থানীয় প্রচেষ্টা ও উপকরণের সাহায্যে দ্রুততর করিতে হইলে গ্রামস্তরে পঞ্চায়েত ছাড়াও জিলা ও ব্লক স্তরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনায় অতি সাধারণ ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শাসন বিষয়ে জিলা স্তরে সুসংগঠিত একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলার কথা হইয়াছিল—এই কাঠামোতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি উচ্চস্তরের জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। বলা হইয়াছিল যে আরও ভালভাবে বিচার বিবেচনা করার পূর্বে, সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে জিলা উন্নয়ন কাউন্সিল এবং ব্লকস্তরে উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হউক। স্টাডি টীম সুপারিশ করেন যে, দেশে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (democratic decentralisation) ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল এই ব্যবস্থা আলোচনা করেন। তাঁহাদের ঘোষণায় এই কথা বলা হয় যে, কোনরূপ গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি হইল গ্রামস্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। যে-দুইটি প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য গণতন্ত্র সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে উহারা হইল গ্রামপঞ্চায়েত এবং গ্রাম্য সমবায়। কোন অঞ্চলে, তাই প্রথম কাজই হইবে গ্রামস্তরে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা। জিলার মধ্যে উন্নয়ন কার্যসূচী পরিচালনায় একটি সুসম্বদ্ধ কাঠামোর বিভিন্ন অংশ হইল জিলা, ব্লক ও গ্রাম স্তরের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল তাই জিলা ও ব্লকস্তরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার লক্ষ্য পুনরায় ঘোষণা করে এবং বলে যে প্রত্যেকটি রাজ্য নিজস্ব পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাঠামোটির বিশেষ রূপ নির্ধারিত করিয়া লউক। গত তিন বৎসরে পঞ্চায়েতী রাজ গঠন করার উদ্দেশ্যে বহু রাজ্যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ। গণতান্ত্রিক পরিবেশে গ্রামোন্নয়নের যে সাধারণ নীতি গত দশ বৎসর যাবৎ অনুসৃত হইতেছিল—পঞ্চায়েতী রাজ উহারই পরিণতি।

২। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা করা

সমষ্টি-উন্নয়নের তৃতীয় দিক হইল এই যে, জিলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ব্লকও পরিকল্পনা ও উন্নয়নের এক একটি ইউনিট হিসাবে কাজ করিবে—এইরূপ একটি প্রস্তাব কার্যকরী করার কথা উঠিয়াছে। সুপারিশ করা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলি জিলা ও ব্লক

৩। স্থানীয় পরিকল্পনাগুলি রচনা করা

পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তৃতীয় পারকল্পনাকালীন স্থপারিশ রচনা করিবে :

(১) কৃষি, ক্ষুদ্র জলসেচ, ভূমি সংরক্ষণ, গ্রামের বনাঞ্চল পশুপালন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত ; (২) সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়ন ; (৩) গ্রাম্য শিল্প ; (৪) প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষত, স্থানীয় জনসাধারণের জন্য বিদ্যালযের গৃহ নির্মাণ ; (৫) গ্রামে জলসরবরাহ এবং নিম্নতম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা ; নিকটবর্তী রাস্তা বা রেল ষ্টেশনের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে এইরূপ রাস্তা নির্মাণ ; (৫) গ্রামাঞ্চলে জনশক্তির পূর্ণতর ব্যবহারের উপযোগী নির্মাণ কার্যসূচী।

যদিও কোন কোন রাজ্যে, বিশেষত কৃষিতে ব্লক পরিকল্পনা বচনা কবাব চেষ্টা হইয়াছে, তবুও রাজ্যের পবিকল্পনাগুলি সাধারণত স্থানীয পবিকল্পনাগুলি হইতে স্বাধীনভাবেই করা হইযাছে। ইহা হইতে বোঝা যায যে, স্থানীয পরিকল্পনাগুলির ভিত্তিতে দেশেব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়া রচিত হইবে, এই অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয নাই। বর্তমানে যে পবিবেশে তৃতীয পরিকল্পনা রচিত হইযাছে, সেই অনুযায়ী বলা চলে যে এই অবস্থায স্থানীয পরিকল্পনাগুলির প্রধান কাজ হইবে বাজ্য পরিকল্পনা কার্যকরী কবিয়া তোলার চেষ্টা করা।

জিলা-পরিকল্পনাব সাধারণ কাঠামোব মধ্যে ব্লক পরিকল্পনাব উদ্দেশ্য হইল ব্লকের এলাকার সকল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা। ইহার জন্য প্রযোজন হইল : (ক) ব্লক ও গ্রামের স্তরে স্থানীয ভাবে পরিকল্পনা শুরু করা ; এবং (খ) ব্লকের মধ্যে রূপায়িত হইতেছে এইরূপ বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা। ব্লক পরিকল্পনাব মধ্যে প্রধান ধরনের কাজকর্মেব রূপ কি হইবে তাহা নিচে আলোচিত হইল : (১) সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকটি কোন স্তবে উন্নীত হইযাছে সেই অনুযায়ী উহার বিভিন্ন স্কীমের বাজেটে যে সকল বিষয ধরা হইয়াছে ; (২) বিভিন্ন দপ্তরেব বাজেটের অন্তর্গত যে সকল বিষয ব্লক সংগঠনের মধ্য দিয, কার্যকরী করিযা তোলা যায় ; (৩) আইনের প্রভাবে স্থানীয় জনসমষ্টি বা ব্যক্তিরা যে সকল কাজ করিতে চায ; (৪) অর্ধ-দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের লইযা ব্লকেব কাজকর্ম ; (৫) বিভিন্ন বিষযে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য স্থানীয় জনসমষ্টির নিকট হইতে

অধিকতর সাহায্য আদায় করার উদ্দেশ্যে ব্লক এবং ব্লক সংগঠন কর্তৃক অন্যান্য যে সকল কাজকর্ম করা হইবে।

উপরে যে তিনটি দিক আলোচিত হইয়াছে. যেমন সমষ্টি উন্নয়ন সংগঠনের প্রসার. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তোলা, এবং এলাকা ও গ্রাম পরিকল্পনাগুলিকে রচনা ও কার্যকরী করা—ইহারা সকলেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সম্প্রসারণের কাজকর্ম করার জন্য প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে আছে একদল গ্রামান্তরের কর্মী এবং কৃষি পশুপালন, সমবায়, গ্রামশিল্প ও অন্যান্য দিকে অভিজ্ঞ টেক্নিকাল বিশেষজ্ঞর একটি টীম। ইহারা সকলে ব্লক উন্নয়ন অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালিত। জিলা-স্তরে উচ্চতর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই সম্প্রসারণ-কর্মীরা গ্রামে গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে এবং ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতিদের সাহায্য করে। তাঁহাদের কাজ হইল স্থানীয় জনসমষ্টির ব্যাপক সহযোগিতা এবং স্থানীয় জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণের সর্বাধিক ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে খুঁটিনাটির দিক হইতে নিভুঁল ব্লক ও গ্রাম-পরিকল্পনা রচনা করিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্য করা।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কি

শিল্পতালুক (Industrial Estates)

কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে শিল্পতালুক গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। রেলপথ বা জাতীয় সড়কের কাছাকাছি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হইবে, স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে, সরকারী ব্যয়ে শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া উঠার উপযোগী স্থান এবং এই সকল গৃহ অতি অল্প মূল্যে ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধাগুলি বা বাহ্য ব্যয়-সংকোচের সকল সুবিধা সরকারী ব্যয়ে তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়া উঠেন। ইহাই শিল্পতালুক পরিকল্পনা।

শিল্পতালুক পরিকল্পনা কাহাকে বলে

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পতালুক পরিকল্পনার গুরুত্ব বড় কম নহে। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থান লঘু নয়; আমাদের পরিকল্পনাগুলিতেও এই সকল বিষয়ের উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ

করা হইয়াছে। ইহাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করা রাষ্ট্রেরং দায়িত্ব। ইহাতে বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হইবে ; সুদূর গ্রামের দিকেও অনেক অঞ্চল শিল্পোন্নয়নের ফল ভোগ করিতে পারিবে ; প্রাচীন জীবনযাত্রা ও চিন্তায় আচ্ছন্ন অধিবাসীদের মধ্যে নূতন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের ধারণা নূতন আলোক আনিয়া দিবে, ফলে চারিপাশের কৃষি-অর্থনীতিও ক্রমশ সজীব হইয়া উঠিবে ; অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিবে ; মোটামুটি গ্রাম্য ও সুপরিচিত পরিবেশেই শিল্প শ্রমিকেরা উন্নত ধরনে বসবাস করিতে সক্ষম হইবে। এই সকলের সামাজিক ফল হইবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়া।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইহার ভূমিকা বা গুরুত্ব কোথায়

ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, বেলজিয়ামে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই শিল্পতালুক পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রথম ইংলণ্ডে এইরূপ 'তালুক' গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেশের 'দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে' (depressed or distressed area), অর্থাৎ যে-অঞ্চলে ব্যাপক বেকারি আছে সেই অঞ্চলে শিল্পব্যবসায় ও বাণিজ্য ছড়াইয়া দেওয়া। ইংলণ্ডে সেই সময়ে এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাহারই অনুকরণে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board) ভারত সরকারের নিকট এইরূপ তালুক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষ ভাগে এই প্রস্তাব ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই কার্যসূচী গৃহীত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই পরিকল্পনা-কালের মধ্যে মোট ৭০টি তালুক প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকারখানা গড়িয়া তোলার উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনে অনেকগুলি তালুকই সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে কতকগুলিতে ততটা সাফল্য হয় নাই। উপরন্তু, বেশির ভাগ শিল্পতালুকই বড় শহরের নিকটে স্থাপিত হওয়ায় নূতন নূতন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য ততটা সাফল্য লাভ করে নাই।

এই পরিকল্পনার উৎপত্তি

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার কার্যসূচী ও সাফল্য কতটা

প্রথমের ৬০টি শিল্পতালুক ব্যতীত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৬০টি শিল্পতালুক সবেমাত্র শুরু হইয়াছে বা অনুমোদন পাইয়াছে—তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহাদের সম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইবে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন আয়তনের ও ধরনের আরও ৩০০টি শিল্পতালুক প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইহারা স্থাপিত হইবে যতটা সম্ভব ছোট ও মাঝারি শহরের কাছাকাছি। যে সকল গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ, জল এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা আছে, সেই অঞ্চলেও কিছু সংখ্যক শিল্পতালুক গঠনের ইচ্ছা কমিশন প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ গ্রাম্য শিল্পতালুক (rural industrial estates) প্রধানত শ্রমিকদের কাজের জায়গা, সাধারণ কয়েকটি সুযোগসুবিধা এবং সীমাবদ্ধ সংখ্যক কলকারখানার জায়গা ও ঘরবাড়ি লইয়া গঠিত হইবে। যেখানে প্রচুরসংখ্যক কুশলী কর্মী পাওয়া যায় এইরূপ অঞ্চলে এই সকল শিল্পতালুক যাহাতে স্থাপিত হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে কারণ তাহা হইলেই উহারা উন্নত টেক্‌নিক, যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধাগুলি ব্যবহার করিতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ের কার্যসূচী

আবার কোন কোন জায়গায়, বিশেষ করিয়া বড় শহর বা নগরীর সন্নিকটে কেবলমাত্র উন্নত ধরনের শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তোলা দরকার—যেখানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নিজেদের ঘরবাড়ি তুলিয়া লইতে পারে। এই সকল শিল্পতালুকে সম্পূর্ণ কলকারখানার ঘরবাড়ি তৈয়ারী না থাকিলেও চলিবে। বৃহৎ শিল্পের আনুসঙ্গিক বা অনুপূরক ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য সামনে রাখিয়া কতকগুলি 'ফাংশানাল শিল্পতালুক' (Functional estates) প্রতিষ্ঠিত হইবে। নির্দিষ্ট কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ কয়েকটি শিল্পতালুক গঠনের কথা বলা হইয়াছে, যাহাতে ছাত্রেরা পাঠের সময় উপার্জনের সুযোগ পায়, এইরূপে তাহাদের শিক্ষা ও অভ্যাস তৈরী হয়, পাঠকালের শেষে তাহারা নিজেদের ব্যবসায় খুলিতে পারে; শিল্পতালুক প্রতিষ্ঠার ব্যয় যাহাতে পূর্বাপেক্ষা কম পড়ে, তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার কথা বলিয়াছেন।

অনেক ধরনের শিল্পতালুক দরকার

শিল্পতালুক কার্যসূচীর মূল্যায়ন (Evaluation of the Industrial Estates Programme)

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পতালুকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি প্রধানত

ক্ষুদ্রশিল্প, ইহারা আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি এবং শক্তি ব্যবহার করে। ক্রেতা-জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্য অথবা অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের অনুপূরক দ্রব্যসামগ্রী ইহারা প্রস্তুত করে। গত কয়েক বৎসরে কিছু কিছু কারণে, যেমন আমদানি-নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি, পথঘাটের সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের সাহায্যদান প্রভৃতির ফলে ভারতে এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা কেন ক্রমশ বাড়িতেছে

এই সকল ক্ষুদ্রশিল্প যাহাতে প্রসারিত হইয়া মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইতে পারে এবং আরও বেশিসংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠে তাহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই শিল্পতালুক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কোন অঞ্চলে কোন শিল্পের অন্তর্গত অনেকগুলি ফার্ম স্থাপিত হইলে সেই অঞ্চলে সেই ফার্মগুলির পক্ষে সুবিধাজনক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহাদের বাহ্য ব্যয়সংকোচ বলে। দেশের অভ্যন্তরে নূতন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যাহাতে প্রথম হইতেই এই সকল সুযোগ সুবিধার সাহায্য পায় সেই উদ্দেশ্যে শিল্পতালুক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের নীতির সহিত এই কার্যসূচী খাপ খায় না; তবে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন লক্ষ্যরূপে গণ্য করিলে এই কার্যসূচীর পিছনে এইরূপ অর্থ নৈতিক যুক্তি গ্রহণযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহ্য ব্যয়সংকোচের অর্থ নৈতিক যুক্তি ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন এই কার্যসূচীর স্বপক্ষে আরও তিনটি বিশেষ কারণ ঘোষণা করিয়াছেন: (ক) এইরূপ কার্যসূচীর দরুণ বর্তমানের শিল্পাঞ্চলসমূহের এবং বড় বড় শহরের অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতি দূর হইবে; ফলে ইহা নগর-পরিকল্পনার কার্যসূচীকে সাহায্য করিবে; (খ) কোন বৃহৎ কলকারখানাকে ঘিরিয়া আশেপাশের শহরগুলিতে ক্ষুদ্র-শিল্প গড়িয়া উঠিবে; ফলে ইহা পরিপূরক শিল্পোৎপাদন প্রসারে সাহায্য করিবে; (গ) ক্ষুদ্র শহর এবং বৃহৎ গ্রামের অভিমুখে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাইবে; ফলে দেশে শহরাঞ্চলের অবাধ প্রসার বাধা পাইবে ও শিল্পের স্থাননিরূপণ নিয়ন্ত্রণ করিবে।

বাহ্য ব্যয় সংকোচ সৃষ্টি করা দরকার

বাস্তবক্ষেত্রে এই সকল লক্ষ্য কতটা সফল হইতেছে তাহা আলোচনা করিলেই এই কার্যসূচীর ত্রুটি ধরা পড়িবে। যে কোন অঞ্চলে শিল্পতালুক গঠিত হইলেই তাহা সফল হইবে তাহা নয়। সেই অঞ্চলের কাছাকাছি উদ্যোগী ব্যবসায়শ্রেণী এবং দক্ষ শ্রমিক থাকিলে তবেই সেই শিল্পতালুক

পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে। পূর্ব হইতে সেই অঞ্চলে উদ্যোগক্ষমতা, মূলধন এবং শ্রম উপযুক্তভাবে প্রস্তুত না থাকিলে এইরূপ কার্যসূচী তেমন সফল হইতেছে না। যেমন পাঞ্জাবে লুধিয়ানায় হোসিয়ারী বা বস্ত্র উৎপাদনের বহু ক্ষুদ্র সংস্থা পূর্ব হইতেই চালু ছিল, তাহাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যাই ছিল শক্তি এবং স্থানের। এখানে শিল্পতালুক পরিকল্পনা তাই সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এলাহাবাদের ৩ মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত শিল্পতালুকের অধিকাংশ কারখানা-গৃহই অব্যবহৃত পড়িয়া আছে। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে চিরাচরিত শিল্প-হীন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য হিসাবে এই কার্যসূচী ততটা কার্যকরী নয়। এই সকল অঞ্চল শিল্পসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে হইলে প্রথমে বৃহৎ কোন শিল্প বা কলকারখানা স্থাপিত হওয়া দরকার। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহতের অনুসরণকারী মাত্র, তাহারা নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না। বৃহৎ শিল্প যে বাহ্য ব্যয় সংকোচের সৃষ্টি করে, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তাহার ছত্রচ্ছায়ায় বাড়িতে থাকে। বৃহৎ শিল্পের দক্ষ শ্রমিকদের মধ্য হইতেই কোন কোন উদ্যোগী পুরুষ নিজ প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্যদেশের শিল্প-প্রসারের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প বৃহতের পরিপূরক, তাই দূরে ইহার প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়

শিল্পতালুকগুলি সম্পর্কে আরও বলা হয় যে ইহার মধ্যে অনেকগুলির স্থান-নির্বাচন মোটেই সঠিক হয় নাই। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার চিন্তা বাদ দিয়া রাজনৈতিক কারণাবলীর চাপে অনেক অঞ্চলে এইরূপ পরিকল্পনা গড়িয়া উঠায় ইহাদের কার্যকারিতা কম হইতেছে। উপরন্তু সরকারী ব্যয়ে নির্মিত কারখানা-গৃহগুলির নির্মাণব্যয় অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া ক্ষুদ্র শিল্পপতিগণ মনে করিতেছেন, ফলে তাহারা ভাড়ার পরিমাণ এবং গৃহগুলির মূল্য উভয়ই বেশি বলিয়া আপত্তি তুলিতেছেন।

সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে, শিল্পতালুকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পরিচালিত, ফলে উহারা মোটেই শ্রম-প্রগাঢ় এবং মূলধন-সঞ্চয়ী নয়। বরং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের তুলনায় শ্রমিক-প্রতি মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ বড় কলকারখানায় কম।*

---

* *The Role of Small Enterprises in Indian Economic Development* by **P. N. Dhar & H. F. Lydall; Institute of Economic growth. Delhi p. 35—62.**

তাই এই সকল কার্যসূচীর দরুন দেশে কর্মসংস্থান মোটেই প্রসার লাভ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত (capital-out put ratio) বিচার করিয়া বলা চলে যে, ইহাতে দেশের মূলধন বর্তমানে অপব্যয়িত হইতেছে। ফলে ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিমাণে এবং পর্যাপ্ত মজুরিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পথে ইহারা প্রকৃতপক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

অনুশীলনী

1. Describe the main features of the Community Development Projects in India.

2. Give your own views on the achievements and prospects of Community Projects and the National Extension Service in India.

3. Give a critical estimate of the performance of the Community Development Projects in India.

4. Point out the role of Community Development projects and Industrial Estates in the growth of the Indian economy.

5. Give a brief review of the progress of the Community Development and National Extension Service Programme in India.

6. Discuss the role of Community Development and Industrial Estates in the Third Five Year Plan.

7. Discuss the principal features of Community Development and National Extension Projects.

১৪

খাদ্যের অর্থনীতি

Economics of Food

শিল্পপ্রসারের পক্ষে খাদ্যের গুরুত্ব (Importance of Food in Industrialisation):

খাদ্য উৎপাদনের গতিবেগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্যভোগের পরিমাণে বৃদ্ধি মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংগ-বিশেষ। বস্তুত, অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি পরিমাপ করার জন্য অনেক ধনবিজ্ঞানী দেশের খাদ্য-ভারসাম্যের পরিবর্তনকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেন।

শুধু তাহাই নহে। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার সর্তস্বরূপ। যে গতিতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তত দ্রুত বাড়িতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে শিল্প-প্রসার শুরু হয়, তখন শিল্প ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে।

কত বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে

খাদ্যের উৎপাদন যত বাড়িতে থাকিবে, গ্রামাঞ্চলে ভোগবৃদ্ধি কম হইলে. উহা, ততই শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের কাজে সাহায্য করিবে, শিল্পপ্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ দ্রুততর হইবে। তাহা ছাড়া, খাদ্যশস্যই অনুন্নত দেশের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য, ইহার উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়িলে চাষীর আয় বৃদ্ধি হয়, শিল্পপ্রসারের উপযোগী আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইতে পারে। খাদ্যের উৎপাদন বাড়িলে তাই আয়, সঞ্চয় বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে চাষ করিলে চাষীর ও মাটির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে, খাদ্যোৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে লোক সরাইয়া মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োগ করা চলে। খাদ্যের রপ্তানি করিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা শিল্পদ্রব্য আনিতে পারা যায়, খাদ্যের রপ্তানি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর নীচু

থাকিলেও উন্নয়নে সাহায্য হয়, কারণ এই অবস্থায় মজুরি কম দিতে হয়, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোগ ব্যয় কম হয়, উদ্বৃত্ত ও মূলধন-গঠনের হার বেশি হইতে পারে। অপূর্ণোন্নত দেশে বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য-কাঠামোর ভর-কেন্দ্র হইল খাদ্যের দামস্তর. প্রধানত ইহাই ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তরের উঠানামার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইতে খাদ্যের ভূমিকা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ন্যায় দেশে এই গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যাহাই হউক না কেন, বাৎসরিক মোট জনবৃদ্ধির পরিমাণ খুবই বেশি। ভারতীয়দের ভোগ-কাঠামোতে খাদ্যশস্যের অনুপাত বেশি থাকায় এই গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতীয়গণ মোট যে ক্যালোরি গ্রহণ করেন, তাহার ৭৫ ভাগই খাদ্যশস্যের ভোগ হইতে সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া, দেশে অন্যান্য স্বাস্থ্য-সম্মত খাদ্য ও অধিক ক্যালোরি-প্রদানকারী খাদ্যের অভাব আছে। যে উন্নত জীবনযাত্রার মানে পৌঁছাইলে জনবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, সেই স্তরে পৌঁছাইতে হইলে খাদ্যোৎপাদন আরও বাড়ানো দরকার। সর্বোপরি, মনে রাখা প্রয়োজন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হয় শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি ক্রমাগত বাড়াইয়া এবং ইহারই জন্য অধিক খাদ্য ও উন্নততর খাদ্য দরকার। কম খাদ্য ব্যবহারের দরুন বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদন-ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না, ভবিষ্যতের জনশক্তি তেমন কম দেহশক্তি ও বুদ্ধি-ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর কম খাদ্য গ্রহণ ও শরীরের অপরিপুষ্টি ভবিষ্যতের সুস্থ সবল তেজী শ্রমিক-শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার প্রধান অন্তরায়, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অধিক হওয়ায় মূল প্রতিবন্ধক, এই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। সত্য কথা বলিতে গেলে ভারত এইরূপ ক্রমক্ষীয়মাণ মানবিক মূলধনের উপরই ভবিষ্যতের শিল্প-কাঠামো গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে।

ভারতের উন্নয়নে খাদ্যের গুরুত্ব আরও বেশি

ভারতের খাদ্য সমস্যা (Indian Food Problem) :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের বাণিজ্যিক শস্যের রপ্তানি কমিয়া যাওয়ায় উহাদের দাম হঠাৎ হ্রাস পায়; এদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হওয়ায় চাউলের দাম খুব বাড়িতে থাকে। দেশে যুদ্ধকালীন নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে সমস্যার প্রকাশ

পাওয়াতেও খাদ্যের ঘাট্‌তি দেখা যায়। স্বল্পকালীন সমস্যা মিটাইবার জন্য দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হইল, দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানের জন্য অধিক খাদ্য-ফলাও আন্দোলন শুরু হইল। যুদ্ধকালীন আভ্যন্তরীণ শিল্প বিস্তার হওয়ায় অন্যান্য কাঁচামালের দাম ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং ফলে কোন কোন কাঁচামালের দামের ঊর্ধ্ব-সীমা নির্দিষ্ট করিতে হইয়াছিল। কিন্তু খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ বা কণ্ট্রোল পূর্ণ সফল হইল না।

প্রথম পরিকল্পনা শুরুর সময়ে খাদ্যের উৎপাদন দেশের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে প্রচুর ছিল না। জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ১৯৫১ সালে খাদ্যের ঘাটতি ছিল ৩০ লক্ষ টন, তাই দেশের খাদ্যের ঘাট্‌তি ছিল খুব বেশি এবং খাদ্যের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সরকারী মজুত হইতে বাজারে খাদ্য ছাড়িয়া দেওয়া, ভাল মরসুমের সম্ভাবনা এবং কঠিনতর (tight) আর্থিক নীতির ফলে উহার পরবর্তী দুই বৎসরে দামস্তর অনেকখানি হ্রাস পায়। অবশ্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে ২১৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিয়াছিল। এই সময়ে ভারত সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার একটি নূতন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। উহাতে বলা হয় যে, সংকটকাল ব্যতীত ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চের পর হইতে আর খাদ্য আমদানি করা হইবে না। প্রথম পরিকল্পনায় ১৪% বা ৭৬ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য ধার্য করা হইল।

প্রথম পরিকল্পনাকালে খাদ্যের অবস্থা

পরিকল্পনার এই কার্যসূচীর সঙ্গে ১৯৫২ সালের অধিক-খাদ্য ফলাও অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ যোগ করা হইল। স্থির করা হইল যে, (ক) ১৯৫১ সালের পর খাদ্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করার নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকার-সমূহ খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের (Grain procurement) নীতি গ্রহণ করিবে; (খ) সারা বৎসর জল পায় এইরূপ জমিতে প্রগাঢ়-চাষের সাহায্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে; (গ) ট্রাক্টরের সাহায্যে ৮ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করিতে হইবে; (ঘ) টিউবওয়েল বসাইতে হইবে; (ঙ) জলসিঞ্চিত খাদ্যোৎপাদনের এলাকার জন্য বিশেষ ধরনের সার আমদানি করিতে হইবে, এবং (চ) উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্যের চাষ হইতে কিছু জমি খাদ্য-শস্যোৎপাদনে অপসারণ করিতে হইবে। প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় নির্দিষ্ট জলসিঞ্চিত ও ভাল মাটির এলাকায় প্রগাঢ়-চাষ নীতির ফলে ১৯৫৩-৫৪ সালে

খাদ্যোৎপাদন অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হইল। আমদানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইল, ১৯৫৩ সালে ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করিয়া ভারত ৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাইতে সক্ষম হইল।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের দাম এত কমিয়া যায় যে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেন। ১৯৫৪ সালে সারা বৎসর ধরিয়া খাদ্যশস্যের দাম খুব কম চলিতে থাকে পরবর্তী বৎসরে দামের এই হ্রাস আরও বিস্তৃত হইতে থাকে। ১৯৫৭ সালের খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে দাম-হ্রাসে এত বিস্তৃতির কারণ হইল উৎপাদন-বৃদ্ধির তুলনায় বিক্রয়যোগ্য উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি। দাম হ্রাস রোধ করার জন্য ভারত সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন; উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কিছু পরিমাণে রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া এবং সীমাবদ্ধ ভাবে দাম-ঠেকা দেওয়ার নীতি বা মূল্য-নির্ভরণ নীতি (Price-support policies) গ্রহণ করা। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে যবের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় উহার দাম একটু বাড়িবার ঝোঁক শুরু হইলে সমগ্র ধারার পরিবর্তন দেখা যায়। সমগ্র ১৯৫৬ সাল ধরিয়া খাদ্যশস্যের দাম বাড়িতে থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও দাম বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে, বিভিন্ন দ্রব্যের দামে বিভিন্ন অঞ্চলে ও সময়ে বিভিন্ন হারে এই বৃদ্ধি ঘটে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যের যোগান, চাহিদা ও দাম

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে (১৯৫৭) চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়াতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এইরূপ দাম বৃদ্ধি দেখা দেয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকারী ও বেসরকারী খাতে, ঘাটতি ব্যয় ও ঋণ প্রসারের সাহায্যে বিপুল বিনিয়োগ-ব্যয় করা হইয়াছে; এই অর্থ জনসাধারণের হাতে আয় হিসাবে পৌঁছিয়াছে, অথচ খাদ্যোৎপাদন বাড়িতেছে না। ফলে খাদ্যের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, আয় বৃদ্ধির দরুন খাদ্যভোগের পরিমাণ ও ধরনে পরিবর্তন আসে। ১৯৫৬ ৫৭ সালে খাদ্যের দাম বাড়িবে এই আশায় বহু ব্যক্তি খাদ্যশস্য মজুত করে, কেবল ব্যবসায়ীরা নয়, বৃহৎ ও মাঝারি চাষীরাও এই অবস্থায় খাদ্য গোলাজাত করিতে পারে।

খাদ্যশস্যের যোগানের দিক হইতেও দামবৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে যবের উৎপাদন (৩০ লক্ষ টন) কম হওয়ায় দামবৃদ্ধি শুরু হয়, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেই দামবৃদ্ধি না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে, চাল ও গমের

উপর চাহিদার চাপ এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তোলে। উৎপাদনের সহিত দামের যোগ অপূর্ণোন্নত দেশে কম, দামের যোগ হইল সেই উৎপাদন হইতে বিক্রয়যোগ্য অংশ বা যোগানের সহিত। দাম বাড়িয়া যাওয়ায় চাষীরা কম পরিমাণ বিক্রয় শুরু করে ও উন্নত জীবনযাত্রার মানে পৌছানোর জন্য ভোগের পরিমাণ কিছুটা বাড়াইযা দেয়, বৃহৎ ও মাঝারি চাষীরা মজুত ও ফাট্‌কাদাবি শুরু করে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ধারা ও কর্মপন্থা (Prospects for the future : Direction & Programmes) :

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে ভবিষ্যৎ চাহিদা, যোগান, দামে পরিবর্তনের পরিমাণ ও গতি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বলা খুবই অসুবিধাজনক আরও বিশেষত, যখন দেশে-বিদেশে অর্থ নৈতিক শক্তিসমূহ এত বেশি পরিবর্তনশীল। খাদ্যদ্রব্যের ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করিবে : (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধিব হার, (খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নযনমূলক ব্যযের দরুন আয বৃদ্ধির হার, (গ) জনসাধারণের ভোগ-প্রবণতাব, ও (ঘ) মজুত-প্রবণতার পরিবর্তন, প্রভৃতিব উপর। কমিটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিল যে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে খাদ্যশস্যের চাহিদা ১০% বাড়িবে। আয়বৃদ্ধির দরুন অতিরিক্ত ৪% হইতে ৪.৫% চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। উভয় হিসাব মিলিযা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১৪.৫% হইতে ১৫% খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইযাছিল। এই হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে ১৯৬০-৬১ সালে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য দরকার হইবে।

যোগানের দিকে হিসাব করিযা কমিটি দেখাইয়াছিলেন যে, ১৯৬১ সালে মোট খাদ্যশস্যের যোগান ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টন হইবে, অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় ১৫ লক্ষ টন কম হইবে। বিদেশ হইতে খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা আলোচনা করিয়া কমিটি বলিয়াছেন যে, বর্তমানের হিসাবে মোট ১০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করা যাইতে পারিবে।

কি কি অবস্থা অবলম্বন করা দরকার

কমিটির মতে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে খাদ্যের দাম অস্থির থাকার সম্ভাবনাই বেশি, সুতরাং মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখিতে হইলে রাষ্ট্রের কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় অবাধ ব্যবসায়ের অনেক ত্রুটি দেখা গিয়াছে, আবার অপরপক্ষে সম্পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণের বহু আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক (administrative) অসুবিধা আছে। তাই মধ্যপন্থার সুবর্ণরেখা অবলম্বন করা দরকার। বর্তমানে সরকারের উচিত (ক) নিয়মিতভাবে খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের কেনাবেচা শুরু করা, (খ) পাইকারী ব্যবসায়ের কিছুটা অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত করা, (গ) অপর অংশে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের উপর লাইসেন্স প্রভৃতির মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা, (ঘ) গম ও চালের উপযুক্ত পরিমাণ মজুত হাতে রাখা, (ঙ) নিয়মিত আমদানির ব্যবস্থা করা, (চ) এই সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি উপযুক্ত ধরনের ফিস্‌কাল, আর্থিক ও ঋণনীতি গড়িয়া তোলা, এবং (ছ) প্রয়োজন হইলে কোন বিশেষ দ্রব্য বা শস্যের ক্ষেত্রে কিছুটা কণ্ট্রোল ব্যবস্থা আরোপ করা।

কমিটি সুপারিশ করিযাছিলেন যে, এই সকল নীতি গ্রহণ করা ও কার্যকরী করার কাজ সুসংহত করার জন্য একটি সংগঠন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। দামসম্পর্কীয় নীতি ও উহার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি দাম-স্থিরতা সাধনকারী বোর্ড (Price stabilisation Board) প্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছিল। ইহার সহিত এমন একটি খাদ্যশস্যের স্থিরতাসাধনকারী সংগঠন (Food grains stabilisation organisation) থাকিবে যে নিয়মিতভাবে বেচাকেনার কাজ চালাইয়া যাইবে। দাম কমিবার ঝোঁক দেখা দিলে একসঙ্গে প্রচুর ক্রয় করা ; দাম বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিলে একসঙ্গে প্রচুর বিক্রয় করা—এইভাবেই দামে উঠানামা বন্ধ রাখা সম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যদপ্তর ও দাম স্থিরতা সাধনকারী বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য, (ক) বে-সরকারী কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা কাউন্সিল (Central food Advisory Council), এবং (খ) প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি দাম অনুসন্ধানী বোর্ড স্থাপনের কথা বলা হইযাছিল। দাম স্থিরতা সাধনকারী বোর্ড (P. S. B.) এই দুইটির—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা কাউন্সিল ও দাম অনুসন্ধানী বোর্ডের সহায়তায় শুধু খাদ্য নয়, সকল দ্রব্যের দামের উপরই নজর রাখিবে এবং প্রয়োজনীয় নীতি ও পদ্ধতি সুপারিশ করিবে।

কি কি সংগঠন গড়িয়া তোলা দরকার

এই সকল ব্যবস্থা ছাড়াও কমিটি খাদ্যশস্যের বণ্টন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েকটি স্বল্পকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার মতে খাদ্য বণ্টন হওয়া উচিত প্রধানত ন্যায্যমূল্যের দোকান (Fair

Price Shop), সমবায়-সমিতি বা মালিক-সমিতির মাধ্যমে। বড় শহরের চাহিদা গ্রামাঞ্চলে অধিক চাপ সৃষ্টি করিতে থাকিলে শহরকে ঘেরাটোপে রাখার বা কর্ডন করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে "অঞ্চল" বা "এলাকা" (Zone) এমনভাবে ভাগ করিতে হইবে যে, ঘাটতি অঞ্চল ও বাড়্তি অঞ্চলে সামঞ্জস্য থাকে, যাহাতে সরকারী মজুতের উপর বিশেষ চাপ না পড়ে এবং একই অঞ্চলের মধ্য দিয়া একাধিক অঞ্চলের জন্য খাদ্যশস্যের চলাচল (cross movement of food grains) না ঘটে। ভূমি সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়া উহা প্রকৃতভাবে কার্যকরী করিয়া তোলাও প্রয়োজন। সর্বশেষে, কমিটি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও জনসংখ্যা হ্রাসের প্রচেষ্টা দৃঢভাবে চালাইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন।

খাদ্য ও তৃতীয় পরিকল্পনা (Food and the Third Plan) :

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, দেশে খাদ্যের ঘাট্তি থাকিলে এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে থাকিলে শিল্পপ্রসারের গতিবেগ উচ্চস্তরে ধরিয়া রাখা যায় না। বিগত দুইটি পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনাতেও তাই শিল্পপ্রসারের সর্তস্বরূপ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল (১৯৬০-৬১ সালের ৭৬ মিলিয়ন টন হইতে ১৯৬৫-৬৬ সালে ১০০ মিলিয়ন টন উৎপাদন করা, অর্থাৎ ৩২% বৃদ্ধি। কমিশন মনে করেন যে, এই লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে এবং মাথা-প্রতি খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের দৈনিক ১৬ আউন্স হইতে ১৯৬৫-৬৬ সালে দৈনিক ১৭·৫ আউন্সে পৌছাইবে। ফলমূল, শাকসব্জি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক খাদ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়িতেছে এই পরিকল্পনায় উহাদের উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে অধিক নজর দিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য

আগামী কয়েক বৎসরে খাদ্যের চাহিদা বিশেষভাবে বাড়িতে থাকিবে বলিয়া মনে হয়। জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বাড়িতেছে। দেশে আর্থিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে; ফলে আর্থিক আয় বাড়িবে। গ্রাম হইতে শহরে অধিক সংখ্যায় লোক চলিয়া আসিবে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকেরই মোট আয়ের $\frac{1}{2}$ হইতে $\frac{3}{4}$

খাদ্যের চাহিদা কেন বাড়িবে

অংশ খাদ্য জোটাইতে ব্যয় হয়। সুতরাং খাদ্যের চাহিদা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ মনে করা চলে। সর্বোপরি, বর্তমানে খাদ্যভোগের ধরন (pattern of food consumption) দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে। উচ্চস্তরের খাদ্য বা উন্নত গুণসম্পন্ন খাদ্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

খাদ্যের যোগান কিরূপে বাড়িবে

খাদ্যের যোগান কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে তৃতীয় পরিকল্পনায় সামগ্রিক কৃষিউন্নয়নের কর্মসূচী কতটা সাফল্য লাভ করে, তাহার উপর। কৃষিউন্নয়নের কর্মসূচী, জলসেচ ও সমষ্টি উন্নয়নে মোট ১৭১৮ কোটি টাকা খরচ হইবে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ছিল ৯৫০ কোটি টাক। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ করিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত করা, শুষ্ক চাষ প্রথা ও সারের ব্যবহার, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক গড়িয়া তোলা, সমষ্টি উন্নয়নের সর্বমুখী প্রসার, সেবাভিত্তিক কাজকর্মের উন্নতি, সকল প্রকার সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

খাদ্যের যোগান বাড়াইবার এই সকল কর্মসূচী ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। উহা হইল খাদ্য দ্রব্যের দাম। খাদ্যশস্যের দাম মোটামুটি স্থির রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারেরই আয় কম এবং তাহার আয়ের অনেক বেশি

দাম স্থির রাখা যাইবে কি না

অংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করে। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, খাদ্যের ক্ষেত্রে পূর্ণনিয়ন্ত্রণ বা পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ কোন নীতিই এককভাবে গ্রহণ করা চলে না। খাদ্যদ্রব্যের দাম কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সর্বদা রাষ্ট্রের হাতে থাকা দরকার। গমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হাতে যোগানের পরিমাণ ও আগামী তিন বৎসরে প্রত্যাশিত আমদানির পরিমাণ অনুযায়ী দামে তীব্র উঠানামার বিশেষ কোন আশংকা নাই। একমাত্র কোন বৎসর বিপুল শস্যহানি ঘটিলে গমের ক্ষেত্রে দামের স্থিরতা বজায় রাখা অসুবিধাজনক হইবে। চালের ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থা অধিকতর অসুবিধাজনক, কারণ ঘাটতির সময় উপযুক্ত পরিমাণ আমদানি করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার খুবই অভাব। অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রে অবস্থা সর্বদাই খুব পরিবর্তনশীল।

দাম যাহাতে হঠাৎ কমিয়া না যায়, ফলে উৎপাদক যাহাতে হঠাৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এই বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। কমিশন তাই মনে করেন যে, দামে উঠানামার পরিধি কমাইয়া আনার সঙ্গে সঙ্গে দামের নিম্নতম সীমা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে, ক্রেতার স্বার্থের দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের দাম যাহাতে খুব বেশি বাড়িতে না পারে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। এই দুইটিই হইল সাধারণ লক্ষ্য. ইহার জন্য সরকারী নীতি হইবে খাদ্যশস্য মজুত করা এবং সারা দেশ ব্যাপিয়া এবং অধিকসংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে অবিরতভাবে ক্রয় ও বিক্রয় করিতে থাকা। আঞ্চলিক দাম-পার্থক্য রোধ করার জন্য এক অঞ্চলে ক্রয় করিবার এবং অন্য অঞ্চলে বিক্রয়ের নীতি গ্রহণ করা দরকার। অতীতে এই বিষয়ে সর্বাধিক অসুবিধা ছিল সরকারী গুদামের অভাব। সুতরাং এই নীতির সাফল্যের জন্য এই পরিকল্পনায় সরকারীক্ষেত্রে গুদাম-নির্মাণ প্রসারিত করা হইবে। খাদ্যশস্যের ক্রয়বিক্রয়ের সরকারী খোলাবাজারী কার্যকলাপ (open market operations in food grains) খাদ্যশস্যের দামে স্থিরতা বজায় রাখিতে পারিবে বলিয়া কমিশন মনে করেন। ইহার মতে অত্যন্ত দ্রুত ও সহজভাবে এবং অধিক সংখ্যক স্থানে এইরূপ খোলাবাজারী কার্যকলাপ করা হইবে যাহাতে ঠিক যেখানে দরকার সেখানেই ইহার প্রভাব অনুভূত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে অন্তত ৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য সরকারের হাতে সর্বদা মজুত রাখা দরকার।

খাদ্যশস্যে খোলা বাজারী কার্যকলাপ

দাম স্থির রাখা, দামে মরসুমী ও আঞ্চলিক পার্থক্য কমাইয়া দেওয়া, এই সকল উদ্দেশ্যে খোলাবাজারী কার্যকলাপ সফল হইতে হইলে কতকগুলি বিষয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। কৃষকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত কতকগুলি সরকারী ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। পাইকারী ব্যবসায়ের লাইসেন্স দান ও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। উপযুক্ত দিকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইতে হইতে পারে। খুচরা ব্যবসায়ের সকল স্তরে সরকারী ও সমবায় সমিতিগুলির উপযুক্ত অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, দাম নিয়ন্ত্রণের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে সমাজে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন আনয়নের সমস্যা—ব্যক্তি-প্রধান ব্যবসায়িক সূত্রগুলির বিরোধী হিসাবে উহার পাশাপাশি সরকারী ও

ইহার জন্য নূতন ব্যবসায়িক সূত্র গড়িয়া তোলা

সমবায় ব্যবসায়িক সূত্রগুলি গড়িয়া তোলা। দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সময়ে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়।*

সাম্প্রতিক খাদ্যসংকট : উহার কারণ প্রতিকার ও সরকারী ব্যবস্থা (Recent food crisis : its causes, remedies and Government activities)

তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মাঝামাঝি সময় হইতে ভারতের খাদ্য সমস্যা এত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে যে ইহা বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ সংকটে পরিণত হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে ভারত এত বড় অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন আর কখনও হয় নাই। গত দুই বৎসর ধরিয়া এই খাদ্যসংকট ক্রমশ তীব্রতর হইতছে, সরকারী কোন প্রতিকার ব্যবস্থাতে ইহার কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জন সংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার (বৎসরে ২˙৫%) বজায় থাকা সত্ত্বেও এত তীব্র মূল্য বৃদ্ধির সাধারণ কারণ হইল বিনিযোগ বৃদ্ধি ও দেশরক্ষার প্রয়োজনে দেশের উপকরণ টানিয়া লওয়া হইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির বেশির ভাগই ঘটিতেছে মূলধনী শিল্পে কিন্তু টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ভোগ্য-দ্রব্যের উপর চাপ বাড়িয়াই চলিযাছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশরক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি—এই সাধারণ পটভূমিকায় এই তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে।

কিন্তু জনবৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশরক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি—কেবলমাত্র এত তিনটি সাধারণ কারণ দ্বারা সাম্প্রতিক খাদ্যসংকট ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯৬০-৬১ সালে দেশে মোট খাদ্য উৎপাদন ছিল ৮১ মিলিয়ন টন, ১৯৬১-৬২ সালেও এই পরিমাণ কমে নাই ; ১৯৬২-৬৩ সালে অল্প কমিয়া ইহা দাঁড়ায় ৭৯ মিলিয়ন টন, কিন্তু, ১৯৬৩-৬৪ সালে ইহা বাড়িয়া দাঁড়ায় ৮০ মিলিয়ন টন। সুতরাং খাদ্যোৎপাদনে হঠাৎ বিপুল ঘাট্‌তি হইয়াছে এমন বলা যায় না। উপরন্তু এই ১৯৬০-৬৪ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৪½ মিলিয়ন টন খাদ্য আমদানি হইয়াছে, ইহার পূর্বের চারি বৎসরে এইরূপ গড় আমদানির

---

* "Regulation and control of prices are in this view an aspect of the problem of institutional changes—that is, strengthening of public and co-operative as against private agencies—that must necessarily accompany development planning." *Third Five Year Plan.* P. 131

পরিমাণ ছিল ৩ মিলিয়ন টন। সুতরাং ভাল ফলনের বৎসরে আমদানিকরা খাদ্য যদি সরকারের হাতে মজুত থাকে, তবে গত বৎসরগুলিতে খাদ্যের যোগান কম পড়িবার কথা নয়। অন্তত হিসাবে-তথ্যে সেইরূপ দেখা যাইতেছে না।

কিন্তু তবুও যে তীব্র খাদ্য সংকটের লক্ষণগুলি গত কয়েকবৎসর যাবৎ দেখা গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, আমদানি করা খাদ্য হইতে ভাল ফলনের বৎসরেও প্রভূত খাদ্য বাজারে ছাড়া হইয়াছে। ইহাতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা গিয়াছে: ঘাট্‌তি বৎসরের জন্য সরকারের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য মজুত ছিল না, এবং শিল্পজাত দ্রব্যের দামে বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যের দাম উপযুক্ত হারে বাড়িতে পারে নাই বলিয়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ সৃষ্টি হয় নাই। পি. এল্. ৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রধানত গম আমদানি হয়, এই গম বাজারে ছাড়া হয় বলিয়া চালের তুলনায় গমের দাম বৃদ্ধির হার কম থাকে। ফলে চাষীরা গম উৎপাদনে উৎসাহ পায় নাই। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন বাড়িলেও খাদ্যের যোগান না বাড়িতে পারে, কারণ উৎপন্ন পণ্য মজুত করিয়া রাখার ক্ষমতা ও ইচ্ছা দুই ই পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে বেশি দাম পাওয়া যাইবে এই ধারণায় বৃহৎ মজুতদাররা প্রভূত পরিমাণ খাদ্য গুদামজাত করিয়াছে। সরকারী সমবায়ী ঋণ ও কৃষি বিভাগের সাহায্যের অধিকাংশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত না করিয়া তাহারা খাদ্যশস্যের ফাট্‌কা ব্যবসায়ে টানিয়া আনিতে পারিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সুবৃহৎ কৃষিবিনিয়োগের অধিকাংশ যদি ফাট্‌কাবাজারকে পুষ্ট করিয়া তোলে তবে দাম বৃদ্ধি পাইবে না কেন? এই কৃষি বিনিয়োগ উৎপাদন বাড়াইতে পারে নাই কেন? উহার কারণ জমির মালিকানা হইতে ব্যাপক প্রজা উচ্ছেদ অথচ সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিখণ্ডগুলির একত্রীকরণ না হওয়া।

এই খাদ্যসংকট প্রতিকারের জন্য সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন উহারাও বিশেষ সাফল্য লাভ করিতেছে না। প্রথমত, সহরাঞ্চলে আংশিক রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিয়া সরকার নিজের মজুত হইতে বাজার অপেক্ষা কম মূল্যে খাদ্যের যোগান কিছুটা বাড়াইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সরকারের হাতে মজুতের পরিমাণ কম থাকায় এই ব্যবস্থা বিশেষ সফল হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, সরকার খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু খাদ্যের বাজারে অচেল

খাদ্য ঢালিয়া দিতে না পারিলে, অথবা সকল খাদ্য সরবরাহ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে আনিয়া পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু না করিলে এইরূপ মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিফল হইতে বাধ্য। তৃতীয়ত খাদ্য আমদানির পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। চতুর্থত, উদ্বৃত্ত খাদ্যাঞ্চল হইতে সস্তায় খাদ্য কিনিয়া যাহাতে খাদ্যের মুনাফাদাররা বেশি দামে ঘাটতি অঞ্চলে বিক্রয় করিতে না পারে সেই জন্য উদ্বৃত্ত অঞ্চলে নিজে লেভি (Levy) প্রথা দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিতেছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে খাদ্যের চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা সফল হইতেছে না, কারণ দেশে বিক্ষিপ্ত গ্রাম্য জমিদারদের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত শস্য আদায় করার মত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নাই। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে আমাদের শাসনযন্ত্র ও উহার কর্মচারীবৃন্দ এই গ্রাম্য মজুতদারদের স্বার্থবিরুদ্ধ কোন কাজ করিতে সক্ষম নয়।

খাদ্যসংকট মূলত খাদ্যের যোগান ও চাহিদার বৈষম্যের ফল নয়। ইহার মূল কৃষিউৎপাদনের অনড়তা। আমাদের দেশে গত দশ বছরে কৃষি উৎপাদন যতটুকু বাড়িয়াছে তাহা কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়িবার ফল, একর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ফল নহে ঃ চীন ও জাপানে উৎপাদন যতটুকু বাড়িয়াছে তাহা প্রধানত একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ফল। আমাদের দেশে একর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্প। ইহার কারণ দূর না হইলে এই খাদ্যসংকট কোনমতে দূর হইবে না এবং সুদীর্ঘকাল এই সংকট চলিতে থাকিবে। তাই আপাতত কোনরূপ প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading in Food Grains) :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে হইলে কৃষি-উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষককে ফসলের উপযুক্ত দাম দিতে হয়। বর্ধিত দাম পাইয়া চাষী যে-উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহার সবটা বা বেশির ভাগ চাষীর হাত হইতে লইয়া আসিয়া ক্রমবর্ধমান শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট সস্তা দামে পৌঁছাইতে হয়। খাদ্যের উপযুক্ত দামের উপর তাই শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী আভ্যন্তরীণ বাজার এবং শিল্পক্ষেত্রে মজুরি ও কাঁচামালের খাতে উৎপাদন-ব্যয় নির্ভর করে। চাষীর নিকট হইতে ফসল কিনিয়া ক্রেতাদের নিকটে বিক্রয়ের এই কাজ এতদিন বেসরকারী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে চাষী

উপযুক্ত দাম পায় নাই. এই বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীরা অনেক সময় মজুত করিয়া কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করিয়াছে, প্রায়ই সর্বশেষ স্তরের ক্রেতাকে বেশি দাম দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে। ফসলের দামে তীব্র উঠানামা এবং দামের আঞ্চলিক ও মরসুমী পার্থক্য রোধ করার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যের বাণিজ্য-ক্ষেত্রকে মুনাফামুখী বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অবাধ বাজারের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তাই সম্প্রতি ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্যের বাজারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের (State Trading Corporation) মাধ্যমে তাঁহারা খাদ্যশস্য ক্রয় ও বিক্রয় কার্য শুরু করিবেন।

কেন ইহার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে

ভারত সরকার বলিতেছেন যে, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল ভোগকারী ও উৎপাদক, উভয়ের পক্ষে ন্যায্য দামস্তর রক্ষা করা এবং উৎপাদক যে-দাম পায় ও ক্রেতা যে দাম দেয় এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য যথাসম্ভব হ্রাস করা।

প্রাথমিক লক্ষ্য

প্রথম হইতেই পূর্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য শুরু করার বহু অসুবিধা সম্পর্কে ভারত সরকার সচেতন আছেন। যেমন উপযুক্ত প্রশাসনিক সংগঠনের অভাব, মজুত করিযা রাখার মত গুদামের অভাব এবং পরিমাণমত প্রাথমিক মজুতের অভাব। তাই এই পরিকল্পনাটিকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (১) চূড়ান্ত ধরন (ultimate pattern), এবং মধ্যবর্তী পরিকল্পনা (interim scheme), যাহা পূর্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য শুরু করা পর্যন্ত গড়িয়া উঠিবে।

চূড়ান্ত ধরন ও মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনা

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের চূড়ান্ত ধরনে এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে রাষ্ট্র সেবা-সমবায়ের (Service Co-operatives) মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত তুলিয়া আনিয়া উহাকে বিক্রয় সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া খুচরা বিক্রেতা বা ক্রেতা সমবায় সমিতির সাহায্যে ক্রেতাদের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে। ক্রেতা সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চূড়ান্ত ধরনে পৌঁছিবার প্রচেষ্টা যত দ্রুত সফল হয় ততই ভাল এবং মধ্যবর্তীকালীন কার্যসূচীর মধ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ

চূড়ান্ত ধরন ও উহাতে পৌঁছিবার পথ

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়কে সমবায় সমিতিগুলি নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতে থাকিবে।

মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনাতে রাষ্ট্র প্রথম হইতেই চাষীর বিক্রয়-যোগ্য উদ্বৃত্তের সমস্তটা লইয়া ব্যবসায় শুরু করিবে না, কারণ তাহা হইলে এখনই রাষ্ট্রের উপর শিল্পাঞ্চলের ও আধা-শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যসংস্থানের পূর্ণ দাযিত্ব আসিয়া পড়ে। তাই বর্তমানের পাইকারী ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ সরাইয়া দেওয়া হইবে না। সরকার তাহাদের লাইসেন্স দিবে এবং সরকার নির্দিষ্ট দামে চাষীদের নিকট হইতে তাহারা খাদ্যশস্য ক্রয় করিবে। খুচরা বিক্রেতাদের নিকট অল্প কিছু বেশি দামে তাহারা বিক্রয় করিবে। এই দুইটি দামের পার্থক্য সরকার স্থির করিয়া দিবে এমনভাবে, যাহাতে লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীর নিয়োজিত মূলধন হইতে ন্যায্য লাভ হয়, এবং মাল চলাচলের দরুন তাহার বিভিন্ন প্রকার ব্যয় পোষাইয়া যায়। নিয়মিত দামে কোন লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীর সকল মজুত রাষ্ট্র দরকার মনে করিলে কিনিয়া লইতে পারে। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ও মজুতের সকল হিসাব রাখিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উহা দাখিল করিতে হইবে।

মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনার রূপ

সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (ক) প্রাথমিক স্তরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কেবল মাত্র দুইটি শস্যে—ধান ও গমের ক্ষেত্রেই শুরু হইবে। উৎপাদকেরা যাহাতে ন্যায্য দাম পায় এই উদ্দেশ্যে সরকার নিজে একটি ক্রয় করার এজেন্সী স্থাপন করিবেন এবং যাহারা সরাসরি সরকারের নিকট তাহাদের উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করিতে চায় তাহারা সেই সরকারী ক্রয় এজেন্সীর কাছে ফসল বিক্রয় করিবে। (খ) সামগ্রিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় কার্য চলিবে এমনভাবে যাহাতে কোন ক্ষতি বা লাভ কিছুই না হইতে পারে। (গ). একটি রাজ্যের জন্য বা একটি অঞ্চলের জন্য সমান ক্রয়মূল্য স্থির করা হইবে। কোন কোন রাজ্যে এমন অনেক অনুন্নত অঞ্চল আছে, যেখানে রেলের দ্বারা পৌঁছানো যায় না। পাইকারী বাজার এবং ধানকলগুলি প্রায়ই রেলস্টেশনের কাছাকাছি থাকে বলিয়া অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ দাম এই রেলস্টেশনের দামের দ্বারাই মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন দাম নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাহা ছাড়া, দেশে এমনিতেই কতকগুলি এমন ঘাটতি অঞ্চল আছে যেখানে দাম বাড়তি অঞ্চলের তুলনায় সর্বদাই বেশি

থাকে। এই সকল অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ক্রয়মূল্য স্থির করা যাইতে পারে। ঠিক সেইরূপ একটি রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের লাইসেন্সধারী পাইকারী ব্যবসাদারদের নিয়ন্ত্রিত দামেও পার্থক্য থাকিতে পারিবে। (ঘ) খুচরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাম নিয়ন্ত্রণ করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া ও দ্রুত ক্রেতা সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া খুচরা দামের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হইবে। কোন রাজ্য সরকার রাজ্যের কোন অঞ্চলের জন্য খুচরা দাম নিযন্ত্রণ করিতে পারিবে, তবে সেইরূপ অবস্থায তাহাদের নিশ্চিত হওযা দবকার যে, যোগান-ধারায় হঠাৎ কোন বিপর্যয় না আসিযা এইরূপ নিযন্ত্রিত দাম কার্যকবী রাখা উহার পক্ষে সম্ভবপর।

পরীক্ষামূলকভাবে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের খাদ্যশস্যেব বিক্রযযোগ্য উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণই রাষ্ট্র কিনিয়া লইবে কি না তাহা রাজ্য সরকারেব সহিত আলোচনার দ্বারা স্থির হইবে। এইরূপ কোন অঞ্চলেব সকল উদ্বৃত্ত ক্রয় করিয়া লইলে সেই অঞ্চলেব বা অন্য যে-অঞ্চলের ক্রেতাবা এই খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করিত—সকলকে খাদ্য যোগান দিবার দাযিত্ব সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের উপর আসিযা পড়ে। এইরূপ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাব ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাহা বোঝা যাইবে এবং এই সকল অসুবিধা দূর করিতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহাও জানা যাইবে।

নীতিগত দিক হইতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয বাণিজ্যনীতি বিশেষ অভিনন্দন-যোগ্য, কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সফল হইতে হইলে খাদ্যের যোগান ব্যক্তিক্ষেত্রের হাতে কিছুতেই রাখা চলে না।* তাহা ছাড়া, চাষী উপযুক্ত দাম পাইবে, শিল্পাঞ্চলের ক্রেতা উপযুক্ত দামে খাদ্য পাইবে, মধ্যস্তরেব অনুৎপাদক শ্রেণীর ব্যক্তিদেব লাভ অবলুপ্ত হইবে। দামে উঠানামার ব্যাপ্তি ও তীব্রতা কমিয়া আসিবে, কৃষক তাহার নিজস্ব উৎপাদনের পরিকল্পনা ও রাষ্ট্র বা ব্যবসায়ীরা তাহাদের নিজস্ব উৎপাদনের পরিকল্পনা—সবই সঠিক ভাবে করিতে পারিবে,

ইহা কেন খুবই প্রয়োজনীয়

* কথা হইল যে খাদ্যের উৎপাদনও ব্যক্তিগত চাষীর হাতে রাখা চলে না, কিন্তু এখানে সেই প্রশ্ন অবান্তর। নীতি হিসাবে ইহা যে অভিনন্দনযোগ্য তাহা আরও বোঝা যায়, যখন পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলন ইহাকে unreal ও hasty বলেন।

মধ্যপথে উহারা বানচাল হইয়া যাইবে না। দালাল, ফড়িয়া ও পাইকারী-অধ্যুষিত অসংগঠিত কৃষি-বাজার ক্রমশ সুসংগঠিত হইয়া উঠিবে, এবং কৃষিবিক্রয় সংগঠনের অন্যতম শূন্যস্থান (lacunae) পূরণ হইবে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি বেশি দূর কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের ন্যায় দেশে সম্পূর্ণ নিখুঁত কোন ভাল পরিকল্পনাও কার্যকরী হওয়ার সময়ে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টিভংগীর অভাবে এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী চাষীদের বিরোধিতায় বা অত্যন্ত অধিক "সহযোগিতায়" সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যায় —এইরূপ আমরা বহু দেখিয়াছি। সব পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনার মধ্যেও এমন ফাঁক রাখা হইয়াছে, যাহাতে অবস্থা কিছুমাত্র উন্নত না হওযাব সম্ভাবনাই খুব বেশি। পাইকার শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াই রাষ্ট্রেব নিজস্ব বাণিজ্য সংগঠন গড়িয়া তোলা দরকার ছিল। পুবানো পাইকার শ্রেণীকেই লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, এবং সরকার উহাদের উপরেই খাদ্যশস্য সংগ্রহেব ভাব দিযাছেন। উহাতে চাষীদের ক্রোধের হাত হইতে ইহাদের রক্ষা করা হইতেছে এবং ইহাদের নিকট শস্য বেচিতে চাষীদের আইনত বাধ্য করা হইতেছে। মনে রাখা দরকার, গ্রামাঞ্চলে জমিদার, জোতদার ও ধনী চাষারাই খাদ্যশস্যের পাইকার। উহারা চাষীকে পূর্বে দাদন দিয়া সরকার নির্দিষ্ট দাম অপেক্ষা কম দামই দিবে। ইহাদের নিযুক্ত দালাল ও ফড়িয়ারা চাষীর নিকট হইতে কম দামেই ক্রয় করিবে—তাহা রোধ করার কোন ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় নাই। দ্বিতীয়ত, খুচরা বিক্রেতাগণ কি দামে ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিবে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে না, পরিকল্পনায় ইহা বলা হইয়াছে। এই পাইকাররাই স্বনামে বা বেনামে খুচরা বিক্রেতা সাজিয়া বসিবে, বর্তমানের খুচরা বিক্রেতাদের মাল না দিয়া নিজেদের খুচরা বিক্রয়সংগঠনকেই মাল যোগান দিবে এবং বেশি দাম না পাইলে খাদ্যশস্য বিক্রয় করিবে না, অর্থাৎ খাদ্যশস্যের কালোবাজার সৃষ্টি হইবে। চাষীর নিকট হইতে কম দামে চাল কিনিয়া উহার খুব অল্পাংশ রাষ্ট্রের হাতে বিক্রয় করিবে এবং অধিকাংশ নিজেদের নূতন 'খুচরা" বিক্রয়-কেন্দ্রে পাঠাইবে। বর্তমানের বা পুরাতন বিক্রেতারা মারা পড়িবে, ক্রেতাদের বেশি দামই দিতে হইবে। তৃতীয়ত, এখন গ্রামাঞ্চলে বহু ছোটখাট পাইকার কাজ করিতেছে, অনেক

কিন্তু বাস্তবে ইহা কেন সফল হইতেছে না

গরীব চাষী বা কৃষিমজুরও খুব অল্প মূলধনে চাষীদের নিকট হইতে ধান কিনিয়া শহরে আসিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহারা লাইসেন্স পাইবে বলিয়া মনে হয় না, ফলে ইহাদের আয়ের পথ বিলুপ্ত হইবে অথবা ইহারা পাইকারের দালালে পরিণত হওয়ায় আয় সংকুচিত হইবে। বাজারে অধিকসংখ্যক প্রতিযোগী থাকিবে না, কিছুটা রাষ্ট্র স্বীকৃত ও আধা-নিয়ন্ত্রিত অলিগোপলীয় বাজার গড়িয়া উঠিবে। সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে, কেবল খাদ্যশস্যের উপর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-নীতি গৃহীত হওয়াতে সমস্যার অর্ধেকের দিকে নজর-পাত হইয়াছে, অবশিষ্ট অর্ধেক অন্ধকারে থাকিয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্য ও শিল্পদ্রব্য উভয়ের দামের অনুপাত নির্দিষ্ট হারে না রাখিলে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সফল হয় না—কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। শিল্পাঞ্চলে উচিত-মূল্যে খাদ্য দেওয়ার নীতি নিশ্চয় ঠিক, কিন্তু উহার সঙ্গে একই বাণিজ্য নীতি ও কাঠামোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে উচিত মূল্যে শিল্পদ্রব্য যোগানের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলনী

1. Give a critical account of the measures adopted by the Govt. of India for dealing with food problem of the country. (C. U. B A. 1953)

2. Examine critically the Goverment of India's present policy of progressive decontrol with regard to food. (C U. B. A. 1954)

3. What are the causes of food shortages in India? Discuss the measures adopted by the Government to remedy the shortage. (C. U. B. A. 1958)

4. Examine the causes of the continuous rise in the prices of food grains in India. What measures were recommended by the Food grains enquiry committee of 1957 in the stabilisation prices of food grains in the country? (C. U. B. A. 1960)

5. Examine briefly the measures adopted by the Government of India for dealing with the food problem of the country. (C. U. B. Com. 1951)

6. Examine the importance of increasing the production of food grains in a developing economy like India. (C. U. B. Com. 1958)

7. How do you explain rising food prices in India in recent times? What measures would you recommend to stabilise food prices?

8. Discuss the problem of State trading of food grains in India.

9. Examine the causes of recent rise in foodgrain prices in the country and suggest measures for stabilising them.
(See also chapter on 'Price Level')

10. Explain carefully the factors under lying the present food crisis in India.

১৫

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প

Cottage and Small scale Industries

কুটিরশিল্প বলিলে এমন এক ধরনের উৎপাদক সংগঠন বোঝা যায় যাহা গ্রামে বসিযা উৎপাদকের বাড়িতে বা তাহার অতি নিকটে ক্ষুদ্র মাত্রায় পরিচালনা করা হয়। প্রধানত নিজেদের পরিবারের বা আশেপাশের লোকজন এবং নিজস্ব পুঁজি ও পরিচালন-দক্ষতা অনুযায়ী যে মাত্রায় উৎপাদন হইতে পারে তাহাকেই সাধারণভাবে কুটিরশিল্প বলে। প্রধানত অপরের শ্রম ভাড়া করিয়া ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন হইলে এবং কুটিরশিল্পের তুলনায় উন্নততর যন্ত্র, অধিকতর মূলধন থাকিলে উহাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে কোন সংজ্ঞাই ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটিরশিল্পকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেখাইতে পারে না। বস্তুত ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করা হয় প্রধানত কোন বিশেষ নীতি বাস্তবে কার্যকরী করার সময়ে কোন বিশেষ মানদণ্ড অনুযায়ী। তবে সাধারণত দেখা যায় যে, বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ইহারা অনেক বেশি শ্রম প্রগাঢ় পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইহাদের সংজ্ঞা কি এবং পৃথক করা যায় কি না

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ভূমিকা (Role of cottage & small Industries in a planned economy) : অপূর্ণোন্নত দেশে যতদিন শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না এবং সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ দূর হইয়া শিল্প-কাঠামো গড়িয়া উঠে না, ততদিন গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প দেশের ভোগ্যদ্রব্য যোগানের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হইলেও যত দিন বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার না ঘটে ততদিন পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া চলে। ভারতের শিল্পপ্রসার খুব দ্রুত হারে ঘটিতেছে না, এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাজকর্মকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে না আনিয়া কিছুটা ব্যক্তি-উদ্যোগক্ষেত্র বজায় রাখা হইতেছে—এই কারণে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প অপরিকল্পিত ব্যক্তি-ক্ষেত্রে (unplanned private sector) গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্ণ ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে অথবা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর না হওয়ায় এইরূপ ব্যক্তিগত পরিবারকেন্দ্রিক উৎপাদন সংগঠন

বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো মোটামুটি স্থির বলিয়াই ইহার গুরুত্ব চলিতে পারিতেছে

বজায থাকা সম্ভবপর হইতেছে। ভারতেব ঐতিহাসিক ঘটনাসংস্থানের চাপে এই সকল কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—যতদিন কোন একদিকে উন্নয়নের পথ স্পষ্টভাবে গৃহীত না হয়, ততদিন ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহার স্থান উল্লেখযোগ্য থাকিবে বলিয়া মনে করা চলে।

ভারতের চাষীরা সারাবৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে এবং তাহাদের শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কাজে নিযুক্ত থাকে না। ফলে অনিচ্ছামূলকভাবে বেকার থাকিতে তাহারা বাধ্য হয়। এইরূপ অবস্থায় কুটির-শিল্প তাহাদের কর্মসংস্থান যোগাইতে পাবে; আয় বাড়াইতে পারে; প্রচ্ছন্ন মরসুমী ও আধা-বেকারি কিছুটা দূর হয়। কিছু-সংখ্যক ব্যক্তি কুটির শিল্পে নিযুক্ত থাকিতে পারিলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাইতে পারে। বর্তমান জীবিকার কাঠামোতে (occupational structure) ভারসাম্যহীনতা অনেকটা দূর হইতে পারে। মূলধন-গঠনের পরিবর্তন হারে বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী সঞ্চযের অভাব, কিন্তু অল্প মূলধনের দ্বারাই এই সকল কুটিরশিল্প পরিচালিত হইতে পারে। গ্রামেব পরিচিত পরিবেশে এবং পবিবাব হইতে বিচ্যুত না হইয়া উৎপাদন করিতে পারে, তাই শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত থাকে। পরিবারের সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইতে পারে, এবং তাহারা একত্রে উৎপাদন করে বলিয়া সৃষ্টির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয় না, দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। বৃহৎশিল্পেব পরিবেশ শ্রেণীসংঘর্ষ ও শ্রেণীসংগ্রামে কলুষিত থাকে; কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে সেই অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে না, সামাজিক ঐক্যতান (social harmony) বজায় থাকে, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের" সমাজের ভিত্তি প্রস্তুত করে, কারণ অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও শক্তিসম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

উহা গুরুত্বপূর্ণ কেন

উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থানও পরিবর্তনশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ যত বেশি বাড়িতে থাকে, দেশে প্রাচীন ও পুরাতন উৎপাদন-পদ্ধতি অপসারিত হইয়া উন্নত যন্ত্রকৌশল ও শ্রমবিভাগের প্রসারের ভিত্তিতে ততই বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন-কেন্দ্র সংগঠিত হইতে থাকে। ভারতের উন্নয়নের বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের বদলে বৃহৎমাত্রায় শিল্পোৎপাদন ঐতিহাসিক নিয়মেই ঘটিতে থাকিবে। ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে বিলাপ করিয়া লাভ নাই, ক্ষুদ্র

উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে উহার গুরুত্ব পাল্টাইতে পারে

ভাবালুতার দৃষ্টিতে (sick romantic attitude) অর্থনৈতিক উন্নয়নকালে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের সমস্যা বিচার করা চলে না। কুটিরশিল্পে যে-সকল সুবিধার কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা সবই ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিশ্চল ধরিয়া লইয়া আলোচনা করা হয়, অথবা এই কাঠামো না থাকিলে পূর্ণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই ধরিয়া লওয়া হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নূতন সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলা। বর্তমানকালের কাঠামো ডিঙাইয়া সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে (Long-term Perspective) ভবিষ্যতের সেই কাঠামোর দিকে তাকাইয়া কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে করা যায় না। বর্তমানকালের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিটি পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়িবার দিকে এক একটি ধাপ, তাই বর্তমানেও কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের উপর কোন জোর না দেওয়াই উচিত।

ভবিষ্যতের ছবি অনুযায়ী বর্তমানকে বিচার করিতে হয়

ইহার অনেক কারণ আছে। কুটিরশিল্পকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ একমাত্র বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদনের মাধ্যমেই সকল ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায়, শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয়, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে উন্নত যন্ত্রকৌশল ব্যবহার করা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার ফল লাভ করা যায়। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার, অর্থাৎ মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির হার একমাত্র বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদনের মাধ্যমেই দ্রুত বাড়িতে পারে; ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার হ্রাস পায়, শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উন্নয়নের গতিবেগ বাড়িতে পারে না। বলা হয় যে, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প তুলিয়া দিলে বেকারি ঘটিবে। প্রথম দিকে নিশ্চয় ইহা সত্য, এবং সেই জন্য দরকার সাময়িকভাবে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে যতটা সম্ভব বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন (labour-intensive large scale production) যেমন, চীনা পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। কত দ্রুত এই বেকারদের কাজ দেওয়া যায় তাহা নির্ভর করিবে দেশে মূলধন-গঠনের হার কত বেশি তাহার উপর, এবং মূলধন গঠন দ্রুততর হইতে পারে যদি বৃহৎ-মাত্রার শিল্পগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বৃহৎমাত্রার উৎপাদনেই মূলধন-গঠন বেশি হয় (কারণ শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বেশি), এবং

সেই বিচারে ভারতে কুটিরশিল্পের স্থান নাই

মূলধন গঠন বেশি হইলেই বিনিয়োগ ও কলকারখানা বাড়াইয়া তুলিয়া দেশের বেকারি দূর করা যায়। তাই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা ও পরিধি বাড়ানোই একমাত্র পথ, ক্ষুদ্রমাত্রার শিল্প বা কুটিরশিল্প জিয়াইয়া রাখিয়া উহাদের প্রসারে বেকারি দূর করা যায় না। লোককে অনুৎপাদক কাজে বা কম-উৎপাদক কাজে লাগাইয়া রাখাই দেশের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নহে, শ্রমশক্তির পূর্ণ স্ফূরণ ঘটাইবার জন্যই বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মূল নীতি। তাহা ছাড়া, ভারতের ন্যায় গরীব ও জনবহুল দেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের স্থান নাই বলিলেই চলে। শিল্পের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের শিল্পগুলি উহাদের যন্ত্রগত কাঠামো অনুযায়ীই বৃহৎমাত্রায় স্থাপিত হইতে বাধ্য এবং জনবহুল গরীব দেশে প্রতিটি ব্যক্তিকে সস্তায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ দ্রব সমূহ যোগাইতে হইলে কম উৎপাদন ব্যয়শীল বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনই কাম্য। ইহা সহজেই বোঝা যায় ভারতের ন্যায় গরীব ও জনবহুল দেশের জীবনমান উন্নয়নে কুটিরশিল্পের বিলাস চলিতে পারে না।

সর্বোপরি, ইহা মনে রাখা দরকার যে পরিকল্পিত অর্থনীতি সফল হইতে পারে যদি নির্দিষ্ট কয়েকটি উৎপাদন কেন্দ্র হয়। অসংগঠিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মুনাফামুখী কুটিরশিল্পকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা এবং উহাদের সাহায্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন করা অসুবিধাজনক ও অপচয়মূলক।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখনও কুটিরশিল্প টিকিয়া আছে। ব্যক্তিগত রুচি ও সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রভৃতি কারণ ছাড়াও বলা হয় যে, বিজ্ঞানের উন্নতি এমন স্তরে উঠিয়াছে যখন ক্ষুদ্র মাত্রায় কম ব্যয়ে উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, বৃহৎমাত্রায় যন্ত্রজনিত ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা আজ ক্ষুদ্রমাত্রাতেও পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং উন্নত যন্ত্রের প্রয়োগে কুটিরশিল্পে নূতন জীবন আনিতে পারে। এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামো স্বীকার করিয়া আমরা এই সকল ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা স্বীকার করিতে পারি না। পশ্চিমী উন্নত দেশগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে অপরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামো—সেখানকার এইরূপ অবস্থা আমাদের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না।

ধনতান্ত্রিক দেশে আছে সুতরাং আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশেও থাকিবে,—ইহা কোন যুক্তি নহে

যদি কোন দিন বিজ্ঞানের ও শ্রমিক দক্ষতার এমন বৃদ্ধি হয় যে, দেশের শ্রমিকেরা বাড়িতে বসিয়াই পরিবারের লোকজনের সাহায্যে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে শ্রম-বিভাগের সকল সুবিধা লাভ করিয়া উৎপাদন করিতে পারে এবং দেশময় সকল শ্রমিকের বাড়িতে কাঁচামাল পৌঁছানো ও পরিকল্পিত পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য তুলিয়া বাজারে লইয়া আসার মত কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের স্থান কল্পনা করা সম্ভব।

নিছক কল্পনা

কুটিরশিল্প ও ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Cottage Industries and Indian Economic Plans)। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। কুটির ও শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয় যে, ইহার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ, আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে এবং গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোতে অধিকতর ভারসাম্য ও সুসংবদ্ধতা (Balance and integration) দেখা দিবে। যে-কুটিরশিল্পগুলি প্রাচীনকাল হইতে চলিতেছিল উহাদের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল। গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যা ও কলাকৌশলের উন্নতি হইতে থাকিবে, কুটির-শিল্পগুলি যন্ত্র ব্যবহার করিতে থাকিবে, এবং ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া উন্নততর গ্রাম্য ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত হইতে থাকিবে—এইরূপ আশা করা হইয়াছিল। এইরূপ পরিবর্তন ঘটিতে দীর্ঘকাল প্রয়োজন হইবে, তাই ইতিমধ্যে কুটির শিল্পগুলিকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করিবে, যেমন, আইন করিয়া বিদেশী ও দেশীয় বৃহৎ শিল্পের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে—এইরূপ বলা হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় ইহার স্থান

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে "গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন, কারণ ভারী ও মূলধনী শিল্প প্রসারের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।" ভারী ও মূলধনী শিল্পোৎপাদনে প্রভূত মূলধন দরকার হয়, অথচ তুলনামূলকভাবে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বেশি বাড়ে না। সুতরাং ভারী শিল্পের উপর এই গুরুত্ব

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার স্থান ও গুরুত্ব

আরোপের সহিত ভারসাম্য রাখিবার জন্যই ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে মূলধন সঞ্চয়ী ও কর্মসংস্থান প্রসারী (Capital-saving and employment giving) উৎপাদন-পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে গেলে গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের যান্ত্রিক দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া যতটা সম্ভব ভোগ্যদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা মিটানো খুব প্রয়োজন। এই সকল শিল্পের কর্মসংস্থান-সম্ভাব্যতা (employment potential) তুলনামূলক-ভাবে বেশি এবং দেশের দুষ্প্রাপ্য মূলধন ভাণ্ডারের উপর ইহাদের দাবীও তুলনামূলকভাবে কম।

শিল্পক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য অংশ উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি, কারণ এই অংশের উপর প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তি নির্ভরশীল এবং বর্তমানে তাহাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিচুতে। গ্রামীণ ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করে কত পরিমাণ শক্তিশালী ও তেজী বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পাংশ তৈয়ার করা যায়, তাহার উপর। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত দ্রুত ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর গুরুত্ব বিচার করা দরকার। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতিব জন্য কোন পরিকল্পনা রাষ্ট্রক্ষেত্রেব দুষ্প্রাপ্য উপকরণ ভাণ্ডারের উপর যেন কোন চাপ না দেয় এবং একক্ষেত্র হইতে অন্যক্ষেত্রে স্থায়ী ও অধিক পরিমাণে আযের অপসারণ না ঘটায়। এই সকল সাধারণ বিষযগুলি মানিয়া লইলেও দেখা যায যে ক্ষুদ্রমাত্রা ও গ্রাম্য শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিব ধারা শুরু করার প্রচুর সুযোগ রহিযাছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে ক্ষুদ্র ও কুটিবশিল্পের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে। কর্মসংস্থানের প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বণ্টনে অধিকতর সমতাসাধন—এই সকল লক্ষ্য সফল করিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই শিল্পগুলি বিশেষ সাহায্য করিযাছে বলিযা কমিশন মনে করেন। কমিশনেব ভাষায বলিতে গেলে "with the larger dimensions of the task to be accomplished in the Third plan, their role will be even more important."

তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার স্থান ও গুরুত্ব

গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি যেখানে নূতন টেক্‌নিক গ্রহণ করিতে পারে নাই, অথবা সমবায়ের মাধ্যমে মাত্রা বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারে নাই—সেখানেই তুলনামূলকভাবে উৎপাদন-ব্যয় উঁচুতে

রহিয়া গিয়াছে। গতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পরিলে এবং ক্রমাগত নূতন টেক্‌নিক্, পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক রূপ অবলম্বন করিতে থাকিলে তবেই গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্প-গুলির স্থায়িত্ব ও প্রসার হইতে থাকে। ঋণ, অর্থসাহায্য, বিক্রয়-ব্যবস্থা, বিদেশ হইতে আমদানি হ্রাস করিযা ইহাদের জন্য বাজার সৃষ্টি করা—এই সকল সরকারী সুবিধার আড়ালে ইহারা এতদিন কাজ করিয়াছে। সারা দেশে যে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসাব ঘটিয়াছে, পথঘাট ও যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পাইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা ও সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহাতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির সম্মুখে নূতন সুযোগ ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত হইয়াছে।

অবস্থার উন্নতির উপায় (Measures for development): শিক্ষা, মূলধন, যন্ত্রবিদ্যা, বিক্রয় সংগঠন, শিল্পসম্মত রুচি, আধুনিক উপযুক্ত মান নির্ধারণ এবং অর্থসংগতি—এই সকল বিষয়ের অভাব মিলিয়া কুটির-শিল্পগুলিতে উৎপাদনের ব্যয় অধিক হইতেছে ও উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষের মান নামিয়া গিয়াছে। এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ১৭·৫ কোটি টাকা প্রথমে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পরে মিলের কাপড়ের উপর যে সেস্ (cess) বসানো হয় তাহা হইতে ২০ কোটি টাকা খাদি ও তাঁতশিল্প উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজ্যসরকার মিলিয়া প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে মোট ৪৫·৫ কোটি টাকা—উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা মিলিয়া ৩৩·৬ কোটি টাকা ও সকল রাজ্যসরকার মিলিয়া ১১·৯ কোটি টাকা। কেন্দ্রের ৩৩·৬ কোটি টাকার মধ্যে তাঁত হইল ১২·২ কোটি, খাদি, ১২·৩ কোটি, ক্ষুদ্রশিল্প ৪·৪ কোটি গ্রাম শিল্প ২·৯ কোটি, হস্তশিল্প ৮২ লক্ষ, রেশম চাষ (Secriculture) ৬৫ লক্ষ এবং দড়ি শিল্প ৩০ লক্ষ। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার এলাকাগুলিতে গ্রাম শিল্প (rural crafts and industries) প্রভৃতির জন্য ১·৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রধানত পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর হইতেই ইহাদের উপর ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ ছিল প্রধানত অর্থ বরাদ্দ করা—কিন্তু উন্নয়নের কর্মসূচী কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল প্রধানত বিভিন্ন সংস্থানসমূহ ও রাজ্য সরকারের উপর।

প্রথম পরিকল্পনায় ইহার জন্য বরাদ্দ

ইহা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনাকালে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কয়েকটি সারা ভারত সংস্থা বা বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছিল। এইরূপ ছয়টি সংগঠন আছে: (১) সারা ভারত খাদি ও গ্রাম শিল্প বোর্ড (All India Khadi and Village Industries Board); (২) সারা ভারত হস্তশিল্প বোর্ড All India Handicrafts Board); (৩) সারা ভারত তাঁতশিল্প বোর্ড (All India Handloom Board); (৪) ক্ষুদ্রশিল্প বোর্ড (the Small Industries Board); (৫) দড়ি-শিল্প বোর্ড (The Coir Board); এবং (৬) সিল্ক বোর্ড the Silk Board)। ইহাদের মধ্যে দড়ি ও ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা (Statutory bodies)। ক্ষুদ্র শিল্পবোর্ডের সহিত ক্ষুদ্রশিল্প সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (Small Industries service Institutes) এবং জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশনের (National Small Industres Corporation) যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। ইহাদের প্রত্যেকটি বোর্ডের কার্যক্ষেত্র সারা ভারত জুড়িয়া প্রসারিত। রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় সংযোজন (Co-ordination যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার কার্যসূচী, বিক্রয়সংগঠনের উন্নয়ন, মাননির্ধারণ ও নমুনা নির্ণয় এবং অর্থসাহায্য প্রভৃতি কার্যে ইহারা সাহায্য করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও এই সকল সংস্থার মিলিত চেষ্টায় প্রায় প্রতিটি শিল্পেই উৎপাদনের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনাকালে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কোথাও পরিকল্পিত লক্ষ্য ছাড়াইয়া গিয়াছে, কোথাও সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা টীমের সুপারিশ: আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন (Ford Foundation) কর্তৃক পরিচালিত টীম (International Planning Team) ১৯৫৪ সালে তাহাদের সুপারিশগুলি প্রকাশ করেন। ওই টীমের বহু সুপারিশের মধ্যে প্রধানগুলি আলোচনা করা দরকার। (ক) এই টীম বলেন যে, চারিটি আঞ্চলিক যন্ত্রকৌশলগত প্রতিষ্ঠান (Four regional Institutes of Technology) স্থাপন করিয়া উহাদের মাধ্যমে এক একটি অঞ্চলের কারিগরদের যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, ছোট যন্ত্র সরবরাহ, রুচি ও প্যাটার্ন শিক্ষা, কাঁচামাল যোগান, ও বিক্রয় ব্যবস্থা—প্রভৃতি সকল কাজ করা দরকার। ডিজাইন ও ফ্যাশান শিক্ষা দানের জন্য একটি জাতীয় ডিজাইন শিক্ষায়তন (National school of Designs), দেশে ও বিদেশে যোগানের উপযুক্ত সূত্রগুলি গড়িয়া তোলার জন্য ক্রেতা সেবা করপোরেশন (Consumer's

Service Corporation) এবং ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় একটি করিয়া রপ্তানি উন্নয়ন অফিস (Export Development office) প্রভৃতি স্থাপন করা দরকার। (খ) এই টীম সুপারিশ করিয়াছে যে, (১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আঞ্চলিক শাখাসমূহ যেন ক্ষুদ্রশিল্পকে অধিকতর ঋণদান করে, (২) সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যেন ক্ষুদ্রশিল্পসমূহকে অধিকতর ঋণ দেয়, (৩) সকল রাজ্যের রাজ্য ফিনান্স করপোরেশন যেন তাহাদের মূলধনের একাংশ ক্ষুদ্রশিল্পে নিয়োগের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয়, এবং (৪) দ্রব্য ও সম্পত্তি বন্ধকের বিনিময় ঋণ দিবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। (গ) কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলা দরকার, তবে রাষ্ট্র যেন ইহাদের সর্বদা নেতৃত্ব দেওয়ার নীতি পরিত্যাগ করেন। (ঘ) বিক্রয় ও দ্রব্য বণ্টন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্বাধীন বিক্রয়কার্য করপোরেশন (Marketing Service Corporation) স্থাপন করিয়া উহার মাধ্যমে ক্রেতাদের চাহিদা নির্ধারণ করবেন এবং এই চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপাদকদের উৎসাহ দিবেন। এই করপোরেশনের আরও কাজ হইবে ক্ষুদ্রশিল্পের বিক্রয় সংবাদ সংগ্রহ প্রতিষ্ঠান (Marketing News Service) হিসাবে কাজ করা। এই সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে ৪টি বহুমুখী আঞ্চলিক যন্ত্রকৌশলগত প্রতিষ্ঠান (Four Regional Technological Institutes) নেতৃত্ব করিবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী ও কার্ভে কমিটি (Programme in the Second Plan & the Karvey Committee): দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রধানত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এই প্রসারের জন্য বিভিন্ন কার্যসূচী কি হইবে এবং কোন দিকে কিরূপে উন্নয়ন ঘটাইতে হইবে তাহা পর্যালোচনার জন্য গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্প কমিটি বা কার্ভে কমিটি (Village and small-scale Industries Committee or Karvey Committee) নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালে এই কমিটি তাহার বিবরণ ও সুপারিশ পেশ করেন। এই কমিটি বিভিন্ন শিল্পের এবং বিভিন্ন রাজ্যের ভিত্তিতে কোন দিকে উন্নয়নের জন্য কত উপকরণ কি ভাবে নিযুক্ত করিতে হইবে তাহা আলোচনা করিয়াছিলেন। কর্মসংস্থান প্রসারের লক্ষ্য সর্বদা সম্মুখে

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী নির্মাণ ও কার্ভে কমিটি

রাখিয়াই গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের কথা বলা হইয়াছে। ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনকারী বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা যাহাতে আর বাড়ানো না হয় সেইজন্য যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) নির্ধারিত করার কথা বলা হইয়াছে। তাহার ফলে দেশের বর্ধিত চাহিদা গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের দ্রব্যের দিকেই প্রবাহিত হইবে।

কমিটি বলেন যে, যন্ত্রভিত্তিক বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনকারী ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিতে নিত্যনূতন যন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে, উৎপাদন-পদ্ধতি মূলধন-প্রধান হইয়া ওঠে, প্রচুর বেকারি দেখা দেয়। গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পে এইরূপ যন্ত্রজনিত বেকারির স্থান নাই তাই পরিকল্পনায় ইহাদের উন্নত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার। বেকারি রোধের এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন : (ক) বর্তমান বেকারির পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়া ও নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং, (খ) মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত-ভাবে দ্রুত হারে অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিকেন্দ্রীকৃত সামাজিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করা। এমন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে কর্মসংস্থান প্রসার লাভ করিতে পারে। যন্ত্রপ্রয়োগ ও যন্ত্রকৌশলের উন্নতিতে কমিটির কোন আপত্তি নাই, যদি সেই উন্নতি কর্ম-সংস্থাপনের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ঘটায়। কমিটি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, যন্ত্রকৌশলগত উন্নতি খুবই প্রয়োজন, আধুনিকতম যন্ত্রের প্রবর্তনে তাহাদের মোটেই আপত্তি নাই, তবে সেই যন্ত্রের প্রবর্তনে বেকারি বৃদ্ধি হইলে চলিবে না। কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক দিক হইতে অধিক ব্যয়শীল উৎপাদন পদ্ধতি জিয়াইয়া রাখিয়া কর্মসংস্থান বাড়াইবার কথা বলা হইতেছে না, নূতন নূতন বিনিয়োগ করার সময়ে যতদূর সম্ভব নূতনতম ও সর্বোত্তম উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করার কথাই চিন্তা করা দরকার।

কমিটির মূল নীতি

কমিটি যন্ত্রভিত্তিক ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলি প্রসারের সর্বোচ্চসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য বহু সুপারিশ করিয়াছেন। (ক) বিকেন্দ্রীকরণ ও সমবায়ের ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠিত করা. (খ) ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা, (গ) সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা, (ঘ) দীর্ঘকালীন ঋণের জন্য রাজ্য ফিনান্স করপোরেশনের

উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যসূচী

একাংশে কুটিরশিল্প বিভাগ খোলা, প্রভৃতি কাজ দরকার। (ঙ) কৃষিঋণের ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ যোগানের বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিষয়ে একজন মন্ত্রী থাকা আবশ্যক।

কমিটির নিয়ন্ত্রণমূলক সুপারিশগুলির মধ্যে (restrictive recommendations) প্রধান হইল: (ক) তাঁত বস্ত্র ও ঢেঁকিতে চাউল তৈয়ারীর জন্য কিছুটা ক্ষেত্র পৃথক করিয়া রাখা, (খ) ভেজিটেবল তৈল ও চামড়া-শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি সংকুচিত করা, (গ) মিল বস্ত্র, মিলের চাউল, ভেজিটেবল তৈল ও চামড়া-শিল্পের উপর সেস্ ও উপজ শুল্ক (cess and excise duties) আরোপ করা।

বৃহৎ শিল্পের সংকোচন নীতি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে অত্যন্ত দ্রুত উৎপাদন-পদ্ধতি, যন্ত্রকৌশল, ও যন্ত্রবিদ্যা পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং নূতন যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িতে থাকে। বস্তুত, যন্ত্রকৌশলের ক্রমাগত উন্নতিই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। প্রতি স্তরে যন্ত্রের প্রয়োগ বাড়াইয়া উৎপাদন-ক্ষমতা স্তরে স্তরে বাড়াইয়া চলাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে কার্ভে কমিটির ন্যায় এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক স্থাপনকারী সুপারিশ সত্যই বিস্ময়কর। যন্ত্রের উন্নতি হইবে, সেই যন্ত্র প্রয়োগ করা হইবে অথচ কিছু শ্রমিক সেই উৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হইবে না, এইরূপ ঘটিতে পারে না। এই বেকারি দূর হইতে পারে নূতন কারখানা খুলিয়া এবং তাহার জন্য যে মূলধন দরকার সেই মূলধন-গঠন দ্রুত যন্ত্রভিত্তিক বৃহৎমাত্রার শিল্প কারখানা হইতেই সম্ভব হইতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের বদলে উন্নততর যন্ত্রের ভিত্তিতে দেশের ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো দরকার, দেশের গরীব অধিবাসীরা তাহাতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সস্তায় পাইতে পারিবে। আজ যে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের শিল্প স্থাপিত হইতেছে, কাল তাহা হইতে কি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বাহির হইবে না? সেই যন্ত্রপাতিকে অকেজো রাখিয়া এবং বর্তমান ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা সংকুচিত রাখিলে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের গতি কি ব্যাহত হইবে না? যাঁহারা বেকারির ভয় দেখান

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে এই নীতি উন্নয়নের হার হ্রাস করিয়া দেয়

তাঁহারা স্থিতিশীল ও আংশিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন; যেন অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম বর্তমান স্তরেই চলিতেছে, অথচ যন্ত্রশিল্পের উন্নতিতে কুটিরশিল্পীরা উৎখাত হইয়া কাজ পাইতেছে না। সমগ্র দেশের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মের একত্র উন্নয়নের গতিশীল ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বেকারির ভয় থাকিতে পারে না।

সুতরাং এই নীতির পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়

তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের কার্যসূচী (Programmes of Development in the Third Plan: কমিশনের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রাম ও কুটিরশিল্প উন্নয়নের সময়ে কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা দরকার। (১) শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উপরন্তু, দক্ষতার মান উন্নয়ন, টেকনিকাল উপদেশ, উন্নত যন্ত্রপাতি ও ঋণব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাহায্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমানো। (২) অর্থসাহায্য, বিক্রয় রিবেট এবং আশ্রিত বাজার প্রযোগ সুবিধার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা। (৩ গ্রামাঞ্চলে ও ছোট শহরে শিল্পপ্রসারে উৎসাহ দান। (৪) বৃহৎশিল্পের পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রমাত্রার শিল্পগুলি গড়িয়া তোলা; এবং (৫ শিল্পী ও কারিগরদের সমবায় প্রথায় সংগঠিত করা। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সকল লক্ষ্য সফল করার উপযোগী নীতি ও কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রে কি ধরনের লক্ষ্য সম্মুখে থাকিবে

দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য টেকনিকাল শিক্ষার প্রসার তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচীর একটি অন্যতম প্রধান দিক। কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া এই শিক্ষার সুযোগ যাহাতে পাইতে পারে সেইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ('cluster type' institutions) কথা বলা হইয়াছে। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের শিল্পের জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভাড়া করিয়া নূতন যন্ত্র আনার এবং কয়েক দফায় দাম পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে। বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতের প্রসার ঘটানো হইবে। বিনা ব্যয়ে যন্ত্রপাতি বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্লকে এই প্রকার কর্মী রাখা হইবে। নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গবেষণা কার্যকেও উৎসাহ দেওয়া হইবে।

১। দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচী

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রসারের জন্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃহত্তর মাত্রায় ঋণ-প্রসারের ব্যবস্থা করা হইবে। দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা হইবে এবং নিম্ন সুদে ও সহজ কিস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। চল্‌তি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও দীর্ঘ ও মধ্যকালীন ঋণ দেওয়া হইবে। এই বিষয়ে সমবায়ী ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক-গুলিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব লইতে বলা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে অধিকতর সাহায্য করিবে।

সরকারের তরফ হইতে এইরূপ 'প্রত্যক্ষ' ও সক্রিয় সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া 'পরোক্ষ' সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। অর্থসাহায্য, বিক্রয়-রিবেট এবং আশ্রিত বাজার—এই ধরনের সাহায্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উদ্যোক্তাদের আত্মনির্ভর করিয়া তুলিতে বেশ কিছু বাধা দিয়াছে। তাহারা স্বাবলম্বী ও প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন হইতে চাহে নাই। তাই সরকারী নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

২। 'প্রত্যক্ষ' সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

কুটির শিল্পগুলি গ্রামে অবস্থিত হইলেও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মধ্যে শহরের নিকটে অবস্থিত হওয়ার ঝোঁক এখনও প্রবল। এই ক্ষেত্রে কর্মসূচীগুলির একটি লক্ষ্য হইল আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সারা দেশে ছড়াইয়া দেওয়া তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই শিল্পগুলিকে ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। অবশ্য স্থাননির্বাচনের সময়ে সেই অঞ্চলটিতে বিদ্যুৎ, পথঘাট ও অন্যান্য বাহ্য ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি পাওয়া যাইবে কি না সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইবে। শিল্পতালুক পরিকল্পনার (Industrial Estates Programme) প্রসার হইবে, উহাতেও ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের সম্মুখে প্রভূত সুযোগসুবিধার দ্বার উন্মুক্ত হইবে। খাদ্যশস্য ও বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে শোধন-শিল্প (processing industries) প্রসারিত হইবে। পুনরায় কর্মসংস্থান ও গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোতে বৈচিত্র্য সাধনের জন্য ইহাদের বিকেন্দ্রিকভাবে এবং সমবায় পদ্ধতিতে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। গুদাম, বিদ্যুৎ ও দক্ষ কর্মী বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহারা স্বল্পব্যয়ে পরিচালিত হইতে পারিবে বলিয়া মনে করা চলে।

৩। গ্রামাঞ্চলে ও ছোটশহরে শিল্পপ্রতিষ্ঠা

বৃহৎশিল্পের পরিপূরক হিসাবে কিরূপে ক্ষুদ্রশিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা করা যায় বা কিছুটা আপনা-আপনি উহারা গড়িয়া উঠিতে পারে এই বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমানে একটি বিশেষ কমিটির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়

সরকারী ক্ষেত্রের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান মেশিন টুল লিঃ-এর সহিত ব্যবস্থা করিয়া উহার আশেপাশে এইরূপ অল্প কিছু প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রেই উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে কতটা ক্ষুদ্রশিল্পের সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। কৃষি যন্ত্রপাতি, সাইকেল, বয়নযন্ত্র, রেডিও ও আরও অনেক শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

৪। পরিপূরক করিবার কর্মসূচী

তাই, দড়ি প্রভৃতি যে কয়েকটি শিল্পে সমবায় সমিতির সাহায্যে উৎপাদন চলিতেছে, সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই সমিতিগুলির কাজকর্ম সুসংগঠিত করার দিকে নজর দেওয়া হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প সমবায় সমিতি গঠন করার প্রচেষ্টা করা হইবে। এই বিষয়ে সরকারী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইল অল্প কিছুকাল ব্যাপিয়া সমিতিগুলিকে পরিচালনা জন্য ব্যয় নির্বাহের উপযোগী অর্থসাহায্য করা, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যে সুদের হার দাবী করে তাহার একাংশ বহন করা, এবং কারিগরী ও পরিচালনার শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিল্প সমবায়সমূহের কাজকর্ম সুসংবদ্ধভাবে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে ছোট একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৫। কারিগরী সমবায় প্রতিষ্ঠা করা

এই সকল কার্যসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাজ্য ও ইউনিয়ন এলাকাগুলিতে ১৪১ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচীর জন্য ১২৩ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত সমষ্টি উন্নয়ন কার্যসূচীতে এই খাতে ২০ কোটি টাকা ধরা আছে, এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সমাজকল্যাণ এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর কল্যাণ প্রভৃতি খাতেও কুটির শিল্পপ্রসারের কথা বলা হইয়াছে। উপরন্তু, বেসরকারী উদ্যোগী ব্যক্তিরা এবং ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া আরও ২৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে বলিয়া কমিশন আশা করেন।

অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ

পর্যালোচনা ও মূল্য নির্ণয় (Review and Evaluation): ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কে বর্তমান কালের গবেষণা হইতে আরও অনেক নূতন তথ্য ও বিশ্লেষণ জানা যাইতেছে।* এখনকার অর্থনীতি-বিদ্‌রা চিরাচরিত ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প এবং আধুনিক ক্ষুদ্রশিল্প (traditional

* *The Role of Small Enterprises in Indian Economic Development. P. N. Dhar & H. F. Lydall. Institute of Economic growth, Delhi.*

small industries and modern small industries)—এই দুই শ্রেণীতে ইহাদের বিভক্ত করিতে চান। তাঁহাদের মতে সরকারী ও আধা-সরকারী মহলে ক্ষুদ্রশিল্পের সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা মূলত চিরাচরিত ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সকল যুক্তি আধুনিক ধরনের ক্ষুদ্র-শিল্পের ক্ষেত্রে খাটানো চলে না। চিরাচরিত ধরনের ক্ষুদ্রশিল্পগুলির উৎপাদন-ধারা অনেকটা শ্রমপ্রগাঢ় ইহারা গ্রামে বা গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত, শক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে, পুরাণো ধরনের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত। আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পগুলি শহরে বা শহরের আশেপাশে অবস্থিত, শক্তি ও যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত, এখানে বৃহৎ শিল্পের ন্যায উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত এবং তাহাদেরই ন্যায আধুনিক দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন হয। তাই ক্ষুদ্র শিল্পের সমর্থনে সরকারী ও পরিকল্পনা কমিশনের যুক্তিগুলি উহাদের ক্ষেত্রে খাটে না।

বাস্তব অবস্থা কিন্তু ভিন্ন রূপ

কর্মসংস্থান বাড়ে, গ্রামাঞ্চলে ও ক্ষুদ্র শহরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করে, সাম্য ও গণতন্ত্রের প্রসার ঘটায়, সুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য উপকরণগুলি (যেমন মূলধন ও উদ্যোগক্ষমতা) উন্নযনে সাহায্য করে—এই সকল যুক্তি আধুনিক ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। এই সকল ক্ষুদ্রশিল্প (১০ হইতে ৪৯ জন পযন্ত শ্রমিক নিযোগকারী) প্রকৃতপক্ষে মূলধন-প্রগাঢ়, অর্থাৎ বৃহৎশিল্পের তুলনায় ইহাতে শ্রমিক-প্রতি মূলধন বিনিযোগের পরিমাণ বেশি। বৃহৎশিল্পগুলি দিনে ২ বার বা ৩ বার কাজ চালায়, এই সকল ক্ষুদ্রশিল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা ঘটে না, তাই মূলধনের ব্যবহারও তুলনা-মূলকভাবে কম। ইহারা মজুরি দেয় কম, শ্রমিক-দক্ষতা বাড়াইবার প্রচেষ্টাও ইহাদের ততটা নাই। ইহারা বিকেন্দ্রিকভাবে ছড়ানো নাই, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইহারা বড় শহরে অবস্থিত। এইরূপ ক্ষুদ্র শিল্পের সমর্থনে একটি যুক্তিই দেখান চলে তাহা হইল যে, দেশের মোট আয় বেশিসংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া যায়। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বর্তমানের এই সুবিধার মূল্য হিসাবে ভবিষ্যতে ভাল মজুরির চাকুরি কম পড়িবে, ভবিষ্যতে জাতীয আয় ও মাথাপিছু আয় ততটা বৃদ্ধি পাইবে না। ইহারা ক্ষুদ্র বলিয়া সর্বোন্নত মাত্রায় ব্যয়সংকোচ-সমূহ (economies of optimum scale) লাভ করিতে পারিতেছে না। তাই ইহাদের সমর্থন করা চলে না।

সুতরাং ইহা বিশেষ সমর্থন যোগ্য নহে

অনুশীলনী

1. On what lines and by what methods is it possible to develop our cottage and small scale industries so that they may play a useful part in the development of the country? (C. U. B. com. 1959)

2. What difficulties are being experienced by the handloom industry in India to-day? What steps have recently been taken by the central and state governments to improve the handloom industry?

(C. U. B. com. 1953; B. A. 1955)

3. Examine the importance of cottage and small-scale industries in the industrial structure of India with special reference to the Draft Plan frame of the Second Five Year Plan. (C. U. B. com. 1956)

4. Discuss how far it is practicale to increase the supply of essential consumer goods in India through the encouragement of cottage and small industries. (C. U. B. com. 1958)

5. Give a critical estimate of the measures adopted by the government of India for the development of small scale industries. (C.U. B. com. 1961)

6. Discuss the role that cottage industries in India are expected to play in the maintenance of production and employment. What attempts are being made by the Government of India to improve the position of these industries? (C. U. B. A 1954)

7. Examine the place of cottage and small-scale industries in the Indian economy. How do you propose to improve their organisation?

(C. U. B. A. 1956)

8. Discuss the rationale of fostering the small scale and cottage industries in India under present conditions. Indicate briefly the measures recenty adopted by the Government of India to assist the development of these industries.

9. Discuss the role of small scale industries in India's economic development.

10. "Handloon cottage industries of India from an important link of rural economy of India." Explain.

11. "From the point of Indian Economy there is a strong case for special encouragement of small scale and cottage industries." Discuss, in the light of the statement, the importance of cottage and small industries in Indian Economy.

12 What are the causes of the decay of the traditional Indian handicrafts? Is there any justification for the adoption of special measures for their revival?

১৬

শিল্পপ্রসার ও সরকারী শিল্প নীতি

Industrial Development and Government Policy

ভারতের শিল্পোন্নয়ন উচিত কি না (Whether India should be industrialised):

ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশগুলির দ্রুত শিল্পোন্নয়নের বিরুদ্ধে উন্নত দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ্ যুক্তি প্রদর্শন করেন। ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে টোকিয়োতে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষির দিকে বেশি ঝোঁক (agriculture-biased) থাকা উচিত। তাঁহাদের বক্তব্য আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এবং দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে শিল্পোন্নয়নই একমাত্র পথ ইহা মনে করা উচিত নয়। "Manufacturing industry is simply one type of economic activity, and there is no special reason why this activity rather than some other activity should at any given time serve best to promote either the most efficient allocation of existing resources or the most rapid growth of resources." ইহারা বলেন যে, যেহেতু উন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নতির মাত্রা বেশি, এইজন্য শিল্পোন্নয়নের সমর্থকেরা ভুলভাবে মনে করেন যে ভারতও শিল্পোন্নত হইলে সম্পদশালী হইয়া উঠিবে। প্রকৃতি ভারতকে কৃষি-প্রধান দেশে পরিণত করিয়াছে, ইহার কৃষি প্রধান থাকাই কর্তব্য। ইঁহাদের বক্তব্য এইরূপ। কিন্তু আমরা এই প্রকার যুক্তি মানিয়া লইতে পারি না। ভারতে জনসংখ্যার চাপ কৃষিতে এত বেশি যে প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী কৃষিক্ষেত্র যোগাড় করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, কৃষি ও শিল্পে ভারসাম্য আনার পক্ষেও শিল্পোন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়।*

* K. K. Kurihara, "Theoretical objections to Agriculture-biased Economic Development, *Indian Journal of Economics*, October 1955, P. 169. Professor Kurihara's equations are based on (a) decline in the productivity of capital; (b) decline in the saving ratio; and (c) Worsening of the terms of trade.

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন যে শিল্পোন্নত দেশের অধিবাসীদের আসল আয়ের উচ্চস্তর কেবলমাত্র শিল্পোন্নতির ফল নয়। আসল আয় ও শিল্পোন্নতি উভয়ই একই প্রকার কারণ বা প্রভাবের ফলস্বরূপ, যেমন সস্তা জলবিদ্যুৎ, প্রভূত পরিমাণ খনিজ সম্পদ ও সঞ্চিত মূলধন, দক্ষতা ও পরিচালনগত যোগ্যতা। এই যুক্তি একান্ত হাস্যকর। ঐ কারণগুলির জন্য দেশে শিল্পোন্নয়ন হয় না, উহারা শিল্পোন্নয়নেরই প্রত্যক্ষ ফল।

তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ আছে বলিয়া শিল্পোন্নয়ন দরকার এই যুক্তি সঠিক নয়। যে ভূমি বর্তমানে চাষের অযোগ্য সেই ভূমিকে মূলধন ও টেক্‌নোলজির দ্বারা উন্নত করা চলে এবং অতিরিক্ত কৃষক-সংখ্যাকে সেই ভূমিতেই সার্থকভাবে নিয়োগ করা সম্ভব, ইহার জন্য নূতন শিল্প স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নাই। এই যুক্তি কোনমতে মানিয়া লওয়া চলে না। ইহা ধরিয়া লয় যে ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশগুলিতে অকর্ষিত ভূমির পরিমাণ কম নয়। বাস্তবে ইহা সত্য নয়। উপরন্তু ভূমি ও কৃষির উন্নয়নের জন্যই যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, এবং শিল্পোন্নয়ন দরকার।

শিল্পোন্নয়নের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

চতুর্থত, তাঁহারা বলেন আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের নিয়ম মানিয়া কৃষি-প্রধান দেশগুলির উচিত কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করা এবং উহা রপ্তানি করিয়া উন্নত দেশগুলি হইতে শিল্প-জাত দ্রব্য আমদানি করা। সমগ্র পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল কল্পনা করিয়া এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। এই যুক্তিও আমরা মানিয়া লইতে পারি না। কৃষিদ্রব্য বিক্রয় করিয়া শিল্পজাত দ্রব্য বেশি পাওয়া যায় না, কারণ উভয়ের দাম কাঠামোতে বিশেষ পার্থক্য আছে, বাণিজ্য-হারও কৃষিজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে। কৃষি-পণ্যের উৎপাদন আরও বাড়াইলে পৃথিবীর বাজারে ইহাদের দাম আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নার্ক্‌সে বলেন: "There has been some sluggishness in the industrial countries' demand for primary products, and despite the recent raw-material boom there is no certainty that this sluggishness is gone for good."

পঞ্চমত, শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিবিদ্‌গণ আরও বলেন যে, অনুন্নত দেশ-গুলি যদি সকল প্রকার শিল্প নিজেরা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, অর্থাৎ 'ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন' এবং 'অর্থনীতির বৈচিত্র্যায়ন' করিতে চায়, তাহা হইলে উহা ব্যয়বহুল

হইবে এবং এইরূপ চেষ্টার দরুণ মূলধনের অপচয়মূলক নিয়োগ ঘটিবে। এই অর্থনীতিবিদগণ প্রধানত উন্নত দেশগুলির স্বার্থরক্ষায় এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেন; সস্তা কাঁচামালের উৎস হিসাবে এই অঞ্চলগুলিকে স্থায়িভাবে কৃষি-প্রধান রাখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে আয় ও সম্পদ বৈষম্যের বর্তমান ধরন (status quo) তাঁহারা বজায় রাখিতে উৎসুক। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ভাঙিয়া দিবে, উন্নত দেশগুলির শিল্প ব্যবসায়ের বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হইবে, তাহারা তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে, এই সকল কথা মনে রাখিয়া তাঁহারা এই প্রকাব যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহারা মনে রাখেন না যে, সুস্থ ও সম্মানজনক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হইল বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদ বৈষম্যের এই বিপুল পার্থক্য দূব করা। 'শোষণের অঞ্চল' হিসাবে গণ্য না করিয়া তাহাদের উন্নত করিয়া তুলিলেই সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ বাড়িবে, জীবন যাত্রা ও সভ্যতার মান উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেক শিল্পোন্নত দেশই প্রাথমিক মূলধন পাইয়াছে ইহাদের সঞ্চয় লুটপাট কবিয়া এবং অন্যায বাণিজ্যের মাধ্যমে। সেই লুট এবং অন্যায়-বাণিজ্যের ফলেই ইহাদের অনুন্নতি। আজ তাহাদের অনুন্নতিকে ভগবানেব বিধান, অশিক্ষা, উদ্যোগহীনতা ও শ্রমবিমুখতাব ফল বলিলে উহা 'ঐতিহাসিক' উপহাসের মত শোনায। আর ইহাদের শিল্পোন্নযন উচিত নয় বলা চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জাতিসংঘের রিপোর্টে ঠিকই বলা হইয়াছে : "The poorer nations are beginning to realize that their position can be improved by modern techniques and they are aspiring towards a better life. It is the duty of our civilization to respond to these legitimate aspirations. If we do not succeed in doing so within a short space of time, how can we legitimately ask two-thirds of mankind to support a civilization which cannot provide even for their basic subsistence ?"

শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা (The Need for Industriali-sation)

. বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ কলিন ক্লার্কের মতে কোনো দেশেব জাতীয় আয়ের সহিত সেইদেশের জনসংখ্যার জীবিকা-কাঠামোর (occupational structure) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তিনি সকল জীবিকাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

করিয়াছেন ঃ কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি হইল প্রাথমিক কার্যকলাপ (primary occupations) ; যন্ত্রশিল্প, কলকারখানা প্রভৃতি হইল দ্বিতীয়স্তরের কার্যকলাপ (secondary) ; সওদাগরী, ছবি আঁকা, গান করা, শিক্ষকতা, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি তৃতীয় স্তরের (tertiary) কার্যকলাপ। তাঁহার মতে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঐতিহাসিক গতিপথ হইল কৃষি হইতে শিল্প এবং শিল্প হইতে বাণিজ্য। প্রাথমিক স্তরের জীবিকাগোষ্ঠীতে জনসংখ্যার অনুপাত যত কমিবে এবং দ্বিতীয়স্তরে বৃদ্ধি পাইবে, দেশ ততই উন্নত হইয়া উঠিবে, উহার জাতীয় আয় তত বাড়িতে থাকিবে। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, কৃষি বা পশুপালনে শ্রমিক সারা বৎসরে যে সম্পদ উৎপাদন করে; যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত কলকারখানার শ্রমিকেরা সেই সময়ের মধ্যে অনেক বেশি

শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন : জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়ানো

মূল্যের সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে, শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা কৃষি-ক্ষেত্রের শ্রমিকের তুলনায় অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, কৃষি-ক্ষেত্র হইতে লোক যত সরিয়া আসিয়া শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতেছে ততই কম লোক দিয়া কৃষিতে উৎপাদন হইতেছে। কৃষি উৎপাদনেই টেকনোলজি এবং উন্নত প্রয়োগ-বিদ্যার দরকার হইতেছে, ফলে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতাও বাড়িতেছে। এই দুইটি কারণের জন্য কলিন ক্লার্কের বক্তব্য আমরা সঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। সুতরাং জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়াইবার জন্য কৃষিক্ষেত্র হইতে লোক অপসারণ করা এবং কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পোন্নয়ন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। ভারতের ন্যায় জনবহুল অনুন্নত দেশে উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে প্রভূত কলকারখানা দরকার, 'শিল্পোন্নয়নের মাত্রা' খুব বেশি না হইলে কৃষি হইতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চাষীকে সরাইয়া আনা যাইবে না। মনে রাখা দরকার যে প্রচুরসংখ্যক লোক সরাইয়া আনিলেও পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত মূলত কৃষি-প্রধান দেশই থাকিয়া যাইবে। যেমন নিউজিল্যাণ্ড প্রধানত কৃষি-প্রধান দেশ, সেখানে জনসংখ্যার শতকরা ২৭·১ ভাগ প্রাথমিক স্তরের জীবিকাতে, আর ভারতে এখনও এই অনুপাত শতকরা ৬৯ ভাগ। দ্বিতীয়ত, ইহা মনে রাখা দরকার যে ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে কেবল শিল্পের

প্রসারই কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ কমাইতে পারে না। সকল উন্নত দেশেই জনসংখ্যার বেশি অংশ তৃতীয়স্তরের জীবিকাতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ইহার অনুপাত ৫০ এর বেশি।* ভারতেও তৃতীয়স্তরের প্রসার ঘটান দরকার কারণ কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ ইহাতে কমিবে। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য, ওকালতি-মোক্তারী, প্রভৃতি কাজকর্মের প্রসার ঘটান যায় যদি কৃষি ও শিল্প উভয়ের প্রসার ঘটে। শিক্ষক, ডাক্তার, নর্তক, বাদক তখনই সমাজে আয় করিতে পারে যখন প্রাথমিক ও দ্বিতীয়স্তরের উৎপাদক শ্রেণী সমাজে প্রভূত সম্পদ উৎপাদন করে এবং তৃতীয়স্তরে উৎপন্ন কাজকর্ম ক্রয় করিতে পারে। তাই শিল্পোন্নয়নই কৃষি ও সেবা কাজকর্ম উভয়কে একযোগে উন্নত করিতে পারে। আসল দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বা আসল আয় যত বৃদ্ধি পাইবে ততই তৃতীয়স্তরের কাজকর্মের জন্য চাহিদা বাড়িবে। তখনই জনসংখ্যার বেশি অংশ তৃতীয় শ্রেণীর জীবিকাতে নিযুক্ত হইতে পারে।

ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন বেশি, কারণ আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্যহীনতা। কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া আবহাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে উৎপাদন উঠানামা হয় এবং যন্ত্রদক্ষতা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ স্বল্প থাকে। এই ভারসাম্যহীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল অস্থায়িত্ব (instability)। আমাদের কৃষি-নির্ভরশীলতার দরুণ রপ্তানি-বাণিজ্যে কৃষিপণ্যের এবং আমদানি বাণিজ্যে শিল্পপণ্যের প্রাধান্য বেশি। উভয়ক্ষেত্রেই বিদেশের উপর নির্ভরশীলতার দরুণ বিদেশের বাণিজ্যসংকট আমাদের অর্থনৈতিক দেহে অস্থিরতার সঞ্চার করে। শিল্পোন্নয়ন এই ভারসাম্যহীনতা দূর করিয়া অস্থিরতার মূল ভিত্তি অপসারণ করিবে। শিল্পোন্নয়নের ফলে দেশের প্রাকৃতিক উপকরণগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, উহাদের শিল্পগত এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজন বাড়ে, উহাদের মূল্য দেখা দেয়। নূতন ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর উদ্ভব ঘটে, বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগে টেকনোলজির প্রসার হয়। জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে, সময়ানুবর্তিতা, কর্মদক্ষতা, পার্থিব ভোগের প্রতি আসক্তি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের বেগ বৃদ্ধি পায়। সরকারী কোষাগারে রাজস্ব আদায় বাড়ে, সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার পরিধি প্রসারিত হয়।

* ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন ঘটিলে অর্থনৈতিক কাঠামোতে তৃতীয় স্তরের প্রসার ঘটে দ্রুতগতিতে, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারাতে দ্বিতীয় স্তরের প্রসারের ব্যাপ্তি বেশি।

শিল্পোন্নয়নের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ (Factors inhibiting Industrialisation) : বর্তমানের শিল্পোন্নত দেশগুলির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আমরা আজকাল শিল্পোন্নয়নের তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছি। শিল্পোন্নয়ন বলিলে বুঝা যায় উৎপাদনের নানা দিকে মূলধন বা পুঁজির নিয়োগ বাড়াইয়া তোলা এবং উৎপাদনপদ্ধতিতে মানুষের শারীরিক শক্তি প্রয়োগের বদলে ক্রমাগত যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ বাড়াইয়া চলা। শিল্পোন্নয়ন হইল "a process in which changes of a series of strategical production functions are taking place. It involves those basic changes that accompany the opening of a new market, and the exploitation of a new territory. This is, in a way, a process of 'deepening' as well as 'widening' of capital."

সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি ক্রমাগত বেশি পরিমাণ মূলধনের নিযোগ, অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ান—ইহাই শিল্পোন্নয়নের ধারা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মূলধন সঞ্চয়—মূলধনের নিয়োগ—উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো—আরও মূলধন সঞ্চয়—আরও বেশি মূলধনের নিযোগ—উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানো, ইহাই শিল্পোন্নয়নের গতিপথ।

ভারতে বা এইরূপ অনুন্নত দেশে এই গতিধারার সূত্রপাত কেন হইতেছে না, অথবা ইহার দ্রুত গতির প্রতিবন্ধকসমূহ আলোচনা করা দরকার। এই সকল বাধাকে আমরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিযা আলোচনা কবিতে পারি : (ক) অর্থনৈতিক পরিবেশ ; (খ) জনসংখ্যা সম্পর্কীয় ও সামাজিক কারণাবলী ; (গ) সরকারী ও শাসনতান্ত্রিক নীতিসমূহ ; এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক শক্তি সমাবেশ।

অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের প্রধান বাধা উহার বিরূপ অর্থনৈতিক পরিবেশ। যেমন, এইরূপ প্রায় সকল দেশেই যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ অনুন্নত। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুতর প্রতিবন্ধক, কারণ, কাঁচামালগুলি একত্র সংগ্রহ করা, শ্রমিকের উপস্থিতি যন্ত্রপাতির নিয়োগ, উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যগুলিকে বিক্রয়-কেন্দ্রে দ্রুত পাঠান—সকল কিছুই উন্নত পরিবহনের ফলে সহজ ও সম্ভব হয। শিল্পপ্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন তাই অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবহন ব্যবস্থার উপর। অর্থনৈতিক পরিবেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল শক্তি। প্রায় সকল অনুন্নত

১। বিরূপ অর্থনৈতিক পরিবেশ কাহাকে বলে

দেশেই কম বেশি শক্তির স্বল্পতা দেখিতে পাওয়া যায়। কয়লার সাহায্যে বাষ্পশক্তি সম্ভব হয়, কিন্তু সকল দেশ বা কোনো একটি দেশের সকল অঞ্চলে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন কয়লা সমান পরিমাণে পাওয়া যায় না। তাই সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি প্রসারের চেষ্টা সকল অনুন্নত দেশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থনৈতিক পরিবেশের আর একটি দিক হইল আনুষঙ্গিক শিল্পউৎপাদন কেন্দ্রের অভাব। একটি শিল্পের অপচয়ী উপকরণসমূহ অন্য শিল্পের কাঁচামাল, দ্বিতীয় শিল্পটি প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রথম শিল্পটির উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে, প্রথমটির প্রতিষ্ঠা না হইলে উহার পূর্বে দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। শিল্পদক্ষতা ও শিক্ষার মনোবৃত্তির অভাব, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাব, মূলধন সংগ্রহের উপযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব, শিল্পোন্নয়নের উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িয়া তোলার প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য কেবল অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাই নয়, উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশও দরকার। সামাজিক পরিবেশের দুই দিক: জনসংখ্যা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি। অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণভাবে মাথাপিছু আয় এবং মূলধন কম, এই অবস্থায় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নের উপযোগী সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়। প্রতি বৎসর কিছুটা নূতন মূলধন গঠন হইলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশে মাথা-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ সমানই থাকে। অর্থাৎ নূতন শিল্পোন্নয়নের কাজে খাটানো যায় না। এই কারণে জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। ভূমির পরিমাণ কম থাকিলে এই প্রতিবন্ধকতা তীব্রতর হইয়া উঠে। জনসংখ্যাবহুল অনুন্নত দেশে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় কম, ফলে একদিকে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার নাই, আবার অপর দিকে শিল্পে খাটিবার উপযোগী মূলধন সঞ্চয় সম্ভব নয়।

২। সামাজিক পরিবেশ

দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এমনই যে উহাদের মধ্য হইতে শিল্পোৎ-পাদনে উপযোগী নূতন প্রচেষ্টা দেখা দেয় না; বাহির হইতে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা সুরু হইলেও তাহারা বাধা দিতে থাকে। বর্ণভেদ প্রথা, বংশগত কৌলীন্য-বোধ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে যথাযোগ্য মূল্যবোধের অভাব,—এই সকল কারণে শিল্পব্যবসায়ে দক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী মানসিকতা গড়িয়া উঠে না। বর্ণ, শ্রেণী, ভাষা, বংশ ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য সামাজিক ঐক্য ব্যাহত করে, ব্যক্তির আনুগত্য সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থাকে।

অনুন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকেরা সাধারণ বা যন্ত্রশিক্ষা কোনটিই ভালভাবে পায় না। তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না, নানাপ্রকার গোষ্ঠীগত চাপে শ্রমিকের চলনশীলতাও কম। যন্ত্রের সহিত মানসিক নৈকট্যবোধ, কারখানার সহিত আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে না ; গ্রাম ও চাষের জমির স্বপ্নে বিভোর মজুর লইয়া শিল্পোন্নয়নের বেগ বৃদ্ধি হয় না। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব থাকায় যৌথ পরিবারের বাড়িঘর ভাঙিয়া স্থায়ীভাবে শহরে আসিয়া বসবাস করার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে না। সামাজিক শক্তিসমূহ মূলধন সঞ্চয়কে ব্যাহত করে। বারো মাসে তেরো পার্বণের সামাজিক চাপ ব্যক্তির সঞ্চয়কে ক্ষয় করে। উন্নত দেশের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়া 'প্রদর্শনীয় ভোগের' পরিমাণ বাড়ে। অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক কৌলীন্য এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভিত্তি জমির উপর মালিকানা। ব্যক্তির সঞ্চয় তাই জমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। বাকিটা মহাজনী ব্যবসায়ে ব কারবারের ফাট্‌কা ব্যবসায়ে খাটিতে থাকে।

উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের যুগে সামাজিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার তুলনায় বর্তমানের অনুন্নত দেশগুলিতে, যেমন ভারতবর্ষে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন দ্রুততর হওয়া দরকার। ইহার কারণ দুইটি : তাহাদের দেড়শত বৎসরের অগ্রগতি আমরা দশ বৎসরে পাইতে চাহিতেছি, এবং আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির শিকড় ইতিহাসের অনেক গভীরে, উহাদের রক্ষণশীল ঐতিহ্য এবং স্থায়িত্ব অনেক বেশি। জাতি-সংঘের রিপোর্টের ভাষায় বলিতে গেলে "industrialisation is not merely technological revolution ; it involves profound social changes which must be fully taken into account if the process is to result in higher material standard and a greater degree of human welfare."

৩। শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ

সরকারী শাসন-কাঠামোর ত্রুটি শিল্পোন্নয়নের গুরুতর প্রতিবন্ধক। বেশির ভাগ অনুন্নত দেশেই সুদক্ষ এবং বর্ণ শ্রেণী ও দল নিরপেক্ষ সরকারী কর্মচারী-গোষ্ঠী থাকে না। শিল্পোন্নয়ন পরিচালনার উপযোগী সরকারী কর্মচারী শ্রেণী এই সকল দেশে গড়িয়া তোলাও কষ্টকর। শাসক শ্রেণীর দক্ষতা ও সততা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে, এই সকল বিষয়ের অভাব সঠিক পথে উন্নয়ন ঘটায় না। প্রচারের অভাব

মূলধনকে জড় ও স্থবির রাখে। সরকারের দীর্ঘসূত্রতা, খেয়াল খুশিমত কাজ করা, আত্মীয়-স্বজন পোষণ বৈদেশিক মুদ্রা বা কর ফাঁকিতে সাহায্য, প্রভৃতি নানাবিধ দুর্নীতি শিল্প ব্যবসায় প্রসারের প্রতিবন্ধক।

অনুন্নত দেশগুলির আয়ত্তের বাহিরে এমন কতকগুলি আন্তর্জাতিক অবস্থা থাকে যাহারা শিল্পোন্নয়নের প্রতিবন্ধক। উন্নত দেশগুলি সময়মত যন্ত্রপাতি পাঠায় না, একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করিয়া কাঁচামালের উৎস অনুন্নত দেশটিকে শোষণ করে সর্বাধুনিক যন্ত্র দিতে রাজি হয় না, নিজের দেশের পুরানো অপ্রচলিত যন্ত্রাদি প্রেরণ করে। উৎস দেশগুলির সরকারসমূহ অথবা তাহাদের কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান মিলিয়া বাণিজ্য বিষয়ে নানা সংস্থা গড়িয়া তুলিয়া, (যেমন, ইউরোপীয় সাধারণ বাজার নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। তাহাদের আমদানি-রপ্তানি নীতি, শুল্ক নীতি, সকল কিছুই নূতন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বাধা দিতে থাকে।

৪। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকসমূহ

শিল্পোন্নয়নের উপযোগী উপায়সমূহ (Measures conducive to Industrialisation): জাতিসংঘের বিভিন্ন রিপোর্টে অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের উপযোগী নানাবিধ উপায় অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল সুপারিশের প্রত্যেকটি সকল দেশে সমভাবে প্রযোজ্য না, কারণ প্রতিটি দেশের বাস্তব অবস্থা সমান নয়। আয়তন, উপকরণের পরিমাণ, সরকারের চরিত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য, তৎকালীন শিল্পোন্নতির স্তর প্রভৃতি নানাবিষয়ে পার্থক্য আছে। জাতিসংঘের রিপোর্টসমূহ এই সকল সুপারিশকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। আভ্যন্তরীণ উপায়গুলি তিন প্রকার: যে সকল পদ্ধতি দ্বারা দেশে উৎপাদনের উপকরণগুলির স্রোতধারার গতিবেগ বাড়ানো যায়, যন্ত্রশিল্পগত বা টেকনোলজি বিষয়ক উন্নয়নের সমস্যা এবং রাষ্ট্রীয় নীতি। আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি হইল, শিল্পোন্নত দেশসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক সাহায্য।

অনুন্নত দেশে শিল্প প্রসারের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী এক শ্রেণী গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষার মান বাড়ানো দরকার। যতদিন না পর্যন্ত উপযুক্ত শিল্পনেতা বা উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়িয়া উঠে ততদিন সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পোউন্নয়ন করপোরেশন (Industrial Development Corporation) তৈয়ার হওয়া দরকার। যেখানে ব্যক্তিগতভাবে কোন উদ্যোক্তা অগ্রসর হন না

সেক্ষেত্রে সরকার নিজেই অগ্রসর হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্যোক্তাশ্রেণীর উদ্ভব হইলে শিল্প স্থাপিত হয়, আবার শিল্পগুলি স্থাপিত হইতে থাকিলেই উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়িয়া উঠিতে থাকে। সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেও উপযুক্ত পরিচালকের অভাব থাকিতে পারে। বিদেশ হইতে মূলধন এবং উপযুক্ত পরিচালক সাময়িক-ভাবে লইয়া আসাও চলে। মূলধন সঞ্চয় এবং মূলধন বিনিয়োগ—উভয় উদ্দেশ্যেই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা বাঞ্ছনীয়। কলকারখানা সংক্রান্ত আইনকানুন এমনভাবে রচনা করা দরকার যাহাতে শিল্প প্রসার সহজ হইতে পারে। সরকার নিজে অগ্রণী হইয়া বেসরকারী শিল্পোদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করিয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারে। বেসবকারী ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের জন্য শিল্প পুঁজি করপোরেশন গড়িয়া তুলিতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা এবং চলনশীলতা বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসংস্থান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। খনিজ দ্রব্য এবং প্রাকৃতিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য সরকার বিভিন্ন অনুসন্ধানী কমিশন স্থাপন করিতে পারে, বিভিন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য ব্যবহার ও গুণাগুণ পর্যালোচনা করার জন্য গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারে। ব্যক্তি, বিদ্যালয়, ফার্ম সকল কিছুর মাধ্যমেই গবেষণাব কাজ অগ্রসর হইতে পারে। কাঁচামালের দাম কমানোর জন্য কৃষি উৎপাদনের উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। দেশে খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব পড়িলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বাড়ে, তাই কৃষির উন্নতি ঘটানো শিল্পপ্রসারের পক্ষেই অবশ্য প্রযোজনীয়।

উপকরণে স্রোতের গতিবৃদ্ধির কথা

উৎপাদনের টেকনিক উন্নত করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যায়। প্রথমেই লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ফার্মের আয়তন সর্বোন্নত (optimum size firms) হয়। উন্নত বিদেশী ফার্মগুলির আয়তন অনুকরণ করিয়া লাভ নাই, কারণ বাজারের আয়তন অনুযায়ী ফার্মের আয়তন নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশে কোনো দ্রব্যের বাজারের আয়তন ছোট বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম আধুনিক বা কম মূলধন প্রধান যন্ত্রও ব্যবহার করা উচিত, এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। বেকারি বৃদ্ধির ভয়ে অথবা বর্তমান বেকারির পরিমাণ কমাইবার জন্য শ্রম-প্রগাঢ় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প রক্ষা করিতে হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও টেকনোলজির উন্নয়ন দ্বারা কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের

টেকনিক উন্নত করার উপায়

উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা দরকার ইহাতে সন্দেহ নাই। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য বাজার রিজার্ভ করিয়া রাখা দরকার, যন্ত্রশিল্প উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখাও অসম্ভব নয়। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পরিপন্থী হইলেও স্বল্প কিছুকালের জন্য এই উপায় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন হইতে পারে: **"it is part of the price for easing the transition from manual to mechanical production, and for preventing the sudden dissolution of the ancient industrial organisation, which by throwing large number of people back on the land would involve heavy social costs as well as reversal of the industrialization trend."**

নানাবিধ রাষ্ট্রীয় নীতি

রাষ্ট্রীয় নীতির চারিটি দিক আছে; কর ও শুল্কনীতি, ঋণ নীতি, লেনদেন ব্যালান্স সংক্রান্ত নীতি; এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। শিল্পোন্নয়নের উপযোগী শুল্ক নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল; (ক) নূতন ও পুরাতন শিল্পে যাহাতে মূলধন নিয়োগ বাড়ে, (খ) অনুৎপাদক কাজকর্মে ফাটকাবাজি যাহাতে বন্ধ হয়, এবং (গ) দ্বিতীয় স্তরের উৎপাদনক্ষেত্র অর্থাৎ কলকারখানাতে নিযুক্ত উপকরণগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা যেন বাড়ে। করের বিষয়ে নানারূপ সুবিধাদান, মুনাফার পুনর্নিয়োগ করিলে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া, কর হার হ্রাস করা প্রভৃতি উপায়ে শিল্পোন্নয়ন উৎসাহ পায়। নূতন শেয়ারে টাকা খাটাইতে লোকে যাহাতে উৎসাহিত হয় সেইরূপ কর-কাঠামো গড়িয়া তোলা দরকার। উন্নয়নশীল দেশে ঋণ-নীতি এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ দেখা না দেয়। দ্রুত শিল্প প্রসারের যুগে বিনিয়োগ বাড়ে। লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী টাকার পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন তৎক্ষণাৎ বাড়ে না। তাই মুদ্রাস্ফীতির প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেয়। সংকোচনমূলক ঋণনীতি তাই গ্রহণ করা দরকার। তাই অল্প একটু মুদ্রাস্ফীতির আবহাওয়া জিয়াইয়া না রাখিলে বিনিয়োগের উপযুক্ত অনুকূল আবহাওয়া দেখা দেয় না। এই কারণে মৃদু বর্ধনশীল দামস্তর রক্ষা করার উপযোগী ঋণনীতি গ্রহণ করা হয়। লেনদেনের ব্যালান্স সংক্রান্ত নীতি কি হইবে তাহা অনেক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে। দেশটির রপ্তানি দ্রব্যসমূহের চাহিদা কিরূপ, আমদানি-সংকোচন কতটা সম্ভব, কোন্ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করিলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন কম বা বেশি, দেশটির বৈদেশিক

মুদ্রার ও সোনার মজুত তহবিল কতটা, প্রভৃতি অনেক বিষয় বিচার করিয়া লেনদেন ব্যালান্স সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করিতে হয়। শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে লেনদেন ব্যালান্সের উপর চাপ খুবই বেশি, এই সময় বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। যদি এই ঋণের সাহায্যে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠা হয় যাহাতে রপ্তানি-প্রসার বা আমদানি হ্রাস ঘটে, তবে সেই ঋণ পরিশোধ সহজ হইয়া উঠে। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রায় সকল অনুন্নত দেশই কেন্দ্রীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেবল মাত্র নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করাই পরিকল্পনা কমিশনের কাজ নয়। অর্থনীতির বিভিন্নক্ষেত্রের যথাযথ ভারসাম্য রক্ষিত হইল কি না, শিল্প প্রসারের গতিবেগ বা হার সঠিক হইল কি না, শিল্প প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকার নীতি রক্ষিত হইল কি না, জাতির স্বার্থে উপযুক্ত টেক্‌নিক নির্বাচন করা হইল কি না—সকল কিছুর দিকেই পরিকল্পনা কমিশন নজর রাখিবে।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল উন্নত দেশগুলির কার্যকলাপ। অনুন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের একটি প্রধান পথ হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের উপায়গুলি

এই পথেই বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়, বিদেশ হইতে মূলধন ও যন্ত্র দক্ষতা আনয়নের পথ প্রশস্ত হয়। উন্নত দেশগুলির কার্যকলাপে অনুন্নত দেশের রপ্তানি হইতে আয়ের পরিমাণ, বাণিজ্য হার, যন্ত্রপাতি পাওয়া, বাজার প্রসারিত হওয়া সকল কিছু নির্ভর করে। উন্নত দেশ হইতে যন্ত্রদক্ষ ও মূলধন সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলে শিল্পোন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। উন্নত দেশ হইতে মূলধন অনুন্নত দেশটিকে দুইভাবে সাহায্য করে। ইহার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় উপকরণগুলিকে কাজে লাগানো যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাব অনেকটা মেটে। উন্নত দেশ হইতে টেক্‌নিকাল সাহায্য অনুন্নত দেশের যন্ত্রদক্ষতার অভাব পূরণ করে। এই সাহায্য সম্পর্কে দুই প্রকার নীতি অবলম্বন করা যায়: যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক কিছুকালের জন্য ঋণ লওয়া এবং অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের উন্নত দেশে লইয়া গিয়া শিক্ষা দেওয়া।

অনুন্নত দেশগুলির শিল্প প্রসারে সাহায্য করার জন্য নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে মূলধন ঋণ দেয়, কেহ টেক্‌নিকাল সাহায্য দেয়, শিক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটে, উন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নের অভিজ্ঞতা হইতেও অনুন্নত দেশগুলি লাভবান

হয়। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেশন, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের একটি বিশেষ তহবিল—এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পোন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো : মিশ্র অর্থনীতি (Industralisation and the State structure : The Mixed Economy) : আজকাল পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র নিজের দেশে মিশ্র অর্থনীতি গড়িয়া তোলার কথা বলিতেছেন। ভারতের শিল্পনীতির লক্ষ্যও তাই। মিশ্র অর্থনীতি কাহাকে বলে ?

শিল্পোন্নয়নের দুই পথ : ধনতান্ত্রিক ও অধনতান্ত্রিক

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া একদল পুঁজির মালিক বা ধনীশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল যাহারা দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয়ের পর তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া নিত্য নূতন টেক্‌নোলজির উদ্ভব করিয়াছেন, শ্রমিক ও উপকরণসমূহ একত্র করিয়া বিরাট যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিয়াছেন। মূলধন খাটাইয়া শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমাগত উন্নত করিয়া, বিপুল পরিমাণ মুনাফা করিয়া আরও মূলধন বাড়ানো—ইহাই সেই সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের রূপ। এই সকল দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রের আইনকানুন এমনভাবে রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে মূলধনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয়। মূলধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিলে উহা দ্রুত বাড়িবে, কারণ সকল পুঁজিপতিই প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার জন্য পুঁজির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিবে, এই ছিল তদানীন্তন রাষ্ট্রের আদর্শ। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজে হস্তক্ষেপ করিবে না। অবাধ প্রতিযোগিতার (Lassez faire) খেলায় রাষ্ট্র নিজে খেলিবে না, শুধু দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিবে।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা আর এক রূপ শিল্পোন্নয়নের দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে সেখানকার পুঁজির মালিকরা সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটাইতে পারিতেছিল না। দেশে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের বেগ তীব্র ছিল না। উপনিবেশ লুট করিতে পারে নাই; রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতে পারে নাই; বর্ণ জাতি ও গোষ্ঠীর বন্ধন ভাঙাইয়া 'স্বাধীন" মজুর শ্রেণী গড়িতে

পারে নাই, হয়তো বা আবহাওয়া, জলবায়ু বা প্রাচীন সংস্কৃতিময় ঐতিহ্যের প্রভাবে শ্রমিক-শোষণ ও মূলধন-গঠনের মানসিকতা অর্জন করিতে পারে নাই। কৃষি-প্রধান দেশরূপে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর দিন কাটাইতেছিল। বিদেশী পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে কয়েকটি কলকারখানা দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের মুনাফা তাহারা নিজ দেশেই পাঠাইয়া দিত, অনুন্নত সেই দেশটির মূলধন-গঠনে বিনিয়োগ করিত না। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি ছোট ছোট এবং সম্ভাব্য পুঁজির মালিকদের হাতে না আসিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজিতন্ত্রের বিরোধী কোনো শ্রেণীর হাতে আসে তবে সেই সকল দেশে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়ন না হইয়া রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অ-ধনতান্ত্রিক পথে (Non-capitalist path) শিল্পোন্নয়ন ঘটে। এইরূপ অধনতান্ত্রিক পথে শিল্পোন্নয়নের পরবর্তী স্তরের একটি বিশিষ্ট রূপ সমাজতন্ত্র। এই পথে ক্রমশ উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না, কৃষি ও শিল্প সকলক্ষেত্রেই সরকারী মালিকানা বা সরকারীক্ষেত্র প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেন, কোথা হইতে প্রাথমিক মূলধন পাওয়া যাইবে, কোন্ কোন্ শিল্প কখন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, দেশে মজুরির হার বা ভোগের স্তর কত থাকিবে অর্থাৎ মূলধন সঞ্চয়ের গতিবেগ কতটা হইবে, উন্নয়নের হার কিরূপ হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা হিসাবে আনিয়া অতি দ্রুত দারিদ্র্য দূর করিয়া দেশের সকল শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান একযোগে উন্নত করা যাইবে।

শিল্পোন্নয়নের ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পথ দুইটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ নবজাগ্রত সকল অনুন্নত দেশই কোন না কোন দিক বাছিয়া লইতেছে। ভারত যখন স্বাধীন হইল তখন কিন্তু তাহার অবস্থা একেবারে অনুন্নত নয়। আমাদের দেশে বৃটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশ কম ছিল না, তাহাদের নেতৃত্বে আমাদের দেশেও একদল পুঁজির মালিকশ্রেণী বর্তমান ছিল। আমাদের শাসনকাঠামো ও ব্যক্তিগত মালিকানা সংক্রান্ত আইনকানুন ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ডের নেতৃত্বে গড়িয়া উঠায় আমাদের দেশে স্বাধীনতার পূর্বেই সীমাবদ্ধ ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী শাসকশ্রেণী নিজেরা পুঁজিপতি না-হইলেও এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো বজায় রাখিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণ ধনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন না, আবার পৃথিবীর অপর কয়েকটি দেশের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক

ভারতে কেন এই দুই-এর মিশ্রণ ঘটিতেছে

কাঠামো তৈয়ার করিতেও সক্ষম হইলেন না। এই অবস্থায় তাঁহারা ভারতে যে নূতন অর্থ নৈতিক কাঠামো ঘোষণা করিলেন উহার নাম মিশ্র অর্থনীতি।

ভারত সরকার মনে করিলেন যে, ভারতের পুঁজিপতিরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটাইতে পারিবে না, এবং পারিলেও ইহাতে শোষণ, আয়-বৈষম্য এবং সামাজিক অবিচার বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে ভারতের ন্যায় দেশে এখনই দ্রুতবেগে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বর্তমানের উৎপাদন-ব্যবস্থা হঠাৎ একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে, দেশে অর্থ নৈতিক বিশৃংখলা দেখা দিবে। তাঁহারা ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা বজায় রাখিলেন যাহাতে উৎপাদন হইতে ব্যক্তিগত পুঁজি অপসারিত না হয় এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শিল্পনীতি রচিত হইল।* এই শিল্পনীতির লক্ষ্য হইল ব্যক্তিক্ষেত্র ও সরকারীক্ষেত্রের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, উভয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিভাগের কথা এই শিল্পনীতিতে গৃহীত হইল না। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলা চলে, "the private and the public sector cannot be looked upon as anything like two separate entities ; they are and must function as parts of a single organism."

মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর নীতি হইল অবাধ ব্যক্তি উদ্যোগ এবং পূর্ণ রাষ্ট্র উদ্যোগ উভয়ের দোষত্রুটি পরিহার করিয়া এবং উভয়ের গুণগুলিকে যতটা সম্ভব রক্ষা করিয়া দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটানো। ইহা ব্যক্তিপ্রধান ধনতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী এক ব্যবস্থা, উভয়ের মিশ্রিত এক অর্থ নৈতিক

* প্রথম পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন "the concept of private enterprise, as, indeed, of private property, is undergoing rapid change and the view that private enterprise can function only on the basis of unregulated profits is already an anachronism." পৃথিবীর অনেক দেশেই ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ শোষণ আর সম্ভব হয় না, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে কাজ করিতে হয়। এইরূপ রাষ্ট্রকে আজকাল কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare State) বলে। ইহার কারণ হইল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার। গণতন্ত্রের প্রসারের দরুন মূলধনের মালিকশ্রেণী এককভাবে ঐ সকল রাষ্ট্রে আর ক্ষমতা রাখিতে পারিতেছে না, ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর সহিত তাহাকে ক্ষমতা ভাগ করিয়া লইতে হইতেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও মিশ্র অর্থনীতি ভবিষ্যতে কি রূপ লইবে তাহা নির্ভর করে শাসক শ্রেণীর মধ্যে নীতি-নির্ধারণের কার্যকরী ক্ষমতা কাহার হাতে থাকে—সম্পত্তির মালিকশ্রেণী অথবা নিছক বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও ভূমিহীন চাষী, তাহার উপর।

কাঠামো। ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের দোষত্রুটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিয়া উহাকে সরকারী উদ্যোগের সাহায্যকারী এবং পরিপূরক বলিয়া গণ্য করা ইহার অন্যতম মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী।

মিশ্র অর্থনীতির বিশ্লেষণ

আবার অর্থনৈতিক দেহের কোন কোন অংশে ব্যক্তি-উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে সরকারী-উদ্যোগ কাজ করিবে। মিশ্র অর্থনীতিতে উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবাধ শোষণ-লীলা নিশ্চয় চলিবে না, ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগগুলির সমাজকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থাকিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পথে সমাজের স্বার্থে যদি এই ব্যক্তিউদ্যোগগুলি পরিচালিত হয় এবং কমিশন নির্দিষ্ট ন্যায়সঙ্গত মুনাফার হার পাইতে থাকে, তবে এমন কি ইহাদের প্রসারের জন্য উৎসাহ দেওয়াও হয়। ব্যক্তিউদ্যোগকে উৎসাহ দিবার কারণ, প্রথমত, দেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মোট মূলধনের অভাব এবং দ্বিতীয়ত, এখনও সরকারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা ব্যক্তিগত উদ্যোগ দক্ষতর। একই সঙ্গে সরকারী ক্ষেত্রের দ্রুত প্রসারও বিশেষ বাঞ্ছনীয়ঃ "it has not only to initiate development which the private sector is either unwilling or unable to undertake. it has to play the dominant role in shaping the entire pattern of investments in the economy, whether it makes the investments directly or whether these are made by the private sector." মিশ্র অর্থনীতি তাই পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের নেতৃত্বে। ইহাতে পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় না বটে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়িয়া উঠে যে-সমাজে "private enterprise, free pricing, private management are all devices to further what are truly social ends."

ব্যক্তিক্ষেত্র ও সরকারী ক্ষেত্র পরস্পরের পরিপূরক হইবে—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে মিশ্র অর্থনীতি সম্পর্কে চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বেশির ভাগ অর্থনীতিবিদ্‌ই মনে করেন যে, এইরূপ পরিপূরকতা (complementarity) সম্ভব নয়। এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে বিরোধ থাকাই স্বাভাবিক, কারণ ব্যক্তিক্ষেত্রে

কেন মিশ্র অর্থনীতিতে উন্নয়ন দ্রুত হয় না

পুঁজির মালিকদের প্রধান প্রেরণা-শক্তি প্রচুর মুনাফা করা, সেই মুনাফার পুনর্নিয়োগ, আরও অধিক মুনাফা করা—এইরূপে নিজের হাতে মূলধন সঞ্চয়ের গতিবেগ বাড়াইয়া চলা। অপরপক্ষে সরকারী ক্ষেত্রের প্রেরণাশক্তি ক্রমাগত

উৎপাদন বাড়ানো, মূলধনের পরিমাণ নয়। ব্যক্তিক্ষেত্র শ্রমিক-শোষণের মাত্রা বাড়াইয়া মুনাফা বাড়াইবে, সরকারী ক্ষেত্র শ্রমিক শোষণের মাত্রা কমাইয়া উৎপাদন বাড়াইবে। সরকার মুনাফা অর্থাৎ শোষণের মাত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিলে ব্যক্তিক্ষেত্রের শিল্প প্রসারের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছাড়াও আর একটি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। উভয় ক্ষেত্রই কাজ করে জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র দেহের মধ্যে, দেহের এক অংশ অপর অংশের সহিত বিরোধিতা শুরু করিলে সমগ্র দেহটির স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও মূলধন সঞ্চয়ের দুই বিরোধী নিয়মের মধ্যে যে সংঘাত দেখা দেয়, তাহাতে পরিকল্পনা কমিশনের কাজ ব্যাহত হয়, লক্ষ্যগুলি পূরণ হয় না, শিল্পোন্নয়নের বেগ হ্রাস পায়। মূলধন-পিয়াসী ব্যক্তিক্ষেত্রের উদ্যোক্তারা কিছুদিন পরে নিজেদের ক্ষেত্রে ঠাঁই না পাইয়া মুনাফা ও মূলধন-সঞ্চয়ের লোভে সরকারী ক্ষেত্রে হাত বাড়াইবে। ব্যক্তিক্ষেত্রের বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী বা মালিক-গোষ্ঠী সরকারের মধ্যে অনুপ্রবেশের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকিবে ফলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব দুর্বল হইয়া পড়িবে, দেশে প্রথমে স্বৈরতন্ত্র ও ক্রমে ধনতন্ত্র স্বয়ংপ্রভাবী হইয়া উঠিবে। একমাত্র একটি অবস্থা দেখা দিলে মিশ্র অর্থনীতি দীর্ঘকাল চলিতে পারে। যদি শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর সমাজতান্ত্রিক অংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং ব্যক্তিক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলেই এই মিশ্র অর্থনীতি বহুদিন বজায় থাকে এবং অবশেষে সরকারী ক্ষেত্রের আরও দ্রুত প্রসারের প্রভাবে ক্রমে পূর্ণ সমাজতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে।

ভারত সরকারের শিল্পনীতি (Industrial policy of the Government of India):

স্বাধীনতা পাইবার বহু পূর্ব হইতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল ভারতে দ্রুত শিল্পপ্রসার এবং ইহার জন্য সমগ্র শিল্পক্ষেত্র জাতীয়করণ করা। দেশের সমস্ত কলকারখানা, খনি, পরিবহন, ব্যবসায় ও বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় অধীনে আনা না হইলে বা জাতীয়করণ করা না হইলে ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে দ্রুত শিল্পপ্রসার ঘটিতে পারে না। বেসরকারী মালিকানায় ততটা দ্রুত প্রসার হয় না, শিল্পায়নের সামাজিক ব্যয়ভার (বেকারি, বস্তি, বাণিজ্যচক্র) খুবই বেশি হয় ব্যক্তিগতভাবে মালিক মুনাফা আত্মসাৎ করে। আয়বৈষম্য

স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয়করণের স্বপক্ষে

বৃদ্ধি পায়, দেশের জনসাধারণ পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল লাভ করিতে পারে না, কাজে উৎসাহ পায় না। ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ সর্বাধিক মুনাফা পাইবার আশায় শিল্প স্থাপন করেন, দেশের সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থ বিচার করে না। যতটা দ্রুত ও যে সকল শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া দরকার তাহা কার্যকরী করিতে হইলে সরকারী মালিকানা ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোই প্রয়োজন।

স্বাধীনতা লাভ করার পরে ভারত সরকার বিদেশী বা দেশীয় বেসরকারী শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করিলেন না। তাঁহাদের মতে ভারতে মূলধনের অভাব, তাই ক্ষতিপূরণ দিয়া পুরানো প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ না করিয়া সীমাবদ্ধ মূলধন লইয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নূতন শিল্প স্থাপন করা দরকার। তাহা ছাড়া, ভারতের দক্ষ উদ্যোক্তা বা সংগঠক শ্রেণীর অভাব, সুতরাং যাঁহারা শিল্প পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের অপসারণ না করাই বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি চলিতেছিল, জাতীয়করণ করা হইলে উৎপাদন সহসা হ্রাস পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি বাড়াইয়া দিবে, এরূপও বলা হইয়াছিল। সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না, ভারতীয় সংবিধানে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া পূর্ণ জাতীয়করণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষিত হইল।

স্বাধীনতার পরে জাতীয়-করণের বিপক্ষে

১৯৪৮ সালের ঘোষণা:

১৯৪৮ সালের ঘোষিত শিল্পনীতিতে পূর্ণ জাতীয়করণের নীতি অগ্রাহ্য করিয়া ভারতে মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার নীতি ঘোষণা করা হইল। শিল্পগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হইল। (ক) পূর্ণ সরকারী একচেটিয়া ক্ষেত্র (Exclusive Government Monopoly)। যেমন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ আণবিক শক্তি উৎপাদন, রেলপথ প্রভৃতি। (খ) সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র (Government controlled sphere), এই ক্ষেত্রে নূতন শিল্প একমাত্র সরকারী মালিকানায় স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে পারিবে, কিন্তু পুরানো বেসরকারী মালিকানার শিল্পগুলি ১০ বৎসর চলিতে পারিবে, যেমন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, বিমানপোত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি। (গ) বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত সরকারী নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র (Private industries subject to

ভারতের প্রথম শিল্পনীতি

State regulation & Control), যেমন, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, চিনি, বস্ত্র, সিমেণ্ট, কাগজ, লবণ, মেশিনটুল প্রভৃতি। (ঘ) দেশের সাধারণ সরকারী নীতি অনুযায়ী পরিচালিত বেসরকারী ক্ষেত্র (Sphere of Private enterprise under the general control of the state)।

এই ঘোষণাতে আরও বলা হইয়াছিল যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে বৃহৎশিল্পের পরিপূরক হিসাবে উন্নত করা হইবে। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার নীতি গৃহীত হইবে। ক্রেতা, উৎপাদক ও জাতীয় স্বার্থের উপযোগী নূতন শুল্কনীতি রচিত হইবে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযোগী এবং সম্পদ-বৈষম্য কমাইবার উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থার সংশোধন করা হইবে। দুই একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম সহ্য করিয়া কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের প্রধান অংশ ভারতীয়দের হাতে রাখিয়া বিদেশী মূলধন দেশে আসিতে পারিবে।

এই নীতি বহুলাংশে কার্যকরী করা হইয়াছে এবং কার্যকরী করার সময় সরকার নিজের ক্ষেত্র বাস্তবে অনেক বেশি প্রসার করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প বিমান পরিবহন জাতীয়করণ হইয়াছে, ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং ১৯৫৬ সালে জীবন বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের নীতির সংকীর্ণতা ভাঙিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য দেশের প্রধান শিল্পগুলির (যেমন, কয়লা) ক্ষেত্রে জাতীয়করণের এই উৎসাহ বিশেষ দেখা যায় নাই। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র ও সরকারের নিকট প্রভূত সুবিধা ও ব্যাপকতর স্থান আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে বহু কর তুলিয়া বা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, জুলাইতে শিল্পপুঁজি প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation) স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে নূতন শুল্ক কমিশন গঠিত হইয়াছে। ইহাদের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে স্থায়ী ধরনের ভারতীয় ট্যারিফ কমিশন স্থাপিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কয়েকটি শিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং বেসরকারী মালিকদের সুবিধার্থে ১২টি জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও জলসেচের উপর জোর দিলেও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পপ্রসারের জন্য প্রচেষ্টা হইয়াছে। বিদেশী মূলধন ও যন্ত্রবিদ্যা আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে।

নীতির বাস্তব প্রকাশ

বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসাবে ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন

ও নিযন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হইযাছিল (Industries, Development and Regulation Act, 1951)। এই আইনে বর্তমানেব চলতি শিল্পগুলিকে বেজিস্ট্রি কবাইবাব এবং নূতন শিল্প স্থাপন কবিতে হইলে লাইসেন্স গ্রহণেব ব্যবস্থা কবা হইযাছিল। উহাব আভ্যন্তবীণ বিষয উপযুক্তভাবে পবিচালিত না হইলে যে কোন শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান কবিবাব ক্ষমতা, এবং প্রযোজন মনে কবিলে উহা সবকাবেব হাতে তুলিযা লওযাব ক্ষমতা এই আইনে উল্লিখিত ছিল। শিল্পেব জন্য একটি কেন্দ্রীয উপদেষ্টা কাউন্সিল (Central Advisory Council) স্থাপনেব কথা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি শিল্পেব জন্য একটি উন্নযন কাউন্সিল (Development Council) স্থাপনেব কথা ঘোষিত হইযাছিল। ১৯৫৩ সালেব মে মাসে এই আইনেব কার্যপবিধি বাড়াইবাব জন্য ইহাব সংশোধন কবা হয। প্রথমে এই আইনেব কার্যক্ষেত্র ৩৭টি শিল্পেব উপব প্রসাবিত ছিল, ১৯৫৩ সালেব অক্টোবব হইতে ৯৫টি শিল্প এই আইনেব পবিধিভুক্ত হয।

নীতি কার্যকরী করার উপায়

এই আইন অনুযাযী কেন্দ্রীয উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত হইযাছে, লাইসেন্সিং কমিটি স্থাপিত হইযাছে, কযেকটি শিল্পেব জন্য (ভাবী বাসাযনিক, সাব, চিনি, বাইসাইকেল ইত্যাদি প্রভৃতি) উন্নযন কাউন্সিল স্থাপিত হইযাছে। তাহা ছাড়া বেসবকাবি ক্ষেত্রেব সুবিধার্থে বহু পুঁজি সাহায্য কাবী নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইযাছে। ক্রমেই বাষ্ট্র দ্রুত শিল্পপ্রসাবে সক্রিয অংশ গ্রহণ কবিতে শুরু কবিযাছে। দ্বিতীয ও তৃতীয পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায বাষ্ট্র ব্যাপক শিল্পপ্রসাবেব দাযিত্ব লইয়াছে।

অন্যান্য দিকে রাষ্ট্রীয় কার্যতৎপরতা

১৯৫৬ সালের নূতন শিল্পনীতি (New Industrial Policy, 1956) :

১৯৪৮ সালেব ঘোষণাব পবে ৮ বৎসব ভাবতে বহু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক পবিবর্তন হইযাছে, যেমন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব কাজ শেষ হইযাছে, বাষ্ট্র ও পবিকল্পনা কমিশন বহু বিষযে অভিজ্ঞ হইযা উঠিযাছে। ১৯৫৪ সালেব ডিসেম্বরে ভাবতেব পার্লামেণ্ট সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেব বাষ্ট্র গঠন কবাব নীতি গ্রহণ কবিযাছে। এই নীতি কার্যকবী করিতে হইলে দ্রুত শিল্পপ্রসাব, বাষ্ট্রীয ক্ষেত্রেব প্রসাব, বেসবকাবী ক্ষেত্রকে

নূতন শিল্প-নীতির প্রয়োজনীয়তা : দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভিত্তি

আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা, সমবায় ক্ষেত্রের প্রসার করা, সম্পদ ও আয়বৈষম্য হ্রাস করা, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাত হইতে অর্থ নৈতিক শক্তি সরাইয়া আনা—প্রভৃতি কাজ করা দরকার। রাষ্ট্রের অধিক পরিমাণে শিল্পপ্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার। এই সকল প্রয়োজনের চাপে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরুর পূর্বে উহার উপযোগী নূতন শিল্পনীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল।

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয় এবং এই ঘোষণাতে কাহারা শিল্পোন্নয়ন ঘটাইবে সেই অনুযায়ী শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে পুনর্বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে রাখা হয় ১৭টি শিল্প, যেমন লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তৈল, আণবিক শক্তি, কতিপয় পরিবহন প্রভৃতি।* এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কাজ 'সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব" ("exclusive responsibility of the state")। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প রাখা হইয়াছে† যেমন মেশিনটুল অ্যালুমিনিয়াম, অ্যান্টিবায়োটিক, সার ... ও

* In Schedule A are included (1) Arms & ammunitions and allied items of defence equipment, (2) Atomic energy, (3) Iron & steel, (4) Heavy Castings and forgings of Iron Steel, (5) Heavy plant and machinery required for Iron steel production, for mining, for machine tool manufacture and for such and other basic industries as may be specified by the Central government, (6) Heavy electrical plant including large hydraulic and steam turbine; (7) Coal and lignite, (8) Mineral oils, (9) Mining and iron ore, manganese ore, chrome ore, gypsum, sulphur, gold and diamond (10) Mining and processing of copper, lead, zinc, tin, molybdenum and wolfrom, (11) Minerals specified in the schedule to the Atomic Energy (Control of production and use) order 1953, (12) Aircraft, (13) Air Transport, (14) Railway transport, (15) Ship Building, (16) Telephones and telephone cables, telegraph and wireless apparatus (excluding radio receiving sets), and (17) Generation and distribution of electricity.

† In Schedule B are included, (1) All other minerals except 'minor minerals' as defind in Section of the minera's concession Rules, 1949, (2) Aluminium and other non-ferrous meta's not included in Schedule 'A', (3) Machine tools, (4) Ferro-alloys and tool steels, (5) Basic and intermediate products required by chemical industries such as the manufacture of drugs, dye staff and plastics; (6) Antibiotics and other essential drugs; (7) Fertilizers, (8) Synthetic rubber; (9) Carbonisation of coal; (10) Chemical pulp, (11) Road Transport, and (12) Sea Transport.

সামুদ্রিক পরিবহন প্রভৃতি। এই সকল শিল্পক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী মালিকানা পাশাপাশি চলিবে, কিন্তু ক্রমশ রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রসার হইবে এবং ফলে রাষ্ট্র সাধারণভাবে নূতন শিল্প স্থাপনে অগ্রসর হইতে থাকিবে ("which will be progressively state-owned and in which the state will therefore generally take the initiative in establishing new undertaking")। তৃতীয় শ্রেণীতে অবশিষ্ট সকল শিল্প রাখা হইয়াছে, যেমন বস্ত্র, সিমেণ্ট, চিনি, প্রভৃতি। এই অংশে "ভবিষ্যৎ উন্নতি, সাধারণভাবে, ব্যক্তিক্ষেত্রের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে" ("future development will, in general, be left to the initiative and enterprise of the private sector")। কিন্তু রাষ্ট্রের নূতন শিল্প স্থাপনের অধিকার থাকিবে।

শিল্পক্ষেত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

১৯৪৮ সালে শিল্পনীতির সহিত তুলনা করিলে ১৯৫৬ সালের এই নূতন শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হইবে। (ক) পুরাতন শিল্পনীতির তুলনায় এই শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরিধি অধিকতর প্রসারিত করা হইয়াছে, এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলার নীতি অনুযায়ী ইহা ঠিকই হইয়াছে। (খ) ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, বর্তমানের চলতি ব্যক্তিক্ষেত্রের কোন শিল্পকে ১০ বৎসরের পূর্বে জাতীয়করণ করা হইবে না এবং চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পে রাষ্ট্র তখনই হস্তক্ষেপ করিবে যখন তাহা উপযুক্তভাবে চলিতেছে না। কিন্তু নূতন শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রের হাতে অধিকতর ক্ষমতা গ্রহণ করা হইয়াছে, বেসরকারী শিল্প হাতে তুলিয়া লওয়ার পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। (গ) নূতন শিল্পনীতির আরও বৈশিষ্ট্য হইল ইহা অনেকাংশে নমনীয়; এই সকল শ্রেণীবিভাগ সর্বদা-নির্দিষ্ট, অনমনীয় বিভাগীকরণ নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পার্থক্য দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। দেশে ধনবৈষম্য দূর করার কথা ঘোষিত হইয়াছে। কুটিরশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং সমবায়ী কৃষি ও সমবায়ী শিল্পের দিকে অধিকতর নজর দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। শ্রমিকদের অবস্থায় উন্নতি এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। শিল্পে শান্তি বজায় রাখার নীতি এবং বৈদেশিক

পুরাতনের তুলনায় নূতন শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্য

মূলধনকে অবৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া উৎসাহ দেওয়ার নীতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, "The expansion of industry will continue to be governed by the Industrial Policy Resolution of April, 1956." দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতই সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রকে পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া গণ্য করা হইবে। যেমন নাইট্রোজেনযুক্ত সারের ক্ষেত্রে এতদিন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনাতে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদেরও এই শিল্পে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। কাঁচালোহার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপনের সুবিধা দেওয়া হইবে। ইহারই পাশাপাশি বলা হইয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ সফল করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিক্ষেত্রে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া অবস্থা যাহাতে গড়িয়া না উঠে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। সর্বোপরি, প্রথম শিল্পনীতিতে যে আঞ্চলিক শিল্পোন্নয়নের ভারসাম্যের (Balanced Regional Development) কথা বলা হইয়াছিল, ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাতে শিল্পনীতির এই অংশ কার্যকরী করার দিকে জোর দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী এই শিল্প-নীতিকে অনুসরণ করিয়াছে

সমালোচনা (Criticisms) :

ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কাঠামো কিরূপ হইবে এই সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য থাকায় এই শিল্পনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত সমালোচনা দেখা যাইতেছে। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিক্ষেত্রের স্থান প্রধান, ইহার প্রসারই বাঞ্ছনীয়, রাষ্ট্রের কাজ হইল কর, শুল্ক, পরিবহন, অর্থ সাহায্য-নীতি সকল কিছুকে বেসরকারী শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা—ভারতের ব্যক্তিক্ষেত্রের একচেটিয়া শিল্পপতিগণ, ঋণদানকারী পশ্চিমী সরকারসমূহ এবং বহু দেশী-বিদেশী ধনবিজ্ঞানী এই মত সমর্থন করেন। তাঁহারা তাই বর্তমান শিল্প-নীতিতে সুখী হন নাই। তাঁহাদের মতে (ক) বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হইয়াছে। ইহা বহুদেশে এবং এই দেশেও বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যক্তিক্ষেত্রের শিল্পগুলিতে দ্রুত উন্নতি

পূর্ণধনতন্ত্রের সমর্থকদের সমালোচনা

ঘটে, ইহাবা স্থপবিচালিত এবং এখানে অপব্যয় কম। স্থতবাং এই শিল্পনীতি ব্যক্তিক্ষেত্র সীমাবদ্ধ কবিয়া শিল্পায়নেব হাব কমাইয়া দিবে। (খ) জাতীয়কবণেব অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত থাকিলে বেসবকাবী শিল্পপ্রসাবেব উপযুক্ত অর্থনৈতিক পবিবেশ (ecónomic climate) স্থষ্টি হয়। বেসবকাবী শিল্পপতিদেব মনে ভয় সন্দেহ অবিশ্বাস ও নিবাশা স্থষ্টি হইয়াছে। (গ) বাষ্ট্রীয় শিল্প পবিচালনাব উপযুক্ত যন্ত্রকুশলী পবিচালক ও শ্রমিক মলধন সবকিছুব অভাব থাকায় বাষ্ট্রীয ক্ষেত্র দ্রুত প্রসাবিত হইতে পাবিবে না, অথচ ব্যক্তিক্ষেত্রে শিল্পস্থাপনেব স্থবিধা নাই ফলে দেশে শিল্পসম্প্রসাবণেব গতি ব্যাহত হইবে। বিশ্বব্যাঙ্কেব প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউজিন ব্ল্যাক বলিয়াছেন যে, 'this policy, if rigidly applied, could only result in imposing heavy additional burdens on the already over strained financial and administrative resources of the public sector and in restricting the rate of development in these vitally important fields.'

উপবেব অধিকাংশ সমালোচনাব উৎসই এই পবিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে বাষ্ট্রেব ভূমিকা বুঝিতে না পাবা। পবিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপই অনিশ্চিত সম্ভাবনাব উপব ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। সবকাবী ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসাবিত হইবে এই নীতিব তাৎপর্য ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিক্ষেত্রেব সম্প্রসাবণ হইবে না এমন কিছু বলা হয় নাই। কথা হইল ব্যক্তিক্ষেত্রেব ভবিষ্যৎ নির্ভব কবিবে তাহাদেব আচবণেব উপব। যদি তাঁহাবা সঠিক পথে অগ্রসব হন এবং জাতীয় পবিকল্পনাব লক্ষ্য পূবণে যোগ্য অংশীদাব হন তবে ভবিষ্যতে তাহাদেব ক্ষেত্র নিশ্চয়ই প্রসাবিত হওয়াব সম্ভাবনা। এই নূতন শিল্পনীতি বেসবকাবি ক্ষেত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছে বটে কিন্তু উহাব নিয়ন্ত্রণেব বাস্তব প্রয়োজনও স্বীকাব কবিয়াছে। অনেক পণ্ডিত তাই এই শিল্পনীতিকে আমাদেব 'অর্থনৈতিক সংবিধান' (Economic Constitution) বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রে বেসবকাবী ক্ষেত্রকে বাঁচিয়া থাকাব স্থযোগ দিয়া এই নীতি সমাজতন্ত্রেব নূতন, বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য রূপ উদ্ভাবনেব চেষ্টা কবিয়াছে।

যাঁহাবা মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিতান্ত অস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা এবং পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে পৌঁছিবাব পথে একটি স্তব মাত্র বলিয়া

মনে করেন তাঁহারাও এই শিল্পনীতিকে সাদর আহ্বান জানাইতে পারেন নাই। (ক) ১৯৪৮ সালের তুলনায় রাষ্ট্রক্ষেত্রের প্রসারের সম্ভাবনা বাড়িলেও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে আর বেসরকারী মালিকানায় না রাখিয়া কবে জাতীয়করণ করা হইবে, সেইরূপ নির্দিষ্ট তারিখের লক্ষ্য কিছু রাখা হয় নাই। (খ) তাহা ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলার একটি দিক হইল কলকারখানা, উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতির উপর হইতে বেসরকারী মালিকানা ও কর্তৃত্ব অপসারণ করা। বেসরকারী মালিকানা ক্ষেত্রকে ক্রমে ক্রমে সংকুচিত করিয়া অবশেষে বিলোপ করার সুস্পষ্ট কোন নীতি গৃহীত হয় নাই। চীন দেশে এই নীতি গ্রহণ করিয়া প্রতিটি বেসরকারী শিল্পকে সরকারী অংশীদারত্ব (joint partnership with the State) গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। (গ) উপরন্তু, নূতন শিল্পনীতির নমনীয় করিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক রাখিয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ও মৌলিক অংশেও বেসরকারী মালিকানা প্রসারের সুযোগ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।* আরও বলা চলে যে, ভারতীয় শিল্পে যে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ একচেটিয়া সংগঠন দেখা দিয়াছে, সেই একচেটিয়া মালিকদের উৎপাদন-ক্ষেত্রে অপর কোন প্রতিযোগী শিল্পপতির প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া রাষ্ট্রের শক্তি সেই একচেটিয়া মালিকানা রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। কেবলমাত্র বর্তমানের বেসরকারী ভারী ও মূল শিল্পগুলিই প্রসারিত হইতে পারিবে, কারণ এই নীতিতে "নিজস্ব প্রয়োজন ও উপজাত দ্রব্য উৎপাদনে" প্রসার লাভ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ('for meeting their won requirements or as by-products")। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইহা পুরাতন শিল্পের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। (ঘ) এই শিল্প-নীতিতে শিল্পে শান্তি রক্ষা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের কথা বলা হইয়াছে বটে,

পূর্ণ সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের সমালোচনা

ইহা বর্তমানের একচেটিয়া রক্ষা করিতেছে

* "The division of industries into separate categories does not simply that they are being placed in watertight compartments. In appropriate cases privately-owned units may be permitted to produce an item falling within schedule A (i.e. industries reserved exclusively for the State) for meeting their own requirements or as by products."

কিন্তু তাহা বাধ্যতামূলক ও কার্যকরী করিয়া তোলার কোনরূপ নীতি ঘোষিত হয় নাই বা ব্যবস্থা করা হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে উৎপাদনের পরিমাণ গতি, সংগঠন ও পরিচালনার ভার অনেকাংশে শ্রমিকদের উপর ন্যস্ত হয়। জাতীয় পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শ্রমিকেরা নিজেরা মিলিতভাবে উৎপাদনের পরিকল্পনা করে, উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যয় কম রাখিবার জন্য মাথাপিছু উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়াইয়া তোলে, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের আয়, জীবনযাত্রার মান, উৎসাহ ও কর্মকুশলতা বাড়িতে থাকে। কেবলমাত্র জাতীয়করণের বাহ্য রূপ (form) গ্রহণ করিয়া উহার মূল বিষয় বস্তু (content) বাদ দিলে উহা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে (State-capitalism) পরিণত হয়। জাতীয়করণ হইল প্রথম ধাপ. ইহার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা দূর হইল, সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের হাতে এই মালিকানা আসিল। কিন্তু ঠিক একই সঙ্গে উহার পরবর্তী ধাপ হইল শ্রমিকদের সম্মিলিত শক্তির উপর উৎপাদন পরিকল্পনা ও উহা কার্যকরী করার মত সংগঠন গড়িয়া তোলার ভার ছাড়িয়া দেওয়া। তাহা না হইলে জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সফল হয় না, উহার বিকৃতি ঘটে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ও মনোবল দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। আমলাতান্ত্রিক শিল্পসংগঠন আর সমাজতান্ত্রিক শিল্পসংগঠন এক জিনিস নহে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির বাস্তব প্রয়োগে তাই ভারতবর্ষ প্রকৃত সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবে না, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ও ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র উভয়ের মিলিত বিকাশ ঘটিতে থাকিবে।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের নীতি ঘোষণা করিতেছে

রাষ্ট্রক্ষেত্র বনাম ব্যক্তিক্ষেত্র: উহাদের তুলনামূলক ভূমিকা: কেন রাষ্ট্রক্ষেত্রের আরও প্রসার দরকার: (Public sector versus Private sector: their respective roles: why public sector should expand more):

প্রথম পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পূর্বে ১৯৪৮ সালে ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই নীতিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর লক্ষ্য হিসাবে ভারত সরকার মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র শিল্পপ্রসারের দিঙ্‌নির্ণয় নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন রচনা করেন। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে মাত্র ৩টি শিল্পকে সরকারী একচেটিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং অল্প কিছু

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া অবশিষ্ট সকল শিল্পকেই মোটামুটি বেসরকারী মালিকদের চারণ-ক্ষেত্র হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। প্রথম পরিকল্পনায় গুরুত্ব ছিল কৃষির উপর, শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা ছিল নিতান্ত সীমিত, উহার দায়িত্বও ছিল বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর। ব্যক্তিক্ষেত্র সঙ্কোচনের কোন কথা উঠে নাই, ব্যক্তিক্ষেত্রের মুখপাত্রগণও শিল্পনীতি ও মিশ্র কাঠামো সন্তোষজনক চিত্তে মানিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বে অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কাঠামো। ১৯৫৬ সালে নূতন শিল্পনীতি রচিত হয়, পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টার গুরুত্ব বাড়ে। উহার পর হইতে ব্যক্তিক্ষেত্রের মুখপাত্রগণ আর নীরব নাই, তাঁহারা এই শিল্পনীতির প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নামিয়াছেন এবং সরকারীক্ষেত্রকে অযোগ্য প্রমাণের প্রচেষ্টা করিতেছেন।

সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিক্ষেত্র প্রসারের পক্ষে যুক্তি-সমূহ আলোচনা করা যাউক। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার গণতন্ত্রের কবর রচনা করিবে। গণতন্ত্রের মূল কথা ব্যক্তির স্বাধীনতা, তাহার অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির স্বাধীনতা কমাইয়া দিবে, তাহার উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অর্থ নৈতিক দক্ষতা হ্রাস করিয়া দিবে। শ্রমিক ও পরিচালকেরা রুটিন-বাঁধা কাজে আবদ্ধ হইয়া সৃজনীশক্তি হারাইয়া ফেলিবে। অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় ক্রেতার পছন্দই সর্বেসর্বা, সেই পছন্দ অনুযায়ী তাহারা দাম দেয়, দাম অনুযায়ী উৎপাদকেরা উৎপাদন করে, প্রতিযোগিতার ফলে দক্ষতা বাড়ে, উপকরণগুলির সর্বাধিক উৎপাদন-ক্ষমতা এবং সর্বোত্তম নিয়োগ দেখা দেয়। সরকারী ক্ষেত্রের স্বল্প প্রসার অর্থ নৈতিক কাঠামোকে প্রথমে 'মিশ্র' করিবে, আর একটু বেশি প্রসার ইহাকে পূর্ণ রাষ্ট্রতন্ত্রে পরিণত করিবে। ইহাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়, কারণ একের অবলুপ্তি না ঘটাইয়া অপরের প্রসার ঘটানো যায় না। কয়লা, ইস্পাত, পরিবহন—প্রভৃতি বিষয় যদি সরকারী ক্ষেত্রে থাকে তবে সরকারী ক্ষেত্রের অদক্ষতা ও অপচয়ের দরুন ইহাদের দাম বাড়িবে এবং ব্যক্তিক্ষেত্রের মূলধন-গঠন সংকুচিত হইবে। সরকারী পণ্যগুলির একচেটিয়া দামে ব্যক্তিক্ষেত্রের শ্বাসরোধ হইবে। সরকারী অদক্ষতা ও অপচয়ের দরুন লোকসান মিটাইতে গিয়া বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর করভার বাড়িয়া চলিবে।

উপরের এই সকল যুক্তি অনেকে মানিয়া লন না। বিগত দশকে ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তিক্ষেত্রের কার্যকলাপ এবং ভূমিকা পর্যালোচনা করিলেই

আমরা ইহা দেখিতে পাইব। ১৯৬২ সালের অগস্ট মাসে এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী কমিশন রিপোর্ট দেন এবং সরকারী ক্ষেত্রের নানা অযোগ্যতা তুলিয়া ধরিয়া সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারের উপর জোর দিতে বলেন। দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের দিকে তাকাইয়া রচিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে যে অগ্রাধিকার নীতি স্বীকৃত, বেসরকারী ক্ষেত্র সেই নীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানে নাই। তাহারা এমন শিল্পে বিনিয়োগ করিয়াছে যাহাদের অগ্রাধিকার স্থান নীচুতে (Low priority)। এইরূপে দুষ্প্রাপ্য আভ্যন্তরীণ উপকরণ ও বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটাইয়াছে। পরিকল্পনায় যে-কাজের ভার তাহাদের উপর দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন না বাড়ার ফলে সরকারী ক্ষেত্রের উৎপাদন-ধারার নিয়মিত গতি বাধা পাইয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রের বিমান উৎপাদন-কেন্দ্র বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত সময়ে অ্যালুমিনিয়াম পায় নাই, সরকারী ক্ষেত্রের ইস্পাত উৎপাদন-কেন্দ্র বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত শ্রেণীর কয়লা পায় নাই। পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই সকল বেসরকারী ক্ষেত্রে অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগ শুরু হওয়া দরকার। বেসরকারী ক্ষেত্রের মুনাফালোভ মিটিতেছে না বলিয়া পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকার দেরি করিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ সালে ট্যারিফ্ কমিশন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখনও সত্য। বেসরকারী ক্ষেত্রের কলকারখানাগুলিতে অব্যবহৃত উৎপাদন-শক্তি (Unused Capacity) পড়িয়া আছে। নূতন ক্ষেত্রে তাহাদের লাইসেন্স দিবার পূর্বে পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন করিলে বেশি দ্রব্যোৎপাদন হইবে, দাম কমিয়া যাইবে, সারা দেশের লোকের আসল আয় বাড়িবে, শিল্পোন্নয়ন প্রসারিত হইবে। এই অন্যায় ও একচেটিয়া মুনাফা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, বেসরকারী ক্ষেত্র অপরিকল্পিত বলিয়া আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়নের ব্যয়ভার বেশি। মুনাফার তাড়নায় উৎপাদন হয় বেশি করিয়া অথবা কম করিয়া এই বেসরকারী ক্ষেত্রগুলি সুষ্ঠু উন্নয়নে বাধা দিয়াছে,—হয় পণ্যসামগ্রীর আধিক্য এবং অবিক্রীত থাকা, না-হয় পণ্যসামগ্রীর স্বল্পতা এবং দাম বৃদ্ধি পাওয়া—ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চতুর্থত, দ্রব্যবণ্টনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত বেসরকারী ক্ষেত্র ফাটকাদারির কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশে জীবন-

বিগত দশকে ব্যক্তি-ক্ষেত্রের ভূমিকা বিশেষ ভাল নয়

যাত্রার মান এত নিম্নে এবং পরিকল্পনার গতিবেগ হ্রাস পাইলে বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা, সেখানে বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য এই ফাটকাদারি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ফাট্‌কা ব্যবসায়ের দরুন আজ রাষ্ট্রকে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় এবং শহরাঞ্চলে খুচরা ব্যবসায়ও রাষ্ট্রয়ত্ত করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চমত, রাষ্ট্রের সকল সাহায্য পাইয়াও ইহারা শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি দেয় নাই, পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করিতে তাহাদের ডাকে নাই, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজকর্মে গাফিলতি করিয়াছে। সর্বোপরি, তাহাদের কর ফাঁকির পরিমাণ, প্রবণতা ও পদ্ধতি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। আণ্ডার-ইন্‌ভয়েসিং ও ওভার-ইন্‌ভয়েসিং করিয়া দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা অপহরণ করিয়াছে। অতিভোগ ও বিবিধ অপচয় করিয়া মূলধন-গঠন হ্রাস করিয়াছে। বিগত দশকে ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপ এবং ভূমিকা শিল্পোন্নয়নের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি।

এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া আমাদের এখন আলোচনা করা দরকার কেন ভারতে সরকারী ক্ষেত্রের দ্রুততর ও ব্যাপকতর প্রসার হওয়া প্রয়োজন। তিনটি অতি পরিচিত যুক্তির পুনরুক্তি করিয়া আমরা শুরু করিতে পারি। প্রথমত, এমন কতকগুলি শিল্প আছে যাহা হইতে এখনই কোন প্রতিদান দেখা দিবে না তবুও জাতির জীবনে বা দূর-ভবিষ্যতের শিল্পোন্নয়নে উহারা প্রয়োজনীয়। সেই সকল ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ প্রসারিত হওয়া দরকার। ভূমিক্ষয় রোধ, অরণ্য রক্ষা ছাড়াও আমাদের মত অনুন্নত দেশে এইরূপ ক্ষেত্রের কোন অভাব নাই। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি শিল্প আছে, যেমন সিন্ধ্রি সার উৎপাদন কেন্দ্র, যেখানে মুনাফার লোভ না করিয়া ব্যয়ের কথা চিন্তা না করিয়া উৎপাদন করা উচিত। সরকারী উদ্যোগ প্রসারিত হইলে উহা জাতির স্বার্থই রক্ষা করিবে। তৃতীয়ত, এমন কতকগুলি শিল্প আছে, যেমন ইস্পাত, যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ এত বেশি যে তাহা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের ক্ষমতার বাহিরে। সেই সকল শিল্পে নিশ্চয় সরকারী উদ্যোগ প্রসারিত হওয়া দরকার।

এই ত্রিবিধ কারণ ছাড়াও আরও অনেক কারণে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দ্রুততর করা প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে যে মূল ও ভারি শিল্পগুলি দরকার তাহাদের প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে প্রয়োজন। মূল ও ভারি শিল্পগুলিকে কোন অবস্থাতেই বেসরকারী মালিকানার শিবিরে রাখা উচিত নয়, উহাদের উৎপাদন এবং প্রসারই জাতীয় অর্থনীতির ভরকেন্দ্র। ব্যক্তিক্ষেত্রের শিল্পব্যবসায়

সঞ্জাত মুনাফা ব্যক্তিক্ষেত্রকেই পুষ্ট করে, সরকারের হাতে মূলধন-সঞ্চয় বাড়াইবার উপায় সরকারী শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলা। ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার দেশকে বাণিজ্যচক্রের প্রভাবাধীন করিবে, পরিকল্পিত সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দেশের শিল্পোন্নয়নের গতিবেগকে সুস্থির করিয়া তুলিবে। ইহা দামস্তরকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, বৈদেশিক মুদ্রার অপহরণ ও অপচয় রোধ করিবে। শিল্পোন্নয়নে যে আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা যায়, পরিকল্পিত সরকারী শিল্পোদ্যোগ সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নে সাহায্য করিবে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে ভারতে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার হওয়া দরকার। আমাদের দেশে স্বাধীনতার সুরুতে সীমাবদ্ধ ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রিকতা ও একচেটিয়া অধিকার তখন হইতেই ভারতে বর্তমান। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থবিনিয়োগের দরুন তেজী বাজারে এই পুরাতন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের হার নূতন প্রতিষ্ঠান-সমূহ অপেক্ষা অনেক বেশি। ফলে ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং একচেটিয়া শক্তির আধিপত্য পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দুই উপায়ে এই অশুভ গতি রোধ করিতে পারে। প্রথমত, অর্থনৈতিক কাঠামোর অবশিষ্ট অংশে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি প্রবেশের পূর্বে যদি নিজে উহা করায়ত্ত করিতে পারে তবে সরকারী ক্ষেত্র আরও অধিক অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা রোধ করিতে পারিবে। সরকারী উদ্যোগেরই উচিত আগে প্রবেশ করিয়া স্থান দখল করিয়া রাখা। দ্বিতীয়ত, সরকারী ক্ষেত্রের মুনাফা ব্যক্তির হাতে যায় না বলিয়া ব্যক্তিক্ষেত্রে ক্ষমতা ও শক্তির প্রসার ঘটিতে পারে না। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার তাই ব্যক্তিক্ষেত্রকে সংকুচিত করিয়া এবং ব্যক্তির আয় ও ক্ষমতার বৃদ্ধি কমাইয়া দিয়া অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের অশুভ গতি কিছুটা রোধ করিতে পারে।

অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা ও এক-চেটিয়ার প্রসার রোধ করে

উন্নত ও অনুন্নত উভয় ধরনের দেশেই সরকারী ক্ষেত্র থাকিতে পারে। আজকাল ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই সরকার অনেক কাজকর্ম নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতেছেন এবং এইরূপে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার হইতেছে। কিন্তু উন্নত ও অনুন্নত, উভয় প্রকার দেশের সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা সমান নয়, উহাদের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। প্রথমত, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে সরকারী ক্ষেত্র অর্থনৈতিক কাজকর্মের খুব কম অংশ অধিকার করিয়া

থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশে মোট অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপ বেশি। দ্বিতীয়ত, সরকারী ক্ষেত্রের চরিত্র ও তাৎপর্য (significance) উভয় প্রকার দেশে অনেকটা পৃথক। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকারী ক্ষেত্র থাকে ধনতন্ত্রের দোষগুলির আঘাত সহ্য করিয়া ধনতন্ত্রকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে। বাণিজ্য-চক্রজনিত বেকারি এবং উৎপাদন হ্রাস দূর করা, অর্থনীতি একেবারে ভাঙিয়া না-পড়ে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, সংক্ষেপে অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন স্থায়িত্বসাধনকারী (Built-in-Stabilizer) শক্তি হিসাবে ইহা কাজ করে। অনুন্নত দেশে কিন্তু ইহার গুরুত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার কাজ পরোক্ষ নয় প্রত্যক্ষ ; এবং অনুসরণকারী নয়, নেতৃত্ব দান। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার মাধ্যম এই সরকারী ক্ষেত্র। জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত গতিবেগ, বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রসার ও বিভিন্ন দিকের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন—ইহাই সরকারী ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রধান দায়িত্ব।

উন্নত ও অনুন্নত দেশে সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা পৃথক

সরকারী শিল্পে বেসরকারী মূলধন গ্রহণ যুক্তিযুক্ত কি না (Whether private participation in Public sector industries in justified) :

কিছুকাল পূর্বে কোম্পানী আইন বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রী ডি. এল, মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি স্টাডি গ্রুপ গঠন করা হয়। সরকারী শিল্প ও ব্যবসায়ের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করাই ইহার কাজ ছিল। এই স্টাডি গ্রুপ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছে যাহার ফল সুদূরপ্রসারী। এই স্টাডি গ্রুপের মতে সরকারী উদ্যোগে যে শিল্প ব্যবসায়গুলি ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার শেয়ার ব্যক্তিক্ষেত্রের ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের নিকট বিক্রয় করা উচিত। অবশ্য কমিটির মতে দেশরক্ষার উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত শিল্পগুলির এবং একচেটিয়া ক্ষেত্রের সরকারী শিল্পগুলির শেয়ার ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় না-করাই ভাল। এই গ্রুপের মতে, পরীক্ষামূলকভাবে. সীমাবদ্ধ কয়েকটি শিল্পে ইহা শুরু হইতে পারে এবং তাহাদের মোট শেয়ারের ২৫% মূলধনের মালিকদের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সরকারী শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনার কাজে বেসরকারী শিল্পপতিদের

প্রবেশাধিকার দিবার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। রাষ্ট্রীয় শিল্প ব্যবসায়গুলির পরিচালনার কাজে বেসরকারী শিল্পপতিদের অভিজ্ঞতা, উৎসাহ এবং কর্মদক্ষতা যুক্ত হইলে স্বভাবতই পরিচালনার মান উন্নত হইবে। বেসরকারী শিল্পপতিদের মনে সরকারী উদ্যোগগুলি সম্পর্কে বিরূপতা দূর হইবে, বর্তমানের বিরোধী মনোভাব তাঁহারা পরিবর্তন করিবেন। সরকারী শিল্পোদ্যোগসমূহ বর্তমানে ব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত হইতেছে না। ইহার ফলে তাহারা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতেছে না। সরকারী কর্মচারীরা শিল্প পরিচালনার কাজ জানেন না. তাঁহারা রুটিন-মাফিক চাকরি করিতে অভ্যস্ত। বেসরকারী শিল্পপতিদের মুনাফা-প্রবণতা যুক্ত হইলে তাহাদের উদ্যোগ ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিবে। সরকারের হাতে মূলধনের পরিমাণ কম থাকায় আরও অধিকসংখ্যক কলকারখানা খোলা সম্ভব হইতেছে না, বেসরকারী মূলধনকে অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিলে শিল্পপ্রসার ত্বরান্বিত হইবে। সরকারের শিল্পে শেয়ার কিনিতে বহু ব্যক্তি আগ্রহান্বিত হইবে কারণ লোকসানের ভয় ইহাতে কম। ফলে যে অর্থ অলস পড়িয়া থাকিত, উহার বিনিয়োগ সম্ভব হইবে। যদি ব্যক্তিক্ষেত্রহইতে মূলধন সরিয়া আসিয়া সরকারী ক্ষেত্রে অংশীদার হয়, তবে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনে নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুযায়ী শিল্পপ্রসার ঘটিবে। ফলে ইহা বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুনাফা হইতে শ্রমিকেরা যে বোনাস পায় তাহা মুদ্রাস্ফীতি বাড়াইতে সাহায্য করে। যদি সেই বোনাস নগদ টাকায় না-দিয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের শেয়ারের রূপে দেওয়া হয় তবে শ্রমিকেরা সেই কারখানার উৎপাদন বাড়াইতে সচেষ্ট থাকিবেন, তাঁহাদের মনে একপ্রকার অংশীদারত্বের মনোভাব দেখা দিবে। সরকারী শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে যে গোপনীয়তার আবহাওয়া বর্তমানে দেখা যায় সেই পর্দা অপসারিত হইবে।

কিন্তু এইরূপ প্রস্তাবের বিপক্ষে বহু ব্যক্তি অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমত, যদি সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কিছু পরিমাণ শেয়ার জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। ব্যক্তিক্ষেত্র হইতে মূলধন সরিয়া আসিয়া সরকারী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে মাত্র। সরকারী শিল্পে লোকসান হইলে সরকারের বাজেট হইতে উহা পূরণ হয়, তাই টাকা লোকসানের ভয় নাই। এইরূপ ঝুঁকিহীন বিনিয়োগে সকলেই টাকা খাটাইবে, বেসরকারী ক্ষেত্র মূলধন পাইবে কিরূপে ?

দ্বিতীয়ত, ইহা প্রায়শই দেখা যায় যে, কয়েকজন ব্যক্তি কোন একটি কোম্পানির বেশির ভাগ শেয়ার করায়ত্ত করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছে। সরকারী শিল্পগুলির শেয়ার বাজারে ছাড়িয়া দিলেও উহা মাত্র কয়েকজন শিল্পপতিব কুক্ষিগত হইতে পারে। তখন তাহাদের চাপে এই সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, দাম ও বণ্টন নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। তৃতীয়ত, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হইল নীতির দিক হইতে। ভারতের বেসরকারী শিল্পপতিরা দেশের প্রয়োজনীয় অনেক শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে নাই, কারণ প্রথম দিকে ঝুঁকি বেশি, লাভের পরিমাণ কম এবং অনিশ্চিত দূর ভবিষ্যতেই ঐ সকল শিল্পে লাভ দেখা দিবে। জাতির স্বার্থে অর্থ-বিনিয়োগের কথা তাঁহারা কখনও চিন্তা করেন নাই। আজ যখন ভারত সরকার অগ্রণী হইয়া কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ঝুঁকি লইয়াছে, প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে, মুনাফা হইবে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তখন মধুলোভী বেসরকারী শিল্পপতিরা উহার পরিচালনা-ভার এবং নিশ্চিত মুনাফার অংশ করায়ত্ত করিবার চেষ্টায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী এই শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জাতির টাকায়। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়া, জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার বৃদ্ধি করিয়া, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ না-করিয়া উহার পরিবর্তে আমরা এই শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিয়াছি। আমাদের আশা ইহাদের মুনাফা একদিন আরও সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবে এবং সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইবে। আজ আমরা সরকারী শিল্পের লাভজনক শেয়ারগুলি মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে ছাড়িয়া দিলে জাতির প্রতি, দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের প্রতি, চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিব। সমাজতন্ত্রের আশা বিলীন হইবে। কতিপয় শিল্পপতিই তখন ক্রমে রাষ্ট্রেরও মালিক হইয়া উঠিবে। উপরন্তু, ভারতের সরকারী শিল্পগুলির বেশির ভাগ মূল ও ভারি শিল্প। এই সকল শিল্পের প্রসার আমাদের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে। পরিকল্পনা কমিশন ইহার মাধ্যমে প্রধান ধাতুদ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ ও দিক্ নির্ধারণ করিতেছে। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র মুনাফালোভী কয়েকজন শিল্পপতির হাতের ক্রীড়নক হইতে দেওয়া জাতির স্বার্থে কখনই উচিত হইবে না।

ভারতের শিল্পসংরক্ষণ নীতি (Policy of Protection of Industries in India—the Fiscal Policy) : দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের একটি অন্যতম প্রধান উপায় হইল রাষ্ট্রের এরূপ শুল্কনীতি গ্রহণ করা যাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া দেশে শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে। ইংরাজদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতি গৃহীত হইয়াছিল। উহার পূর্বেও ভারতে শুল্ক ছিল না তাহা নহে, তবে উহারা প্রধানত সরকারী তহবিলের আয় বাড়াইবার জন্য আরোপিত হইয়াছিল বিদেশী শিল্পের হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য নহে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কতকগুলি অবস্থার চাপে ইংরাজ সরকার সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিতে রাজি হইল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ইংরাজ সরকার বুঝিতে পারিল, ভারতে কিছু শিল্প না থাকিলে যুদ্ধকালীন দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব পুনরায় দেখা দিবে। তাহা ছাড়া, সেই সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ভারতে মালপত্র বিক্রয় করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের ক্ষান্ত করা প্রয়োজন। ভারতের শিল্পপতিরাও জাতীয়তার নামে শিশুশিল্প সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা ও শিল্পে বিভিন্নতা আনিবার যুক্তি দেখাইয়া সংরক্ষণের দাবি তুলিতে লাগিল। এই সকল কারণ মিলিয়া ১৯২১ সালে ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টে (Fiscal Autonomy Convention) এই নীতি গৃহীত হইল এবং ভারতীয় শুল্ক কমিশন গঠিত হইল। এই শুল্ক কমিশন সকল শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য সামগ্রিক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিলেন না; কয়েকটি শর্ত বা অবস্থা বজায় থাকিলে তবে সেই শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষিত হওয়ার সুবিধা পাইবে, এইরূপ স্থির করিলেন। এই নীতিকে তাই বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি (Policy of Discriminating Protection) বলা হয়।

১৯২১ সালের শুল্ক-নীতির ইতিবৃত্ত

সংরক্ষণের অন্তর্নিহিত অসুবিধা এবং ভোগকারীর স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কেবলমাত্র সংরক্ষণ পাইবার উপযুক্ত শিল্পকে এই সুবিধা দেওয়া হইবে, কমিশন এইরূপ স্থির করিলেন। যে-শিল্প এই সুবিধা পাইতে চাহে, তাহাকে তিনটি শর্ত বা অবস্থা (Triple Formula) পূরণ করিতে হইবে : (১) শিল্পটি এরূপ হওয়া চাই যাহাতে দেশের মধ্যে অফুরন্ত কাঁচামালের যোগান, সস্তায় শক্তি, পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিক সরবরাহ ও স্বদেশে বিস্তৃত বাজার প্রভৃতি স্বাভাবিক সুবিধা আছে। (২) শিল্পটি এরূপ হওয়া উচিত যাহার বিনা সংরক্ষণে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার আদৌ

সংরক্ষণের শর্তসমূহ

সম্ভাবনা নাই, অথবা দেশে বৃহত্তর স্বার্থে যত দ্রুত প্রসার লাভ করা উচিত, বিনা-সংরক্ষণে তাহার কোনরূপ আশা নাই। (৩) শিল্পটি এমন হওয়া উচিত যাহা সংরক্ষণের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে এমন উন্নত হইয়া উঠিবে যে. বিনা সংরক্ষণেই বৈদেশিক শিল্পের সহিত সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে। এই তিনটি প্রধান শর্ত ছাড়া আনুষঙ্গিক ছোটখাট শর্ত ছিল: (ক) শিল্পটিতে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে. এইরূপ হইতে হইবে; (খ) শিল্পটি এমন হইবে যে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের সমগ্র চাহিদা মিটাইতে পারিবে; (গ) শিল্পটি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং একই সঙ্গে উহা মূল বা ভারী শিল্প। কোন বিশেষ শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা পাইতে হইলে সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে এবং সরকার উপযুক্ত মনে করিলে শুল্কবোর্ড (Tariff Board নিয়োগ করিবে। সেই বোর্ড সেই শিল্পের দাবী সমর্থনযোগ্য কিনা অনুসন্ধান করিয়া সরকারের নিকট সুপারিশ পাঠাইবে। তখন সরকার বিল রচনা করিয়া আইন-সভায় উপস্থিত করিবে এবং সেই বিল পাস হইলে শিল্পটি সংরক্ষণ পাইবার অধিকারী হইবে।

এই সংরক্ষণ নীতির ফলে ভারতে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, চিনি, কাগজ. দিয়াশলাই. ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্লোরাইড প্রভৃতি শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইহার মধ্যে সংরক্ষণের পূর্বে ভারতে অনেক শিল্প ছিল না বলিলেই চলে। এই সীমাবদ্ধ সংরক্ষণ-নীতির ফলে ১৯২৯ সালের বাণিজ্য-সংকটের মধ্যে অন্যান্য শিল্প সংকুচিত হইল, কিন্তু সংরক্ষিত শিল্পগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রসারিত হইতে পারিয়াছিল। এই সকল শিল্প গড়িয়া উঠিবার দরুন উহার আনুষঙ্গিক ও সহযোগী আরও কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই নীতির ফলে পরোক্ষভাবে কৃষির অবস্থাতেও উন্নতি আসিয়াছিল, তুলা ও ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি পাইয়া চাষীর হাতে নগদ টাকা আসার সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই নীতির ত্রুটি

কিন্তু এই নীতির ত্রুটির পরিমাণ কিছু কম ছিল না। (ক) যে ত্রি-শর্ত রচিত হইয়াছিল, তাহার ব্যূহ ভেদ করিয়া কোন শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণ পাওয়া বড় সোজা কথা ছিল না।* (খ) তাহার ফলেই প্রধানত ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিই (একমাত্র লৌহ ও ইস্পাত

* একটি শিল্পের সকল প্রকার কাঁচামালই একটি দেশে পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ অপূর্ণোন্নত দেশে অনেক কাঁচামালের শিল্প প্রথমে অপ্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রথমে শিল্পটি স্থাপিত হইলে তবে উহার কাঁচামালের শিল্প গড়িয়া উঠার তাগিদ দেখা যায়। অনেক শিল্পের বাজার প্রথমে দেশে থাকে না, দ্রব্যটি উৎপন্ন হইয়া ক্রেতাদের মধ্যে ক্রমশ পরিচিত লাভ করিয়া বাজার তৈয়ারী করে, যোগান নিজেই তাহার চাহিদা সৃষ্টি করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় শর্ত একটি স্বতঃসিদ্ধ (truism), আর তৃতীয়টি পুরাপুরি আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ছাড়া) সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, মূল ও ভারী শিল্প উন্নত হইতে পারে নাই, শিল্পোন্নয়ন বিসম তালে অগ্রসর হইয়াছে। (গ) যে পদ্ধতিতে শুল্কনীতি কার্যকরী করা হইত, তাহা শিল্পোন্নয়নের পক্ষে ছিল খুবই অনুপযোগী। কোন স্থায়ী শুল্কবোর্ড না থাকায়, সামগ্রিক ও স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না, বহুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতে পারিত না। শুল্কের জন্য অনুরোধ এবং সেই শুল্ক পাওয়া—উভয়ের মধ্যে প্রচুর সময় কাটিয়া যাইত। (ঘ) শুল্ককে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অস্ত্র হিসাবে না দেখিয়া কোন একটি বিশেষ শিল্পের উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হইত। শিল্পোন্নয়ন হইল পরস্পর নির্ভরশীল প্রভাবশীল বহুস্রোতের সম্মিলন—প্রতিটি শিল্পের উন্নতিই অন্য শিল্পের বাজার, কাঁচামাল বা যন্ত্রদক্ষতা সৃষ্টি করিয়া সমাজের উৎপাদন, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ একত্রে বাড়াইয়া তোলে। তাই পুরানো শুল্ক কমিশনের নীতির সম্পর্কে অধ্যাপক B. P. Adarkar বলিয়াছিলেন, "It has voucshaped nothing better than a perfunctory assistance indifferently and grudgingly rendered to industries whose subsequent development has been left to take its own course."

অন্তর্বর্তীকালীন শুল্কবোর্ড (Interim Tariff Board) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিক হইতেই ভারতে প্রধান শিল্পগুলির অভাব অনুভূত হওয়ায়, যুদ্ধের প্রয়োজনে ১৯৪০ সালে ভারত সরকার ঘোষণা করিলেন যে, যুদ্ধের মধ্যে স্থাপিত শিল্পগুলি সঠিক ব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত হইলে সংরক্ষণের সুবিধা পাইবে। এই ঘোষণাতে ভারত সরকারের শিল্পনীতি নূতন রূপ গ্রহণ করিল এবং শুল্কনীতির পরিধি প্রশস্ত হইয়া উঠিল। দীর্ঘকালীন শুল্কনীতি ও স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে দেরী হইবে এই জন্য ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে ভারত সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন শুল্কবোর্ড স্থাপন করিলেন। ইহার কাজ ছিল যুদ্ধের সময়ে স্থাপিত শিল্পগুলির সংরক্ষণের দাবি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ে সুপারিশ করা। দুই বৎসরের জন্য এই বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিন বৎসরের জন্য কোন শিল্পকে সংরক্ষণ সুপারিশ করার অধিকার এই বোর্ডের ছিল। এই বোর্ডের সংরক্ষণনীতির ভিত্তি হিসাবে সংরক্ষণকামী শিল্পগুলির কিছু কিছু শর্ত পূরণ করিতে হইবে এই কথাও বলা হইয়াছিল। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে শুল্কবোর্ড পুনর্গঠিত

হইয়াছিল এবং অন্তবর্তীকালীন শুল্কবোর্ডের অপেক্ষা আরও অধিক কার্যভার উহার হাতে অর্পিত হইয়াছিল।

নূতন সংরক্ষণী-নীতি, ১৯৪৯-৫০ (New Fiscal Policy for Protection, 1949-50):

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় উপযুক্ত শুল্কনীতি গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। সেই অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণমাচারির সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালে একটি শুল্কনীতি কমিশন (Fiscal Commission) স্থাপিত হয়। এই কমিশন ১৯৫০ সালে তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। এই কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ন, কোন বিশেষ শিল্পের দৃষ্টিতে সংরক্ষণ-নীতিকে ব্যবহার করা নয়। পুরানো যে-কোন উপায়ে ঠেকা দেওয়ার নীতির বদলে সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সফল করার অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের শুল্কনীতি ব্যবহৃত হইবে—কমিশন এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে সমগ্র সমস্যাটি বিচার করিলেন। যে শিল্পের সম্ভাবনা বা বাজার আছে তাহাকে সংরক্ষণ করার নীতির বদলে সেই শিল্পের বাজার বা সম্ভাবনা সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করা হইল। এই উন্নয়নমূলক সংরক্ষণের নীতি (Developmental protection) পুরানো নীতির তুলনায় শিল্পোন্নয়নের যুগে অনেক বেশি উপযোগী।

পরিকল্পনার পক্ষে প্রয়োজনীয় শুল্কনীতি

পুরানো শুল্কনীতিতে যে ত্রি-শর্ত আরোপিত হইয়াছে তাহার বদলে কতকগুলি সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হইল। জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় রাষ্ট্রীয় শুল্কনীতির একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হইল। কোন শিল্পের আভ্যন্তরীণ তৈয়ারী বাজার বা দেশে ও বিদেশে ভবিষ্যতে বাজার তৈয়ারীর সম্ভাবনা থাকিলে এবং শ্রমিক থাকিলেই চলিবে। কাঁচামালের অভাবের দরুন সংরক্ষণ পাইবে না এরূপ হইবে না। আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পুরা মিটাইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মূল ও ভারী শিল্পের উপর অধিক নজর দিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীও সংরক্ষণের সুবিধা পাইবে—কমিশন এইরূপ নীতি গ্রহণ করিল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তখনও গৃহীত হয় নাই, কিন্তু কমিশন এমনভাবে শুল্কনীতি নিরূপণ করিল যাহাতে পরিকল্পনা সফল করার কাজে রাষ্ট্রের হাতে অস্ত্র হিসাবে ইহা থাকিতে পারে। সমগ্র শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল: (ক) দেশরক্ষা

ও উহার আনুষঙ্গিক শিল্পসমূহ, (খ) মূল ও ভারী শিল্প, (গ) অন্যান্য শিল্প।

দেশরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে যে-কোনরূপ ব্যয়েই হউক না কেন, সংরক্ষণ করিতেই হইবে। মূল ও ভারী শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার জন্য শুল্ক কমিশন শর্ত ও পরিমাণ স্থির করিবে এবং কিছুদিন অন্তর অন্তর উহার অগ্রগতি কিরূপ হইতেছে তাহার দিকে নজর রাখিবে। কোনরূপ কঠিন শর্ত আরোপিত হইবে না। অন্যান্য শিল্পের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে. শুল্ক কমিশন স্থির করিবে সংরক্ষণ দেওয়া উচিত কি উচিত নয়; শিল্পের অর্থনৈতিক সুবিধা, সম্ভাব্য উৎপাদন-ব্যয় এবং জাতীয় স্বার্থে উহার প্রয়োজনীয়তা, এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ইহাদেরও সংরক্ষিত করা হইবে।

উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ

কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, সংরক্ষণী শুল্ক হইতে আদায়ী অর্থ লইয়া একটি উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) গঠন করা দরকার এবং উহা হইতে বেসরকারী শিল্পকে প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য (subsidy) করাও প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপন না করিয়া কেবল অর্থ-সাহায্যের নীতিও গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

এই সকল কাজ চালাইবার জন্য উচ্চ ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন স্থায়ী শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) প্রতিষ্ঠিত রাখার কথাও বলা হইয়াছে। নিজের প্রচেষ্টায়, উৎসাহে ও বিচার বুদ্ধিতে এই স্থায়ী কমিশন শুল্ক আরোপন ও শুল্কের হারের পরিবর্তন করিবে সরকারের নিকট নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাইবে; অর্থনৈতিক গবেষণার কাজ চালাইবে। সংরক্ষণ দ্রুত না হইলে নীতি ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই রিপোর্ট পাইবার দুই মাসের মধ্যে সরকারকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে. ইহাও বলা হইয়াছে। ভারত সরকার এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্থায়ী শুল্ক কমিশন ১৯৫২ সালের ২১শে জানুয়ারী হইতে কাজ শুরু করিয়াছে।

স্থায়ী শিল্প কমিশন

এই শুল্কনীতি বেসরকারী ও সরকারী উভয় শিল্পক্ষেত্র প্রসারের উপযোগী হইয়াছে এবং শিল্পোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করিতে পারে, এইরূপ আশা করা হইতেছে। মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়ার নীতি সঠিক হইয়াছে। অংকুর অবস্থার শিল্পগুলির (Embryonic industries) কথাও চিন্তা করা

খুবই উচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সংরক্ষণের পরে শিল্পগুলির অগ্রগতির দিকে নজর দেওয়া হইবে, ইহাও খুব উল্লেখযোগ্য নূতন নীতি। তবে দেশের শুল্কনীতিকে আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের নীতির সহিত সংযুক্ত করার কথা অস্বীকার করিয়া এই নীতি বিরাট ফাঁক রাখিয়া দিয়াছে। শুল্কনীতি নিরূপণের সময় আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমানো বাড়ানো এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের অবস্থা বিবেচনা করা খুবই প্রয়োজন। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর, বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া মুনাফার উপর এবং সামগ্রিক পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের হারের উপর, প্রতিটি শুল্কের নিজস্ব ও উহাদের মোট প্রভাব বিচার করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি—এই কথা মনে রাখা দরকার ছিল। অধ্যাপক হাবারলারের ভাষায় বলিতে গেলে: "The policy of speeding a country's development through customs protection or other measures is a task of great difficulty and complexity. Recommending and evaluating such a policy, to say nothing of carrying it through, requires a good deal more than keen theoretical analysis. What is also needed is a vast factual knowledge, good judgement, and above all, a sense for historical, political, and social development."

পুরাতন নীতি অপেক্ষা উন্নততর

বিগত দশকে ভারতের শিল্পপ্রসার (Progress of Industrialisation in India during the last decade) :

১৯৫১ সালে ভারতে পঞ্চবর্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয় এবং ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়াছে। এই দশ বৎসর আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের গুরুতর সন্ধিকাল। অনুন্নতির বেড়াজাল ভেদ করিয়া শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টার সূত্রপাত এই সময়েই। শিল্পপ্রসারের হার (rate) এবং শিল্পোন্নয়নের ধরন (pattern)—উভয় দিক বিচার করিলেই দেখা যায়, এই সময়ে আমাদের শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করিয়াছে। নীচের তালিকা হইতে এই গতির আভাস পাওয়া যায়:

শিল্পোৎপাদনের সূচক (১৯৫০ ৫১=১০০)

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০ ৬১
সাধারণ সূচক	১৩৯	১৯৪
সূতা বস্ত্র	১২৮	১৩৩
লৌহ ও ইস্পাত	১২২	২৩৮
যন্ত্রপাতি (সকল শ্রেণীর)	১৯২	৫০৩
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	১৭৯	২৮৮

পূর্বপৃষ্ঠার তালিকা হইতে দেখা যায় যে, শিল্পোৎপাদনের সাধারণ সূচক বৎসরে ৭% চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা যে সকল বিভিন্ন দিকে উহার প্রসার হইয়াছে, তাহাই উল্লেখযোগ্য। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প-প্রসারের দিক্ পরিবর্তন ঘটে নাই, প্রধানত পুরাতন বৃহৎ শিল্পগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করাই লক্ষ্য ছিল। ঐ পাঁচ বছরে, এই মৃদু উৎসাহ পাইয়াই, শিল্পোৎপাদন ৩৯% বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের পরেই নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা সম্ভব হইয়াছিল। বিশেষত মূলধনী এবং উৎপাদক শিল্পসমূহ। এই শিল্পগুলিই ভবিষ্যতে শিল্পোন্নয়নের হার ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিতে পারে। ধাতুবিষয়ক, যন্ত্রপাতি বিষয়ক, বৈদ্যুতিক এন্‌জিনিয়ারিং বিষয়ক এবং রাসায়নিক শিল্পগুলি দেশে আধুনিক ধরনের শিল্পসম্ভার তৈয়ারীর উৎস স্বরূপ। ইহাদের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে আমাদের যাত্রাপথ সুগম করিয়া দিয়াছে।

মূল ও ভারিশিল্পের প্রতিষ্ঠা

মূল ও ভারি শিল্পের উন্নয়নে সরকারী ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। এই দশ বৎসরে শিল্প ও খনি মিলিয়া সরকারী ক্ষেত্র মোট ৯৭৪ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ৮৭০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সংগঠিত শিল্পে মোট বিনিয়োগের ৫৬ ভাগ। ইহা হইতে বুঝা যায় ব্যক্তিক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দ্রুততর হউক, পরিকল্পনা কমিশন তাহাই চাহিতেছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল যে, সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পগুলির বেশির ভাগই ভারি ও মূল শিল্প। এই ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠা করায় সরকারী ক্ষেত্র শক্তিশালী হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্পোন্নয়নে নেতৃত্ব দিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। ইহারই ফলে ব্যক্তিক্ষেত্রে মধ্যমায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

সরকারী ক্ষেত্রের প্রধান ভূমিকা বা নেতৃত্ব

সরকারী ক্ষেত্রে তিনটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিক্ষেত্রের দুইটি ইস্পাত কারখানায় উৎপাদনের প্রসার, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, ভারি রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রঙ, কয়লা, পেট্রল এবং বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি বিগত দশকের অতি উল্লেখযোগ্য অবদান। শুধু তাহাই নহে। এই ইস্পাত প্রভৃতি

লইয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানাও ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিভিন্নমুখী অগ্রগতির স্বাক্ষর

ভারতের বহু ভোগ্যশিল্প আজ ভারতে তৈয়ারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতেছে, আমদানি-নির্ভরতা হ্রাস পাইতেছে। কাপড়, পাট, তেল, কাগজ, খনি, ময়দা, চিনি, চা, সিমেণ্ট, ঔষধপত্র, পরিবহন প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় কলকব্জা আজ ভারতেই উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫০ লক্ষ টাকা। ব্যক্তিক্ষেত্রে শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের কাজও করা হইয়াছে। এখন ভারতের এই শিল্পগুলিতে দেশীয় কাঁচামালের অনুপাতও বাড়িয়া গিয়াছে। দেশে নূতন নূতন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন শুরু হইয়াছে, যেমন, বয়লার, ট্রাক্টর, ডি. ডি. টি, মোটর সাইকেল ও স্কুটার ইত্যাদি।

পুরাতন ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিও উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া দিয়াছে। এককথায় আমাদের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথের বাধা আমরা বহুল পরিমাণে অপসারণ করিতে পারিয়াছি।

অনুশীলনী

1. Discuss the effects of the policy of discriminating protection on the industrial development of India. What changes, if any, would you suggest in the fiscal policy of the country?

2. Explain the new scheme of protection of Indian Industries as formulated by the Fiscal commission of 1949-50.

3. Critically examine the present Industrial policy of the Government of India.

4. Critically discuss the main provisions of the Industries (Development and Regulation) Act of 1951.

5. What are the different ways in which the government helps private industries in India?

6. Elucidate the main features of the industrial policy of the Government of India as enunciated from time to time.

7. What is meant by a "mixed economy"? Write a short note on the importance of the public sector in the Indian economy.

8. Write a short note on the fiscal policy adopted by the government after 1949-50.

9. Write short notes on: (a) The Industries (Development and Regulation) Act; (b) The new Fiscal policy.

10. "The Indian Fiscal commission 1949-50 approached their task from a new angle of vision and laid down new principles of protection." Elucidate the statement.

11. Discuss the main features of the new Industrial Policy of the Government of India as enunciated in April, 1956.

12. Discuss the principles of the protectionist policy adopted in India after 1949-50.

13. Explain the principal change in the fiscal policy of India as the result of recommendations of the Fiscal commission of 1949-50.

14. Examine the main features of the industrial policy of the government of India during the last ten years of planned development.

15. Give a critical estimate of the Govt. of India's New Industrial Policy.

16. "Industrialisation in India has been too slow in relation to the people's need for remunerative employment and has failed to result in a well balanced industrial structure". Discuss.

17. Review the performance of the Private Sector in the first two Plan periods.

18. Give a brief review of the Progress of industrialisation in India since 1951.

১৭

বেসরকারী ক্ষেত্র : শিল্প পরিচালনা

Private Sector : Industrial Management

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা (The Managing Agency System):

ধনতান্ত্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত তিন ধরনে পরিচালিত হয়, ব্যক্তিগত পরিচালনা, অংশীদারী পরিচালনা ও যৌথ কারবারী পরিচালনা। ইহার মধ্যে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। শিল্পে পুঁজি সংগ্রহের সুবিধা লাভ করা ও কম-মূলধনে বিভিন্ন শিল্পের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া অনেক শিল্পের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপনের সুবিধার জন্য বেসরকারী শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত যৌথ মূলধনী কারবাররূপে গঠিত হয়।

ভারতেও বৃহৎ শিল্পসমূহ প্রায় সবই যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ কোম্পানিই প্রকৃতপক্ষে শেয়ার ক্রেতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ডিরেক্টর সভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না। অপর কোন ব্যক্তি, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ও যৌথ কোম্পানী রূপে গঠিত কোন ম্যানেজিং এজেন্সীর সহিত উৎপাদনকারী এই প্রকৃত ফার্মটি চুক্তি করে এবং সেই চুক্তির বলে ম্যানেজিং এজেন্টরা ফার্মটির মালিক না হইয়াও উহার পরিচালন-ক্ষমতা লাভ করে। ভারতের বৃহৎ যন্ত্রশিল্পসমূহের প্রায় সবগুলিই ম্যানেজিং এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত, পরিচালনার এইরূপ ব্যবস্থাকে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বলে।

আমাদের দেশে মোটামুটি দুই ধরনের ম্যানেজিং এজেন্ট দেখিতে পাওয়া যায়—ইংরাজ ও ভারতীয়। যখন ইংরাজ ব্যবসাদারেরা এদেশে প্রথম শিল্প-স্থাপনে অগ্রসর হইল তখনকার বাস্তব প্রয়োজনে এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ছিল সংখ্যায় অল্প এবং তাহাদের মনে ভারতে স্থায়ী বসবাসের ইচ্ছা ছিল না। ফলে ডিরেক্টর সভায় সভ্য হইবার উপযুক্ত ইংরাজের অভাব হইত এবং কাহারও উপর স্বল্পকাল, দীর্ঘকাল বা চিরকালের জন্য ভার ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানি-সমূহ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে ইহারা কোম্পানীগুলিকে অর্থ সাহায্য করিয়া

উৎপত্তির কারণ

বাঁচাইয়া রাখিতে শুরু করিল। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্টরা সৃষ্টি হইয়াছিল প্রধানত অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পপতির শিল্প-পরিচালনার অক্ষমতা, ত্রুটি ও এই সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের দরুন। ভারতীয় মূলধনের বাজারে ত্রুটিও ইহার উদ্ভবের কারণ বটে। ভারতীয় মূলধন নিজে অগ্রসর হইতে চাহিত না. এবং ভারতের পুঁজির বাজারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভাব ছিল (যেমন, promoting house, investment trusts প্রভৃতি)।

সাধারণত ইহাদের কাজ তিন ধরনের : (ক) নূতন শিল্প গড়িয়া তোলা, অর্থাৎ উদ্যোক্তার কাজ করা; (খ) স্থির ও চল্‌তি মূলধন—উভয় প্রকার পুঁজিই প্রয়োজনমত ঋণ দেওয়া, অথবা তাহাদের সুনাম ধার দেওয়া, যাহাতে লোকে সেই কোম্পানির ডিবেঞ্চার ও বণ্ড কেনে; (গ) শিল্পগুলির দৈনন্দিন পরিচালনার কাজ চালানো। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নূতন শিল্পে বিনিয়োগ করিবার ঝুঁকি ব্যক্তি বিশেষকে বহন করিতে হয় না, দেশে ইস্যু হাউস্, প্রোমোটার হাউস্ এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের কাজ চালাইতে থাকে। ভারতে এইরূপ সুসংগঠিত মূলধনের বাজার না থাকায় ম্যানেজিং এজেন্টরা এই কাজ করিয়াছে এবং তাহাদের কর্মকৌশল ও সুনামের উপর ভরসা করিয়া ব্যক্তিগত সঞ্চয়-কারীরা বিনিয়োগ করিয়াছে। ফিস্‌কাল কমিশন (১৯৫০) বলিতেছেন যে, এই প্রথা "rendered signal service to Indian Industries during the last 75 years. In the early days of industrialization when neither enterprise nor capital was plentiful, the managing agents provided both and India's well-established industries like cotton, jute, steel etc. owe their present position to the pioneering zeal and fostering care of several well-known managing agency houses." দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্টরা আর্থিক মূলধন যোগাইয়াছে। ধার দিয়া, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া এবং কোম্পানীর সহিত নিজের সুনাম জড়িত রাখিয়া কোম্পানীর ঋণ পাওয়া ও শেয়ার ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া ইহারা কোম্পানীগুলিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছে। এখনও বৃহৎ কোন ম্যানেজিং এজেন্টের নাম জড়িত থাকিলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া সহজে মূলধন সংগ্রহ করা চলে। কোম্পানী-আইন কমিটি তাই বলিয়াছেন, জনসাধারণের সঞ্চয় শিল্পের বিনিয়োগে টানিয়া আনিতে ইহারা এখনও সক্ষম (still a potent instru-

কাজকর্ম ও উপকারিতা

ment for tapping the spring of private enterprise)। দৈনন্দিন শিল্পপরিচালনার কাজ চালাইয়া ভারতীয়দের বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ইহারা ব্যবসায় পরিচালনায় দক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন শিল্প একই ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে থাকায় পরিচালনগত ব্যয়সংকোচ প্রতিটি ফার্মই লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দালালি দিতে হয় নাই, প্রতিযোগিতার অপচয় দূর হইয়াছে। ছোট ফার্ম দক্ষ ইন্‌জিনিয়ার বা বিশেষজ্ঞ রাখিতে পারে না, ম্যানেজিং এজেন্টরা ইহাদের সাহায্যে একাধিক ছোট কোম্পানীর কাজ করাইয়া লইয়াছে, ফলে প্রতিটি কোম্পানীর ব্যয়ভার লাঘব হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রথার স্বপক্ষে এত কথা বলার থাকা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, ইহার দরুন ভারতের শিল্প কাঠামোতে বহু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি বিচ্যুতির উদ্ভব হইয়াছে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতে "the system is rotten, root and branch, leaf and bark and blossom"। প্রথমত, এই সকল ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানীগুলি সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানায় বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে পরিচালিত। ফলে কোন মালিকের মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণ ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীটির মালিক হন। ইহারা যে পূর্ববর্তী মালিকদের ন্যায় সমান পরিচালন-যোগ্যতা লইয়া জন্মলাভ করিবেন তাহাতে কোন নিশ্চয়তা নাই। ফলে উহাদের অধীনস্থ শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, অনেক ম্যানেজিং এজেন্ট নিছক অর্থসরবরাহ করিয়া কোম্পানীর পরিচালনভার হাতে তুলিয়া লন, কিন্তু হয়ত তাহারা ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক বা পরিচালনা সম্বন্ধে তেমন দক্ষ নহেন। তাহাদের পরিচালিত শিল্পসমূহ উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। তৃতীয়ত কেন্দ্রীয়ভাবে কেনা-বেচা ও পরিচালনার জন্য যে ব্যয়সংকোচ প্রতিটি ফার্ম লাভ করিতে পারে, উহার সুবিধা দ্রব্যের ক্রেতা বা শেয়ার ক্রেতা পর্যন্ত পৌঁছায় না। স্বনামে বেনামে বহু প্রকার প্রতিষ্ঠান রাখিয়া একের দ্রব্য অন্যকে বেচিয়া ম্যানেজিং এজেন্টরা কমিশন দালালি প্রভৃতিতে অর্থোপার্জন করে। চতুর্থত, ১৯৩৬ সালের পূর্বে ইহারা দুই ভাবে অর্থ পাইত, (ক) অফিস চালাইবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, এবং (খ) উৎপাদন, বিক্রয় বা মুনাফার উপর চুক্তিবদ্ধ হারে কমিশন। অফিস চালাইবার নাম করিয়া প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা ম্যানেজিং এজেন্টরা আদায় করিত। উৎপাদন

বা বিক্রয়ের উপর কমিশন পাওয়ায় কোম্পানীর লাভ হউক বা ক্ষতি হউক ম্যানেজিং এজেন্টকে কমিশন দিতেই হইত। আর মুনাফা অনুযায়ী ম্যানেজিং এজেন্টকে দিতে হইলে বিভিন্ন খাতে মোট মুনাফার প্রায় অর্ধেক প্রতি বৎসর ম্যানেজিং এজেন্টকে দিতে হয়। এইরূপ ব্যবসায়ের অবস্থা কখনও ভাল হইতে পারে না।

তাহা ছাড়া এজেন্টরা এক কোম্পানীর টাকা অন্য কোম্পানীতে খাটাইত, ভাল কোম্পানীগুলি দুর্বল হইয়া পড়িত তাহাদের প্রসারণের শক্তি সংকুচিত হইত। নিজেদের সুবিধার জন্য কোম্পানী সমূহের অর্থ লইয়া ফাট্‌কাবাজী করিতেও অনেক ম্যানেজিং এজেন্ট দ্বিধা বোধ করে নাই। এক কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা দিয়া অপর কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার কিনিয়া নূতন কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকাতে তৃতীয় কোম্পানী কিনিবার চেষ্টা করা এবং এইরূপে ভারতে ব্যক্তিগত শিল্প সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলার ইতিহাস এখনও দেখা যাইতেছে (যেমন হরিদাস মুন্দ্রা)। ডিরেক্টার বোর্ডগুলিতে নিজের আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত লোক রাখিয়া সাধারণ শেয়ার ক্রেতাদের ক্ষমতা প্রয়োগের কোন সুযোগ না দেওয়া—ইহাই বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান রূপ।

সর্বোপরি, এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তি প্রচুর সংখ্যক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কর্তৃত্ব হাতে রাখার পদ্ধতি হিসাবে এই প্রথা ভারতের শিল্প কাঠামোতে তীব্র একচেটিয়া অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ডাঃ মেহেতা দেখাইতেছেন যে, ভারতের মাত্র নয়টি পরিবার মিলিয়া মোট শিল্পক্ষেত্রের অধিকাংশ নিজেদের দখলে রাখিয়াছে। ভারতীয় শিল্পজগতে এই একচেটীয় শক্তিকেন্দ্রগুলি স্থাপিত হওয়ায় শিল্পসম্প্রসারণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হইতেছে।

গত দশ বৎসর যাবৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার উপরোক্ত দোষগুলি ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, কতকগুলি রপ্তানীমুখী শিল্পে (যেমন পাট, চা প্রভৃতিতে) ছয়টি বৃহৎ ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ৫০% বাড়িয়া গিয়াছে; ইহাতে অন্যান্য দেশীয় শিল্পের গুরুত্ব কেবল যে হ্রাস পাইয়াছে তাহা নহে, প্রভূত মুনাফা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, দেখা যাইতেছে যে পরিচালনগত কেন্দ্রিকতা যত বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই দেশে ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদনসংস্থা অধিক সংখ্যক বজায় থাকিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ দামের ব্যাপারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ক্রমে

এই প্রথার কিরূপ বৈশিষ্ট্য বর্তমানে দেখা যাইতেছে

গড়িয়া উঠিলেও পাশাপাশি মাত্রাবৃদ্ধির ব্যয়সংকোচন ও বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকীকরণ কিছুই বৃদ্ধি পাইতেছে না। উপরন্তু, কতকগুলি ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পে যেমন বস্ত্রশিল্পে, শেয়ারের মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি গড়ে ৪০টি কোম্পানীর ডিরেক্টার হইয়া আছেন।

এই প্রথার প্রসার অব্যাহত থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হইল দেশে মূলধনের স্বল্পতা, ঝুঁকি বহনেচ্ছু মূলধনের অধিকতর অভাব। পুঁজি সরবরাহের উপযোগী নূতন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবও এই ব্যবস্থা প্রসারের একটি কারণ। সর্বোপরি, এই প্রথা একেবারে দূর করিতে সরকারী অনিচ্ছা, সরকার কর্তৃক ইহাদের পুঁজি সরবরাহ এবং সরকারী শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিক পরিমাণে ইহাদের সহযোগিতা কামনা করা—এই সকল নীতিই পরিকল্পনাকালে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার প্রসারের কারণ।

এই প্রথার প্রসার কেন ঘটিতেছে

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার সংস্কার (Reforms of Managing Agency System) : এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act) সংশোধনের সময় হইতে এই প্রথা সংস্কারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। এই আইনের প্রধান বিষয়গুলি ছিল : (ক) কোন ব্যাঙ্কিং বা বীমা কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেণ্ট বসান চলিবে না। (খ) কোন কোম্পানীতে ২০ বৎসরের অধিককাল ম্যানেজিং এজেন্সী চলিবে না, উহার পরে শেয়ার-ক্রেতাদের সভায় পুনরায় পাশ করাইয়া লইতে হইবে; (গ) ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য-সংখ্যার ⅓ অংশের অধিক সদস্য ম্যানেজিং এজেণ্টের মনোনীত হইতে পারিবে না। (ঘ) বিক্রয় বা উৎপাদনের উপর কমিশন ভবিষ্যতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; অফিস সংক্রান্ত নির্দিষ্ট ব্যয় ও নীট মুনাফার শতকরা নির্দিষ্ট অংশ মাত্র ম্যানেজিং এজেন্সির পাওনা হইবে। (ঙ) ম্যানেজিং এজেন্সির অধীনস্থ এক ফার্মের টাকায় অপর ফার্মের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করা চলিবে না। (চ) সর্বোপরি, এক ম্যানেজিং এজেণ্ট নিজের পরিচালনাধীন কোন ফার্মের ঠিক প্রতিযোগী অপর কোন ফার্মের ম্যানেজিং এজেণ্ট হইতে পারিবে না।

১৯৩৬ সালের আইন

কিন্তু আইন করিয়া এই সকল ত্রুটি ও অন্যায় রোধ করা যায় না, আইনের বন্ধন কাটাইবার মত অর্থ, বুদ্ধি ও সংগঠন ইহাদের আছে। তাহা ছাড়া আইনের প্রায় সকল ধারাই ভবিষ্যৎ ম্যানেজিং এজেণ্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; পুরাতন প্রচলিত চুক্তিগুলির উপর আইন ততটা হস্তক্ষেপ করে নাই। তাহার ফলে ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীগুলির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ হইল, এইভাবে কোম্পানীগুলির ম্যানেজিং এজেণ্ট পরিবর্তিত হইতে থাকিল। ১৯৫১ সালে একটি সংশোধনী আইনে স্থির হইল যে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়া কেবলমাত্র তাহার সম্মতি-ক্রমেই কোম্পানীগুলির ম্যানেজিং এজেণ্ট পরিবর্তিত হইতে পারিবে। ভাবা-র নেতৃত্বে কোম্পানী আইন কমিটি (ভাবা কমিটি) প্রতিষ্ঠিত হইল। এই কমিটি ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে রাজি হইল না এবং উহার সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করিল। ভারত সরকার সেই সকল সুপারিশের অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া ১৯৫৬ সালে একটি নূতন কোম্পানী আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বহু দোষ ত্রুটি রোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইল।

ভাবা কমিটির প্রতিষ্ঠা

১৯৫৬ সালের এই আইন ১৯৩৬ সালের আইনের তুলনায় অধিকতর কঠোর ও ব্যাপক। আইনের ধারাগুলির মধ্যে প্রধান হইল: (ক) কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়া দিতে পারিবেন, কবে হইতে কোন্ শিল্পে আর কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট থাকিতে পারিবে না। (খ) ১৯৬০ সালের ১৬ই আগষ্টের পর হইতে বর্তমানের সকল ম্যানেজিং এজেন্সীর কার্যকাল শেষ হইবে। উহার পরে প্রথমবার একযোগে ১৫ বৎসরের বেশি সময়ের জন্য কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট আর নিযুক্ত হইতে পারিবে না। বর্তমানের চলতি এজেণ্ট পুনরায় ১০ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবে, যদি প্রথমে শেয়ার-ক্রেতাদের সাধারণ সভা ও পরে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে সম্মত হয়। জনস্বার্থে কোন শিল্পে ম্যানেজিং এজেন্সী নিতান্ত দরকার, ম্যানেজিং এজেন্সীর চুক্তি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত, এবং ম্যানেজিং এজেণ্ট যোগ্য ব্যক্তি—এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার নীতি স্থির করিবেন। কোথাও অমত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোম্পানী আইন উপদেষ্টা কমিশনের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া লইতে হইবে। (গ) ১৯৬৯ সালের ১৫ই আগষ্টের পর কেহ ১০টির বেশি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট থাকিতে পারিবে না (কিন্তু

সেক্রেটারী বা কোষাধ্যক্ষ থাকিতে পারিবে)। (ঘ) ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার ১০%-এর বেশি হইবে না; কোন বৎসর লাভ না হইলে বা কম হইলে ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত পাইতে পারিবে। কোম্পানীর সাধারণ সভায় হিসাব পরীক্ষা ও পাশ না হওয়া পর্যন্ত ম্যানেজিং পারিশ্রমিক পাইবে না। নীট মুনাফার ১০%-এর অধিক পারিশ্রমিক দিতে হইলে কোম্পানীর শেয়ার ক্রেতাদের একটি বিশেষ প্রস্তাবে ইহা পাশ হওয়া চাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন চাই; তবে ১১% হইল সর্বাধিক সীমা। পৃথক করিয়া কোন অফিস-সংক্রান্ত ব্যয় পাইবে না, তবে প্রকৃত খরচ পাইতে পারিবে। দালালি, পারিশ্রমিক, রিবেট, কমিশন, খরচা—প্রভৃতি খাতে আর কিছু পাওনা নিষিদ্ধ করা হইল। (ঙ) এই আইন ম্যানেজিং এজেন্টদের ক্ষমতার উপর কিছু কিছু বাধা আরোপ করার চেষ্টা করিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্ট সেই কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডের তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনাধীনে কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও গঠননীতি অনুযায়ী কাজ করিবে। কোন পরিচালিত কোম্পানী (managed company) ম্যানেজিং এজেন্টকে বা এজেন্সী হাউসকে টাকা ধার দিতে পারিবে না; একই এজেন্সীর পরিচালনাধীনে বিভিন্ন কোম্পানীর পারস্পরিক ঋণ দান চলিবে না। ডিরেক্টার সভার সভ্য সংখ্যা ৫ হইলে ১ জন এবং উহার অধিক হইলে ২ জনের বেশি সদস্য ম্যানেজিং এজেন্ট কর্তৃক মনোনীত হইতে পারিবে না। একই ধরনের দ্রব্যোৎপাদনকারী ও প্রতিযোগী অপর কোন ফার্মের পরিচালন ভার কোন ম্যানেজিং এজেন্ট গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৯৫৬ সালের আইনের বিবিধ প্রচেষ্টা

ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার দিক হইতে ১৯৫৬ সালের আইন এত শিথিল যে, ইহার দ্বারা এই প্রথার কুফলগুলি এখনও দূর করা যাইবে না। এই আইনের এত ফাঁক রহিয়াছে যে একচেটিয়া ব্যবসাদারদের কার্যকলাপ রোধ করার সাধ্য এই আইনের নাই। যেমন ম্যানেজিং এজেন্টরা এই আইনের পরেও নিম্নলিখিত যে কোন একটি পথ গ্রহণ করিতে পারে:

—১০টি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী হাতে রাখিয়া যত খুসি সংখ্যক কোম্পানীর সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ হইয়া উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারে।

—নিজের বড় ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসকে ভাঙিয়া স্বনামে বেনামে ছোট

ছোট ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস্ গড়িয়া তুলিয়া প্রত্যেকে ১০টি করিয়া কোম্পানী রাখিতে পারে।

—পরিচালিত ছোট ছোট কোম্পানীগুলিকে একত্র করিয়া বড় বড় কোম্পানীতে পরিণত করিয়া ১০টি কোম্পানীই হাতে রাখিতে পারে।

—যে কোন নূতন কোম্পানী খুলিয়া উহাকে পুরাতন কোন কোম্পানীর শাখা বলিয়া অভিহিত করিতে পারে, কারণ একটি কোম্পানী কত প্রকার দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজ হাতে লইতে পারে আইনত তাহার কোন বাধা নাই।

এইরূপে আইনের প্রতিটি ধারার সুড়ঙ্গ পথই একচেটিয়া ব্যবসাদারদের পরিচিত এবং ১৯৫৬ সালের নূতন কোম্পানী আইন ম্যানেজিং এজেন্সীর দোষত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে বলিলেও ভুল হইবে না।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ (The future of the Managing Agency System):

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হওয়া উচিত কি না সেই সম্পর্কে ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এখনও একমত হইতে পারেন নাই। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কমিশন ও কমিটি লইয়া আলোচনা করিয়াছে কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই। ফিস্‌কাল কমিশন, আয়-কর অনুসন্ধান কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি, কোম্পানী আইন কমিটি, কোম্পানী বিলের জন্য গঠিত জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি—সকলেই এই সমস্যা লইয়া কম-বেশি আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই প্রথার স্বপক্ষে ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল যে বর্তমান ভারতে ইহার প্রয়োজন এখনও ফুরায় নাই (not yet outlived its utility)। যেমন বোম্বাই মিল মালিকদের সমিতি বলিতেছেন যে "the necessity of managing agency system arises from the fact that it is impossible in the present state of banking in this country to find either the share capital at intial state or the other finance necessary to run a particular concern unless it is backed by a firm of substantial resources." এখনও পর্যন্ত ভারতে উপযুক্ত ধরনের শেয়ার ও বিল বাজার গড়িয়া উঠে নাই, শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী সাহস বিনিয়োগকারীরা অনুভব করিতেছে না

অনেকে বলেন এখনও ইহার প্রয়োজন ফুরায় নাই

এই অবস্থায় কোন বৃহৎ ম্যানেজিং এজেন্টদের নাম যুক্ত থাকিলে লোকে ভরসা করিয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করে। সুতরাং মূলধন-প্রাপ্তির প্রয়োজনে এই প্রথা এখনও বজায় থাকা দরকার। বর্তমানেই এই প্রথা তুলিয়া দিলে বিনিয়োগকারী এবং নূতন যৌথ মূলধনী কোম্পানী সমূহের মধ্যে বর্তমান যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—ইহাও মনে রাখা দরকার। ভারতে এই প্রথা উৎপত্তির যে সকল কারণ ছিল বর্তমানে উহারা মোটেই দূরীভূত হয় নাই। আমাদের দেশে সুসংগঠিত বাজার ছিল না, আণ্ডার রাইট করার উপযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, হোল্ডিং কোম্পানী ছিল না. বিনিয়োগকারী ট্রাষ্ট বা সিণ্ডিকেট ছিল না—উন্নত দেশগুলিতে ইহারা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের নেতা বা বাহক। এই সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমান ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করা যায় না, তাই ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার প্রয়োজনও নিঃশেষ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা চলে না। দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্টদের সরাইয়া দিয়া পৃথক পৃথক মালিকানায় কোম্পানীগুলিকে ছড়াইয়া দিলে প্রত্যেকটির পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং সকল প্রতিষ্ঠানে যে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হইয়াছে সেইগুলি মধ্যপথে বন্ধ হইয়া যাইবে।

তৃতীয়ত, বর্তমানে ভারত শিল্পবিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করিতেছে, স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু হইতেছে। এই পথে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব করিবে অভিজ্ঞ ও যন্ত্রদক্ষ পরিচালকবৃন্দ; কোম্পানীগুলির দৈনন্দিন পরিচালনার কাজে উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত উদ্যোক্তাশ্রেণী ভারতে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। আমরা তাই এইরূপ ব্যবসায় পরিচালনার অভিজ্ঞতা ভাণ্ডারকে কোনমতে উপেক্ষা করিতে পারি না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রবল মুদ্রাস্ফীতি রহিয়াছে, এই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধিই প্রধান কাজ। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা তুলিয়া দিলে সমগ্র উৎপাদন-কাঠামো বানচাল হইয়া পড়িবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ শ্লথ তো হইবেই, দেশে বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সর্বোপরি, ভারতের ম্যানেজিং এজেন্টদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একাংশ বিদেশীদের মালিকানায় পরিচালিত। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা তুলিয়া দিলে ইহাদের মাধ্যমে যে বৈদেশিক মূলধন ভারতে আসিত তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা যখন বৈদেশিক মূলধন সাদরে আহ্বান করিতেছি, সেই

অবস্থায় ইহার আগমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে কি? এই বৈদেশিক মূলধনের ভারতে অনুপ্রবেশ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংকটকে অনেক পরিমাণে সমাধান করে তাহা আমরা জানি। ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাকে এখনই সরাইয়া দিলে এই সংকট তীব্রতর হইয়া উঠিবে।

অপরপক্ষে, এই প্রথার বিরোধীদের বক্তব্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহাদের মতে উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বর্তমানে মূলধনের বাজার পূর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত, ফলে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা না থাকিলেও মূলধন তুলিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। বরং নানাবিধ দুর্নীতিপূর্ণ এই প্রথা বজায় থাকার ফলেই নূতন ও সৎ বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারে তাহাদের সঞ্চয় খাটাইতে ভরসা পান না। উপরন্তু, এই প্রথা ভারতের শিল্পক্ষেত্রে একপ্রকার সামন্ততন্ত্র (industrial feudalism) গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহার আশু অবলুপ্তি দরকার। দেশের সমগ্র শিল্প-কাঠামোতে এক ধরনের জমিদারী প্রথা কায়েম হইয়া বসিয়াছে, ইহা শিল্পপতিদের মানসিক চিন্তাভাবনা, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের মান নিচু করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে শিল্পে আধুনিকীকরণের কাজে বাধা দিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও উৎপাদন পদ্ধতির বিরোধিতা করিতেছে। আজকালকার বেশির ভাগ কোম্পানীই সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য পায়, তাই জনসাধারণের অর্থে এইরূপ একশ্রেণীর শোষক উত্তরাধিকার-সূত্রে স্ফীত হইতে থাকিবে—স্বাধীন ভারতে, বিশেষত দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা ঘোষণা করিয়া আমরা তাহা মানিয়া লইতে পারি না। যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্টরা ভারতের বাহিরে প্রতি বৎসর প্রেরণ করে তাহাতে কেবল দেশের মূলধনই হ্রাস পাইতেছে তাহা নহে, বৈদেশিক মুদ্রাসংকটও গভীরতর হইতেছে। সর্বোপরি, এই প্রথার মধ্য দিয়া আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, একচেটিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে, মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে দেশের শিল্প-শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তাই অবিলম্বে এই প্রথার বিলুপ্তি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আবার অনেকে বলেন ভারতের নূতন শিল্প যুগে ইহার প্রয়োজন নাই

এই উভয় মতের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনরূপ মিল নাই, তাই এই তর্ক এখনও চলিতেছে। তবে এই প্রথা তুলিয়া দিলে কোনরূপ ক্ষতি হইবে কি না তাহা আলোচনার বিষয়। অতীতে এই প্রথা ভারতে শিল্প কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, সুতরাং বর্তমানে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা

দরকার—এইরূপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। ভারতে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে, বর্তমানে ম্যানেজিং এজেন্টরা আর শিল্প-ঋণের বেশি অংশ সরবরাহ করে না। সরকারী বহু অর্থ বিনিয়োগ সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, উদ্যোগী শিল্পপুরুষরা এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রমশ অধিক পরিমাণে ঋণ পাইতেছে। উপরন্তু, আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এত অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় যে, কোন ম্যানেজিং এজেন্টের পক্ষে উহা সরবরাহ করা একান্ত অসম্ভব। ইতিমধ্যে ভারতের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এই বিষয়ে শুভ-পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাঁহারা ক্রমশ শিল্প কলকারখানাকে ঋণ দিতে আগাইয়া আসিতেছেন। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। যদি এই প্রথার বিলোপ ঘটে, তবে ম্যানেজিং এজেন্টদের টাকাকড়ি সমস্ত কিছু দেশের গুপ্তগহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া চলিয়া যাইবে তাহা নহে। সরকারী ঋণপত্র, ব্যাঙ্কের আমানত এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার—প্রভৃতির মাধ্যমে উহা দেশের মধ্যে অর্থের ও মূলধনের বাজারেই ঘুরিয়া আসিবে। ইহাদের মধ্যে সরকারী ঋণপত্রে ও ব্যাঙ্কের আমানতে নিয়োগ করিলে সুদের হার কম, তাই স্বভাবতই উহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে নিযুক্ত হইবে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ম্যানেজিং এজেন্সী ছাড়াও পরিচালন-যোগ্যতা ও দক্ষতার কোন অভাব হয় না, ভারতেই বা আত্মনির্ভরশীল নূতন ব্যবসায়ী শ্রেণীর কেন উদ্ভব হইবে না? সর্বোপরি, বর্তমানে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে, শিল্পক্ষেত্রে সমবায় গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, শিল্প পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্থান আছে বলা হইতেছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে একচেটিয়া স্থাপনের প্রধান পথ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলুপ্ত করা বিশেষ প্রয়োজন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রথা তুলিয়া দিলে কোন বিরূপ প্রভাব হইবে কি?

অনুশীলনী

1. "The Managing Agency System has outlived its usefulness". Discuss the statement. (C. U. B. Com. 1951)

2. How far it is necessary to do away with the system of managing agency in this country? Give full reasons. (C. U. B. Com. 1955)

3. Give your own evaluation of the part played by the Managing Agency system in India's economic development. (C. U. B. Com. 1959)

4. "Although in the initial stages the Managing Agency system played an important role in the development of industries in India, it has several drawbacks." Discuss. (C. U. B. A. 1953)

5. Explain the peculiarities of the Indian Managing Agency system as a form of industrial organisation. Do you think that the system has outlived its utility ?

6. Give critical estimate of the role of managing agents as providers of industrial finance. Do you advocate the total elimination of managing agents ? Give reasons.

7. Write short notes on : Managing Agency system in India.

বেসরকারী ক্ষেত্র : শিল্পে পুঁজি সরবরাহ

Private Sector : Industrial Finance

বেসরকারী শিল্পে পুঁজির যোগান ও উৎস (Supply and agencies of finance in the Private Sector)

সাধারণত প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দুই প্রকার মূলধনের প্রয়োজন দেখা যায় : দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন। যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখিবার জন্য স্থায়ী ধরনের মূলধন দরকার এবং কাঁচামাল কেনা, মজুরি দেওয়া, প্রচারও বিক্রয়সংগঠন করা প্রভৃতিতে স্বল্পকালের জন্য চল্‌তি মূলধন দরকার। উন্নয়নের যুগে সমাজে মূলধন-গঠনের প্রয়োজনেই বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং এই প্রতিষ্ঠান-সমূহ আবার মূলধন-গঠনের গতিকেই বাড়াইয়া তোলে। এতদিন আমাদের দেশে শিল্পপ্রসার পূর্ণমাত্রায় অগ্রসর হয় নাই এবং মূলধনের পরিমাণ ও মূলধন-গঠনের হার কম থাকায় এইরূপ বিশেষ ধরনের পুঁজিযোগানকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বর্তমানে ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে তাই এইরূপ সমস্যা দেখা দিয়াছে।

শিল্পে পুঁজির প্রয়োজন

উন্নত দেশসমূহে বেসরকারী শিল্পরা সাধারণত নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে অর্থ পাইয়া থাকে : (ক) শেয়ার বিক্রয়, (খ) ডিবেঞ্চার বিক্রয়, (গ) ব্যাঙ্ক, ও (ঘ) *অন্যান্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমাদের দেশে* খুব নামকরা বড় ব্যবসায়ী ছাড়া অপর কেহ শিল্পোদ্যোগ শুরু করিলে সাধারণত সেই *কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় হয় না। শেয়ার-বাজারে ফাটকাদারদের প্রাধান্য* থাকায় অনভিজ্ঞ সঞ্চয়কারীরা শেয়ার বাজারে যাইতে চাহে না। তাহা ছাড়া, জমিতে সর্বোচ্চ সীমা এতদিন বাঁধা ছিল না, তাই সঞ্চিত অর্থ প্রধানত জমি-ক্রয়ে আবদ্ধ থাকিত। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি বহন করিয়া লয় এইরূপ বিনিয়োগ সংস্থাও দেশে প্রসার লাভ করে নাই। দ্বিতীয়ত, বাঁধা-সুদের হার পাইতে থাকিবে এইরূপ ডিবেঞ্চার আমাদের দেশের সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পছন্দ করেন না। উহা সেই দেশেই সম্ভব, যেখানে প্রচুর মূলধন আছে। কিরূপে উহা হইতে স্থায়ী আয় পাওয়া যায় ব্যক্তিদের নিকট তাহাই সমস্যা।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশেব ব্যাঙ্কগুলি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কিং প্রথা অনুসবণ কবিযা চলিযাছে, কারণ ইহাবা ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলিব অনুকবণে গডিযা উঠিযাছে। ইহাবা স্বল্পকালের জন্য ধাব দেয এবং সাধাবণত শিল্পকে টাকা ধাব না দিযা ব্যবসাযের উদ্দেশ্যে ঋণ দেয। প্রচুব পবিমাণ বন্ধক চাহে, সুদেব হাবও কম নয়। ঋণ গ্রহণেব সংবাদ বাজাবে জানাজানি হইলে সুনাম ও ঋণ প্রাপ্তিব ভবিষ্যৎ সুযোগ নষ্ট হইবাব ভয থাকে। তাই আমাদেব একচেটীয ব্যবসাদাবরা প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজেবা ব্যাঙ্ক স্থাপন কবিযা বা নিযন্ত্রণ কবিযা সেই অর্থে ব্যবসায চালায। কিন্তু মাঝাবি ও ছোট শিল্পপতিবা এই সুযোগ পায না। চতুর্থত, অন্যান্য বিনিযোগকাবী উৎসেব মধ্যে প্রধান হইল সবকাব। ভাবত সবকাব মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন কবাব নীতি গ্রহণ কবিযাছে তাই বেসবকাবী শিল্পপ্রসাবেব জন্য ঋণ দেয। এই উদ্দেশ্যে বাজ্যসবকাবগুলিব শিল্পবিভাগ হইতেও ঋণ দেওযাব নীতি প্রচলিত আছে। তাহা ছাডা সবকাব বেসবকাবী বৃহৎ শিল্পকে সবকাবী অর্থে সাহায্য কবাব উদ্দেশ্যে শিল্পপুঁজি সংস্থা (Industrial Finance Corporation) স্থাপন কবিযাছেন। মাঝাবি ও

ভারতে শিল্প ঋণের উৎসসমূহ

ক্ষুদ্র আযতনেব বেসবকাবী শিল্পকে সবকাবী অর্থ সাহায্য কবাব উদ্দেশ্যে বাজ্য পুঁজি সববরাহ সংস্থা (State Finance Corporation) স্থাপিত হইযাছে। বেসরকাবী ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্যেব জন্য কেন্দ্রীয সবকাবেব অর্থে জাতীয ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা (National small industries corporation) স্থাপিত হইযাছে। উপবন্তু, সবকাবী অর্থে, নূতন বেসবকাবী শিল্প স্থাপন ও সামগ্রিক পবিচালনাব কাজ চালাইবাব জন্য জাতীয শিল্পোন্নযন সংস্থা (National Development Corporation) গঠিত হইযাছে। সবকাবী উৎসাহে ও পবোক্ষ সাহায্যে ভারতীয শিল্পপুঁজি ও বিনিযোগ সংস্থা (Industrial Credit and Investment Corporation of India) এবং পুনবর্থসাহায্য সংস্থা বা রি-ফিনান্স করপোবেশন স্থাপিত হইযাছে।

ভাবতেব ব্যক্তিক্ষেত্র কোন ধবনেব উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহ কবে তাহা পবপৃষ্ঠাব তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। ইহা দ্বিতীয পবিকল্পনা কালেব হিসাব।*

* *Third Five Year Plan*. P. 456.

		কোটি টাকার হিসাবে
১।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগত এজেন্সী হইতে ঋণ	৮০
২।	কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দান	২০
৩।	বৈদেশিক মূলধন (বিক্রেতা প্রদত্ত ঋণ সহ)	২০০
৪।	নূতন শেয়ার বিক্রয়	১৫০
৫।	আভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য সূত্র	৪০০
	মোট	৮৫০

শিল্পে পুঁজি সরবরাহের উপযোগী নূতন প্রতিষ্ঠানসমূহ (The new institutions to supply industrial finance)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্রের রূপ পরিবর্তিত হইতেছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে আয়-বৈষম্যের পরিধি হ্রাস পাইতেছে, ক্রমশ অধিকসংখ্যক ব্যক্তির হাতে সঞ্চয় চলিয়া যাইতেছে। পুরাতন সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি এখন আর নাই, ব্যক্তির ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বল্প সঞ্চয়ী ব্যক্তির পক্ষে বিনিয়োগে টাকা খাটান-র সুযোগ আর বিশেষ নাই বলিলেই চলে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা আজকাল অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে নূতন বৃহৎ শিল্প স্থাপনে প্রভূত বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে এবং বর্তমান শিল্পগুলিতে দীর্ঘকালীন মূলধন-নিয়োগের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। নূতন বৃহৎ শিল্প স্থাপন এবং বর্তমান শিল্পগুলির প্রসার ও আধুনিকীকরণ-- এই দুই উদ্দেশ্যে সকল অপূর্ণোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও অর্থবিনিয়োগ সংস্থা বা ফিনান্স করপোরেশন গঠিত হইয়াছে। "সরকারী ও বেসরকারী টাকাকে সরকারী, বেসরকারী বা মিশ্রিত কোম্পানীসমূহে, সমবায়ী বা অন্যান্য ধরনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে, তাহাদের মাঝারি ও দীর্ঘকালীন প্রয়োজনে খাটাইবার জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। ঋণ ও শেয়ার-মূলধন—উভয় ধরনেই এইরূপ মূলধন বিনিয়োগ ঘটিতেছে। শিল্প কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা—উভয় কার্যেই ইহারা অর্থবিনিয়োগ করিতেছে।"

কেন এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে

এই সকল অর্থবিনিয়োগ সংস্থার প্রকৃতি এবং কাজকর্মের পরিধি সকল দেশে সমান নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ন্যায় উন্নত দেশসমূহে সাধারণত

ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থসাহায্য করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। সেই সকল দেশে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানদের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করার পথে কোনরূপ বিশেষ বাধা নাই। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানরাই অর্থসংগ্রহের সমস্যার সম্মুখীন। অপরপক্ষে, অনুন্নত দেশসমূহে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সম্মুখেই এই সমস্যা বর্তমান। উপরন্তু, অপূর্ণোন্নত দেশে, মূলধন সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ঝুঁকি দক্ষ শ্রমিক ও পরিচালকবর্গ সংগ্রহ করা এইরূপ সকল প্রকার সমস্যারই সমাধান করিতে হয়।

ইহাদের উদ্দেশ্য কি

এইরূপ নূতন অর্থবিনিয়োগ সংস্থাসমূহ গড়িয়া উঠার কয়েকটি কারণ আছে। অনুন্নত দেশে লোকের সঞ্চয় নিভৃতে লুক্কায়িত থাকিতে চায়, শিল্প কলকারখানায় মূলধন হিসাবে, বিশেষত নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আসিতে চায় না। আর এইরূপ দেশে ব্যক্তির হাতে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের পরিমাণও কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, ফলে উৎপাদন দ্রুত বাড়ান দরকার। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য ঘুচাইবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিতান্ত প্রয়োজন। অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে মূলধনের বাজার অনেকাংশে অসংগঠিত। এই সংস্থাগুলি কেবলমাত্র অর্থ-বিনিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। তাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার বিক্রয়ে সাহায্য করে এবং এইরূপে মূলধনের বাজারকে সতেজ করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠান অবশ্য প্রয়োজনীয়। সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অনুপূরক কোন বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়তো প্রতিষ্ঠা করা দরকার, কিন্তু কোন বেসরকারী উদ্যোক্তা অগ্রসর হইতেছে না, এই অবস্থায় অতি-অবশ্য শেয়ার-মূলধনে সাহায্য করিয়া বা ঋণ দিয়া সেই শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অর্থ বিনিয়োগ সংস্থাগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে। সর্বোপরি, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে, এবং উন্নয়নের প্রথম যুগে, ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়, মূলধনের বাজার হইতে ইহাদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা খুবই অসুবিধাজনক। তাই ইহাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ বিনিয়োগ সংস্থা গড়িয়া তোলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভারতেও এই সকল উদ্দেশ্যে নানারূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

ইহাদের উপযোগিতা কিরূপ

শিল্পপুঁজি করপোরেশন (Industrial Finance Corporation)

১৯১৮ সালের শিল্প কমিশন, ১৯৩০-৩১ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি উভয়েই বেসরকারী শিল্পে পুঁজি সরবরাহের জন্য এইরূপ একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সালের ১লা জুলাই সংসদের আইন অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পপুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরিচালনাভার ১৫ জন ডিরেক্টরের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।*

শিল্পপুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান একটি স্বয়ং চালিত প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি শেয়ার ৫০০০ টাকা মূল্যের ২০০০০ শেয়ারে বিভক্ত মোট ১০ কোটি টাকা ইহার অনুমোদিত মূলধন। বর্তমানে ১০০০০ শেয়ার বাজারে ছাড়া হইয়াছে, অর্থাৎ ৫ কোটি টাকা মূলধন তোলা হইয়াছে। আইনে নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানীসমূহ, বিনিয়োগকারী ট্রাষ্টসমূহ এবং সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ মিলিয়া এই শেয়ারগুলি ক্রয় করিয়াছে। ভারত সরকার মূলধন ফেরত দিতে এবং নিম্নতম ২½% হারে (করমুক্ত) বাৎসরিক লভ্যাংশ দিতে গ্যারান্টি দিয়াছেন। শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারে ; ইহার পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশি হইবে না। রাজ্যসরকার এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতেও ইহা আমানত লইতে পারে। এইরূপ আমানত ৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য নয়। অবশ্য এখন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান কোনরূপ আমানত গ্রহণ করে নাই। বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ইহার শেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধন ও রিজার্ভের ৫ গুণ পর্যন্ত অর্থ উঠাইতে পারিবে। এই সকল বণ্ড ও ডিবেঞ্চারের পরিশোধ ও সুদ প্রদানে ভারত সরকার গ্যারান্টি প্রদান করিবে।

ইহার মূলধন-কাঠামো

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের সিকিউরিটির বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনধিক ৯০ দিনের জন্য ইহা ঋণ লইতে পারিবে। নিজের ডিবেঞ্চারের বিনিময়েও সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনধিক ১৮ মাসের জন্য ঋণ লইতে পারিবে, তবে উহার মোট পরিমাণ কখনও ৩ কোটি টাকার বেশি হইতে পারিবে না।

* কেন্দ্রীয় সরকার ৩ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২ ; ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য শেয়ার ক্রেতাদের প্রত্যেকের ২ জন ; বোর্ডের সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে ঋণদানের ক্ষমতা ইহাকে দেওয়া হয় নাই, রাজ্য পুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহ (S. F. C) সেই কাজ করিবে। ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বে গঠিত বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে গঠিত কোম্পানীদের ঋণ দিতে পারিবে না। সরকারী ক্ষেত্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানদেরও ইহা মূলধন সরবরাহ করিতে পারিবে না। ইহা কেবলমাত্র বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃহৎমাত্রায় গঠিত যৌথ মূলধন বা সমবায়ী প্রথায় গঠিত প্রতিষ্ঠানদের ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

এই শিল্পপুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটির তিন ধরনের কাজ আছে, অর্থাৎ তিনরূপে ইহারা সাহায্য করিতে পারে: (ক) বৃহৎ শিল্পকে প্রয়োজনের সময় ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য মাঝারি ও দীর্ঘকালীন ঋণদান করিতে পারে। (খ) কোন বৃহৎ শিল্প জনসাধারণের নিকট হইতে ২৫ বছরের কম সময়ের জন্য ঋণ লইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলে ইহা সেই গ্যারান্টি দিতে পারে। (গ) কোন বৃহৎ শিল্প যদি শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়িতে চায় তবে ইহা ঐ সকল আণ্ডাররাইট করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান নিজে কোন কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত ইহা কেবলমাত্র প্রথম ধরনের কাজই করিয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের কাজে হাত দেয় নাই। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার এবং I. B. R. D. প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণদান করিলে এই প্রতিষ্ঠান উহাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবে। কোন আমদানীকারী ব্যবসায়ী বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ঋণ চাহিলে এই শিল্পপুঁজি প্রতিষ্ঠান উহা গ্যারান্টি করিতে পারে।

ইহার কাজকর্ম বা সাহায্য কি ধরনের

১৯৫২ সালের সংশোধনী আইনে এই সংস্থা জাহাজ কোম্পানীকে ঋণ দিতে পারিবে এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রথম আইনে কোন প্রতিষ্ঠানকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারিত, এই সংশোধনী আইনে ১ কোটি পর্যন্ত ঋণদান করা চলিবে। ১৯৫২ সালের সংশোধনী আইন অনুযায়ী ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৬ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাইতে পারে। এই সংশোধনী আইনে পুনর্গঠন ও উন্নয়নকামী আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক-এর (International Bank for Reconstruction and Development) নিকট হইতে ঋণ আনিবার ক্ষমতাও ইহাকে দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫২ সালের সংশোধন

শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এই সংস্থাটির দায়িত্ব বাড়িয়া যাওযায় ১৯৫৭ সালে I. F. C. (Amendment) Act 1957 বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, (ক) শেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের ৫ গুণের স্থলে ইহা এখন ১০ গুণ পযন্ত ঋণ করিতে পারিবে; (খ) জনসাধারণ ছাড়াও রাজ্যসরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে; (গ) কোন আমদানী ব্যক্তি যদি বিদেশের বিক্রেতার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারে তবে পরে পরিশোধ দেওযা হইবে ইহা গ্যারাণ্টি দিতে পারিবে। (ঘ) আরও অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ইহার নিকট হইতে সাহায্যের সুবিধা পাইবে।

১৯৫৭ সালের সংশোধন

ইহার কাজকর্ম কিরূপে পরিচালিত হয (functioning)? কোন ঋণ দিবাব পূর্বে করপোরেশন সকল প্রকার সংবাদ চাহিযা পাঠায়, যেমন কি দ্রব্য উৎপাদন হইবে কারখানাটি কোথায় অবস্থিত, জমি ও গৃহ প্রভৃতির মালিকানা স্বত্ব কিরূপ, শক্তি সম্পদ ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান কিরূপ, বিক্রয়ের সম্ভাবনা কিরূপ, সম্ভাব্য ব্যয কতটা, যন্ত্রের গুণাবলী ও উৎকর্ষ কিরূপ, বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য কিরূপ, কি উদ্দেশ্যে ঋণ লওযা হইতেছে, মুনাফা তোলার এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা কতখানি প্রভৃতি। এই সকল খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহের পর করপোরেশন হইতে দক্ষ অফিসারগণ কোম্পানীটির হিসাবপত্র পরীক্ষা করেন, সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করেন, পরিচালনার কাজ সন্তোষজনক কি না তাহা বিচার করেন, কাচামাল ও বাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। ঋণদানের পরে উহা উপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কি না সেই বিষয়ে করপোরেশন হইতে কিছুকাল অন্তর অন্তর রিপোর্ট লওযা হয। ভারত সরকারের বিভিন্ন দফ্‌তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিয়া করপোরেশন কাজ করে। ইহার পাঁচটি উপদেষ্টা কমিটি আছে, উহারা বস্ত্র, শর্করা, এন্‌জিনিয়ারিং, রাসায়নিক এবং বিবিধ শিল্পের কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত ঋণের দরখাস্তগুলিকে বিবেচনা করে।

কাজকর্ম কিরূপে পরিচালিত হয

ঋণদানের সময়ে এই করপোরেশন কতকগুলি বিষয়ে বিবেচনা করে। (ক) শিল্পটির জাতীয় গুরুত্ব; (খ) দেশে উৎপন্ন দ্রব্যটির প্রয়োজন কতটা; (গ) যন্ত্রদক্ষ লোকজন ও কাঁচামালের যোগান কিরূপ; (ঘ) পরিচালনদক্ষতার

স্থান কিরূপ; (ঙ) বন্ধকী দ্রব্যের প্রকৃতি; (চ) উৎপন্ন দ্রব্যটির গুণাগুণ কতটা, প্রভৃতি।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঋণের উপর করপোরেশন ৫½% হারে সুদ চাহিত, সময়মত পরিশোধ দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে ½% রিবেট দিত। কিন্তু করপোরেশন নিজে ক্রমশ বেশি-সুদে টাকা ঋণ করিতে বাধ্য হইয়া

কি সুদে ঋণ দেওয়া হয়

১৯৫২ সালে সুদের হার বাড়াইয়া ৬% ধার্য করিল, ১৯৫৩ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হইল ৬½%। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৭% হইয়াছে, সময়মত ঋণ পরিশোধের দরুণ ½% রিবেটের ব্যবস্থা বহাল আছে। সুদের হার বেশি বলিয়া বহু সমালোচনা করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে নূতন কোম্পানীগুলির পক্ষে এত বেশি সুদ বহন করা অসুবিধাজনক।

১৯৫২ সালে এই I. F. C. আইন সংশোধনের সময়ে এবং ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুঁজি করপোরেশন আইন সংশোধনের সময়ে করপোরেশনের কাজকর্মকে অনেকে বিপুল সমালোচনা করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ উথাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা চলে। (ক) ঋণদানের ব্যপারে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনতোষণ করা হইতেছে। (খ) প্রত্যক্ষ-ভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় বৃহৎ কতিপয় ব্যবসায়ীরা মিলিয়া ইহাকে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপে একদল বৃহৎ ব্যবসায়ী দেশের সমগ্র শিল্প-ক্ষেত্র নিজেদের করায়ত্ব করিতে পারিবে। (গ) অনুন্নত অঞ্চলসমূহের শিল্পোয়নে ইহা সাহায্য করিতে পারে নাই, কয়েকটি রাজ্য বিভিন্নরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজেদের জন্য অধিক অর্থ আদায়ে সক্ষম হইয়াছে। (ঘ) বৃহৎ সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীদের ইহা ঋণ দিয়াছে, কিন্তু

ইহার কাজকর্ম সম্পর্কে বিবিধ সমালোচনা

ক্ষুদ্র ও মাঝারিদের ঋণদানে ততটা ঔৎসুক্য দেখায় নাই। (ঙ) পরিকল্পনায় যেরূপ অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেই অনুযায়ী ঋণদানের নীতি প্রয়োগ করা হয় নাই। মূলধনী ও ভারী শিল্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ পাইয়াছে, অপরপক্ষে ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পসমূহ প্রভূত ঋণ পাইয়াছে। (চ) ঋণদানের পর কোম্পানীগুলির উপরে উপযুক্তভাবে নজর রাখা হয় নাই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে নাই। (ছ) শেয়ার-মূলধনে অংশগ্রহণ না করায় ইহার সাহায্যে ঝুঁকিশীল উৎপাদনে উদ্যোক্তারা অগ্রসর হইতে পারে নাই। (জ) করপোরেশন কেবল

সেই সকল কোম্পানীকেই ঋণ দিয়াছে যাহাদের মুনাফা ছিল প্রচুর। ইহারা নিজেরাই বাজারে প্রভূত ঋণ তুলিতে পারিত। (ঋ) করপোরেশনের কাজকর্ম ততটা দক্ষ নয় অথচ ইহার পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশি।

শিল্পপুঁজি সরবরাহ সংস্থার কার্যাবলীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে ও ভারতীয় সংসদে অনেক ধরনের প্রচার হওয়ায ১৯৫২ সালে সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইয়াছিল, উহা পরবৎসর একটি রিপোর্ট দেয়। সেই রিপোর্টে স্বজনপোষণ প্রভৃতি অভিযোগের হাত হইতে ইহাকে মুক্তি দিয়া ইহার কার্যদক্ষতা বাড়াইবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করা হইয়াছিল। ঐ সকল সুপারিশ শাসনবিষযক (administrative), কার্যরীতি-বিষযক (Procedural) এবং নীতিবিষয়ক (Policy matters), এই তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে।

শাসনবিষযক সুপারিশের মধ্যে প্রধান হইল: (১) একজন মাহিনাভোগী পূর্ণকালীন (Full time) চেয়ারম্যান রাখা; (২) উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করা; (৩) পরিচালক বোর্ডকে আরও প্রতিনিধি-স্থানীয় করা (৪) শাখা অফিসের আঞ্চলিক উপদেষ্টা রাখা। কার্যরীতি-বিষযক সুপারিশের মধ্যে প্রধান হইল: (১) এই সংস্থাব ডিরেক্টবরা যে সকল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা যে কোম্পানীব ম্যানেজিং এজেন্সীর সহিত জড়িত সেই কোম্পানী ঋণ পাইবে না। তবে কোন কোম্পানীর সাধারণ ডিরেক্টর হইলে বোর্ডের ⅔ অংশের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত ভোটে ঋণদান প্রস্তাব পাস হওয়া চাই। (খ) অধিক তথ্যবহুল ও বিস্তৃত বাৎসরিক রিপোর্টে ও সাময়িক বিবরণ প্রকাশ করা দরকার। (গ) ঋণদানে অযথা বিলম্ব দূর করা উচিত। (ঘ) ঋণের অন্তত ৫০% ভাগ মূল্য বন্ধক রাখা উচিত।

সুচেতা কৃপালনী কমিটির সুপারিশ

নীতি বিষয়ক সুপারিশগুলির মধ্যে প্রধান হইল: (ক) পরিকল্পনাতে শিল্প উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকা (Priorities for industrial development) মানিয়া ইহার ঋণ-নীতি স্থির করা দরকার। যে শিল্প প্রায় উন্নত স্তরে পৌঁছিয়াছে (পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী , সেই শিল্পে ঋণদান কমানো প্রয়োজন। (খ) সরকারের উচিত অনুন্নত অঞ্চল, অনুন্নত শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে সংস্থাটিকে পরিষ্কারভাবে জানানো। (গ) ৫০ লক্ষ টাকা ঋণের বেশি হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের

নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো, প্রভৃতি। ভারত সরকার মোটামুটি এই সকল সুপারিশ মানিয়া লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনিয়াছেন।

শিল্পপুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কার্য পর্যালোচনা, ইহার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Review of the working of the IFC, its role, progress and future prospects):

বিগত ১৩।১৪ বৎসর যাবৎ এই শিল্পপুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কাজ করিয়া আসিতেছে। ভারতের অনুন্নত মূলধনের বাজারে বেসরকারী বৃহৎ শিল্পপতিদের মূলধন পাওয়ার যে-সকল অসুবিধা হয়, এই প্রতিষ্ঠান তাহা অনেকটা দূর করিয়া আনিয়াছে। বিভিন্ন দিক বিচার করিলেই ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাইতে পারে। (ক) ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এই সংস্থা সর্বমোট ১৩৫.৫১ কোটি টাকার ৬৪৯টি দরখাস্ত পাইয়াছে, তাহার মধ্যে সে মোট ৬৬·৬৯ কোটি টাকার ৩০০টি দরখাস্ত অনুমোদন করিয়াছে। ইহার প্রায় ⅔ অংশই নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের (new industrial units) জন্য, এবং ইহার ⅓ অংশ ছিল পুরানো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির নূতনীকরণ, আধুনিকীকরণ ও প্রসারণের উদ্দেশ্যে। (খ) ঋণ প্রাপ্ত শিল্প অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যায় যে, এই ১১ বৎসরে চিনি, তুলাবস্ত্র, রাসায়নিক, সিমেণ্ট ও কাগজ প্রভৃতি মোট ৫০·৪১ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি ঋণ পাইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মোটামুটি ভাবে পুরানো প্রতিষ্ঠিত শিল্পদের ইহা ঋণ দিয়াছে। কিন্তু নূতন ধরনের শিল্প স্থাপনে উৎসাহী উদ্যোক্তাদের অধিক পরিমাণে ঋণ দেওয়া দরকার ছিল। দেশের শিল্প-কাঠামোর মধ্যে বহুপ্রকার, বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের শিল্প স্থাপিত হওয়া দরকার সেই দিকে এই সংস্থা ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। (গ) গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সংস্থা সমবায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণদান করিতেছে। মোট ঋণের প্রায় ২২% এইরূপ সমবায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইয়াছে। চিনি-শিল্পে ইহার পরিমাণ খুবই বেশি। যেমন চিনি-শিল্পে মোট ঋণদানের মধ্যে ৭২% অংশই পাইয়াছে সমবায়ী চিনি-শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ। (ঘ) করপোরেশনের আয় ও ব্যয় বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসরই ইহার আয় ক্রমশ

কাজকর্মের পর্যালোচনা

বাড়িতেছে, অপরপক্ষে ইহার পরিচালনগত ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এইরূপে করপোরেশনের নীট আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যারান্টি অনুযায়ী শেয়ার-প্রতি ২½% হারে লভ্যাংশ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় নাই। (ঙ) ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে করপোরেশন আণ্ডাররাইট করিতে শুরু করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকার জন্য আণ্ডাররাইটিং করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ হইল ১.৬২ কোটি টাকা। এই বিষয়ে কমিশনের কাজ আরও প্রসারিত হওয়ার দরকাব ছিল, কিন্তু তাহা হইতেছে না। (চ) ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে আর একটি নূতন দিকে করপোরেশন তাহার কাজকর্মের প্রসার ঘটাইযাছে। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান মূলধনী দ্রব্য আমদানি করিযা তৎক্ষণাৎ দাম দিতে না পাবিলে করপোরেশন তাহার এই ঋণের পিছনে গ্যারান্টি দিতেছে। তবে এই বিষয়েও কবপোবেশন বিশেষ অগ্রসব হয নাই, ৫ কোটি টাকার মত গ্যারান্টি প্রদান করা হইযাছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধনেব ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করা কবপোরেশনেব পক্ষে সম্ভবপব হইযাছে। (ছ) করপো-রেশন প্রদত্ত ঋণ যাহারা পাইযাছে সেই প্রতিষ্ঠানসমূহ মোটামুটি ভালই কাজ করিয়াছে, এবং ইহাদেব মধ্যে অনেকেই কবপোরেশনের পূর্ব-অনুমতি লইযা নির্দিষ্ট ৬% হারে বেশি লভ্যাংশ দিতে পাবিযাছে। পবিশোধে অক্ষম এইরূপ ঋণের পবিমাণ খুব কম এবং সুদ দানে ব্যর্থতাব পবিমাণ বেশ কম বলিতে হইবে।

বর্তমানে দেখা যায়, এই করপোবেশন ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে অনেকটা সক্ষম হইযা উঠিযাছে, কিন্তু ইহার অর্থভাণ্ডার অনেকাংশে অব্যবহৃত পড়িয়া আছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধনের পূর্বে ইহার সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, আর বর্তমানে সমস্যা হইল কিরূপে সেই অর্থ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া যায। করপোরেশনের নিজস্ব আয বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার বণ্ডগুলি বাজারে ভাল দামে বিক্রয হইযাছে, তাহা সত্ত্বেও ইহার কাজকর্মের পরিধি প্রসারিত করিতে পারা যায় নাই। যেমন, ১৯৫৯-৬০ সালে মাত্র ৭.৮৪ কোটি টাকার ঋণদান হইয়াছে। এই অবস্থার কারণ হিসাবে করপোরেশনের চেযারম্যান মিঃ মেনন সবকারের আমদানি-নিয়ন্ত্রনের নীতি দায়ী বলিয়া মনে করেন। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ করার দরুন

বর্তমানের প্রধান সমস্যা অব্যবহৃত অর্থভাণ্ডার

বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারতে আসিতে পারে না, ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

করপোরেশনের ভাণ্ডারে অর্থ আছে অথচ উহার ব্যবহার হইতেছে না, এই অবস্থা বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ চলিতেছে। ইহা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। দ্রুত শিল্পপ্রসারের যুগে এইরূপ অবস্থা দেখা দেওয়া নিতান্ত অস্বস্তিজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ হিসাবে অনেকে বলেন যে, ভারতের বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে মোটামুটি তীব্র একচেটিয়া মালিকানা বজায় আছে, এবং এই মালিকেরাই ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। ফলে তাহারা নিজেরা বিভিন্ন সূত্রে অর্থসংগ্রহ করিতে পারে, এবং কোন শিল্পের মালিকগণ নিজস্ব ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানী হইতে অর্থসংগ্রহ করিলে বাহিরের কাহাকেও সুদ না দিলে চলে। তাহা ছাড়া, বর্তমানে শিল্পের মুনাফা সবটা লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন না করিয়া উহাকেই পুনরায় মূলধনে রূপান্তরিত করার প্রবণতা বাড়িয়া গিয়াছে (self-financing)। এই সকল কারণের দরুন অনেকেই অর্থ-বিনিয়োগের এই সকল ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

ইহার কারণ কি কি

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে, বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে শিল্পপ্রসারের জন্য যাহাতে অধিকতর কার্যকরী নীতি অবলম্বন করা যায় এই উদ্দেশ্যে করপোরেশনের চেয়ারম্যান কয়েকটি প্রস্তাব দিয়াছেন। প্রথমত, বিশ্বব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থবিনিয়োগ সংস্থা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ-সংগ্রহ করা দরকার। করপোরেশন নিজে মার্কিন ঋণদান সংস্থাসমূহ ও বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং এখন ভারত সরকারের উচিত এই বিষয়ে তৎপর হওয়া। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের হাতে যে ডলার-ঋণ অর্পণ করিয়াছে উহার কিছু অংশ করপোরেশন নিজে ঋণদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। তৃতীয়ত, করপোরেশন ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যদি সে তাহার উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়া সরাসরি দেশের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিতে পারে, তবে করপোরেশনের

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইহার কাজকর্ম কিরূপে উন্নত করা যায়

আয়ও বাড়ে এবং এই অর্থও অব্যবহৃত থাকে না। করপোরেশন যে ঋণ দেয়, উহাকে শেয়ার মূলধনে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়, এইরূপ অধিকার দেওয়া থাকিলে ইহা সহজে সম্ভব হয়। বেসরকারী শিল্পপতিরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, সরকার এই পদ্ধতিতে ক্রমশ অধিক শেয়ার সংগ্রহ করিয়া কার্যত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু এই যুক্তি অর্থনৈতিক দিক হইতে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং সরকারের সহিত যুক্ত মালিকানা এবং পরিচালনাই মিশ্র অর্থনীতিতে শিল্প-কাঠামোর রীতি। সুদীর্ঘকালীন ঋণদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঋণকে শেয়ার মূলধনে রূপান্তরণের অধিকার তাই করপোরেশনের হাতে নিশ্চয় থাকা প্রয়োজন।

রাজ্যপুঁজি সরবরাহ সংস্থাসমূহ (State Financial Corporation)

১৯৫১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় সংসদ রাজ্যপুঁজি সরবরাহ সংস্থা আইন (SFC Act) লিপিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যসরকারসমূহ নিজেদের তত্ত্বাবধানে SFC স্থাপন করিতে পারিবে। IFC কেবলমাত্র যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় কিন্তু মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণ দিবার জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। SFC গুলির কাজ হইবে ইহাদের ঋণ দেওয়া। প্রায় IFCর মতই প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া SFC স্থাপিত হইবে। তবে IFC যেমন ২৫ বৎসরের জন্য ঋণ দেয়, ইহারা ২০ বৎসরের জন্য ঋণ দিবে। SFCর শেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধনের পরিমাণ নিম্নতম ৫০ লক্ষ টাকা হইতে উর্ধ্বতম ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হইতে পারিবে। তাহাদের ক্ষেত্রে শেয়ারলব্ধ মূলধনের ৳ অংশ যোগান দিবে রাজ্যসরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত ব্যাঙ্কসমূহ, সমবায় ব্যাঙ্ক; বীমাকোম্পানী, বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থাসমূহ, অবশিষ্ট ৳ অংশ শেয়ার ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা ক্রয় করিতে পারিবে। ইহাদের নিকট আমানত-রাখা অর্থ শেয়ারলব্ধ মূলধনের পরিমাণ ছাড়াইয়া যাইবে না। ৪০ লক্ষ টাকার বেশি কাহাকেও ঋণ দেওয়া যাইবে না।

১৯৫৬ সালে রাজ্যপুঁজি সংস্থা (সংশোধনী) আইন লিপিবদ্ধ হয় (State Financial Corporation Amendment Act 1956)। এই আইনে বলা হইয়াছে (ক) দুই বা ততোধিক রাজ্যসরকার একত্র হইয়া সংযুক্ত SFC গঠন করিতে পারিবে ; (খ) প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার

বা IFC-র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে পারিবে ; (গ) রাজ্য অনুমোদিত ব্যাঙ্ক বা রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিলে ঋণ দিতে পারিবে ; (ঘ) সরকারী ঋণপত্রের বিনিময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারিবে ; (ঙ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল SFC পরীক্ষা (inspection) করিতে পারিবে। বর্তমানে ভারতে ১৩টি SFC কাজ চালাইতেছে।*

এই সকল SFC প্রথম দিকে বহু অসুবিধা ও ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্য দিয়া পার হইয়াছে—দরখাস্তকারীদের অনভিজ্ঞতা, উপযুক্ত কর্মীর অভাব, উচ্চ হারে সুদ (৬% হইতে ৭%, ইহার সহিত পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের ৩% স্ট্যাম্প শুল্ক যোগ দিলে ৯% হইতে ১০% হইযা দাঁড়ায়), অধিক সাংগঠনিক ব্যয় প্রভৃতি। তাহা ছাড়া (ক) এক একটি বোর্ড স্থাপিত হওয়ায় উহাদের নিকট হইতে সহজে ঋণ পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে, এবং (খ) চাল-কল, তেল-কল প্রভৃতির উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায (কুটির. শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে) SFC-গুলি উপযুক্ত দরখাস্ত পাইতেছে না। সর্বোপরি, (গ) একমাত্র যৌথ মূলধনী কারবার ছাড়া অপর কোন কারবারী উপযুক্ত ভাবে হিসাবপত্র রাখে না, ফলে SFC-সমূহ ঋণ দিতে বিব্রত হইয়া পড়ে।

ইহাদের অসুবিধা ও ত্রুটি

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা লিঃ (National Industrial Development Corporation Ltd.)

১৯৫৪ সালের ২৯শে অক্টোবর ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন এবং ১ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া NIDC প্রতিষ্ঠিত হয। এই সম্পর্কে ১০ লক্ষ টাকা দেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ইহা স্থাপিত হয। যে-সকল শিল্পে ব্যক্তিগত মূলধন অগ্রসর হইতেছে না, অথচ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করার স্বার্থে যাহাদের গড়িয়া উঠা দরকার সেই সকল শিল্পে NIDC (ক) অর্থ সাহায্য করিবে, (খ) নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবে, অথবা (গ) বেসরকারী নূতন শিল্পের পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া উহাকে উন্নত করিযা তুলিবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়েকটি শিল্পকে NIDC সাহায্য করিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে উহার উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ ভার দেওয়া

* মাদ্রাজ, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, কেরল, পশ্চিমবাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র।

হইয়াছিল এবং ইহার হাতে ৫৫ কোটি টাকা ছাড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। উহার একাংশ প্রাথমিক হিসাবে ২০—২৫ কোটি টাকা) বস্ত্র ও পাট শিল্প আধুনিকীকরণে (modernisation) ব্যয়িত হইবে ; অবশিষ্ট ৩৫ কোটি টাকা নূতন মূল ও ভারী শিল্প স্থাপনে ব্যয়িত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।*

কি কাজ করিতেছে

N. I. D. C-র প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য ও ঋণ হিসাবে দিবে। তাহা ছাড়া, পাট ও বস্ত্রশিল্প আধুনিকীকরণের জন্য শিল্পগুলিকে যে অর্থ সাহায্য করা তাহার মুখপাত্র বা এজেন্সী হিসাবে N. I. D. C-র কাজ করিবে। ১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত N. I. D. C. কাপড়ের মিল ও পাট শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং মেশিন-টুল প্রতিষ্ঠানগুলি প্রসারের জন্য ১৪.৭৯ কোটি টাকা অনুমোদন করিয়াছে। এই সকল ঋণের উপর বাৎসরিক ৪½% হারে সুদ দিতে হইবে এবং ১৫টি বাৎসরিক কিস্তিতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

পুনরর্থ সাহায্য করপোরেশন (Refinance Corporation)

১৯৫৮ সালের জুন মাসে মাঝারি ধরনের শিল্পকে ঋণ দিবার জন্য প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আকারে রি-ফিনান্স করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল শিল্প পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে একবার ঋণ পাইলে ঋণ কালের শেষে পুনরায় তাহাদের ঋণ দান করা, ইহাই এই করপোরেশনের উদ্দেশ্য। ১৯৬০ সালের মার্চ পর্যন্ত ইহার পরিমাণ হইল ৪.১৬ কোটি টাকা। বোম্বাইতে অবস্থিত এই সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী সাতজন লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে সভাপতি হইবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, সভ্যদের মধ্যে থাকিবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন ডেপুটি গভর্নর, স্টেট ব্যাঙ্কের ও রাষ্ট্রীয় জীবনবীমা করপোরেশনের চেয়ারম্যানদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির তিনজন প্রতিনিধি।

রিফিনান্স করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইল ২৫ কোটি টাকা ;

* "The projects taken up for investigation by the NIDC include Foundry and forge shops, structural fabrication, refractories, chemical pulp for rayon, newsprint, intermediates for dyestuffs and drugs, carbon. black etc. Apart from these projects, it is expected that the N. I. D. C. will direct its efforts towards fostering the establishment of a new unit in the aluminium industry and the manufacture of heavy equipment for earth moving, mining, rolls and rolling mill equipment required in ferrous and nonferrous industries."

প্রতি শেয়ার ১ লক্ষ টাকা হিসাবে ২৫০০টি শেয়ারে বিভক্ত। কিন্তু প্রথমে ১২·৫ কোটি টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়া হইয়াছে। উহা এইরূপে বিভক্ত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	৫ কোটি টাকা
জীবনবীমা কর্পোরেশন	২·৫ ” ”
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া	২·৩ ” ”
১৪টি ব্যাঙ্ক মিলিয়া*	২·৭ ” ”
	১২·৫ ” ”

রিফিনান্স করপোরেশন যে ঋণ দিবে, তাহার মেয়াদ ৩ বৎসরের কম হইবে ও ৭ বৎসরের বেশি হইবে না, এবং কোন ঋণই ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হইবে না। একমাত্র যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ২½ কোটি টাকার বেশি নয় তাহারাই এই ঋণ পাইবে। এই ঋণ প্রধানত ব্যবহৃত হইবে দ্বিতীয় ও বর্তমান তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পে উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার শস্য-ঋণ খাতের পাওনা হইতে দীর্ঘকালীন যে ২৬ কোটি টাকা ঋণ দিতেছে এই করপোরেশন নিজস্ব মূলধন ছাড়া তাহাও পাইবে।† করপোরেশন নিজে ঋণ দিবে না সদস্য ব্যাঙ্কগুলির মারফত এই অর্থ সাহায্য করিবে। মোট ৩৮½ কোটি টাকা (১২½ কোটি +২৬ কোটি) প্রতিটি সদস্য ব্যাঙ্কের মধ্যে কোটার মত বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই ব্যাঙ্কসমূহ এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শিল্পে ঋণ দিবার সুবিধা পাইবে।

জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা (National Small Industries Corporation)

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য এই সংস্থা স্থাপিত হয়। যন্ত্রপাতি কেনা, বিক্রয় সংগঠন উন্নত করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সংস্থার নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারিবে। যে

* ইহাদের মধ্যে আছে The Central Bank, the Punjab National Bank, the Allahabad Bank, the Bank of India, the India Bank, the Mercantile Bank of India, the Hyderabad Bank, the Bank of Baroda, the National Bank of India, the United Commercial Bank, the Lloyds Bank, the Chartered Bank, The United Bank of India, and the Dena Bank.

† এই ঋণ ৪০ বৎসরের জন্য এবং ইহার জন্য ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বাৎসরিক ৫% হারে সুদ দিবে।

সকল ক্ষুদ্রশিল্পের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম এবং যন্ত্রশক্তি ব্যবহার করিয়া ১০০ জন লোক নিয়োগ করে—তাহারা ইহার নিকট হইতে সাহায্য পাইবার অধিকারী হইবে। ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইযা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয। ভারত সরকার একাই এই মূলধন দিয়াছেন এবং প্রযোজনমত চল্‌তি মূলধন সাহায্য করিবেন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন পরিচালিত আন্তর্জাতিক টীমের সুপারিশে গঠিত ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন ইন্‌স্টিটিউট-গুলির (Small Industries Service Institute) সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই সংস্থা কাজ করিতে থাকিবে। যন্ত্রক্রযের জন্য ঋণের সুদ হইল ৪½% হইতে ৫%। N S.I C. ক্ষুদ্রশিল্পকে কণ্ট্রাক্ট পাইতে সাহায্য করে এবং সেই কণ্ট্রাক্ট আণ্ডাররাইট করে। উন্নত মানসম্পন্ন দ্রব্য যাহাতে উৎপন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে N. S. I C ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে দেখাশোনাও করে। সরকারী দ্রব্যাদি ক্রযের অর্ডাব যাহাতে ক্ষুদ্র শিল্প পায, ইহাবা সেই চেষ্টাও করিতেছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও দিল্লীতে N. S I. C-র চারিটি শাখা সংস্থা স্থাপিত হইযাছে।

ভারতীয় শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা (Industrial Credit and Investment Corporation of India)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয সরকার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্যোগে তিনজন সদস্য লইযা গঠিত একটি প্রতিনিধিদল ১৯৫৪ সালের প্রথমে ভারত সরকারকে এমন একটি সংস্থা স্থাপন করিতে উপদেশ দেন যাহার মারফত বিদেশী সরকারী ও বেসরকারী পুঁজিপতিরা ভারতীয় শিল্পকে ঋণ দিয়া অর্থ সাহায্য করিতে পারে। তাঁহাদের পরামর্শে গঠিত এই I C I C I ১৯৫৫ সালের ১লা মার্চ হইতে কার্য শুরু করে।

এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ভারতীয ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কোন কোন করপোরেশন প্রভৃতি সকলে মিলিযা ২ কোটি টাকা; ব্রিটিশ ইস্টার্ন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং কযেকটি কমনওযেলথ্‌ ও ব্রিটিশ বীমা ও অন্যান্য কোম্পানী মিলিয়া ১ কোটি টাকা; আমেরিকার কয়েকটি কোম্পানী ও ব্যক্তি মিলিয়া ৫০ লক্ষ টাকা; এবং অন্যান্য সকলে মিলিয়া ½ কোটি টাকা দিযাছেন। অনেক দেশের লোকেরা মিলিয়া এই সংস্থাকে সাহায্য করিয়াছে—ইহা অনেকটা আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার রূপ লইয়াছে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর রূপে গঠিত হইলেও ইহা ভারত সরকারের সাহায্য লাভ করিয়াছে। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার সুদ-বিহীন ৭½ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছেন, সমান ১৫টি ভাগে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। পুনর্গঠন ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (IBRD) ইহাকে ১৫ বছরের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলার বাৎসরিক ৪⅝% হার সুদে ধার দিয়াছে। ICIC কেবল শিল্পগুলিকে ঋণ দেয় তাহা নহে, ইহা তাহাদের ঋণে গ্যারান্টি দেয়, পরিচালনগত ও যন্ত্রবিদ্যাগত সকল প্রকার সাহায্য করিয়া থাকে।

চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, করপোরেশন ১৯৫৯ সালের শেষ পর্যন্ত বহু প্রতিষ্ঠানকে মোট ২০.৪০ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ৯.০১ কোটি টাকা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কাগজ, রাসায়নিক ও ঔষধ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, চিনি, খনিজ ধাতু, চুন, সিমেণ্ট, কাঁচ ও বিবিধ শিল্প ইহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং নূতন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা—ইহার উপর এই সংস্থা খুবই জোর দিয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টিই নূতন শিল্প-প্রচেষ্টা।

ভারতে শিল্পপুঁজির নিজস্ব সরবরাহ ব্যবস্থা (Self-Financing of Industries in India)

কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাহির হইতে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার মারফত মূলধন তুলিয়া ব্যবহার শুরু করে বটে, কিন্তু তাহার পরবর্তী উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে মুনাফার পুনর্লগ্নীর উপর। মুনাফা অবণ্টিত রাখিয়া, মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ বাবদ তহবিল এবং রিজার্ভ ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজের টাকাতেই পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া লয়। মূলধন বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও পুনরায় বিনিয়োগ—এই গতিশীল ধারায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই প্রসারিত হইতে থাকে। মুনাফা মূলধনরূপে বিনিয়োগ করিতে পারিলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহার নিজেরই পুনরায় মুনাফা ও মূলধন-সংগ্রহ করার মত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শিল্পে পুঁজির নিজস্ব সরবরাহ ব্যবস্থা কাহাকে বলে

আধুনিককালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে প্রতিবৎসর যে নূতন বিনিয়োগ ঘটে, তাহার অধিকাংশই এইরূপ স্ব-বিনিয়োগ (self-investment)। শিল্পে পুঁজি সংগ্রহের এই পদ্ধতিকে অনেক সময় পুঁজির নিজস্ব সরবরাহ ব্যবস্থা (self-financing) বলা হয়।

শিল্পে মূলধন-বিনিয়োগের নিজস্ব সরবরাহ ব্যবস্থার অনেক সুফল আছে। এইরূপ করিলে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাণিজ্যচক্রজাত উঠানামার এবং মরসুমী উঠানামার প্রকোপ অনেকটা সহ্য করিতে পারে। প্রভুত মুনাফা বা রিজার্ভ ফণ্ড সঞ্চিত থাকিলে প্রতি বৎসর সুনির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হয়, বাজারে কোম্পানীর সুনাম গড়িয়া উঠে। এই সুনামের দরুন প্রয়োজনমত ঋণ পাইবার উপযোগী সুবিধা থাকে এবং সুনির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দিতে থাকায় প্রয়োজনের সময়ে শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রসারণের জন্য নিজে অর্থ লগ্নীর ভাণ্ডার রাখিলে বাহিরের কাহাকেও সুদ দিতে হয় না, অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় না। প্রথমদিকে কয়েক বৎসর মুনাফা অবণ্টিত রাখিলে শেয়ার-ক্রেতাদের অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু শেয়ারের মূল্য ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের প্রভুত সুবিধা হয়। এই সকল কারণে আজিকার ব্যবসায় বাণিজ্যের কাঠামোতে ব্যক্তিগত সঞ্চয় দ্বারা শিল্পপুঁজি সরবরাহ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় (institutionalized savings) উহার স্থান লইয়াছে।

ইহার সুফলসমূহ

ভারতের ক্ষেত্রেও শিল্প ব্যবসায়ে পুঁজির নিজস্ব-সরবরাহ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন ইহাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে ৬১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা বা প্রায় ৩২.৬% এইরূপ প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়ের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিবে, এইরূপ আশা পোষণ করা হইয়াছিল। ১৯৫০-৫১ সালে বিভিন্ন শিল্প হইতে মুনাফার পরিমাণ ছিল ৯৮ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ৩৪ কোটি টাকা বা ৩৪.৭% পুনর্লগ্নী হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে বেসরকারী খাতে ব্যয়যোগ্য ৯২০ কোটি টাকার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি 'আভ্যন্তরীণ সূত্রে' অর্থাৎ নিজস্ব সঞ্চয় হইতে ৩০০ কোটি টাকা বা ৪৮% সংগ্রহ করিবে—পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। তৃতীয় পরিকল্পনাতে বেসরকারী খাতে ৪৩০০ কোটি

ভারতেও এই ব্যবস্থা প্রসারিত হইতেছে

টাকা বিনিয়োগ হইবে, ইহার মধ্যে সরকার ২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে। ৪১০০ কোটি টাকা সংগ্রহের দায়িত্ব বেসরকারী শিল্পপতিদেরই। ইহার মধ্যে কিছুটা বৈদেশিক মূলধন, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সূত্রে পাওয়া গেলেও বেশির ভাগই মুনাফার পুনর্লগ্নী হইতে পাওয়া যাইবে বোঝা যাইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবেষণা ও তথ্যবিষয়ক দপ্তর 'ভারতীয় যৌথ কোম্পানী সমূহে অর্থ-সরবরাহের ব্যবস্থা, ১৯৫০-৫৫ সাল' নামে একখানি গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন শিল্পের কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা মূলধনসম্পন্ন ৭৫০টি যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ব্যালান্সসীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব আলোচিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে প্রথম পরিকল্পনাকালের মোট মুনাফার মধ্যে অবন্টিত মুনাফার অংশ ছিল ৩৯%। পরবর্তী হিসাবগুলি হইতে দেখা যায় যে, এই অনুপাত ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

এইরূপে শিল্পপুঁজির নিজস্ব-সরবরাহ বা মুনাফার পুনর্লগ্নী ব্যবস্থা আপাত দৃষ্টিতে শুভকর মনে হইলেও ইহার সামাজিক কুফল কম নয়। এই ব্যবস্থারই প্রধান ফল দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা এবং একচেটিয়া অবস্থার প্রসার। বর্তমানের বৃহৎ কোম্পানীগুলি ক্রমশ বাড়িতে থাকিলে নূতন ফার্ম প্রবেশের পথ পাইবে না, শিল্পটিতে একচেটিয়া অধিকার দেখা দিবে। দ্বিতীয়ত, মুনাফা অবন্টিত রাখার ব্যবস্থা রাখিলে পরিচালকবৃন্দ শেয়ারের বাজারে ফাটকাব্যবসায়ের অধিকতর সুবিধা পান। এই নীতি অনুসারে লভ্যাংশের হার কম রাখিয়া বাজারে শেয়ারের দাম কমাইয়া সেই কম দামে সাধারণ ক্রেতাদের নিকট হইতে নিজেরা ক্রয় করিয়া শেয়ারগুলিকে নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া ফেলিতে পারেন। তৃতীয়ত, শেয়ার ক্রেতাদের আয় হইলে তাহারা যে সঞ্চয় করিতেন এবং যে সকল শিল্পে বিনিয়োগ করিতেন, এই ব্যবস্থার ফলে তাহা সম্ভব হয় না। মূলধনের বাজারে পুঁজির নিজস্ব গতি দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। চতুর্থত, কোন কোম্পানীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূলধন সংগৃহীত (over-capitalisation) থাকিলে শিল্পপ্রসার ত্বরান্বিত হয় না। পঞ্চমত, ইহাতে বিনিয়োগকারী শেয়ার-ক্রেতাদের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়।

ইহার ত্রুটিসমূহ

ইউনিট-ট্রাস্ট (Unit-Trust):

ভারতবর্ষে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণ

নানা কারণে এখনও পর্যন্ত নূতন কোম্পানীগুলির শেযাব কিনিতে সাহস পান না। একমাত্র সুবিখ্যাত কোনো ব্যবসায়ীর নাম পরিচালকমণ্ডলীর সহিত যুক্ত থাকিলে তবে সেই কোম্পানীর শেয়ার অনেকে ক্রয করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহা ছাড়া শেয়ার বাজারে অনেক দুর্নীতিব কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার থাকায় তাঁহারা শেয়ার কিনিতে ভয় পান। উপরন্তু, কোন ফার্মেব ভবিষ্যতে কিরূপ মুনাফা পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহা বিচার করিতে হইলে যে খুঁটিনাটি বিষযে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রযোজন তাহা এই সম্ভাব্য সাধারণ শেযার ক্রেতাদের মধ্যে না থাকারই সম্ভাবনা। নূতন ফার্মগুলি যাহাতে উপযুক্ত পবিমাণ মূলধন পাইতে পারে এবং কযেকজন ব্যক্তিব মধ্যে শেযাব কুক্ষিগত না হইযা যাহাতে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে শেযারগুলিব মালিকানা বন্টিত হইতে পাবে, সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে ভাবত সবকাব 'ইউনিট ট্রাস্ট' নামে একটি সংস্থা গঠিত করিযাছেন, ১৯৬৪ সালেব জুলাই মাস হইতে এই সংস্থা কাজ শুরু করিযাছেন।

ইউনিট ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্য কি

সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক এবং ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক মিলিযা এক কোটি টাকাব কিছু বেশি মূলধন সববরাহ কবিযাছে। ইউনিট ট্রাস্ট প্রথমে মোট পাঁচ কোটি টাকা মূলধন লইযা কাজ শুরু কবিযাছে। দেশেব সকল ব্যাঙ্কেব ৩৫০০ শাখা হইতে ইউনিট ট্রাস্টেব শেযাব বিক্রয হইতেছে। প্রতি শেযাবেব মূল্য ১০৲ টাকা। এই ইউনিট ট্রাস্ট একটি স্বয শাসিত প্রতিষ্ঠান (Autonomous Institution)। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনোনীত ৬ জন সহ মোট ১০ জনেব একটি বোড অব ট্রাস্টির দ্বাবা ইহা পরিচালিত। এই বোড অফ ট্রাস্টিব মধ্যে ৪ জন বেসবকারী প্রতিনিধি আছেন, উহার মধ্যে তিনজন ব্যবসায এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহেব এবং একজন কোনো অডিটাব ফার্মেব প্রতিনিধি। ইউনিট ট্রাস্টের কাজ হইল, মধ্যে মধ্যে এইরূপ শেযাব বিক্রয় করিযা সেই টাকা দিযা শিল্পেব শেযাব ক্রয কবা। প্রতি আর্থিক বৎসরের শেষে (৩০ জুন) নিজেব খরচ-খরচা কাটিযা রাখিযা এই ইউনিট ট্রাস্ট শিল্পেব শেয়ারগুলি হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ এই ক্ষুদ্র বিনিযোগকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। বৃহৎ পুঁজিপতিদেব সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকার জন্য সরকার ইউনিটট্রাস্ট হইতে প্রাপ্ত ১০০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ করমুক্ত করিয়াছেন।

ইহার গঠন ও পরিচালনা

এই ইউনিট ট্রাস্টের উপযোগিতা বা গুরুত্ব কম নয়। ভারতের ক্ষুদ্র

সঞ্চয়কারীরা একদিন শিল্পের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগের উপযুক্ত পদ্ধতি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ইউনিট-ট্রাস্ট গঠনে তাহারা নিরাপত্তার সহিত টাকা খাটাইতে পারিবে। স্বর্ণ বা জমি ক্রয়ে লোকের সঞ্চয় আবদ্ধ থাকিত। দেশের সেই স্বল্পসঞ্চয়গুলি এখন শিল্পপ্রসারে সাহায্য করিবে। এই সকল স্বর্ণ বা জমি হইতে স্বল্পসঞ্চয়কারীরা কোনো নিয়মিত আয় পাইতেন না। ইউনিট ট্রাস্ট হইতে তাঁহারা নিয়মিত আয় পাইতে পারিবেন। উপরন্তু স্বর্ণ বা জমির তুলনায় ইহাদের শেয়ারগুলি অনেক বেশি তরল (liquid)। সঞ্চয়কারী প্রয়োজন মনে করিলে এই শেয়ারগুলিকে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকায় পরিণত করিতে পারিবে।

ইহার উপযোগিতা ও গুরুত্ব

এই ইউনিট ট্রাস্ট গঠন করা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একমত হইতেছেন না, ইহার বিরূপ সমালোচনাও শোনা যাইতেছে। অনেকে বলেন যে, বিদেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি শেয়ারে টাকা খাটাইয়া যে লভ্যাংশ পায় উহার বেশির ভাগই নিজেরা লইয়া যায়। প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা খুব কমই পান। নানারকম ব্যয় দেখাইয়া, প্রকৃত লভ্যাংশের হার গোপন রাখিয়া এই মধ্যবর্তী বিনিয়োগ সংস্থাগুলি স্বল্পবিত্ত সঞ্চয়কারীদের অজ্ঞতার সুযোগ লয়। ব্রিটেন ও আমেরিকায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান বহুক্ষেত্রে শেয়ারের ফাট্‌কাবাজারে প্রবেশ করে এবং প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের উপর লোকসানের ভার নামিয়া আসে।

বিরূপ সমালোচনা

ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট সরকারী প্রাতিষ্ঠান বলিয়া উপরের আশঙ্কাগুলি হয়তো একটু কম। কিন্তু আমাদের দেশে আর এক ধরনের সমস্যা আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের বেসরকারী শিল্পগুলি নূতন যন্ত্রপাতি আনে নাই, ব্যক্তিগত মুনাফার লোভে কোম্পানীর ক্ষয়ক্ষতি তহবিল সঠিক পরিমাণে পূর্ণ করে নাই। ইউনিট ট্রাস্ট এই সকল অযোগ্য কোম্পানীগুলিকে ঋণ দিয়া বিপুল ঝুঁকি বহন করিবে। সেই তুলনায় ইহার আযও বেশি হইবে না। তাহা ছাড়া, বেসরকারী কোম্পানীতে টাকা বিনিয়োগের পর উহাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিচালকমণ্ডলীতে বাধ্যতামূলক সরকারের প্রতিনিধি রাখিয়া সরকারের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল। তাহা না হইলে উহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার পথ উন্মুক্ত হইবে না।

১৯৬৩ সালে ভারত সরকার ইউনিট ট্রাস্টের সহিত একযোগে আরও

একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উহার নাম শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank)। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন মূলধন দরকার। জনসাধারণ তাহাদের স্বল্প সঞ্চয় দিয়া এই শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিবে এবং সেই ব্যাঙ্ক নিজেই ঐ মূলধন এবং ব্যবসায়িক নেতৃত্ব সরবরাহ করিয়া নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে থাকিবে। এখনও এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কোন কাজকর্ম শুরু হয় নাই।

শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক

অনুশীলনী

1. Describe the main features of the Industrial Finance Corporation of India and give a brief account of its working.

2. Give critical account of the organisation and functions of the Industrial Finance Corporation of India.

3. Describe the measures that have been taken in the last ten years to improve the organisation for the supply of long term finance to Indian Industries.

4. Give an account of the functions and importance of the new institutions that have been established in India for providing long term finance to large-scale industrial concerns.

5. Examine the financial problems of small and medium-scale industries and discuss the measures that have been adopted in recent years to solve these problems.

6. Give a critical account of the working of the institutions set up in India for longterm financing of industries.

7. Explain the functions and objectives of State finance corporations as established in different states of India.

8. Critically examine the functions and achievements of the Industrial Finance Corporation of India.

9. Give a critical account of the functions and activities of the various agencies that are at present catering to the financial needs of small and middle-sized industries in India.

10. Examine the main financial requirements of large scale industries in India. What part has been played by the Industrial Finance Corporation of India in meeting those requirements ?

11. Discuss briefly the facilities that have been provided by the Government in recent years for financing Indian Industries.

12. Discuss the part played by the Industrial Finance Corporation of India in the industrial development of the country.

13. Explain the financial problems of small and medium scale industries in India. Give a brief account of the steps which have been taken to solve these problems.

14. Describe the agencies available India for supplying long-term finance to large scale industries. How far are they adequate and efficient ?

১৯

বৈদেশিক পুঁজি

Foreign Capital

পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পোন্নয়নের সমান স্তরে অবস্থিত নাই। যাহারা উন্নততর স্তরে আছে তাহারা অনুন্নত দেশগুলি হইতে এতকাল ধরিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভূত মূলধন সঞ্চয় করিয়াছে। নিজেদের দেশে কাঁচামাল, শ্রমিক ও বাজারের সুযোগসুবিধা তাহাদের আর নাই, তাহারা এখন বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে মূলধন প্রেরণ করিতে চাহিতেছে। এই বৈদেশিক মূলধন এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে শিল্প বিপ্লবকে প্রসারিত করিতেছে। ঔপনিবেশিক শোষণ ছাড়াও ইংলণ্ড ১৭ ১৮ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের নিকট হইতে মূলধন পাইয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় অনেক দেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়াছে, বিংশ শতাব্দীতেও সোভিয়েট রুশিয়া অল্প হইলেও কিছুটা মার্কিণ মূলধন সংগ্রহ করিয়াছে।

শিল্প বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক মূলধনের লেনদেন

বিদেশে ঋণদানের ফলে ঋণদানকারী দেশগুলিও উপকৃত হন। সাধারণত উন্নত দেশের শিল্প-কাঠামো এমনভাবে গঠিত যে তাহারা রপ্তানি-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে পারে, অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানির প্রয়োজন তাহাদের কম। নিজেদের দেশে খাটাইলে যে টাকা তাঁহারা পান উহাপেক্ষা অধিক হারে প্রতিদান অপূর্ণোন্নত দেশে পাওয়া যায়। বিদেশে মূলধন পাঠাইয়া সেই সকল দেশকে শিল্পোন্নত করিয়া তাহারা নিজ দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য বাজার তৈয়ারী করিয়া তোলে। এইরূপ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারেও বৈদেশিক মূলধন সহায়তা করে।

ভারতে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ (Magnitude of Foreign Capital in India): ভারতে বিদেশী মূলধন কত তাহার কোন প্রকৃত হিসাব স্বাধীনতার পূর্বে ছিল না, এইরূপ হিসাব প্রস্তুত করাও সম্ভবপর ছিল না। স্বাধীনতার পরে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি হিসাব প্রস্তুত করিলেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ হিসাব করা হইল। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব ও শ্রেণী বিভাগ

ঐ হিসাব পুরাণো হওয়ায় ১৯৫৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পুনরায হিসাব গ্রহণ করিলেন। এই হিসাব করিবার সময়ে বিদেশী মূলধনকে পোর্টফোলিও (Portfolio) ও প্রত্যক্ষ (Direct) এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। যে-মূলধনের সহিত পরিচালনার কর্তৃত্বভার জড়িত থাকে তাহাই প্রত্যক্ষ এবং যাহার সহিত কর্তৃত্বক্ষমতা জড়িত নাই তাহা পোর্টফোলিও।* পোর্টফোলিও মূলধনকে আবাব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : ইকুইটি মূলধন (equity capital) ও ঋণরূপ মূলধন (creditor capital)। সাধারণ শেয়ারে বিনিযোগকারী মূলধনের মালিক ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে, উহা ইকুইটি মূলধন; ডিবেঞ্চার বা সর্বাগ্রগণ্য শেযাবেব মালিক ঝুঁকি বহন করে না, উহা ঋণরূপ মূলধন।

১৯৪৮ সালের জুন মাসের শেষ তাবিখে ভারতে মোট বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি টাকা। ইহাব মধ্যে সরকারেব দীর্ঘকালীন ঋণের পরিমাণ ছিল ২৯৩ কোটি টাকা। সুতরাং মোট বেসরকাবী ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিযোগের পবিমাণ ছিল ৩৯৭ কোটি টাকা। ইহাব মধ্যে পোর্টফোলিও লগ্নীর পরিমাণ ছিল ১৪৪ কোটি টাক এবং অবশিষ্ট ২৫৩ কোটি টাকা হইল প্রত্যক্ষ লগ্নী।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্ববেব শেষে ভাবতে দীর্ঘকালীন বৈদেশিক বিনিয়োগের (এক বৎসর পরে দেয) পবিমাণ ছিল ১০৩৬ কোটি টাকা। ইহাব মধ্যে সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৮৩ কোটি টাকা এবং বেসবকাবী ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল ৪৫৩ কোটি টাকা। এই ৪৫৩ কোটি টাকাব মধ্যে ৪১৯ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক ব্যবসায়িক বিনিযোগ (Foreign business investments)। ইহার মধ্যে ৩৪৯ কোটি টাকাই ছিল প্রত্যক্ষ লগ্নী, অর্থাৎ পরিচালনগত ক্ষমতাযুক্ত লগ্নী, আর অবশিষ্ট ৭০ কোটি টাকা ছিল পোর্টফোলিও ধরনের। সুতবাং দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতা লাভের পর ৫½ বছরের

* বিদেশী মূলধনকে বহুভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যেমন ঋণ (Loans), বিনিয়োগ (Investments) ও সাহায্য (Grants)। অথবা সরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত ও বেসরকারীক্ষেত্রে নিযুক্ত। তাহা ছাড়া ব্রিটিশ, মার্কিন, কানাডীয় প্রভৃতি ভাবেও শ্রেণী বিভক্ত করা সম্ভব। সর্বোপরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ন্যায় পোর্টফোলিও ও প্রত্যক্ষ—এই দুই ভাবেও বিভক্ত করা চলে। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে ইহা ছাড়াও বিদেশী মূলধন কোন্ ধরনের শিল্পে কি পরিমাণ নিযুক্ত আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। উপরন্তু সুদ, মুনাফা, বিদেশে ছুটি কাটান, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রভৃতি খাতে তাহারা দেশের উদ্বৃত্তের কি অংশ বাহিরে পাঠায় তাহাও জানা খুব দরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট দুইটিতে এই সকল তথ্য নাই।

মধ্যে ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার জন্য বিদেশী মূলধনের পরিমাণ প্রভূত বাড়িয়াছে এবং পরিচালনার ক্ষমতাযুক্ত লগ্নী অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।*

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে যে হিসাব হয়† তাহাতে দেখা যায় বেসরকারী ক্ষেত্রের মোট বৈদেশিক দায় বাড়িয়া হইয়াছে ৫২২ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ হইল ৪৮১ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২ বছরে ৬২ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৮৫%-ই প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, এবং মাত্র ১৫% হইল পোর্টফোলিও বিনিযোগ। ১৯৫৮ সালে বিদেশী মূলধনেব পরিমাণ দাঁড়াইযাছিল ৫৭০·৬৪ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে কোন্ দেশ কত পবিমাণ মূলধন পাঠাইযাছে তাহা আমরা নিচের তালিকায সাজাইতে পারি:

	(কোটি টাকার হিসাবে)
ব্রিটেন	৩৯৮·০৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৯ ৮৫
জার্মানী	৩ ৭৭
জাপান	·৬২
সুইজারল্যাণ্ড	৬ ৭৫
পাকিস্তান	৪ ২৩
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক	৭২·১৭
অন্যান্য দেশ	২৫·২২
মোট	৫৭০·৬৪

কোন ধরনের শিল্পে কতটা বিনিয়োগ হইয়াছে, তাহা জানিলে বিদেশী বিনিযোগের স্বার্থের ধরন জানিতে পারা যায়। নিচে উহার তালিকা দেওয়া হইল: *

* সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার নীতির সহিত বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রসার ও উহার উপর বিদেশী কর্তৃত্বের প্রভাব ঠিক মেলে না। তাহা ছাড়া, প্রকৃত সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইলে এত বিদেশী বিনিয়োগ ঘটিত কি না সন্দেহ।

† Reserve Bank Report on the Survey of India's Foreign Liabilities and assets, 1957.

‡ "The foreign branches have largely invested their capital in trading, utilities and transport and plantations. Direct controlled joint stock companies, espicially the subsidiaries, have concentrated their investments mainly in manufacturing sector." R. B. Report.

* *Reserve Bank of India Bulletin, April, 1960.*

ক্ষেত্র	(কোটি টাকার হিসাবে)
পেট্রোলিয়ম	১১৮·২
যন্ত্রশিল্প (Manufacturing)	২২০.১
ব্যবসায় বাণিজ্য (Trading)	২৯ ৫
বাগিচা (Plantations)	৯৫·৮
পরিবহন ও অন্যান্য সেবাকার্য (Utilities)	৪৩·৭
অর্থসম্পর্কীয় ব্যবসায (Finnacial)	২২ ৯
খনি (Mines)	১২·৫
ম্যানেজিং এজেন্সী	১২·২
অন্যান্য	২ ৩
মোট	৫৭০·৬

ভারতে বিদেশী পুঁজির গুরুত্ব (Importance & Role of Foreign Capital in India)

ভারতের স্বাধীন শিল্পোন্নয়নের পথ যেমন ইংরাজরা বন্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ তাহারাই ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের প্রবর্তন করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের পুঁজিবাদী সমাজ-বিবর্তনে বিদেশী মূলধনের ভূমিকা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খনিশিল্প, বাগিচাশিল্প, রেল ও জাহাজ পরিবহন, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায—ইহাদের উন্নতির মূলে ছিল বিদেশী মূলধন, প্রধানত ব্রিটিশ পুঁজি। এদেশ হইতে মূলধন লুণ্ঠন করিয়া নিজদেশে ও ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রসার ঘটাইয়া সেই মূলধনের কিছু অংশ বিদেশী মালিকানায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই পুঁজি যন্ত্রশিল্পে দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে ভারতে নূতন যন্ত্রযুগের সূচনাতে তাই ইহা সাহায্য করিতে পারিয়াছে। আধুনিকতম টেকনিক, যন্ত্রজ্ঞান, ব্যবসায় পরিচালনা ও যন্ত্রযুগের উপযোগী নূতন ভাবাদর্শ শিক্ষা দিয়া তাহারা ভারতে ধনতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করিয়াছে।

ভারতীয় পুঁজিবাদের পথ প্রদর্শক

কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বিদেশী মূলধনকে কখনই সুনজরে দেখিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক, বিদেশী মূলধনের মালিকেরা ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীকে এবং

আন্দোলনকে চিরকাল বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের ব্যবসায়ীরা দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশীদের আধিপত্য পছন্দ করিতে পারেন নাই। অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই বিদেশী মালিকেরা ভারতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, দেশী শিল্পপতিদের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। এই বিদেশী মালিকেরা ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে নাই, যন্ত্রবিদ্যা ও ব্যবসায় পরিচালনার উপযুক্ত শিক্ষা প্রসারের পথ প্রশস্ত করে নাই। দেশী ও বিদেশী কর্মচারীদের মধ্যে বেতন, ছুটি ও মর্যাদা সকল বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে। ভারতীয়দের অতি নিম্নহারে মজুরি দিয়াছে, প্রভূত উদ্বৃত্ত ভারতের, শিল্পোন্নয়নের কাজে না লাগাইয়া বিদেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের স্বার্থ না দেখিয়া গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে; ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কেবল মুনাফার লোভে যে-কোন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণের আড়ালে বিভিন্নক্ষেত্রে একচেটিয়া শিল্পাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

কেন বৈদেশিক পুঁজি আনা উচিত নয়

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইযাছে। যদিও আমাদের শিল্প হইতে বিদেশী মূলধন চলিয়া যায় নাই, তাহাদের জাতীয়করণ করাও হয় নাই, একচেটিয়া রীতিনীতি চালাইবার সুবিধা পাইতেছে; তাহা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্তৃত্বভার ভারতীযদের হাতে আসিয়া পড়ায় উহার ক্ষতিকারক সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পাইযাছে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আরও বলা হয় যে, আধুনিক কালে বিদেশী পুঁজি অনেক সময় বিশ্বব্যাঙ্ক বা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ভারতে আসিতেছে, ফলে উহার রাজনৈতিক বা বিশেষ কোন জাতীয় চরিত্র নাই, উহা অরাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক হইয়া উঠিয়াছে।

তাহা ছাড়া, অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে বিদেশী মূলধন অনেক উপায়ে সাহায্য করিতে পারে। প্রথমত, যে-সকল দেশ শিল্পোন্নত, তাহারা বর্তমানে বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারসমূহ উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছে। সেই সকল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রজ্ঞান ভারতে আমদানি করিলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে শিল্পোন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশ অপূর্ণোন্নত বলিয়া ভারতে জাতীয় সঞ্চয় বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৪৫০ কোটি টাকা বা জাতীয় আয়ের ৪·৯%। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বাড়িয়া হইয়াছে ৭৯০ কোটি টাকা বা জাতীয় আয়ের ৭·৩%। এই পরিমাণ সঞ্চয় নিযুক্ত হয় ব্যবসায়ে, শিল্পে, গৃহ-নির্মাণে ও জমি ক্রয়ে, সোনা ও অলঙ্কার সংগ্রহে এবং কিছুটা থাকে নগদের আকারে। ভারতের শিল্প-প্রসারে ইহার কতটুকু অংশ বিনিয়োগ হয়? এই অবস্থায় বিদেশী মূলধনের উপর ভরসা রাখিতেই হইবে। জাতীয় আয়ের ১৫% হইতে ২০% যদি শিল্পে বিনিয়োগ করা না যায়, তবে শিল্প সম্প্রসারণের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। বর্তমানের বহু অপব্যয়মূলক সামাজিক কাঠামো বজায় রাখা হইয়াছে, দেশের সম্ভাব্য উদ্বৃত্তকে টানিয়া বাহির করিয়া শিল্পোন্নয়নে খাটান হইতেছে না; বিদেশী মূলধনের গুরুত্ব তাই ভারতে ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে।* তৃতীয়ত, বিদেশ হইতে মূলধন না পাইলে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট এড়ান যায় না। উন্নয়নের প্রথম যুগে ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দরকার, কেবল মাত্র রপ্তানি বাড়াইয়া এতটা পাওয়া যায় না। চতুর্থত, অপূর্ণোন্নত দেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলি হইল ভোগ্যজাতীয়, তাই উহাদের অধিক রপ্তানি করিলে জীবনযাত্রার মান আরও হ্রাস পাইবে। ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিদেশী মূলধনী দ্রব্য আমদানি করার হিসাব হইয়াছিল ৯৬২ কোটি টাকা; বিদেশে যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাপেক্ষা অনেক বেশি মূল্য দিতে হইয়াছে। উন্নয়নের প্রথম যুগে বর্তমান পৃথিবীর তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই পরিমাণ রপ্তানি-উদ্বৃত্ত (export surplus) সৃষ্টি করা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব মিটাইবার জন্য তাই বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন এত বেশি। পঞ্চমত, শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে দেশে প্রভূত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবার সম্ভাবনা। আর্থিক আয় বাড়ে, মূলধনী দ্রব্যের উপর জোর দেওয়া হয় বলিয়া ভোগ্যদ্রব্যের উপর চাপ বাড়িতে থাকে। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ

কেন ভারতে বৈদেশিক পুঁজির দরকার

* সামাজিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ না করিয়া এবং দেশের অতিভোগ ও অপব্যয় বন্ধ না করিয়া সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না। দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য অন্তত প্রথম কয়েক বৎসর ক্রমাগত অধিক হারে মূলধন-গঠন দরকার। দেশে সেই মূলধন নাই, সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত না হওয়ায় মূলধন-গঠন দ্রুত হইতেছে না। তাই ভবিষ্যৎ ভারতীয় পরিকল্পনাগুলিতে বিদেশী প্রয়োজন এই কারণেই ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে।

ভাবে ভোগ্যদ্রব্য বা উহার উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল বাহির হইতে দেশের মধ্যে আনিতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ হ্রাস পাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি না ঘটাইয়া বা কম ঘটাইয়া দেশের শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর হয়। এইরূপে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন—কারণঃ (১) উহা আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিপূরক ; (২) নূতন যন্ত্রকৌশলী ও যন্ত্রবিদ্যা দেশে আনিতে পারে ; (৩) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশের মধ্যে আসে ; (৪) বৈদেশিক মুদ্রাসংকট এড়াইতে সাহায্য করে, এবং (৫) মুদ্রাস্ফীতি না ঘটাইয়া আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়া তোলে।

বৈদেশিক মূলধনঃ সরকারী নীতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Foreign capital : Government's policy and future prospects) :

১৯৪৮ সালের ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির ঘোষণায় ভারত সরকার বৈদেশিক বিনিযোগ বাড়াইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই নীতি অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, (ক) ভারতীয় বা বিদেশী সকল শিল্পকেই শিল্পনীতি মানিয়া কাজ চালাইতে হইবে, (খ) একই ধরনের ভারতীয় শিল্পের উপর যে বিধিনিষেধ ভারত সরকার আরোপ করেন না, তাহা কখনও বিদেশী শিল্পের উপর আরোপ করিবেন না ; (গ) সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মকানুনের মধ্যে থাকিয়া বিদেশী শিল্প মুনাফা করিতে পারিবে ; (ঘ) কোন বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয়করণ করা হইলে ন্যায্য ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাইবে ; (ঙ) ভারত হইতে বিদেশে মুনাফা পাঠাইবার বা মূলধন তুলিয়া লওয়ার বর্তমান সুবিধা সংকুচিত করা হইবে না ; (চ) কোম্পানীর বেশির ভাগ শেয়ার বা সকল শেয়ারই বিদেশীদের হাতে থাকিতে পারিবে।

কোন ধরনের বাধা নিষেধের মধ্যে উহা কাজ করিবে

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আমাদের পরিকল্পনা কমিশনও বৈদেশিক মূলধন গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশ দেশীয় উপকরণগুলিকে ব্যবহার করিয়া উন্নত করিয়া তুলিবে এবং অব্যবহৃত সঞ্চয়কে টানিয়া আনিয়া বিনিয়োগে খাটাইতে উৎসাহিত করিবে। যে সকল নূতন

পরিকল্পনা কমিশনের নীতি

দিকে উৎপাদন বাড়ান দরকার সেই সকল দিকেই বৈদেশিক মূলধন আনা বাঞ্ছনীয়। যেখানে বিশেষ ধরনের দক্ষতা ও কুশলতা দরকার এবং যেখানে আভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ত নয়, সেখানেই বিদেশী মূলধন প্রয়োজন।*

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে নীতি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট প্রায় ১১৮২ কোটি টাকার বৈদেশিক মূলধন ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং প্রায় ৯৮২ কোটি টাকা রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে বৈদেশিক সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। চীনের সহিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় ভারত যাহাতে হারিয়া না যায় এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখিয়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রসার ঘটাইয়া ভারতে যাহাতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতকে সাহায্য করার ইচ্ছা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে দেশের প্রয়োজন

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২৬০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে PL 480 খাতে আমদানির পরিমাণ ধরা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারতবর্ষ পুনর্গঠন ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (IBRD) এবং কয়েকটি বন্ধুভাবাপন্ন দেশের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছে। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ সমস্যাবলী এবং তাহার প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিবার জন্য তিনজন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক-পরিচালক লইয়া গঠিত একটি মিশন ভারতে প্রেরণ করেন। মিশনের রিপোর্টে আলোচনা হয় কি ভাবে বিদেশী মূলধন তৃতীয় পরিকল্পনার

* "In view of the fact that the investment of foreign capital necessitates the utilization of indigenous resources and also that the best use of foreign capital is as a catalytic agent for drawing forth larger resources for domestic investment, it is desirable that such investment should be channelled into fields of high priority. The broad principle to be followed is that foreign investment should be permitted in spheres where new lines of production are to be developed or where special types of experience and technical skill are required or where the volume of domestic production is small in relation to demand and there is no reasonable expectation that the indigenous industry can expand at a sufficiently rapid pace."

কার্য-সূচীকে সাহায্য করিতে পারে। উহার পরে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক হইতে একটি কুশলী-মিশন (expert mission) এই দেশে আসিয়া পরিকল্পনাটির বিভিন্ন দিক লইয়া খুঁটিনাটি আলোচনা করে। তাহার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। বিদেশী সাহায্য সর্বাধিক ফলপ্রসূ হইতে পাবে, যদি (ক) বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে পাইবার প্রতিশ্রুতি থাকে. (খ) কোন বিশেষ প্রজেক্টের জন্য এই সাহায্য না দিয়া যদি সামগ্রিকভাবে উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর সাফল্যের জন্য ইহা দেওয়া হয়, এবং (গ) যদি পরিশোধের শর্ত এমনভাবে নিরূপিত হয় যাহাতে ঋণ গ্রহণকারী দেশের উপযুক্ত পরিমাণ রপ্তানি-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করাব ক্ষমতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

১৯৬১ সালে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহশীল দেশগোষ্ঠী (consortium) কয়েকবার নিজেদেব মধ্যে আলাপ আলোচনা করেন। ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২ ৬৩ সালের মধ্যে তাহারা ১০৮৯ কোটি টাকা ঋণ দিবেন বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে অর্ধেকই দিবে যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েট রাশিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যবহারেব জন্য ইতিমধ্যে ২৩৮ কোটি টাকা দিয়াছে। অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলি যেমন চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, পোলাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতিও তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য মোট ৬৭ কোটি টাকা সাহায্য দিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন অর্থ সাহায্য হইতে মোট ৩৬৫ কোটি টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে, উহাও এখন ব্যবহৃত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভালই

প্রয়োজন বিচার করিয়া এই কন্সর্টিয়াম আরও সাহায্য দিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে মূলধন-সম্পন্ন দেশগুলি পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে ক্রমশ অধিক পরিমাণ মূলধন পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে বৈদেশিক মূলধন দ্রুত ব্যবহারেব ব্যবস্থা করা উচিত এবং উহা ব্যবহারের জন্য দেশের অভ্যন্তরে মূলধন-গঠনের হার বাড়াইয়া তোলা প্রয়োজন। উন্নয়নের প্রথম যুগে বৈদেশিক ব্যালান্স ঘাট্‌তি ঘটেই, ইহা আরও বহু বৎসর ধরিয়া ঘটিতে থাকিবে। এই যুগে বৈদেশিক সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য হইবে দেশের অর্থনীতিকে ক্রমশ অধিকতর আত্মনির্ভর করিয়া তোলা, যাহাতে ভারতবর্ষ নিজের উৎপাদন ও সঞ্চয় হইতেই দশ বার বৎসরের মধ্যে পর্যাপ্ত মাত্রায় বিনিয়োগ করিতে পারে। দেশে

বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক মাত্রায় ঘটিতেই থাকিবে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধরনের বৈদেশিক সাহায্য ক্রমশ কমাইয়া আনিতে হইবে, অবশেষে উহা বন্ধ করিতে হইবে। এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হইল তৃতীয় পরিকল্পনা।*

এই সকল সুবিধা দানের সরকারী নীতি সত্ত্বেও আকাঙ্খিত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন দেশে প্রবেশ করিতেছে না। উহার অনেক কারণ ভারতীয় ব্যবসাদাররা দেখাইতেছেন, যেমন (ক) ভবিষ্যতের করনীতি ও জাতীয়করণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার দরুণ বিদেশীরা ভারতে মূলধন পাঠাইতে সাহস পাইতেছেন না (খ) বহু সরকারী বাধানিষেধ ও উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্যের দরুণ মুনাফার হার ততটা বেশি নয়। অতীতে প্রধানত ব্রিটিশ পুঁজিই ভারতের প্রবেশ করিত। যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ পুঁজির প্রাধান্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে বিদেশে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে পারে এইরূপ দেশ হইল আমেরিকা। কিন্তু ভারতে মূলধন নিয়োগে তাহারা এখনও অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া, আমেরিকার বৈদেশিক বিনিয়োগের সহিত রাজনৈতিক মতামত ও শর্ত জড়িত থাকিতে চায়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতের জাতীয় আয় এবং রপ্তানি-বাণিজ্যের নীতি ও সম্ভাবনা বিচার করিয়া বলা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করার ক্ষমতা এখনও ভারতের আছে। তবে সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দরকার যেন এই সকল ঋণ দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ্য হয় এবং সুদের হার কম থাকে। উপরন্তু বৈদেশিক মূলধন দেশে আনিয়া জনসাধারণের ভোগের হার বাড়ান চলে, ফলে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের হার বাড়িল না এইরূপ অবস্থা দেখা দিতে পারে।† ভোগের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক

বৈদেশিক মূলধন কোন্ রূপে ভারতে প্রবেশ করিতেছে?

* "The balance of payments difficulties that the country is facing are, it must be stressed, not short run or temporary : they will continue for several years to come. External assistance is essential for this period, but the aim must be to make the economy more and more self-reliant, so that it is able to support within a period of ten or twelve years an adequate scale of investment from its own production and savings. Normal inflows of capital may continue but reliance on special forms of external assistance has got be reduced progressively and eliminated. The Third Plan represents a crucial stage in this process."

† Nurkse: Problems of Capital formation. P. 91.

ঋণ ও সাহায্য ব্যবহার করার (যেমন ভারতের খাদ্য ও অনাবশ্যক বিলাস সামগ্রী আমদানি) দোষই হইল যে, উহা আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগের হার বাড়াইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অধ্যাপক শেনয়ের ভাষায় বলিতে গেলে "during the first plant period the bulk of foreign aid during the first three yeaıs financed gold smugglıng, the much larger foreign aid during the first three years of the second plan was used up principally for hoarding food grains, partly to finance smuggling and a small part for purchasing Indian assets owned by foreigneıs."

পরিশিষ্ট

ভারতের শিল্পপ্রসারে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা

(Role of Direct Foreign Investment in the Industrialisation of India) :

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ভারতের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। ইহার অনেক কারণ আছে, তাহার মধ্যে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমত, যে কোন দেশ শিল্পপ্রসার স্বরু করিলে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সম্মুখীন হইবে। যদি সেই দেশের এমন কোন রপ্তানি-দ্রব্য থাকে যাহার চাহিদা ক্রমবর্ধমান (যেমন পেট্রোলিয়াম) তবে এই সংকটের হাত হইতে সে রক্ষা পাইতে পারে। স্বল্পকালের জন্য (in the short run) বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশ বৈদেশিক মুদ্রার অভাব পূরণ করিতে পারে। কিন্তু এই ধরনের 'উপকারিতা' একান্তভাবে সাময়িক ধরনের। দীর্ঘকালে এই মূলধনের লাভ বাহিরে পাঠাইতে হয় বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রার অভাব আরও তীব্র হইয়া উঠে। প্রত্যেক মূলধন-বিনিয়োগকারীই চেষ্টা করেন মূলধনের পরিমাণ বাড়াইতে, অর্থাৎ যে পরিমাণ বিনিয়োগ করিয়াছেন উহা অপেক্ষা বেশি ফেরৎ পাইতে। বৈদেশিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যও একই। নিজের দেশে যত দ্রুত মূলধন ফেরৎ পাওয়ার আশা, তাহা অপেক্ষা বিদেশে খাটাইলে দ্রুততর ফেরৎ পাওয়া যাইবে এইজন্যই মূলধনের মালিকেরা বিদেশে বিনিয়োগ করে। বিদেশী মূলধনের মালিকেরা আশা করে যে অন্তত পাঁচ বছরের মধ্যে মূলধন ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ তাহারা এমন ক্ষেত্রে মূলধন

বিনিয়োগ করিতে চাহে যাহা হইতে সরকারী কর এবং রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা ইত্যাদি বাদ দিয়া নীট লভ্যাংশ অন্তত শতকরা কুড়ি ভাগ পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে একথা সকলেই জানেন যে মার্কিন বিনিয়োগকারীরা এই হারে লভ্যাংশ না পাইলে বিদেশে বিনিয়োগ করিতে প্রস্তুত নন।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধোত্তর কালের বিভিন্ন দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে বৈদেশিক মুদ্রার অনুপ্রবেশ বিনিয়োগ অপেক্ষা অনেক কম। সাধারণত, প্রথমবারের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশগুলি সেই দেশেই পুনর্বিনিয়োগ করিয়া মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ান হইয়াছে। একদিক হইতে বিচার করিলে ইহা বৈদেশিক মুদ্রার অনুপ্রবেশ, কিন্তু অপরদিক হইতে দেখিতে গেলে ইহা বৈদেশিক মুদ্রার বহির্গমন, সুতরাং এইরূপ বিনিয়োগের ফলে দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর নীট প্রভাব একেবারেই শূন্য বলা চলে। অনেক দেশেই অবন্টিত লভ্যাংশের পুনর্নিয়োগের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ এমন কি অর্ধেক। বিনিয়োগ সুরু হওয়ার প্রথম কয়েক বৎসর এইরূপ পুনর্নিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকে। কিন্তু ব্যবসায়টি প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লভ্যাংশের বণ্টন ও উহার বিদেশে প্রেরণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর চাপ দীর্ঘকালে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, যেখানে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রধানত আভ্যন্তরীণ বাজারের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, । অর্থাৎ রপ্তানি দ্রব্য নয় , সেখানে লভ্যাংশ প্রেরণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন যতটা বাড়ে ঐ বিনিয়োগ হইতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ততটা বাড়ে না। যদি দেশটির রপ্তানি দ্রব্য প্রধানত কৃষিজাত ধরনের হয়, তবে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব মিটাইতে রপ্তানির ক্রমশ অধিক অংশ ব্যয়িত হইতে থাকে। (কারণ কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী দেশটির বাণিজ্যহার প্রতিকূল থাকে)।

বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ দেশে আমদানির প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে মেটায় সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে ইহা অনেকাংশেই কাল্পনিক সুবিধা। কারণ শিল্পোন্নয়নের বেগ যত বৃদ্ধি পায়, ততই বিদেশী ভোগ্যদ্রব্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের জন্য চাহিদা বাড়িতে থাকে।

চতুর্থত, যদি বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে রপ্তানির উপযোগী কাঁচামালের শিল্প (যেমন খনিজদ্রব্য, কৃষিদ্রব্য ইত্যাদি), তবেও অবস্থা আশানুরূপ হয় না।

ইহার কারণ, রপ্তানি-দ্রবের দাম বাড়িলে উহার লাভ পায় বিদেশী মালিকেরা তাহাদের লভ্যাংশ বাড়ে, অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার উপর চাপ আরও বাড়ে। অর্থাৎ বাণিজ্য-হার ভারতের অনুকূল হইলেও উহাতে ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হয় না, বরং বিদেশী মুদ্রার সংকটই ঘনীভূত হয়।

পঞ্চমত, অবশ্য যদি বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে রপ্তানির উপযোগী যন্ত্রশিল্পে, তবে অবস্থা দেশটির অনুকূলে আসে। কারণ সেই দ্রব রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রেও বিপদ আছে। সাধারণত বিদেশী শিল্পপতিরা নিজেদের দেশের মূল কোম্পানীর শাখা বা অধীন হিসাবে অনুন্নত দেশে কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে। মূল কোম্পানীর ব্যবসাতে ক্ষতি না হয় একমাত্র এইরূপভাবেই অধীনস্থ শাখা কোম্পানীটির রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতে পারে। যেমন, বাণিজ্যসংকটের সময়ে শাখা কোম্পানীর রপ্তানি ব্যবসায় সংকুচিত করিয়া মূল কোম্পানী নিজে রপ্তানি করিয়া প্রথমে নিজেকেই রক্ষা করিবে। এইরূপে উন্নত দেশের সংকটের ফল অনুন্নত দেশটি ভোগ করিতে থাকিবে।

ষষ্ঠত, ভারতে শাখা কোম্পানীর ব্যবসায়িক স্বাধীনতা সংকুচিত থাকিবে, কারণ রপ্তানির বাজার বণ্টন করিবে মূল কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ এবং তাহারা নিজেদের মুনাফার প্রতিই প্রধান লক্ষ্য রাখিবে।

সপ্তমত, সংকটের সময়ে মূল কোম্পানী ও উহার মালিকবৃন্দ যথাসম্ভব বেশি মুনাফা নিজেদের দেশে পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। ঠিক যখন রপ্তানির বাজার সর্বাধিক ক্ষীয়মান, তখনই লভ্যাংশ প্রেরণের চাপ বাড়ে বলিয়া দেশটি অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, শাখা কোম্পানীটিও বিপদগ্রস্ত হয়।

অষ্টমত, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উহারই সঙ্গে বিদেশী টেকনিক ভারতে আনে। এই টেকনিকগুলি ভারতের পক্ষে উপযোগী না-ও হইতে পারে। ইহা সবচেয়ে বেশি সত্য শ্রম-সঞ্চয়ী মূলধন প্রগাঢ় যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে। বর্তমানে, ভারতের শিল্পোন্নয়নের এই স্তরে, ঠিক বিদেশের অনুরূপ যন্ত্রপাতি ও টেকনিক আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারকও হইতে পারে। অনেক সময়ই এই সকল যন্ত্র ভারতীয় কাঁচামাল লইয়া কাজ করার উপযোগী হয় না। তখন বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি করা সুরু হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন না হইয়া বৈদেশিক মুদ্রার সংকট চিরস্থায়ী রূপ লয়। এই সকল যন্ত্রপাতি লইয়া

উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতা বেশি বলিয়া আয়ও বেশি। ফলে অন্যান্য কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্রের মজুরেরা বেশি মাহিনা আদায় করে এবং দেশে শিল্পপ্রসারের প্রথম যুগে মূলধন-গঠনের বেগ মন্দীভূত হয়।

নবমত, ব্যক্তিক্ষেত্রের বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা নিজেদের টেকনিক ও ব্যবসায়িক রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে অস্বাভাবিক গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিতে চায়। ফলে যে-হারে আমরা ইহাদের প্রসার চাই, সেই হারে শিল্পজ্ঞানের প্রসার ঘটিতে পারে না।

অনুশীলনী

1. Discuss the economic effects of employment of foreign eap ital in India.

2. Discuss the place of foreign capital in the economic developmen t of India to-day. What are the sources from which foreign capital may be obtained for the country ?

3. Examine the case for encouraging the flow of foreign capital into India india in recent years.

4. Examine the case for and against encouraging the flow of foreign capital into india under existing circum stances.

5. "Employment of Foreign Capital for developing Indian Indus tries was long beset with difficulties from which she has now become free." Examine.

6. Discuss the case for and against using foreign capital for India's economic development. What are the different sources of capital av ailable to India ?

২০

কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমস্যা

Few Industries and new Problems

তুলা বস্ত্রশিল্প (Cotton Textile Industry)

ভারতের বৃহৎ মাত্রায় যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল বস্ত্রোৎপাদন শিল্প। ১৮১৮ সালে কলিকাতায় প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হইলেও, এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সুরু ১৮৫৪ সাল হইতে, যখন বোম্বাইতে একটি বস্ত্রোৎপাদন কারখানা স্থাপিত হয়। তাহার পর হইতে উত্থান পতনের মধ্য দিয়া এই শিল্প ক্রমাগত প্রসার লাভ করিয়াছে। এই শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ভারতীয় মূলধন ও পরিচালনায় বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা ও নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও এই শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে।

ভারতীয় পুঁজিবাদ প্রসারের হোতা

অপরাপর শিল্পের উন্নতি বেশিদূর না হওয়ায় ভারতের শিল্প সংগঠনে মিলবস্ত্র শিল্পের স্থান এতদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহাতে প্রায় ১২২ কোটি টাকার মূলধন নিযুক্ত এবং বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। প্রায় ৮ লক্ষ ৯০ হাজার লোক ইহাতে নিযুক্ত আছে। পৃথিবীর মিলবস্ত্র উৎপাদনের ১৪% এবং মিলসূতা উৎপাদনের ১৩% ভারতে উৎপন্ন হয়। ১৮৭টি সূতা উৎপাদনকারী মিল এবং ২৯২টি মিশ্রমিল (সূতা ও বস্ত্র উভয়ই উৎপন্ন হয়) লইয়া শিল্পটি গঠিত। ভারত বিভাগের ফলে মিলের সংখ্যা কমিয়া ১৯৪৭ সালে ছিল ২০৮টি, কিন্তু তাহার পরে এই শিল্প অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও নূতন কয়েকটি মিল এখনও প্রস্তুতির পথে। ১৯৬০-৬১ সালে মিলবস্ত্রের মোট উৎপাদন ছিল ৫১২৭ মিলিয়ন গজ ও সূতার পরিমাণ ছিল ১৯৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড।

শিল্পটির কাঠামো

১৯২৬ সালে সংরক্ষণের দাবী জানাইয়া এই শিল্প আবেদন করে এবং বহু তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়া সংরক্ষণ লাভ করিয়া দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ১৯৪৭ সালে এই সংরক্ষণ তুলিয়া দেওয়া হয়। এই শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল ক্রমবর্ধমান রপ্তানি। ১৯৫৯ সালে ভারত ৬১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানি করিয়াছিল। বিদেশী প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়া এবং আমদানিকারী

সংরক্ষণ ও প্রসার

দেশগুলিতে বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার উপর রপ্তানির পরিমাণে উঠানামা নির্ভর করে।

দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের উপযোগী। তাহা ছাড়া, গুজরাটী, সিন্ধী ও পার্শী ব্যবসায়ীরা প্রথমে এই ব্যবসায় সুরু করেন। উপরন্তু বিদেশে রপ্তানি করার সুবিধা পাইবার জন্য প্রথম হইতেই বস্ত্রশিল্প বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। তবে বর্তমানে এই কেন্দ্রিকতার ঝোঁক কমিয়া গিয়াছে, ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই মিলবস্ত্রের কারখানাগুলি ছড়াইয়া গিয়াছে। তবে এখনও প্রধানত বোম্বাই রাজ্যে উহাদের প্রায় ৬০% সীমাবদ্ধ আছে। সম্পূর্ণ বেসরকারী মালিকানায় এই শিল্প পরিচালিত।

প্রথম পরিকল্পনায় মিলবস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্য মাথাপিছু ১৫ গজ ধার্য করা হইয়াছিল, মিলবস্ত্র শিল্প সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে বস্ত্র উৎপাদনের ভার প্রধানত তাঁতের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার কথা হইয়াছিল। কর্মসংস্থান বাড়াইবার উদ্দেশে কার্ভে কমিটির সুপারিশ অনুসারে মিল বস্ত্রের প্রসার না ঘটাইয়া, মিলগুলির উৎপাদনের উপর সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) বসাইয়া, এইরূপ কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে

পরিকল্পনায় মিলবস্ত্রের লক্ষ্য

১৯৬৫-৬৬ সালে সুতা উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ২২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ঐ সময়ে সুতাজাত বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্য ৫৮০০ মিলিয়ন গজ। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে জনসংখ্যা ও রপ্তানির বৃদ্ধি হিসাবে ধরিয়া লইয়াও এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিলে মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার ১৯৬০-৬১ সালের ১৫.৫ গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭.২ গজ হইবে।

বোম্বাই মিল মালিক সমিতি বস্ত্রশিল্পের নিম্নলিখিত প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন: (ক) উৎকৃষ্ট তুলা আমদানির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্য বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করা যাইতেছে না। (খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রম-প্রগাঢ় তাঁতশিল্পের প্রসারের জন্য মিলের পূর্ণ উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার করিতে না দেওয়া, ফলে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি। ইহার ফলে বাহিরে বাজারে ভারতের মিলগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমিয়া

শিল্পের বর্তমান সমস্যাবলী

যাইতেছে। (গ) ১৯৫৮ সালে রপ্তানি হ্রাস, খাদ্যদ্রব্যের দামবৃদ্ধির দরুণ আভ্যন্তরীণ ক্রয় শক্তিতে হ্রাস, অধিক হারে উপজ শুল্ক (excise duties) ও মজুরি বৃদ্ধির দরুণ মিল বস্ত্র বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া; এই শিল্পের সম্মুখে গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। মিলের গুদামে বস্ত্রদ্রব্য জমিয়া যাইতেছে। (ঘ) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি বাড়াইবার জন্য সরকারী অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। বর্তমানে চীনের বস্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাজার হইতে অনেকটা সরিযা আসিতে হইয়াছে। ইউরোপীয় সাধারণ বাজার গঠিত হওয়ায় ইউরোপের এই দেশগুলিতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সুউচ্চ শুল্ক প্রাচীরের বাধার সম্মুখীন হইযাছে। আরও উন্নত ধবনের তুলা থাকিলে উন্নত গুণসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হইত, আমাদের রপ্তানিও বাড়িত। (ঙ) আধুনিকীকরণের জন্য সবকারী অর্থ সাহায্য করা এবং বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনিবার লাইসেন্স দেওয়া দরকার।

মিলবস্ত্র শিল্পের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল ইহার যন্ত্রপাতির আধুনিকী-করণ (rationalisation)। কেন আধুনিকীকরণ দরকার হইয়া পড়িয়াছে তাহা আলোচনা করিযা দেখা দরকার। প্রথমত, পৃথিবীতে বস্ত্রের বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্রতর হইয়া উঠিযাছে। ব্রিটেন, জাপান, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ছাড়াও বর্তমানে চীন, হংকং প্রভৃতি দেশগুলি নূতন ধরনের যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে ভারতের বস্ত্রশিল্পকে আর অপেক্ষা করিলে চলিবে না। দ্বিতীয়ত, ভারতের বস্ত্রশিল্পে বর্তমানে বাধ্যতামূলক ব্যয়-স্ফীতি (compulsory cost inflation) দেখা যাইতেছে। পুরাতন যন্ত্রপাতি রহিয়া গিয়াছে অথচ কাঁচামাল ও শ্রমিকের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইতেছে না। তৃতীয়ত, রপ্তানি বাড়াইয়া দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইলে এই শিল্পটিতে উৎপাদন ব্যয় কমান দরকার। চতুর্থত, জনসংখ্যা এবং আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ মোটামুটি বাড়িতেই থাকিবে; দেশে বস্ত্রের দাম মোটেই কম নয়, বরং বলা যায় যে, দাম বেশি থাকার দরুণই ভারতের জনসাধারণ যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় মাথাপিছু কম বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে লোকেরা

কেন বস্ত্রশিল্পের আধুনিকীকরণ দরকার

গড়ে বৎসরে ১৬ গজ বস্ত্র ব্যবহার করিত, বর্তমানে ইহা ১৫ গজ। উচ্চ মূল্য ও স্বল্প ভোগের সমস্যা দূর করিতে হইলে এই আধুনিকীকরণ দরকার। পঞ্চমত, আধুনিকীকরণ না-করা শ্রমিকেরা উৎপাদনক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধির পথে বিশেষ বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইযাছে। সর্বোপরি, আধুনিকীকরণ না হইলে অনেক সংখ্যক বস্ত্রের কারখানা ক্রমশ বন্ধ হইয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে প্রায ১৫০টি অত্যন্ত স্বল্পদক্ষতাসম্পন্ন মিল আছে, যাহারা যে-কোন সময়ে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

বহু কমিটি ও সংগঠন এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। যেমন শিল্প পুঁজি করপোরেশনের দ্বিতীয় বাৎসরিক রিপোর্ট (১৯৫০) এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিল। মিল বস্ত্র শিল্পের জন্য গঠিত ওযার্কিং পার্টির টেক্‌নিক্যাল সাব্‌কমিটি এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছিল। আন্তর্জাতিক শ্রম দফ্‌তরের মিশন (I. L. O. Mission) অবিলম্বে এই শিল্প আধুনিকীকরণ করিযা উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের (quality control) কথা ঘোষণা করিয়াছিল।

বহু কমিটি এই কথা ঘোষণা করিযাছেন

১৯৫৪ সালে কানুনগো কমিটি বা মিলবস্ত্র অনুসন্ধান কমিটি (The Kanungo committee or the Textile Enquiry Committee) বলিযাছিলেন যে, রপ্তানির স্বার্থে এই শিল্পকে অবিলম্বে উন্নত করিয়া তোলা দরকার। ১৯৫৮ সালে তুলাবস্ত্র অনুসন্ধান (জোশী) কমিটিও (The cotton Textile Enquiry (Joshi) Committee) এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় মজুরি বোর্ডও ইহার উপর জোর দিযাছেন। এই উদ্দেশ্যে NIDC ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১.২৩ কোটি টাকা বিভিন্ন বস্ত্র শিল্পপতিগণকে ঋণ দিয়াছেন। দেশে মূলধনের স্বল্পতা, বিদেশী মুদ্রার অভাব এবং বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির ভয়, এই সকল কারণে ভারত সরকার এই বিষয়ে সুদৃঢ় কোনরূপ পদক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিতেছেন।

পাটকল শিল্প (Jute Mill Industry)

জর্জ অক্‌ল্যাণ্ড নামে একজন স্কচ্‌ ভদ্রলোক শ্রীরামপুরের নিকট রিষড়াতে প্রথম পাটকল স্থাপন করেন, শক্তির সাহায্যে তাঁত পরিচালনার কাজ ১৮৫৯ সালে শুরু হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিল্পটি প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপীয় মূলধনে ও পরিচালনায় দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দায় এই শিল্পটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। এই শিল্প ভারতের শিল্প-কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করিয়া আছে। ইহাতে বিনিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ৮৯.৫৫ কোটি টাকা, ২৩½ লক্ষ শ্রমিকের বেশি ইহাতে নিযুক্ত আছে। মূলত রপ্তানির উদ্দেশ্যেই উৎপাদন হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা, প্রধানত ডলার আয় করিতে এই শিল্প সাহায্য করে। ভারতে এখন ১১২টি পাটকল আছে; উহার মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবাংলায় সীমাবদ্ধ (১০১টি)। ইহা ভারতের মধ্যে অত্যন্ত সুসংগঠিত শিল্প, ইহার মালিকসমিতি (Indian Jute Mill Owner Association বা IJMA) ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মালিক-সংগঠন। পাটশিল্প অনুসন্ধান কমিশন ১৯৫৪ সালের মে মাসের রিপোর্টে দেখান যে, ১২টি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসের হাতে ৭৫% মিল কেন্দ্রীভূত এবং ইহার মধ্যে ৪টির হাতে মোট তাঁত-পরিমাণের ৪৫% রহিয়াছে।

শিল্পের কাঠামো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় পাট শিল্পের সমস্যা ছিল দুইটি: (ক) বাড়তি-অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতা (excess capacity), এবং (খ) বিকল্প বা পরিবর্ত-দ্রব্যের প্রতিযোগিতা। (গ) দেশবিভাগের ফলে কাঁচাপাট পাইবার সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠে। (ঘ) এই সকল সমস্যার সহিত বর্তমানে আরও একটি সমস্যা যুক্ত হইয়াছে, তাহা হইল পুরাতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতি। বিভিন্ন দেশে নূতন প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে হইলে শিল্পটির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

পাট শিল্পের চারিটি সমস্যা

শিল্পটির প্রধান সমস্যাই হইল চাহিদার তুলনায় ইহার উৎপাদনক্ষমতা অনেক বেশি। এই অবস্থায় বাজারে দাম যাহাতে কমিয়া না যায় সেইজন্য IJMA সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রতিটি মিলের কাজের সময় কিছুটা কমাইতে হইবে এবং মোট তাঁত পরিমাণের (loomage) শতকরা নির্দিষ্ট অংশ তাঁত বন্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, চটের থলি পূর্বে যেরূপ একচেটীয় অবস্থায় ছিল, আজ আর তাহা নাই। চটের থলি দামে সস্তা, বহুবার ব্যবহার করা যায় ছিঁড়িয়া মাল নষ্ট হইবার ঝুঁকি কম। কিন্তু এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কাপড়ের ও কাগজের থলি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, একসঙ্গে অধিক মালপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা শুরু হওয়ায় (bulk handling) চটের থলির প্রয়োজন কমিয়া যাইতেছে। তৃতীয়ত, দেশ বিভাগের ফলেই কাঁচা পাট পাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়াছে। সকল মিল পূর্ণশক্তিতে কাজ করিলে প্রতি

বৎসর মোট ৭৫ লক্ষ বেল (bales) কাঁচা পাট প্রয়োজন হয়। এই কয় বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করা হইতেছে এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে মোটামুটি ৪০ লক্ষ বেল ভারতে উৎপাদন হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে কাঁচা পাটের উৎপাদন ৫০ লক্ষ বেল করা হইবে স্থির হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ৪০ লক্ষ বেল উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও কাঁচা পাটের এই ঘাট্‌তি চলিতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে ইহাব উৎপাদন প্রায ৬২ লক্ষ বেল করা হইবে বলা হইয়াছে। সর্বোপরি, এতদিন ভারতের পাটশিল্প সারা দুনিয়ার বাজারে একচেটিয়া অধিকার কায়েম রাখিয়াছিল ; আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই একচেটিয়া অধিকার সংকুচিত হইয়াছে। পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, ফিলিপাইন এবং জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ সর্বাধুনিক যন্ত্রপতির সাহায্যে পাটশিল্প গড়িয়া তুলিযাছে। তাহাদেব উৎপন্ন দ্রব্য সস্তায বিক্রয় হইতে পারে বলিযা ভারতীয পাটশিল্প নিদারুণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। পাট অনুসন্ধানী কমিশন তাই ভারতীয শিল্পসমূহের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনের উপর জোব দিয়াছেন। IJMA এইরূপ আধুনিকীকরণে সম্মতি দেয় নাই, কারণ তাহাদের নিজেদেব মধ্যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা (Cut-throat Competition) দেখা দিবে এবং বর্তমানের উৎপাদন সংগঠনে বিশৃংখলা আসিবে। কিন্তু পাট অনুসন্ধানী কমিশন বলিয়াছেন যে, আধুনিকীকরণ না ঘটাইয়া পুরাতন অক্ষম ফার্মগুলি জিয়াইয়া রাখা হইতেছে, ফলে অপর উন্নত ফার্মসমূহ (উৎপাদন শক্তির অপূর্ণ ব্যবহারের দরুণ) বড হইয়া উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পারিতেছে না। পাট কমিশনের হিসাবে এইরূপ আধুনিকীকরণে ৪০ কোটি টাকার দরকার। NIDC এই বিষয়ে তৎপর হইয়া মিলগুলিকে সাহায্য করিতেছেন।

উৎপাদনক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার ; পরিবর্ত দ্রব্য ; কাঁচামাল, বিদেশী প্রতিযোগিতা, ও আধুনিকীকরণ

১৯৫৪ সালের পাট অনুসন্ধানী কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হইল : (ক) পাট শিল্পের জন্য একটি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা। (খ) শিল্পের বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা থাকায় নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স না দেওয়া। (গ) শিল্পটির যন্ত্রপাতি ও পরিচালন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ। (ঘ) কাঁচাপাট উৎপাদনে সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা, যাহাতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধরনের

পাট অনুসন্ধানী কমিশনের সুপারিশসমূহ

পাট পাকিস্তান হইতে আমদানি হয়। (ঙ) আঞ্চলিক বণ্টন ব্যবস্থা। (চ) কাঁচা পাটের নিম্নতম দাম নির্ধারণ করা। (ছ করভার হ্রাস করিয়া শিল্পটিকে সাহায্য করা।

১৯৬১ সালে ভারতে পাট শিল্পে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বেশ কতকগুলি অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্য দিয়া পাটশিল্প এবং পাট চাষী পার হইয়া আসিয়াছে। মিল মালিকদের তরফ হইতে বলা হয় যে, কাঁচা-পাটের দাম খুবই বেশি, কারণ প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম। আবার চাষীদের তরফ হইতে বলা হয় যে দালাল শ্রেণীর লোকেরাই ফাট্‌কাবাজি দ্বারা দাম বাড়াইতেছে, চাষীরা প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাজারে ৫৫।৬০ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় হয়, কিন্তু মালিক সমিতি ৩০।৩২ টাকাকে ন্যায্য দর বলিয়া মনে করেন। মিল মালিক সমিতি এই যুক্তিতে অনেক তাঁত অলস করিয়া রাখেন, জুন ও জুলাই মাসে এক সপ্তাহ করিয়া সকল মিল বন্ধ রাখেন। তাঁহারা আরও বলেন মোট মজুরির বিল পূর্বাপেক্ষা বেশি দিতে হইতেছে অথচ বিদেশী মিলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার জন্য দাম বাড়ান ততটা সম্ভবপর হয় নাই। এই সকল কারণে (ক) পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পায়, (খ) কাঁচা পাটের দাম বেশি থাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কিছুটা বাড়াইতে হয়, (গ) পাকিস্তানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হইয়া উঠে, এবং (ঘ) পাটের পরিবর্ত-দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। পাট শিল্পপতিদের এবং মজুরদের আয় হ্রাস পায়, রপ্তানি কমে এবং বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারে কম অর্থাগম হয়। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাটের দাম দ্রুত হ্রাস পায়, অর্থাৎ পাট চাষীদের বিনিময়ে মিল মালিকরা আবার উৎপাদন বাড়াইতে সচেষ্ট হন। বর্তমানে মিল মালিকরা প্রতি মণ ৩১·৫০ হইতে ৩১·৭৫ ন.প. দরে পাট কিনিতেছেন, অর্থাৎ পাট চাষীরা ইহাপেক্ষা প্রতি মণ অন্তত ৭।৮ টাকা কম দরে পাট বিক্রয় করিতেছেন। এইরূপে পাটের চাষে সংকট ঘনীভূত করিয়া পাট শিল্প 'সংকট' কাটাইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে পাট শিল্পের সমস্যা

চিনি শিল্প (Sugar Mill Industry)

ভারতে চিনির উৎপাদন বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিতেছে; তবে কলের সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে চিনির উৎপাদন অন্যান্য যন্ত্রশিল্পের তুলনায় প্রাচীন নহে। এতদিন প্রধানত যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল।

কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যেও চিনির কল স্থাপিত হইতেছে। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত কলগুলির উৎপাদন দক্ষতা বেশি এবং ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয় কম। ১৯৩২ সালে এই শিল্প সংরক্ষণ পায় এবং তাহার পর হইতেই ইহা অতি দ্রুত প্রসারিত হয়। ১৯৩১ সালে মাত্র ৩১টি কারখানা ছিল এবং মোট উৎপাদন ছিল ১,৫৮,০০০ টন। সংরক্ষণের চার বৎসরের মধ্যে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৫টি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৯,১৯,০০০ টন। ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে কারখানাজাত চিনির উপর একটি উপজ শুল্ক (excise duty) বসান হইয়াছে। চিনি-শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণে বহু উঠানামা দেখা গিয়াছে, এই উঠানামা নির্ভর করিয়াছে তিনটি বিষয়ের উপর: ইক্ষুর যোগান (supply of sugar cane), ইক্ষু মাড়াইবার সময়ের দীর্ঘতা (the length of the crushing season), এবং উহা হইতে চিনির পরিমাণের শতকরা অংশ (the percentage recovery of sugar)। ১৯৫৬-৫৭ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টন। নূতন কারখানা স্থাপিত হওয়ায় এবং বর্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টনে পৌঁছিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয় নাই, আশা করা হইয়াছিল ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বৎসরে ১৫ লক্ষ টন উৎপাদন হইলেই চলিবে। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে চিনির উৎপাদন বাড়িয়া ১৬ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ফলে পরিকল্পনার লক্ষ্য পারবর্তিত করিয়া ১৮ লক্ষ টন ধার্য করা হয়, এবং এই উদ্দেশ্যে ৩৭টি নূতন কারখানার ও ৪০টি বর্তমান কারখানার উৎপাদন-শক্তি বাড়াইবার লাইসেন্স দেওয়া হয়। শিল্পনীতির সংশোধন অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে একটি উন্নয়ন কাউন্সিল স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য বাৎসরিক ২.২৫ মিলিয়ন টন ধার্য করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে প্রায় ৩ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য পার হইয়া গিয়াছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় চিনি শিল্পের উৎপাদন

চিনি উৎপাদনের এতটা বৃদ্ধি আর কোন বৎসর সম্ভব হয় নাই। ইহার পিছনে দুইটি কারণ আছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিনির রপ্তানি এবং চাষীদের ক্রমশ অধিক পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদন। কিউবা হইতে আমেরিকায় চিনির আমদানি বন্ধ

হওয়ায় আমেরিকার বাজার ভারতের চিনি-ব্যবসায়ীদের নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। উৎপাদন বাড়াইলে শুল্ক হইতে রিবেট পাইবে—এই সরকারী নীতির দরুণও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক নূতন মিল স্থাপিত হইয়াছে, পুরাতন মিলগুলির প্রসার ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে চাষীরা ক্রমশ বাজার মুখী উৎপাদন শুরু করিয়াছে; সরকারও ইক্ষুর নিম্নতম দাম বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের উৎসাহ দিয়াছেন, প্রতি মণ ইক্ষুর দাম ছিল ১'৪৪ নঃ পঃ, এখন হইয়াছে ১'৬২ নঃ পঃ। অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে এবং গুড় উৎপাদনে দাম কম পাওয়া যায় বলিয়া চাষীরা মিলের নিকট অধিক ইক্ষু বিক্রয় করিয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ৩'৫ মিলিয়ন টন। পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে যে এই শিল্পে আরও ১৪০ কোটি টাকার নূতন বিনিযোগ হইবে। ইহার মধ্যে ১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে।

এই শিল্পের সম্মুখে বহু প্রকার সমস্যা রহিয়াছে। চিনি শিল্পকে বলা হয় সংরক্ষণের শিশু (the child of protection)। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিয়াও শিশুটি বড়সড় হইতে পারে নাই, বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জন করে নাই। প্রথমত, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ইক্ষুর সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই। চিনির উৎপাদন-ব্যয়ের ৫০% ব্যয়ই হইল ইক্ষুর জন্য, ইক্ষু সস্তা না হইলে চিনি সস্তা হইতে পারে না। আমাদের দেশে গত ২০ বৎসর ধরিয়া প্রতি-একরে মোটামুটি গড়ে ১৪ হইতে ১৫½ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে—মিশরে ৩০ টন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০ টন, ফিলিপাইনে ২৭ টন, জাপান ও ফরমোসায় ২৮ টন। জাভাতে ২৬ টন এবং হাউইতে ৬২ টন ইক্ষু প্রতি-একরে উৎপন্ন হয়। ভারতের কোন কোন অংশে যেমন দক্ষিণ ভারতে গড়ে একর-প্রতি ৩০ হইতে ৪০ টন উৎপাদন দেখা যাইতেছে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, চিনি কলগুলির বেশির ভাগ উত্তর ভারতে অবস্থিত। উহাদের অপসারণ করিয়া দক্ষিণ ভারতে লইয়া আসার খরচও বেশি, তাহা ছাড়া যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের গ্রাম্য অর্থনীতির উপর ইহার সংকটজনক প্রভাবও কম নয়। সুতরাং তাহা সম্ভব হইতেছে না। ইক্ষু হইতে কত অংশ চিনি উদ্ধার করা যায় তাহাও দেখা দরকার। বর্তমানে ভারতে মোটামুটি ১০'৩১% উদ্ধৃত হইতেছে; অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা খুবই কম, যেমন কিউবাতে ১২'৩৩, ফরমোসাতে ১২'০৫, এবং কুইন্সল্যাণ্ডে

চিনি শিল্পের সমস্যাগুলি: ইহার পরিমাণ, গুণ ও দাম

১৪·২২%। তাহা ছাড়া, শিল্পটির উপজাত দ্রব্য (by products) উৎপন্ন করার দিকে বেশির ভাগ কারখানার ঝোঁক না থাকায় উৎপাদন ব্যয় কমাইবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হইতেছে না।

চিনির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয় চিনি সিণ্ডিকেট (Indian Sugar Syndicate); ইহার সভ্যপদ প্রথমে ছিল স্বেচ্ছামূলক, পরে যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের রাজ্য সরকার আইন করিয়া সকল মিলকে উহাতে যোগ দিতে বাধ্য করে। সিণ্ডিকেটের উদ্দেশ্য হইল চিনির দাম সর্বাধিক রাখা, এই সরকার দুইটির উদ্দেশ্য হইল ইক্ষুর দাম বেশি রাখা। ফলে এত বেশি দাম থাকায় চিনির ভোগ দেশের মধ্যে বাড়িতে পারিতেছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দেশের মধ্যে যতটা চিনির ক্রয় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত বাস্তবে ততটা হইতেছে না। রপ্তানির হঠাৎ-সুযোগ না ঘটিলে নিশ্চয় চিনি শিল্পে উৎপাদনের আধিক্য দেখা দিত। উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে দাম ও চিনি চলাচলের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এবং ১৯৬১ সালের অক্টোবর হইতে একটি অর্ডিনান্স জারি করিয়া প্রতিটি মিলের উৎপাদনের কোটা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে ভারত হইতে আরও চিনি ক্রয় করে সেই প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রতি ১৯৬১-৬২ সালের জন্য যে কোটা দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্ব বৎসরের অপেক্ষা ১০% কম। উৎপাদন বেশি হইলে বাজারে হঠাৎ দাম পড়িয়া যাইতে পারে, এই আশংকায় এইরূপ করা হইয়াছে, ফলে চিনি মিলসমূহের উৎপাদনক্ষমতা ১০% বা ততোধিক অব্যবহৃত থাকিয়া যাইতেছে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের চিনিমিলগুলি যতখুশি জমি নিজস্ব চাষের জন্য রাখিতে পারে। কিন্তু মহারাষ্ট্র সরকার এই মিলগুলিকেও জমির ঊর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ আইনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, বেসরকারী এবং সমবায়ী ক্ষেত্রে আর নূতন মিল খোলার লাইসেন্স স্থগিত রাখিয়াছেন।

বাজার, ব্যয় ও বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা

কয়লা শিল্প (Coal Industry)

ব্যবসায় হিসাবে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ১৭৭৪ সাল হইতে কয়লা শিল্পের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। উহার পরে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়া কয়লা শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। ১৯২০-২৬ সালে উৎপাদন হ্রাস পায় ও অন্যান্য বহুবিধ

অসুবিধা দেখা দেয়। শিল্পটি সংরক্ষণের দাবী জানায়, কিন্তু ১৯২৬ সালে শুল্কবোর্ড এই দাবী অগ্রাহ্য করে। বিদেশী ক্রেতাদের সুবিধার জন্য কয়লার বিভিন্ন মান নিরূপণের (Grading) ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৭-২৯ সালে উৎপাদন বাড়ে, তবে ১৯৩০ সালের বাণিজ্যসংকটের প্রভাবে পড়িয়া শিল্পের অবস্থা পুনরায় সংকটজনক হইয়া পড়ে। বহু কয়লা খনি বন্ধ হইয়া যায়, যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে-কোন উপায়ে কয়লা উত্তোলন করিতে থাকে। ১৯৩৭ সালে কয়লা সংরক্ষণ (conservation) ও খনিতে সাবধানতা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য কয়লা খনি কমিটি (coal mining committee) নিযুক্ত হয়।

কয়লা খনি কমিটির মতে, তখনকার বাৎসরিক কয়লা উত্তোলনের হার অনুযায়ী, ভারতে ১২৯ বৎসর চলিতে পারে এইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা আছে; ৬২ বৎসর চলিতে পারে এইরূপ কোকিং কয়লা আছে; এবং নিম্ন শ্রেণীর কয়লার কোন অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কয়লা সংরক্ষণের জন্য কমিটি বহুবিধ সুপারিশ করে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে কয়লার প্রয়োজন খুবই বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের প্রভূত উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। খনিসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও রেলপথের বহনক্ষমতা উভয়ের উপর বিশেষ চাপ পড়ে। দেশের বহু অঞ্চলে এক ধরনের কয়লা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সরকার কয়লা বণ্টনের অগ্রাধিকার তালিকা (Priority list) প্রস্তুত করিয়া সেই অনুযায়ী বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রথা ভঙ্গ করিয়া ভারত সরকার মাটির তলায় কয়লা খাদে স্ত্রী-শ্রমিককে কাজ করার অনুমতি দেন, কয়লা কমিশনার নিযুক্ত হয়, এবং দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে কয়লা শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

প্রথম পরিকল্পনায় কয়লাশিল্পের অবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫০ সালের ৩২ মিলিয়ন টনের স্থলে ১৯৫৫ সালে ৩৮ মিলিয়ন টন উৎপাদন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪½ মিলিয়ন টন সরকারী খনিগুলিতে, অবশিষ্ট সব বেসরকারী ক্ষেত্রের উৎপাদন। প্রধানত পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিতে এইরূপ উৎপাদন বাড়িয়াছে, আধুনিকীকরণ বা নূতন খনি স্থাপনের ফলে ইহা ঘটে নাই। রপ্তানি বিশেষ কমে নাই। ১৯৫৪ সালে সরকার কয়লা রপ্তানি

কমিটির দুইটি প্রধান সুপারিশ গ্রহণ করে: (ক) উন্নত মানের কয়লা রপ্তানি না-করার নীতি খুব দৃঢ়ভাবে পালন করা হইবে না, কারণ উন্নত মানের দ্রব্য না হইলে বিদেশী ক্রেতা কিনিবে না এবং (খ) কয়লা লইয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বন্ধ করা হইবে। বেসরকারী মালিকেরা ইহাতে খুব তুষ্ট হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার কয়লাবোর্ডের (Coal Board) সুপারিশ গ্রহণ করিয়া মেটালারজিকাল কয়লা ধৌত করার জন্য বোকারকার গলিতে (Bokarkar gali) একটি কয়লা শোধনাগার (Coal washery) স্থাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালে অতিরিক্ত ২২ মিলিয়ন টন অর্থাৎ মোট ৬০ মিলিয়ন টন উৎপাদনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হয়। ইহার কারণ হইল শিল্পোৎপাদন ও ভোগ-কার্যে কয়লার প্রয়োজন বাড়িবে। এই ২২ মিলিয়নের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কয়লাখনি হইতে আসিবে ১২ মিলিয়ন টন এবং বাকি অংশ বেসরকারী কয়লাখনি হইতে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কয়লা উৎপাদন উন্নয়ন কমিশনারের নেতৃত্বে (Coal Production Development Commissioner) একটি সংগঠন গড়িয়া তোলা হইবে এবং রাষ্ট্রীয় কয়লাখনিসমূহ পরিচালনার জন্য একটি পৃথক করপোরেশন স্থাপিত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লা শিল্পের অবস্থা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম হইতে কয়লা শিল্পে গুরুতর কয়েকটি অসুবিধা দেখা যাইতেছে। মনে হয় পরিকল্পনা কমিশন এখনও পর্যন্ত কয়লা সংকটের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠেন নাই। তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যে কয়লা-দুর্ভিক্ষ দূর হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কমিশন যে সম্ভাব্য চাহিদা ধরিয়াছেন, উহাপেক্ষা বাস্তবে অনেক বেশি হইবে, বিশেষজ্ঞরা এইরূপ বলিতেছেন। ইহা ছাড়াও পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি একটি অন্যতম বিষয়। বাংলা-বিহারের বাহিরের খনিগুলি উৎপাদন বাড়াইতে পারে নাই, ফলে এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার উপর চাপ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বেসরকারী কয়লাখনি আর প্রসারিত হইবে না এইরূপ আইন হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব থাকায় বর্তমানের খনিগুলি প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। দাম বৃদ্ধি না হইলে বর্তমানের ব্যয়বহুল উৎপাদনে অসুবিধা হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৬০

তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লা শিল্পের অবস্থা

মিলিয়ন টন, ১৯৬১ সালে ইহা হইয়াছে ৫৪ মিলিয়ন টন। ইহার মধ্যে ব্যক্তিক্ষেত্র তাহার লক্ষ্য সফল করিয়াছে, কিন্তু সরকারীক্ষেত্র পিছনে পড়িয়া আছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৬ মিলিয়ন টন কম উৎপাদন হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ৯৭ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা ৩৭ মিলিয়ন টন বেশি। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্র উৎপাদন বাড়াইবে ২০ মিলিয়ন টন ও বেসরকারী ক্ষেত্র উৎপাদন বাড়াইবে ১৭ মিলিয়ন টন।

কয়লা শিল্পের সমস্যাবলী

এই শিল্পের সমস্যাবলীর মধ্যে প্রধান হইল শিল্পটির আধুনিকীকরণ। এইজন্য (ক) ছোট ছোট কয়লাখনিসমূহকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত আয়তনে পরিণত করা দরকার; এবং (খ) ভারতে কয়লা উত্তোলনের যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা খোলা দরকার। দ্বিতীয়ত, উন্নত গুণসম্পন্ন কয়লা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, আধুনিকীকরণ, উপযুক্ত বণ্টন, পরিবহনের সমস্যা সমাধান প্রভৃতির জন্য আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। সর্বোপরি, উৎপাদনব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কয়লার দাম স্থির করা উচিত। এই বিষয়ে সমস্যা হইল শিল্পটিতে কোন 'প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম' পাওয়া যাইতেছে না। কাহারও উৎপাদন ব্যয় খুব বেশি, আবার কাহারও কম। কয়লার দাম পুনর্বিবেচনা কমিটি (Coal Prices Revision committee) এই বিষয়ে সরকারকে ও শিল্পকে সাহায্য করিতেছেন।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron & Steel Industry)

ভারতীয় বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের অবিস্মরণীয় কীর্তি হইল ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। ১৮৭৪ ও ১৮৮৯ সালে যথাক্রমে বরাকর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ও বঙ্গীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং ১৯০৭ সালে টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। চার বৎসর পরে ইহা উৎপাদন শুরু করে, ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে কাঁচা লৌহ এবং ১৯১৪ সালে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বিপুল মুনাফা করিয়া শিল্পটি বাড়িয়া চলে এবং ১৯১৯ সালে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালে ভদ্রাবতীতে মহীশূর লৌহ কারখানা স্থাপিত হয়। যুদ্ধের পরেই বিদেশী প্রতিযোগিতায় শিল্পটির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে এবং ১৯২৪ সালে সংরক্ষণ পায়। সংরক্ষণের অন্তরালে ইহার অগ্রগতি দ্রুত হইতে থাকে;

শিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার

১৯২২-২৩ সালে ১,৩১,০৭০ টন উৎপাদন ছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ১০ ৭০,০০০ টন উৎপাদন হইতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প আরও দ্রুত বাড়িতে থাকে। নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, নূতন দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হয়, শ্রমিকদের নূতন যন্ত্রকৌশল, শিক্ষা ও যন্ত্রবিদ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে সংরক্ষণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে আর চাপ না দেওয়ায় সংরক্ষণ তুলিয়া লওয়া হয়; এখন নিজস্ব শক্তিতে যে কোন বিদেশী শক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় এই শিল্প দাঁড়াইতে পারে।

১৯৫৩ সালের যন্ত্রশিল্পের হিসাব গ্রহণের সময়ে (1953 : Census of Manufacturing Industries) দেখা যায় ভারতে ছোট বড় ১২২টি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। উহার মধ্যে তিনটি-ই প্রধান। (১) জামসেদপুর টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী—উৎপাদন ক্ষমতা ৮,৫০,০০০ টন; (২) হীরাপুর এবং কুলটির ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী (১৯৫২ সালে যাহার সহিত ষ্টীল করপোরেশন অব্ বেঙ্গল মিলিয়া গিয়াছে); (৩) ভদ্রাবতীতে মহীশূর ইস্পাত কোম্পানী—উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,০০০ টন।

ভারতবর্ষ ইস্পাত উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। ECAFE-এর (Economic Commission for Asia & Far East) লৌহ ও ইস্পাত সাব্‌কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন ভারতের মাথাপিছু লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ হইল প্রতি বৎসর ৮ পাউণ্ড অথচ যুক্তরাষ্ট্রের ৮৬০ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ২৫০ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়াতে ৪৭০ পাউণ্ড। ইস্পাতের ব্যবহার এত কম হইলেও আমাদের বাহিরের আমদানির উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে ইস্পাত উৎপাদন ছিল বৎসরে ৭ লক্ষ টন এবং আমদানি পরিমাণ ছিল বৎসরে ১½ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টন। যুদ্ধের মধ্যে উৎপাদন বাড়িয়া ১৯৪৩ সালে সর্ব বৃহৎ উৎপাদন হয় ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২ শত টন। ১৯৩৩ সালের পরে, বিশেষত, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় হইতে প্রধানত চাহিদা হ্রাস, শ্রমিক বিরোধ ও পরিবহনের অসুবিধার জন্য উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে, এবং ১৯৪৭ সালে উৎপাদন কমিয়া দাঁড়ায় ৮৭৮৮০ টন-এ।

শিল্পনীতির ঘোষণা অনুযায়ী (ক) বর্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন বাড়ান, এবং (খ) সরকারী মালিকানায় নূতন কারখানা স্থাপন করার নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রথমত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫০-৫১ সালের ইস্পাতের উৎপাদন ক্ষমতা (১১,২৫,০০০ টন) হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে

উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার লক্ষ্য (১৭৫০০০০ টন) গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানের কারখানাগুলিকে সরকারী সকল প্রকার সাহায্য দেওয়ার নীতি অবলম্বন করা হইতে থাকে এবং উৎপাদন বাড়িতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তিনটি নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টা শেষ হইয়াছে। এই সকল কারখানা সম্পূর্ণ চালু হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য হইবে ১২০ কোটি টাকা। জার্মান এক কোম্পানীর সহযোগিতায় উড়িষ্যায় রুরকেলা নামক স্থানে হিন্দুস্থান ইস্পাত লিমিটেড, বৃটিশ এক কোম্পানীর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, এবং রুশীয় সরকারের সহযোগিতায় মধ্য দেশের ভিলাই-তে এই তিনটি কারখানায় ইস্পাত নির্মাণ কার্য সুরু হইয়াছে। শিল্পে পরিকল্পিত সরকারী বিনিয়োগের ৩০%-এর উপর কেবল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৪২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে ৬০ লক্ষ টনে এবং প্রকৃত উৎপাদনকে ৫০ লক্ষ টনে পৌঁছাইবার লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে মোট উৎপাদন ৪১.১ মিলিয়ন টন করা হইবে, এইরূপ লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইবার জন্য বোকারোতে চতুর্থ সরকারী ইস্পাত কারখানার প্রতিষ্ঠা করা হইবে স্থির হইয়াছে। অনেকদিন টালবাহানার পর আমেরিকা এই সাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়াছে, এবং সম্প্রতি রুশ সরকার ইহা নির্মাণ করিয়া দিবে বলিয়াছে।

ভারতের শিল্পোন্নয়নে ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ইস্পাত উৎপাদনের বৃদ্ধি ভারতকে যন্ত্রশিল্পের যুগে পৌঁছাইয়া দিতে পাবে। আজ যত ইস্পাত বাড়ান যাইবে, আগামী কাল ততই সেই ইস্পাত দিয়া নূতন নূতন যন্ত্র তৈয়ারীর প্রয়োজন ও ক্ষমতা দেখা দিবে। প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পে উৎপাদনের হার বাড়াইলে উহা সকল শিল্পে উন্নয়নের হার বাড়াইয়া তুলিবে। তাই এই শিল্পের সমস্যা লইয়া আলোচনা করা দরকার। এই শিল্পের সম্মুখে তিনটি প্রধান সমস্যা আছে। প্রথমত, ইস্পাতের দাম। বর্তমানে ইস্পাতের দাম সরকার-কর্তৃক নির্দিষ্ট, এবং দুই প্রকার দাম এই বাজারে প্রচলিত। উৎপাদকেরা যে দামে ইস্পাত পায় তাহার নাম 'রিটেনশান দাম' (retention price) ; এবং ভোগের উদ্দেশ্যে ক্রেতাদের জন্য একটি পৃথক বিক্রয় মূল্য আছে। রিটেনশান দাম অপেক্ষা বাজারে বিক্রয় মূল্য বেশি। এই দুই মূল্যের পার্থক্য

লইয়া একটি Equalisation Fund গঠিত। ইহা হইতে আধুনিকীকরণের জন্য যন্ত্রপাতি বা উন্নত স্তরের ইস্পাত আমদানি করা হয়। ইস্পাতের দাম ক্রমশ বাড়ান হইতেছে। এই বিষয়ে টাটা প্রভৃতি কোম্পানী দাম বাড়াইতে চাহিতেছে, কিন্তু নূতন শিল্পপতিরা বা রাজ্যসরকারগুলি আর দাম বৃদ্ধি চাহিতেছে না। এই শিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা হইল উন্নত ধরনের কয়লার অভাব এবং উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির অভাব। তৃতীয়ত, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এই শিল্পে উৎপাদন ব্যয় আরও হ্রাস করিতে বাধা দিতেছে।

শিল্পের স্থান নির্বাচন (Location of Industries) :

কোন শিল্পের স্থাননিরূপণ (location) সাধারণত নির্ভর করে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিসমূহের উপর। এই সকল শক্তির মিলিত ফলে যদি একটি বিশেষ অঞ্চলে একটি বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত প্রচুর সংখ্যক বা অধিকাংশ ফার্ম কেন্দ্রীভূত হয় তখন তাহাকে স্থানিকতা (localisation) বলে। তত্ত্বের দিক হইতে, যে স্থানে ফার্মটি স্থাপিত হইলে পরিবহন ব্যয় সহ গড় উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে, সেই স্থানেই ফার্মটি স্থাপিত হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপ না-ও হইতে পারে। কারণ, (ক) উপকরণ ও বাজার সম্পর্কে শিল্পপতিদের জ্ঞান সঠিক ও সম্পূর্ণ হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণত কয়েকটি ফার্ম এক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকায় কতকগুলি লব্ধ সুবিধা দেখা দেয় এবং অন্যান্য শিল্পপতিরাও সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়। (খ) অর্থনৈতিক বিবেচনা ছাড়াও সমাজজীবনের অন্যান্য আরাম ও সুবিধা পাইবার জন্য সহরের কাছাকাছি থাকিতে ইচ্ছা করে। (গ) আঞ্চলিক প্রীতির টানে বিশেষ অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করিতে পারে।

ভারতীয় শিল্পসমূহের স্থাননিরূপণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দেশের সকল অঞ্চলে সমান হারে শিল্পপ্রসার ঘটে নাই। তাহা ছাড়া ভারতের কয়েকটি সহরের কাছাকাছি শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সহরগুলিতে অতিরিক্ত বিস্তার ও কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা ও বোম্বাই-এ ভারতের মোট শিল্পশ্রমিক সংখ্যার ৫৪·৩% এবং পাঁচটি রাজ্য একত্রে ধরিলে ৮৮·৪% নিযুক্ত ছিল। সারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ১১·৬%। বর্তমানে ইহা লক্ষ্যনীয় যে বাংলা ও বোম্বাই এর মিলিত প্রাধান্য কমিয়াছে, কিন্তু যুক্তপ্রদেশ

অসম আঞ্চলিক শিল্প প্রসার

বিহার ও মাদ্রাজের প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলের অংশ কমিয়াই আসিয়াছে।

স্বাধীনতার পর হইতে কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি কয়েকটি সহরে শিল্পের বিপুল কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে।

এই সকল সহরে লোকবৃদ্ধির কারণ শিল্পের কেন্দ্রিকতা, গ্রামাঞ্চল ভাঙিয়া সহরের দিকে লোকের আগমন এবং কিছুটা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই অঞ্চলে শিল্পের কেন্দ্রিকতা থাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, তাই গ্রাম হইতে ও পাকিস্তান হইতে আসিয়া লোকেরা এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রিকতার দোষ

ইহার দোষ অনেক। (ক) কম জায়গায় অধিক লোকের বসবাস করিতে হয়, লোকের স্বাস্থ্য (Individual health), জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Sanitary arrangements), চরিত্র, মন ও রুচি সকল কিছুর অবনতি ও বিকৃতি ঘটে; (খ) কোন অঞ্চলের বিশেষ শিল্পে সংকট দেখা দিলে সমস্ত অঞ্চলটাই দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে পরিণত হইবার ভয় থাকে; (গ) অন্যান্য অঞ্চলসমূহ অবহেলিত হইতে থাকে; (ঘ) যুদ্ধবিগ্রহের সময় এই অঞ্চলসমূহে শত্রুর আক্রমণে দেশের সর্বাধিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন কেন

আধুনিক কালে অবস্থার পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। নূতন কাপড়ের কলগুলি বোম্বাই ছাড়া যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপিত হইতেছে; নূতন চিনির কলগুলি দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঝোঁক দেখা যাইতেছে। মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও সিমেণ্ট শিল্প স্থাপিত হইতেছে. কলিকাতার দূরেও কাগজের কল স্থাপনের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। এই গতিধারার কয়েকটি কারণ আছে; (ক) আভ্যন্তরীণ বাজারের গুরুত্ব বাড়িতেছে, পরিবহনের উন্নতি হইতেছে, এবং আর্থিক বাজারের প্রসার গ্রামাঞ্চলেও হইতেছে। (খ) উৎপাদন পদ্ধতিতে বা পূর্বে অব্যবহৃত উপকরণের ব্যবহারের উন্নতি হইয়াছে; (গ) শিল্পপতিরা পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতা এড়াইতে চাহিতেছেন। (ঘ) পুরাতন আমলের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ অধিক সুবিধা দিয়া নিজ নিজ রাজ্যাঞ্চল উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র (অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে) নিজে শিল্পের স্থান নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার

ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যালান্সের ন্যায়, স্থান নিরূপণের ব্যালান্সও (Locational Balance কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—তাই পরিকল্পনার প্রভাবে এই পরিবর্তন ঐতিহাসিক দাবিতেই ঘটিতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন (Balanced Regional Development) সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। কমিশনের মতে সকল অঞ্চলে সকলপ্রকার শিল্প স্থাপনের উপযোগী প্রাকৃতিক সুবিধা নাই, তাই সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদনের নীতি প্রয়োগ করা দরকার। এই নীতি অনুসারে যে সকল অঞ্চল বর্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী সেই সব উন্নত অঞ্চলেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইহাতে উৎপাদন বেশি হয়, দ্রুত মূলধন গঠন হয়, নূতন অঞ্চলে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়, এইরূপে শিল্পাঞ্চলের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া সকল অঞ্চলকে উন্নত করিয়া তোলে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন—এই দুইটি লক্ষ্য তাই পরস্পর সংযুক্ত।

সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন: তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

তবে পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, কৃষি উন্নয়ন পরিবহন, ক্ষুদ্র শিল্প, জলসেচ, সমষ্টি উন্নয়ন, শিল্প-তালুক প্রভৃতি কার্যসূচী উন্নয়নের ফলে বর্তমানের অনুন্নত অঞ্চলগুলি উন্নত হইয়া উঠিবে এবং সেই অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, নিজস্ব অঞ্চলের অনুন্নত উপকরণগুলিকে ব্যবহারের উপযোগী শিল্প গড়িয়া তুলিতে থাকিবে। বর্তমানে অর্থ নৈতিক ও টেক্‌নিকাল সুযোগ সুবিধাই প্রথমে চিন্তনীয়, ইহা মনে রাখিয়া অনুন্নত অঞ্চলে যতদূর সম্ভব শিল্পোন্নয়ন ঘটাইতে হইবে।*

শিল্পের আধুনিকীকরণ (Rationalisation of Industries)

শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিকতম বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ প্রয়োগ করিয়া শ্রম, সময় ও উপকরণের অপব্যয় বন্ধ করাকে শিল্পের আধুনিকীকরণ বলা হয়। শ্রমবিভাগের ধারার পরিবর্তন, অধিক শ্রমিক ব্যবহার না করিয়া শ্রম-সঞ্চয়ী নূতন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার বা পুরাতন ধরনের যন্ত্র নূতনরূপে ব্যবহার, অল্প সময়ে বা

কাহাকে বলে

*"As regards the diffusion of industrial activity, so far as the larger industries are concerned. economic and technical considerations are always important and in practice only marginal deviations are feasible In the location of public sector projects, the claims of relatively backward areas have been kept in view whenever this could be done without giving up essential technical and economic criteria". *Third Five YearPlan* p. 145.

অল্প কাঁচা মালের সাহায্যে অধিক উৎপাদন করিবার মত যন্ত্র-কৌশলগত উন্নতি (technological improvements)—প্রভৃতির সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থার দক্ষতা এমনভাবে বাড়ানো যাহাতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে, ইহাকেই আধুনিকীকরণ বলে।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, ভারতের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে মিলবস্ত্রশিল্প ও পাটকলশিল্পের ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ হইল অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এই শিল্প দুইটি অধিকতর প্রাচীন; অন্যান্য দেশে তাহাদের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-পদ্ধতির যে বিজ্ঞান-সম্মত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাদের প্রয়োগ করা ভারতে সম্ভব হয় নাই।

মিলবস্ত্র ও পাটশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বেশি

১৯৩০ সালের সংকটে শিল্পগুলি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, যুদ্ধের সময়ে প্রচুর পরিশ্রম করিয়া যন্ত্রপাতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পর হইতেই আমদানি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নূতন যন্ত্রপাতি আনা সম্ভবপর হয় নাই। সর্বোপরি, শ্রমিক সংঘগুলির মিলিত বাধা শিল্পের আধুনিকীকরণের সম্ভাবনা পিছাইয়া দিয়াছে।

বর্তমানে শিল্পের মালিকেরা আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিতেছেন এবং সরকারের উপর চাপ দিতেছেন। তাঁহারা চারিটি যুক্তি দেখাইতেছেন, (ক) অনেক দিন ধরিয়া তাঁহারা বাহির হইতে নূতন যন্ত্রপাতি আনিতে পারেন নাই। (খ) মজুরি ও শ্রমিক

আধুনিকীকরণের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

কল্যাণের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রমিকের জন্য ব্যয় বাড়িয়াছে কিন্তু উন্নততর যন্ত্রপাতি না আনায় শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়ান যাইতেছে না। (গ) বিদেশীদের সহিত প্রতি-যোগিতা বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের উন্নততর ও আধুনিকতর যন্ত্রপাতি থাকায় উৎপাদন ব্যয় কম পড়িতেছে, ফলে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে প্রতি-যোগিতায় টিঁকিয়া থাকা সম্ভব হইতেছে না। বস্ত্রশিল্পে জাপান প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে, নয়া চীনও সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। পাটশিল্পে পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, জাপান সকলেই প্রবেশ করিতেছে। (ঘ) ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার দ্রুত প্রসারিত হইতে পারিতেছে না, দাম বেশি বলিয়া উৎপন্ন দ্রব্যাদি অবিক্রীত পড়িয়া থাকিতেছে। (ঙ) দেশের মূলধন গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি হইতেছে না।

সাধারণভাবে ভারতের শ্রমিকসংঘসমূহ এই আধুনিকীকরণের বিরোধিতা করিতেছেন। তাঁহারা মোটমুটি দুইটি যুক্তি দিয়া থাকেন। প্রথমত, আধুনিকীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল শ্রম-সঞ্চয়ী যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনপদ্ধতি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের প্রয়োজন কমিয়া যাওয়া, ফলে বেকারির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। এই অবস্থায় বেকারির পরিমাণ বাড়িলে দেশে উপযুক্তসংখ্যক কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়া সেই সকল স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, যদিও বা এইরূপ শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা ঘটাইয়া আধুনিকীকরণের দ্বারা উৎপাদনব্যয় কমান হইল, কিন্তু সেই ব্যয় হ্রাসের ফল কি ক্রেতারা ভোগ করিতে পারিবে? অথবা, বেসরকারী ব্যক্তিগত ও একচেটিয়া মালিকের মুনাফাই কেবল বাড়িবে? অতীতে দেখা গিয়াছে, বর্তমানেও দেখা যাইতেছে, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলে বা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইলে তাহাদের মজুরি বৃদ্ধি হয় না, অথবা সেই বৃদ্ধির হার মুনাফাবৃদ্ধির হারের তুলনায় কমই হয়। এমতাবস্থায় "জাতির স্বার্থ", "শিল্পের স্বার্থ" এই সকল নিছক প্রচার মাত্র, বহু শ্রমিককে বেকার করিয়া মুষ্টিমেয় মালিকের মুনাফাবৃদ্ধিই আসল কথা। তাই ১৯৫৭ সালে ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন তিনটি শর্তে আধুনিকীকরণ মানিতে সম্মত হইয়াছে: (ক) কোন ছাঁটাই চলিবে না এবং বর্তমানে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন হ্রাস হইবে না, (খ) আধুনিকীকরণের সুফল তিন দলের মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগ হইবে, সমগ্র দেশ, মালিক ও শ্রমিক; (গ) ইহার ফলে কাজের ভার (work load) কিরূপ পড়িবে তাহার নিখুঁত হিসাব করিতে হইবে। এই সম্মেলন আরও বলিয়াছে, সরকারের পক্ষ হইতে খুব ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে যে, দেশের স্বার্থে এই আধুনিকীকরণ দরকার. একমাত্র তবেই যেন মালিকেরা এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে অনুমতি পান।

ইহার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর আধুনিকীকরণের বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক উভয় দলের সম্মতি প্রয়োজন ইহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উভয়ের চুক্তির একটি নমুনা খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া আধুনিকীকরণের বিভিন্ন পরিকল্পনা কাযকরী করিতে হইবে। কোন যন্ত্রগত পরিবর্তনের পূর্বে মালিকেরা

শ্রমিকদের ন্যায্য নোটিশ দিবে (তিন সপ্তাহ হইতে তিন মাস)। এই নোটিশে এই সংক্রান্ত সকল তথ্য থাকিবে, কি ধরনের পরিবর্তন, কবে হইবে, কোন শ্রমিক পরে কি ধরনের কাজ করিবে, কত শ্রমিক ছাঁটাই হইবে প্রভৃতি। মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা একত্র হইয়া এই পরিবর্তন লইয়া আলাপ আলোচনা করিবে। এই আলোচনার এক সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিক সংঘ তাহার মতামত জানাইয়া দিবে। যদি উভয় দলে চুক্তি হয় তবে পূর্বনির্দিষ্ট তারিখ হইতে মালিক আধুনিকীকরণ করিতে পারিবে। কেহ এই কারণে বেকার হইলে, খসড়ায় বলা হইয়াছে, সেই শিল্পের কার্যপরিধি বাড়াইয়া শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ করিতে হইবে। সেই শিল্পে, সেই ধরণের, সেই মাহিনার কাজ পাওয়া গেলে কোন শ্রমিককে ছাড়ান চলিবে না। নূতন ধরনের কাজ হইলেও শ্রমিককে শিখাইয়া লওয়ার কথাও এই খসড়া চুক্তিতে বলা হইয়াছে। যদি কোন কারণে ছাঁটাই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তবে ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন অনুযায়ী মালিক তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে।

এই বিষয়ে সরকারী নীতি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শিল্পে আধুনিকীকরণ বন্ধ রাখা চলিতে পারে না। আধুনিকীকরণের মূল কথাই হইল উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমাগত অধিকতর মূলধন-প্রগাঢ় (more capital intensive) করিয়া তোলা এবং প্রতিস্তরে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা। এই ধারা বন্ধ রাখার অর্থ হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কমানো। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আধুনিকীকরণে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, বেকারির সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া শিল্পের আধুনিকীকরণ করা হইলে বিশেষ শ্রেণী লাভবান হয়, বেকারির সম্ভাবনাও বাড়ে। সুতরাং যে-বিষয় নীতি হিসাবে পৃথক ভাবে দেখিলে ভালই, তাহা বিশেষ ধরনের সামাজিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচার করিলে অবিলম্বে গ্রহণযোগ্য না-ও মনে হইতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কেন্দ্রিকতা বা একচেটিয়া (Concentration or Monopoly in India Industries): পশ্চিমী দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক কাঠামো বজায় ছিল। ধীরে ধীরে সেই প্রতিযোগিতার অবলুপ্তি ঘটিয়াছে. এক একটি শিল্পে একটি বা

কয়েকটি ফার্ম একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ছোট ছোট এবং দক্ষতা-হীন ফার্মগুলি উঠিয়া গিয়াছে বা একত্র হইয়া বড় একটি ফার্ম গঠন করিয়াছে। ভারতের শিল্প ইতিহাসের প্রথম হইতেই বিদেশী কর্তৃত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে বলিয়া একধরনের একচেটিয়া দেখা দিয়াছে। বিদেশী ধরনে শিল্প সংযুক্তির ধারা (combination movement) এই দেশে দেখা দেয় নাই; ক্ষুদ্র ও অদক্ষ প্রতিযোগী ফার্মগুলি অপসারিত হইযা বৃহৎ ও দক্ষ একচেটিয়া ফার্ম গড়িয়া উঠার আন্দোলন বা ধারা আমাদের দেশে ঘটে নাই। কিন্তু পশ্চিমী ধরনের ট্রাস্ট বা বা কার্টেল প্রভৃতি শিল্পসংযুক্তির রূপ দেখা না গেলেও আমাদের দেশের শিল্প জগতে মালিকানার কেন্দ্রিকতা ও একচেটীয় শক্তি কম নাই। প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ফার্মগুলির মালিকানা ও পরিচালনা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা ফার্মের হাতে সীমাবদ্ধ হইযা পড়িয়াছে।

পশ্চিমী একচেটিয়া ও ভারতীয় একচেটিয়ার পার্থক্য

অল্প কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস্ ভারতীয় শিল্পেব বৃহত্তব খণ্ডেব উপর বিপুল কর্তৃত্ব ও নিযন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কবিযা রাখিযাছে। ৬০০টি বড় ফার্মেব মধ্যে ২৫০টিকে এখনও নিযন্ত্রণ ও পরিচালনা কবে মাত্র ৯টি ইংবাজ ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস্। অর্থাৎ ভারতীয় বৃহৎ শিল্পের প্রায় অর্ধেকের মালিক বিদেশীরা এবং মাত্র কযেকজন ইংরাজ। ইহা ব্যতীত ২২০টি বড় ফার্ম নিযন্ত্রণ করে ১১টি ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্ট। অর্থাৎ ৬০০টি ফার্মেব মধ্যে ৪৭০টি ফার্ম নিয়ন্ত্রণ ও পবিচালনাব কর্তৃত্ব মাত্র ২০টি বিদেশী ও দেশী ম্যানেজিং এজেন্সীর উপর।

শিল্পক্ষেত্রের প্রায় অর্ধেকের মালিক বিদেশীরা, বাকি অর্ধেকের মালিক মাত্র কয়েকটি ভারতীয়

এক একটি ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস যে কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরনের শিল্পেব উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন তাহা নহে। যেমন, একটি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসের হাতে আছে ৫০টি ফার্ম, ইহার মধ্যে ১০টি পাটকল, ১৭টি চা বাগান, ১০টি কয়লাখনি, ১টি চিনি কল, ২টি পরিবহন সংস্থা, ২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং ৮টি বিবিধ শিল্প সংস্থা।

এক একজন কর্তৃত্ব করে বহু বিভিন্ন শিল্পের উপর

নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনগত কেন্দ্রিকতা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা কোন একটি শিল্পের দিকে তাকাইলেও বুঝা যাইতে পারে। যেমন, বস্ত্রশিল্পে ৪০৮টি

মিলের মধ্যে ৮১টি নিয়ন্ত্রণ করে ১১টি ম্যানেজিং এজেন্ট এবং এই মিলগুলি এত বড় যে, শিল্পের মোট উৎপাদনের ⅔ অংশ তাহাদেরই হাতে। পাটকলে কেন্দ্রিকতা আরও বেশি। এখানে ৮৫টি মিলের মধ্যে ৩৩টি মিল মাত্র ৪টি ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে, ইহার মধ্যে ২১টি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে ২টি ম্যানেজিং এজেন্ট। দেশের ১৬৬টি চিনি কলের মধ্যে ৫১টির কর্তৃত্ব ১৬টি ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে—ইহার মধ্যে ৫টি ম্যানেজিং হাউস নিয়ন্ত্রণ করে ৩২টি চিনিকল। কয়লা শিল্পে দেখা যায়, ৬০টি কোম্পানীর উপর কর্তৃত্ব করে ১৪টি ম্যানেজিং এজেন্ট, ইহার মধ্যে ৪টি ফার্ম ৩০টি কয়লাখনির উপর নিয়ন্ত্রণ খাটায়। চা শিল্পে ১২৮টি চা বাগান নিয়ন্ত্রণ করে ১১টি ম্যানেজিং এজেন্ট, ইহার মধ্যে ৬টি কর্তৃত্ব করে ৯৬টি চা বাগানের উপর।

বস্ত্র, পাট, চিনি, কয়লা, চা, সবত্র এই অবস্থা

সিমেণ্ট, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং দিয়াশলাই শিল্পে এইরূপ পরিচালনগত কর্তৃত্ব বা সংযুক্তি আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং কিছুটা পশ্চিমী ধরনের বৃহৎ উৎপাদন ইউনিট স্থাপিত হইয়া একচেটীয় বা আধা-একচেটীয় অবস্থা দেখা দিয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের ২৫টি সিমেণ্ট কারখানার মধ্যে A. C. C. নিয়ন্ত্রণ করে ১৫টি এবং ডালমিয়া ৫টি। ইস্পাতের ক্ষেত্রে এখনও উৎপাদনের ৬০% নিয়ন্ত্রণ করে টাটা এবং মার্টিন বার্ণ কোম্পানী। দিয়াশলাই শিল্পে উৎপাদনের ⅔ অংশের নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র একটি কোম্পানী (WIMCO)।

লৌহ, সিমেণ্ট, দিয়াশলাই-এ আরও বেশি

বহুসংখ্যক ডিরেক্টরী প্রথার মধ্য দিয়া (system of multiple directorship) শিল্পজগতের প্রকৃত ক্ষমতা মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি ও কয়েকটি পরিবারে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ এম্ এম্ মেহ্তা দেখাইতেছেন* যে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও ব্যবসায়ের ১৭০০টি ডিরেক্টারপদ মাত্র ১০০টি ব্যক্তি অধিকার করিয়া আছে, উহার মধ্যে ৮৬০টি অধিকার করিতেছে ৩০ জন লোকে। এই ৩০ জন লোকের মধ্যে ১০ জন নিজেরা ৪০০টি ডিরেক্টারী হাতে রাখিয়াছে। সুতরাং ভারতের কয়েকটি পরিবার মিলিয়াই শিল্পভারতের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, পরিকল্পনা ও দিক্‌নির্ণয় করিতেছে, বিপুল মুনাফা ও ক্ষমতা করায়ত্ত রাখিয়াছে।

বহু-ডিরেক্টরী ও পারস্পরিক গাঁটছড়া

* "For all practical purposes a few leading families in India control and guide the industrial destinies of the country. Fresh and young blood seldom find an opportunity to enter the closely-preserved and well-organised industrial oligarchy". Dr, M. M. Mehta—Structure of Indian Industries.

ভারতের এই মুষ্টিমেয় একচেটিয়া শিল্পপতিরা দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা এই সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। শিল্পশক্তি ও অর্থশক্তির এই মিলন ঘটিয়াছে পরিচালনগত কেন্দ্রিকতা এবং পরস্পরসংলগ্ন ডিরেক্টারী প্রথার মাধ্যমে (interlocutaiy directorships)। ডাঃ ভি, কে আর্, ভি, রাও বলিতেছেন "ভারতের প্রধান ছয়টি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস্ পরস্পরসংলগ্ন ডিরেক্টরী-ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও বিনিয়োগ সংস্থাসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে। তাহা ছাড়া ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সীসমূহ নিজেদের অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে একের অর্থ অন্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত রাখিয়াছে।"†

শিল্পপুঁজি ও অর্থপুঁজির মিলন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিকল্পনার উপর শিল্পজগতের এই কেন্দ্রিকতা ও একচেটিয়ার প্রভাব অতি কুফলদায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমী দেশ-গুলিতে একচেটিয়া আসিয়াছে ছোট ও অদক্ষ ফার্মগুলিকে অপসারণ করিয়া, বৃহৎ ও ব্যয় সংকোচনশীল ফার্ম স্থাপন করিয়া। অনেক ক্ষেত্রে ইহারা বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারসমূহ উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে, সমাজের উৎপাদনী শক্তিকে কিছুটা হইলেও বাড়াইয়াছে। কিন্তু ভারতের শিল্পজগতে ম্যানেজিং এজেন্সীর মারফৎ মালিকানা, পরিচালনা ও মহাজনী কারবারের সুড়ঙ্গপথে এক-চেটিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ব্যয়সংকোচের উদ্দেশ্যে নূতন ধরনের যন্ত্র-সৃষ্টির আন্দোলন ও বেগ সৃষ্টি হয় নাই, দ্রুতভাবে উৎপাদন-শক্তির উন্নতি ঘটে নাই। অথচ বাজার, দাম ও উৎপাদনের পরিমাণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখিয়া দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণের পথে ইহারা বাধা দিতেছে। ভারতের শিল্পনীতিতে এই একচেটিয়া শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ভাঙিবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। মূল ও ভারি শিল্পের প্রসার রাষ্ট্রক্ষেত্রে ঘটিবে ঠিকই, কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্রীয় শিল্পের উৎপাদন ক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া, দেরি করিয়া, সংঘবদ্ধভাবে কম দাম দিয়া এবং অন্যান্য বহুপ্রকার চাপ দিয়া ভারতের কয়েকটি পরিবার অর্থনৈতিক

শিল্পোন্নতির সংকোচক এই কাঠামোর অপসারণ দরকার

† "Thus all the six leading Indian Managing Agency Houses maintain close connection with Banks Insurance Companies and Investment Trusts through the system of inter-locutary directorships. Also the practice of inter-investment of funds in companies under the same Managing Agency is widely prevalent both among Indian as well as European Managing Agency Houses."

পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিতে পারে, সেইরূপ অবস্থা বজায় রাখা হইয়াছে।* সর্বোপরি, ইহাদের অবস্থিতি ও কার্যকলাপের দরুণ পরিকল্পনার কর্মক্ষমতা ও সরকারী সততার উপর জনসাধারণের মনে অবিশ্বাস ও হতাশা সৃষ্টি হইবে, এইরূপ পরিকল্পনার বিদ্যুৎস্পর্শে গণ-উদ্যোগ জাগিয়া উঠিতে পারে না। অধিকতর উদ্বৃত্ত সৃষ্টি, সেই উদ্বৃত্তের উপযুক্ত সংগ্রহ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহাদের পরিকল্পিত বিনিয়োগ এইরূপ সকল কার্যে বাধা দিয়া এই একচেটিয়া শক্তিকেন্দ্রগুলি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কমাইয়া দিতেছে। ভারতের ভূমি মালিকানায় একচেটিয়ার ন্যায় শিল্পের একচেটিয়াও শিল্পপ্রসারের সংকোচক (depressor)। কৃষিকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজগতে মালিকানা ও পরিচালনার কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা তাই অর্থনৈতিক অপূর্ণোন্নতি দূর করার অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ।

অনুশীলনী

1. Why was the cotton Mill industry of India concentrated in Bombay in its earlier stages? What factors have brought about the dispersal of the industry in other areas in recent years?

2. What policy would you advocate in respect of the rationalisation of industries in India? Give reasons for your answer.

3. Consider the present position and future prospects of the Jute industry in India.

4 Give an account of the crisis that is facing Tea industry in West Bengal and Assam. What measures would you suggest for assisting the industry?

5 Explain the main problems of the Jute Mill industry in the present times What measures would you suggest to improve the competitive position of the industry in the world market?

6. What problems have faced the Indian cotton mill industry since the end of world war II? What measures would you suggest to improve the present position of the industry?

7. Discuss the case for rationalisation of the cotton textile industry in India and point out briefly the measures already taken in this connection in recent years?

8 Examine carefully the current problems of *either* the Jute mill industry *or* the Coal mining industry in India. What measures would you suggest for improving the present position of the industry

9. Discuss the effects of introducing rationalisation in Indian industries.

10. Discuss the need for rationalisation of Indian industries

11. Write a short note on :

Location of Industries.

12. Examine the present position and problems of (a) the tea industry (b) the jute mill industry of India.

* তাহা ছাড়া সরকারের উপর এই পরিবারগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রভাবে ক্রমশ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপ অসমাজতান্ত্রিক হইতে থাকিবে।

২১

সরকারী শিল্পক্ষেত্র

The Public Sector

ভারতে সরকারী শিল্পক্ষেত্রের প্রসার এবং মূল্যায়ন (Expansion of Public Sector in India and its critical evaluation) :

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি-প্রস্তাবে ভারতেব শিল্পোন্নয়নে সরকারী ক্ষেত্রের প্রধান ভূমিকা ও নেতৃত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইযাছে। এই প্রস্তাবে বলা হইযাছিল : "The adoption of the socialist pattern of society as a national objective, as well as the need for a planned and rapid development required that all industries of basic and strategic importance, or in the nature of public utility services, should be in the public sector. Other industries which are essential and require investment on a scale which only the state, in the present circumstances, could provide, have also to be in the public sector."

সবকারীক্ষেত্রের প্রসার দরকার কেন? ইহার কারণ কতকগুলি মূল শিল্প আছে (ক) যেখানে প্রথমেই বিপুল পবিমাণ বিনিযোগ দরকার, (খ) বৈদেশিক কোনো সরকারের সহিত সহযোগিতায যাহাদের গড়িযা তুলিতে হইবে, (গ) যেখানে বর্তমানে অনেক বৎসর কোনো লাভ হইবে ন। অথচ ভবিষ্যতের দিকে তাকাইযা এখনই স্থাপিত হওয়া দরকার, (ঘ) যাহা জাতির অর্থ নৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, (ঙ) যাহা সরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা না করিলে ব্যক্তিগত কতিপয় ব্যবসায়ীর একচেটিয়া ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। এই সকল কারণে সরকারীক্ষেত্রের প্রসার একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাহা নহে। দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার জন্য ক্রমশ বেশি পরিমাণ মূলধনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সরকারের হাতে চলিযা আসা দরকার। বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন-গঠন দ্রুত হইতে পারে, কিন্তু সেখানে আয় ও সম্পদ বৈষম্যের বিরূপ প্রভাবে সামাজিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে।

এই সকল কারণের দরুণ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের সরকারীক্ষেত্র বিপুল ভাবে প্রসারিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরু হইতে

প্রকৃত পক্ষে সরকারীক্ষেত্রের প্রসারের নীতি গৃহীত হইয়াছে। খনি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন ও সংযোজন, জলসেচ, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবস্থা,—বিভিন্ন দিকে ভারতের সরকারীক্ষেত্র নিজের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে সরকারী উদ্যোগের সংখ্যা ৫০-এর উপরে, ইহার মধ্যে ১৪টি আইন-সিদ্ধ করপোরেশন এবং অবশিষ্ট সব কয়টিই কোম্পানীর আকারে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠান কয়টি ব্যতীত আরও বেশ কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সরকারের শেয়ার আছে। সরকারী উদ্যোগগুলি নানা আয়তনের, হিন্দুস্তান ষ্টীলের মূলধন ৩০০ কোটি টাকার উপরে আবার নাহান ফাউণ্ড্রিতে ৩০ লক্ষ টাকা, বা উড়িষ্যা মাইনিং করপোরেশনে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। ১০ কোটি হইতে ৩০ কোটি টাকার মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানীর সংখ্যাই বেশি, যেমন হিন্দুস্তান এয়ার ক্রাফ্ট, হিন্দুস্তান মেশিনটুল্‌স্‌, হেভি ইলেকট্রিকাল, ভারত ইলেক্‌ট্রনিকস্‌ প্রভৃতি।

সরকারীক্ষেত্রের প্রসার কতটা দ্রুত হইয়াছে তাহা আরও স্পষ্ট হইবে যদি আমরা তিনটি পরিকল্পনায় ইহাদের জন্য বিনিয়োগ হিসাব করি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা মিলিয়া সরকারী ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র শিল্প ও খনিতে, মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ৯৭৪ কোটি টাকা। কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ছিল ৮৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সরকারী বেসরকারী মিলিয়া ভারতের সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের মোট মূলধন বিনিয়োগের শতকরা ৫৬ ভাগ। পেট্রলিয়ম রিফাইনারি ছাড়া সরকারী উদ্যোগের উজ্জ্বল নক্ষত্র হইল তিনটি সুবৃহৎ ও আধুনিক ইস্পাত কারখানা: দুর্গাপুর, রুরকেলা ও ভিলাই। তাহা ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কয়লাখনির যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও শিল্পোন্নয়নের এই মূল নীতি, অর্থাৎ সরকারী ক্ষেত্রের দ্রুততর প্রসার, অব্যাহত রাখা হইয়াছে। সরকারীক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮৮২ কোটি টাকা, কিন্তু ব্যক্তিক্ষেত্রে ধরা হইয়াছে ১০৫০ কোটি টাকা। যে সকল শিল্প আমাদের শীঘ্র স্বনির্ভরশীল করিবে এইরূপ আমদানি-হ্রাসকারী (import-substituting) শিল্পে বিনিয়োগ খুবই বাড়ান হইয়াছে। কমিশনের ভাষায়, "The major industrial projects in the public sector included in the Third Plan are in the fields of metallurgy, industrial machinery, machine tools, fertilisers, basic chemicals and intermediates, essential drugs and petroleum refining."

সাম্প্রতিক কালে ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার। এই প্রসারের ফল এখনও বিশেষ ভাবে অনুভূত না-হইলেও আমরা তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ভারতে শিল্প প্রসারের হার বাড়িয়া গিয়াছে, আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, বেসরকারী ক্ষেত্রে নিত্য নূতন ছোট, বড়, মাঝারি আয়তনের কারখানা গড়িয়া তোলার মত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ দেশের মধ্যেই পাইতেছি। উপকরণসমূহের চলনশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিত্য নূতন দ্রব্যসামগ্রীর উদ্ভব ঘটিতেছে, শিল্পমুখী জীবনযাত্রা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতেছে, নগরীকরণের মাত্রা পূর্বের তুলনায় বেশি। সরকারী ক্ষেত্রের এই প্রসার বেসরকারী ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে নাই, ব্যক্তিক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় উহার প্রসারের হার বাড়িয়া গিয়াছে।

সরকারীক্ষেত্র প্রসারের সুফল

ভারতের সরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে বর্তমানে নানা সমালোচনা প্রচারিত হইতেছে। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার ব্যক্তিক্ষেত্র সংকুচিত করিয়াছে। ব্যক্তিক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা বাড়িয়াছে, উপকরণের জন্য উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের নানা দোষ, যেমন শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদের কম দামে ক্রয় করা প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। এই সরকারী শিল্পগুলি জনসাধারণের টাকায় গঠিত ও পরিচালিত, কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় আইনসভার নিকট কাজকর্মের জন্য কোন হিসাব দাখিলের দায়িত্ব ইহাদের নাই। জনসাধারণের চক্ষের অন্তরালে ইহারা এক একটি 'ক্ষুদে রাজত্ব' গড়িয়া তুলিয়াছে। ব্যবসায়িক স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছে।

এই সকল সমালোচনার মধ্যে কোনো সত্য নাই তাহা নহে। ইহা ছাড়াও নানা ত্রুটির কথা বলা যাইতে পারে। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের প্রতিটি বিভাগের নিকট হইতে ব্যক্তিক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা পাইয়াছে, অর্থের ও আমদানি লাইসেন্সের অভাব ভোগ করিতে হয় নাই, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিক্রেতাদের নিকট হইতে সুদীর্ঘকালীন ঋণ পাইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা এমন অদক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে যে উপযুক্ত মুনাফা করিতে পারে নাই। পরিবহন ক্ষেত্র যতদিন ব্যক্তিক্ষেত্রের অধীন ছিল ততদিন উহাতে লাভ হইত বিস্তর। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ক্রমাগত

লোকসান হইতেছে। ক্রেতাসাধারণের প্রতি দায়িত্ব হ্রাস পাইয়াছে, উৎপন্নদ্রব্য ও কার্যাদির উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হইযাছে। বেসরকারী ক্ষেত্রের ন্যায় মুনাফার তাড়া না-থাকায় দীর্ঘসূত্রতা ও পরিচালনগত অযোগ্যতা, অক্টোপাসের মত ইহাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। এই সরকারী ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি কম, বোনাস নাই, চলাফেরার স্বাধীনতা কম। এখানে শ্রমিকদের নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তির স্ফুরণের পরিবেশ নাই, সরকার আদর্শ শ্রমিক নিয়োগকারী (employer) হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সর্বোপরি, এই সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে শৃংখলারক্ষার নামে আমলাতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সমাজতান্ত্রিক শিল্প সংগঠন হিসাবে ইহারা গড়িয়া উঠিতেছে না। প্রতিপদে শ্রমিকদের সহিত সহযোগিতা না করিলে এবং পরিচালন সভায় শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিনির্ধিদের স্থান না দিলে আমলাতন্ত্র চিরস্থায়ী হইবে। সরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের এই সকল ত্রুটি দূর করার উপর নির্ভর করিবে ভারতের আগামী শিল্পবিপ্লবে ইহারা সফল নেতৃত্বদান করিতে পারিবে কি না।

সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক রূপ (Forms of Public Enterprises):

বেসরকারী মালিকানাতে একক মালিক, কয়েকজন অংশীদার অথবা প্রচুর সংখ্যক শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধিরূপে কয়েকজন ডিরেক্টার মিলিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করে। মালিক নিজে বা মালিকের প্রতিনিধিরাই পরিচালনার কাজকম চালাইতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্প পরিচালনার ভার রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিটি শিল্পে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ গড়িয়া তুলিতে হয়। ভারতে সরকারী মালিকানায় ক্রমশ অধিকসংখ্যক শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। তাই ভারতেও এই সমস্যা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে এই সমস্যা ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে

সরকারী শিল্প পরিচালনার সংগঠন কতরূপ হইতে পারে, সেই সম্পর্কে ভারত সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা ধরন নাই। তবে ভারতে মোটামটি তিনটিরূপে ইহা পরিচালিত হইতেছে। প্রথম হইল বিভাগীয় শাসন (departmental administration), যেমন ডাক ও তার। সরকারের একটি বিভাগরূপে এই পরিচালনার কাজ চলে। এইরূপ বিভাগীয় শাসনের কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী শিল্প পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে একটি

পরিচালক-বোর্ডের উপর (Board of Management)। এই বোর্ডের সভ্যদের কিছু সংখ্যক সরকারী এবং কিছুসংখ্যক বেসরকারী—একজন জেনারেল ম্যানেজার ইহাদের সাহায্যে পরিচালনার কাজ চালাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় সরকার আইন করিয়া একটি করপোরেশন স্থাপন করেন এবং সেই আইনেই ঐ করপোরেশন-এর পরিচালকমণ্ডলী কিরূপে গঠিত হইবে তাহা নির্দিষ্ট থাকে, (Statutory corporations); যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, শিল্পপুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (I F C), হিন্দুস্তান বিমান নির্মাণ কারখানা প্রভৃতি। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানই পরিচালিত হয় যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় (Joint stock company type); উহার পরিচালক মণ্ডলীতে রাষ্ট্র নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ব্যক্তিগত শেয়ার-ক্রেতাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও কিছু পরিমাণ, অধিকাংশ বা সমগ্র শেয়ার ক্রয় করেন। ভারতীয় কোম্পানী আইনের নিয়ম কানুন অনুযায়ী এই পরিচালকমণ্ডলী পরিচালনার কাজকর্ম চালাইয়া থাকেন।*

ভারতে বর্তমানে চারি ধরনের ব্যবস্থা দেখা যায়

উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি পরিচালন ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধার কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। যে শিল্পে দ্রুত নীতি-নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন কম, সেখানে বিভাগীয় শাসন চলিতে পারে। আধা-সরকারী বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইলে পরিচালনায় কিছুটা নমনীয়তা (Flexibility) দেখা দেয়। কিন্তু উপরের উভয় ব্যবস্থাতেই সরকারী দীর্ঘসূত্রতা এবং ফলে ব্যবসায়িক উদ্যোগের অভাব দেখা দিয়া থাকে। আইনসিদ্ধ করপোরেশনগুলি অনেক পরিমাণে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী এবং ব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত হইতে পারে ঠিকই, কিন্তু উহাদের হিসাব দেখাশোনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার ভার কাহার উপর থাকিবে? যৌথমূলধনী কোম্পানীর ধরনে পরিচালিত হইতে থাকিলে উহার ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ কোম্পানীর উপর দেশের আইন-সভার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। গণ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকিলে সরকারী অর্থের অপব্যয় রোধ করা যাইবে কি উপায়ে?

উহাদের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

* "Public enterprises in the manufacturing field have been organised in three forms. Some of them like the Chittaranjan Locomotive works are administered departmentally; there are few which are Corporations constituted by a statute; but the majority are joint stock companies established under the Companies Act, although sometimes designated as Corporations." *Third Five Year Plan*, p. 265.

১৯৪৯ সালের ফিস্‌কাল কমিশন শিল্প পরিচালনার সঠিক সাংগঠনিক ধরন সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। কমিশন সাধারণভাবে তিনটি নীতি ঘোষনা করিয়াছেন যে, (ক) দেশের লোকে এই শিল্পের ব্যয়ভার সম্পর্কে জ্ঞাত থাকিবে; (খ) এই ব্যয়ভার কতটা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্টিত আছে তাহা দেশের লোকে জানিবে; এবং (গ) পরিচালন-কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

ফিস্‌কাল কমিশনের তিনটি সাধারণ নীতি

১৯৫৪ সালে ECAFE যে আলোচনা সভা (Seminar) আহ্বান করিয়াছিল সেখানে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোম্পানীর আকারে সরকারী প্রতিষ্ঠান চালাইবার বিরুদ্ধে মত দেন। সেখানকার সাধারণ মত ছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি হয় আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করপোরেশন অথবা সরকারী বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। লিমিটেড কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ সংবাদ কোনমতে সরকারের নিকটে পৌঁছায় না, উহাদের নিয়ন্ত্রণের পথও সরল হয়। ভারতের সরকার ব্যক্তিগত ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিযুক্ত কোম্পানীগুলির নিকট হইতে কোন সংবাদ ভালভাবে আদায় করিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা বেশির ভাগ সরকারী প্রতিষ্ঠানই কোম্পানীরূপে সংগঠিত করিতেছেন। জনসাধারণের অর্থ কিরূপে ব্যয় হইতেছে তাহার জন্য আইন-সভার প্রখর দৃষ্টির মধ্যে ইহাদের কাজ করা দরকার। কোম্পানীসমূহ "গোপনীয়তা" রক্ষায় সিদ্ধহস্ত।

সম্প্রতি, তৃতীয় পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর এই বিষয়ে সরকারী নীতির বদল হইতেছে। একাধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার দরকার হইলে এতদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে "সাধারণ পরিচালক" নিয়োগ করা হইত, তাঁহারাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ রক্ষা করিতেন। সরকারী কোন বিভাগের অধীনে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকিলেও এই সুযোগ রক্ষা করার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। কারণ সরকারই তাহার নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকল বোর্ডের সদস্য বা চেয়ারম্যান করিয়া রাখিয়া দেন।

আজকাল সরকারের চিন্তাতে কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। একই শিল্পে বা একই ধরনের কাজ কর্মে অনেক সংখ্যক সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকিলে প্রত্যেকে

স্বাধীনভাবে চলিবে তাহা উচিত নয়। সরকারের চিন্তায় এই বোধ দেখা দিয়াছে। ইহাদের যতটা সম্ভব একত্রীকরণ সম্ভব হয় সেই দিকেই বর্তমানের চেষ্টা। ইহার সুফল হিসাবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে: "This would enable provision of common facilities to individual units, which otherwise might be well beyond their means and lead to overall economy and efficiency."*। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন, পরস্পর সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রে মিলিয়া ক্রয় বিক্রয়ের জন্য একটি ব্যাপক সংগঠন তৈয়ার করিতে পারে, বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারে, শ্রমিক-সংগ্রহ ও শিক্ষণ ব্যবস্থা একত্রে মিলিয়া চালাইতে পারে। পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করিয়া প্রত্যেকেই লাভবান হইতে পারে।†

সরকারী শিল্প সংগঠনের উপযোগী প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো কিরূপ হওয়া উচিত ইহার বিচার করিতে হইলে কয়েকটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত, সংগঠন এরূপ হইবে যে সরকারী শিল্পটিতে উৎপাদনের হার ও শ্রমিক-দক্ষতা সর্বাধিক হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন অপচয় এবং অপব্যয়ের সুযোগ না থাকে। তৃতীয়ত, আমলাতন্ত্র দেখা না দেয়। চতুর্থত, সমাজতান্ত্রিক উৎ-পাদনের নিয়মসমূহের কার্যকারিতার পূর্ণ স্ফূরণ ঘটে।

কয়েকটি সাধারণ নীতি

বর্তমানে ভারতবর্ষে সরকারী শিল্পগুলির সংগঠন বিশ্লেষণ করিলে এই চারিটি নীতির কোনটিই উপযুক্ত ভাবে কার্যকরী হইতেছে বলিয়া মনে করা যায় না। পরিচালক মণ্ডলীতে শ্রমিকদের স্থান নাই। ব্যবসাদারদের, যাহাদের অন্যত্র নিজস্ব মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায় রহিয়াছে, অনেকক্ষেত্রে তাহাদের লইয়া পরিচালক মণ্ডলী গঠন করা হইয়াছে। বৃটিশ আমলে শাসন-নীতিতে শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্পপরিচালনা

* "For example, a number of enterprises grouped together and working in the same field and pooling their resources can maintain an organisation of adequate size both for purchase and sale, with a network of branch offices on a large enough scale ; can set up facilities for scientific and technological research ; establish training programmes and institute suitable systems of personnel selection and recruitment on a common basis." *Third Five Year Plan.* P. 266.

† *Third Five Year Plan.* P. 266.

এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদনের পদ্ধতি, পরিমাণ ও দাম নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে—এইরূপে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নিয়মকানুন গড়িয়া উঠিতে পারে না।* পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করার সময়ে প্রতিটি বিভাগের সাধারণ শ্রমিকদের সহিত আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা নাই। তাহাদের সৃজনীশক্তির পূর্ণ স্ফূরণের আহ্বান নাই, নিজের কারখানায় পরিকল্পনার লক্ষ্যের সহিত শ্রমিকদের যোগাযোগ নাই, নূতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন রীতি প্রবর্তনের এবং নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অধিকতর উৎসাহিত হওযার লক্ষণ নাই। এরূপ পরিচালন কাঠামো আর যাহাই হউক, সমাজতান্ত্রিক নহে। তাই বলা চলে যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার সর্বাধিক হইতে পারে এইরূপ সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এখনও ভারতে গড়িয উঠে নাই। পরিকল্পনার অগ্রগতি ধীরে হওযার এবং অনেক ক্ষেত্রে বিফল হওযার কারণও এই প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ই নিহিত আছে (institutional bottle necks)।

সরকারী শিল্প পরিচালনার কতিপয় সমস্যা (A few problems of Public Sector Management)

(ক) বহুমুখী শিল্পোদ্যোগ (Multipurpose enterprises) :

১৯৫৬ সালে অধ্যাপক গলব্রেথ এবং ১৯৬০ সালের এস্টিমেট কমিটি উভযেই ভারত সরকারকে বলিযাছিলেন যে প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যই পৃথক করপোরেশন বা পৃথক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। তাঁহাদের মতে ভারতের শিল্প কাঠামোতে অধিক সংখ্যক ছোটখাটো ইউনিট না-থাকিযা

* সোভিয়েত ধরনের সমাজতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া যুগোস্লাভিয়া এইরূপ পরিচালন-ব্যবস্থা গাড়য়া তুলিয়াছে। সেখানে সরকার মনোনীত ব্যক্তি এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি উভয়কে লইয়া পরিচালকমণ্ডলী গঠিত বটে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তিত হয় নাই। সেখানে একই শিল্পের অন্তর্গত একটি সরকারী ফার্ম অপর ফার্মের দ্রব্যের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন দিযা নিজেদের দ্রব্য খোলা বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করে এবং সম্ভব হইলে আধা একচেটিয়া বা অলিগোপলীয অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রায় সকল ফার্মই দ্রব্য ও দাম লইয়া ফাট্‌কাবাজী (speculation) করে। কোন ফার্ম নূতন কোন যন্ত্র বা উৎপাদন রীতি আবিষ্কার করিলে উহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়, অপর ফার্মকে ব্যবহারের সুযোগ না দিয়া নিজে গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এইরূপ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মাবলী চালু রাখিয়া সমাজতান্ত্রিক শিল্পকাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে না। উৎপাদন, বণ্টন, দাম নির্ধারণ ও উদ্বৃত্তের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তিত না হইয়া কেবল মাত্র পরিচালকমণ্ডলীতে কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধি যোগ দিলেই উহা সমাজতান্ত্রিক শিল্পসংগঠনে পরিণত হয় না।

মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান থাকা ভাল। এক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উপর ছোটখাটো অনেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাদেরই উপর নূতন কোনো সরকারী শিল্পোদ্যোগ পরিচালনার ভার দেওয়া দরকার। ইহাদেরও উচিত নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আনুষঙ্গিক বা সহকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। এইরূপ এক একটি বৃহৎ সরকারী শিল্প পরিচালনা প্রতিষ্ঠান নানা দিকে একযোগে দৃষ্টি রাখিতে পারে, বহু অপব্যয় এবং অহেতুক প্রতিযোগিতা দূর হয়, বিভিন্ন সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুদৃঢ় সংযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের সরকারী শিল্প-কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত কম হইবে, ততই আইনসভার পক্ষে উহাদের উপর নিযন্ত্রণের সম্ভাবনা বেশি এবং কাজ অনেকটা সহজ। অসংখ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইলে পৃথকভাবে প্রতিটি সম্পর্কে খোঁজ রাখা আইন-সভার পক্ষে সম্ভব নয়। সবকারী শিল্পের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে একই বা কাছাকাছি ধবনেব দ্রব্যোৎপাদনকারী সবকারী ফার্মগুলি লইয়া সমান্তরাল সংযুক্তি (Horizontal combination) ঘটানো যাইবে অথবা, উৎপাদন ব্যয় কমাইবার জন্য কোনো দ্রব্যোৎপাদনের সমগ্র ধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদনকারী সরকারী ফার্মগুলি লইয়া লম্বমুখী সংযুক্তি (Vertical combination) গঠন করা চলিবে। ব্যক্তিক্ষেত্র বজায় থাকিলে এইরূপ শিল্প-সংযোজন সমাজবিরোধী, কিন্তু সরকারী মালিকানাব শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিব এইরূপ সংযোজন নিশ্চয় ব্যয়সংকোচে সাহায্য করিবে। এইরূপ সুবৃহৎ সরকারী পরিচালনা সংস্থাসমূহ তখন এক একটি মন্ত্রিদপ্তরের অধীন হইয়া সরকারেব অর্থনৈতিক নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিবে।

পলবেথ : কেন্দ্রিকতার সুফল কি ?

কৃষ্ণ মেনন কমিটি অবশ্য এই মত গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। এই কমিটির মতে এক একটি সরকারী ফার্ম খুব বেশি বড় আকারের হওয়া উচিত নয়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বা চেয়ারম্যান যাহাতে দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারেন, ফার্মটি সেই আয়তনের হওয়া উচিত। পরিচালনার এক একটি ইউনিটের মধ্যে অনেক প্রকার দ্রব্যোৎপাদন বা বহুমুখিতা ভাল নয়, উহা দক্ষতার পক্ষে বাধা স্বরূপ। সর্বোপরি, কমিটির মতে, বিরাট আকৃতির বহুমুখী কয়েকটি সংস্থা প্রকৃতপক্ষে এক একটি 'ক্ষুদে সাম্রাজ্যে' পরিণত হইবে। রাষ্ট্রের মধ্যে এইরূপ কয়েকটি অতিশক্তিশালী বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে দেওয়া ঠিক নয়;

মেনন কমিটি : কেন বিকেন্দ্রীকরণ ভাল

ইহাতে কালক্রমে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়া রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়া ফেলিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশনও যেমন কমিটির বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে বিশেষ সমর্থন করেন নাই। কমিশন বলিয়াছেন: "It has now been recognised that proliferation of special organisations of such number and variety as to be manageable should be avoided and there should be a definite policy of consolidating these organisations so as to bring together enterprises functioning broadly in the same field"*

(খ) পরিচালনার কাঠামো (Pattern of Management)

প্রতিটি সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচালকমণ্ডলী বা বোর্ড অফ্ ডিরেক্টারস্ থাকে। এই বোর্ডের কাজ হইল সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা। এই সাধারণ নীতির ভিত্তিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা জেনারেল ম্যানেজার দৈনন্দিন পরিচালনার কাজ চালাইবেন। মন্ত্রিদপ্তরের সেক্রেটারীদের চেয়ারম্যান বা ডিরেক্টার হিসাবে নিয়োগ করা উচিত নয়। অবশ্য কোন শিল্পোদ্যোগ সুরু হওয়ার সময়ে বিভাগীয় দুই একজন কর্মচারী উহার সহিত যুক্ত থাকিতে পারে। তাঁহারা অন্যান্য ডিরেক্টারের মতই কোম্পানির নিয়মকানুন মানিয়া কাজকর্ম করিবেন। তাঁহারাই সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সংযোগ সেতু, বোর্ডের নিকট তাঁহারা সরকারের অভিমত ব্যক্ত করিবেন এবং সরকারের নিকট কোম্পানির সংবাদ দিতে পারিবেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। খুব ছোট ছোট কোম্পানি ছাড়া তাঁহারা পূর্ণ সময়ের জন্য এবং বেতনভুক হইবেন। অন্যান্য ডিরেক্টারগণ পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইবেন। বোর্ডের সভ্যপদের ভিত্তি হইবে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং শাসন-যোগ্যতা।

গরওয়ালা কমিটি এই বিষয়ে কিছু কিছু সুপারিশ করিয়াছেন। পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন স্বার্থের টানাটানিতে বোর্ডের কার্যদক্ষতা যেন কমিয়া না যায় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সামাজিক স্বার্থে সুদক্ষ পরিচালনাই বোর্ডের লক্ষ্য। জাতির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা এবং ব্যক্তিগত শিল্পপতির ন্যায়

* Third Five Year Plan, p. 266. "This would enable provision of common facilities to individual units, which otherwise might be well beyond their means, and lead to overall economy and efficiency." Also p. 269.

যোগ্যতা—এই দুই ধরনের গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া বোর্ডগুলি তৈয়ার হইবে।

লোকসভার এষ্টিমেট কমিটি ইহার ষোড়শ রিপোর্টে (১৯৫৪-৫৫) বলিয়াছেন যে, 'Boards of Directors who have been appointed to the various public undertakings have not been fulfilling any useful role in as much as they are all nominated by Government, mostly from the Government officials of the various Ministries, their powers being limited.' কমিটির মতে এই বোর্ডগুলির অধিবেশন হইয়াছে দীর্ঘকাল অন্তর অন্তর, এবং ব্যক্তিগত যৌথ কারবারের অনুকরণ করা ছাড়া ইহাদের দ্বারা সরকারের বা শিল্পোদ্যোগসমূহের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। কমিটির মতে এই প্রকার বোর্ডের নিয়োগ পদ্ধতি বন্ধ করা উচিত। শিল্পোদ্যোগটির পরিচালনা একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা কতিপয় ম্যানেজিং ডিরেক্টার লইয়া গঠিত বোর্ডের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণ মেনন কমিটির মতে বোর্ড অব্ ডিরেক্টারস্ গঠিত হওয়া উচিত বিভিন্ন দিকের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা. অর্থ বিষয়ক, শাসন বিষয়ক, টেকনিকাল যোগ্যতাসম্পন্ন, ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের লইয়া। পরবর্তী ডিরেক্টার নিয়োগ করা উচিত কোম্পানিকে যোগ্যতার সহিত সেবা করিয়াছে এইরূপ লোকদের মধ্য হইতে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারী বা রাজনৈতিক দলের সেবাকারী ব্যক্তিদের জন্য রিজার্ভ রাখা উচিত নয়। বোর্ডের উচিত একটি টীমের মতন কাজ করা, চেয়ারম্যান উহার নেতা। কৃষ্ণ মেনন কমিটি রাজনৈতিক দলের লোকজন লইয়া বোর্ড গঠনের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। পার্লামেণ্টের সদস্যদের ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করাও তিনি পছন্দ করেন নাই।

সরকারী কর্মচারিবৃন্দ বা ব্যক্তিক্ষেত্রের ব্যবসায়িবৃন্দ—কাহাদের মধ্য হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা চেয়ারম্যান বাছিয়া লওয়া উচিত—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করিয়া যেখানে পাওয়া যায় সেই স্থল হইতেই তাহাদের লইয়া আসা দরকার। ডাঃ অ্যাপ্‌লেবি অবশ্য ব্যক্তি-ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান সংগ্রহ করার পদ্ধতি মোটেই পছন্দ করেন নাই। তাঁহার মতে এই ক্ষেত্রে সততা ও যোগ্যতা দুই-এরই অভাব: "the business world is far from an ideal place from which to derive administrators of public enterprises......The

one to find there should be put it third levels of the corporate hierarchies as Shop and Plant Managers."

সরকারী শিল্পোদ্যোগের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ত্রুটি সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন বলেন যে, "Lack of delegation of power within the enterprise is another common failure. Even as the general manager does not enjoy sufficient authority to manage effectively there is often a failure by him and other management staff in the hierarchy to delegate authority to others down the line, who cannot do their jobs properly without the necessary authority. The lack of delegation of authority is usually accompanied by a failure to define responsibilities and duties." পরিচালনার কাজে সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকের অভাবের কথাও পরিকল্পনা কমিশন বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

(গ) পরিচালনার স্বাধীনতা (Autonomy of Management)

সরকারী মন্ত্রিদপ্তর যাহাতে সদাসর্বদা সরকারী শিল্পোদ্যোগসমূহের দৈনন্দিন পরিচালনার কাজে হস্তক্ষেপ না করে, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। শিল্পোদ্যোগগুলির দক্ষতা, উৎসাহ ও প্রেরণার মূল ভিত্তি হইল পরিচালনার স্বাধীনতা। এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অনেকক্ষেত্রেই এই শিল্পোদ্যোগগুলি সরকারী বিভাগের লেজুড় রূপে, মন্ত্রিদপ্তরের অধস্তন বিভাগের মত কাজ করে; "The state undertakings have thus become adjuncts to Ministries and are treated more or less on the same lines as any subordinate organisation or office." কমিটির মতে, ইহার ফলে সরকারী বিভাগের কাজকর্মের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও দীর্ঘসূত্রতা, দায়িত্বহীনতা ও অযোগ্যতা বাসা বাঁধিয়াছে।

সরকারী শিল্পোদ্যোগসমূহ ব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। ইহার তাৎপর্য হইল দৈনন্দিন পরিচালনার কাজে ইহাদের প্রভূত স্বাধীনতা থাকা দরকার। ১৯৫৯ সালে ECAFE র সেমিনার মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য আনিতে পারা বিশেষ দরকার। সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে স্বীকার করিয়াও অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, এই নিয়ন্ত্রণ যেন দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে প্রযুক্ত না হয়। সাধারণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেন সীমাবদ্ধ থাকে। সরকারী বিভাগ বা মন্ত্রিদপ্তর সাধারণভাবে কোম্পানিটির নীতি স্থির করিয়া উহা কার্যকরী করার পূর্ণ স্বাধীনতা যেন

পরিচালকমণ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দেন। পরিচালকেরাও যেন সর্বদা মন্ত্রিদপ্তর এবং সরকারী কর্মচারীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত না থাকেন। "Advocacy of autonomy simply highlights the need to educate responsible top organs of government in the ordinances of self-denial which would restrict their intervention to really important concerns."

(ঘ) পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ (Parliamentary Control or Public Accountability) :

সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলির মূলধন সরবরাহ হয় সরকারী কোষাগার হইতে, জনসাধারণের টাকাতেই ইহাদের উৎপত্তি হয় এবং কাজকর্ম চলে। পার্লামেণ্টে বাজেট উপস্থিত করার সময়ে সদস্যগণ এই শিল্পোদ্যোগ হওয়া উচিত বলিয়া মত দেন এবং টাকার বরাদ্দ পাস করেন। স্বভাবতই ইহারা লাভ-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটি ও সাফল্য অসাফল্যের জন্য আইন সভার নিকট, অর্থাৎ আইন সভার মাধ্যমে দেশের করদাতা জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিবেন। পার্লামেণ্টেরও একটি বিরাট কর্তব্য হইল এই শিল্পোদ্যোগগুলি সুপরিচালিত হইতেছে কিনা সে-বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব পার্লামেণ্টের হাতে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং শিল্পোদ্যোগসমূহের প্রতি সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখা এই স্বার্থ রক্ষার অন্যতম প্রধান পথ।

পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই সঠিক, কিন্তু কথা হইল কতটা, এবং কি উপায়ে পার্লামেণ্ট এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিবে, ইহার পরিধি ও পদ্ধতি কি হইবে। কেহ কেহ বলেন, পার্লামেণ্ট আইন করিয়া কোন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করার পর উহাকে নিয়ন্ত্রণের কোন আইনগত বা নৈতিক অধিকার হাতে রাখিতে পারে না। এই করপোরেশনগুলিকে ছোটখাট বিষয়েও সদাসর্বদা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিলে ইহাদের উৎসাহ ও কর্মোদ্যম কমাইয়া দিবে, ফলে মোট দক্ষতার মানই নামিয়া যাইবে। অপরপক্ষে অনেকে বলেন, সুদক্ষ পরিচালনার স্বার্থেই পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও সুদক্ষ পরিচালনা—উভয়ের কোনটিই ক্ষুণ্ণ না হয়, এই বিষয়ে সেইরূপ নীতি গৃহীত হওয়া দরকার।

১৯৫১ সালের গরওয়ালা কমিশনের মতে দৈনন্দিন পরিচালনার কাজে পার্লামেণ্ট নিশ্চয় হাত দিবে না, তবে কোম্পানিটির বাৎসরিক পূর্ণ রিপোর্ট ও হিসাবপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে পার্লামেণ্টের সদস্যদের

প্রশ্ন করা এবং মতামত দিবার অধিকারও প্রযোগ করা উচিত। কিন্তু ভারতের পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ খুবই বেশি এবং ইহা অবিলম্বে কমানো দরকার. ডাঃ আপ লেবি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক গলব্রেথও সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমাইবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় স্থাপিত শিল্পগুলি এক একটি স্বাধীন করপোরেশন দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত এবং এই করপোরেশনগুলির উপর কোনরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ উচিত নয়। তাঁহাদের অভিমতে পার্লামেণ্ট যদি বেশি অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠে তবে এই করপোরেশন-গুলি ক্রমশ অতি-সাবধানী মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে এবং ইহাদের স্বাধীন-ভাবে কাজ করার ইচ্ছা কমিয়া যাইবে।

কৃষ্ণমেনন কমিটি এই বিষয়ে বলেন যে, সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলির জন্য পার্লামেণ্টের একটি কমিটি থাকা উচিত। এষ্টিমেট কমিটি ও পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটির অনুরূপ এইরূপ কমিটির কাজ হইবে এই শিল্পোদ্যোগগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা। এই কমিটি কেবল খুঁত ধরার কাজ করিবে না, অথবা উচ্চতর পরিচালন-বোর্ডে Super Board of Management) পরিণত হইবে না। ইহার কাজ হইবে তথ্যানুসন্ধান। বাজেটের সময়ে অল্প সময়ে সদস্যরা কোনো শিল্পোদ্যোগের নানা দিক লইয়া পূর্ণ আলোচনার সুযোগ পান না। তদুপরি, বিভিন্ন জীবিকা হইতে আগত সদস্যদের সকলে শিল্প পরিকল্পনার কাজে যোগ্যতাসম্পন্নও নন। সুতরাং আমাদের মতে, মেনন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পার্লামেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইলে তবেই পার্লামেণ্ট ইহাদের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটির সদস্যগণ উপযুক্তভাবে নির্বাচিত হইলে এই নিয়ন্ত্রণ কোম্পানিটির উপকারেই আসিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন তাই মেনন কমিটির সুপারিশ মানিয়া লইয়াছেন। কমিশনের ভাষায়, "The need has, therefore, been felt for a Committee of Parliament which would enable informed parliamentary criticism to be brought to bear on public enterprises. This Committee would keep itself continuously informed regarding the working of public enterprises." কমিশনের মতে এই কমিটিতে সদস্যপদ অন্তত তিন বৎসরের জন্য হওয়া উচিত, যাহাতে সদস্যগণ জটিল বিষয়গুলি বুঝিবার সময় পান এবং কিছুদিন পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পান। ইহার ফলে পার্লামেণ্টের অনেক সদস্য এই শিল্পোদ্যোগগুলি

সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হইবেন। কমিটি উপযুক্তভাবে খোঁজখবর রাখিতেছেন এই কথা চিন্তা করিয়া পার্লামেণ্টের সাধারণ সদস্যরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

ভারতে সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের দাম-নীতি এবং মুনাফানীতি (Price and Profit Policy of Public Enterprises):

পরিকল্পনার যুগে ভারতে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পগুলির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। দেশে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-গঠনের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি শিল্পের জাতীয়করণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া নূতন বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরাসরি সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সরকারী শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে তাহাদের দামনীতির আলোচনাও আজ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা হয় তাহা হইলে বলা চলে, বেসরকার শিল্পগুলির ন্যায় একই ভাবে সরকারী শিল্পের দাম নির্ধারিত হউক। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে দামনীতিকে সমান দৃষ্টিতে দেখা চলে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের দাম-নীতি কতকগুলি কারণে পৃথক আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ব্যক্তিক্ষেত্রে সাধারণত পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা বজায় থাকে। এইরূপ বাজারে মোট চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অনুযায়ী পণ্যটির দাম নির্দিষ্ট হয় এবং বিশেষ কোনো ফার্ম এককভাবে বাজারের একটি ক্ষুদ্রতম অংশের উৎপাদন ও যোগান করে বলিয়া সে দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একচেটিয়া অথবা অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকার দরুন সরকারী ফার্মটির দাম নীতি বাজারকে প্রভাবিত করে। কোনো একটি সরকারী ফার্ম যদি সেই শিল্পের একটি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র হইত, তাহা হইলে অবশ্য দাম-নীতির কোনো বিশেষ তাৎপর্য রহিত না। কিন্তু একচেটিয়া সরকারের সর্বোচ্চ লাভ তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা (যে নিয়ম বেসরকারী শিল্পোদ্যোগ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ছাড়া অন্যান্য কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। বেসরকারী শিল্পে যদি একচেটিয়া থাকে তবে তাহা জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন ঘটায় এবং এইভাবে সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু সরকারী শিল্পে একচেটিয়া থাকিলে সরকার উহার ত্রুটিগুলি সম্পর্ক পূর্ণ সচেতন থাকেন এবং এমন একটি দাম-নীতি গ্রহণ করেন যাহাতে এই দোষগুলি দেখা না দেয়।

সরকারের পক্ষে অন্যান্য বেসরকারী শিল্পের ন্যায় একইভাবে লাভক্ষতি বিচার না করিলেও .চলে। একটি বেসরকারী উদ্যোগ যদি খরচা উঠাইতে না পারে তবে সে বাজারে প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।' রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত যুক্ত বলিয়া কতকগুলি ব্যয় রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে হয়তো উঠাইয়া লইল না, কিন্তু করের বা ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে এই অভাব পূরণ করিয়া লইল। এই ক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনই বড় প্রশ্ন—পণ্যটির বাজার-দর উহার প্রকৃত দাম অপেক্ষা কম হইলেও ক্ষতি হয় না। তাই সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পগুলির দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে, অথবা ইহা অপেক্ষা বেশি হইবে বা কম হইবে তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

কোনো একটি শিল্পের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের স্তরে তাহার দাম নির্ধারিত হয়। ধনবিজ্ঞানের এই নিয়ম অনুযায়ী সরকারী শিল্পসমূহের 'লাভ নহে এবং ক্ষতিও নহে' এই নীতি গৃহীত হইলে পণ্যের দাম তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হওবা উচিত। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পসমূহেব ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী হওয়ার পথে কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে স্থির ব্যয়ের পরিমাণ বেশি। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় ব্যয় ক্রমশ কমিবে, অথচ দাম যদি প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় তাহা হইলে শিল্পটিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লাভ লোকসানের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে তাহা নয়, সমাজের কল্যাণ সাধনও ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যে পণ্যের ব্যবহার অবাঞ্ছিত হয তাহা হইতে দাম বাড়াইয়া ভোগকারীদেব ভোগ হইতে বিরত করিতে হইবে।

প্রান্তিক ব্যয়ের স্তরে দাম নির্ধারণে আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে—যেমন কোনো নতুন শিল্প স্থাপনের বেলায় একযোগে প্রভূত পরিমাণ স্থির পুঁজি বিনিয়োগ করিতে হয় বলিয়া এক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয় অনুযায়ী দাম হিসাব করা শক্ত।

এই সকল বহুবিধ অসুবিধার দরুন অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে প্রান্তিক ব্যয়ের পরিবর্তে উৎপাদনের সম্পূর্ণ ব্যয়-নীতি (full cost principle) অনুযায়ী দাম নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। প্রান্তিক ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপাদন কতখানি বাড়াইতে হইবে শুধুমাত্র এইটুকুই জানা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যয়ের নীতি

অনুসরণ করিলে জানা যায় কোনো নূতন শিল্পোদ্যোগ সুরু করা উচিত কি না অথবা চালু শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করা উচিত কিনা। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগসমূহ যাহাতে সর্বোন্নত স্তরে উৎপাদন করিতে পারে এবং উৎপাদনের সম্পূর্ণ ব্যয় উঠাইতে পারে সেই ভাবে রাষ্ট্র দাম ও উৎপাদনের স্তর নির্দিষ্ট করিবে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির দাম এবং মুনাফাসংক্রান্ত নীতি কি হইবে তাহা লইয়া বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ ভি, কে. আর, ভি. রাও মহাশয় প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে. সরকারী শিল্পোদ্যোগ হইতে অধিকতর মুনাফা তুলিতে হইবে। দাম যদি উৎপাদন ব্যয়ের উর্ধ্বে রাখা হয় তবে যে টাকা লভ্যাংশ হিসাবে সরকারের হাতে আসিবে তাহা দিয়া সরকার রাষ্ট্রীয় স্তরে আরও বেশি বিনিয়োগ করিতে পারিবে। দাম কম রাখিয়া ঘাটতি টাকা করের মাধ্যমে তুলিয়া লওয়া অপেক্ষা বরং দাম বেশি রাখিয়া সেই টাকা দ্বারা মূলধন গঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করা অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ; আমরা আগেই দেখিয়াছি যে, পরিকল্পনার যুগে সরকারী ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। দাম অত্যন্ত উচ্চে বাঁধিয়া দিয় সরকার নিজেই নিজের মূলধন গঠন করিতে পারিবে এবং এই উদ্বৃত্ত অর্থকে পরবর্তী স্তরে বর্ধিত উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারিবে। ডাঃ রাও-এর এই নীতি ভারতের প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক সমর্থিত এবং গৃহীত হইয়াছে।

ডাঃ রাও এর এই নীতি বিশেষ সমর্থনযোগ্য কারণ এই নীতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের সমস্যা দূর করে এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এইভাবেই অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হারকে সর্বোচ্চ স্তরে লইয়া যাওয়া যায়। জনকল্যাণ সাধন ও অর্থ নৈতিক বৈষম্য হ্রাস পরিকল্পনার এই মূল লক্ষ্যগুলি সাধিত হয়। ভারতের ন্যায় অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে মূলধন-গঠনের সমস্যা খুবই প্রবল, সেখানে রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগুলির দামনীতি এই সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারিত হইবে।

সাধারণত কয়লা, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, যানবাহন ইত্যাদির ন্যায় বৃহৎ ও ভারী শিল্পসমূহ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাদের উপর সমগ্র সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো নির্ভর করে বলিয়া ইহাদের তাৎপর্য খুব বেশি। উপরন্তু, ইহাদের দাম বেসরকারী ক্ষেত্রে নানাবিধ শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ের

অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই রাষ্ট্র সরকারী দ্রব্যের দাম কমাইয়া ও বাড়াইয়া বেসরকারী ক্ষেত্রকেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

সর্বশেষে দেখিতে হইবে যে, পণ্যটি কি প্রকৃতির এবং কাহার নিকট কি উদ্দেশ্যে উহা বিক্রীত হইতেছে। যদি উহা ভোগ্যপণ্য হয় তাহা হইলে দাম অবশ্যই বেশি রাখিতে হইবে। কিন্তু উহা যদি মূলধনী দ্রব্য হয় বা মধ্যবর্তী স্তরের পণ্য হয় তবে উহার দাম অপেক্ষাকৃত কম রাখা উচিত, নতুবা উৎপাদনের গতি ব্যাহত হইবে। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবার সম্ভাবনাও আছে। যেমন রান্নার জন্য যে কয়লা ব্যবহার হইবে তাহার দাম বেশি হইতে পারে, কিন্তু যে কয়লা উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত হইবে তাহার দাম কম হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পগুলির দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণও অসমর্থনযোগ্য নহে।

অনুশীলনী

1. Critically evaluate the role of the public sector in Indian economy.

2. Describe the different forms of public enterprise in India. Which of these forms do you consider most suitable for this country?

5. How far the Public enterprises should be granted autonomy in matters of management?

4. What considerations should guide the Price and Output policies of public enterprises?

২২

শিল্প শ্রমিক ও তাহার সমস্যা

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা (Productivity of Labour):

সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে, ভারতের শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা খুবই কম, অথবা অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহাদের জন প্রতি উৎপন্নের পরিমাণ কম। উৎপাদন-ক্ষমতা কম কি না তাহা বিচার করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে তাহা জানা প্রয়োজন। শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় যন্ত্রগত, পরিচালনগত, অর্থগত, শ্রমিকগত, সরকারী, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণাবলী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাবের মোট ফল হইল শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা। নিম্নে ইহাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হইল।

শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা কিসের উপর নির্ভর করে

১। যন্ত্রগত কারণসমূহ: এন্‌জিনিয়ার ও যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকদের যন্ত্রকৌশলগত নূতনত্ব আনয়ন (technological innovations); (ক) যন্ত্রের ব্যাপারে (in tools) (খ) উৎপাদনের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাতে, এবং (গ) উপকরণ সম্পর্কে।

২। পরিচালনগত কারণসমূহ: নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিচালকদের দৃষ্টিভংগী ও কার্যকলাপ: (ক) প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, (খ) ঝুঁকি বহনের ইচ্ছা, (গ) নূতনত্ব গ্রহণ ও আয়ত্ত করার মত মনোভাব, (ঘ) সুদক্ষ কর্মবিভাগ (শ্রমবিভাগ ও কারখানা সাজানোর ব্যাপার) (ঙ) দক্ষতার সহিত কাঁচামাল ক্রয় করা, (চ) আক্রমণাত্মক উপায়ে বাজারের প্রসার, (ছ) দক্ষতার সহিত শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক পরিচালনা, (জ) নূতন ও উন্নত পদ্ধতির জন্য সক্রিয় সাহায্য, (ঝ) উৎপন্ন দ্রব্যের সমমানসাধন (standardisation)।

৩। অর্থগত কারণসমূহ: নূতনত্ব প্রয়োগ করার উপযোগী মূলধন পাওয়া যায় কি না, (ক) বর্তমান শিল্পে এবং (খ) নূতন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

৪। শ্রমিকগত কারণসমূহ: নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য: (ক) দক্ষতার স্তর, (খ) সাধারণ শিক্ষা ও ট্রেনিং, ভাল স্বাস্থ্য ও

উন্নত মন, (ঘ) কাজের ঘণ্টা ও মজুরির পরিমাণ, (ঙ) খাপ খাওয়াইবার বা মানাইয়া চলার ক্ষমতা, (চ) নূতনত্ব গ্রহণ করার মত ইচ্ছা, (ছ) কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়ে দৃষ্টিভংগী।

৫। সরকারী নীতিসমূহ: নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারী নীতি: (ক) শ্রমিক, (খ) ব্যবসায় ও বাণিজ্য, (গ) কর আরোপন, (ঘ) শিল্প ও কৃষির প্রসার, এবং (ঙ) শুল্ক ও অর্থনৈতিক সাহায্য।

৬। সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা: বিশেষত, (ক) পরিবহন ব্যবস্থা, (খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে জনসাধারণের ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং (গ) নূতন দ্রব্য গ্রহণ করিতে ক্রেতাদের ইচ্ছা।

৭। প্রাকৃতিক কারণাবলী: (ক) জলবায়ু, (খ) খনি বা অন্যান্য ধাতু, এবং (গ) মাটির অবস্থা, প্রভৃতি।

ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা কম হইবার কারণ (Cause of low Productivity of Indian Labour): ভারতীয় শ্রমিকেব উৎপাদন ক্ষমতা যে অন্যান্য পূর্ণোন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলির প্রভাবে ভাবতীয় শ্রমিকদেব উৎপাদন-ক্ষমতা কম হইয়াছে উহাদের আলোচনা করা দরকার।

(১) ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা কম হইবার কারণ হইল অপূর্ণ শিল্পোন্নয়ন। শিল্পোন্নতি পূর্ণ না হইবাব ফলে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ভারতে উৎপন্ন হয় না, আমদানি করা যন্ত্রপাতি পুরানো হইয়া গেলেও বেশি পরিমাণে খাটাইতে হয়। ইহাতে শ্রমিক-দক্ষতা কমিয়া যায়। (২) মূলধন কম থাকায় ভারতে বিনিযোগ কম হয়, নূতন পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হয় না, ইহার দরুন শ্রমিক-ক্ষমতা কম হইয়া পড়ে। (৩) ভারতে বেকারি, অর্ধ বেকারি এত বেশি থাকায় শ্রমিকের মনে নূতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনকৌশল শিক্ষা করার ও প্রয়োগ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা এমন ভাবে হ্রাস পাইয়াছে, যাহাতে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বেশি থাকিতে পারে না। (৪) গ্রাম হইতে ভূমিহীন বা বিত্তহীন চাষীরা একমাত্র নিরুপায় হইলেই কারখানায় কাজের জন্য আসে। কলকারখানার পরিবেশে তাহার উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কারণ শরীরে ও মনে এই পরিবেশকে সে গ্রহণ করিতে পারে না। বহুর মধ্যে

একাকীত্বের অনুভূতি, নিজস্বতার লোপ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব, যান্ত্রিক নিয়মবদ্ধতা, একঘেয়ে আকর্ষণহীন খাটুনি নিয়মিতভাবে খাটিয়া চলা, এই সকল মিলিয়া তাহার দক্ষতা উন্নততর হইতে পারে না। বন্ধুবান্ধবহীন ভাবে, পরিবারের বাহিরে, অর্থকষ্টে ও ভবিষ্যৎ নিরাশার মধ্যে দিন কাটাইতে হয় বলিয়া বহু প্রকার মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত (psychological tensions) তাহার মধ্যে দেখা যায়। (৫) ভারতের কলকারখানায়, বিশেষ করিয়া যে সকল শিল্প-ব্যবসায় পারিবারিক মালিকানায় চলে, সেখানে মালিকদের দৃষ্টিভংগী খুবই আপত্তিজনক। একধরনের উদার পিতৃত্ব (benevolent paternalism) এমন ভাবে শ্রমিকদের জড়াইয়া থাকে যেখানে তাহারা স্বাধীনভাবে কাজ করার কোন সুবিধা পায় না। বর্ণ ও শ্রেণী সম্পর্কে পুরাতন ধারণা এখনও মালিকদের মধ্যে প্রবহমান। শ্রমিকসংঘসমূহ বহু বিবিধ উপায়ে শিল্পে শান্তি বজায় রাখিতে পারে ও শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় মালিকেরা শ্রমিকসংঘগুলিকে কারখানা হইতে সর্বদা বিতাড়িত করিতেই চেষ্টা করে। (৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় যন্ত্রপাতি ও কলখানাগুলি দেশের সর্বত্র দৈনিক একাধিক বার চালিত হইয়াছে, উহারা পুরানো ও অকেজো হইয়া গিয়াছে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়াছে। (৭) ভারতীয় কলকারখানার মালিকেরা তাহাদের দ্রব্যসামগ্রীর গুণাগুণ বাড়াইতে চেষ্টা করে না এবং সর্বদা গুণসমান রাখে না। নিজের উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে এমন গর্বের অভাব দেখা যায় যে, দ্রব্যের গুণ প্রায়ই হ্রাস পায়, বিক্রয় কমিয়া যায় ও উৎপাদন-ক্ষমতা কমিতে থাকে। (৮) ভারতীয় শিল্পপতিরা এমন সব লোকের হাতে শিল্প পরিচালনার ভার দেন যাহাদের শিল্প পরিচালনার কোনরূপ শিক্ষাদীক্ষা বা অভিজ্ঞতা নাই। ম্যানেজাররাও প্রায় সকলে অশিক্ষিত ও যোগ্যতাবিহীন। ফলে জন-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কিছুতেই বেশি হতে পারে না। মালিক, ম্যানেজার ও শ্রমিকদের শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অভাবই উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতার কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৯) উৎপাদন-ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে উৎসাহের অভাবের উপর। অর্থনৈতিক বা অপর কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা শ্রমিকের সম্মুখে তুলিয়া না ধরিলে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কম অপচয় করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধি করা এবং ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় কমানো খুবই প্রয়োজন, এবং ইহারই

সহিত মাহিনা ও পাওনা সংযুক্ত—শ্রমিকেরা এইরূপ চিন্তা না করিলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িতে পারে না। (১০) শ্রমিকদের হাতে প্রকৃত দায়িত্ব দিতে ভারতীয় পরিচালকগণ আপত্তি করিয়া থাকেন, ইহাতে শ্রমিকদের মনে নিরাশা ও উৎসাহহীনতা জমাট বাঁধে। আমাদের দেশের শ্রমিক-সংঘরাও ধরিয়া লয় যে, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার উদ্দেশ্য হইল শ্রম-সঞ্চয়ী পদ্ধতির প্রচলন করিয়া বেকারির পরিমাণ বাড়াইয়া তোলা। (১১) ভারতের শিল্পমালিকদের মনে একটি ভুল ধারণা আছে যে, যন্ত্রদক্ষ এন্‌জিনিয়ারই ভাল শিল্প-পরিচালক হইতে পারেন। বাস্তবে ইহা সত্য নহে। উৎপাদনেব যন্ত্র ও কৌশল হইতে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্র পৃথক—ইহার নিজস্ব বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কলা আছে। সকল উপকরণ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান, সস্তায় ক্রয় ও বেশি দামে বিক্রয়ের পদ্ধতি, শ্রমিক মালিক বিরোধ বন্ধ করা, তাহাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা, এই সকলই প্রকৃত পরিচালনার কাজ। ভারতে এইরূপ পরিচালন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। কারখানাব পরিবেশ এমন এবং সেখানে কাজের সংগঠনও এমনভাবে গঠিত আছে যাহাতে শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা কম থাকিতে বাধ্য।

কিন্তু যে দেশ দ্রুত শিল্পোন্নয়নেব পথে অগ্রসর হইতে চায়, তাহার শ্রমিক-শ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিতে হয়। কাসত অর্থনৈতিক অগ্রগতি কথাটির তাৎপর্যই হইল উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি। উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। কম দামে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে, ফার্মগুলিতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িতে পারে। বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে, বৈদেশিক মুদ্রাগমের পথ প্রশস্ত হয়। শ্রমিকদের আর্থিক ও আসল আয় বৃদ্ধি পায়, কাজেব ঘণ্টা হ্রাস পায়, তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। প্রত্যেকটি কর্মে অধিকতর উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, দেশে মূলধন-গঠন, কর্মসংস্থানের পরিমাণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পায়। তাই প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক প্রগতির মূল কথা হইল শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা।

উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা কি

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশনের মতে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষ এই বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করে, তাই উভয়

পক্ষেই অনমনীয় মনোবৃত্তি দেখা যায়। ইহারা মনে করেন যে, শ্রমিকের উপর কাজের চাপ বাড়ানোই আধুনিকীকরণ এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মূল কথা।' কিন্তু কমিশনের মতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটাইয়া এবং বিপুল পরিমাণ ব্যয় না করিয়াও উৎপাদনক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ানো যায়। এই বিষয়ে পরিচালকের দায়িত্ব সর্বাধিক, তাহাকেই সর্বোত্তম যন্ত্রপাতি, কাজকর্মের সঠিক অবস্থা ও পদ্ধতি, উপযুক্ত শিক্ষা ও মনোভাব এবং শ্রমিকদের মাহিনার বিষয়ে উৎসাহ—প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।*

ব্যক্তিগতভাবে দুই একজন শিল্পপতি উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করিলেও ইহার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান এতদিন ভারতে গড়িয়া উঠে নাই। বাস্তবে উদাহরনের সাহায্যে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োগ-কলা দেখাইয়া দিবার জন্য ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (I. L. O) সর্বপ্রথম একটি উৎপাদনক্ষমতা মিশন (Productivity Misson) ভারতে পাঠায়। এই মিশন বহু কারখানায় হাতে কলমে উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া অপব্যয় রোধ করার পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। উহার কাজে আকৃষ্ট হইয়া ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে একটি জাতীয় উৎপাদনক্ষমতা কেন্দ্র (National Productivity Centre) স্থাপনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘকে অনুরোধ জানান এবং মিশনের একটি টীম বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি দেখিয়া বহুবিধ সুপারিশ করে এবং প্রভূত পরিমাণ অপচয় রোধে সাহায্য করে। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় মিশন ভারতে আসিয়াছে, বরোদা ও বাঙ্গালোরে শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে (অক্টোবর মাসে) জাপান প্রত্যাগত ভারতীয় উৎপাদনক্ষমতা সংক্রান্ত প্রতিনিধিদল এই বিষয়ে বিস্তৃত সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই দলের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে একটি উৎপাদনক্ষমতা সেমিনার (Productivity Seminar) বসে এবং সেই সেমিনার বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন স্তরে উৎপাদনক্ষমতা সংক্রান্ত সংগঠন (Productivity Organisations) গড়িয়া তোলার কথা বলেন। সেই সেমিনারে ভারতে

আধুনিক কালে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার প্রচেষ্টা

* "Productivity has many facets and it suffers because of the one-sided and rigid approach which is frequently adopted in dealing with it both by the employers and by the workers. Rationalisation of efforts in every direction is the true basis of productivity." *Third Five Year Plan.* P. 262.

জাতীয় উৎপাদনক্ষমতার আন্দোলন (National Productivity Movement) সুরু করার কথা বলা হয়। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা কাউন্সিল (National Productivity Council) স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এক অষ্টমুখী কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছে।*

নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ (Fixation of Minimum Wages)

পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পোন্নত দেশে সরকার বিশেষ ধরনের শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারিত করিয়া দেন। যে সকল শিল্পে শ্রমিকেরা অসংগঠিত বা অতিরিক্ত শোষিত সেই সকল ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরির হার বাঁধিয়া দেওয়া খুব প্রয়োজন। ভারতের অবস্থাও সেইরূপ। তাহা ছাড়া আমাদের শ্রমিকসংঘসমূহ এখন পর্যন্ত উন্নত ধরনে সংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই, মালিকেরা ন্যায্য মজুরি দিয়া শ্রমিক দক্ষতা বাড়াইবার এবং যুগোপযোগী মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই।

স্বাধীনতার পূর্বে

বহুকাল ধরিয়া ভারত সরকারের নিকট নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারিত হওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত হইতেছিল। ১৯২৬ সালে ভারত সরকারের সম্মুখে নিম্নতম মজুরি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘের (I L O) প্রস্তাব অনুমোদন করার কথা তোলা হইয়াছিল, কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে ইহা অনুমোদন করা সম্ভবপর হয় নাই। শ্রমিক-সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়াল কমিশন অন লেবার বিভিন্ন প্রকার তথ্যের অভাবের জন্য এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব নয় এইরূপ বলিয়াছিলেন। অবশ্য এই কমিটি আসামের চা বাগানের শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শ্রমিক

* (i) Stimulation and promotion of productivity-consciousness by dissemination of information relating to productivity; (ii) Training in productivity techniques and processes for all levels of management; (iii) Provision of specialist services where a demand emanates from the Local Productivity Councils; (iv) encouragement of inter-plant visits which helps in exchanging views on problems and their solution; (v) extensive and intensive research in methodology or productivity; (vi) Sponsoring visits of productivity teams to advanced countries to gather improtant information regarding work-study, meth d-study and other means of raising productivity; (vii) arranging for productivity training abroad; and (viii) inviting foreign technicians and productivity experts for guiding and assisting various sectors of the Indian economy in increasing productivity."

অনুসন্ধান কমিটি এইরূপ আইনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে এই বিষয়ে কোনরূপ কাযকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সকল বড় শিল্পে এবং কিছু কিছু মাঝারি বা ছোট শিল্পে নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারিত আছে। দুইটি আইনের সাহায্যে এইরূপ নির্ধারণ করা হইতেছে, যেমন ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন এবং ১৯৫৮ সালের নিম্নতম মজুরি আইন। শিল্পে মজুরি সংক্রান্ত বিবাদ ঘটিলে শিল্পবিরোধ আইনে শিল্প ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়া থাকে এবং এই ট্রাইবুনালগুলির উপর তখন নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। প্রায় সকল বড় শিল্পগুলিতে এই সকল ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত নিম্নতম মজুরির হার বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

স্বাধীনতার পরে দুইটি আইন

১৯৪৮ সালের নিম্নতম মজুরি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে সেই ধরনের শ্রমিকদের সুবিধার জন্য যাহারা শ্রমিক সংঘের দ্বারা অসংগঠিত থাকায় অতি অল্প মজুরি পাইয়া থাকে। এই আইনের ধারাগুলি চা বাগিচা, তেল কল, ধান কল, ময়দা কল, মোটর পরিবহন, চামড়া শিল্প এবং কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজ্যসরকারসমূহ ইচ্ছা করিলে অন্যান্য শিল্পকেও এই আইনের আওতায় লইয়া আসিতে পারে। ১০০ শ্রমিকের কম নিয়োগকারী কোন শিল্পে নিম্নতম মজুরির আইন প্রযুক্ত হইবে না। কৃষিতে ৩ বৎসরের মধ্যে ও অন্যান্য শিল্পে ২ বৎসরের মধ্যে নিম্নতম মজুরি স্থির করিতে হইবে—পরবর্তী বিভিন্ন সংশোধন দ্বারা এই সময় আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের আইন

কি ভাবে নিম্নতম মজুরি নিধারিত হইবে আইনে তাহাও বলা হইয়াছে। রাজ্যসরকার কোন শিল্পে নিম্নতম মজুরির হার প্রকাশ করিয়া দিতে পারে অথবা একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া নিম্নতম মজুরির হার সুপারিশ করিতে বলিতে পারেন। সেই সুপারিশকৃত মজুরি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং উহার ৩ মাস পর হইতে কার্যকর হইবে। ২ বৎসরের জন্য এইরূপ মজুরির হার নির্দিষ্ট করা হইবে এবং উহার পরে সংশোধন করা হইবে। সংশোধনের পূর্বে এই উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন। এই কমিটিসমূহের কাজকর্মে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাজ্যসরকার একটি উপদেষ্টাবোর্ড নিয়োগ করিবে। কেন্দ্রীয় সরকারও নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধনের বিষয়ে

নির্ধারিত হওয়ার পদ্ধতি

রাজ্যসরকারের ও নিজের সুবিধার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

সময়-অনুযায়ী মজুরির হার (Time-rate) ও পরিমাণ অনুযায়ী মজুরির হার (Piece-rate) উভয়ই সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। বিভিন্ন কাজের জন্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বয়স্ক, স্ত্রীলোক, বালক, শিক্ষানবীশ (apprentices) প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরির হার পৃথক হইতে পারে। এই মজুরির সহিত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ভাতা যুক্ত থাকিতে পারে অথবা না-ও থাকিতে পারে। কোন্ নীতি অনুযায়ী নিম্নতন মজুরির হার হিসাব করা হইবে, আইনে স্পষ্ট কবিয়া তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

এই আইনের কার্যপরিধি খুবই সীমাবদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন বৃহৎশিল্পে (চা বাগিচা ছাড়া) এই আইন কার্যকরী নয় এবং ১০০০-এর কম শিল্পগুলিকেও বাদ দেওয়া হইযাছে। তাহা ছাড়া, সবকারী কোন দপ্তর কর্তৃক মজুরির হার নির্ধারণ কতদূব যুক্তিসঙ্গত তাহাও সন্দেহেব বিষয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীব লোক লইয়া গঠিত এক একটি মজুরি-বোর্ড (Wage Board) বিভিন্ন শিল্পের জন্য স্থাপিত হওযা বাঞ্ছনীয এবং ইহাদের সুপারিশ মালিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণীব পক্ষে বাধ্যতামূলক করা উচিত। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বা হ্রাসের সহিত নিম্নতম মজুরি যাহাতে বাড়ে বা কমে সেইরূপ সাংগঠনিক নমনীযতা থাকাও দরকার। এইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পের জন্য কয়েকটি অস্থায়ী মজুরি বোর্ড (Wage Board) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যেমন তুলা, পাট সিমেণ্ট, চিনি বাগিচা প্রভৃতি।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে, "These measures have not proved effective in many cases." উহার মতে এই আইন অধিকতর কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত নজর রাখার ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তোলা দরকার। প্রধান শিল্পসমূহে মজুরি নির্ধারণ হয় যৌথ দরকষাকষি, আপোষ-মীমাংসা, মধ্যস্থতা ও বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ বা রায় দান প্রভৃতির মধ্য দিয়া। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্থাপিত মজুরি-বোর্ড-গুলি ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অবিলম্বে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য একটি বোর্ড স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। কয়লা শিল্পে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ে মিলিয়া মজুরি সংশোধনের উদ্দেশ্যে দ্বি-পাক্ষিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করার মনস্থ করিয়াছেন।

নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সঠিক নীতি (Principle of Minimum Wage fixation) :

কোন শিল্পে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের নীতি কি হইবে তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে। অনেকে বলেন যে, এইরূপ মজুরি স্থির হইবে শ্রমিকের বাঁচিবার মত মজুরির স্তর (Living wage) অনুযায়ী। এই নীতি অনুসারে একটি অঞ্চলের গড় পরিবারের আয়তন অনুযায়ী একজন শ্রমিকের স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাহিনাকেই বাঁচিবার মত মজুরি (Living wage) বলা হয়।

বাঁচার মত মজুরি

আপাতদৃষ্টিতে এই নীতি অতি সরল মনে হইলেও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সময়ে ইহাতে বহু জটিলতা আসিয়া পড়ে। "স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন বলিলে কি বোঝা যাইবে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। গড় শ্রমিক, গড় পরিবার প্রভৃতি ব্যাখ্যা করার অসুবিধা দেখা দিতে পারে। বড় বা ছোট পরিবার থাকিলে তাহাদের ক্ষেত্রে কি করা হইবে তাহা সিদ্ধান্ত করাও শক্ত। বাস্তবক্ষেত্রে, তাই বর্তমানের প্রচলিত হার হইতে বাঁচিবার মত মজুরির হারকে খুব বেশি পৃথক করা চলে না।

মালিকেরা সম্পূর্ণ বিপরীত একটি নীতি গ্রহণ করার কথা বলিয়া থাকেন, ইহা হইল শিল্পের বহন ক্ষমতা (capacity to pay)। এই নীতিও জটিলতামুক্ত নয়; শিল্পের ক্ষমতা দীর্ঘকালে একরূপ, স্বল্পকালে অন্যরূপ। তাহা ছাড়া মুনাফার হার বা পরিমাণ অনুযায়ী বহনক্ষমতা স্থির করা চলে না, কারণ প্রায় সকল শিল্পেই অপব্যয় বা কারচুপির সাহায্যে হিসাবে খরচ বাড়াইয়া রাখা হয়।

দেওয়ার মত ক্ষমতা

এই সকল অসুবিধার জন্যই অনেকক্ষেত্রে একটি শিল্পের মধ্যে বা তুলনামূলক ভাবে কোন শিল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মালিক যে-হারে মজুরি দেয় উহাকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের ট্রেড বোর্ডগুলি (Trade Boards) এই নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে।

অনেক সময় সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্পের মন্দা ও তেজী বাজার—এই সকল বিষয়ও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। একটি বিশেষ ফরমূলার উপর ভরসা না করিয়া অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ভারতে ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (Central pay Commission) মোটামুটি বাঁচিবার মত মজুরির নীতি গ্রহণ করার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যত উহা সম্ভব হইবে না বলিয়া শেষ পর্যন্ত প্রথম ধাপে প্রচলিত হারের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করার কথা বলিয়াছেন। মোটামুটি এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতে বিভিন্ন শিল্পবিরোধের সময় মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিচারকগণ শিল্পের বহন ক্ষমতার (capacity to pay) উপর নজর রাখার কথাও বলিয়াছেন।

বিভিন্ন শিল্পের নিম্নতম মজুরি নির্ধরিত হইলেও ১৯৪৭ সালের শিল্প সন্ধি প্রস্তাব (Industrial Truce Resolution) শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য "ন্যায্য মজুরি" (Fair wages) দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে একটি ন্যায্য মজুরি কমিটি" (Fair wages Committee) নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উহা পরবর্তী বৎসরে এক রিপোর্ট দাখিল করেন। এই কমিটি বলেন যে নিম্নতম মজুরি যে কেবল মাত্র নিছক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিবে, তাহা নহে, কিছু পরিমাণ শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধা দিয়া শ্রমিকের দক্ষতা রক্ষার ব্যবস্থাও করিবে।*

ন্যায্য মজুরি

তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন এই বিষয়ে বলেন যে "it has been agreed that the nutritional requirements of a working class family may be re-examined in the light of the most authoritative scientific data on the subject." কমিশনের মতে, নিম্নতম মজুরি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের জন্য এমন ন্যায্য মজুরির হার হওয়া উচিত যাঁহাতে তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ বাড়াইবার উপযোগী দক্ষতা লাভ করিতে উৎসাহিত হয়। কমিশন আরও বলেন যে শ্রমিক শ্রেণীর মজুরি এবং উচ্চতর পরিচালকদের মাহিনার মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশি। অবশ্য কমিশন এই পার্থক্য দূর করার জন্য কোন নীতি ঘোষণা করেন নাই।†

তৃতীয় পরিকল্পনাতে কি বলা হইয়াছে

* "The minimum wages must provide not merely for the bare sustenance of life, also for the preservation of the efficiency of the worker by providing some measure of education, medical requirements and amenities".

† "There are, however, wide disparities between the wages of the working class on the one hand, and the salaries at the higher management levels on the other." P. 256.

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা (Role of Trade Unions in Economic devolopment)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইলে দেশে শ্রমিকসংঘ সেই উন্নয়নের হার কিছুটা কমাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ করিয়া তাহা হইতে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত তুলিয়া যাইতে চায়। শ্রমিক-সংঘ শ্রমিক শোষণ বন্ধ করিবার বা শোষণের হার কমাইবার চেষ্টা করিলে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির হার জন্য ব্যবসাদারের হাতে মূলধন-সঞ্চয়ের হার কিছুটা হ্রাস পায়। ইহাতে অর্থনৈতিক প্রসারের হার কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রথম যুগে শ্রমিক সংঘ না থাকাই উন্নয়নকে সাহায্য করে।*

ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রথমযুগে বাধা

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে শ্রমিকসংঘের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপূর্ণোন্নত দেশে উন্নযন সফল করিতে হইলে ক্রমাগত অধিক মূলধন-সঞ্চয় কবা দরকার এবং তাহার জন্য সমাজে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। এই উদ্বৃত্ত বাড়াইতে হইলে দুইটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হইবে ; শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং উপযুক্ত মজুরী নীতি।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ

শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাইবে উৎপাদনের পরিমাণ তত বেশি বাড়িতে থাকিবে। ভোগের স্তর সমান রাখিতে পারিলে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশি হইবে। শ্রমিকশ্রেণীর দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে হইলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে শ্রমিকসংঘের গুরুত্ব খুবই বেশি। অপূর্ণোন্নত দেশে শ্রমিকদের দক্ষতার মান খুব নীচুতে থাকে। উহাদের যত্ন সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে, প্রখর আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করিতে পারিলে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার বোধ জাগাইতে পারিলে শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। নূতন যন্ত্র, উৎপাদনপদ্ধতি ও যন্ত্রকৌশলের প্রবর্তন সহজ হয়—যদি উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শ্রমিক দল কারখানার উন্নতি ঘটাইবার জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করে। তাহাছাড়া, শিল্পে শান্তি বজায় রাখা অসংঘবদ্ধ শ্রমিকদলের পক্ষে কখনই সম্ভব

শ্রমিক সংঘ কিরূপে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় ও মূলধন-গঠন দ্রুততর করে

* এই কারণে Keynes বলিতেছেন যে, ক্লাসিকাল যুগের তুলনায় বর্তমানে অর্থনৈতিক দেহে অনেক ধরনের 'rigidities' দেখা দিয়াছে, শ্রমিক সংঘের কার্যকলাপে বিনিয়োগকারীদের পূর্বের ন্যায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টি" করা (অর্থাৎ মালিকের হাতে তুলিয়া লওয়া) সম্ভবপর হইতেছে না।

নয় ; সকল শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় না রাখিলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি উৎপাদন ক্ষেত্র অপর উৎপাদন-ক্ষেত্র-সমূহের সহিত জড়িত, ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল। তাই একদিকে উৎপাদন হ্রাস পাইলে উহা অপর কোন ক্ষেত্রের উৎপাদনের কার্যসূচী বানচাল করিয়া দেয়। সকল শিল্পে শান্তি রক্ষার ও উৎপাদন বাড়াইবার কাজে তাই শ্রমিক শ্রেণীকেই অগ্রসর হইতে হয়। এই কাজ করার দায়িত্ব শ্রমিক সংঘের উপর। তাহা ছাড়া সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচনা সার্থক হইতে পারে যদি প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্র নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার রচনা নিজেরা করিলে উহা পূর্ণরূপে সফল করার দায়িত্ব-বোধও নিজেদের মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই দায়িত্ববোধই উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেরণা যোগাইতে পারে।

এবং উপযুক্ত মজুরি-নীতি গ্রহণে সাহায্য করে

শুধু তাহাই নহে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি মজুরির হার সেই অনুপাতে বাড়ান হয় তবে বর্ধিত উৎপাদন শ্রমিকের ভোগে ব্যয়িত হইয়া পড়ে, বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত হিসাবে সমাজের হাতে চলিয়া আসিতে পারে না। তাই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনায় কম হারে মজুরি বাড়াইতে হয়। যদি একেবারেই মজুরি বাড়ান না হয়, তবে শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে না ; যদি বেশি বাড়ান হয়, তবে মূলধন সঞ্চয়ের বেগ হ্রাস পাইবে। শ্রমিক সংঘের সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মজুরি নীতি নির্ধারণ করা তাই পরিকল্পনার সাফল্যের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও কমিশন ঠিকই বলিয়াছেন যে "they have to be accepted as an essential part of the apparatus of industrial and economic administration of the country."

ভারতে শ্রমিক সংঘ ও শ্রমিক আন্দোলন (Trade union and Labour Movement in India):

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ভারতের কারখানা শিল্পের শ্রমিকেরা তাহাদের ক্ষোভ প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছিলেন এবং ১৯১৮ সাল হইতে ভারতে শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হইতে সুরু হইয়াছিল। মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে প্রচুর সংখ্যক

ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই ধর্মঘটগুলির পরিচালনা, শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা, মালিকদের সহিত দরকষাকষি করা এই সকল কাজ করার জন্য শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হইতে সুরু হইয়াছিল। প্রথমে মাদ্রাজে ও পরে অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রে কয়েকটি শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হয়। সেই যুগের শ্রমিকসংঘগুলি ছিল মূলত ধর্মঘট কমিটি এবং দাবি পূরণ হইলে বা আন্দোলন শেষ হইলে সাধারণত সংঘের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইত।

প্রায় ১০ বৎসরের বহুবিধ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ১৯২৬ সালে ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আইন (Indian Trade Unions Act, 1926) পাশ হইল। এই আইন অনুযায়ী শ্রমিকসংঘ ইচ্ছা করিলে আইনসঙ্গতভাবে সরকারের নিকট রেজিষ্ট্রীকৃত হইতে পারিবে, এইরূপ স্থির হইল। রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রমিকসংঘগুলির কিছু কিছু আইনগত সুবিধা স্বীকার করা হইয়াছিল, যেমন তাহাদের কাজকর্মের দরুন সহসা গ্রেপ্তার করা হইবে না, সংঘ পৃথক ভাবে নিজের নামে কাজকর্ম চালাইতে পারিবে, সম্পত্তির মালিকানা পাইবে, উত্তরাধিকারক্ষমতা লাভ করিবে। এই সকল সুবিধার বদলে রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রমিকসংঘকে কতকগুলি নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হইবে, যেমন, কার্যকরী সমিতির অন্তত অর্ধেক সভ্য সেই কারখানার কর্মচারী হওয়া চাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেই সকল সংঘের অর্থভাণ্ডার ব্যবহার করা চলিবে না, এবং অডিটর দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করাইয়া সেই হিসাব এবং কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা প্রভৃতি সরকারের নিকট নিয়মিত পাঠাইতে হইবে। কি কি উদ্দেশ্যে তাহাদের অর্থ-ভাণ্ডার হইতে অর্থ ব্যয় করা চলিবে তাহাও এই আইনে বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম দিকে শ্রমিকসংঘগুলি রেজিষ্ট্রী করিতে চাহিত না। কিন্তু রেজিষ্ট্রী না হইলে স্বীকৃতি দান করিবে না—মালিকদের এইরূপ নীতির দরুন ক্রমশ শ্রমিক সংঘগুলি অধিক সংখ্যায় রেজিষ্ট্রী হইতে সুরু হইল। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের আমলে আইনসভায় রেজিষ্ট্রীকৃত ইউনিয়নগুলি প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে এইরূপ স্থির হওয়ার রেজিষ্ট্রী করার তাগিদ আরও বেশি বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে রেজিষ্ট্রীকৃত ইউনিয়নগুলির অর্ধেক ছিল সরকারী বিভিন্ন দপ্তরগুলির কর্মচারীসংঘ, যেমন রেল, ডাক ও তার, প্রভৃতি। ১৯৪৮ সালের শ্রমিকসংঘ আইনে কোন শ্রমিক-কোর্টের আদেশে সংঘকে স্বীকৃতি দান মালিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানে অবনতি, অতিরিক্ত সময় খাটুনি, কাজের পরিমাণের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, অতিরিক্ত মুনাফা এবং শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-চেতনা—এই সকল কারণ মিলিয়া দ্রুত প্রচুর সংখ্যার শ্রমিক সংঘ গড়িয়া উঠিতে থাকে। যুদ্ধোত্তর যুগে স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির দরুন শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়। নিচের তালিকাটিতে শ্রমিক সংঘের বৃদ্ধির পরিমাণ দেখা যাইতেছে।

বৎসর	রেজিষ্ট্রাকৃত ইউনিয়ন	কতজন হিসাব পাঠাইযাছে	মোট সভ্যসংখ্যা (যাহারা হিসাব পাঠাইযাছে)
১৯৩৯	৬৬৭	৪৫০	৫·১ লক্ষ
১৯৪৪-৪৫	৮৬৫	৫৭৩	৮·৯
১৯৪৯ ৫০	৩৭৮৩	২১২৬	১৯·৭৭
১৯৫৬-৫৭	৮৫৫৩	৪৩৭৯	২৮·৬০
১৯৫৭ ৫৮	১০০৪৫	৫৫২০	৩০·১৫
১৯৫৮-৫৯	৮৭১৩	৬০৪০	৩৫·৩৭

ভারতীয় শ্রমিকসংঘের ইতিহাসে উহাদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকের শ্রমিক সংঘগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত এবং তাহাদের কাজ-কর্মের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১৯২০ সালে সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) স্থাপিত হয়। দেশের প্রায় সকল শ্রমিক সংঘ মিলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে এই কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়িয়া তোলে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সংগঠনের ইতিহাস খুবই বিচিত্র। প্রথম হইতেই ভারতের সাম্যবাদী দল এই কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। ১৯২৮-২৯ সালে কয়েকজন শ্রমিক নেতা মিলিয়া এন্ এম্ জোশীর নেতৃত্বে পৃথক একটি সংগঠন স্থাপন করে, উহার নাম ছিল সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (AITUF)। কিছুদিনের মধ্যেই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সাম্যবাদী দলের নেতাদের ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে AITUF ক্রমশ কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়ে। নিজেদের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, অবশেষে ১৯৪০ সালের উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। ইতিমধ্যে তদানীন্তন বিদেশী ভারত সরকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে থাকে এবং সরকারী যুদ্ধোদ্যোগে সর্বাত্মক সাহায্য করা দরকার এই যুক্তিতে

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন গুলির ইতিহাস —বর্তমানে চারিটি

মিঃ এম্ এন্ রায় পৃথক হইয়া গিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করেন। যুদ্ধের পরে কংগ্রেস দল সরকার গঠন করে এবং দেশের শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ও নেতৃত্ব বাড়াইবার জন্য ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC) প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যক্ষ ভাবে কংগ্রেসের সাহায্য এবং পরোক্ষভাবে সরকারী সাহায্য পাওয়ায় এই সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। কিছুদিন পরে সমাজতন্ত্রী দলের লোকেরা হিন্দ্ মজদুর সভা (Hind Mazdoor Sabha) স্থাপন করে। অপর কয়েকজন ব্যক্তি ও কয়েকটি বামপন্থী দল মিলিয়া সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (United Trade Union Congress বা UTUC) গঠিত হইয়াছে।

ভারতের শ্রমিক সংঘের উপরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সাধারণ-ভাবে দেখা যায় যে চারিটি কারণ এই আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ইহাকে সাহায্য করিয়াছে। দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি এবং জাতীয় আন্দোলন ও চেতনার প্রসার শ্রমিক সংঘ গঠনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যুদ্ধফেরত সৈনিক বিদেশী শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টাও এই আন্দোলনে কম সাহায্য করে নাই। রাজনৈতিক নেতারা বিশেষত বামপন্থী নেতারা, বহু নির্যাতন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া এই আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত হওয়ায় ভারতেও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে উৎসাহ পাইয়াছে। সর্বোপরি, রাশিয়ায় বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদের প্রসার এবং রাশিয়ার দ্রুত উন্নতি সকল কিছু মিলিয়া ভারতের শ্রমিকদের সংগঠনে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।*

আন্দোলন প্রসারে কোন কোন শক্তি সাহায্য করিয়াছে

শ্রমিক আন্দোলনের সবলতা, দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধক (Strength, weakness, obstacles or difficulties of Trade Union Movement)

গত কয়েক বৎসর হইতেই ভারতের শ্রমিক আন্দোলন পূর্বাপেক্ষা অনেক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার মধ্যে অনেক নূতন সবলতার লক্ষণ দেখা

* The great unheaval in Russia after the fall of the czars and the establishment of the communist state in Soviet Russia gave a further filip to the workers, cause in India."

যাইতেছে। প্রথম যুগে অধিকাংশ শ্রমিকসংঘই ছিল ধর্মঘট কমিটি ; বিশেষ কোন ধর্মঘটের পূর্বে উহার আবির্ভাব ঘটিত এবং ধর্মঘট শেষ হওয়ার পরে উহার অস্তিত্বের অবসান হইত। কিন্তু বর্তমানে ভারতে প্রায় সকল শ্রমিক সংঘ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। তাহাদের সংগঠন এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত ; তাহাদের কার্যাবলীও এখন বিভিন্নমুখী ও সুসম্বদ্ধ। বহু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম তাহারা সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিয়াছে, এবং শ্রমিকদের কাজকর্মের ও মজুরির অবস্থা অনেকক্ষেত্রে বেশ কিছুটা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রমিকদের মনে আত্মবিশ্বাস ও একতাবোধ জাগাইতে সক্ষম হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক-সংঘসমূহ স্কুল হাসপাতাল ও আমোদপ্রমোদ কেন্দ্র পরিচালনা করিতেছে। সারা ভারতে সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন ঠিকই বলিয়াছেন "They have to be accepted as an essential part of the apparatus of industrial and economic administration of the country and should be prepared for the discharge of the responsibilities which attach to this position."

সবলতা ও সাফল্য

কিন্তু তাহা হইলেও এই আন্দোলন কতকগুলি দুর্বলতা এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলা চলে যে, "The obstacles to the development of Trade Unions are largely internal ; they come from labour itself." বেশির ভাগ ইউনিয়ন সাংগঠনিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত দুর্বল। নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সভ্য সংখ্যা অনেক সময় স্ফীত করিয়া দেখান হয়। নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় হয় না, এবং তাহার ফলে আর্থিক অবস্থাও বিশেষ সুবিধার বলা চলে না। মাহিনা-করা কর্মচারী রাখা, শ্রমিক-সমস্যা লইয়া গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যের জন্য শিক্ষিত কর্মীদল গড়িয়া তোলা, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কাজকর্ম করা সকল কিছুই ইহাদের সামর্থ্যের বাহিরে। ধর্মঘটের সময়ে বা বেকারির সময়ে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন ও অভাব মিটাইবার জন্য যে সুবিস্তৃত সংগঠন থাকা দরকার তাহা এখনও পর্যন্ত আমাদের শ্রমিক সংঘগুলির আয়ত্তের বাহিরে। "At present the trade-unions are in most cases labouring under the handicap

১। ইহাদের ক্ষমতা কম

of insufficient resources and not in a position to obtain all the help and guidance that they need." এই আন্দোলনের অপর একটি ত্রুটি হইল বেশির ভাগ সংঘের নেতৃত্ব ও পরিচালন, এখন পর্যন্ত সেই শিল্পের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নহে এইরূপ বহিরাগত ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত। এই সকল ব্যক্তির নিরলস প্রচেষ্টা আদর্শবাদ ও ত্যাগের মধ্য দিয়াই শ্রমিকসংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। প্রথম যুগে বহিরাগত নেতৃত্বের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে আন্দোলন এমন এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যখন নিজেদের শ্রেণী হইতে এবং শিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে সুদক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া এই আন্দোলন আর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারিবে না। বর্তমানে স্কুল-কলেজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু ব্যক্তি কলকারখানায় চাকুরি পাইতেছেন, এবং শ্রমিক বা আধা-শ্রমিকে পরিণত হইতেছেন। তাই শ্রমিকদের নিজেদের মধ্য হইতে শ্রমিকসংঘ পরিচালনার উপযুক্ত নেতা ও কর্মী উদ্ভব হওয়ার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। কমিশন বলেন যে, "Trade Union leadership has to grow progressively out of the ranks of the workers, and this process will be greatly accelerated as the programme of workers education gathers momentum."

২। নিজস্ব নেতৃত্বের উদ্ভব হয় নাই

এই সকল দুর্বলতা এখনও বজায় থাকিতেছে এবং দ্রুত উহার অপসারণ হইতেছে না, তাহার কারণ হইল এখনও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। এই সকল ত্রুটিই প্রধান প্রতিবন্ধক, ইহাদের যথাসম্ভব শীঘ্র দূর করার চেষ্টা দরকার। আভ্যন্তরীণ ত্রুটির মধ্যে প্রধান হইল, এখনও স্থায়ী ধরনের এবং শিল্পের সহিত বংশপরম্পরায় সংযুক্ত ও উহার উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ফলে গ্রামমুখিতা এবং গ্রামাকর্ষণ রহিয়া গিয়াছে, বৎসরের মধ্যে কিছু সময় গ্রামে কাটাইবার ইচ্ছা দূর হয় নাই। শিক্ষার অভাব এখনও শ্রমিক সংঘের অন্যতম প্রধান বাধা, ইহারই জন্য শ্রমিকের মনে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভবিষ্যতের সহিত নিজেদের ভবিষ্যৎ একত্রে মিলাইবার দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতে পারে না; নিজেদের মধ্য হইতে উপযুক্ত সংঘ-নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে পারে না। শ্রমিকসংঘ গড়িয়া উঠার অপর একটি বাধা হইল বিভিন্ন ধরনের জাতি, বর্ণ ও ভাষাভাষী জনসমষ্টি লইয়া শ্রমিকদল গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করার অসুবিধাও কম নাই।

আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও অসুবিধা

মালিকেরাও এই সকল বিভিন্নতাকে কাজে লাগাইতেছে, শ্রমিকদের মনে বিভেদ জিয়াইয়া রাখিয়া সংঘ গড়িয়া উঠার কাজে বাধা দিতেছে। শ্রমিক সংগ্রহকারী দালাল এবং সর্দারেরাও নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় সংগঠনের কাজে বাধা দিতেছে। শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ মানিয়া লয় না এরূপ বহু রাজনৈতিক দলও নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় বিভেদপন্থী শ্রমিক আন্দোলন চালাইতেছে। শ্রমিকদের মধ্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়িয়া না উঠায় উপযুক্ত ধরনের শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত হইতে পারিতেছে না। পরিকল্পনা কমিশন বলিতেছেন যে, "Multiplicity of trade unions, political rivalries, lack of resources and disunity in the ranks of workers are some of the major weaknesses in a number of existing unions."

বাহ্য অসুবিধাগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে দুইটি: সরকারের বিরূপ মনোভাব এবং মালিকদের বিরোধিতা। ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইনে সরকার ও মালিক—উভয় পক্ষই মুখে শ্রমিক সংঘগুলিকে স্বীকৃতিদান করিয়াছে বটে, কিন্তু কার্যত প্রায় সর্বপ্রকারে উহার বিরোধিতা করিয়াছে। বর্তমানেও বিভিন্নরূপে এইরূপ বিরোধী মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। অবিশ্বাস, অসহযোগিতা ও বিরোধিতা ইহারাই শ্রমিক মালিক সম্পর্ককে এরূপ কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে যে শ্রমিক সংঘের সুস্থ পরিচালনা ও অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে।

বাহ্য ত্রুটি ও অসুবিধা

শ্রমিকসংঘ সংক্রান্ত আইন (Trade union Legislation)

শ্রমিকসংঘ সংক্রান্ত আইনগুলির উদ্দেশ্য হইল শ্রমিক সংঘ কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করা, মালিকেরা যাহাতে উহাকে স্বীকৃতি দেয় তাহার ব্যবস্থা করা উহাদের দায়িত্ব ও অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রকৃত শ্রমিকসংঘ সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য সংঘের সভাদের কোনরূপ শাস্তি না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা।

এই সকল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন (The Trade union Act, 1926) বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে মালিক সংঘ এবং শ্রমিক সংঘ উভয়কে স্বীকৃত দানের কথা বলা হয়। যে সকল শ্রমিক-সংঘ নিজেকে রেজিষ্ট্রী করাইয়া লইতে পারিবে তাহারা কিছু কিছু অধিকার

পাইবে. অ-রেজিষ্ট্রীকৃত সংঘসমূহ (unregistered unions) এই অধিকারগুলি পাইবে না। রেজিষ্ট্রীকৃত সংঘগুলিকে কিছু কিছু শর্ত মানিয়া চলিতে হইবে, তবেই সে রেজিষ্ট্রীর জন্য দরখাস্ত করিবে পারিবে এবং উহার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংঘের একটি সুনির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র থাকিতে হইবে এবং কার্যকরী সমিতির অর্ধেক সদস্যের বেশি বহিরাগত সদস্য থাকিতে পারিবে না। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করাইয়া উহা সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। আইন-নির্দিষ্ট কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সংঘ ব্যয় করিতে পারিবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘের অর্থভাণ্ডার হইতে ব্যয় হইতে পারিবে না। তবে সভ্যদের নিকট হইতে স্বেচ্ছামূলক চাঁদা তুলিয়া (voluntary subscriptions) এই উদ্দেশ্যে পৃথক ভাণ্ডার গঠন করা চলিবে। এই সকল দায়িত্বের পরিবর্তে সংঘ নিজের নামে সম্পত্তি রাখিতে পারিবে, উহার উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইবে এবং কোন প্রকৃত শিল্পবিরোধের সহিত জড়িত কাজকর্মের জন্য সংঘের বা সদস্যদের নামে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা চলিবে না।

রেজিষ্ট্রীকৃত হওয়ার সর্তাবলী

১৯৪৮ সালে এই আইনের সংশোধন হয়। সংশোধিত এই আইনে মালিকের পক্ষে শ্রমিক সংঘকে বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করা হয়। নির্দিষ্ট সর্তাবলী পূরণ করিলে মালিকের নিকট সংঘ স্বীকৃতি পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে; মালিক বাজি না হইলে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক কোর্টের (Labour court) নিকট স্বীকৃতির দাবি জানাইতে পারিবে। স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য হইতে হইলে ইউনিয়নটিকে রেজিষ্ট্রীকৃত থাকিতে হইবে; উহার সভ্যদের সেই শিল্পে নিযুক্ত কর্মী হইতে হইবে; সংঘের এরূপ কোন নিয়ম থাকিতে পারিবে না যাহাতে শিল্পে নিযুক্ত কেহ সভ্য হইতে না পারে; এবং সংঘটি সেই শিল্পের বা ফার্মের শ্রমিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংঘের শাসনতন্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত থাকিবে কি পদ্ধতিতে সংঘ ধর্মঘটে যোগদান করিতে পারিবে। যদি শ্রমিক-কোর্ট দেখে যে এই সকল সর্ত প্রতিপালিত হইতেছে, তবে ইহা সংঘকে একটি বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেট দিবে এবং উহার ফলে সেই শ্রমিকসংঘ শিল্পসম্পর্কীয় সকল বিষয়ে মালিকের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবার অধিকার লাভ করিবে।

বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি পাইবার সর্তাবলী

১৯২৬ সালের আইন এবং ১৯৪৮ সালে উহার সংশোধনী আইন উভয়েরই

দোষ ত্রুটির অভাব ছিল না। মালিকসংঘ এবং শ্রমিকসংঘ উভয়কেই ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে মানিয়া লওয়ায় অস্বাভাবিক ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। রয়াল কমিশন অন্ লেবর এই আইন সংশোধনের জন্য কিছু কিছু সুপারিশ করিয়াছিলেন। কমিশন বলিয়াছিলেন যে, হিসাব পরীক্ষা করাইবার খরচ সরকারের বহন করা উচিত। সংঘের কার্যকরী সমিতিতে সেই শিল্পে কাজ করেন এইরূপ সদস্যের সংখ্যা অর্ধেকের পরিবর্তে ⅔ অংশ হওয়া উচিত; এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থভাণ্ডার গড়িয়া তোলার উপর কোন বাধা নিষেধ থাকা উচিত নয়। কমিশন ইহাও বলেন যে, শ্রমিক সংঘগুলিকে নিজস্ব সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহা ছাড়া, শ্রমিকসংঘ সম্পর্কে মালিকদের মনোভাব আরও সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, উহাদের সহিত সমমর্যাদার ভিত্তিতে (on equal terms) আলাপ আলোচনা করা উচিত, এইরূপ কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের শিল্প মালিকেরা এই বিষয়ে মোটেই কর্ণপাত করেন নাই, শ্রমিক সংঘ সম্পর্কে তাহারা চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা, বিরোধিতা এবং শত্রুতার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

আইনগুলির দোষ-ত্রুটি ও রয়াল কমিশনের সুপারিশ

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংসদে সরকার একটি ট্রেড ইউনিয়ন বিল আনেন (Trade Unions Bill, 1950)। এই বিলে বলা হইয়াছিল, ৭ বা ততোধিক শ্রমিক মিলিয়া সংঘ গঠন করিয়া রেজেষ্ট্রীর জন্য দরখাস্ত করিতে পারে। ১৯২৬ সালের আইনে রেজেষ্ট্রীর জন্য যে সকল শর্ত ছিল তাহাপেক্ষা আরও কয়েকটি শর্ত এই বিলে যোগ করা হইয়াছিল, যেমন সংঘের আইনে সদস্যদের চাঁদা মাসিক চারি আনার কম হইবে না; বহিরাগত সদস্যের সংখ্যা কার্যকরী সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার ¼ এর বেশি বা ৪ জন-এর অধিক হইবে না। কোন সংঘ যদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারী কর্মচারীদের লইয়া গঠিত হয়, তবে কোন বাহিরের লোক সেই সংঘের কার্যকরী সমিতির সদস্য হইতে পারিবে না, অথবা উহারা কোন রাজনৈতিক কার্যে যোগদান করিতে পারিবে না।

১৯৫০ সালের ট্রেড ইউনিয়ন বিল

ভারতের পার্লামেন্টে এই আইনের বিরুদ্ধে তুমুল তর্ক উঠে, এবং ফলে ভারত সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য এই বিলটি মুলতুবী রাখেন। এইরূপে

বিলটি বাতিল হইয়া যায়। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে নৈনিতালে এক ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে বিলটির বিভিন্ন দিক লইয়া আলাপ আলোচনা করা হয়। কিন্তু এই সম্পর্কে নূতন কোন বিল আনা হয় নাই।

সকল পক্ষ মানিয়া চলে এইরূপ যে শৃংখলাবিধি (Code of Discipline) গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রমিকসংঘকে মানিয়া লওয়ায় যে ভিত্তি স্বীকৃত আছে সেই অনুযায়ী বর্তমানে শ্রমিক সংঘের কাজ চলিতেছে। পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনায় মনে করেন যে, "The basis for recognition of unions, adopted as a part of the Code of Discipline, will pave the way for the growth of a strong and healthy trade unionism in the country." যদি কোন শ্রমিকসংঘে অবিচ্ছিন্নভাবে ছয় মাস যাবৎ মোট শ্রমিক সংখ্যার অন্তত ১৫% সভ্যপদ গ্রহণ করিতে থাকে, তবে সেই প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃত বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং যদি ইহার সভ্য সংখ্যা মোট শ্রমিক সংখ্যার ২৫% হয়, তবে উহাকে প্রতিনিধিমূলক (representative) বলিয়া গণ্য করা হইবে। কোন শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে একাধিক শ্রমিকসংঘ থাকিলে সর্বাধিক সদস্যবিশিষ্ট সংঘটি স্বীকৃতি পাইবে। একবার কোন সংঘ স্বীকৃতি পাইলে এবং সে শৃংখলাবিধি মানিয়া চলিলে, দুই বৎসরের মধ্যে তাহার অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন আনা চলিবে না।

বর্তমান স্বীকৃতির ভিত্তি কি?

ভারতে শিল্পবিরোধ (Industrial Disputes in India)

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতের শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট বিশেষ দেখা যায় নাই। শ্রমিকশ্রেণী অসংগঠিত থাকায় দাবিদাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তাহাদের পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে কোন চেষ্টা করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। যুদ্ধোত্তর যুগে দামস্তরে ও জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধির দরুন প্রধানত মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ১৯২০-২১ সালে বিপুল সংখ্যক ধর্মঘট দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২১ সাল হইতেই ভারত সরকার ধর্মঘট সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করিতে সুরু করেন এবং ১৯২৯ সাল হইতে শিল্প বিরোধ মিটাইবার প্রচেষ্টা করিতে সুরু করেন এবং এই সম্পর্কে আইন পাশ করিতে থাকেন।

বিভিন্ন প্রকার কারণে ভারতে শিল্পবিরোধ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল মজুরি বৃদ্ধি ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবি। শিল্পবিরোধের কারণ

হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাজের সময় কমাইবার দাবি, কাজের মধ্যে বিশ্রামের জন্য সময় দাবী প্রভৃতি। শ্রমিক-ছাঁটাই এবং ইউনিয়ন কর্মীদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাও শিল্প বিরোধের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তাহা ছাড়া, বহু বিভিন্ন কারণে শিল্প বিরোধ ঘটিতে দেখা যায়, শ্রমিকেরা অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুবিধা দাবি করে, যেমন বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, বাড়ী ভাড়া, সস্তায় খাদ্য সরবরাহ এবং কোন অফিসারের অপসারণ প্রভৃতি। অনেক ক্ষেত্রে মালিকের অযৌক্তিক শত্রুতা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা, সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে তালা বন্ধ (lock-out) ঘটিয়া থাকে।

শিল্প বিরোধের কারণাবলী

শিল্প বিরোধের ফলে শ্রমিক ও মালিক উভয় দলই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। শ্রমিকের আয় না থাকায় তাহাদের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পায়, মালিকের মুনাফা হ্রাস পায়, কারখানার স্থায়ী খরচা চালাইতে হয়, ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য খরচ করিতে হয়, এইরূপে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় শিল্পে ধর্মঘট হইলে মালিক হিসাবে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বেসরকারী শিল্পে ধর্মঘট হইলে কর প্রভৃতি খাতে রাষ্ট্রের আয় হ্রাস পায়। সমাজের মোট উৎপাদন, ও জাতীয় আয় কমিয়া যায়। সমাজ-দেহের একাংশে সংঘর্ষ ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়, অস্বস্তি, ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিতে থাকে। দেশের সরকার তাই শিল্প-বিরোধের প্রতিরোধ ও মীমাংসার জন্য প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে।

শিল্প বিরোধের ফলাফল এবং রোধের প্রয়োজনীয়তা

শিল্পবিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি (Methods for the Settlement of Indistrial Disputes)

১৯২০-২১ সালে প্রচুর সংখ্যক ধর্মঘট হওয়ায় তখন হইতে শিল্পবিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি স্থির করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। ১৯২৯ সালে এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার শিল্পবিরোধ আইন (Trade Disputes Act) পাশ করেন। সেই আইন অনুসারে কোন শিল্পে বিরোধ ঘটিলে সরকার উহাকে হয় একটি এনকোয়ারী কোর্ট (Court of Enquiry) অথবা একটি কনসিলিয়েশন বোর্ডের (Board of conciliation) নিকট পাঠাইবার ক্ষমতা লাভ করেন। এক বা একাধিক ব্যক্তি লইয়া এনকোয়ারী কোর্ট গঠিত ছিল এবং বিশেষ যে সকল বিষয় তাহাদের নিকটে উপস্থাপিত করা হইবে

উহাদের সম্পর্কে সরকারকে রিপোর্ট দেওয়া ছিল উহার কাজ। আর কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠিত ছিল একজন স্বাধীন চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কয়েকজন সদস্য লইয়া। বোর্ডের কাজ ছিল বিরোধী পক্ষদের একত্রে ডাকিয়া উহাদের মধ্যে আপোষ ঘটাইবার চেষ্টা করা। কোন আপোষ না হইলে বোর্ড সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিত। এই আইনে জন-প্রয়োজনীয় শিল্প (public utility services) যেমন, রেল, ডাক ও তার প্রভৃতি এবং অন্যান্য শিল্পের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছিল। জন প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহে ১৪ দিনের নোটিশ না দিয়া কোন ধর্মঘট ঘোষণা করা যাইবে না এইরূপ বলা হইয়াছিল। কোন শিল্পের নিজস্ব সমস্যা বা বিরোধ ছাড়া অপর কোন কারণে ধর্মঘট ঘোষণা করা চলিবে না এইরূপ স্থির হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু শিল্পের সাধারণ সমস্যা লইয়া বা রাজনৈতিক কোন কারণে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা বে-আইনী কার্যে পরিণত হইল। প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাশ করিয়া পরে এই আইনকে স্থায়ী করা হয়। বহু ধর্মঘট ঘটিলেও এই আইনের সাহায্য বিশেষ লওয়া হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে এই আইনকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ভারত সরকার শিল্পবিরোধ (সংশোধনী) আইন পাশ করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এবং রেল কোম্পানীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে কনসিলিয়েশন অফিসার নিয়োগের ভার দেওয়া হয়।

১৯২৯ সালের শিল্প বিরোধ আইন ও ১৯৩৮ সালের সংশোধন

ইতিমধ্যে বোম্বাই সরকার ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালে কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই সকল আইনে প্রধানত আপোষের উপর জোর দেওয়া হয়। কনসিলিয়েশন অফিসার (conciliation officer) নিয়োগ করা, এবং আপোষের জন্য একটি স্থায়ী শিল্পকোর্ট প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করা হয়। কোন ধর্মঘট বা তালাবন্ধ (lockout) ঘোষণার পূর্বে সকল বিরোধই এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট উপস্থিত করা বাধ্যতামূলক এইরূপ বলা হয়, কিন্তু ইহাদের মীমাংসা (award) গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয় না। ১৯৩১ সালের এই আইনে মালিকের পক্ষে শ্রমিক সংঘকে স্বীকৃতি দান বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের বোম্বাই প্রদেশীয় আইন

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়। ভারতরক্ষা বিধিসমূহের

(Defence of India Rules) ৮১ (ক) ধারায় বলা হইয়াছিল যে ভারত-সরকার অবশ্য-প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিতে (essential industries) ধর্মঘট ও তালাবন্ধ ঘোষণা নিষেধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং সকল বিরোধই আপোষ অথবা বিচারের জন্য (for conciliation or adjudication) প্রেরণ করিতে পারিবেন। আপোষ বা বিচার চলাকালীন কোন ধর্মঘট বা তালাবন্ধ চলিবে না। কোন মীমাংসা বা রায় মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক, কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন। এই প্রথম সর্বভারতীয় শিল্পবিরোধের বিষয়ে বিচারের নীতি এবং বাধ্যতামূলক আপোষের কথা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক ধর্মঘট ঘটা সত্ত্বেও ১৯২৯ সালের শিল্পবিরোধ আইনের মত এই ধারা বিশেষ প্রয়োগ করা হয় নাই।

যুদ্ধের সময়ে আপৎকালীন ব্যবস্থা

যুদ্ধ শেষ হইবার সময়ে এবং স্বাধীনতার সুরুতে ভারতে শিল্পবিরোধের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং স্বাধীন ভারতীয় সরকার ১৯৪৭ সালে শিল্প বিরোধ আইন (Industrial Disputes Act, 1947) পাশ করেন। এই আইন এবং উহার পরবর্তী ১৯৫৭ সালের আইন উভয়ে মিলিয়া বর্তমানের শিল্পবিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিসমূহের ভিত্তি (machinery for settlement of disputes) স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের আইনে বলা হয় যে, সর্বনিম্নস্তরে একশতের অধিক শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিটি কারখানাতে একটি করিয়া ওয়ার্কস্ কমিটি (works committee) থাকিবে। মালিকদের মনোনীত প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি গঠিত থাকিবে। দৈনন্দিন বিরোধ বা মত-পার্থক্যগুলি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে দূর করা এই কমিটির কাজ। দ্বিতীয়ত, কোন বিরোধের আপোষের জন্য এই আইনে একটি পৃথক রীতি অবলম্বন করা হয়। সরকার কয়েকজন কন্‌সিলিয়েশন অফিসার নিয়োগ করিবেন, তাহারা বিরোধ মিটাইবার জন্য প্রতি কারখানায় গিয়া মীমাংসা ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। তাহারা সক্ষম হউন বা না হউন দুই সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে তাহা জানাইতে হইবে। মীমাংসা না হইলে সরকার বিরোধকে হয় একটি কন্‌সিলিয়েশন বোর্ড (Board of conciliation) অথবা একটি ট্রাইবুনালের (Industrial Tribunal) নিকট পাঠাইয়া দিবে। শিল্পটি জনপ্রয়োজনীয় শিল্প বলিয়া ঘোষিত থাকিলে

১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন

ওয়ার্কস কমিটি, কনসিলিয়েশন অফিসার

উহাকে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। শ্রমিকদের ও মালিকদের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান লইয়া এক একটি কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠিত হইবে। দুই পক্ষকে বুঝাইয়া আপোষে রাজি করান ই এই বোর্ডের কাজ। সক্ষম হউক বা না হউক দুই মাস কালের মধ্যে সরকারকে তাহা জানাইতে হইবে। শিল্প ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে হাইকোর্টের বিচারপতির সমান যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তি লইয়া। প্রায় সাধারণ কোর্টের মতই এই ট্রাইবুনাল উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া রায় দিবে। ট্রাইবুনালের রায় উভয়পক্ষের উপর অন্তত ১ বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে সরকারী শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে উহা মানিয়া লওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যতদিন ধরিয়া আপোষ বা বিচার চলিতেছে এবং কোন মীমাংসা বা রায় যতদিন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক, ততদিনের মধ্যে কোন ধর্মঘট বা তালাবন্ধ বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে।

কন্‌সিলেয়েশন বোর্ড ও শিল্প ট্রাইবুনাল

এই আইনে বিরোধ মিটাইবার জন্য আপোষ বা বাধ্যতামূলক সালিশী (Compulsory Arbitration) উভয় ব্যবস্থার কথাই বলা হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বাধ্যতামূলক সালিশীর উপর সরকার অধিকতর নির্ভর করিতেছে এবং মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কন্‌সিলিয়েশন বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। ইহা এই আইন কার্যকরী হওয়ার পথে বিষম বাধা ও ত্রুটি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন শিল্প ট্রাইবুনাল গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে এমন পরস্পরবিরোধী রায় দিয়াছিল যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে অধিকতর অবনতি ঘটিয়াছিল। তাই ১৯৫০ সালে সরকার একটি সংশোধনী আইন (Amendment Act) পাশ করিয়া আপীল ট্রাইবুনাল (Appellate Tribunal) স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ইহার কাজ হইল মজুরি বোর্ড (wage boards), শিল্পকোর্ট (Industries Courts) ও শিল্পট্রাইবুনাল (Industrial Tribunal) প্রভৃতির রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করা এবং সেই আপীলের বিচার করা।

এই আইন কার্যকরী হওয়ার পথে ত্রুটি

১৯৫৭ সালের নূতন শিল্পবিরোধ আইনে (Industrial Disputes Act, 1957) শিল্পবিরোধ মিটাইবার পথে ও পদ্ধতিতে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। এই আইন অনুসারে কোন শিল্পবিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে তিন ধরনের ট্রাইবুনাল বসান চলিবে : শ্রমিক কোর্ট (Labour Court), শিল্প ট্রাইবুনাল

১৯৫৭ সালের নূতন আইন

(Industrial Tribunal) এবং জাতীয় ট্রাইবুনাল (National Tribunals)। চলতি নিয়মকানুন পরিবর্তন করিয়া মালিক যে ধরনের নির্দেশ দিবে বা আদেশ জারী করিবে উহাদের আইনসিদ্ধতা বা ঔচিত্য লইয়া যে সকল শিল্পবিরোধ দেখা দিবে অথবা শ্রমিকের কর্মবিচ্যুতি বা বরখাস্তের বিরুদ্ধে ধর্মঘট বা তালাবন্ধ বে-আইনী হইয়াছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ের সহিত জড়িত শিল্পবিরোধগুলি শ্রমিক কোর্টে হাজির হইবে। মজুরি, কাজের সময়, বোনাস, আধুনিকীকরণ এবং ছাঁটাই প্রভৃতি বিষয়ে কোন শিল্পবিরোধ দেখা দিলে উহারা শিল্প ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য প্রেরিত হইবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে অথবা যে শিল্পবিরোধ একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত থাকে তাহারা জাতীয় ট্রাইবুনালে প্রেরিত হইবে। এই আইনে আপীল ট্রাইবুনাল প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। "শ্রমিক" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করিয়া এই আইনে অনধিক ৫০০ টাকা বেতন পায় এইরূপ যন্ত্রদক্ষ কর্মী বা সুপারভাইজারদেরও ধরা হয়। আরও বলা হয় যে, মালিক কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজের অবস্থা পরিবর্তন করিতে চাহিলে ২১ দিন পূর্বে নোটিশ না দিলে চলিবে না। কোন সংশ্লিষ্ট অফিসার শিল্পের চলতি নির্দেশাবলী ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা বিচার করিবার কিছুটা ভার পাইল এবং শ্রমিকও কোন চলতি নির্দেশের ব্যাখ্যার জন্য বা পরিবর্তনের জন্য শ্রমিক-কোর্টে দরখাস্ত করার অধিকার পাইল। এই আইনে মালিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পায় ; কোন শিল্পবিরোধ চলাকালীন সেই বিরোধের সহিত জড়িত নয় এরূপ কোন অনুচিত কার্যের জন্য মালিক কোন শ্রমিককে শাস্তি দিতে বা এমন কি বরখাস্ত করিতে পারে।

শ্রমিক কোর্ট, শিল্প-ট্রাইবুনাল ও জাতীয় ট্রাইবুনাল

অন্যান্য পরিবর্তন

এই নূতন আইনে তথাকথিত "গিরি দৃষ্টিভঙ্গী" (Giri Approach) গ্রহণ করা হয় নাই। একমাত্র সালিশের ক্ষেত্রে ইহার কিছুটা প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ধারায় বলা হইয়াছে যে, উভয় পক্ষই একটি সালিশীর চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া একজন সালিশের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত এই আইন মোটামুটি পুরাতন নীতিসমূহ বিশেষ পরিবর্তন করে নাই। আপীল ট্রাইবুনাল তুলিয়া দেওয়া খুবই ভাল হইয়াছে, কারণ ইহার ফলে শ্রমিক ও মালিকদের মনে মামলা মোকদ্দমার মনোবৃত্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

নূতন আইনের সমালোচনা

শিল্পবিরোধ মীমাংসার বর্তমান পদ্ধতির যৌক্তিকতা (Adequacy of the present machinery for the settlement of Industrial Disputes) : ১৯৪৭ সালের এবং ১৯৫৭ সালের শিল্প বিরোধ আইন মীমাংসার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছে। এই দুইটি আইনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সংঘবদ্ধ দরকষাকষির মাধ্যমে (Collective bargaining) শিল্পবিরোধ মীমাংসা করিয়া থাকে। ১৯৪৭ সালের আইনে ওয়ার্কস কমিটি, কনসিলিয়েশন অফিসার, কনসিলিয়েশন বোর্ড, কোর্ট অফ্ এনকোয়ারী ও শিল্প ট্রাইবুনাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে। এই শিল্প ট্রাইবুনালের রায় বাধ্যতামূলক, উভয়পক্ষ ইহা মানিতে বাধ্য। অবশ্য সরকার ৩০ দিনের মধ্যে ইহ পরিবর্তন করিতে বা বর্জন করিতে পারেন।* সরকারী শিল্পের বিষয়ে বলা হইয়াছিল যে, উহাদের ক্ষেত্রে সরকার কনসিলিয়েশন বোর্ডে বিরোধটি পাঠাইতে বাধ্য। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিরোধটিকে কনসিলিয়েশন বোর্ড বা শিল্প ট্রাইবুনাল কোথায় পাঠান হইবে তাহা সরকারের ইচ্ছাধীন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিল্পবিরোধ মীমাংসার বর্তমান পদ্ধতিতে শিল্পের মধ্যে ও বাহিরে উভয় দিকেই ব্যবস্থা রহিয়াছে; স্বেচ্ছাকৃত আপোষ ও সালিশী উভয়ই আছে; এবং বাধ্যতামূলক আপোষ ও বিচারের ব্যবস্থাও আছে।

বর্তমান মীমাংসার পদ্ধতি

বর্তমান মীমাংসার এই পদ্ধতির বহুবিধ দোষ ত্রুটি দেখান হইয়াছে। প্রথমত, সারাদেশে এই বিষয়ে আইনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ও সমতা নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক রাজ্য সরকার নিজ নিজ ধরনের আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ফলে সমগ্র দেশে শিল্পবিরোধ আইনের বিষয়ে অসম্ভব জটিলতা দেখা দিয়াছে।

সারাদেশে জটিলতার সৃষ্টি

দ্বিতীয়ত, এই আইনের দৃষ্টিভঙ্গী ভুল এবং উহা শিল্পবিরোধ মীমাংসার সহায়ক নহে এইরূপ গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী কালের অস্বাভাবিক অবস্থার অসংখ্য শিল্পবিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য এবং শিল্পে কিছুটা শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য থাকিলেও

---

* এই প্রসঙ্গে মনে রাখা যাইতে পারে যে, এই ক্ষমতার বলেই ভারত সরকার ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে ব্যাঙ্ক ট্রাইবুনালের রায় পরিবর্তিত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগিরি পদত্যাগ করেন।

বর্তমানে ইহা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। বাধ্যতামূলক সালিশী ও বিচারের পথ ত্যাগ না করিলে এবং পারস্পরিক আলোচনার পথে অগ্রসর না হইলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত হইতে পারিবে না। ইহাই সুবিখ্যাত 'গিরি দৃষ্টিভঙ্গী' (Giri approach)। পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় মীমাংসা না হইলে কনসিলিয়েশন অফিসারের নিকট যাইতে হইবে। এই সকল অফিসারদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে উভয় পক্ষ রাজি হইয়া তৃতীয় একজন সালিশের নিকট বিবাদটি পাঠাইতে হইবে এবং তাঁহার কথা উভয় পক্ষ মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। যদি সালিশী বিফল হয় তবে দুই পক্ষ পছন্দ করিয়া নিরপেক্ষ একজন বিচারকের নিকট ইহা প্রেরণ করিবে। সাধারণভাবে, সর্বশেষ স্তর, [illegible] এবং জনপ্রয়োজনীয় শিল্পে বাধ্যতামূলক সালিশী ও বিচারের কথা ভাবা যাইতে পারে।

গিরি দৃষ্টিভঙ্গী কাহাকে বলে

এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেখান যাইতে পারে। দেশের শিল্পগুলির [illegible] সাধারণ মামলা-মোকদ্দমার মত বিষয় নয়, কেবলমাত্র আইন ও নিয়মের সঠিক ব্যাখ্যা দ্বারাই ইহার মীমাংসা চলে না। উভয় পক্ষেরই [illegible] অধিকার, কর্তব্য ও স্বার্থ শিল্পের সহিত জড়িত। উভয় পক্ষের সম্মতি ও আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত মীমাংসাই উভয় পক্ষ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে, বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া বাধ্যতামূলক রায়ের উল্লাস ও গ্লানি দেখা দেয় [illegible] সেই রায় অনুযায়ী কাজকর্ম করে না, শ্রমিকেরা [illegible] কৌশল (go slow tactics) গ্রহণ করে মালিকেরা বা রায় কার্যকরী করিতে যথাসম্ভব দেরী করে ও পরিণামে তিক্ততার সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও সুযোগ্য বিচারক লইয়া গঠিত হইলেও শিল্প ট্রাইবুনালের বিচারকগণ শিল্পের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে না, তাহাদের রায় সঠিক হইতে পারে না। তৃতীয়ত, বাধ্যতামূলক সালিশীর ব্যবস্থা সহজ হইলে সংঘবদ্ধ দরকষাকষির অভ্যাস গড়িয়া উঠিতে পারে না। মালিকেরা যদি জানে যে তাহারা বাহিরের কাহারও নিকট যাইতে পারে, তখন তাহাদের মনে শ্রমিকসংঘকে মানিয়া চলার মনোবৃত্তি কিছুতেই তৈয়ারী হইয়া উঠে না। চতুর্থত, বাস্তবে দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে উভয় পক্ষের মনেই মামলা মোকদ্দমার আগ্রহ বাড়িয়া গিয়াছে।

গিরি দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে কি যুক্তি

'গিরি দৃষ্টিভঙ্গী'র বিপক্ষে বলা হয় যে, বর্তমান ভারতের বাস্তব অবস্থায় উহা চলিতে পারে না। আমাদের দেশে শ্রমিক সংঘগুলি দুর্বল, অধিকাংশ মালিকেরা স্পষ্টতই শ্রমিক সংঘের বিরোধিতা করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় আপোষ বা সংঘবদ্ধ দরকষাকষি সফল হইবে না, কারণ উভয় পক্ষের শক্তিতে তারতম্য আছে। বাধ্যতামূলক সালিশী ও বিচারের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্র দুর্বল শ্রমিকসংঘগুলিকে রক্ষা করিতে পারে। ইহাই 'নন্দা দৃষ্টিভঙ্গী' (Nanda approach)।

গিরি দৃষ্টিভঙ্গী কি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ?

ভারতে শ্রমিক কল্যাণ (Labour Welfare in India)

দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, সামাজিক বৈষম্য, রক্ষণশীল মনোবৃত্তি, কুসংস্কার, দাস-সুলভ মনোবৃত্তি ও রোগশোক ব্যাধি—ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রমিকদের যাহা কিছু প্রয়োজন, সেই সকল মিলিয়াই 'শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম'। "শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সাধারণ অবস্থার উন্নতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকল প্রচেষ্টাকে' শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম বলে। এই কল্যাণমূলক কাজকর্মের দুইটি দিক আছে, মানবিক দিক ও অর্থনৈতিক দিক। একদিকে এই সকল কার্যের ফলে শ্রমিকেরা মানুষ হিসাবে উন্নত হইয়া ওঠে, অপর দিকে তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিল্পে শান্তি বজায় থাকে, উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী স্বাস্থ্যকর মানসিক অবস্থা গড়িয়া উঠে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠান আমার নিজের, ইহার উন্নতিতেই আমার উন্নতি—এইরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠে। শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের ফলে স্থায়ী ধরনের শ্রমিক শ্রেণী গড়িয়া উঠে।

শ্রমিক কল্যাণ কাহাকে বলে ও ইহার প্রয়োজনীয়তা

শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ কারখানার ভিতরে, ও বাহ্য অর্থাৎ কারখানার বাহিরে (Intra-mural and Extra-mural)। শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের মধ্যে প্রধান হইল : (ক) শিক্ষা, (খ) অসুস্থতাকালীন সাহায্য, (গ) প্রসূতি সাহায্য, (ঘ) আমোদ প্রমোদ, (ঙ) গৃহ নির্মাণ, (চ) সমবায় ক্রেতা সমিতি, (ছ) সুলভ ক্যান্টিন, (ঝ) শিশুদের তত্ত্বাবধান কেন্দ্র (creches), (জ) খাবার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা, পর্যাপ্ত জলসরবরাহ প্রভৃতি।

শ্রমিক কল্যাণের বিভিন্ন কাজকর্ম

সাধারণত চারি শ্রেণীর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শ্রমিক কল্যাণের কাজকর্ম করিয়া থাকে : মালিক, জনসেবা সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, শ্রমিকসংঘ, এবং সরকার। মালিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মালিক দেখা যায়। যাহারা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে আগ্রহশীল, তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচ্ছন্নতা ও সুব্যবস্থাপনায় পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত তুলনীয়। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মালিকই এখনও শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক সুবিধা বুঝিতে পারেন নাই। আধুনিক যুগে এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব ক্রমশ রাষ্ট্রের উপর আসিয়া পড়িতেছে। এতদিন পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্র শ্রমিক কল্যাণের দিকে বিশেষ কোন নজর দেয় নাই। বর্তমানে ভারত সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিতেছেন।

ভারতে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের ততটা প্রসার হয় নাই

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি সীমাবদ্ধভাবে কিছু কিছু কল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছেন, যেমন বোম্বাই সোস্যাল সার্ভিস লীগ, সারভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি, দি ম্যাটারনিটি এণ্ড ইন্‌ফ্যাণ্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, দি ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাসেস্ মিশন সোসাইটি প্রভৃতি। ইহারা আজকাল ভারত সরকারের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইতেছেন।

শ্রমিকেরা নিজেদের সংঘের মারফৎ বিশেষ কিছু কল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মালিক ও পুলিশের বিরোধিতা এবং আর্থিক দুরবস্থার দরুণ তাহাদের পক্ষে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কাজকর্ম করা খুব বেশি সম্ভবপর হয় নাই। তবে বর্তমানে ভারতের শ্রমিক সংঘগুলি ক্রমশই এই বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু পর্যন্ত ভারতে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। যুদ্ধের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল অব্যাহত রাখার জন্য এইরূপ কিছু কিছু প্রচেষ্টা সুরু হয়। স্বাধীনতা পাওয়ার পর হইতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে এবং ১৯৫২ সালের খনি আইনে ক্যান্টিন, শিশুরক্ষণকেন্দ্র, আশ্রয়স্থল, চিকিৎসার ব্যবস্থা, লেবর অফিসার নিয়োগ প্রভৃতি ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে প্রায় ২০০ শ্রমিককল্যাণ ফাণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা-

কিছু কিছু কাজ হইয়াছে

খনিতে এই কল্যাণ ভাণ্ডারসমূহ কাজকর্ম করিতেছে, ১৯৪৭ সালের কয়লা খনি শ্রমকল্যাণ ভাণ্ডার আইন অনুযায়ী ইহার কাজকর্ম পরিচালিত হইতেছে। অভ্রখনি শ্রমকল্যাণ ভাণ্ডারও প্রসারিত হইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমকল্যাণ বিষয়ে চলতি কাজকর্মসমূহকে অনেক দূর প্রসারিত করা হইবে, স্থির হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় লেবর ইন্‌স্টিটিউট এবং তিনটি আঞ্চলিক লেবর ইন্‌স্টিটিউটের কাজকর্ম প্রসারিত করা হইবে। বলা হইয়াছে যে "The problem of safety should receive greater attention." এই উদ্দেশ্যে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে। রাজ্য সরকারের শ্রমদফ্‌তর অধিকতর সক্রিয় হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতেও কিছুটা করা হইবে

বিভিন্ন কারখানায় সাবধানতা কমিটিও এই বিষয়ে সচেতনতা গড়িয়া তোলা হইবে। খনি সাবধানতা সম্মেলন এবং উহার বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে এই বিষয়ে অধিকতর গবেষণার কাজ অগ্রসর হইতেছে। একটি জাতীয় খনি সাবধানতা কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হইতেছে। গৃহনির্মাণ প্রভৃতি 'অস্থায়ী' শিল্প সম্পর্কেও আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করা হইতেছে। শিল্পগত কারণে অস্বাস্থ্য দূর করার জন্য গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ ও অনুসন্ধানের পরিধি প্রসারিত করা হইবে। শ্রমিকদের সমবায়-সমিতি গঠনের দিকে জোর দেওয়া হইতেছে। শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের জন্য মালিকদের দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া হইতেছে। খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও বাড়ান হইতেছে।*

প্রয়োজনের তুলনায় এই সকল ব্যবস্থা নিতান্ত স্বল্প, এই সকল কাজে অর্থবরাদ্দের পরিমাণও কম। স্ত্রীশ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করা দরকার, সেই কাজকর্মের পরিমাণ খুবই কম। এই সকল কাজ পরিচালনার ভার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের নিজেদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া দরকার; পিতৃত্বমূলক শাসনে (paternalistic administration) শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস জাগরিত হয় না। এই সকল কাজ পরিচালনার উপযোগী শিক্ষিত ও সমাজ-সচেতন কর্মীর বিশেষ অভাব।

ইহাদের অসম্পূর্ণতা

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি সীমাবদ্ধভাবে কিছু কিছু এইরূপ

* *Third Five Year Plan*. P. 258-9

কাজকর্ম করিতেছেন, যেমন বোম্বাই সোস্যাল সার্ভিস লীগ, সারভেন্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, দি ম্যাটারনিটি এণ্ড ইন্‌ফ্যাণ্ট ওয়েলফেয়ার অসোসিয়েশন, দি ডিপ্রেসড ক্লাসেস্ মিশন সোসাইটি প্রভৃতি। ইহারা আজকাল ভারত সরকারের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইতেছেন।

শ্রমিকেরা নিজেরা সংঘের মারফৎ বিশেষ কিছু কল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মালিক ও পুলিশের বিরোধিতা এবং আর্থিক দুরবস্থার দরুণ তাহাদের পক্ষে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কাজকর্ম করা বেশি সম্ভবপর হয় নাই। তবে বর্তমানে ভারতের শ্রমিকসংঘগুলি ক্রমশই এই বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম কতদূর হইতে পারে তাহা আলোচনা করা দরকার। ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের যুগে ব্যক্তিগতভাবে মালিকেরা সর্বাধিক উদ্বৃত্ত তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে, তাই শ্রমিক কল্যাণের কাজ প্রথম দিকে করা হয় না। তবে যখন শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে তখন সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিকের অবস্থার কিছু কিছু উন্নতি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যে ধরনের কল্যাণমূলক কাজকর্মে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িতে পারে বা শ্রমিক-অসন্তোষের সাময়িক কিছুটা উপশম হয়, মোটামুটি সেই কাজকর্মগুলির উপরই জোর দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম যুগেও শ্রমিক-কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া চলে না। দ্রুত মূলধন সঞ্চয় করিলে এবং উহার সকলটুকু শিল্পপ্রসারে খাটাইলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বা শিল্পপ্রসারের গতিবেগ বাড়িতে পারে। কিন্তু যদি প্রথমদিকে শ্রমিক কল্যাণের জন্য বেশি খরচ হয় তবে বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং ব্যাপক শিল্পপ্রসারের ভিত্তি দ্রুত তৈয়ারী হইয়া উঠিতে পারে না। তাই যত অধিক অপূর্ণোন্নতির স্তরে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাজ সুরু হইবে, দেশে অধিক মূলধনের প্রয়োজনে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম তত বেশিদিন না করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হইবে। অবশ্য ভারতের পরিকল্পনা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নয় তাই শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম না করার নীতি গ্রহণ করা ভুল হইবে। শিল্প কাঠামোর বেসরকারী অংশ যদি শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজ না করে তবে সেই উদ্বৃত্ত ব্যক্তিগত

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত

মূলধন-গঠন ও শ্রমিক-কল্যাণে বিরোধ

মালিকের হাতে থাকিবে এবং নানাবিধ পথে অপচয় হইতে থাকিবে। অপব্যয় না হইয়া যদি উহা মূলধন হিসাবেই খাটে তবে তাহাতে ধনতন্ত্রের প্রসার হইবে. ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রথম দিকে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম না করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারে, কারণ সেখানে আয়-বৈষম্য এবং ভোগস্তরে পার্থক্য এত গভীর নয়। শ্রমিকেরা ত্যাগ স্বীকার করিতে আপত্তি করে না, কারণ ব্যক্তিগত মুনাফা নাই এবং সকলেই মোটামুটি সমান খারাপ অবস্থায় আছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, তাই কল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য সে কিছুদিন দেরী করিতেও পারে। কিন্তু ভারতের ন্যায় মিশ্র কাঠামোতে শ্রমিক-কল্যাণমূলক কাজকর্মের দ্রুত প্রসার করা অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা মূলধন-গঠনকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়

কারণ, তাহাই পর্যাপ্ত কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ভিত্তি

ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনা (Social security schemes in India):

ভারতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গুরুতর সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্পকেন্দ্রগুলিকে ঘিরিয়া বহু অপরিচ্ছন্ন বস্তির উদ্ভব হইয়াছে, অপরিণত বয়সের বালকদিগকে দিয়া কাজ করানো হইয়াছে, নির্ধারিত বা ন্যায্য সময়ের বেশি সময় ধরিয়া শ্রমিকদিগকে খাটানো হইয়াছে, স্ত্রী-শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিকেরা থাকিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ঝুঁকিবহুল কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকের বা শ্রমিক পরিবারের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই সকল সমস্যার প্রতি কোনো মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। শ্রমিকেরা অসুস্থ হইলে, বেকার হইলে বা বার্ধক্যে পৌঁছিলে তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিবে কি করি।—বহুকাল যাবৎ এই সমস্যাগুলি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

শ্রমিকেরা এককভাবে তাহাদের এই সমস্যাগুলি দূর করিতে পারে না। সরকার বিভিন্ন আইন-কানুনের সাহায্যে এই সামাজিক সমস্যাগুলিকে দূরীকরণের চেষ্টা করেন। ইহাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বিধান' বলা চলে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা

বিধানের জন্য কিছু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে **'কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ আইন'** দ্বারা কোনো শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় গুরুতর শারীরিক আঘাত পাইলে ক্ষতিপূরণ পাইবার ব্যবস্থা হয়। আঘাত যদি মৃত্যুর কারণ ঘটায় তাহা হইলে শ্রমিকের গড় মাসিক মজুরী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওযা হইবে ঠিক হয়। অবশ্য পরে এই আইন বহুবাব সংশোধিত হয় (Amendment)।

বৃটিশ রাজত্বাধীনে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান

১৯৪৬ সালে এক সংশোধনী বিলে—এই সকল শ্রমিকদেব মাহিনাব সর্বোচ্চ সীমা ৩০০ হইতে বাড়াইয়া ৪০০ কবা হয। কতকগুলি মাতৃমঙ্গল আইন পাশ হয়—স্ত্রী শ্রমিকেরা প্রসূতি অবস্থায একটি নির্দিষ্ট ভাতা পাইবাব অধিকাবী হয। অবশ্য এই সকল আইন সত্ত্বেও শ্রমিকদেব অবস্থার উন্নতি হয নাই—একদিকে শ্রমিকদেব অজ্ঞতা, অন্যদিকে মালিকদের ঔদাসীন্য—এই দুইটি কাবণ ইহাব জন্য মূলত দাযী। স্বাধীনতা প্রাপ্তিব পবে সরকাব এই বিষযে মনোযোগী হন এবং কতকগুলি আইনেব দ্বাবা সামাজিক নিবাপত্তা সাধনেব প্রশ্নটিকে জনসমক্ষে তুলিযা ধবেন।

(ক) আদারকার-এর স্বাস্থ্য-বীমা পরিকল্পনা:

দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব সময হইতেই সবকাব শিল্প শ্রমিকদিগেব স্বাস্থ্য-বীমাব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন। ১৯৪০, '৪১ ও '৪২ সালে শ্রম মন্ত্রীদেব সম্মেলনে ভারতে স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনেব প্রশ্নটি আলোচিত হয। ১৯৪৩ সালে অধ্যাপক আদারকার এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হন। আদারকার প্রথমে তাঁহাব পবিকল্পনাটিকে বস্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনিযারিং এবং ধাতু শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বাখিলেন। যে সকল শ্রমিকের বযঃসীমা ১২ হইতে ৬০ বৎসর এবং যাহাদেব মাসিক আয মাসে দুইশত টাকা তাহারাই এই পরিকল্পনাব অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আদারকাব-এর পরিকল্পনা অনুযাযী শ্রমিকদের মাহিনা হইতে একটা নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে এবং সরকারের পক্ষ হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাও লওয়া হইবে এইরূপ স্থির হয়। পরে এই পবিকল্পনার ক্ষেত্রটিকে প্রসাবিত করিয়া অন্যান্য শিল্পে প্রযুক্ত করার প্রস্তাব হয, এবং তৎসহ মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দানের পরিকল্পনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। এই সকল আলোচনার উপর ভিত্তি করিযা কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৮ সালে কর্মচারী রাষ্ট্র বীমা আইন পাশ করেন।

(খ) কর্মচারী রাজ্যবীমা পরিকল্পনা :

যে সকল স্থায়ীশিল্পে ২০ বা তদপেক্ষা বেশি লোক নিযুক্ত আছে এবং যাহাদের মাসিক আয় চারিশত টাকার উপরে নহে তাহারা এই বীমা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইল। কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকদিগের অসুস্থতা, বা শারীরিক অক্ষমতা, শ্রমিকদিগের চিকিৎসাদির সুবিধাদান এবং প্রসূতিদিগকে সুবিধাদান এই সকল বিষয়গুলি এই আইনের বিবেচনাধীন হইল। টাকা দিয়া অন্যান্য ধরনের সুবিধা, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

যদিও শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণেই সাহায্য তহবিল গড়িয়া উঠিল, কিন্তু ইহার মূল দায়িত্ব অর্পিত হইল মালিকেরই উপর। শ্রমিক এবং মালিকদের দেয় টাকা ছাড়াও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। ইহা ঠিক হইয়া ছিল যে প্রথম পাঁচ বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সাংগঠনিক ব্যয়ভার চালাইবার দুই তৃতীয়াংশ করিয়া বাৎসরিক সাহায্য দিবেন।

এই আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয়, যেমন কর্মচারী রাজ্য বীমা সংস্থা। এই সংস্থার একটি স্থায়ী কমিটি কর হইল—ইহারা সংস্থার কাজকর্ম পরিচালনা করিবে। ইহা ভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দানের জন্য একটি 'চিকিৎসা সংস্থা' গড়িয়া তোলা হইল।

এই পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম দিল্লী এবং কানপুরে প্রবর্তিত হয়। ক্রমশ ইহা অন্যান্য শিল্পাঞ্চলগুলিতেও প্রসারিত হয়। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের শেষে দেখা যায় যে একমাত্র গুজরাট ব্যতীত দিল্লী এবং অন্যান্য রাজ্যের ১৩১টি শিল্পকেন্দ্রে প্রায় ১৮·৬৫ লক্ষ লোক এই সুবিধাগুলি লাভ করিয়াছে। ১৫·১৫ লক্ষ কর্মচারীকে ঐ সকল রাজ্যে চিকিৎসাগত সুবিধা দান করা হইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সালে ৫·৪৩ কোটি টাকা মালিক পক্ষ হইতে এবং ৪·০২ কোটি টাকা শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে তোলা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাতে আরও ব্যাপকভাবে এই প্রচেষ্টা চালাইয়া আরও প্রায় দুই লক্ষ লোককে এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত কর হইল।

যদিও এই পরিকল্পনা সকল শ্রেণীর সকল লোকের সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারে নাই—তবুও সামাজিক নিরাপত্তা সাধনের প্রথম সফল প্রচেষ্টা হিসাবে ইহার অবদান অনস্বীকার্য।

(ক) বেকারী-বীমা : এই সময়ে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের বেকারী-বীমার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে এবং ১৯৫৩ সালে 'শিল্প-বিরোধ' আইনকে সংশোধিত করিয়া ৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানাতে ও খনিতে বেকার শ্রমিকদের সুবিধা দানের ব্যবস্থা হয়। ক্রমশ ইহার পরিধি আরও প্রসারিত করিয়া বাগিচা শ্রমিকদের (Plantation workers) ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই সকল সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র ছাঁটাই করা শ্রমিকদের এবং উৎপাদন বন্ধ থাকায় সাময়িকভাবে কর্মহীন শ্রমিকদের দেওয়া হইত।

সর্বশ্রেণীর বেকারী-বীমা দানের জন্য ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি "ওয়ার্কিং গ্রুপ" গঠন করেন। এই গ্রুপ বেকারী-বীমা পরিকল্পনা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়া বলেন শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষকেই বীমার প্রিমিয়াম দিতে হইবে। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে সক্রিয় সাহায্য ও তৎপরতার অভাব দেখা গেল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার একটি বেকারী সাহায্য তহবিল এর প্রস্তাব করিলেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এর প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট শিল্পের মালিকদের পক্ষ হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া এই তহবিল চালু রাখার প্রস্তাব হইল। কিন্তু মালিকদের বিরোধিতার জন্য শ্রমিকদের কল্যাণসাধনকারী এই প্রস্তাবটি সাময়িকভাবে স্থগিত রহিল।

১৯৬০ সালের কোম্পানী সংশোধনী বিল-এ সাব্যস্ত হয় যে কোনো কোম্পানী যদি ব্যবসায় বন্ধ করে তবে কোম্পানীর সম্পত্তি বেচিয়া প্রথমেই শ্রমিকদের পাওনা টাকা মিটাইতে হইবে।

(গ) কর্মচারী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন, ১৯৫২

কর্মচারী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন প্রথমে সিমেণ্ট, সিগারেট, ইঞ্জিনীয়ারিং, লৌহ ইস্পাত, কাগজ ও বস্ত্র শিল্প এই ছয়টি প্রধান শিল্পে, ৫০ জনের বেশি শ্রমিক যেখানে নিযুক্ত আছে, এইরূপ কারখানার শ্রমিকদিগের বাধ্যতামূলক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-এর সুবিধা দিল। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে মোট ৭০টি শিল্পে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। যে সমস্ত শিল্পের তিন বৎসর-কাল পূর্ণ হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা ৫০ জন এবং যে সমস্ত শিল্পের পাঁচ বৎসরকাল পূর্ণ হইয়াছে সেক্ষেত্রে ২০ হইতে ৫০ জনের মধ্যবর্তী শ্রমিক-সংখ্যা হইলেই তাহারা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনার মূল কথা হইল যে শ্রমিক এবং মালিক

এই উভয়পক্ষ হইতেই কিছু অংশ বাধ্যতামূলক ভাবে এই ফাণ্ডে জমা দিতে হইবে। যে সকল শ্রমিকেরা চাকুরীর এক বৎসরকাল পূর্ণ করিয়াছেন অথবা ২৪০ দিন কাজ করিয়াছেন এবং যাহাদের মূল বেতন মাসিক ৩০০ টাকার ঊর্ধ্বে নহে তাহারা এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত। এই আইনে ঠিক হয় যে শ্রমিকেরা তাহাদের মোট বেতনের শতকরা ৬১/৪ ভাগ (অর্থাৎ টাকায় এক আনা) এক হিসাবে জমা দিবেন এবং কর্তৃপক্ষও একই পরিমাণ জমা দিবেন। পরে অবশ্য ইহাকে ৮১/৩ ভাগ করিবার প্রস্তাব হয় এবং ১৯৬৩ সালে চারিটি বৃহৎ শিল্পে এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়।

শ্রমিকের ৫৫ বৎসর কার্যকাল পূর্ণ হইবার পর কর্মবিরতির সময়ে, অথবা অন্য কোনো কারণে যদি আগেই চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করে, তখন সে ঐ প্রাপ্য টাকা পাইবে। ১৯৬২ সালের শেষে দেখা গেল যে প্রায় ৩৪,৭০,০৩৮ জন শ্রমিক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা জমা দিয়াছিল এবং মোট টাকার পরিমাণ ছিল ৩৮৩.৪৬ কোটি। ১০৮.২৯ কোটি টাকা শ্রমিকদের ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের এই পরিকল্পনা সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে খুব সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহা উৎপাদনের কাজে শ্রমিকদের নূতনতর উৎসাহ দান করে এবং শিল্পে শান্তিরক্ষা করে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ক্রমান্বয়ে বহু নূতন শিল্প এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঘ) **কয়লা খনি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বোনাস পরিকল্পনা আইন**—১৯৪৮ সালে জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই আইন চালু হয়। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ১২২২টি কোলিয়ারী এই পরিকল্পনাভুক্ত হয়।

(ঙ) **প্রসূতিকালীন সাহায্য**—প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই প্রসূতিদিগের সাহায্য দানের জন্য আইন পাশ হইয়াছে। ১৯৬১ সালে মাতৃমঙ্গল আইন দ্বারা সকল শিল্পেই প্রসূতিকালীন সাহায্য দানের একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি ঠিক হইল।

(চ) **মেনন কমিটি রিপোর্ট :**

সামাজিক নিরাপত্তা সাধনের বিভিন্ন দিকগুলি লইয়া এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রচেষ্টা চলিয়াছে। ভি কে. কৃষ্ণমেননের সভাপতিত্বে যে 'স্টাডি গ্রুপ' গঠিত হইয়াছিল তাহারা ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে এককভাবে বিচার না করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য একটি রিপোর্ট পেশ করিলেন। একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বীমা পরিকল্পনা এই দুই বিষয়কে একত্রিত করিয়া পরিচালনার জন্য যেমন কমিটি সুপারিশ করিলেন। তাহারা আরও বলিলেন যে ইহার ফলে যে বাড়্তি ব্যয়ের চাপ আসিয়া পড়িবে সেই ব্যয়ভার-এর বোঝা যেন আর শ্রমিক বা মালিকদের ঘাড়ে চাপানো না হয়।

শ্রমিকদিগকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-এর পরিবর্তে পেনসন দিবার জন্য এই কমিটি সুপারিশ করে। শ্রমিকদিগের কার্যকাল শেষ হইবার পর তাহাদিগকে গ্র্যাচুইটি দিবার প্রস্তাব হয়—গ্র্যাচুইটির ব্যয়ভার মালিকপক্ষই বহন করিবেন বলা হয়। সামান্য গ্র্যাচুইটি দ্বারা শ্রমিকেরা তাহাদের সাময়িক প্রয়োজনগুলি মিটাইতে পারিবে এবং যথাসম্ভব বেশি পেন্সন তাহারা ভোগ করিবে। পেন্সন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনার সংহতি সাধনের জন্য কিছু বাড়্তি টাকার প্রয়োজন. কমিটি তাই সুপারিশ করিলেন যে, বাধ্যতামূলক দেয় হারকে বাড়াইয়া শতকরা ৬৪ ভাগ হইতে শতকরা ৮৩ করা হইল।

যেনন কমিটির প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি কার্যকরী করিলে সুফল পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহা একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সামগ্রিক সমাজ বীমা পরিকল্পনার সাথে সংহত কবিতে পারিলেই এই কার্যের প্রকৃত এবং বাস্তব রূপায়ন হইতে পারে।

(ছ) **গৃহনির্মাণ**—সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনায় শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের প্রশ্নটিও সমধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে গৃহ-নির্মাণেব প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর বস্তি পরিবেশ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা হ্রাস কবে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান, এইগুলির সহিত সমন্বয় রাখিয়া গৃহনির্মাণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের ন্যায় জনসংখ্যাবহুল দেশে যদি সত্য সত্যই কল্যাণ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হয় তবে গৃহনির্মাণের সমস্যাকে অবহেলা করা চলে না। প্রথম পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১৩'২৯ কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ৪৩,৮২১টি বাড়ি নির্মিত হয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ২২'৯৫ কোটি টাকা ও ৫৫ ৮২৯টি বাড়ি নির্মিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৯'৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে এবং ৭৩,০০০টি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। সরকারের আগ্রহ এবং সক্রিয় সাহায্য সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই, কারণ বেসরকারী উদ্যোগের মালিকেরা এই ব্যাপারে ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতেছেন। তাই বেসরকারী ক্ষেত্রে মালিক,

শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি 'যুক্ত গৃহনির্মাণ সংস্থা' গঠন করা উচিত।

গণতান্ত্রিক এবং শিল্পোন্নত ভারত গঠনের পথে সামাজিক নিরাপত্তার আশু প্রয়োজন। একটি অনুন্নত দেশ হইতে ভারতকে অতি দ্রুত স্বনির্ভরশীল এবং শিল্পসমৃদ্ধ স্তরে পরিণত করার জন্য পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলিতে বার বার বলা হইয়াছে। দেশ যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে শ্রমিক-কল্যাণ এবং শ্রমিকদের জীবনের সামাজিক নিরাপত্তা সাধনের দ্বারাই এই উদ্দীপনা সঞ্জীবিত হইতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করিতে হইলে আয় বৈষম্য দূর করিতেও হইবে। এই সামাজিক নিরাপত্তার প্রচেষ্টা সমূহ যে শুধু উৎপাদন বাড়াইতে সাহায্য করে তাহাই নহে, ইহা আয় বৈষম্য দূর করার কাজেও রাষ্ট্রের হাতে অন্যতম হাতিয়ার। আয়-বৈষম্য দূর করা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বাণিজ্যচক্র রোধ করিতেও সরকারকে সাহায্য করে।

উৎপাদনের গতিকে অব্যাহত রাখিয়া দেশের শিল্পায়ন এবং আয় বৈষম্য দূর করা—এই লক্ষ্যদ্বয়ের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে বিরোধ দেখা যায়। কারণ যত বেশি পরিমাণ অর্থ শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য ব্যয় হইবে রাষ্ট্র সেই পরিমাণ মূলধন-গঠনের সুযোগ হারাইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের গতি ব্যাহত হইবে। দেশে যখন মূলধনের ঘাটতি আছে, সেখানে শুধুমাত্র কল্যাণ এর কথা চিন্তা করিয়া শিল্পোৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সমীচীন নহে এইরূপ বলা চলে।

অবশ্য যদি আমরা উপলব্ধি করি যে উৎপাদনের যে বিরাট প্রচেষ্টা চলিয়াছে ইহাতে প্রধান অংশগ্রহণকারী হইল শ্রমিকেরা নিজেরাই, তবে আর এই আপাত-বিরোধ থাকে না। সমাজ যদি তাহাদের সামাজিক জীবনকে কিছুটা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তবেই তাহারা নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা ত্বরান্বিত করিতে পারে। সর্বোপরি, সামাজিক নিরাপত্তার এই কার্যসূচীগুলি প্রয়োজনমত ব্যবসায় মন্দাকে ঠেকাইতে পারে বলিয়া শ্রমিকেরা বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারীর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাই আজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা সাধন যে কোন উন্নয়নশীল দেশেরই

লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, বর্তমানে ভারত সরকার সকল কর্মচারীদেরই পেনসন্ দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ (Worker's participation in Management)

শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যে শ্রেণী-বিরোধ দেখা দিয়াছে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখনও তাহার অবসান হয় নাই। এইরূপ অনেক দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক দিকে, বিশেষত শিল্পপরিচালনার ক্ষেত্রে, গণতন্ত্রের প্রসার হয় নাই। কোন একটি শিল্পের পরিচালকমণ্ডলীতে মূলধনের মালিক এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি উভয়ে একত্রে বসিয়া পরিচালনার কাজ চালাইলে শিল্পপরিচালনার কাজ অনেকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতে পারে। ১৯১৭ সালে ইংলণ্ডে হুইট্‌লে কমিটি এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং মূলধন ও শ্রমিকের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে কিছুটা সমন্বয় সাধন করিয়া পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পকাঠামোর পুনর্গঠন সুপারিশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পরিচালনার কাজে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের মাত্রাও সর্বত্র সমান নয়। ইংলণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে শ্রমিকেরা অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্ত কমিটির (Joint Committees) মাধ্যমে, এবং এই সকল কমিটির কেবলমাত্র আলোচনা করা ও উপদেশ দিবার ক্ষমতা আছে, কোনরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা কাহারও থাকে না। অপরপক্ষে, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানীতে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার পদ্ধতি আইনসঙ্গতভাবে গৃহীত, ফ্রান্স ও জার্মানীতে পরিচালকমণ্ডলীতেও শ্রমিকদের প্রতিনিধি গৃহীত হয়। যুগোস্লাভিয়া আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেখানে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার সম্পূর্ণভাবে সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরাই বহন করেন, তাঁহারাই কাউন্সিল এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

অন্যান্য দেশে কি অবস্থা

১৯৪৭ সালে শিল্পবিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে এই বিষয়ে ভারতে কোনরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। এই আইনে প্রতি কারখানায় শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া এক একটি ওয়ার্কস্ কমিটি গঠন করার কথা বলা হইল। প্রধানত, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্পে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করাই

এই ওয়ার্কস্ কমিটির কাজ। অবশ্য এই সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের ব্যাপারেও কমিটিগুলি সফলকাম হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ের সূত্রপাত

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইল। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন নূতন দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের ভাষায় বলা চলে, "কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজ কেবলমাত্র আর্থিক লাভের প্রেরণার ভিত্তিতে গঠিত থাকে না, ইহার ভিত্তি হইল সমাজ-সেবার আদর্শ এবং সমাজের পক্ষ হইতে এইরূপ সেবার স্বীকৃতি। এই বিষয়ে তাই শ্রমিকের মনে এমন অনুভূতি আনা দরকার যে সে তাহার নিজের পথেই একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করিতেছে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হইল শিল্পে গণতন্ত্রের উদ্ভব।" পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য পরিকল্পনার কাজে শ্রমিকদের ক্রমশ বেশি পরিমাণে অংশ গ্রহণের কথা কমিশন বলিয়াছিলেন। ইহার অনেক সুফলের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল: (ক) শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি, শ্রমিক শ্রেণী এবং সমাজ, সকলের স্বার্থেই ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে; (খ) শিল্পটির কাজকর্ম এবং উৎপাদন-পদ্ধতিতে নিজেদের ভূমিকা কি, শ্রমিকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে; এবং (গ) শ্রমিকেরা আত্মপ্রকাশের প্রেরণার পথ খুঁজিয়া পাইবে, ফলে শিল্পক্ষেত্রে শান্তি উন্নততর সম্পর্ক এবং অধিকতর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। পরিচালক, সুদক্ষ কারিগর বা টেকনিশিয়ান এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া পরিচালনা কাউন্সিল (Management Council) গঠিত হইলে তাহার মাধ্যমে এই অংশগ্রহণ সম্ভবপর হইবে।

এই বিষয়টি খুবই জটিল এবং বহুপ্রকার স্বার্থের সহিত ইহা জড়িত। ফলে ইহার দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অধিকতর তথ্য ও জ্ঞান থাকা দরকার। ইহা বিবেচনা করিয়া ১৯৫৫ সালে একটি স্টাডি টীম গঠিত হইল। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিরা মিলিয়া গঠিত এই ষ্টাডি টীম পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি পরিভ্রমণের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল: (ক) বাছাই-করা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে যৌথ পরিচালনা কাউন্সিল গঠন করা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা উচিত। তবে এইরূপ আইন কেবলমাত্র কাঠামোটি রচনা করিয়া

দিবে, খুঁটিনাটি বিষয়গুলি পরস্পর আলোচনার মধ্য দিয়া স্থির হওয়া প্রয়োজন। (খ) কাউন্সিলগুলির প্রধান কাজ হওয়া উচিত শ্রমিক-মালিক আলাপ-আলোচনার সূত্র গড়িয়া তোলা, কাজের এবং জীবনযাপনের অবস্থা উন্নত করা. (ঘ) উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো, চুক্তি এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে সুপারিশ করা এবং উহাদের কার্যকরী করা। আরও কয়েকটি বিষয়ে, যেমন, স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারগুলিতে পরিবর্তন, শ্রমিক-ছাঁটাই, আধুনিকীকরণ, কাজ বন্ধ রাখা, কাজ কমানো, নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করা—প্রভৃতি বিষয়েও কাউন্সিলের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। (গ) প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ আর্থিক অবস্থা, বাজারের হালচাল, উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিচালনা, সাংগঠনিক কাঠামো ও পরিচালনা, উৎপাদনের ও কাজকর্মের পদ্ধতি, বাৎসরিক ব্যালান্সশীট ও লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলপত্র ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর লওয়ার অধিকারও এই যুক্ত কাউন্সিলগুলির হাতে দেওয়া যাইতে পারে। (ঙ) যুক্ত পরিচালনা যেন উপর হইতে চাপানো বা কৃত্রিম ধরনের না হয়, নিজস্ব তাগিদে প্রতিষ্ঠানটির স্বাভাবিক কাজকর্মের প্রয়োজনেই উহার অঙ্গ-স্বরূপে (built-in) গড়িয়া উঠে। (চ) মজুরি, বোনাস এবং ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, কারণ উহা শ্রমিক সংঘের কাজের সীমানাভুক্ত ; (ছ) এই কাউন্সিলগুলির উপর শ্রমিক ও মালিক উভয় শ্রেণীর নির্ভরশীলতা বাড়াইবার জন্য কোন কোন বিষয়ে পরিচালনার পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন, যেমন শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি। (ঝ) যুক্ত পরিকল্পনা কাউন্সিলের পাশাপাশি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল শ্রমিক সংঘ গড়িয়া তোলা দরকার এবং শ্রমিক সংঘ হইতেই ক্রমে ক্রমে বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্ বা পরিচালকমণ্ডলীতে শ্রমিকপ্রতিনিধি গ্রহণ করার নীতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো থাকিলে একাধিক কাউন্সিল গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

স্টাডি টীমের সুপারিশসমূহ

১৯৫৭ সালে ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন (Indian Labour Conference) এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেয় এবং একটি সাব-কমিটি গঠন করে। এই সাব কমিটি সুপারিশ করে যে, ব্যক্তিক্ষেত্রে তুলাবস্ত্র, পাট, এন্‌জিয়ারিং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, তামাক, কাগজ, চিনি, সিমেন্ট, খনি ও বাগিচা প্রভৃতি

অগ্রগতি কতটা

শিল্পে ইহা বর্তমানে শুরু হইতে পারে। সরকারী ক্ষেত্রে রেলওয়ে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ডাক ও তার, বন্দর, জাহাজ নির্মাণ, পরিবহন, খনি, মুদ্রণ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে ইহার প্রবর্তন সুপারিশ করা হয়। একটি চুক্তির খসড়াও সাব-কমিটি প্রস্তুত করিয়া দেয়। ১৯৫৮ সালে শ্রমিক-পরিচালক সহযোগিতা সেমিনার (Labour-Management Co-operation Seminar) এই বিষয়ে আরও বিভিন্ন সুপারিশ করে। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে এই বিষয়ে দ্বিতীয় সেমিনার বসে। এই সেমিনারের আলোচনায় দেখা যায় যে, কিছুটা আশ্চর্যের বিষয় এবং অস্বস্তিজনক মনে হইলেও সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় বে-সরকারী ক্ষেত্রেই ইহা অধিকতর সাফল্য লাভ করিতেছে। সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ২৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এইরূপ যুক্ত পরিচালনা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে যে, আরও অধিক সংখ্যক শিল্পে ইহার প্রসার ঘটানো দরকার, যাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা দেশের শিল্প-ব্যবস্থার স্বাভাবিক অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়ে। কমিশনের ভাষায় বলা চলে যে, "As it develops, worker's participation may become a highly significant step in the adaptation of the private sector to fit into the frame-work of a socialist order." কমিশন আশা করেন যে, এই ব্যবস্থা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ কমাইয়া আনিবে, পরস্পর বোঝাপড়া উন্নত করিয়া তুলিবে, এবং উভয় পক্ষেই, শিল্প ও মজুর সম্পর্কে ধারণাগুলি অধিকতর বাস্তবমুখী হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা অসাফল্য কেবলমাত্র পরিচালকদের দায়িত্ব নহে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশের অর্থ কাঠামোর শান্তিপূর্ণ ক্রম-বিবর্তনের জন্য পরিচালনার কাজে শ্রমিকের অংশগ্রহণকে একটি মূলনীতি ও অবশ্য প্রয়োজনীয় পথ বলিয়া গণ্য করা দরকার। কালক্রমে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতেই পরিচালকবৃন্দ সৃষ্টি হইবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রধান বিষয় হইল এইরূপ সামাজিক চলনশীলতা (social mobility)—ইহা এই পথেই গড়িয়া উঠিবে।*

তৃতীয় পরিকল্পনায় কি বলা হইয়াছে

* "It can serve to bridge the gulf between labour and management, create better mutual understanding and facilitate the adoption, on both sides, of an objective approach towards the problems of industry and the workers. The success or failure of an undertaking is not the concern of

শ্রমিকদের মুনাফার অংশ প্রদান ও বোনাসের সমস্যা (Profit-sharing and Bonus problems in Indian Industries):

কোন ফার্মের মালিক পক্ষ শ্রমিকদের মজুরির পরেও মুনাফার কিছু অংশ প্রদান করিলে উহাকে মুনাফার অংশ প্রদান বা Profit sharing বলে। শ্রমিক পক্ষ এবং মালিক পক্ষের মধ্যে সম্মতি ও চুক্তির ভিত্তিতে এইরূপ মুনাফার অংশ প্রদান চলিতে থাকে। বোনাস ইহা হইতে পৃথক। মালিক বাৎসরিক মোট মুনাফার কি অংশ বোনাস হিসাবে শ্রমিকদের দিবে তাহা মালিক পক্ষের ইচ্ছা ও মনোভাবের উপর নির্ভর করে। বোনাস সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা বা চুক্তি থাকে না। কিন্তু মুনাফার অংশপ্রদান ব্যবস্থায় মালিক পক্ষ একতরফা সিদ্ধান্ত লইতে পারে না, এবং মুনাফার যে-অনুপাত শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাহাতেও হঠাৎ কোন পবিবর্তন আসে ন।।

ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে মুনাফাব অংশপ্রদান ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া উচিত, এই দাবি দীর্ঘকাল যাবৎ উপেক্ষিত হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পরে একটি কমিটি গঠন কবা হয়, উহার নাম ছিল মুনাফার অংশপ্রদান কমিটি। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের প্রধান দিকগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) কমিটি তিন দিক হইতে মুনাফাব অংশপ্রদান ব্যবস্থাকে আলোচনা করিয়াছেন : (ক) ইহাতে উৎপাদনে কিরূপ উৎসাহ সঞ্চার হয ; (খ) ইহাতে শিল্পে শান্তি কতটা বক্ষা পায় ; এবং (গ) পরিচালনাব কাজে শ্রমিকের অংশ গ্রহণের পথে একটি প্রয়োজনীয় স্তর হিসাবে মুনাফার অংশপ্রদান কতটা সাহায্য কবে। (২) কমিটি সিদ্ধান্তে আসেন যে, মোট আদায়ীকৃত মূলধনের উপর ৬% হারে প্রতিদান পাইলে উহাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হইবে। (৩) উহার উপরে উদ্বৃত্ত মুনাফার শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিত বলিয়া কমিটি মনে করেন। প্রত্যেক শ্রমিকের অংশ হিসাব করার সময়ে উহার পূর্ববর্তী ১২ মাসের আযের অনুপাত (উহা হইতে দ্রব্যমূল্যভাতা

management alone. For the peaceful evolution of the economic system on a democratic basis, it is essential that worker's participation in management should be accepted as a fundamental principle and an urgent need. In course of time, management cadres should arise out of the working class itself. This will greatly help to promote social mobility which is an important ingredient of a socialist system." *Third Five Year Plan*, P. 254.

এবং বোনাস বাদ দিয়া) হিসাব করা উচিত। যদি কোনো শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ তাহার মূল বেতনের ২৫%-এর বেশি হয়, তবে এই বেশি পরিমাণটুকু কাটিয়া হয় তাহার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে অথবা পরে ফেরৎ দেওয়া হইবে এমন কোন তহবিল সৃষ্টি করা হইবে। (৪) ভারতের সকল শিল্পে এখনই এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বলিয়া কমিটি ভারতের সংগঠিত ছয়টি শিল্পে পাঁচ বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ইহা শুরু করিতে বলেন। এই ছয়টি শিল্প হইল: তুলাবস্ত্র, পাট, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, সিগারেট উৎপাদন ও রবারের টায়ার উৎপাদন।

মুনাফার অংশপ্রদান কমিটির এই সুপারিশসমূহ এখনও ভারতে গৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন বলিয়াছেন যে, এই বিষয়ে আরও চিন্তা করা দরকার। তাহার পূর্বে বোনাস প্রদানের নীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৬১ সালে ভারত সরকার একটি বোনাস কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়েই মনে করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বোনাস মজুরির মধ্যে ধরা যাইবে, কারণ তাহা হইলেই ন্যায্য মজুরির লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিরা কমপক্ষে ১ মাস এবং বেশি পক্ষে ৬ মাসের মাহিনা বোনাস হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। মালিক পক্ষ বলেন যে, মোট মুনাফা হইতে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ, মজুত তহবিল বাদ দিয়া বোনাস হিসাব করা উচিত। শ্রমিক পক্ষের কোন প্রতিনিধি মালিকদের এই বক্তব্য মানিয়া লন নাই। এই কমিশনের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনীতি (Labour Policy in the Third plan):

অপূর্ণোন্নত দেশের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এক প্রকার দুষ্টচক্রের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় শ্রমিকদের আয় কম, তাই তাহাদের সর্বদা মনে হয় তাহারা শোষিত। শোষিত হওয়ার এই অনুভূতির দরুন তাহাদের মনোবল হ্রাস পায়, কাজে উৎসাহ কমিয়া আসে, কাজের উপর শ্রদ্ধা থাকে না, উৎপাদনের পরিমাণ কমে; ফলে মালিক শ্রমিকদের উপর আরও চাপ বাড়াইয়া দেয়, নিয়মকানুন ও কাজের ভার বাড়াইয়া চলে। আরও অসন্তোষ বাড়ে, শ্রমিকদের মন আরও বিষাইয়া উঠে। এইরূপ এক ধরনের দুষ্টচক্রের মধ্যে উৎপাদন, জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মানে উর্ধ্বগতি সম্ভব হয় না।

শ্রমিকদের মানসিক অবস্থা কাজের প্রতিকূল

জীবনযাত্রার মান যত কমে, স্বাস্থ্য ও শক্তি তত হ্রাস পায়, ধর্মঘট, ধীরগতি-কাজ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কাজ পণ্ড করা—সকল কিছু বাড়িতে থাকে। কেবল উৎপাদন-ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায় না।

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হইত যদি আমরা ভারতে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মত উন্নয়নের ধারা বা ক্লাসিকাল পথ খুঁজিয়া পাইতাম। অতলান্তিক মহাসমুদ্রের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উন্নতির মূলে ছিল প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয়, যাহার উৎস ছিল দাস ব্যবসায়, ঔপনিবেশিক শোষণ—এবং অন্যায় ব্যবসায়-বাণিজ্য। আজিকার পৃথিবীতে আমাদের সম্মুখে সেই পথ উন্মুক্ত নাই। কৃষি হইতে হাল্কা শিল্প, উহা হইতে বৃহৎ শিল্প—এই পথ অনুসরণ করিয়া পশ্চিমী দেশগুলি উন্নত হইয়াছে, তাহাদের শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন কয়েক শতাব্দী তাহারা সময়ক্ষেপ করিতে পারিয়াছে। আমরা বর্তমানে সেই পথ অনুসরণ করিতেও পারি না। বৃহৎ ও মূলধনী শিল্পের প্রসারই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি, উহার প্রসার ঘটানোই আমাদের সম্মুখে বড় কথা, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি তাই আমরা কালের হাতে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না, বর্তমানেই ইহা বাড়ানো দরকার। দেশে মূলধন স্বল্প থাকায় আমাদের পরিকল্পনাগুলির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে শ্রমের উপর, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর, তাহার শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহারের উপযোগী মানসিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তোলার উপর। এই কথা মনে রাখিয়া আমাদের শ্রমনীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

উৎপাদন-ক্ষমতা না বাড়াইলে কোন মতেই চলিবে না

ভারতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে আমাদের দেশের শ্রমনীতি ক্রমশ রূপায়িত হইতেছে। ১৯৫৮ সালে সরকার, শ্রমিক সংঘ এবং মালিকপক্ষ—এই তিন দলের প্রতিনিধিরা একত্রে বসিয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি শৃংখলা-বিধি (code of discipline) নির্ণয় করিয়াছেন। বিভিন্ন স্তরে এই ত্রিদলীয় প্রতিনিধিরা একত্র বসিয়া বিভিন্ন নীতি, নিয়মকানুন ও আচরণ-বিধি তৈয়ার করিতেছেন। এই বিষয়ে সরকারী আইনকানুন প্রণয়নের পিছনে মোটামুটি এই সকল পক্ষের সম্মতি থাকে, ফলে ইহা জাতীয় নীতির চরিত্র ও শক্তি লাভ করে এবং স্বেচ্ছামূলক বলিয়া

শ্রমিক, মালিক ও সরকার মিলিয়া গঠিত শৃংখলা-বিধি

সকলে উহা মানিয়া লয়। নীতি নির্ধারণ ও উহা কার্যকরী করার জন্য যুক্ত কমিটিগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপ ত্রিপাক্ষিক সংগঠনগুলির সর্বোচ্চে আছে ভারতীয় শ্রম সম্মেলন (Indian Labour Conference)। এই শৃংখলা-বিধির মূল কথা হইল শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতা (constructive cooperation) গড়িয়া তোলা ; ধর্মঘট, ধীরগতি কাজ প্রভৃতি বন্ধ করা ; বিবাদ-বিসম্বাদ ও মামলা-মোকদ্দমা কমান। এই শৃংখলা-বিধির কোন আইনগত ভিত্তি নাই, সকল পক্ষের স্বেচ্ছামূলক সম্মতিই ইহার সাফল্যের শর্তরূপ। এই শৃংখলা-বিধি গ্রহণের ফলে শ্রমদিবসের অপচয় ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও এই শৃংখলা-বিধি উপযুক্তভাবেই কাজ করিবে, ইহা সকলে আশা করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে শ্রমনীতি সফল হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় উহাদের প্রসার করা হইবে। উহার প্রথম হইল শ্রমিক-মালিকের যুক্ত পরিচালনা এবং দ্বিতীয় হইল শ্রমিকের শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রসার। উহা ব্যতীত, মজুরির (wage policy) ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচন-মূলক মজুরি সংশোধন (selective wage revision) নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সকল স্তরের মজুরি একেবারে স্থির থাকিবে তাহা নহে, আবার সকল স্তরের মজুরিতে সাধারণ বৃদ্ধি হইবে তাহাও নহে। সালিশী-পদ্ধতির উপর জোর কমাইয়া দিয়া ত্রিপাক্ষিক মজুরি বোর্ডে আলাপ-আলোচনার উপর সরকার ক্রমশ জোর দিতেছেন। বস্ত্র চিনি ও পাট শিল্পে এইরূপ মজুরি-বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অন্যান্য শিল্পে উহার প্রসার ঘটানো হইবে বলা হইতেছে। একটি বোনাস কমিশন নিয়োজিত হইয়াছিল সম্প্রতি উহা রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনীতির নানাদিক

আমাদের দেশে শ্রমনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল শ্রমিক কল্যাণ। স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ, সুন্দর বাসগৃহ, উপযুক্ত চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবস্থা—এই সকল সম্পর্কে বহু আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। শ্রমিকের বাসগৃহ সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনাতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে কর্মচারী-রাষ্ট্রীয়-বীমা-স্কীম (Employees State Insurance Scheme) বর্তমানে ১৫ লক্ষ শ্রমিককে সাহায্য করিতেছে। ইহার প্রসার ঘটানো হইবে এবং এই বীমার মধ্যে শ্রমিক-কল্যাণের পরিমাণ

বাড়ানো হইবে। কর্মচারী প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড স্কীম বর্তমানে ২৬ লক্ষ শ্রমিককে সাহায্য করিতেছে, ইহারও প্রসার ঘটানো হইবে। ২০ বা ততোধিক ব্যক্তি কাজ করে এইরূপ প্রতিষ্ঠানেও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আইন প্রসারের কথা ঘোষিত হইয়াছে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে আরও প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। একটি সরকারী স্টাডি টীম সুপারিশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একত্রে মিলাইয়া একটি সামগ্রিক স্কীম গঠন করা হউক। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের হারও ৬১/৪% হইতে ৮১/৩% করার কথা ঘোষিত হইয়াছে। একটি টেকনিকাল কমিটি বর্তমানে উহা আলোচনা করিতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, শ্রমনীতি রচনার সময়ে দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান ও দীর্ঘকালীন লক্ষ্য সফল করার কথা চিন্তা করিতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এতটা দ্রুত হওয়া দরকার যাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছানো যায় এবং দেশের জনসাধারণ উন্নয়নশীল জীবনযাত্রার মান লাভ করিতে পারে। অগ্রগতির ফল সকলে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া লইবে এবং যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গঠিত হইবে তাহা যেন অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের উপযোগী হয়। এই লক্ষ্য কার্যকরী করার বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাহাদের দায়িত্বও বেশি; শিল্পপ্রসারের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনের গতিবেগও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সরকারী ক্ষেত্রের বিপুল প্রসার শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখে কাজকর্মের রূপে গুণগত পরিবর্তন আনিয়া দিবে এবং সামাজিক কাঠামোর সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ সহজতর করিয়া তুলিবে।

শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলাইবে

শ্রমনীতি রচনার পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য বহুদূরপ্রসারী। "অর্থনৈতিক কাজকর্মকে কেবলমাত্র উৎপাদন ও প্রতিদানের হিসাবে আর দেখা যায় না; ইহার প্রধান পরীক্ষা হইল কার্যে নিযুক্ত সকলের কল্যাণ, মানুষের ব্যক্তিসত্তার উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি, এবং সমগ্র জনসমষ্টির সেবা ও সুখ। অর্থনৈতিক কাজকর্ম হইতে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহা সামাজিক সামগ্রী, ইহার উপর মালিক বা শ্রমিক কোন পক্ষের একক দাবি থাকিতে পারে না। অধিকতর উন্নয়ন এবং সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থ, বিশেষত ইহার সকল সদস্যের মূল অভাবগুলি মিটাইবার প্রয়োজন মানিয়া লইয়া তাহার পরে এই উদ্বৃত্তের বণ্টন করা উচিত। প্রত্যেকে নিজ শ্রম অনুসারে বিভিন্ন ধরনের

২৩

বেকারি ও কর্মসংস্থান

Unemployment and Employment

ভারতে বিভিন্ন রূপ বেকারি ও উহার কারণ (Different types of unemployment and their causes):

বর্তমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও কোন ব্যক্তি যদি শ্রম বিক্রয় করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে বেকার বলা যায় এবং এইরূপ অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিযোগ বলা চলে। এইরূপ বেকারিকে অনিচ্ছামূলক বেকারি (Involuntary unemployment) বলে। দেশে এইরূপ অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকিলে সমাজে পূর্ণকর্ম-সংস্থান বা পূর্ণনিযোগ বজায় আছে বলা হয়। এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে এবং বিভিন্ন ধরনের বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে। ভারতেও বিভিন্ন ধরনের বেকারি দেখিতে পাওয়া যায়।

বেকারি কাহাকে বলে

প্রথম ধরনের বেকারির নাম কাঠামোজনিত বেকারি বা যন্ত্রজনিত বেকারি (Structural or Technological unemployment)। নূতন উৎপাদন-সংগঠন, নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি, মূলধন-প্রগাঢ় নূতন যন্ত্রের প্রচলন, নূতন দ্রব্যের আবিষ্কারে পুরানো দ্রব্যের উৎপাদনে বিপুল হ্রাস, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদনকেন্দ্র অপসারণ, পুরাতন বা প্রাচীন শিল্প লোপ পাওয়া—প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পারে ও বেকারি সৃষ্টি হইতে পারে। উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে নূতন যন্ত্রের, দ্রব্যের বা উৎপাদন-পদ্ধতির প্রচলনে এইরূপ বেকারি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু যদি মূলধন গঠন ও উন্নয়নের হার দ্রুত থাকে তবে এইরূপ বেকারেরা অতি সত্বর অন্যত্র নিযুক্ত হইতে পারে। ভারতে উন্নয়নের হার দ্রুত নয়, তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এই বেকারদের অন্যত্র নিয়োগ করার

যন্ত্রজনিত বেকারি ভারতে দেখা দিতেছে কেন

মত পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয় নাই। এই কারণে শিল্প-প্রধান পরিকল্পনার যুগেও শিল্পদক্ষ একদল শ্রমিক বেকার থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও মরসুমী বেকারি (Seasonal unemployment) দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক কাজে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়, কিন্তু বৎসরের অন্য কোন সময়ে তাহাদের কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারখানা, ধানকল, কৃষিকার্য, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি স্থানে)। সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো থাকে। এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামোজনিত বেকারি বা মরসুমী বেকারি বলা হয়। প্রধানত, কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রে এইরূপ বেকারি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া হয। জমিতে সারা বৎসর জল না পাওয়া, মিশ্র চাষ প্রবর্তিত না হওয়া, গ্রামাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা না করা এবং বিভিন্নমুখী জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত না হওয়ার ফলে এইরূপ বেকারি দূর হইতেছে না।

মরসুমী বেকারি ভারতে আছে এবং কেন দূর হইতেছে না

তৃতীয়ত, সকল সমাজেই অর্থনৈতিক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক গতিশীলতার ত্রুটিবিচ্যুতির দরুন সাময়িকভাবে কিছু ব্যক্তি কর্মচ্যুত হন। এইরূপ বেকারিকে বিঘ্নঘটিত বেকারি (Frictional unemployment) বলে। শ্রমিকের বাজারে একচেটিয়ার প্রভাব হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে, শ্রমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের সুযোগসুবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনে হঠাৎ পুনঃসংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া যাইবার ফলে এবং কাঁচামালের সাময়িক অভাবের জন্য যে বেকারি দেখা দেয়, তাহাই বিঘ্নঘটিত বেকারি। উন্নত বা অপূর্ণোন্নত সকল দেশেই এইরূপ বেকারি থাকিতে পারে, ভারতেও আছে। তবে সমাজতান্ত্রিক দেশে এইরূপ বেকারদের দ্রুত অন্যত্র নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। ভারতে এখনও পর্যন্ত এই সকল ব্যবস্থা নাই।

ভারতে বিঘ্নজনিত বেকারির রূপ

চতুর্থত, অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও প্রচ্ছন্ন বেকারি

(Disguised unemployment) দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায়, শ্রমিকেরা এমন কাজে নিযুক্ত আছে যে তাহাদের শ্রমশক্তি, নৈপুণ্য, কাজের সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না, ইহার ফলে তাহার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকিলেও আয় বাড়ান সম্ভবপর হয় না। এইরূপ অবস্থাকে মিসেস্ রবিনসন্ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন। যেমন, ভারতের গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ চাষীই প্রচ্ছন্ন বেকার, অন্য কোথাও কাজে নিযুক্ত হইবার সুযোগ নাই, তাই কম আয় হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন ৫ বিঘা জমি ৩ ভাই মিলিয়া সারা বৎসর ধরিয়া চাষ করিতেছে)। ইহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা শূন্য, উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে ইহাদের একজনকে অপসারণ করা হইলে মোট উৎপাদন কমে না। এইরূপ অবস্থার কারণ হইল দেশে মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগের অভাব অর্থাৎ দ্রুত শিল্পপ্রসার না হওয়া। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অনমনীয় কর্মসংস্থান কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।

ভারতে প্রচ্ছন্ন বেকারির রূপ

এই প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারি আর ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ সে বেকার; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব, কারণ তাহার আয় কম। কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার, তাই তাহার দারিদ্র্য। চাকুরি ও বেকারিতে পার্থক্যের সীমারেখা টানা আমাদের দেশে বিশেষ কষ্টকর।

পঞ্চমত, অপরিকল্পিত ব্যক্তিপ্রধান অর্থনৈতিক কাঠামোতে মোটামুটি নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তর বাণিজ্য-চক্র দেখা দেয়। বাণিজ্য-চক্রের সংকটের যুগে সমাজে সামগ্রিক ভাবে আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। এই ধরনের বেকারিকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারি বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা-সমৃদ্ধি শুরু হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্য-চক্রজনিত বেকারি

ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে কৃষি-উৎপাদনের উপরই নির্ভর করে। তবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত আমাদের যোগসূত্র বেশি থাকায় তাহাদের সংকট বৈদেশিক বাণিজ্যের

মারফত আমাদের দেশেও আসিয়া পৌঁছায়। যেমন ১৯৫৮ সালে পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সংকট দেখা দেয় এবং সেই সংকটের প্রভাবে ভারতের শিল্পোৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছিল। তাহাতে বেকারিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সেচেঞ্জের হিসাবে দেখা যায়, তাহাদের নিকট চাকুরি প্রার্থীর সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ছিল ৭·৫৮ লক্ষ; ১৯৫৭ সালে ৯·২১ লক্ষ এবং ১৯৫৮ সালে (সেপ্টেম্বরে) ইহার পরিমাণ ছিল ১১·৫৩ লক্ষ। ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলির সহিত ব্যবসায়গত নির্ভরশীলতা; আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উপর বিদেশীদের কর্তৃত্ব; এবং দেশে ব্যক্তিগত মুনাফা-ভিত্তিতে বেসরকারী শিল্প-ক্ষেত্রের প্রসার—এই তিন কারণে এইরূপ বেকারি ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশেও দেখা যাইতেছে।

তিন কারণে ভারতেও এইরূপ বেকারি দেখা দিতেছে

ষষ্ঠত, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কার্যকরী চাহিদা (effective demand) কম থাকায় বেকারি দেখা দেয়। এইরূপ সমাজে মোট ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় এত কম যে, সকল শ্রমিকের জন্য চাহিদা সৃষ্টি হইতে পারে না। সমাজে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয় ততটা বাড়ে না. এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ এমন অবস্থায় আসিয়াছে যখন বিনিয়োগ বাড়াইবার সুযোগও আর বেশি পাওয়া যাইতেছে না। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে মোট কর্মসংস্থান ও আয় আরও কমিয়া যাইবে, সমাজে ভোগ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। ফলে নূতন যন্ত্রপাতি উৎপাদনে বিনিয়োগও কমাইতে হইবে। মূলধনের প্রতি দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular stagnation) আসিয়া গিয়াছে, তাই ধনতান্ত্রিক দেশে বেকারি উহাদের কাঠামোতে দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে পরিগণিত হইতেছে।

পশ্চিমী বেকারির রূপ কি

অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশসমূহের ন্যায় ভারতেও এইরূপ বেকারি দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ হইল ভারতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেসরকারী মালি-কানায় শিল্পপ্রসার এবং দ্রুত মূলধন গঠন করিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্পপ্রসার না করা। ধনিকেরা মুনাফা না পাইলে উৎপাদনে বিনিয়োগ করিবে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনিয়োগ করিয়া একই সঙ্গে কর্মসংস্থান, আয় ও দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাব নাই, এখনই মূলধনের জড়ত্ব আসিয়াছে

বিনিয়োগ ও কার্যকরী চাহিদা একই সূত্রে গাঁথা—ইহারা কেন বাড়িতেছে না

বলিয়া মনে করা চলে না। কিন্তু সমাজে মালিকানা-বৈষম্যের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় নাই, ভূমি সংস্কার করা হয় নাই এবং শিল্পক্ষেত্রে জাতীয়করণ ঘটে নাই। তাই যাহাদের ভোগপ্রবণতা কম, তাহাদেরই হাতে অধিক আয় সঞ্চিত হইতেছে, কার্যকরী চাহিদা কিরূপে বৃদ্ধি পাইবে? কার্যকরী চাহিদা এবং বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য আয়বৈষম্য অল্প কিছুটা হ্রাস করিলেও চলে না, কারণ ভবিষ্যতে আবার বিভিন্ন আয়স্তরে পার্থক্য ও দূরত্ব বাড়িতে থাকিবে। ইহার জন্য দরকার আয়-বৈষম্যের মূল ভিত্তিকে অপসারণ করা—অর্থাৎ ভূমি-সংস্কার এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের জাতীয়করণ।

সর্বোপরি, ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারি দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুল, কলেজ, কল-কারখানা, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতিতে কর্মসংস্থান প্রসারেব হার কম। উহার তুলনায় উচ্চ-শিক্ষিত লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির হার বেশি বলিয়াই এইরূপ বেকারির উদ্ভব হয়। মূলধন-গঠন ও উহার সর্বোত্তম বিনিয়োগ বাড়ানোই অর্থনৈতিক প্রসারের মূল কথা—উহার তাগিদে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজকর্ম ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশ গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইরূপে তৃতীয় স্তরের জীবিকাক্ষেত্রের (Tertiary sector) প্রসার ঘটে। কিন্তু ভারতে মূলধন গঠনের বেগ কম হওয়ায় উহাব উপযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া শিক্ষার ধরন এমন রহিয়া গিয়াছে যে, তাহা অধিকতর মূলধন-গঠন বা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রসারকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারিতেছে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও উহাদের পরিমাণও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়।

মূলধন-গঠনই ভিত্তি—উহারই উর্ধ্ব-কাঠামোতে শিক্ষিত ব্যক্তির চাকরি হয়

বেকারি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Unemployment and the Five year plans)

ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যা সমাধানের উপব পৃথকভাবে কোন নজর দেওয়া হয় নাই এবং এইরূপ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যও রাখা হয় নাই।* আশা করা হইয়াছিল যে, বিনিয়োগ বাড়িবার সময়

* জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলিয়াছেন, "It perhaps appears strange that an under-developed economy, in which there is a shortage of goods and services, should at the same time have insufficient employment opportunities, resulting in a surplus labour force. The consequent social and economic injury cannot be exaggerated."

নির্মাণ কার্যের জন্যই বেকারি হ্রাস পাইবে এবং তাহার পর বিভিন্ন কলকারখানা চালু হইলে ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলে স্বভাবতই কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবমতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর দরুন ৫৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান ঘটিবে এবং আরও ৩৫ লক্ষ লোকের আংশিক কর্মসংস্থান ঘটিবে (part-time employment) হইবে। কিন্তু ইহাতে সমস্যার কিছুমাত্র উপশম হইবে না, কারণ বেকার ও আধা-বেকার ধরা হইয়াছিল ১ কোটি ৬৫ লক্ষ। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশে বেকারি দূর করা দীর্ঘকালীন সমস্যার বিষয় ....সর্বশেষ বিশ্লেষণে কর্মসংস্থান বাড়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনুযায়ী।"*

প্রথম পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না

প্রথম পরিকল্পনা শুরু হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই বেকারি দ্রুত বৃদ্ধি পাইল এবং ইহার সমাধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে স্বল্পকালীন কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইল। কমিশন ১১ ধারার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করিলেন। এই কর্মসূচীতে ছিল: (১) যেখানে অতিরিক্ত নির্মাণ-কার্য চলিতেছে সেখানে কাজ করা ও শিক্ষা পাইবার উপযোগী কেন্দ্র গড়িয়া তোলা; (২) ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যক্তি বা সমবায় সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করা; (৩) রাজ্য-সরকারসমূহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে তাহাদের উৎসাহ দেওয়া; (৪) বর্তমানে এই সকল কাজের যে-অংশে লোকাভাব দেখা দিতেছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা; (৫) গ্রামাঞ্চলে এক একটি শিক্ষক লইয়া বিদ্যালয় এবং শহরাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা; (৬) গ্রামাঞ্চলে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার প্রসার; (৭) পথ নির্মাণ ও পরিবহনের উন্নতি; (৮) বেসরকারী গৃহ নির্মাণ কার্যে উৎসাহ দান; (৯) শহরাঞ্চলে বস্তি উন্নয়ন ও নিম্ন আয়-বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ

১১ ধারা কর্মসূচী গ্রহণ

* "The elimination of enemployment in a underdeveloped economy is by its nature a somewhat long term problem.........Expansion of employment opportunities is, in the last analysis, a function cf the rate at which national for a particulr period has to be viewed as part of a bigger programme on an accelerated rate."

পরিকল্পনা গ্রহণ ; (১০) উদ্বাস্তু বসতিগুলিকে পরিকল্পিতভাবে সাহায্য করা ; এবং (১১) বেসরকারী মূলধনে শক্তি (power) উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচীকে উৎসাহ দেওয়া। এই সকল নূতন কার্যসূচী সফল করার জন্য ১৫০ কোটি টাকা হইতে ১৭৫ কোটি টাকা পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই সকল কার্যসূচী সার্থকভাবে কার্যকরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ফলে বেকার সমস্যা হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চারিটি লক্ষ্যের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগের বিপুল প্রসার ("a large expansion of employment opportunities)" একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল যে, "অর্থনৈতিক ও বৃহত্তর সামাজিক দিক হইতে কর্মসুযোগ প্রসারের লক্ষ্য অগ্রাধিকার দাবি করে।"* পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন, সাধারণভাবে দেখিতে গেলে বিনিয়োগের মধ্যেই কর্মসংস্থানের প্রসার স্বাভাবিকভাবে জড়িত আছে। পরিকল্পনার ফলে বিনিয়োগ ব্যয় বাড়িবে ; ইহার অর্থ হইল সেই ব্যয় অন্যের হাতে আয় হিসাবে পৌঁছিয়া দ্রব্যসামগ্রীর জন্য, অর্থাৎ শ্রমিকের জন্য চাহিদা বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু কর্মসংস্থান-অভিমুখী পরিকল্পনার (an employment-oriented plan), তাৎপর্য কেবলমাত্র বিনিয়োগ ব্যয় নির্দিষ্ট করিয়া শান্ত থাকা নয়। ইহার জন্য শিল্প কাঠামোর মধ্যে 'বিভিন্নতা (diversification of industrial pattern), শিল্পের স্থান নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সাহায্য করার বিশেষ নীতি গ্রহণ করা. দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম অবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চস্তরে বজায় রাখা, পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা, শ্রমিকের আঞ্চলিক ও জীবিকাগত চলনশীলতা বাড়াইবার চেষ্টা করা—এই সকলই নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচীর অন্তর্গত।†

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হইল কর্মসুযোগের বৃদ্ধি

* "From economic as well as from the larger social viewpoint expansion of employment opportunities is an objective which claims high priority..." Second Five Year Plan. P. 27.

† "Employmint is implict in and follows investment, and it is, of course, a major consideration in determining the volume of investment... An employment-oriented plan, however, implies much more than deter-

পরিকল্পনা কমিশনের মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তিন দিক হইতে কর্মসুযোগ সৃষ্টির কথা চিন্তা করা দরকার। প্রথমত, শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান বেকারদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশে প্রতি-বৎসর ২০ লক্ষ হিসাবে শ্রমিক-সংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির দরুন তাহাদের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। সর্বশেষে, শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে, কৃষিকার্যে এবং গার্হস্থ্য কাজকর্মে যে অপূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে তাহাদের জন্য অধিকতর কাজের সুযোগ গড়িয়া তোলা দরকার।

চলতি, সম্ভাব্য ও অপূর্ণ

পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন, "যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে তুলনামূলক ভাবে শ্রমিকের পরিমাণ বেশি, সেখানে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতির উপর সাধারণভাবে অধিকতর ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক এবং উপযোগী।"* মূল ও ভারী শিল্পে উৎপাদন-পদ্ধতি সাধারণত মূলধন-প্রগাঢ়, কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিতে শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে। তাহা ছাড়া, দেশে মূলধনের পরিমাণ কম থাকায় ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পে কম মূলধন নিযুক্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। পথঘাট, রেল ও গৃহনির্মাণ প্রভৃতি সকল কাযেই যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে না। তবুও মোটামুটি যে-স্থলে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাজ চলে, সেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে উৎপাদন-পদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরিকল্পন কমিশন মোটামুটি একটি হিসাব দিয়াছিলেন।†

কর্মসুযোগ সৃষ্টির কার্যসূচী

mining the optimum scale of investment. The creation of employment opportunities and reduction in under-employment cannot be approached merely in over-all terms. The problem needs to be broken up in terms of sectors, regions and classes. Diversification of the industrial pattern, a suitable policy on location of industries, special measures to assist small scale and cottage industries, maintenance of economic activity continuously at high level, provision of adequate training facilities, measures to promote geographical and occupational mobility of labour, all these must be considered as elements in the programme of creating new employment on the requisite scale."—*Second Five Year Plan*. p. 26.

* "In the context of an economy with relative abundance of labour a general bias in favour of comparatively more labour intensive techniques is both natural and desirable."—*Second Five Year Plan*. P. 112.

† Second Five Year Plan P. 115 Table. II

(লক্ষের হিসাবে)

ক্ষেত্র	সম্ভাব্য কর্মসংস্থান
১। নির্মাণকার্য	২১'০০
২। জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন	০'৫১
৩। রেল	২'৫৩
৪। অন্যান্য পরিবহণ ও সংযোজন	১ ৮০
৫। শিল্প ও খনি	৭'৫০
৬। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪'৫০
৭। বন, মৎস্যচাষ, জাতীয় সম্প্রসারণ প্রভৃতি	৪'১৩
৮। শিক্ষা	৩'১০
৯। স্বাস্থ্য	১'১৬
১০। অন্যান্য সামাজিক কাজকর্ম	১'৪৩
১১। সরকারী কাজকর্ম	৪'৩২
	৫১ ৯৯
১২। ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি (৫২% হিসাবে)	২৭'০৪
	৭৯'০৫

ধরা যাউক, ৮০ লক্ষ

ইহা ছাড়াও, পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন যে পতিত জমি উদ্ধার, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, বাগিচা ও মিশ্রচাষ প্রসার প্রভৃতির দরুন কৃষিক্ষেত্রে ১৬ লক্ষ কর্মসংস্থান ঘটিবে। উপরন্তু, অধিকতব সেচ কার্যেব জন্য কৃষিকার্যে অপূর্ণ বা আধা-বেকারদের কর্ম-সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উন্নয়নের ফলে অপূর্ণ-নিয়োগ কিছুটা হ্রাস পাইবে বলিয়া কমিশন মনে করিতেছেন।

কৃষিক্ষেত্রেও নূতন কর্মসংস্থান ঘটিবে

শিক্ষিত বেকারির কথা উল্লেখ করিয়া কমিশন বলেন যে, কোন স্বল্পকালীন উপায়ে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা চলে না। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার এমনভাবে হওয়া উচিত যাহা দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষিত বেকারি বৃদ্ধি পায় এমন দিকে শিক্ষার প্রসার যেন না ঘটে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত ও দক্ষতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের

শিক্ষিত বেকারি দূর করা

উৎসগুলি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা দরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মসংস্থান কেন্দ্র, কর্মবিনিময়কেন্দ্র এবং বিভিন্ন জীবিকা-নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কর্ম সুযোগের সংবাদ প্রচারিত হওয়া দরকার। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান (Employment and the Third Plan)

তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৮০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কৃষির বাহিরে ৬৫ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পুরানো বেকারির পরিমাণ হইল ৯০ লক্ষ। কমিশন আরও বলেন যে, ইহা নিতান্ত আন্দাজী হিসাব। এই হিসাবে পৌঁছিবার পদ্ধতি কিরূপ ? প্রথমত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে বেকারের পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ, দ্বিতীয়ত, পূর্বের হিসাব অপেক্ষা শ্রমিক সংখ্যার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে (১৭ লক্ষ) এবং তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রস্তাবিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ হইতে প্রকৃত কর্মসংস্থানের পরিমাণ হইয়াছে কম (প্রায় ২০ লক্ষ)। উপরন্তু, যাহাদের কিছু কাজ আছে কিন্তু অধিকতর কাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এইরূপ অপূর্ণ নিয়োগের পরিমাণ সঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভব নয়, তবে মনে হয় উহার পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার সকল প্রকার কার্যসূচী হইতে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ কর্মসংস্থান হইবে বলা হইতেছে। এই পাঁচ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ। সুতরাং ৩০ লক্ষ নূতন বেকার শ্রমিক পুরানো ৯০ লক্ষের সহিত যুক্ত হইবে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে মোট বেকারের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ। কমিশন আশা করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষের মধ্যে কৃষির বাহিরে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইবে, অবশিষ্ট ৩৫ লক্ষ কৃষি-কাঠামোর মধ্যেই কাজ পাইবে।

কোন ধরনের কাজে কত সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হইতে পারিবে তাহার তালিকা নিচে দেওয়া হইল :

অতিরিক্ত অকৃষিগত কর্মসংস্থান

(লক্ষের হিসাব)

১।	নির্মাণকার্য	২৩'০০
২।	জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	১'০০
৩।	রেলপথ	১'৪০
৪।	অন্যান্য পরিবহণ ও সংযোজন	৮'৮০
৫।	শিল্প ও খনি	৭'৫০
৬।	ক্ষুদ্র শিল্প	৯'০০
৭।	অরণ্য, মৎসচাষ এবং সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম	৭'২০
৮।	শিক্ষা	৫'৯০
৯।	স্বাস্থ্য	১'৪০
১০।	অন্যান্য সামাজিক সেবাকায	০'৮০
১১।	সরকারী চাকরি	১'৫০
১২।	ব্যবসায়-বাণিজ্য (১ হইতে ১১ পর্যন্ত মোট সংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হিসাবে)	৩৭'৮০
	মোট	১০৫'৩০

পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে. পাঁচ বৎসরের বিভিন্ন কার্যস্থচী হইতে কর্মসংস্থান কতটা হইবে (employment potential) তাহা সঠিকভাবে হিসাব করা খুবই অসুবিধাজনক। পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রে দুইটি অনুমান রক্ষা করিতে হয়। প্রথমত, উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নীতি দ্বারা এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বর্তমানের স্তর হইতে কমিয়া না আসে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনায় উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মস্থচী, দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা বজায় রাখিয়া পরিচালনা করা দরকার এবং উৎপাদনের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা দরবার। বিশেষভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতিতে, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা হিসাব করা খুবই মুশকিল। কৃষির উৎপাদন বাড়িলে প্রধানত তাহা কর্মসংস্থানের অপূর্ণতা কমাইয়া দেয় (reduction in underemployment), নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগেও কিছু পরিমাণ নীট বৃদ্ধি ঘটে। স্বল্পোন্নত দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা যেমন বেশি, ইহাদের কাজকর্মের পরিমাণও বেশ কম,

এই ক্ষেত্রেও শিল্পোন্নয়নের ফলে পুরানো অপূর্ণ নিয়োগের পরিমাণই হ্রাস পাইবে, নূতন কর্মসংস্থানের পরিমাণ ততটা সৃষ্টি হইবে না।

শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায় না, কারণ নূতন উৎপাদন পদ্ধতিগুলি বিশেষত বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে, প্রধানত এমন টেকনিকের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা অধিক উৎপাদনক্ষম। কর্মসংস্থান নীতির মূল কথাই হইল উপযুক্ত টেকনিক-নির্বাচন করা। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলিতে গেলে "The choice of techniques becomes, thus, a matter of crucial importance for employment policy." কোন কোন শিল্পে উৎপাদনের এমন মাত্রা ও পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয় যাহাতে সর্বাধিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায়। ফলে ইহারই পাশাপাশি, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যান্য দিকে এমন টেকনিক প্রয়োগ করিতে হয় যাহা শ্রম-প্রগাঢ় ও মূলধন সঞ্চয়ী বিশেষত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন যাহাতে কম। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করলে নির্মাণ কার্যে বর্তমানের তুলনায় অধিকতর শ্রম নিয়োগ করা সম্ভবপর। কি টেকনিক গৃহীত হইবে তাহা কেবলমাত্র সেই বিষয়ে উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারিত হইবে না, যে-অঞ্চলে উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত তাহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। যে-অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বেশি সেখানে জনশক্তির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভবপর এইরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

পরিকল্পনার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হিসাব করার সময়ে কর্মসংস্থানের দুইটি স্তরে পার্থক্য রক্ষা করিতে হইবে—নির্মাণশীল স্তর এবং চলনশীল স্তর। স্বল্পকালের জন্য হইলেও, নির্মাণ-কার্যে নিযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য কিছুটা বিনিয়োগ করিতে হয়। নির্মাণ কার্য শেষ হইলে ততটা কর্মসংস্থান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। নির্মাণ কার্যে বিনিয়োগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা চলে শ্রমিকদের জন্য মজুরি এবং যন্ত্রপাতি ও মালমসলার জন্য ব্যয়। নির্মাণ-কার্যের ফলে নূতন কর্মসংস্থানের পরিমাণ তাই সাবধানে হিসাব করিতে হয়। চলনশীল স্তরে যতটা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে, উহার পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ উহাই মোটামুটি স্থায়ী ধরনের।

উন্নয়নের বিবিধ কর্মসূচী হইতে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছাড়াও উহাদের ফলস্বরূপ যে পরোক্ষ কর্মসংস্থান দেখা দেয় তাহা হিসাব করা

দরকার। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের দরুন লোকের হাতে আয় বৃদ্ধি পায়, উহা ব্যয় হইতে থাকিলে জিনিসপত্রের লেনদেন চলাচল প্রভৃতির উপযোগী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ৫২% পরোক্ষ কর্মসংস্থান হইবে এইরূপ মনে করা হইয়াছিল। বিভিন্ন অনুসন্ধান কার্যের ফলে নূতন তথ্যসংগ্রহ করিয়া ইহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৫৬%।

কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটাইবার নীতি তিন দিক হইতে প্রযোগ করা হইবে, কমিশন এইরূপ বলিয়াছিলেন। প্রথমত, পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে এমনভাবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃততর ও সুষমভাবে কর্মসংস্থানের প্রভাব প্রসারিত হয়। দ্বিতীযত, গ্রাম্য-শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচীর একটি বৃহৎ অংশে আছে গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, গ্রাম্য শিল্প-তালুক প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য শিল্পের উন্নযন এবং শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার। প্রথমদিকে নূতন উৎপাদনের টেকনিকের দরুন কর্মসংস্থান কিছুটা হ্রাস পাইলেও গ্রাম্য অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ফলে বিশেষ পরিমাণ দীর্ঘকালীন সুবিধা পাওযা যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীযত, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটানো হইবে—ইহা ছাড়াও একটি গ্রাম্য নির্মাণ-কার্যসূচী (a rural works programme) গৃহীত হইযাছে। এই নির্মাণ কাযসূচী প্রায ২৫ লক্ষ লোককে বৎসরে গড়ে প্রায ১০০ দিন করিয়া কাজ জোগাইবে। এই কার্যসূচী সাধারণ লোকের কাজের ব্যবস্থা করিবে এবং শিক্ষিত বেকারদের কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করিবে।* কমিশন মনে করেন যে কারিগরি শিক্ষা থাকিলে শিক্ষিত বেকারদের শহরে কাজ জুটিতে পারে, নহিলে প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ঘটিবে। সমবায প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষার প্রসার—ইহারাই শিক্ষিত

---

*"Works programme envisaged for rural areas comprises five categories of work; I. Works projects included in the plans of States and local bodies which involve the use of unskill and semi-skilled labour; II. Works undertaken by the community or by the beneficiaries in accordance with the obligations laid down by law. III. Development works towards which local people contribute labour while some measure of assistance is given by Government; IV. Schemes to enable village communities to build up remunerative assets; and, V. Supplementary works programmes to be organised in which there is high incidence of unemployment."
Third Five Year Plan, P. 163-164,

বেকারি সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ। কমিশনের ভাষায় বলিতে গেলে "As the rural economy develops and the co-operative sector in it becomes larger, there will be increasing opportunity for employment at levels of income which are comparable in real terms with those available in the towns."

অনুশীলনী

1. Analyse the causes of growing unemployment in India. Suggest remedies.

2. Examine the causes of recent increase in unemployment in India. How far would the Second Five Year Plan help to solve the problem ?

3. What are the main types of unemployment to be witnessed in India to-day ? What measures would you suggest for the solution of the unemployment problem in India ?

4. Examine the main causes of unemployment in India. What measures are being adopted to solve the problem under the Third Plan ?

5. Explain the nature of unemployment problem in India. Give your own views on the solution of the problem.

২৪

ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্য

Transport and Foreign Trade in India

পরিবহন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতীয় পরিকল্পনা (Transport, Economic Development and the Indian Plans) :

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দ্রুত শিল্পোন্নয়নের এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের বাহক হইল আধুনিক পরিবহনব্যবস্থা। ইংরাজ কবি কিপ্‌লিং বলিয়াছেন যে 'পরিবহনই সভ্যতা'। বস্তুত ইহা সভ্যতার বাহক ও সূচক (Index) উভয়ই বটে।

অর্থনৈতিক, সামরিক, শাসনতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক—সকল দিক হইতে বিচার করিলেই দেশে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারা যায়। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ দ্রুততর করিতে হইলে এবং সেই বেগ অব্যাহত রাখিতে হইলে সস্তায় দ্রুত বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও যাত্রীদের স্থানান্তরিত করার সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

পরিবহনের গুরুত্ব কি

অতীতে ব্রিটিশ সরকার প্রধানত সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, শিল্পজাত আমদানী-দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং দেশের শাসনতন্ত্র শক্তিশালী করিবার জন্য পরিবহন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। বর্তমান ভারতে পরিবহন-ব্যবস্থা ও সংগঠনের মূলনীতি হইল শিল্পপ্রসার, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ বাড়ানো, অনুন্নত অঞ্চলসমূহে উন্নতি, শিল্পস্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন।

অবাধ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে, পরিবহনের চাহিদা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার দাম বা ভাড়ার হার বৃদ্ধি পায়, বেশি মুনাফার আশায় পরিবহনের ব্যবসায়ীরা নূতন নূতন ক্ষেত্রে পরিবহনের ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। এইরূপে পরিবহনের প্রসার ঘটে, উহার দুষ্প্রাপ্যতা দূর হইতে থাকে, এবং ভাড়ার হার হ্রাস পায়।

পরিবহনের পরিকল্পনা

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে এইরূপ চাহিদা-যোগান ও দামের

সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিবহন ব্যবস্থা প্রসারিত হয় না। দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা হিসাব করিয়া পরিকল্পনা কমিশন পূর্ব হইতেই পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসার করিতে পারে।

দেশে পরিবহনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অর্থাৎ পরিবহনের ভবিষ্যৎ চাহিদা হিসাব করা বিশেষ অসুবিধাজনক। ভবিষ্যতে মালচলাচলের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা আন্দাজ করা দরকার। কৃষি, খনি, শিল্প এবং অন্যান্য কার্যসূচীর ফলে কি-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যাতায়াত করিবে তাহার মোট হিসাব আন্দাজ করা চলে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। বর্তমানের এইরূপ হিসাব সাধারণত সঠিক হয় না, কারণ উৎপাদনে বৃদ্ধির দরুন ঠিক সেই হারে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে না, উহা অপেক্ষা অনেক বেশি হারে ইহার প্রসার ঘটে। ইহাকে আজকাল পরিবহনের গুণক-প্রভাব (multiplier effect of transportation) বলা হয়। যেমন কিছু পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইলে উহা অপেক্ষা ৪.৫ গুণ অধিক পরিবহনের প্রয়োজন দেখা দেয়। উৎপাদনের টন-পরিমাণে বৃদ্ধির তুলনায় পরিবহনের টন-মাইলের বৃদ্ধির হিসাব অনেক বেশি ধরিতে হয়।*

চাহিদা হিসাব করার অসুবিধা কোথায়

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উৎপাদনের কত অংশ পরিবহন-ধারার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান হইতে পারে না। শিল্পটির অবস্থান, কাঁচামালের উৎস, পরিবহনের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা, স্থানীয় ভোগের পরিমাণ, বাহিরের বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ—এই সকল বিষয় পরিবহনের জন্য চাহিদাকে নির্ধারিত করে। রেলপথের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, কয়লা ও কোকের ক্ষেত্রে পরিবহনের অনুপাত হইল ৮০% হইতে ৯৫%, আবার খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ইহা ১৫%। কেবলমাত্র দ্রব্যের ক্ষেত্রে নয়, পরিবহনের ধরন অনুযায়ীও ইহাতে তারতম্য দেখা যায়।

বহু বিষয়ের দ্বারা ইহা প্রভাবিত

দ্রব্যসামগ্রীর চলাচল বা মালবহনের সঙ্গে সঙ্গে মোট যাত্রীবহনের হিসাবও লওয়া দরকার। শহরাঞ্চল, শহরতলী এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যে চলাচলের

* দেখা গিয়াছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে বিভিন্ন দেশে বর্ধনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবহনের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগ (the coefficient of elasticity of demand for transport) ১.৫ হইতে ১.৭ এর মধ্যে থাকে।

হিসাব করা প্রয়োজন। মালপত্রের চলাচলের সহিত যাত্রী চলাচলের গুরুত্বও বাড়িয়া যায়। স্বাভাবিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণও ভবিষ্যতে যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি পাইবে। জন-সাধারণের আয় ও ভোগের ধরন পাল্টাইয়া যাইবে, তাহাদের ব্যয়-কাঠামোতে বিলাস-ভ্রমণ, তীর্থস্থান প্রদর্শন প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও হিসাব করা দরকার।

যাত্রী চলাচল

এই সকল কারণেই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অবস্থায় মোট বিনিয়োগের ২৫% হইতে ৩০% পরিবহন-খাতে নিযোজিত হইতে থাকে। ভারতের প্রথম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ২৭% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৯% পরিবহন-খাতে বরাদ্দ হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১০ ৪০০ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে পরিবহন ও সংযোজন খাতে বরাদ্দ হইল ১৭৩৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ ১৭%।*

ভারতের পরিবহনের পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহনের উপর আরও অধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। পূর্বের দুইটি পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদনের লক্ষ্যগুলি বিচার করিলে বোঝা যাইবে কি বিপুল পরিমাণ মালবহনের ক্ষমতা দেশে সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। কৃষি-উৎপাদন বাড়িবে ৩০%, কয়লা ও লোহা একত্রে ধরিলে ১০০%, গাড়ির ক্ষেত্রেও তাই। অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন বাড়িবে ৩৪১%, কাগজ ও কস্টিক সোডাতে বৃদ্ধির হার হইল যথাক্রমে ১১৯% এবং ১৭২%। এই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাড়িলে উহা অপেক্ষা অনেক বেশি অনুপাতে পরিবহন ক্ষমতার প্রসার দরকার। তাহা আমরা পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছি। ভারতে গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা হইলেও ইহা আমরা দেখিতে পাই। এই দশ বৎসরে জাতীয় আয় বাড়িয়াছে ৪২%, কৃষি উৎপাদনের সূচীতে ৪১% এবং শিল্প উৎপাদনের সূচীতে ৯৪%, কিন্তু রেল পথ ও রাস্তা ঘাটে পরিবহনের পরিমাণ দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশি হইতেছে।† তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন-খাতে

তৃতীয় পরিকল্পনার আরও বিনিয়োগ দরকার ছিল

* সরকারী খাতে ১৪৮৬ কোটি টাকা ও বেসরকারী খাতে ২৫০ কোটি টাকা।

† "Viewed in retrospect, the experience of the last ten years is instructive from the point of view of future planning. The demand for transport

বিনিয়োগের পরিমাণ তাই প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত স্বল্প বলিতে হইবে। পরিবহনের গুণক প্রভাব এবং দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয়ের এজেন্সীতে ও স্তর-সংখ্যার বৃদ্ধি হিসাব করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুইটি পরিকল্পনার শেষে এখনই পরিবহন-প্রতিবন্ধক (Transport bottlenecks) সৃষ্টি হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় কমিশন বলিতেছেন যে "It is only with difficulty that the transportation system has been able to meet the growing demands." এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরিবহন সম্প্রসারণের কার্যসূচীব উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

পরিবহনে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার আরও এই কারণে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহনের দাম মোটেই কম নয়। পরিবহনের সুযোগ বৃদ্ধির দরুণ যে উপকরণ বা অর্থ নিয়োজিত হয় তাহা প্রাথমিক ব্যয়ের বহুগুণ উৎপাদন বাড়াইতে সাহায্য করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন উপকরণের ভাণ্ডার কমিয়া গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে অধিকতর উৎপাদনেব ভিত্তিই হইল বর্তমানে পরিবহনের প্রসার। দেশের পরিবহন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার কোন সময়েই হয় না, কারণ কিছু মজুত শক্তি এইক্ষেত্রে রাখা দরকার। হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে মাল চলাচলের পরিমাণ ও গতিবেগে কিছুটা বৃদ্ধির উপযোগী প্রসারশীলতা দেশের পরিবহন-ব্যবস্থায় থাকা দরকার। ১৯৩৩-৩৪ সালে পরিবহনের স্বল্পতার দরুন সোভিয়েতেব বিখ্যাত পরিকল্পনা প্রায় বানচাল হইতে বসিয়াছিল। ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনাও এই দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা অনেকে মনে করেন। অপর দেশের অভিজ্ঞতা হইতে সঠিক সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিলে এই সম্ভাবনা এড়ানো যাইতে পারে।

তাহা না হইলে পরিকল্পনাই ব্যাহত হইবে

has risen at a substantially faster rate that the increase in national income or the growth of production in any major sector of the economy over the period, While the national income has increased by about 42 per cent, the index of agricultural production has gone up by about 41 per cent and that of industrial production by 94 per cent, the traffic on the railways measured in ton miles has doubled and that on road tran port more than doubled over the period. India's experience over the last decade is in line with the experience of several industrially advanced countries in their early stages of growth and the these trend may well be expected to continue in the period of the next few plans." *Third Five Year Plan*, P. 539.

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রেলপথ (Railways and the Indian Economic Plans):

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে ভারতীয় রেলপথসমূহের সম্মুখে প্রধান সমস্যা হইল পুনর্বাসন ও সাজ-সরঞ্জাম পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা (rehabilitation and replacement)। ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময় হইতেই রেলের সরঞ্জামসমূহের ক্রমাগত ব্যবহার হইতেছে, কিন্তু উহাদের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে যন্ত্রপাতির সাধ্যাতিরিক্ত ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু উহাদের পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই, কারণ যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। তাহা ছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনে রেল লাইন সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল, কিছু কিছু রেলকারখানা যুদ্ধের মালমসলা উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়াছিল। দেশবিভাগের ফলে কিছু রেলপথ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নিজস্ব সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; বহু দেশীয় রাজ্যের রেলপথ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে রেলের অবস্থা

এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। রেলের পুনর্বাসন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ৪০০ কোটি টাকা প্রথমে ধার্য করা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল ইহার মধ্যে ৩২০ কোটি টাকা রেল কর্তৃপক্ষ নিজেই সংগ্রহ করিবে. প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিকল্পনাকালে ৪৩২·৭৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। সংরক্ষী তহবিলের অবস্থাও উন্নত হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে তহবিলের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনায় ৪৩০ মাইল উৎপাটিত রেলপথ (dismantled) পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে, ৩৮০ মাইল নূতন লাইন নির্মিত হইয়াছে এবং ৪৬ মাইল সংকীর্ণপ্রস্থ লাইনকে (Narrow gauge) মিটারপ্রস্থ লাইনে (Meter gauge) পরিণত করা হইয়াছে, নূতন ২০০০ মাইলের জরিপ কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, পরিকল্পনার শেষে ৪৫৩ মাইল নূতন লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হইয়াছে। গঙ্গা নদীর উপর পুল নির্মাণ ও হাওড়ার নিকটবর্তী লাইনের বিদ্যুতীকরণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। রেল ইঞ্জিন ও বয়লার বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা প্রথম পরিকল্পনাকালে ৪২৪টি ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছে। টাটা কোম্পানীও ২০০টির

অধিক ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিত্তরঞ্জনের কারখানার উৎপাদনক্ষমতা বাৎসরিক ৩০০ ইঞ্জিনে তোলা হইবে স্থির হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হইয়া প্রথম বৎসরে পেরাম্বুর বগি কারখানা (Perambur coach Factory) ৭৩টি বগি তৈয়ার করিয়াছিল। রেল পরিচালনায় যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় পরিচালন দক্ষতা (operational efficiency) অনেকখানি ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় রেলের উন্নতি

রেলের যাত্রী-আয়ের (Passenger earning) ৯০% আসে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভ্রমণকে অধিকতর আরামপ্রদ করিয়া তোলা অবশ্য কর্তব্য। ইহার জন্য অধিক সংখ্যক বগি, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বৈদ্যুতিক পাখা, ষ্টেশনে বিশ্রামাগার নির্মাণ, দূরগামী যাত্রীদের জন্য শয়নের বন্দোবস্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ১৫ কোটি টাকা এই সকল উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইয়াছিল।

পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মাল চলাচলের পরিমাণ হইবে ৬০৮ লক্ষ টন এবং যাত্রী চলাচলের পরিমাণ হইবে ১৯৫০ লক্ষ, অর্থাৎ ১৫ বাড়িয়া যাইবে। ইহার জন্য রেল উন্নয়ন খাতে মোট ১১২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল নূতন রেলপথ স্থাপন করা; প্রধানত লৌহ ইস্পাত কারখানা কয়লা খনি প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই ইহারা নির্মিত হইবে। সাজসরঞ্জামের পুনর্নবীকরণ (renewal), পুরাতন রেললাইনের পুনর্নবীকরণ (৮০০০ মাইল), বৈদ্যুতিক রেল চলাচলের ব্যবস্থা, একটির বদলে দুইটি করিয়া লাইন স্থাপন (১৬০৭ মাইল, ছোট লাইনকে বড় লাইনে পরিবর্তন (২৬৫ মাইল) উন্নত ধরনের সংকেত ব্যবস্থা (signalling), তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আরাম ও রেলকর্মচারীদের কল্যাণ, বিদ্যুতীকরণ (৮২৫ মাইল) প্রভৃতি উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২২৫৮টি ইঞ্জিন, ১০৭২৪৭টি ওয়াগন এবং ১১৩৬৪টি বগি নির্মাণের কথাও বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও রেলপথ

তৃতীয় পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে যে ১৯৬৫-৬৬ সালে বর্তমানের তুলনায় মাল ও যাত্রীর পরিমাণ ৯১ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ প্রায় ৫৯% বৃদ্ধি পাইবে।

শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ও যাতায়াত বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও রেলপথ

বর্তমানের হিসাবে উন্নয়নের কর্মসূচী সফল করিতে হইলে মোট ১৩২৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। রেললাইন উৎপাদন, ইঞ্জিন তৈয়ারী, রেলপথ স্থাপন, ওয়াগন ও যাত্রীবাহী গাড়ী উৎপাদন, নূতন ধরনের দ্রব্য রেল কারখানায় উৎপাদন, শ্রমিক কল্যাণ এইরূপ বিভিন্ন দিকে উন্নয়ন ঘটিবে।

ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A short history of Indian Foreign Trade)

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারত বহির্বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর আগেও মিশর, রোম, গ্রীস, আরব, ইরাণ ও চীনের সহিত তাহার বাণিজ্যজনিত লেনদেন চলিত। এই সময়ে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি, হাতীর দাঁত, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, রং, মশলা, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি। এই সময় প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল আরবী ঘোড়া, মদ, খনিজ দ্রব্যাদি, সোণা ও রূপা। মুসলমান আমলেও মোটামুটি এইরূপ বাণিজ্য অব্যাহত ছিল।

ভাস্কো ডা-গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর চারিটি ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্যের জন্য আসিতে থাকে। ইহারা হইল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী। ইহারা প্রধানত, সোণা ও রূপা লইয়া আসিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও মশলা প্রভৃতি লইয়া যাইত। কালক্রমে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজ এই দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে পায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।

ভারতের বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজার এরূপভাবে দখল করিতে থাকে যে ইংলণ্ড ভারত হইতে বস্ত্র আমদানির উপর সুউচ্চ আমদানি শুল্ক বসাইয়া ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত করিতে থাকে। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটায় সেখানে

বৈদেশিক লুণ্ঠনের একটি পথ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য

দ্রুত কারখানা শিল্প গড়িয়া উঠে এবং কাঁচামালের প্রয়োজনে ভারত হইতে কাঁচামাল লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই বাড়িয়া যায়। এই সময় হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্যের

প্রকৃতি হইল ঔপনিবেশিক : কাঁচামাল রপ্তানি ও সেই কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মাল চলাচলের অসুবিধার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুব কমিয়া যায়। আমদানি খুবই কমে; রপ্তানি অবশ্য ততটা কমে না। আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় দেশে কিছু কিছু শিল্প গড়িয়া ওঠার চেষ্টা করে। রপ্তানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ কিছুটা বাড়ে এবং আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের কিছুটা যায়।

যুদ্ধের পরে ১৯২০-২২ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রথম ঘাট্‌তি দেখা দেয়। ইহার প্রধান কারণ হইল জাপানের শিল্পোন্নয়ন ও তীব্র প্রতিযোগিতা। অবশ্য ক্রমে উন্নতি সুরু হয়, এবং ১৯২৮-২৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দায় ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অধিক হ্রাস পাওয়ায় ভারতের ন্যায় কৃষিদ্রব্য রপ্তানীকারী দেশসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। "হোমচার্জ" প্রভৃতি মিটাইবার জন্য স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হয়।

১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে বহির্বাণিজ্যের উন্নতি দেখা দেয় এবং রপ্তানির উদ্বৃত্ত (Export surplus) ক্রমে বাড়িতে থাকে। ১৯৩৭ সালে কিছুটা মন্দা দেখা গেলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে ও যুদ্ধের মধ্যে বহির্বাণিজ্য বিপুল বৃদ্ধি পায় এবং ইহার পরিমাণ (volume), দিক্ (direction), গঠন (composition) ও প্রকৃতিতে (Nature) আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়।

(ক) যুদ্ধপূর্বকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of Pre-war Foreign Trade)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের সময় হইতে ভারতে বহির্বাণিজ্যের গতি, গঠন ও প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বহির্বাণিজ্যের এই রূপ-পরিবর্তন ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তনের ফল এবং সেই পরিবর্তনের সূচক (Index)। এই পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে হইলে যুদ্ধপূর্ব বহির্বাণিজ্যের অবস্থা আমাদের জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ছিল :

যুদ্ধপূর্ব বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

(১) আমাদের রপ্তানির মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের প্রাধান্য দেখা যাইত। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল কাঁচা তুলা, পাট, তৈল বীজ, চা, চামড়া প্রভৃতি; ইহারাই ছিল মোট রপ্তানির প্রায় ৭০%; অবশিষ্ট ৩০% ছিল শিল্পজাত দ্রব্য।

(২) ভারতীয় আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাধান্য দেখা যাইত। প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল মোটর গাড়ি, বস্ত্র, চামড়াজাত দ্রব্য, সাইকেল, সেলাই কল, ঔষধপত্র প্রভৃতি; ইহারাই ছিল আমদানির ৬৩% (১৯৩৮-৩৯ সালে)।

(৩) ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল রপ্তানির উদ্বৃত্ত বা অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স (Favourable Balance of Trade)। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এইরূপ নিয়মিত রপ্তানির উদ্বৃত্ত দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারত সচিবের দপ্তরখানা পরিচালনার ব্যয়, ভারত সরকারের অধীনে নিযুক্ত ইংরাজ কর্মচারীদের পেনশন, ভাতা প্রভৃতি খাতে ব্যয়, ইংলণ্ডে ক্রীত সামরিক ও বেসামরিক দ্রব্যাদির মূল্য ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত বৃটিশ নৌবাহিনী পোষণের জন্য ব্যয় প্রভৃতির জন্য বার্ষিক ৩০ কোটি টাকা হইতে ৫০ কোটি টাকার মত হোম চার্জ দিতে হইত। সুতরাং লেনদেন ব্যালান্স (balance of payments) অনুকূল রাখিবার জন্য আমাদের বহু পরিমাণ দ্রব্যাদি বিলাতে পাঠাইয়া এই 'রপ্তানি উদ্বৃত্ত' বজায় রাখিতে হইত। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে আমাদের 'রপ্তানি উদ্বৃত্ত' কমিয়া যাওয়ায় এই 'হোমচার্জ' মিটাইবার জন্যই আমাদের স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হইয়াছিল।

(৪) বহির্বাণিজ্যের গতি বা দিক্ বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বহির্বাণিজ্যে, বিশেষত রপ্তানিক্ষেত্রে, ইংলণ্ডের স্থান ছিল সর্বপ্রধান। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে আমাদের মোট আমদানির ৩৩% ইংলণ্ড হইতেই আসিত এবং আমাদের মোট রপ্তানির ৪৪% ইংলণ্ডেই যাইত।

(খ) যুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তর যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যে পরিবর্তন (Changes in the foreign trade during the war and Post-war Period)

যুদ্ধের ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। (১) মোট রপ্তানি-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত বাড়িতে থাকে

যুদ্ধজনিত চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট, সুতাজাত বস্ত্রাদির রপ্তানি খুবই বাড়িয়া যায়। (২) রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কাঁচামালের পরিমাণ কমিতে থাকে, কারণ যুদ্ধের ফলে দেশের মধ্যেই শিল্পকারখানা স্থাপিত হওয়ায় কাঁচামালের জন্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। (৩) আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক্ পরিবর্তন সম্পর্কে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ কমনূয়েলথযুক্ত অপরাপর দেশসমূহের, দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (৪) বাণিজ্য ব্যালান্সে আনুকূল্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শিল্পোন্নত দেশসমূহ যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাহাদের অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্তর্নিহিত দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষমতা (Productive potential) কমিয়া যায় এবং বাণিজ্যিক নৌবহরের ঘাট্‌তি দেখা যায়। ফলে আমদানি কমে, অথচ রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ইহার ফলে রপ্তানি-উদ্বৃত্তের (Export Surplus) পরিমাণ খুবই বেশি হয়। সমগ্র ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ করিয়াও ভারত প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং মজুত গড়িয়া তুলিতে পারে।

যুদ্ধের ফলে কিরূপ পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাণিজ্য ব্যালান্সের এই আনুকূল্য অবশ্য ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক নহে। যুদ্ধের পরেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে এই আনুকূল্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতিজনিত দামস্তরে বৃদ্ধি চলিতে থাকায় রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম বেশি হইয়া পড়ে এবং ফলে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতে থাকে। যেমন পাটজাত দ্রব্যের দাম অধিক থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাগজ ও সুতাজাত দ্রব্যাদির দ্বারা প্রয়োজন মিটান হইতে থাকে। বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পায়।

ঠিক একই সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে লোকের হাতে অধিক আয় সৃষ্টি হইয়াছিল অথচ ভোগ্যদ্রব্যাদির ব্যবহার সংকুচিত ছিল। যুদ্ধের পরে অপূর্ব চাহিদা মিটাইবার দরুন অধিক আমদানির চাপ সৃষ্টি হইল। আমদানি নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকায় ভারতের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক হইতে সুরু হইল।

কানাডা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত সর্বাপেক্ষা অধিকতর বাণিজ্য চলিতে থাকে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য (Five Year Plans and India's Foreign Trade)

বিগত দশ বৎসরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রধান প্রভাব হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ। বিশেষভাবে আমদানির উপর ইহাদের প্রভাব খুবই বেশি। প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৬২০ কোটি টাকা টাকা অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ৭২৪ কোটি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মূলধনী দ্রব্য, কাঁচামাল, মধ্যস্তরের দ্রব্যসামগ্রী এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয়তা খুব বাড়ে, ফলে আমদানির পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে আমদানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়;

গত দুইটি পরিকল্পনায় আমদানির পরিমাণ

১৯৫৫ ৫৬ সালে ৭৪৬ কোটি টাকা হইতে ইহা ১৯৫৬-৫৭ সালে ১০৯৯ কোটি হয় এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ইহা দাঁড়ায় ১২৩৩ কোটি টাকা পরবর্তী দুই বৎসরে আমদানির পরিমাণ কমে, যেমন ১৯৫৯ ৬০ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২০ কোটি টাকা। আমদানি হ্রাসের কারণ হইল বৈদেশিক মুদ্রা সংকট এড়াইবার জন্য দেশে আমদানি লাইসেন্স প্রমাণের কড়াকড়ি করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে, ১৯৬০-৬১ সালে আমদানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৮০ কোটি টাকা। সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়াইল ৫৩৬০ কোটি টাকা—বৎসরে গড়ে ১০৭২ কোটি টাকা—অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় ৫০% বেশি।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে বিনিয়োগের কর্মসূচী অনেক বড, এবং মূল ও ভারি শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদানের নীতি বর্তমানেও অব্যাহত রাখা হইতেছে। ফলে, ইহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর আমদানির প্রয়োজন অনুভূত হইবে। পরিকল্পনার প্রজেক্টসমূহের দরুন যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় মালমশলা ক্রয় করিতে ১৯০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। তাহা ছাড়া দেশের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যসমূহের উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী আমদানির প্রয়োজনীয়তা হইল ২০০ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত কাঁচামাল, মধ্য স্তরের দ্রব্যাদি পুনসংস্থাপন ও নবীকরণের জন্য যন্ত্রপাতি, ও প্রয়োজনীয় ভোগ-

তৃতীয় পরিকল্পনায় কি দাঁড়াইবে

দ্রব্যাদি প্রভৃতি দরুণ প্রয়োজনীয় আমদানির পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩৬৫০ কোটি টাকা। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট আমদানির মূল্য দাঁড়াইবে ৫৭৫০ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত P. L. 480 অনুযায়ী আরও প্রায় ৬০০ কোটি টাকার আমদানি হইবে। এই সকল মিলিয়া প্রতি বৎসর গড়ে আমদানির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১২৭০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ছিল ১০৭২ কোটি টাকা।

রপ্তানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিগত দশ বৎসরে ভারতের রপ্তানি বিশেষ বাড়ে নাই. পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলিতে গেলে "over the past decade, on the whole India's exports have been stagnant." প্রথম পরিকল্পনা কালে রপ্তানির বাৎসরিক গড় পরিমাণ ছিল ৬০৯ কোটি টাকা। কমিশনের মতে, ১৯৫১-৫২ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সুযোগ পাওয়া না গেলে ইহা আরও কম হইত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে রপ্তানির বাৎসরিক গড় পরিমাণ ছিল ৬১৪ কোটি টাকা। কমিশনের মতে ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে মৃদু বাণিজ্য-সংকট না ঘটিলে ইহার পরিমাণ আর একটু বেশি হইত। পরিমাণের দিক হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানির পরিমাণ ৯% বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু দ্রব্যাদির দাম বেশি না পাওয়ায় রপ্তানি হইতে এই পরিমাণ আয় বৃদ্ধি হয় না। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুণ আভ্যন্তরীণ চাহিদার চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে রপ্তানির জন্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন, বিগত দশ বৎসরে পৃথিবীতে মোট রপ্তানি-বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতের অংশ ১৯৫০ সালের ২.১% হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৬০ সালে ১.১%-এ পরিণত হয়।

দুইটি পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ

গত দুইটি পরিকল্পনাকালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে দুইটি প্রধান গতি-ধারা (trend) লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রথমত. কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ, যেমন চা, তুলাবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, মশলা, তামাক প্রভৃতি (ইহারা এখনও ভারতের মোট রপ্তানির অধিক অংশ) রপ্তানি বৃদ্ধিতে ততটা সহায়তা করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রজাত নূতন দ্রব্যসামগ্রী এবং আকরিক লৌহ জাতীয় দ্রব্য অনেকাংশে রপ্তানি বাড়াইয়াছে, যদিও অবশ্য ইহারা পুরাতন রপ্তানি দ্রব্যগুলির অক্ষমতা সম্পূর্ণ মিটাইতে পারে নাই।

রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্যগত পরিবর্তন

সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময় হইতে রপ্তানি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা চলিতেছে। এই সকল প্রচেষ্টা না হইলে রপ্তানির পরিমাণ আরও কম হইতে পারিত। সাংগঠনিক পরিবর্তন, রপ্তানিতে বৈচিত্র্যসাধন, অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ দান, প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রথমত, তুলাবস্ত্র, সিল্ক, রেয়ন, এন্‌জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, মশলা, বাদাম, চামড়া, প্লাষ্টিক, অভ্র ও খেলাধূলার সামগ্রী প্রভৃতির ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে; রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে; চা, কফি ও দড়ির জন্য যে সকল বোর্ড আছে তাহাদের হাতে রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিলের কিছু কিছু কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইযাছে, বিজ্ঞাপন ও মেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ ও কোটার বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়া হইযাছে বেশির ভাগ রপ্তানি শুল্ক খারিজ করা হইযাছে, রপ্তানি দ্রব্যোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির লাইসেন্স সহজতর করা হইয়াছে, পরিবহনে উহাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইযাছে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের কাজকর্মের মাধ্যমে এবং সোভিয়েট রুশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অনেকটা বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিযাছে।

রপ্তানি প্রসারে কি নীতি অনুসৃত হইয়াছে

পরিকল্পনার ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশগত বণ্টন বা দিক-নির্দিষ্টতাতেও (Direction of trade) বহুলাংশে পরিবর্তন আসিয়াছে। বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপে প্রায় ৩৯% রপ্তানি হয়, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডেই হয় ২৮%। কয়েক বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে আমাদের রপ্তানির অনুপাত প্রায় সমান রহিয়াছে। উত্তর আমেরিকায় ১৯৫২-তে ছিল ২১%, ১৯৫৬-তে হয় ১৭, আর ১৯৬০-এ ইহা বাড়িয়া হইয়াছে ১৯%। ECAFE দেশগুলির সহিত রপ্তানির অনুপাত মোটামুটি সমানই আছে। জাপানের সহিত রপ্তানির অনুপাত বৃদ্ধির কারণ আকরিক লৌহের রপ্তানি।

বহির্বাণিজ্যের দিক পরিবর্তন ১। রপ্তানিতে

ইংলণ্ড ব্যতীত পশ্চিম ইউরোপের প্রধান দেশগুলির সহিত আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অনুপাত ৬.৩% ও ৯.৫%-এর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। সোভিয়েত রুশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত রপ্তানির অনুপাত

১৯৫১-৫৩-এ ছিল ১%, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা হইয়াছে ৮%-এর উপর।

পশ্চিম ইউরোপ হইতে আমদানির অনুপাত প্রথম পরিকল্পনাতে ৩০% হইতে বৃদ্ধি পাইযা ৫০% হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা ছিল প্রায় ৪০%। পূর্ব ইউরোপ হইতে আমদানির অনুপাত ১৯৫২ সালে ছিল ২.২%, ১৯৫৬-এ হইল ৪.৬%, ১৯৬০ এ ইহা কমিয়া হইয়াছে ৩৭%। উত্তর আমেরিকা হইতে আমদানির অনুপাত ১৯৫২ সালে ছিল ৩৭%, ১৯৫৬ সালে ইহা হয় ১২.৪%, ১৯৬০ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ইহা দাঁড়ায় ২৫.৭-এ। ইহার কারণ প্রধানত খাদ্য আমদানি। ECAFE দেশগুলি হইতে এই সময়কালে আমদানিব অনুপাত ১২% হইতে ১৪%-এর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে।

২। আমদানিতে

ভারতের লেনদেন ব্যালান্স ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ
(Balance of payments in India and the Five Years Plans)*

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পধানত কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িযা তোলা, যেমন জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার। শিল্পের ক্ষেত্রে তৎ-কালীন উৎপাদনক্ষমতাব পূর্ণতর ব্যবহারের দিকেই গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল এবং সরকারী ক্ষেত্রে খনি ও শিল্পে বিনিয়োগের অনুপাত ছিল খুবই কম। প্রথম পরিকল্পনার কার্যসূচীর দরুণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ছিল মাত্র ৪০০ কোটি টাকার। ১৯৫১-৫২ সালে, প্রথম পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ২৩৪ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেয়, কিন্তু পরবর্তী বৎসর-গুলিতে অবস্থার উন্নতি ঘটে, প্রথমত শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন সমগ্র পরিকল্পনাকালে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩১৮ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৬ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যে এবং অবশিষ্ট ১২২ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল (যেমন ষ্টার্লিং ব্যালান্স) হইতে পাওয়া যায়।

প্রথম পরিকল্পনায় লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে মূল ও বৃহৎ শিল্পের অনুপাত ছিল

---

* *Third Five Year Plan. P. 107-118.*

বেশি। এই সকল শিল্পস্থাপনে প্রভূত বিদেশী যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শিল্প-কুশলতা দরকার, ফলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বেশি ছিল। কমিশনের হিসাব মতে মোট বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ধরা হইয়াছিল ১১০০ কোটি টাকা, পরিকল্পনার শেষে পাঁচ বৎসরের এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইল ২১০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের দেনার দিকে প্রভূত চাপ পড়িল এবং প্রথম দুই বৎসরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ৪৮১ কোটি টাকা কমিয়া গেল। ১৯৫৮ সালে অবস্থাও পুনর্বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনাটির কিছুটা ছাঁটিয়া (Prunning করা হইল এবং "মূল" বা "অন্তঃস্থলের" (core) প্রজেক্টগুলি কার্যকরী করবার কথা ঘোষিত হইল। পূর্বে যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হইবে বলা হইয়াছিল উহা ছাপাইয়া উহার আরও ৫০% বেশি ব্যবহৃত হইল। পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল হইতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলা হইয়াছিল। উহার স্থলে ঐ তহবিল হইতে ৬০০ কোটি টাকা হ্রাস পাইল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা

এইরূপ অবস্থা দেখা দিবার পিছনে অনেক কারণ ছিল বলা হইতেছে। আমদানি বৃদ্ধির কারণের মধ্যে প্রধান ছিল দেশে খারাপ মরসুম, খাদ্যের ফাটকাবাজী প্রভৃতির দরুন খাদ্যসংকট। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা রচনার সময়ে প্রতিটি প্রজেক্টের দরুন আমদানির প্রয়োজনীয় পরিমাণ কম করিয়া হিসাব করা হইয়াছিল, এইরূপ বলা হইতেছে। আনুষঙ্গিক বহু শিল্পের ক্ষেত্রে আমদানির প্রয়োজনীয়তা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। তৃতীয়ত, প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিকে সুরু করা কাজগুলির জন্য আমদানির চাপ এই সময়ে দেখা দিয়াছিল। চতুর্থত, সরকারী বহু দপ্তর এবং বেসরকারী শিল্পপতিরা ভবিষ্যৎ মুদ্রা সংকটের আশংকায় প্রথম হইতেই নিজেদের প্রয়োজনীয় আমদানির জন্য চাপ দিয়াছিল। পঞ্চমত, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত পশ্চিমী দেশগুলির সহিত। ঐ সকল দেশে আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ায় পরিকল্পিত দাম অপেক্ষা বেশি দাম দিতে হইয়াছে। ষষ্ঠত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় এই সংকটের সম্ভাবনা প্রথম হইতেই ছিল, তাই অপ্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্য ও বিলাস সামগ্রী আমদানি আরও অনেক সুচিন্তিত ভাবে হ্রাস করা দরকার

আমদানি ও রপ্তানি উভয় দিক হইতেই এই সঙ্কটের উদ্ভব

ছিল। এই ব্যাপারে বেশ কিছুটা গাফিলতি হইয়াছে। সর্বশেষে রপ্তানির পরিমাণও বহু কারণে বাড়িতে পারে নাই। ভারতের ব্যবসাদারগণ ফাটকাদারির মনোবৃত্তি লইয়া বিদেশে মাল পাঠান, তাহার গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন থাকে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে; পশ্চিমী দেশগুলিতে যে মৃদু অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছিল তাহাব প্রভাবে রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে।*

এই সংকটের প্রতিকারের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে বা হওয়া দরকার ছিল তাহাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, তীব্র সংকটেব সম্মুখীন হওয়ায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আমদানি হ্রাস করার নীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন ধরনের নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, খাদ্যোৎপাদন বাড়াইবাব জন্য সরকার সচেষ্ট হন। চতুর্থত, অধিকতর বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ, বিনিয়োগ প্রভৃতি পাইবার চেষ্টা হয়। পঞ্চমত, পরিকল্পনার সংশোধন ও ছাঁটকাট করা হয়। সর্বশেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব মতে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং প্রায় ২০০০ কোটি টাকার রৌপ্য মজুত আছে। এই মজুত স্বর্ণ ও রৌপ্য টাকা দিয়া বা ঋণ করিয়া তাহাদের হাত হইতে লইয়া আসিয়া বিদেশী দ্রব্য আমদানির চিন্তা করা হয়। অবশ্য এই পদ্ধতি গৃহীত হয় নাই।

সংকট ত্রাণের পন্থা

* "The adverse foreign exchange situation that developed during the Second Plan was due partly to underestimation of the direct foreign exchange requirements of the Plan and partly to failure to take into account sufficiently the growing import needs of a developing economy. The sharp rise in the tempo of private investment in the early stages of the Plan also contributed to the difficulties, although this probably affected the timings of deficits rather than their total over the Plan period. The difficulties arising from these shortcomings in planning were aggravated by two bad agricultural seasons during the Plan period. Food imports provided for in the balance of payments estimates for the Plan were 6 million tons. Actual food imports over the Plan period have been about 20 million tons. Import of raw cotton have also been on a substantial scale. However since the emergence of foreign exchange crises stringent import policy has been followed. A rigorous system of exchange allocations on a half-yearly basis has been adopted and no significant fresh commitments have been made unless they were covered by external assistance." *Third Five Year Plan*. P. 109.

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রাক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা কি থাকিবে, তাহার হিসাব দেওয়া হইয়াছে। কমিশনের মতে, এই হিসাব অনেকাংশে আন্দাজী ধরনের, আগামী পাঁচ বছরে অনেক অনিশ্চয়তা দেখা দিবে, যাহাদের বর্তমানেই পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বলা হইয়াছে যে, মোট ১০৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা হইল ২০৩০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার প্রজেক্টগুলির দরুন এত টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়াও অর্থনৈতিক দেহের সাধারণ প্রয়োজনে আরও কিছু বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান দরকার। যেমন কাঁচামাল, আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, পুনসংস্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দরুন পাঁচ বছরে আরও ৩৬৫০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন। অর্থাৎ মোট প্রয়োজন দাঁড়াইল ৫৬৮০ কোটি টাকার।* বর্তমান বৎসরের দরুণ আবও দুইশত কোটি টাকার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার মোট প্রয়োজন

এই বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে তাহাও পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বছরে রপ্তানি হইতে মোট আয় হইবে ৩৭০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে পুরাতন ঋণ ও সুদ পবিশোধের দরুন ৫৫০ কোটি টাকা বাদ দিলে নীট বৈদেশিক মুদ্রার আয় দাঁড়াইতেছে ৩১৫০ কোটি টাকা। ফলে যে বিপুল পরিমাণ ঘাট্‌তি দেখা দিতেছে তাহা ২৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য দিয়াও পূরণ করা সম্ভব হইবে না। তাই কমিশন রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি-হ্রাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশনের নিজের ভাষায় বলা চলে যে, "The balance of payments difficulties that the country is facing are, it must be stressed, not short term or temporary ; they will continue for several years to come."

* "Actually, the needs are larger ; an estimate of Rs. 3800 crores over the five-year period would not be too high. Nevertheless, it is not possible at this stage to provide more resources for this purpose. This means that some underutilisation of capacity will have to be tolerated." *Third Five Year Plan.* P. 110.

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Prospect) :

একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের গভীরতা আরও ভালভাবে বুঝা যাইবে। প্রথমত, আমাদের আমদানি সংকোচন এমন এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহার বেশি আর কমান সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

আমদানি আরও কমিলে শিল্প প্রসার হ্রাস পাইবে

১৯৬১ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে মোট আমদানির ১৬% হইল মূলধনী দ্রব্য, ৬০% হইল শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল, ১৫% হইল খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্য-দ্রব্যের অংশ হইল মাত্র ৯%। এইরূপ অবস্থায় আমদানি সংকোচনের নীতি কিসের উপর প্রয়োগ করা হইবে? দ্বিতীয়ত, রপ্তানি বাড়াইবার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতেও বিশেষ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ অনেক। (ক) আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত তাহারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রয় ক্ষমতার সংকোচন, এবং অর্থ নৈতিক সংকটে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। (খ) রপ্তানি বাড়াইবার জন্যই তো যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি প্রথমে বাড়ান দরকার। (গ) বস্ত্র, পাট প্রভৃতি শিল্পে আধুনিকীকরণ ঘটিলে রপ্তানি বাড়ে বটে কিন্তু উহাতে বেকারি বৃদ্ধি পাইবে। (ঘ) দেশের মধ্যে ভোগবৃদ্ধির প্রবণতা যেরূপ বাড়িতেছে উৎপাদন তত বাড়িতেছে না, তাহাতে রপ্তানির জন্য উদ্বৃত্ত দ্রব্যও তেমন পাওয়া যাইতেছে না। (ঙ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং উন্নতর কাঁচামাল উৎপন্ন না হওয়ায় পাট, ইক্ষু ও তুলার দাম কমিতেছে না—জমিদারী প্রথার বিলোপ নীতি ব্যর্থ হওয়ায় কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ফলে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং রপ্তানি বাড়াইবার মত বৈদেশিক বাজার নাই এবং দেশের উৎপাদন ক্ষমতাও নাই। (চ) আমাদের বেশির ভাগ রপ্তানি হয় ব্রিটেনে। আর ব্রিটেন সম্প্রতি ইউরোপীয় সর্বজনীন বাজারে যোগদানের চেষ্টা করিতেছে। ফলে আমাদের রপ্তানি হ্রাস পাইবার আশংকা দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যের আমদানি হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। খাদ্যশস্য অনুসন্ধানী কমিশন স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে এখনও প্রতি বৎসর ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যের আমদানি করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রয়োজন আরও বাড়িবে

রপ্তানি বাড়াইবার মত বাজার নাই ; দেশের উৎপাদন ক্ষমতাও কম

কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানের ১·৯ হইতে বাড়িয়া ২%এ পৌছিয়া গিয়াছে। সরকারী কৃষিনীতি ব্যর্থ হওয়ায় এইরূপ ফলাফল নিশ্চয় দেখা দিবে। চতুর্থত, যে অধিকতর বৈদেশিক ঋণ, বিনিয়োগ বা সাহায্য পাওয়ার কথা হইতেছে, তাহার সহিত (রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়াও) কিছু কিছু অর্থনৈতিক সর্ত জড়িত আছে, যেমন ঋণদানকারী দেশ হইতেই এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পছন্দমত জিনিস কিনিতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্যের সহিতই যদি সরাসরি দ্রব্য আমদানির শর্ত জড়িত থাকে, তবে সেই বিদেশী মুদ্রার দ্বারা পরিকল্পনার দরুণ বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাট্‌তি মিটান যাইবে কিরূপে? পঞ্চমত, বিদেশী ঋণ পরিশোধ ও সুদ মিটাইবার জন্য ক্রমশ অধিক পরিমাণ রপ্তানির উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা দরকার। তাই বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন ক্রমশই বাড়িতে থাকিবে। সর্বোপরি, পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করার কাজে দেশের লোকের সহযোগিতা বিশেষ লওয়া হয় তাই। তাহাদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় নাই, গৃহের বন্ধন হইতে নারীমুক্তির আন্দোলন দেশের বৃহত্তর অংশকে সচেতন করে নাই, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার সরকারের হাতে চলিয়া আসিবে কিরূপে? দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মৌলিক ভারসাম্যহীনতা দূর হইতে পারে নাই। ইহার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে প্রধানত বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভরসা করিয়া পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে পরিকল্পনার মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন না ঘটিলে, চতুর্থ ও পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে বিদেশী সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বাড়িতেই থাকিবে।

কৃষিনীতি ব্যর্থ, জনসংখ্যা বাড়িতেছে, খাদ্যের আমদানি হ্রাস পাইতে পারে না।

বৈদেশিক সাহায্য ক্রমেই সর্ত জড়িত হইয়া উঠিতেছে

স্বর্ণ তৃষা ছাপাইয়া দেশপ্রেম জাগ্রত হয় নাই

রপ্তানি প্রসারের গুরুত্ব, প্রতিবন্ধক ও পদ্ধতি (Importance, Impediments and Measures of Export Promotion)

দেশের বৈদেশিক মুদ্রাখাতে ঘাট্‌তি পূরণ করার অনেক উপায় আছে: আমদানি কমান; বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্বর্ণ মজুতের তহবিল হইতে ব্যয়

করা; বিদেশ হইতে সাহায্য, ঋণ বা শেয়ার মূলধনে বিনিয়োগের জন্য অর্থ লইয়া আসা; অদৃশ্য উৎসসমূহ হইতে বাড়ান; এবং রপ্তানির প্রসার। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগই আর কার্যকরী হইবে না। আমদানির হিসাব নিম্নতম স্তরে নামান আছে; বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ মজুতের তহবিল ও এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে আর কমান চলে না; ষ্টার্লিং মজুত হ্রাস পাওয়ার ফলে উহা হইতে সুদের আয়ও কমিয়া গিয়াছে অন্যান্য 'অদৃশ্য' সূত্রও অনুপস্থিত। কেবল দুইটি পথ ধরিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানির প্রসার।

বৈদেশিক মুদ্রা সংকট রোধের পথ কি কি

বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা অপেক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধির পথ ভারতের পক্ষে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, রপ্তানি-ক্ষেত্রে অধিক আয় সৃষ্টি এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার হইতে উপকরণের অপসারণের দরুণ এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু ইহার সুবিধা হইল যে, ঋণ পরিশোধের এবং সুদ বহনের ভার বহন করিতে হয় না এবং রপ্তানি হইতে বর্ধিত আয়ের অন্তত কিছুটা অংশ হইতে স্থায়ী ধরনের আয় বৃদ্ধি ঘটিয়া যায়। বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না, বরং ইহাদের মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ভূমিকাই প্রবলতর, অন্তত যদি এই বৈদেশিক সাহায্য ভোগ্যদ্রব্যের রূপে আসে, অথবা এমন যন্ত্রের রূপে, যাহাতে অধিকতর ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু ঋণ করিলেই সুদ প্রদান ও পরিশোধের কথা আমাদের চিন্তা করিতে হয়, অথবা, শেয়ার-মূলধনের আকারে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশ করিলে মুনাফা পাঠাইবার অনুমতি দিতে হয়। উপরন্তু, দীর্ঘকাল ধরিয়া বৈদেশিক সাহায্য পাইবার সম্ভাবনাও ততটা থাকিতে পারে না। তাই রপ্তানির প্রসারই আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রহণীয় কাজ। তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশনের হিসাব মতে বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ তুলিতে হইবে ৬৯০ কোটি টাকায়, ১৯৫৯-৬০ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৬২৩ কোটি টাকা। এই পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইলে বিপুল প্রচেষ্টা করা দরকার।

বৈদেশিক সাহায্য বনাম রপ্তানি বৃদ্ধি

ভারতের রপ্তানি কেন বাড়ান যাইতেছে না, অর্থাৎ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকসমূহ আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, ভারতে জাতীয়

বর্তমানে শিল্পে বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করার সময়ে নিশ্চয় রপ্তানি-শিল্প গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।*

পঞ্চমত, স্বল্পকালেই অবশ্য রপ্তানি বাড়াইবার উপযোগী আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করা চলে। রপ্তানি শিল্পের বাড়্‌তি উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার (fuller utilisation of excess capacity in export industries); লাইসেন্সদানের পদ্ধতির উন্নয়ন; রপ্তানি-শুল্ক ও বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত রীতিনীতির সংস্কার; রপ্তানি দ্রব্যোৎপাদনের উৎকর্ষ-সাধন; বৈদেশিক বাজারগুলি সহিত সংবাদ আদান প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি,—এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি দিলে ইহাদের মিলিত ফল খুব কম হইবে না।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য ও উপায়সমূহ (Export objectives and measures in the Third Plan):

তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পন কমিশন মনে করেন যে, যে সকল কারণে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহাদের তুলনায় রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত নয়। অতীতের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হইল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে রপ্তানি প্রসারের কর্মসূচীকে গ্রহণ না করা। রপ্তানি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্নমুখী কার্যসূচী গ্রহণ করা দরকার। উহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে দেওয়া হইল:

(ক) আভ্যন্তরীণ ভোগকে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন, যাহাতে রপ্তানি-যোগ্য উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে;

(খ) কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হইলে আভ্যন্তরীণ বাজারেই ক্রমবর্ধমান মুনাফা পাওয়া সম্ভব, তাই রপ্তানি হইতে তুলনামূলক মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

(গ) ব্যয় কাঠামো এবং উৎপাদন ক্ষমতার দিক হইতে প্রধান রপ্তানি শিল্পগুলিকে যত দ্রুত সম্ভব উন্নত করিয়া প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করিয়া

* "And one has also to note that real cost of developing export industries is likely to be low—comparative advantage will play some part at least in selection of the industries to be devoloped—and that the initial capital cost and import contents of many of the export industries are likely to be lower than those of the industries producing import-sustitutes" *Prof. Bhabatosh Dutta*, "Exports and the Third Plan", an article in *Problems in the Third Plan*, A Critical Miscellany.

তুলিতে হইবে, এবং প্রত্যেকটি শিল্পের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা না করিলে রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং রপ্তানি বাণিজ্যে নূতন দ্রব্যসামগ্রী এবং খনিজ দ্রব্যের অংশ বাড়ান সম্ভব হইবে না।

(ঘ) দেশের জনমত যাহাতে রপ্তানির প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং রপ্তানির দরুণ ভার বহন করিতে সম্মত হয়, শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিকেরা যাহাতে এই প্রকার জাতীয় প্রচেষ্টাতে সহযোগিতা করে, বাজার-অনুসন্ধান এবং বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সরকারের নিজস্ব সংগঠন যাহাতে উন্নত হইয়া উঠে, ঋণ ও বীমার সুযোগ-সুবিধা যাহাতে প্রসারিত হয়—এই সকল উদ্দেশ্যে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। কমিশন বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতের রপ্তানি বাড়াইবার প্রচেষ্টা এবং বিদেশের চাহিদা অনুসারে আগামী পাঁচ বছরে রপ্তানির-মূল্য অতি অবশ্য ৩৭০০ কোটি টাকা করা দরকার। ইহা অপেক্ষা কম হইলে কিছুতেই চলিবে না, এমন কি এই সীমাতে পৌঁছিতে পারিলেও সমস্যা মিটিবে না। কমিশনের নিজের ভাষায় বলা চলে যে, "there would be quite serious short-falls in the Plan," তৃতীয় পরিকল্পনাতে রপ্তানি বৃদ্ধির উপর এতটা জোর দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল যে, এই সময়ের মধ্যেই রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষ পরিমাণে বাড়াইয়া রাখা দরকার, কারণ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদানের দায়িত্ব ক্রমাগত বাড়িবে, তাহা ছাড়া স্বাভাবিক উন্নয়নমূলক আমদানিও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুসারে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে রপ্তানির বাৎসরিক পরিমাণ হওয়া উচিত ১৩০০ হইতে ১৪০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ কম পক্ষে বর্তমানের দ্বিগুণ। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে দেশ আত্মনির্ভর ও স্বয়ংচলনশীল (self-relian. and self-sustained) হইয়া উঠিবার ইহা একটি অন্যতম প্রধান পূর্বসর্ত।*

* "An important reason for stressing new and far-reaching measures and policies for increasing exports during the Third Plan is that this is the period in which exports must be built up in order to meet the much larger requirements anticipated for the Fourth Plan. Considering the requirements on account of repayment obligations abroad and maintenance of

রপ্তানি বাড়াইবার নীতিসমূহকে পরিকল্পনা কমিশন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : সাধারণ নীতিসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ পণ্য সম্পর্কে নীতিসমূহ। রপ্তানির বৃদ্ধির সাধারণ নীতিসমূহের লক্ষ্য হইল দেশে রপ্তানি বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা, আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ সংকুচিত করিয়া রপ্তানি-যোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা। বিশেষ বিশেষ পণ্যের রপ্তানি-প্রসার সম্পর্কে রপ্তানি উন্নয়ত কাউন্সিলগুলি গড়িয়া তোলা দরকার (Export Promotion Councils)। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের কাজকর্ম আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন। কমিশনের মতে বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত বণ্টনে (countrywise distribution or direction , পরিবর্তন আনা দরকার। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সহিত ব্যাপকতর বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।*

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (The State Trading Corporation)

১৯৫৬ সালের মে মাসে সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানায় ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হয়। প্রথমে এই করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা, বর্তমানে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৫ কোটি টাকা। কোম্পানীর মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমদানি রপ্তানি এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজকর্ম করা ইহার উদ্দেশ্য।†

development imports, it is estimated that by the end of the Fourth Plan the annual level of exports would have to rise to about Rs. 1300 crores to Rs. 1400 crores, that is, to at least twice the present level. This is itself one of the essential conditions for ensuring that India's economy becomes self-reliance and self-sustained by the Fifth Plan." ***Third Five Year Plan.*** **P. 138.**

*** "These countries will need capital goods and components and raw materials for their economic development and mutual possibilities of developing trade with them should be vigorously explored."** ***Third Five Year Plan*** **P. 141.**

† "To organise and effect exports from and imports into India of all such goods and commodities as the company may from time to time determine, and the purchase, sale and transport of and general trade in such goods and commodities in India or anywhere in the world, and to do all such other things as are incidental or conducive to the attainment of the above object."

এইরূপ করপোরেশন স্থাপনের স্বপক্ষে ভারত সরকার অনেক যুক্তি দিয়াছিলেন। প্রথমত ভারতের সহিত রুশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ সকল দেশগুলিতে আমদানি রপ্তানির কাজ করে সেখানকার সরকার, তাই ভারতেও অনুরূপ সংস্থা গড়িয়া তোলা দরকার। দ্বিতীয়ত, সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার দরুণ প্রভূত আমদানির প্রয়োজন হইতেছে, উহার জন্য বাণিজ্যের নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অনেক অসম্পূর্ণতা দূর করিতে ইহা সাহায্য করিবে। তৃতীয়ত, আমদানি-রপ্তানির বেসরকারী ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে ব্যয় বহুল, ইহা বৃহৎ মাত্রায় কাজ করার দরুণ ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি পাইতে পারিবে। চতুর্থত, সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ব্যবসায়গত দিকে হইতে স্বল্পকালীন লোকসান মানিয় লইয়াও ইহা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার উদ্দেশ্যে রপ্তানি করিতে পারিবে।

ইহা স্থাপনের স্বপক্ষে কারণ কি

প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই করপোরেশন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানি বাড়াইয়া সেখান হইতে ইস্পাত, সিমেণ্ট এবং শিল্পগত যন্ত্রপাতি আমদানির প্রচেষ্টা করিতেছে। ভারতের বাণিজ্যে ইহা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করিতেছে এবং পুরানো ও নূতন রপ্তানি দ্রব্যের জন্য নূতন বাজার খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের রপ্তানির বিনিময়ে শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাচামাল আনার জন্য অনেক সময় ইহা এইরূপ সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কযুক্ত যুক্তি করিয়াছে (link deals)। এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে আমদানি করিয়া ইহা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনে সাহায্য করিয়াছে। এমনভাবে আমদানি ও বণ্টনের সময় নির্ধারণ (timing) করিয়াছে যাহাতে এই কাঁচামালগুলির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা না দেয়, দাম বৃদ্ধি না হয়, এবং দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যে সকল প্রধান দ্রব্যসামগ্রী করপোরেশন রপ্তানি করিয়াছে, উহারা হইল, খনিজ ধাতু, জুতা, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চা, কফি ও উলের জিনিস। আমদানি ও রপ্তানির কাজে সহায়তা করার জন্য বন্দর, খনি ও পরিবহন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নয়নের উদ্দেশ্যেও এই করপোরেশন কাজ করিয়াছে। করপোরেশনের উদ্যোগে জাপান ও অন্যান্য দেশের সহিত আকরিক লৌহ

কিরূপ কাজকর্ম করিয়াছে

রপ্তানি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন চুক্তি হইয়াছে, ইহাতে জাহাজঘাট ও খনির মধ্যে রেলপথ প্রসারণ সম্ভব হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত এই করপোরেশন মোট ১২০'০৪ কোটি টাকা মূল্যের লেনদেন করিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি প্রসারের যে-বিপুল পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, উহা কার্যকরী করিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন নিজ কাজকর্ম বিপুলভাবে প্রসারিত করিবে।

এই করপোরেশনের কাজকর্মের বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনা করা হইয়াছে। (ক) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের জন্য এই সংস্থা বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে নাই, বরং অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সুযোগ্য রপ্তানি বাণিজ্যের সূত্রগুলি বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। (খ) প্রত্যাশিত পরিমাণ অপেক্ষা ইহাতে পরিচালনগত ব্যয় হইয়াছে খুবই বেশি। (গ) আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সফলতার মূল কারণ হইল অবস্থা অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার যোগ্যতা। সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের ততটা নিজস্ব উদ্যোগ ক্ষমতা ছিল না, ফলে বহুক্ষেত্রে ইহা অনমনীয় ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, নিত্য নূতন অবস্থার সহিত দ্রুতভাবে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই।

সমালোচনা

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিশেষত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলধন-গঠনের প্রয়োজনে সরকারের হাতে ক্রমশ বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা লইয়া আসা দরকার। ইহা একমাত্র সম্ভবপর যদি বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার একটি বৃহৎ অংশ বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে লইয়া আসা যায়। শুধু তাহাই নহে। পরিকল্পনার অগ্রাধিকার অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে এই দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টন করা সম্ভব হয়। ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা তাই সঠিক পদক্ষেপ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আরও একটি কারণে সত্য। ঐতিহাসিক কারণে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসায় এখনও প্রধানত বিদেশী কোম্পানীসমূহের হাতে, ফলে ইহা হইতে মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ আভ্যন্তরীণ মূলধনের ভাণ্ডার বৃদ্ধি না করিয়া বিদেশে চলিয়া যায়। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন ইহার কিছু অংশ দেশের মধ্যে রাখিতে সাহায্য করিবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের গুরুত্ব আরও একটি কারণে বৃদ্ধি পাইবে

কারণ কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য এইরূপ বৃহৎ কোন একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে সে দরাদরির ক্ষেত্রে অন্য দেশের তুলনায় নিজ-দ্রব্যের দাম বেশি পাইতে পারে। রপ্তানি দ্রব্যগুলির জন্য চাহিদা অপর দেশে যত অস্থিতিস্থাপক, ততই এইরূপ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্য-হারকে নিজ দেশের অনুকূলে লইয়া আসিতে পারে। আমদানি-কারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশি থাকিলে রপ্তানিকারীদের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতা না থাকায় বাণিজ্য-হার অনুকূল হইবার সম্ভাবনা।*

অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ভূমিকা

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারতবর্ষ (European common market and India)

১৯৪৫ সালের পর হইতেই ইউরোপে একটি 'ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়িয়া তুলিবার প্রবল প্রয়াস ও তীব্র আন্দোলন দেখা দিতে থাকে। এই আন্দোলনের মূলে ছিল ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সীমাবদ্ধ শক্তির উপর ইউরোপীয়দের আস্থার অভাব। একদিকে শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপর দিকে সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েত ইউনিয়ন—এই দুই বৃহৎ শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা ইউরোপীয় দেশগুলির লোপ পাইয়াছে অতএব তাঁহারা এই দুই শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি তৃতীয় শক্তি গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। এই গোষ্ঠীজাতিক আন্দোলন কতকগুলি ইউরোপীয় সংগঠনের মাধ্যমে রূপ পাইয়াছে—ইউরোপীয় কমন মার্কেট বা সাধারণ বাজার ইহার অন্যতম।

১৯৫৭ সালের ২৩শে মার্চ রোম চুক্তি (Rome Treaty) অনুযায়ী ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজের সৃষ্টি হয় (European Econômic Community); ফ্রান্স, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ এই ছয়টি দেশ লইয়া এই সমাজ বা ইউরোপের একটি 'সাধারণ বাজার'

ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার কাহাকে বলে

* "One goal, which is commonly pursued when the foreign Trade of a country is centralised in the hands, of governmental agencies, is to secure an improvement in the terms of Trade of that country .....In short if there are no ready substitutes for a country's export, or if a country is responsible for a large share of the World Trade in the commodity involved, then its bulk-selling organisation should have good success in securing better prices and better terms." Tarshis, *International Trade and Finance* P. 408-10.

গড়িয়া উঠে। একদিকে পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকার শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া এবং বাধানিষেধ অপসারণ করা, অন্যদিকে এই চুক্তিভুক্ত দেশগুলির চতুষ্পার্শে অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক প্রাচীর তোলা—ইহাই ছিল বারোয়ারী বাজারের' প্রধান উদ্দেশ্য। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের সমান সুযোগের পথ উন্মুক্ত করা, সকল রকম শুল্কের বাধা ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে কয়েকটি দফায় দূরীভূত করা এবং বারোয়ারী বাজারের অন্তর্ভুক্ত সকল অঞ্চলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা গড়িয়া তোলা—এইগুলিও এই পরিকল্পনার অংশবিশেষ। শুধু পণ্যের অবাধ চলাচলই নহে, ইহার ফলে ক্রমশ মূলধন এবং শ্রমিকের যাতায়াতও অবাধে চলিতে পারিবে। ১৭ কোটি অধিবাসীর একটি বিরাট জনসংখ্যা এইরূপে কৃষি, শিল্প পরিবহন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নকল্পে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবে।

'কমনওয়েলথ'ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকায় ব্রিটেন প্রথমেই এই সাধারণ বাজারে যোগদান করে নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ইংলণ্ডের সাধারণ বাজারে যোগদানের প্রস্তাবনা ঘটিয়াছে। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল যে সাধারণ বাজারের সদস্য দেশগুলির সহিত তাহার বাণিজ্য-সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং সেই সম-শুল্কের বাজারে তাহাকে শুল্ক বৈষম্য জনিত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। ১৭ কোটি অধিবাসী লইয়া গঠিত এই বাজারে প্রবেশ করিলে ইংলণ্ডের কলকারখানাগুলি অধিকতর প্রসার লাভ করিবে, এবং ফলে উহারা বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সুবিধাগুলি পাইতে পারিবে। উপনিবেশ ও কমনওয়েলথ দেশগুলির সহিত তাহার বাণিজ্যের গতি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে বলিয়া ব্রিটেন মনে করে। ইহা ভিন্ন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের যুগপৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। পশ্চিম ইউরোপে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বাণিজ্য গোষ্ঠী থাকার ফলে পশ্চিমী শক্তিসমূহের ঐক্য ব্যাহত হইতেছে।

ইংলণ্ড কেন যোগ দিতে চায়

ইংলণ্ডের বারোয়ারী বাজারে যোগদানের বিপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখানো হয়। ইংলণ্ডের আধিপত্য নষ্ট হইবে ইহা অনেকেরই ভয় ছিল। ইংলণ্ডের কমনওয়েলথ দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং জগৎসভায় ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলিয়া যাইবে। অন্যদিকে বাজারের বাহিরে কমনওয়েলথ

দেশগুলি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলিও প্রসারিত হইতেছে। অতএব শুধু 'সাধারণ বাজারে' যোগদান সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না।

'ব্রিটেনের সাধারণ বাজারে' যোগদানের প্রশ্নে কমনওয়েলথ অন্তর্গত দেশগুলিতে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার অনেক কারণ আছে। ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘকালের—

ইংলণ্ড যোগ দিলে ভারতের উপর উহার প্রভাব

ভারতের চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য, কার্পাস-বস্ত্র, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতির ব্রিটেনই বড় ক্রেতা। ১৯৬০ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারত ইংলণ্ডে ১৭৫ টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছিল, যাহার মধ্যে ৭৫ কোটি টাকার চা, ১৬ কোটি টাকার সুতাবস্ত্র এবং ৬.৩৭ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য। কমনওয়েলথের সভ্য হিসাবে তামাক ব্যতীত আর সকল দ্রব্যই ভারত বিনা শুল্কে ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ড যদি সাধারণ বাজারে যোগ দেয় তাহা হইলে ভারত এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। ভারতের সর্বপ্রকার রপ্তানীদ্রব্য ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে চাহিলে অধিক হারে শুল্ক দিতে হইবে, ফলে আমাদের রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া যাইবে, বৈদেশিক মুদ্রা হইতে আয় হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে বৃহৎ শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা বাধা পাইবে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল ভারতে উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইবে। ভারতকে নূতন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর সহিত বস্ত্র শিল্পে, এবং বেলজিয়ামের সহিত পাট শিল্পে প্রতিযোগিতা হইবে। ভারতের রপ্তানি সংকোচন হইবে, কারণ বারোয়ারী বাজারের দেশগুলি এই সকল পণ্য বিনা শুল্কে ব্রিটেনে পাঠাইতে পারিবে, ফলে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দিবে।

অবশ্য বৃটিশমন্ত্রী মি. থর্নীক্রফ্‌ট ভারতবাসীকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলেও ভারতের স্বার্থ যাহাতে

ইংলণ্ড কর্তৃক আশ্বাস দান

অক্ষুণ্ণ থাকে ইহার প্রতি সে লক্ষ্য রাখিবে। যদি সে দেখে যে 'সাধারণ বাজার' সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া ক্রমশ অধিকতর নিঃস্বার্থ উন্মুক্ত বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে তবেই বৃটেন এই বাজারে যোগদান করিবে।

কিন্তু এই সকল আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও ভারত এবং অন্যান্য কমনওয়েলথের দেশগুলি বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না—কারণ ইহা নিশ্চিত যে কমনওয়েলথের

প্রতি পক্ষপাতিত্বের সর্তরক্ষা করিয়া ব্রিটেন সাধারণ বাজারে প্রবেশাধিকার পাইবে না, সুতরাং কমনওয়েলথভুক্ত সমস্ত দেশগুলির সহিত তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ভারতের এই সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান কোথায়? ইহা সুনিশ্চিত যে, জীব-জগতের প্রথমনীতিই হইল আত্মরক্ষা, ইহা ব্যক্তি ও জাতি উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। সেই জন্যই আমাদের উচিত ভারতের আর্থনীতিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যকে একটি দীর্ঘ মেয়াদী (long-term) ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা, যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ অবাঞ্ছিত চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ইহার থাকে।

স্বল্পকালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা কিছুটা অনুকূলে আনা যাইতে পারে। ভারতের রপ্তানি-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনব্যয় হ্রাস ও উহাদের গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব আনয়নের দিক লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকালে ভারতের উচিত হইবে আভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনের হারকে বাড়াইয়া তুলিয়া নিজের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। আবার অনেকে মনে করেন সাধারণ বাজারে ব্রিটেন যোগ দিলে ইহা ভারতের পক্ষে ভবিষ্যতে সুফলদায়ী হইবে। সাধারণ বাজারে যোগদান করিয়া ব্রিটেন যদি তাহার অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে কমনওয়েলথ দেশগুলিরও সুবিধা হইবে। ভারতের বাজার ব্রিটেনে, এমনকি সাধারণ বাজারের অন্যান্য দেশগুলিতেও সম্প্রসারিত হইবে।

এই অবস্থায় ভারতের কর্তব্য কি হইবে

'সাধারণ বাজারে' বৃটেনের যোগদান প্রসঙ্গে এই বিতর্কের আজ আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য নাই। কারণ ফ্রান্স কোনদিনই বৃটেনের যোগদানের প্রস্তাবকে ভাল চোখে দেখে নাই এবং মূলত ফ্রান্সের বিরোধিতার ফলেই বৃটেনের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হয় নাই। বৃটেনের নিজ দেশেও সকলে কমনমার্কেটে যোগদানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে নাই।

অনুশীলনী

1. Describe the changes that have taken place in the direction and composition of India's Foreign Trade as a result of the second world war and "Partition".

2. Write a short note on India's balance of payments in the post-war period.

3. Discuss the main features of India's export Trade and examine the prospects of increasing our export-earnings in the near future.

(C. U. B. Com. 1958)

4. Discuss the main factors that have affected India's balance of payments situation since the initiation of the Second Plan.

5. What are the main exports of India? What are possibilities of raising our exports in future?

6. Discuss the main features of the foreign Trade in India.

7. Describe the important trends in the direction of India's Foreign Trade since 1939.

8. What are the causes of the growing deficit in India's balance of payments? What steps have been taken to meet the situation?

9. Discuss the changes that have taken place in the nature, volume and direction of India's Foreign Trade in the last decade.

10. Indicate the main features of India's balance of payments in the post-war period. What measures would you suggest for improving her balance of payments position?

11. Examine the causes of the Foreign exchange crisis in India during the Second Five Year Plan.

12. Discuss the main factors that have affected India's balance of payments situation since the initiation of the Second Plan. What measures would you suggest for improving her balance of payments position?

13. Give a short account of India's balance of payments difficulties in recent years. How do you like to improve her balance of payments?

14. What have been the causes of India's balance of payments difficulties since the initiation of the Second Five Year Plan?

15. What are the economic reasons for a programme of export expansion? Explain, in this connection, the future prospects of India's exports.

16. Write short notes: State Trading Corporation.

17. Estimate the short and long term prospects for Indian exports. Examine the suitability of export promotion measures adopted by the government.

18. Write a note on the State Trading Corporation of India with special reference to (a) its constitution and functions, and (b) an assessment of its working.

19. Write short notes on: India and the European Common Market.

20. Discuss the impact of Five Year Plans on the nature and direction of India's foreign trade.

২৫

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money Market and Banking

ভারতীয় অর্থের বাজারের কাঠামো ও উহার বৈশিষ্ট্য (Structure of the Indian Money Market and its characteristics) :

আর্থিক নীতি সফল হইতে হইলে দেশে সুসংগঠিত অর্থের বাজার থাকা প্রয়োজন। ভারতের অর্থের বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দ্বৈতস্থিতি (dichotomy)—সুসংগঠিত, এবং অসংগঠিত, এই দুই অংশে ভারতের অর্থের বাজার বিভক্ত।

সুসংগঠিত অর্থের বাজার গঠিত হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহ ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ প্রভৃতি লইয়া। তাহা ছাড়া, এই বাজারে বিভিন্ন ধরনের দালাল বা মধ্যস্থানীয় ব্যক্তি কাজকর্ম করেন, যেমন তলব-ঋণের দালাল (call money brokers), সাধারণ ঋণের ও শেয়ারের দালাল প্রভৃতি। ভারতের অর্থের বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মধ্যে পারস্পরিক তলব ঋণের বাজার (Inter-bank call money market) ব্যাঙ্ক-সমূহের মোট আমানতের তুলনায় যদিও এই বাজারে লেনদেনের পরিমাণ খুব বেশি নয়, তবুও ইহাই অর্থের বাজারের সর্বাধিক স্পর্শ-কাতর (sensitive) ক্ষেত্র। এই তলব ঋণের বাজারে ষ্টেট ব্যাঙ্ক কোন অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রয়োজন হইলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ভারতীয় ব্যবস্থায় বিল-বাজার বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই তবুও বলা চলে যে ভারতের অর্থের বাজার "সংগঠিত সম্পর্ক এবং কার্য-বিশেষায়ণের দিক হইতে দেখিতে গেলে তুলনামূলকভাবে বেশ উন্নত।"

অর্থের বাজারের সুসংগঠিত অংশ

অসংগঠিত ক্ষেত্রের সকল অংশ সম্পূর্ণ একজাতীয় নয় (not homogenous)। ইহা প্রধানত "দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি" লইয়া গঠিত। এই বাজারে স্বল্পকালীন ও

দীর্ঘকালীন ঋণের পার্থক্যও অস্পষ্ট এবং ঋণের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রভেদ করা অসম্ভব ; কারণ হুণ্ডির (hundi or indigeneous bills of exchange) উপর লেখা থাকে না কি উদ্দেশ্যে এই ঋণ লওয়া হইতেছে। দেশে বাণিজ্যিক বিল (trade bills) কম থাকায় ভারতে কোন ডিস্‌কাউন্ট বাজার (discount markct) নাই। সাধারণত ফলপ্রসূ না হওযা পর্যন্ত (till maturity) বিলগুলি হাতে ধরিয়া রাখা হয় এবং বৈদেশিক বিলগুলিকে প্রধানত লণ্ডনের বিল বাজারে ভাঙাইয়া আনা হয়।

অর্থের বাজারের অসংগঠিত অংশ

এই দুইটি প্রধান অংশ ছাড়াও ভারতীয় অর্থের বাজারে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত আছে, যেমন পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশন, রাজ্য ফিনান্স করপোরেশনসমূহ, পুনর্গঠন অর্থসাহায্য করপোরেশন জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (NIDC), ভারতীয় শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (ICICI) প্রভৃতি। দেশে আর্থিক বাজারে ইহাদের অংশগ্রহণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ

ভারতের অর্থের বাজারের কাঠামো তাই কিছুটা শিথিল হইলেও একেবারে সম্পূর্ণ অসংগঠিত নয। দেশীয ব্যাঙ্কগুলি ও মহাজনেরা অনেক পরিমাণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে ঋণ পায়, এই ব্যাঙ্কেরা আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই অর্থের বাজারের মধ্যমণি ; তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই বাজারে সংগঠিত অংশের কাজকর্ম নিযন্ত্রিত হয় এবং অসংগঠিত অংশের কাজকর্ম প্রভাবান্বিত হয়।

অপূর্ণোন্নত দেশে টাকার বাজার সুসংগঠিত থাকে না। ভারতের টাকার বাজারেও উপযুক্ত সুদে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা লেনদেন করার মত প্রতিষ্ঠানের অভাব দেখিতে পাওযা যায়। দেশে টাকার যোগান বলিলে বোঝা যায কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু নগদ টাকা এবং দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট ঋণগত অর্থ উভয়ের মিলিত পরিমাণ। ব্যাঙ্কিং অভ্যাসের প্রচলন বেশি এরূপ পূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ঋণগত অর্থসৃষ্টির ক্ষমতা দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত শক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ। অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যাঙ্কব্যবস্থার ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা আরও অধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষে

অপূর্ণোন্নত ভারতীয় অর্থের বাজারের বৈশিষ্ট্য

তাই, টাকার মোট যোগানের খুব বেশি অংশ (প্রায় ⅔ ভাগ) হইল নগদ টাকা। আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক হইতে যে পরিমাণ নগদ টাকা বাহির হইয়া যায়, তাহার একটি বড় অংশ আমানতের আকারে আবার ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসে না; তাই ব্যাঙ্কব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত ও বেশি পরিমাণ ঋণগত অর্থ সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহার ফলেই সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশ ক্রমশ বাজারে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইতে থাকে, এবং বিনিময়যোগ্য বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন হইতে থাকে। ভারতবর্ষেও তাই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ও সুসংগঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশ গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India)

১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সুরু হইয়াছে। ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব বহু পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলা ও বিহারের জন্য একটি সাধারণ ব্যাঙ্ক' (General Bank of Bengal and Bihar) স্থাপনের কথা জানাইয়াছিলেন। উহার পরে বিভিন্ন সময়ে অনেকবার ইহার কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই প্রস্তাব ক্রমে রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হইয়া উঠিল এবং ১৯২১ সালে তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। তখন সকলে আশা করিয়াছিলেন যে এই প্রতিষ্ঠানই পূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপযোগী কিছু কিছু কাজকর্ম চালাইত (যেমন, সরকারের ব্যাঙ্ক রূপে কাজ করা), যদিও নোট প্রচলনের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের। ১৯২৬ সালে ভারতের মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন (The Royal commission on Indian currency and finance), সাধারণত যাহা হিল্টন-ইয়ং কমিশন নামে পরিচিত) বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মধ্যে মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা সম্পর্কে এইরূপ দায়িত্বের বিভাগ এবং এই বিষয়ে উভয়ের নীতির পার্থক্য—ইহাই আর্থিক ব্যবস্থার বিরাট ত্রুটি। কমিশন তাই একটি কেন্দ্রীয়

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করিলেন। বিভিন্ন কারণে এইরূপ স্থাপনের প্রচেষ্টা দ্রুত কার্যকরী হইল না, ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে এই বিষয়ে বিল উপস্থিত হইল এবং ১৯৩৪ সালে পাশ হইল। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ইহা কাজ শুরু করিল। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মদেশ পৃথক হওয়ায় এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান পৃথক হওয়ায় ইহার কার্যের এলাকা হ্রাস পাইল, তবে ১৯৪২ সালের জুন মাস এবং ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ইহা উভয় দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ চালাইয়াছিল। ভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটায়, ইহার কার্য এলাকা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৎকালীন প্রধান বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির উদাহরণ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার হোল্ডারদের ব্যাঙ্করূপে গঠিত হইয়াছিল। ইহার মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা, প্রতি শেয়ার ১০০ টাকা দামে ৫ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। প্রায় সম্পূর্ণ শেয়ারই ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডারদের হাতে ছিল, কিন্তু ইহা জনপ্রিয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া শেয়ার হাতে রাখা ও ডিভিডেণ্ড সংক্রান্ত কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। আইনে আরও লেখা ছিল যে, যদি কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করিতে না পারেন তাহা হইলে সরকার পরিচালক বোর্ড বাতিল করিতে পারিবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও সরকারের আর্থিক নীতির মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় লইয়া আসার কথা অনেক কাল হইতে আলোচিত হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর, এবং তদানীন্তন জনমতের চাপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে, মনে রাখা দরকার যে, যুদ্ধোত্তর যুগে কতিপয় ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (যেমন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড বা ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স প্রভৃতি) রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (জনমালিকানায় আনয়ন) আইন অনুসারে সমগ্র শেয়ার-মূলধন কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয় করিয়া লইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনাধীনে আসিয়াছে।

স্বাধীনতার পর জাতীয়করণ

ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও কার্য পদ্ধতি সমানই আছে, ১৯৪৮ সালের আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনমত নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের সকল ডিরেক্টার,

গভর্ণর, ডেপুটি গভর্ণর ও লোক্যাল বোর্ডের সকল সভ্য এখন কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করিয়া থাকেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ (Functions of the Reserve Bank of India):

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বপ্রধান কাজ হইল দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে (monetary system) এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব বজায় থাকিতে পারে এবং সরকারের সাধারণ অর্থ নৈতিক নীতির কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের মুখবন্ধে বলা হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল, "ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন এবং জমা রাখার ব্যবস্থা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে ভারতের আর্থিক স্থায়িত্ব সম্ভব হয় এবং দেশের স্বার্থে উহার মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাকে পরিচালিত করা যায়।"* দেশের আর্থিক যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কিং ও ঋণব্যবস্থাকে আয়ত্তে রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির) ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাজ করে—এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজের ইচ্ছামত ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি ও পরিমাণ স্থির করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের কর্তব্য পালন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে কেবলমাত্র ব্যাঙ্কহার পরিবর্তন, খোলাবাজারে কাযকলাপ, ব্যাঙ্কজমার অনুপাতে পরিবর্তন—প্রভৃতি ক্ষমতাই নাই, ইহা ছাড়াও ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন অনুযায়ী বিশেষ ধরনের ও প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণের (selective and direct credit regulation) ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের একটি কাজ হইল সরকারের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক কাজকর্ম পরিচালনা করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কল্যাণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় টাকার বৈদেশিক মূল্য স্থির রাখাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

নোট প্রচলনের একাধিকার

ঋণনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

* "To regulate the issue of Bank notes and the keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage".

কাজ। এই কাজ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংগ্রহ ও পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সরকার যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন।

ও অন্যান্য দায়িত্ব

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজকর্ম শুরু হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্মের পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে। কিছুকাল পূর্বে যে সকল কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কার্যপরিধির বাহিরে ছিল, আজকাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সেই সকল উন্নয়নমূলক কিছু কিছু কাজকর্মের দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। চিরাচরিত মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজকাল ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ও উপযুক্ত ধরনের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে। কৃষিঋণ সরবরাহ করার দায়িত্ব ইহার প্রথম হইতেই ছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসরেই মাত্র এই বিষয়ে উপযুক্ত প্রসার ঘটান হইয়াছে। শিল্পের ঋণ সরবরাহের সুবিধা সুযোগ বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্ক সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের কর্তা বলিয়া এবং সরকারের ব্যাঙ্করূপে কাজ করায় সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ইহা সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে।

বর্তমানে উন্নয়নমূলক আর্থিক নীতি কার্যকরী করার দায়িত্ব

বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, দেশের লেনদেন ব্যালান্স, কোম্পানীসমূহের ও সরকারের আর্থিক অবস্থা, শেয়ার বাজার প্রভৃতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করিয়া, উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া, নিয়মিত প্রকাশ করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অনেকাংশে বহন করিতে হইতেছে।

মূল্য নির্ণয় (Evaluation) :

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জীবনের প্রায় ৩০ বৎসর শেষ হইয়াছে। কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহাকে বিশেষ দীর্ঘকাল বলা চলে না। ইহার প্রতিষ্ঠার পর চার বৎসর ধরিয়া নিজস্ব সংগঠন ও কাজকর্মের সমন্বয় সাধনের পর্ব চলিয়াছে, মুদ্রা প্রচলন ও সরকারের ব্যাঙ্করূপে কাজ করাই ইহার প্রধান দায়িত্ব ছিল। পরবর্তী সাত বৎসর ধরিয়া বিশ্বযুদ্ধজনিত বহুবিধ সমস্যা এবং কাজকর্মে স্বাধীনতার অভাবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। যুদ্ধকালীন সরকারী মুদ্রা ও ঋণনীতি,

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মুদ্রানীতি কার্যকরী করিতে ইহার সকল শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারা যায় নাই।* যুদ্ধের পরেই দেশবিভাগ হওয়ায় নূতন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছিল, যেমন পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি ও যুদ্ধোত্তর বিশৃংখলার দরুণ ছোট ছোট ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাওয়া প্রভৃতি। এই সকল সমস্যা কাটাইয়া উঠিয়া বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার উপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে ঋণ দানের ব্যাপারে, পর্যাপ্ত না হইলেও, মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দেশে উপযুক্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। উন্নয়নমূলক ও নিয়ন্ত্রণশীল—উভয় প্রকার কাজকর্মে ব্যাঙ্ককে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে হইলে আগামী কয়েক বৎসরে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্রমেই অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ (Reserve Bank and the Control of Money Market)

দেশের অর্থ নৈতিক দেহে টাকার প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটিলে উহাতে অর্থের যোগান বাড়াইবার বা কমাইবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার অর্থ ও ঋণ-নীতি পরিচালনা করে। আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম কেবলমাত্র অর্থের যোগানকে প্রভাবিত করিয়া ক্ষান্ত থাকে তাহা নহে, দেশের পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ব্যবসায়-জগতে বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও আনে। নগদ টাকার পরিমাণ এবং ব্যাঙ্কের ঋণসৃষ্টির পরিমাণ উভয় দিক হইতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। অবশ্য, প্রধানত, তিন দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, ভারতের আর্থিক বাজারের অসংগঠিত অংশ এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। দ্বিতীয়ত, সরকারের বাজেটে আয় ব্যয়ের যে নীতি ও পদ্ধতি পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তাহা মানিয়া নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ

তিন দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ

* "Little scope was left for perfecting the machinery for the discharge of the more normal functions of a Central Bank".

ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। তৃতীয়ত, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণে কম বেশি হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম প্রভাবিত হয়, সুতরাং আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

নগদ টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে খুবই বেশি। ভারতের টাকার বাজারের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন মরসুমে নগদ টাকার চাহিদায় উঠানামা (Seasonal variation in the demand for cash)। কৃষিজাত শস্যদ্রব্যের বিক্রয় ও লেনদেনের সময় দেশের টাকার চাহিদা বাড়ে, এই ফসল কাটার মরসুমের পরে টাকার চাহিদা আবার হ্রাস পায়।* বৎসরকে মোটামুটি দুইভাবে, তেজীর মরসুম ও মন্দার মরসুম (busy season and slack season) ভাগ করা চলে। অবশ্য বর্তমানে কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হওয়ায় বিভিন্ন মরসুমের মধ্যে টাকার চাহিদার উঠানামার বিস্তৃতি ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। তেজীর সময়ে (অক্টোবরের শেষ হইতে এপ্রিলের শেষ) ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের নিকট নগদ টাকার জন্য হাজির হয়, নিজস্ব আমানত তুলিয়া লয় বা ধার করিয়া বেশি টাকা ধার চায়। ব্যাঙ্কগুলি তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাহাদের জমা টাকা তুলিয়া লয় বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে [illegible]। মন্দার সময়ে (এপ্রিলের শেষ হইতে অক্টোবরের শেষ) নগদ টাকা ব্যবসায়ীদের হাত হইতে ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট [illegible] হয়। টাকার চাহিদায় এই মরসুমী উঠানামাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

তেজী ও মন্দার মরসুমী উঠানামা

১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের দুইটি পদ্ধতি ছিল, ব্যাঙ্ক-হার পরিবর্তনের ক্ষমতা এবং খোলা বাজারে কাজ করার ক্ষমতা।

গত ২৪ বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক-হারে চারিটি পরিবর্তন হইয়াছে। শুরুতে ব্যাঙ্ক-হার ছিল ৩½%, ১৯৩৫ সালে নভেম্বরে প্রথম পরিবর্তনে ইহা

* শিল্পোন্নত দেশেও টাকার চাহিদার উঠানামা হয়, যেমন জাতীয় ছুটি বা বড়দিনের উৎসবের সময় টাকার চাহিদা বাড়ে। সেই সকল দেশে এই সময়ে লোকের ব্যয় বাড়িতে চায় বলিয়া টাকার জন্য চাহিদা বাড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে শস্যদ্রব্যের উৎপাদনের সহিত টাকার চাহিদার উঠানামা জড়িত। তাই এই দুই ধরনের দেশের টাকার চাহিদার মরসুমী উঠানামার কিছুটা পার্থক্য আছে।

হইয়াছিল ৩% ; ১৯৫১ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয় পরিবর্তনে ইহা হইয়াছিল ৩½% ; ১৯৫৭ সালের মে মাসে ইহাকে বাড়াইয়া ৪% করা হইয়াছিল। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী হইতে ইহা হইয়াছে ৪½%। প্রথমদিকে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভব্যাঙ্কের সহিত বিশেষ লেনদেন করিত না, কিন্তু ক্রমেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর তাহাদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাই ব্যাঙ্কহারের গুরুত্ব বাড়িয়া চলিতেছে। বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণের সুদের হার এবং বিভিন্ন প্রকার সুদের হারে মরসুমী পার্থক্য—এই সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যের ফলে সম্ভবপর হইয়াছে।*

ব্যাঙ্কহারে পরিবর্তন

ব্যাঙ্কহারে পরিবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে দেশের ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার পথে ভারতে কয়েকটি বাধা আছে। যেমন, ভারতে সরকারী ঋণপত্রের গুরুত্ব অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে বাণিজ্যিক বিলের পরিমাণ বেশি, ভারতে উহাদের পরিমাণ কম। তাই ভারতে সরকারি ঋণপত্রের দামে পরিবর্তন আসিলে মূলধনের বাজার অনেক বেশি প্রভাবিত হয়। সুদের হার বাড়াইলে, অর্থাৎ সরকারী বণ্ডগুলি কম দামে বিক্রয় করিলে, অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল কেহ কিনিতে চাহিবে না, স্বভাবতই তাহারা অর্থের অভাব অনুভব করিবে। কিন্তু সরকারের উপর অধিক সুদের হার বহন করার দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে; পরিকল্পনার যুগে তাই সুদের হার বেশি বাড়ান সরকারের পক্ষে বিপদজনক। উপরন্তু ব্যাঙ্করেটে বৃদ্ধির দরুণ বাজারে সুদের হার বাড়িয়া গেলে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে পারে। আর যদি তাহারা ঋণগ্রহণ কমাইয়া দেয়, তবে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া গিয়া উন্নয়নের হার হ্রাস পাইতে পারে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ব্যাঙ্কহার নীতিকে প্রয়োগ করা দরকার।

এই নীতি প্রয়োগ করার অসুবিধা

* "Over three years, the Bank has, by its loan and open market operations, succeeded to a considerable extent in reducing the level of interest rates in general and call money and *bazar* bill rates in particular, as also in mitigating the seasonal fluctuations in interest rates, which had been a marked characteristic of the Indian money market prior to the Bank's establishment."—*The Reserve Bank of India, Functions and Working.* (Sept, 1958); P. 38—39.

ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খোলাজারে কার্যকলাপের পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সরকারী ঋণপত্র ক্রয় ও বিক্রয়ের মারফৎ বিভিন্ন মরসুমে বা প্রয়োজনমত সমাজে টাকা ঢালিয়া দেওয়া বা ছাঁকিয়া তোলা ইহাই খোলা বাজারে কার্যকলাপের পদ্ধতি। ভারতের আইনগত ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো সাধারণভাবে খোলা-বাজারী কার্যকলাপের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ আছে, বাহিরে ব্যক্তিগত ক্রেতাদের মধ্যে খুব বেশি ক্রয়বিক্রয় ঘটে নাই, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতিই সরকারী ঋণপত্রের প্রধান গ্রহীতা। যুক্তরাষ্ট্রে বা ইংলণ্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ট্রেজারি বিলের সাহায্যে খোলাবাজারে কার্যকলাপ চালায়, কিন্তু ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রধানত সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। মন্দা-মরসুমে (slack season) দেশের ব্যাঙ্কগুলি সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া রাখে এবং তেজী-মরসুমে (busy season) ব্যাঙ্কগুলি উহার বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা পাইতে পারে। বাজারের প্রয়োজন ছাড়াও, সরকারী ঋণের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এইরূপ খোলাবাজারী কার্যকলাপের পরিমাণ ছিল খুবই কম, যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-সমূহ প্রচুর পরিমাণে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়াছিল, যুদ্ধোত্তর যুগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ ঋণপত্রসমূহ ক্রয় করিয়া লইয়া ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা ঢালিয়া দিয়া ঋণপ্রসারের ভিত্তি প্রশস্ত করিয়াছে। ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে 'ঝটিকা কার্যকলাপ' (Switch operations) করিয়াছে, অর্থাৎ, এক ধরনের ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া একই সঙ্গে অন্য ধরনের ঋণপত্র ক্রয় করিয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন ঋণপত্রের সুদের হারে বিশেষ অসামঞ্জস্য থাকিতে না পারে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগকারী বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি বহনের সুযোগ পায়।*

খোলা বাজারী কার্যকলাপের রূপ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের চাহিদা-আমানতের ৫% এবং কাল আমানতের ২% (5 per cent of their

* "Apart from outright purchases or sales, the Bank engages extensively in 'switch' operations, that is, purchases of one loan against sales of another and *vice versa* to maintain an orderly pattern of yields and to cater to the varying requirements of investors with respect to maturity distribution policy"—*op. cit.* P. 41.

demand liabilities and 2 per cent of their time liabilities) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে। বর্তমানে ইহার পরিমাণ হইল তাহাদের দৈনিক গড় চাহিদা ও কাল-আমানতের ৩%। ইহা ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে, ব্যাঙ্কগুলিতে অতিরিক্ত আমানত হইতে থাকিলে, উহার একাংশ জমা হিসাবে দাবি করিতে পারে।

ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন

সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কি উদ্দেশ্যে ও কাহাদের ঋণ দিতে পারিবে এই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে (২১ নং ধারা) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়ে ঋণ দেওয়া উচিত কি অনুচিত, কি পরিমাণ ঋণ দেওয়া বা বন্ধক রাখা উচিত কি অনুচিত, এই সকল বিষয় ব্যাঙ্কগুলিকে জানাইয়া আসিতেছিল। ১৯৫৬ সালের মে মাসে সর্বপ্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ধান ও চালের ফাট্‌কা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কঋণ দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং বন্ধকীর পরিমাণ বাড়াইতে নির্দেশ দিলেন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে অন্যান্য খাদ্যশস্য, ডাল ও মিলবস্ত্রের ক্ষেত্রেও এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'বাছাইকরা ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি' একটু শিথিল করেন। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষ ভাগে সীমান্ত সংঘর্ষের দরুণ ১৯৬৩ সালের শুরুতে আবার কড়াকড়ি শুরু হয়।

বিশেষ উদ্দেশ্যে ঋণদান নিয়ন্ত্রণ

ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নৈতিক প্রভাব খাটাইয়া দেশের ঋণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিয়াছে। যেমন, ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় টাকার বহির্মূল্যহ্রাসের পর (devaluation) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর প্রধান ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষদের ডাকাইয়া ফাট্‌কা নিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ না দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। খাদ্যশস্যের ফাট্‌কা নিয়োগের ক্ষেত্রেও এইরূপ সম্মেলন হইয়াছিল এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রকাশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত অসহযোগিতা করিতে পারে নাই।

নৈতিক প্রভাব

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন এবং ১৯৪৯ সালের সংশোধনী আইন উভয়ই ১৯৬২ সালে সংশোধিত হয়, যাহাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অধিকতর সময়ের জন্য বেশি পরিমাণ ঋণ দিতে পারে।

এই সকল পদ্ধতি ছাড়াও ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কৃষি ঋণ (Reserve Bank and Agricultural Credit)

১৯৩৫ সালে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইহার অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কৃষিঋণ সরবরাহের সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণ করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি পৃথক কৃষিঋণ বিভাগ আছে। ইহার কাজকর্ম প্রধানত তিনটি : (ক) কৃষিঋণ সংক্রান্ত সকল বিষয় দেখাশোনা ও গবেষণা করার উপযোগী সুদক্ষ কর্মী রাখা ; (খ) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার, রাজ্য সমবায় সমিতি ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনমত এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ; এবং (গ) শস্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় ও অন্যান্য কৃষি কাজকর্মের সহায়তার জন্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কৃষিঋণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি বৈশিষ্ট্য

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিরূপে কৃষিঋণ সরবরাহে সাহায্য করে? কোন কৃষক গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতির নিকট হইতে ঋণ চাহিল। সেই সমিতি জিলাস্তরের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিল। এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আবার রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ চাহিল। নিজস্ব অর্থের ভাণ্ডারে না কুলাইলে এই তিন স্তরের সমবায়ী প্রতিষ্ঠানই নিজের ঠিক উপরিস্থিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হাজির হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নগদ টাকার প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহার নিকট হইতে ঋণ লইয়া সেই টাকা গ্রাম্য সমিতিদের হাতে পৌঁছাইয়া দেয়।

কিরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থ ঋণ দেয়

কয়েক বৎসর পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কৃষিঋণের অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে সারা ভারত কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, ভারতে সমবায় আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কমিটি সুপারিশ করেন যে, সমবায় আন্দোলন এবং সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার মধ্য দিয়াই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কমিটির মতে সমবায় আন্দোলনে অধিকতর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব থাকা উচিত এবং নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন সমবায়ী

প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশীদারত্ব থাকাও দরকার। সরকার এই রিপোর্টের সুপারিশসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইরূপে বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের সমবায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

প্রথম হইতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগ সমবায় আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কম সুদে ঋণ দিবার ও সমবায়ী ঋণপত্রগুলি ডিস্‌কাউন্ট করার সুযোগ দিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনেক দিক হইতে সংশোধন করিয়া গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহ আরও অনেক পরিমাণে সুবিধাজনক করিয়া তোলা হইয়াছে। যেমন, (ক) ব্যাঙ্কহার বহুবার বৃদ্ধি পাইয়াছে. ১৯৫১ সালের নভেম্বরে ৩% হইতে ৩½% হইয়াছে, ১৯৫৭ সালের মে মাসে ৪% হইয়াছে. ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ৪½% হইয়াছে। কিন্তু কৃষিঋণ এখনও ১½% হইতে ২%-এর মধ্যেই সরবরাহ করা হইতেছে। (খ) অর্থ প্রেরণের খরচা বহু পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ (গ) শস্য ক্রয়বিক্রয়ে সাহায্য করার জন্য যে বিলের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দেওয়া হয় সেই বিলগুলির ফলপ্রসূকাল (period of maturity) ৯ মাস হইতে বাড়াইয়া ১৬ মাস করা হইয়াছে। এই সকল পদ্ধতি ছাড়া ১৯৫৪ সাল হইতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যকালীন ঋণ দিতেছে। দীর্ঘকালীন কৃষিঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ইহা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ডিবেঞ্চারও ক্রয় করিতেছে। ইহা ব্যতীত গবেষণা, রিপোর্ট ও সুপারিশের কাজও অব্যাহত রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, 'ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে সমবায় আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইহার সাহায্যের রূপ ছিল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম উদারক করা, শিক্ষাদানেব ব্যবস্থা করা, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার-মূলধনে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারকে ঋণ দেওয়া, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ ঋণ দেওয়া প্রভৃতি। ইহার ঋণদানের পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১৪ কোটি টাকা, তাহা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৯-৬০ সালে দাঁড়াইয়াছে ৮৫ কোটি টাকা। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কৃষিগত লক্ষ্য ও ঋণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাপকতর ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইতেছে। ঋণদানের সময়ে

তৃতীয় পরিকল্পনা, কৃষি ঋণ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বভাবতই নির্ভর করে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শক্তি ও পরিচালনগত দক্ষতার উপর এবং সেই সঙ্গে ঋণ ব্যবহারের উপর তদারকি ও ঋণের পরিশোধ বিষয়ে অতীত কার্যকলাপের উপর। প্রতিটি রাজ্য আমানত সংগ্রহ করার কাজে ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করার কাজে কতটা সফল হইয়াছে, তাহাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণদানের সময়ে বিচার করে। যে সকল রাজ্যে প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে উপযুক্ত অগ্রগতি হয় নাই সেখানকার সমবায় আন্দোলনের আর্থিক কাঠামো পুনর্গঠন করার কাজে সেই রাজ্য সরকারকে সাহায্য করার বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।*

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের ত্রুটি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ (Defects of commercial Banks in India and Reserve Bank's Control):

১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (The Central Banking Enquiry Committee) ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে "একদিকে দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের বিপদজনক প্রতিযোগী বলিয়া মনে করে, অপরদিকে তাহারা প্রায়ই প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ ও শক্তিশালী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার দুয়োরাণী (cinderella বলা চলে'।† কিছুদিন পূর্বেও ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ উপযুক্ত পরিমাণ আমানত পাইত না বা সেই আমানত খাটাইবার মত উপযুক্ত বিনিয়োগক্ষেত্র পাইত না। সরকারী অর্থ, মিউনিসিপালিটি, স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থ কিছুই তাহাদের নিকট জমা হইত না, ভারতীয় জনসাধারণ বা ব্যবসায়ীরাও তাহাদের নিকট অর্থ আমানত রাখিতে চাহিত না। ব্যবসায় বাণিজ্য বিনিয়োগের সূত্রগুলির উপর বিদেশী

* *Third five year plan* P. 206

† "On the one hand they are looked upon as dangerous rivals by the indigenous bankers and on the other, they frequently find themselves in opposition to the old established exchange banks and the powerful Imperial Bank of India. Placed in this position, they have been called the cinderella the Indian Banking system." *The Central Banking Enquiry Committee.*

প্রভাব থাকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের পক্ষেও বৈদেশিক ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সুবিধাজনক ছিল।

ইহা ব্যতীত ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আরও অনেক বহিরাগত ত্রুটি ছিল, যেমন উপযুক্ত ধরনের বাণিজ্যিক বিলের অভাব, ব্যক্তির পরিচিতির ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ার আইনগত বাধানিষেধ, ক্লিয়ারিং হাউসে প্রবেশের বাধা নিষেধ, দেশের অধিকাংশ লোকের অপরিচিত ইংরাজী ভাষায় ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনা, হিন্দু-মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের জটিলতার দরুণ সম্পত্তি বন্ধক লইয়া ঋণ দেওয়ার অসুবিধা প্রভৃতি। আভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে প্রধান ছিল মূলধনের স্বল্পতা। তাহা ছাড়া রিজার্ভ ফাণ্ডে অর্থ মজুত না করিয়া তাহার লভ্যাংশ বণ্টন করিত। যুদ্ধের সময়ে সরকারী ঋণপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা চিন্তা না করিয়া খাতায় পত্রে লাভের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহারা এরূপভাবে বিনিয়োগ করিত যে বিনিয়োগের তারল্য (liquidity) বজায় থাকিত না। ব্যাঙ্কিং ব্যবসার অন্তরালে উৎপাদন, লেনদেন ব্যবসায়, ফাট্‌কা ব্যবসায় প্রভৃতি করিতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। একচেটিয়া অধিকার ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি, দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কই বা বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে বদনাম রটাইয়া উহাদের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস আনিয়া এই একচেটিয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের অবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী করিয়াছে। হিসাবপত্রে চুরি করা, অযথা শাখা প্রসার করা, বেনামীতে ঋণ গ্রহণ করা—এই সকল ত্রুটি ও অসাধুতার জন্যও ভারতে এত ব্যাঙ্ক বিনষ্ট (bank failures) হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার কারণ

এই সকল ত্রুটি দূর করার জন্য এবং এত বেশি পরিমাণ ব্যাঙ্ক যাহাতে বন্ধ না হয় তাহা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ১৯৬৪ সালে একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া যে কোন ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই বৎসরই একটি আইন পাশ করা হয় যাহাতে বলা আছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যাঙ্ক নূতন কোন শাখা স্থাপন বা পুরাতন কোন শাখা অন্যত্র অপসারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল

ত্রুটি দূর করার সরকারী প্রচেষ্টা

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন। পরবর্তী কালে এই আইন সংশোধিত হইয়াছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির উপর এই আইন প্রযোজ্য নয়। সিডিউল বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলিকেও এই আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। এই বিস্তৃত ও সুচিন্তিত আইনের প্রভাবে আজ ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বহু ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হইতে পারিয়াছে।

এই আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। (ক) যাহাতে যত্র তত্র অচিন্তিতভাবে ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুত তহবিলের নিম্নতম পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, একাধিক রাজ্যে ব্যবসায় চলিতে থাকিলে ভারতীয় কোন ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম হইতে পারিবে না এবং বোম্বাই বা কলিকাতায় কোন অফিস থাকিলে সেই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকার কম হইলে চলিবে না। মুনাফা হইতে ২০% প্রতি বৎসর মজুত তহবিলে রাখিয়া দিতে হইবে যতদিন না পর্যন্ত মজুত তহবিল আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণে পৌঁছায়। (খ) কাজকর্মে তারল্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ককে উহার মোট চাহিদা আমানত ও কাল-আমানতের অন্তত ২০% জমা রাখিতে হইবে নগদ টাকা, সোনা বা অনুমোদিত শেয়ারে। (গ) ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ছাড়া অপর কোন ব্যবসায়ে, ফাটকাদারিতে ও উৎপাদনের ব্যাপারে কোন ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। (ঘ) ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী বা বা উপদলের একচেটিয়া অধিকারে বাধা দিবার উদ্দেশ্য নিয়ম করা হইয়াছে যে, কোন শেয়ার-হোল্ডারের ভোটের অধিকার মোট ভোটের ৫% এর বেশি হইবে না। (ঙ) ব্যাঙ্কের কোন ডিরেক্টর, অপর কোন কোম্পানীর ডিরেক্টার, ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা গ্যারান্টিদাতা হইলে সেই কোম্পানীগুলিতে বন্ধকবিহীন ঋণ দিবার প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (চ) ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পরস্পর সংলগ্ন ডিরেক্টর থাকা (inter-locking directorship) বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (ছ) কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট, দেউলিয়া বা চরিত্রহীনতার জন্য শাস্তি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কমিশন পান এরূপ কেহ কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী পরিচালনার ভার পাইতে পারেন না। (জ) কোন ব্যাঙ্ক যাহাতে অন্যায় বা দায়িত্বহীন কোন কাজকর্ম করিতে না পারে এবং যখন ও যেখানে খুশি কোন শাখা স্থাপন

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন

করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে লাইসেন্স দান, পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা, বাৎসরিক কাজকর্ম ও লেনদেনের হিসাব দান প্রভৃতির দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী (সংশোধনী) আইন (The Banking Companies Amendment Act, 1956) ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী হইতে কার্যকর হইতে থাকে। এই আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের প্রভূত ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই আইন অনুসারে কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, সর্বক্ষণের ডিরেক্টার, ম্যানেজার, অথবা ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা নিয়োগ করার সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন লাভ প্রয়োজন। কোন বেতন অতিরিক্ত মনে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা কমাইয়া দিতে পারে। কোন ব্যাঙ্কের কাজকর্মের উপর নজর রাখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শক নিযুক্ত রাখিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক তাহাদের পরিচালকমণ্ডলী ও পরিচালন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনিতে বাধ্য থাকিবে। জাতির এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির এবং আমানতকারীদের স্বার্থে পরিচালন সংক্রান্ত ও নীতিগত বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইন

১৯৬২ সালে পুনরায় ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন এবং ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন উভয়ই সংশোধিত হয়। (ক) এই সংশোধন অনুসারে ব্যাঙ্কগুলিকে পূর্বের ন্যায় চাহিদা আমানতের ৫% এবং এবং কাল আমানতের ২% জমা দিতে হইবে না; ইহার পরিবর্তে তাহাদের দৈনিক গড় চাহিদা ও কাল-আমানতের ৩% রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে। ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের অনুপাত এখন ৩% হইতে ১৫% মধ্যে উঠানামা করিতে পারিবে। (খ) রপ্তানি-বিলের দরুণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯০ দিনের জন্য ঋণ দিতে পারিত, এই সংশোধনে ঐ সময় বাড়াইয়া ১৮০ দিন করা হইল। (গ) ১৯৩৪ সালের আইনে সম্পূর্ণ একটি পরিচ্ছেদ যোগ করিয়া বলা হইয়াছে যে এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের খবরাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং এই সকল সংবাদ প্রকাশ করিতেও পারিবে। (ঘ) যে সকল ব্যাঙ্ক সিডিউলভুক্ত নয় (non-scheduled Banks) তাহারা এখন মোট

চাহিদা ও কাল-আমানতের ৩% রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে (পূর্বের ন্যায় যথাক্রমে ৫% এবং ২% নয়)। আরও একটি সংশোধনে (এটি ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে কার্যকরী হইবে) এই ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের মোট আমানতের ২৫% তরল সম্পত্তিতে (liquid assets) রাখিতে হইবে (নিম্নতম আইনসিদ্ধ রিজার্ভ বাদ দিয়া)।

১৯৬২ সালের সংশোধনী আইন

স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (State Bank of India)

ভারতের যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত হইল স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। অন্যান্য ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় শেয়ার ক্রেতাদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা, কিন্তু ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক আইনসভা প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় সরকারের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই এই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিছু কিছু কাজ করিয়া আসিতেছিল। অন্যান্য ব্যাঙ্কে যাহা হয় না এক্ষেত্রে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়, কেন্দ্রীয় সরকার ডিরেক্টর বোর্ডের কতিপয় সদস্য নির্বাচিত করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা যেখানে নাই, সেখানে এই ব্যাঙ্কই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ চালায়। সকল সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের এক চতুর্থাংশের বেশি একা এই ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ। অন্যান্য ব্যাঙ্কের নগদ টাকার দরকার হইলে তাহারা প্রয়োজনমত এই ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্য হাজির হইয়া থাকে।

অন্যান্য ব্যাঙ্কের মধ্যে ইহার স্থান অনন্য

স্টেট ব্যাঙ্কের পূর্বের নাম ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। ১৯২১ সালে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক মিলিয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। ইহাই সরকারের ব্যাঙ্করূপে কাজ করিত। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে ভারতের জনমত ছিল খুবই প্রবল। এমন স্থানে এই ব্যাঙ্ক শাখা প্রসার করিত এবং এমনভাবে ব্যবসায় চালাইত যাহাতে দেশী ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভারতীয় স্বার্থ, প্রধানত ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষায় ইহারা অগ্রণী ছিল, ইউরোপীয় ব্যক্তি ব্যতীত পরিচালনায় কাহাকেও অংশগ্রহণ বা শিক্ষাগ্রহণ করিতে দেওয়া হইত না। বিদেশী শেয়ার-হোল্ডারদের নিকট মুনাফা চলিয়া যাইত। এই সকল কারণে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব হইতেই এই ব্যাঙ্ককে জাতীয় করণের দাবী বিভিন্ন

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ত্রুটি বিচ্যুতি

চালায়। দ্বিতীয়ত, সাধারণত গ্রাম্য মহাজনেরা ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণ দেয় কিন্তু দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ঋণ দান করে। তৃতীয়ত, মহাজনের তুলনায় দেশীয় ব্যাঙ্কাররা ঋণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। চতুর্থত, মহাজনের তুলনায় দেশীয় ব্যাঙ্কারদের সুদের হার কম এবং পরিশোধ মোটামুটি নিয়মিত। অবশ্য উভয় শ্রেণীই সাধারণভাবে অসংগঠিত, বিক্ষিপ্ত, ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি ও প্রয়োজনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের কাজকর্ম

এই দেশীয় ব্যাঙ্কাররা বহুপ্রকার কাজকর্ম করিয়া থাকে। বিনা বন্ধকে বা অল্প বন্ধকে পরিচিতির উপর ভিত্তি করিয়া ইহারা ঋণ দেয়। ঋনদান পদ্ধতি অতি সরল ও সুবিধাজনক হওয়ায় ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধা খুবই বেশি। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল হুণ্ডির উদ্ভব হয়, উহারা সেই হুণ্ডির বদলে ব্যবসায়ীদের নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করে। এক স্থান হইতে অর্থ অপর স্থানে পাঠাইতে বা আনাইতে ইহারা সাহায্য করে। জনসাধারণের নিকট হইতে অনেক দেশীয় ব্যাঙ্কার আমানত গ্রহণ করে, তবে মুলতানী ও মাড়ওয়ারীরা সাধারণত নিজেদের অর্থসামর্থ্যের উপরই নির্ভর করে। ইহারা কেবল যে ঋণদান করে তাহাই নহে, অনেক সময় নিজেরাও ব্যবসায় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

দেশীয় ব্যাঙ্কাররা কেবলমাত্র নিজেদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে বা একে অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া কাজ চালায় তাহা নহে, অনেক সময় তাহারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট অর্থের জন্য হাজির হয়। নিজেরা যে সকল হুণ্ডি ক্রয় করিয়াছিল উহাদের বিক্রয় করিয়া বা পুনর্বাট্টার দ্বারা (rediscounting) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা ছোট ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাহারা ঋণ পাইয়া থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের সর্তসমূহ অপেক্ষাকৃত কঠোরতর হওয়ায় উভয়ের পরস্পর নির্ভরশীলতা ততটা বেশি নয়। তাই বাজারের হুণ্ডিহার, অর্থাৎ দেশীয় ব্যাঙ্কারদের সুদের হার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের সুদের হারে এত বেশি পার্থক্য চলিতে পারে।

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের প্রধান ত্রুটি হইল তাহারা প্রাচীন ও পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ চালায়। আমানতের উপর জোর দেয় না, গ্রাম্য জনসাধারণের বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহ শিল্পের কাজে খাটাইবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে না,

অথচ নিজের ক্ষমতা সামাবদ্ধই থাকে। প্রধানত নগদ টাকার লেনদেনই বেশির ভাগ, হুণ্ডির অংশ কম। সর্বোপরি, সংগঠিত অংশের সহিত সংযোগ কম থাকায় উহাদের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে। ইহাকে তাই দেশের সামগ্রিক আর্থিক কাঠামোর বা অর্থের বাজারের দুর্বলতা বলাই চলে।

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের ত্রুটি

ভারতের বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামো বহুদিন অপরিবর্তিত থাকিবে ধরিয়া লইলে এই দেশীয় ব্যাঙ্কারদের গুরুত্ব খুবই বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ এখনও ইহাদের অর্থেই পরিচালিত হয়। যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দানের শর্ত অনেক কঠোর ও জটিল এবং তাহারা অতি অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অর্থ সাহায্য করে। ইহাদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে দেশীয় ব্যাঙ্কাররা সহজ ও সরল পদ্ধতিতে বিনা বন্ধকীতে বা অল্প বন্ধকীতে প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ দান করিয়া থাকে। অনেকক্ষেত্রে পরিচয় ও পরিশোধের সম্ভাবনা বেশি থাকিলে খুব বেশি সুদ লয়, ইহা ঠিক নহে। ব্যক্তিগত পরিচিতি ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশি থাকায় তাহাদের পক্ষে যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কের তুলনায় ঋণের ব্যবসায় চালান অনেক সহজ ও কম ঝুঁকিবহুল।

বর্তমান কাঠামোতে ইহাদের গুরুত্ব

দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রথা উন্নয়নের জন্য বহু প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইহাদের আধুনিক ঋণদান পদ্ধতি অবলম্বন করিতে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে, ঠিকমত হিসাব রাখা, হিসাব পরীক্ষা করান, বিল ও চেক ব্যবহার করা প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে। ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজ হইতে ব্যাঙ্কিং এর কাজকে পৃথক করিবার জন্য তাহাদের অনুরোধ করা যাইতে পারে। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের জন্য তাহাদের ব্যবস্থা অবলম্বন, করিতে হইবে। সংগঠিত ক্ষেত্রের অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যে সকল সুযোগ সুবিধা পায় উহাদের সেই সমস্ত সুবিধা দেওয়া দরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে অসুবিধা হইলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কগুলির সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া দরকার। আরও অধিক পরিমাণে হুণ্ডির লেনদেনে ইহাদের উৎসাহিত করা দরকার। কয়েকজন দেশীয় ব্যাঙ্কার মিলিয়া একত্রে যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য আরও উন্নত হইতে পারে।

১৯৩৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্তাবলী কঠোর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় দেশীয় ব্যাঙ্কাররা রাজি হয় নাই। ১৯৫৪ সালে শ্রফ্ কমিটি এই প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই।

গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং (Rural Banking)

ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করে এবং কৃষি ও উহার আনুষঙ্গিক কাজকর্ম তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। অথচ ভারতের যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলির কার্যক্ষেত্র প্রায় সব বড় বা ছোট সহরাঞ্চলে। জিলা বা কোন কোন মহকুমা সহরের বাহিরে গ্রাম্য জনসাধারণের সঞ্চয় জমা রাখার জন্য এবং গ্রামের উৎপাদন ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঋণ দিবার জন্য আধুনিক ধরনে পরিচালিত ব্যাঙ্কের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৫০০ জিলা বা মহকুমা সহরে এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে আছে বটে, তাহারা টাকাও জমা নেয়, কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঋণ দেয় না। সমবায় ঋণ দান সমিতির প্রসার এখনও পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই মহাজন ও দেশীয় ব্যাঙ্কারদের দ্বারাই গ্রামাঞ্চলের কাজ-কর্ম পরিচালিত হইতেছে।

বর্তমান অবস্থা

এই অবস্থার অবসান হইয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার খুবই প্রয়োজনীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে যে বিপুল বিনিয়োগ করা হইযাছে, সেই অর্থ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়ন সফল করার জন্য গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলি একত্রে জড় করিতে হইলে এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ক থাকা দরকার। যুদ্ধের সময় হইতে ও বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের বেগ সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য ও কাঁচামালের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, গ্রামবাসীর একাংশের হাতে আয় ও অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। সর্বোপরি, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ দূর করিতে হইলেও গ্রাম হইতে অর্থ সরাইয়া লইয়া আসা বিশেষ প্রয়োজন।

গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং-এর প্রয়োজনীয়তা

যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা খোলার অসুবিধাও কম নয়। শাখা খুলিবার এবং উহার কাজ চালাইবার জন্য খরচ মিটান প্রথম

দিকে বেশ কিছুকাল ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব না-ও হইতে পারে, কারণ প্রথম দিকেই আমানতের ও ঋণের পরিমাণ খুব বেশি না হওয়ার সম্ভাবনা। অধিকাংশ গ্রামবাসীই অত্যন্ত গরীব, যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে তাহারা প্রায় সকলেই সহরাঞ্চলের সহিত সম্পর্ক রাখেন।

ইহার অসুবিধা

নিরক্ষরতার দরুণ তাঁহারা ব্যাঙ্কের অতি অল্প লেখাপড়ার কাজটুকুও করিতে পারেন না, মনোভাবও খুব রক্ষণশীল। তাহা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে যে সুদ পাওয়া যাইবে তাহা খুবই কম, তাহার তুলনায় মহাজনী ব্যবসাতে সুদের হার বেশি। সর্বোপরি, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বলেন যে, বিভিন্ন সরকারী নির্দেশে পরিচালনার ব্যয় এত বাড়িয়া গিয়াছে যে সাধারণ শহরেও শাখা স্থাপন করা কষ্টকর, গ্রামাঞ্চলে স্থাপনের কথাই উঠে না।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসারের কথা প্রথমে গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) আলোচনা করিয়াছিলেন। গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং প্রসারের জন্য কমিটি নানাবিধ সুপারিশ করিয়াছিলেন। বলা হইয়াছিল যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বর্তমানে ষ্টেট ব্যাঙ্ক) যেন গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যায় শাখা স্থাপন করে এবং প্রত্যেকটি মহকুমা এবং থানাতে একটি করিয়া শাখা রাখে। যাহাতে এই ব্যাঙ্ক অধিক সংখ্যায় শাখা স্থাপন করিতে পারে সেইজন্য প্রয়োজন হইলে সরকারের কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। অন্যান্য যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক যাহাতে গ্রামাঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয় এইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত তাহাদের বিভিন্ন প্রকার সুবিধা দেওয়া, যেমন সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে প্রধান অফিসে টাকা পাঠাইবার খরচা না লওয়া বা খুব কম লওয়া। সাবধানতার জন্য সরকারী ট্রেজারী বা সাব ট্রেজারীতে তাহাদের টাকা রোজ জমা রাখার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কমিটি আরও বলিয়াছিলেন যে, সহরে ৫০০০০ অধিবাসীর কম থাকিলে ব্যাঙ্কের সেই শাখাকে মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সরকারী নির্দেশ হইতে এবং দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের ধারা হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যেও তাঁহারা কিছু কিছু সুপারিশ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি, গ্রামে প্রচুর সংখ্যক গুদাম নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের অর্থ সাহায্যে একটি গুদাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা (Warehousing Development Board) দরকার বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯৫৪ সালে সারাভারত গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটি এই বিষয়ে অনেক সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অন্যতম প্রধান হইল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা। এই সুপারিশ কার্যকরী করিয়া বর্তমানে উহার নাম ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া করা হইয়াছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ৪০০টি শাখা খোলার কথা ষ্টেট ব্যাঙ্ক আইনেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল শক্তিশালী, সুসম্বদ্ধ, রাষ্ট্রের অংশীদারিতে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায়, বহু শাখা সম্বলিত, প্রভূত অর্থশালী এমন একটি বিরাট সংগঠন গড়িয়া তোলা যাহা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং গ্রামাঞ্চলের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সাহায্য করিবে ও বহুবিস্তৃত গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং কাঠামো গড়িয়া তুলিবে।

গ্রাম পর্যায়ে প্রচুর সংখ্যক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং উহার ৫১% মূলধন সরকার সরবরাহ করিবে। এই সকল প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক-গুলির সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে; ইহাদের সম্মিলনে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়া উঠিবে। প্রতি স্তরেই রাজ্যসরকারসমূহ মূলধনের অংশ বহন করিবে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবে। এই সকল ব্যাঙ্কের পাশাপাশি সরকারী ব্যয়ে ও পরিচালনায় প্রচুর সংখ্যক গুদাম নির্মিত হইবে, এই গুদামে ফসল জমা দিয়া সেই জমার সার্টিফিকেট-এর (certificate of deposit) ভিত্তিতে সমবায় ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি ঋণ ও অর্থের লেনদেন করিতে থাকিবে। এই সার্টিফিকেটগুলির বাট্টা ও পুনর্বাট্টার ফলে দেশের ঋণ ব্যবস্থায় গতিশীলতা ও তারল্য বৃদ্ধি পাইবে। যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলিও অধিক সংখ্যায় শাখা স্থাপনে উৎসাহিত হইবে। যে অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের কোন সম্ভাবনা নাই সেখানে 'চলমান ব্যাঙ্ক' (mobile bank) স্থাপনের কথাও চিন্তা করা যাইতে পারে। গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটির এইরূপ সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা the integrated scheme) বাস্তবে কার্যকরী হইয়া উঠিলে এই সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিল বাজার পরিকল্পনা (Bill Market scheme of the Reserve Bank)

সাধারণত কোন দেশের ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহ করেন বাণিজ্যিক বিলসমূহ ডিস্কাউন্ট করার মধ্য দিয়া। ব্যবসায়-বাণিজ্যের

লেনদেনের মধ্য হইতে যে বিলগুলি সৃষ্টি হয়, উহাদের ভিত্তিতে ঋণের আদান প্রদান চলে যেমন কোন বস্ত্র উৎপাদক ১ লক্ষ টাকার বস্ত্র বিক্রয় করিল, ক্রেতা ৯০ দিন পরে দাম পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইল। ইতিমধ্যে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় বস্ত্র উৎপাদক এই বিল লইয়া কোন ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হইল। ব্যাঙ্ক চলতি সুদের হারে উহা ভাঙাইয়া দিল এবং পরে সে ক্রেতার নিকট হইতে টাকা পাইয়া গেল। এইরূপে বস্ত্র উৎপাদক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণের সুবিধা পাইল। ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন হইলে এইরূপ ডিসকাউণ্ট করা টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লইয়া আসিল।

বিল লইয়া কিরূপে বেচাকেনা চলে

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু তাহার পরেও ভারতে বিলের বাজার ততটা প্রসারিত হয় নাই। ইহার অনেক কারণ ছিল। ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান বিষয় ছিল কৃষিজাত শস্যসামগ্রী, ইহাদের লইয়া ব্যবসায়ে বিলের ব্যবহার হয় খুব কম। তাহা ছাড়া উপযুক্ত গুদাম বা মজুতের ব্যবস্থা না থাকায় বিলের পরিমাণ তত দেখা দিত না। ভারতের কৃষিঋণ প্রধানত যোগান দিত দেশীয় মহাজনেরা। তাহারা ডিস্‌কাউণ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহারও নিকট বিল লইয়া হাজির হইত না।

কেন এতদিন ভারতে বিলের বাজার গড়িয়া উঠে নাই

আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও নির্দিষ্ট আয়পদানকারী সরকারী এবং দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিতে টাকা আবদ্ধ রাখা পছন্দ করিত এবং ব্যবসায়িক বিল লইয়া বেচা-কেনার কাজ করিতে অগ্রসর হইত না। তাহা ছাড়া, ভারতের অভ্যন্তরে বিল বা হুণ্ডিগুলি রচিত হইত বিভিন্ন ভাষায়, এক অঞ্চলের ব্যাঙ্কও অন্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের ভাষা, কাজকর্ম ও আর্থিক সঙ্গতি কোন কিছু সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর রাখিত না। উপরন্তু, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কও বিলের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে টাকা ঋণ দিবার প্রচেষ্টা বিশেষ করেন নাই। সাধারণ কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কোন বিল ডিসকাউণ্ট করিয়া দরকারমত উহাকে পুনর্বাট্টার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট যাইতে চাহিত না। সর্বোপরি, আমাদের বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে উদ্ভূত বিলগুলি প্রধানত বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির নিকট উপস্থিত হইত। তাহারা এই বিলগুলি ডিস্‌কাউণ্ট করার টাকা পাইতেন

বিদেশ হইতে, এ দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের যাইতে হইত না, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিতেন না।

বিল বাজার গড়িয়া না উঠায় দেশের মধ্যে সুদের হার এবং ঋণসৃষ্টির পরিমাণ উভয়ই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্য বিল লইয়া দেশীয় মহাজনেরা উপস্থিতই হইতেন না, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও এই বিষয়ে অগ্রসর ছিলেন না। ফলে ব্যাঙ্করেট কমাইয়া বাড়াইয়া বাজারের চল্‌তি হার প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না। সুদের হার প্রভাবিত করিতে না পারিলে ঋণসৃষ্টির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ কবাও খুব অসুবিধাজনক ছিল। এইরূপে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে আর্থিক নীতি ও কৌশলের ততটা প্রয়োগগত কার্যকারিতা ছিল না।

ইহার ত্রুটি

এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালেব জানুয়ারী মাস হইতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি বিল বাজার পবিকল্পনা ঘোষণা করেন। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হইয়া বর্তমানে উহা ভাবতীয টাকার বাজাবের স্থায়ী সংগঠন রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই পবিকল্পনা অনুসারে ভারতের ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্ক তেজী মরশুমে আভ্যন্তরীণ বিল বা হুণ্ডির বদলে বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে টাকা পাইতে পারিবে। প্রথম দিকে কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা আমানত সম্পন্ন সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে এই সুবিধা দেওয়া হয। বিলের লেনদেন প্রসারের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিযম করিয়াছিলেন যে, ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা ½% কম সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলি বিল ভাঙ্গাইতে পারে। ইহার পরে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিবার ¼% হিসাবে দুইবার ডিস্‌কাউন্টের হার বাড়াইয়াছে। বিল বাজার পরিকল্পনার প্রথম দিকে ঋণ গ্রহণকারী কোন ব্যাঙ্ক এইরূপ চাহিদা-বিলগুলিকে (demand bill) বিক্রয়যোগ্য বিলে (usance bills) পরিণত করিতে চাহিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প ডিউটির অর্ধেক বহন করিতে সম্মত হইয়াছিল।

১৯৫২ সালের বিল-বাজার পরিকল্পনা

টাকার বাজারে ১৯৫২-৫৩ সালের মরশুমী অভাব দূর করিতে এই বিল বাজার পরিকল্পনা অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। এই সাফল্যের ফলে ১৯৫৩ সালের জুন মাসে ইহা অনেকটা প্রসারিত হইল, যেমন কমপক্ষে ৫ কোটি টাকা আমানতসম্পন্ন সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ইহার সুযোগ

দেওয়া হইল। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে সকল সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ককেই এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে ব্যাঙ্ককে কমপক্ষে মোট ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ করিতে হইবে এবং কোন বিলের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার কম হইবে না। ইহা কমাইয়া যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে যখন দামস্তর বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দেয়, তখন বাজারে ঋণ প্রসার রোধ করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা তুলিয়া লন ও ডিস্কাউণ্টের সময়ে সুদের হার বাড়াইয়া দেন। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদ প্রদানে বাধ্য করা হয়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যে রপ্তানি বিলগুলিকে এই পরিকল্পনার মধ্যে লইয়া আসা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা যাহাতে ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

এই পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকার রদবদল

ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, নামে বিলবাজার পরিকল্পনা হিসাবে প্রচলিত হইলেও কার্যত ইহা ভারতে বিলের বাজার গড়িয়া উঠিতে বিশেষ সাহায্য করে নাই। বিল বাজার বলিলে বুঝা যায় ব্যবসায-বাণিজ্যে অসংখ্য স্বল্পকালীন বিলের উদ্ভব এবং উহাদের বেচাকেনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা, বিক্রেতা ও প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং তাহাদের অর্থ সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা। কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলে সেইরূপ কোন কিছু দেখা যায় নাই। ব্যবসায়ীরা ঋণ চাহিতে আসিলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের দিয়া বিল তৈয়ারী করাইয়া উহার বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা লইয়া আসিয়াছে, কম সুদে টাকা আনিয়া বেশি সুদে ধার দিয়া মধ্যপথে ব্যাঙ্কগুলির কিছু মুনাফা হইয়াছে। উপযুক্ত ধরনের বিল-বাজার ইহাতে গড়িয়া উঠে নাই এবং সেইরূপ কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

ভারতে ব্যাঙ্ক-ফেল পড়া (Bank Failures in India)

পৃথিবীর অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের ন্যায় ভারতেও ব্যাঙ্ক-ফেল পড়ার ইতিহাস সুপ্রাচীন। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল ব্যবসায়ের গতির সহিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থাতেও

উঠানামা দেখা গিয়াছে। বাণিজ্যচক্রের অবনতির যুগে সাধারণত দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বেশ কিছু অংশ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইত, ব্যাঙ্কগুলির উপর আস্থাহীনতা সেই সংকটকে তীব্রতর করিয়া তুলিত। ভারতের ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পিছনে বাণিজ্যচক্রজনিত সংকট প্রধান কারণ নয়, কাঠামোগত ত্রুটিবিচ্যুতিই ইহার (structural defects) মূল উৎস। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় পরিচালনায় সততা, নিষ্ঠা এবং উপযুক্ত সরকারী আইনকানুনের অভাবই এই কাঠামোগত দুর্বলতার লক্ষণ।

পশ্চিমী ব্যাঙ্ক-ফেল আর ভারতের ব্যাঙ্ক-ফেল এক জিনিষ নয়

ভারতে বহুদিন ধরিয়া ব্যাঙ্ক-ফেল পড়ার ইতিহাস রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট-গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড মনিটারি ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ ইন্ ইণ্ডিয়া নামক রিপোর্টে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। ১৯১৩-১৯ সালের মধ্যে ভারতে ১৭টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে, ইহাদের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকা। শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের দরুণ এই সময়ের সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কটি ফেল পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৯১৮-২১ সালের মধ্যে মাত্র ২১টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছিল, ইহাদের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। ঐ যুগের অর্থনৈতিক সংকট ব্যাঙ্ক-ফেলের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং ১৯২২ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা ছিল ৩৭৩টি; ইহাদের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হইল ৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতে বহু নূতন ব্যাঙ্ক গজাইয়া উঠে, বিশেষত ব্যাঙ্কগুলির নূতন নূতন শাখা প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। অর্থনৈতিক দিক হইতে এই শাখাসমূহ আত্মনির্ভরশীল হয় নাই এবং ইহাতে ঝুঁকিও ছিল খুব বেশি। এই সকল কারণ এবং যুদ্ধোত্তর যুগের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কারণাবলী মিলিয়া যুদ্ধের শেষে ভারতে ব্যাঙ্ক ফেলের হিড়িক পড়িয়া যায়; ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সালে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাঙ্ক-ফেল ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৪৮ সালে ৪৫টি ব্যাঙ্কের ২০টি, ১৯৪৯ সালে ৩৩টির মধ্যে ২৭টি এবং ১৯৫১ সালের মধ্যে ৬২টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ৩৯টি দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে কেরালার পালাই সেনট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পরে এই সমস্যা আবার গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যাঙ্ক-ফেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপর এইরূপ ব্যাঙ্ক ফেলের ফলাফল বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে ব্যাঙ্কের শেয়ার-ক্রেতা এবং আমানতকারিগণ বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হন। দরিদ্র ব্যক্তিদের সঞ্চয় বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। ধনী ব্যক্তিদের সঞ্চয় বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটে এবং মূলধন-গঠন ব্যাহত হয়। ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ব্যবসায়িক যোগসূত্রগুলি ছিন্ন হইয়া যায়। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর তীব্র ও বিরূপ প্রভাব দেখা দেয়। অবশিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির উপর জনসাধারণের আস্থা টুটিয়া যায়, তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও অভ্যাস খর্ব হইয়া পড়ে।

ইহার ফলাফল

ভারতে বিশেষত যুদ্ধোত্তর যুগে, এত ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার কারণ কি? সাধারণত এই কারণগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। আভ্যন্তরীণ কারণাবলী আলোচনা করা যাউক। (ক) এদেশে ব্যাঙ্ক ফেলের অন্যতম প্রধান কারণ মূলধনের স্বল্পতা। ফেল-পড়া অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভের পরিমাণ ছিল খুব কম। (খ) অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত পরিচালকের অভাব ইহার আর একটি কারণ। কতিপয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জীবিকার সন্ধানে একত্র হইয়া একটি ব্যাঙ্ক খুলিয়া কিছুদিন চালাইল, তাহার পরে সংকটজনক অবস্থায় চাপ সহ্য করিতে পারিল না, ইহা অনেকবার দেখা গিয়াছে। (গ) আর একটি কারণ হইল এই ব্যাঙ্কগুলির অব্যবসায়িক বিনিয়োগ-নীতি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যাঙ্কই শেয়ার লইয়া ফাট্‌কা ব্যবসায় করিত এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্পের শেয়ারে আমানতের টাকা খাটাইত। (ঘ) অনেক ক্ষেত্রে ঋণদানের নীতি ছিল একান্তভাবে ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ। কোন বন্ধক না রাখিয়া ডিরেক্টাররা নিজস্ব কোম্পানিতে টাকা ধার লইত, সময়মত পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কগুলি বিপদে পড়িত, (ঙ) অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষতিজনক শাখা-প্রশাখা স্থাপন করিয়া ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বেশি সংখ্যক শাখা থাকিলে সম্মান বৃদ্ধি পাইবে এই ধারণায় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথা না ভাবিয়া অধিকসংখ্যক শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাঙ্কগুলির ব্যয় অনুপাত (expense ratio) বাড়িয়া গিয়াছিল। অনেক সময় শাখাগুলিতে আমানত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হইত। এত উচ্চহারে সুদ দেওয়ার জন্য অধিকতর

আভ্যন্তরীণ কারণাবলী

সুদের হারে ঋণ দিতে হইত এবং এই ধরনের ঋণে সাধারণত ঝুঁকির পরিমাণ ছিল খুব বেশি। (চ) সর্বোপরি, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও ম্যানেজারগণ অনেক ক্ষেত্রেই সততা ও ব্যবসায়িক দক্ষতার দিক হইতে সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলেন না।

বাহ্য কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল মনস্তাত্ত্বিক। মিথ্যা ও ভীতিজনক গুজবের উপর বিশ্বাস করিয়া অনেক সময় আমানতকারীরা একসঙ্গে সকল আমানত দাবি করিয়া সৎ এবং শক্তিশালী ব্যাঙ্ককেও পর্যুদস্ত করিয়া দিয়াছে। ডাক-তার বিভাগ এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ধর্মঘট অনেক ব্যাঙ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যুদ্ধের পরে মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে বৃহৎ মূল্যের নোট-গুলিকে টাকা নয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছিল; আয়কর অনুসন্ধান ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছিল, এই সকল কারণে লোকে ব্যাঙ্কে অধিক টাকা রাখা নিরাপদ মনে করিত না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল যে ইহা বিপদের সময়ে সাহায্য দিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ধারাগুলি ছিল সংকীর্ণ ও অনমনীয়, ফলে উহার নিকট হইতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির প্রয়োজনমত সাহায্য পাইবার পথ উন্মুক্ত ছিল না। এই সুকঠিন নিয়মগুলির বেড়াজাল ভেদ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আপদ-বিপদের সময় সাহায্য পাইতে পারিত না। ১৯৪৬-৪৮ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে ব্যাঙ্ক-ফেলের প্রাদুর্ভাব অনেকটা এই কারণে রোধ করা সম্ভব হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সাফল্য নির্ভর করে ব্যাঙ্কিং নীতি ও কৌশল মানিয়া চলা ও সফলভাবে প্রয়োগ করার উপর, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থসাহায্যের উপর নয়। তাহা ছাড়া, ব্যাঙ্কগুলি ঠিক সময়মত তাঁহাদের নিকট আবেদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। উপরন্তু, সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে যদি ব্যাঙ্কগুলি উপযুক্ত ধরনের এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ মূল্যের বাণিজ্যিক বিল লইয়া ডিস্কাউন্ট করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয়। এইরূপ বিলের ব্যবসায় ভারতে গড়িয়া উঠে নাই। ১৯৪৯ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদানের নিয়মকানুন অনেকাংশে শিথিল করা হইয়াছে।

বাহ্য কারণাবলী

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ কি ছিল

ভারতে আমানত বীমা পরিকল্পনা (Deposit* Insurance Scheme in India)

ব্যাঙ্ক-ফেলের ফলাফলের হাত হইতে দরিদ্র আমানতকারীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উপর জনসাধারণের মনে আস্থা বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বিশেষ ধরনের রক্ষাকবচ প্রচলিত আছে। ইহার নাম আমানত-বীমা পরিকল্পনা (Deposit Insurance scheme)। ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সালের ব্যাঙ্কিং আইনে যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিকল্পনা প্রচলিত হয়। বিশ্ব-সংকটের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি দরজা বন্ধ করায় আমানতকারীরা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রুজভেল্টের শাসন কর্তৃপক্ষ তাহাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এইরূপে একটি ফেডারেল ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স করপোরেশন (Federal Deposit Insurance Corporation অথবা FDIC) গঠিত হয়। ইহার মূলধন সরবরাহ করেন মার্কিন সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহ। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতি বৎসর মোট আমানতের ১% এর $\frac{১}{১২}$ অংশ করপোরেশনের নিকট জমা দিতে হয়। ইহার বিনিময়ে এই আমানতবীমা করপোরেশন সকল আমানতকারীকে সর্বাধিক ৫০০০ ডলার পর্যন্ত ব্যাঙ্কফেলের ঝুঁকি হইতে অব্যাহতি দেন। অর্থাৎ আমানতকারীদের এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে ৫০০০ ডলার পর্যন্ত আমানতের টাকা এই করপোরেশন সেই আমানতকারীকে দিতে বাধ্য থাকিবে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর স্বল্প সঞ্চয়কারীর আস্থা ফিরাইয়া আনিতে এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

মার্কিনী পরিকল্পনার রূপ

১৯৪৭-৫২ সালের মধ্যে ভারতে যখন ১৮৭টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে এবং ৯২ কোটি টাকা আমানত নষ্ট হয়, তখন হইতে এইরূপ একটি পরিকল্পনা আমাদের দেশেও গৃহীত হওয়ার দাবী আলোচিত হইতেছিল। কিন্তু কোন কার্যকরী পরিকল্পনা বহুদিন পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। তবে ১৯৫৯-৬০সালে কেরালার পালাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় আমানত বীমার প্রস্তাব জোরদার হইয়া উঠে। ১৯৬১ সালের আমানত বীমা করপোরেশন আইন অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ভারতেও একটি স্বাধীন আমানত-বীমা করপোরেশন গঠন করিয়াছেন। ইহার অনুমোদিত মূলধন হইল ৫ কোটি টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটি টাকা

সরবরাহ করিয়াছেন। স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ও উহার শাখা প্রশাখা ব্যতীত ভারতের সকল ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের আমানত এই করপোরেশনের নিকট বীমাবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম দিকে অনধিক ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আমানত সীমাবদ্ধ হইয়াছে, পরে অবস্থা বুঝিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে ইহার পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো হইবে। প্রতিটি ব্যাঙ্ক আমানতের জন্য প্রতি তিনমাস অন্তর একশত টাকায় ৫ নয়া পয়সা প্রিমিয়াম দিবে।

ভারতীয় আমানত বীমা করপোরেশন

অনেকে বলেন যে, এই পরিকল্পনা ভারতের ন্যায় দেশে চলিতে পারে না। গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "the risks and uncertaintities to which banking in this country is subject at present are too many and their nature is not yet fully understood." আমাদের দেশে এত বিচিত্র কারণে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িতে পারে যে তাহা পূর্ব হইতে আন্দাজ করা খুবই অসুবিধাজনক, তাই মোট আর্থিক দায় বা ভার সঠিকভাবে হিসাব করাও সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইন পাস হওয়ার পর হইতে এখনও পর্যন্ত অসাধু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই, তাই এই পরিকল্পনা চালু করবার সময় এখনও আসে নাই। এই ব্যবস্থার দরুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাবধানী দৃষ্টি শিথিল হইয়া আসিতে পারে, আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব দেখা দিতে পারে। আরও বলা হয় যে, আমাদের ব্যাঙ্কগুলিতে খরচা এখনও বেশি, কিন্তু মুনাফার পরিমাণ কম; তাই প্রিমিয়ামের ভার চাপাইয়া তাহাদের ভারগ্রস্ত করা উচিত নয়। অবশ্য এই সকল যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় তাহা বলাই বাহুল্য, এবং সরকার ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া আমানত বীমা করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করিয়া সঠিক কাজ করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকে ইহার বিরোধিতা করেন

সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের ন্যায় ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, ইহা আমরা সকলে জানি। বৃহৎ শিল্পপতিরাই আমাদের দেশের বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির মালিক। তাহারা অন্যান্য ব্যাঙ্ককে কোণঠাসা করিয়া, মিথ্যা গুজব রটাইয়া ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিকে ফেল পড়িতে আগাইয়া দিয়াছে এবং এইরূপে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অর্থাৎ টাকার লেনদেনের উপর একচেটিয়া অধিকার

প্রসার করার প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক নীতির সহিত ইহাদের কাজকর্ম খাপ খায় না। শুধু তাহাই নহে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার স্বার্থে দেশের সঞ্চয় যে-ধরনের শিল্পে নিযুক্ত হওয়া উচিত, দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ব্যক্তিক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত থাকিলে মূলধনের সঠিক বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না।

একমাত্র উপায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের জাতীয়করণ

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার আর একটি অঙ্গ হইল উপযুক্ত মূল্যনীতি। দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা মোট টাকার যোগানের একটি বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাকে জাতীয়করণ করিয়া সরকারের হাতে লইয়া আসিলে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য অনেকটা সুনিশ্চিত হইবে এবং একই সঙ্গে অসাধু ব্যাঙ্কপতিদের হাত হইতে দরিদ্র আমানতকারীদের সঞ্চয় বাঁচানো সম্ভবপর হইবে। আমানত বীমা করপোরেশন ব্যাঙ্ক ফেলের মূল কারণ দূর করিতে পারে না, ইহা আমানত-কারীদের অল্প কিছু ক্ষতিপূরণেব ব্যবস্থা ছাড়া আব কিছু নয়।

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয়করণ (Nationalisation of Commercial Banks in India)

কোনো শিল্পকে কখন জাতীয়করণ করিতে হয়

অর্থনীতি শাস্ত্রের আধুনিক সিদ্ধান্ত হইল যখন ব্যক্তি ক্ষেত্রের কোন শিল্পে প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়া যায়, যখন সেই শিল্প একজন বা কয়েকজনমাত্র একচেটিয়াদারের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে, যখন সেই অবস্থা হইতে আবার প্রতিযোগিতা গড়িয়া উঠার কোনো সম্ভাবনা আব দেখা যায় না, তখন সেই শিল্পটিকে জাতীয়করণ করিতে হয। ভাবতেব ব্যাঙ্কিং শিল্পে ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

১। সমগ্র ভাবে কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক

প্রথমত ভারতের ব্যাঙ্ক-শিল্পে কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৯ সালে ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৪৭০। সেই সময়ের পরে কোনো ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিযাছে, আর কযেকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া একত্র হইযাছে। ১৯৬৩ সালের প্রথমে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইল ২৭৬। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মোট আমানতের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে, বর্তমানে উহা ২৩০০ কোটি টাকার বেশি। আমানতের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে, আর ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে—ইহা হইতেই কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হইয়া উঠিযাছে।

কেবলমাত্র সমগ্র শিল্পে নয়, এই শিল্পের মধ্যে মালিকানার রূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ২৭৩টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ৫টি ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ মোট আমানতের প্রায় অর্ধেক। শুধু তাই নয়। প্রতিটি ব্যাঙ্কের মালিকানাই পরিচালিত হয় বড় বড় শিল্প-ব্যবসায়গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় প্রতিনিধি দ্বারা। এই শক্তিশালী ব্যাঙ্কসমূহের সহিত দেশের শিল্প ও ব্যবসায়গুলির সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। ডঃ রাজ কে. নিগম হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ২০টি ব্যাঙ্কের মোট পরিচালক হইল ১৮৮ জন।*

এই ১৮৮ জন ব্যক্তির হাতে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কোম্পানির সংখ্যা হইল ১৬৪০। কোন কোন প্রধান ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর নিজেদের মালিকানায় ব্যাঙ্ক বীমা কোম্পানী ও বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট আছে. ইহাদের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন অংশের নিকট হইতে পাওয়া টাকা তাহারা নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করিতে পারে।

২। মালিকের স্বার্থরক্ষায় ব্যাঙ্কিং নীতি পরিত্যাগ

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত ও সঠিক ব্যাঙ্কিং নীতি পরিত্যাগ করিয়া মালিকের স্বার্থ রক্ষায় ব্যাঙ্কগুলি বহু অন্যায় কাজকর্ম করে। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের খুব বেশি সুদে টাকা ধার দেয়, কিন্তু মালিকদের নিজস্ব কোম্পানিগুলিকে ঋণ দেয় নিতান্ত কম সুদে। যেমন ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ করিতেছিলেন জনসাধারণের নিকট হইতে ৩% হইতে ৪% হারে, নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ৫% হারে, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনেক সময় ৬½% হারে। এই সময়ে তাহারা ৪%, ৩%, এমন কি ২% হারেও মালিকদের কোম্পানিসমূহকে ঋণ দিয়াছেন।

৩। নানারূপ অসাধুতা

তৃতীয়ত, ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ নানারূপ অপরাধ করিয়া থাকেন। ভারতীয় কোম্পানি বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশের প্রতিটি কোম্পানিকে প্রকৃত লাভ ক্ষতির হিসাব দাখিল করিতে হয়। ব্যাঙ্কের উপর কিন্তু এই বিধি প্রযুক্ত হয় না। ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইনেই বলা আছে যে, তাহারা গোপন রিজার্ভে (secret reserves) টাকা সরাইয়া রাখিয়া লাভের পরিমাণ ঘোষণা করিতে পারেন। এইজন্য ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃত লাভের পরিমাণ জনসাধারণের নিকট পৌঁছায় না। ইহাদের গোপন কাজকর্মের আর একটি ফল কর-ফাঁকি দেওয়া

* Dr. Raj K. Nigam—*Company News & Notes, October 1, 1963.*

কালো টাকায় বেনামী শেয়ার কেনা। ব্যাঙ্কগুলির দুর্নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল ওভার ইন্‌ভয়েসিং ও আণ্ডার-ইন্‌ভয়েসিং করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে অসাধু ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা।

চতুর্থত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ, তাহারা বেশ কয়েক শত কোটি টাকা শেয়ারের এবং পণ্য দ্রব্যের ফাটকাদারদের হাতে তুলিয়া দেয়। কেবল মাত্র শেয়ারের ফাট্‌কা ব্যবসায়ে তাহারা ৯০ হইতে ৯২ কোটি টাকা খাটায়। দ্রব্যসামগ্রীর ফাটকাতে টাকা দেওয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি অন্যতম প্রধান কারণ। ১৯৬৩ সালের জুন মাসের হিসাবে এই ফাটকা নিয়োগের পরিমাণ দেখা যায়:

৪। শেয়ার ও পণ্যের বাজারে ফাটকা ব্যবসায়ে সাহায্য করা

খাদ্যদ্রব্য	১২২	কোটি	টাকা
বাদাম	৮	,,	,,
গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলা	৫	,,	,,
তুলাজাত বস্ত্রদ্রব্য	১২০	,,	,,

কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান প্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক কারণে একটু কমিয়া গেলে এই পরিমাণ টাকা দামের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। ফাট্‌কা ব্যবসায়ীদের প্রতি ব্যাঙ্কসমূহ আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ ইহারা বেশি সুদ দিতে পারে।

পঞ্চমত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ প্রকাশ্যে একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। তাহারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া আমানতকারীদের সুদ দেয় নিতান্ত কম, কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সুউচ্চ সুদ আদায় করে। বৎসরে এই ব্যাঙ্কগুলির মুনাফা এত বেশি যে তাহারা তাহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের প্রায় ২৫% তুলিয়া লইতে পারে। শাখা প্রসারের কোনো দায়িত্ব ইহারা পালন করে না।

৫। একচেটিয়া ও প্রভূত লাভ

সর্বোপরি, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ না করার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ হইল দেশের উপকরণগুলি আগামী পাঁচ বৎসরে কোন কোন দিকে নিযুক্ত হইবে তাহা স্থির করা। এই বিষয়টি একটু ভাল করিয়া বোঝা দরকার। দেশের আসল উপকরণগুলি (যেমন জমি, শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল প্রভৃতি) বিশেষ কোনো

৬। ইহারা পরিকল্পনার রূপায়ণে বাধা দিতেছে

একটি দিকে নিযুক্ত হইতে পারে না, যদি-না সেই দিকে কিছু টাকা ধাবিত হয়। যেদিকে অর্থস্রোত বহিবে, উপকরণের স্রোতও সেইদিকে বহিতে সুরু করিবে। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলি বৎসরে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ঋণ দেন। এই পরিমাণ অর্থস্রোত কোন দিকে বহিবে তাহা স্থির করেন ব্যাঙ্কের মালিকবৃন্দ এবং তাঁহাদেব নীতি সর্বাধিক মুনাফা আহরণ। পরিকল্পনা কমিশনের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারে, ফলে উপকরণের নিয়োগ ঘটিতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করিতে হইলে উন্নয়নের প্রত্যেকটি আসল কর্মসূচীর সহিত (Real Plan) পাশাপাশি একটি অর্থ-ঋণের পরিকল্পনা (credit plan) রচনা করিতে হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যক্তিক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া এইরূপ অর্থ ঋণেব কর্মসূচী তৈযারী করা যায় না। পরিকল্পনা বাঁচাইতে হইলে এইরূপ অবস্থা আর বেশিদিন চলিতে দেওয়া সম্ভব নয়।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি ভাল বোঝা যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়ার দিকে ভারতে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিযাছে, খাদ্যদ্রব্যের দাম ভযানক হারে বাড়িতে সুরু করিযাছে, আমাদের পরিকল্পনা একটি জটিল আবর্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, দাম কমান একান্তভাবে প্রযোজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া জাতির এই দুর্দিনে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেশ কযেক কোটি টাকা খাদ্যের ফাটকাদারদের ধার দিলেন, আরও বেশি খাদ্যশস্য গুদামজাত করার এবং দাম বাড়াইবার সুযোগ করিয়া দিলেন।

এই সকল কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীযকরণ আজ বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক ও ঋণনীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Monetary and credit Policy of the Reserve Bank and Economic Development):

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল তত্ত্বে আর্থিক ও ঋণনীতির কোনরূপ সক্রিয় স্থান ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বে, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রসার ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আর্থিক ও ঋণনীতিকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করার কথা বলা হইতেছে। উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক ও ঋণনীতি একদিকে প্রসার ঘটাইবে, অপর দিকে,

একই সঙ্গে, নিয়ন্ত্রণের কাজ করিতে থাকিবে। এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা মনে রাখা দরকার। কোন দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, সাধারণ ভাবে সেই দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মূল কারণ ও শক্তিগুলিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা দেশের মধ্যে সঞ্চয় ও আমানত বাড়াইবার উপযোগী প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো বা বহিরঙ্গ তৈয়ার করিয়া দেয় মাত্র। অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটে অন্যান্য বহু কারণের ফলে, এবং দেশে মূলধনগঠনের এইরূপ গতিবেগ নিজের প্রয়োজনে পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলির রূপে বা চরিত্রে বদল আনিয়া নিজে উপযোগী ব্যাঙ্কিং-কাঠামো গড়িয়া তোলে। দ্বিতায়ত, উন্নয়নশীল দেশের, অন্তত যে ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের নেতৃত্বে উন্নয়নের প্রচেষ্টা হয়, এইরূপ কোন দেশের কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কের নিজস্ব পছন্দমত কোন আর্থিক নীতি থাকিতে পারে না। পরিকল্পিত উন্নযনের লক্ষ্যসমূহ এবং সরকারের মূল নীতি-গুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাকে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের নীতি ও পদ্ধতি নিরূপণ করিতে হয়। সরকারের কর কাঠামো এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলিকে কাজ করিতে হয়। কিন্তু এই কাঠামোর মধ্যে থাকিয়াই উপযুক্ত আর্থিক নীতি গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থ নৈতিক প্রসার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ চালাইতে পারে।

অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সীমাবদ্ধতা

শিল্পোন্নত দেশসমূহে আর্থিক নীতির প্রধান কাজ হইল নিয়ন্ত্রণমূলক, কিন্তু ভারতে সাম্প্রতিককালে আর্থিক ও ঋণনীতির প্রধান রূপ হইল নিয়ন্ত্রণশীল প্রসার (controlled expansion)। এই নীতির দুইটি লক্ষ্য : অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা এবং সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির চাপ রোধ করা। ভারতে পরিকল্পনার দরুণ টাকার প্রয়োজন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। অধিক পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি টাকার দরকার হইতেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কও টাকার সঞ্চালন ক্রমশ বাড়াইয়া দিতেছেন। এই টাকার কিছু অংশ আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কগুলির নিকট উপস্থিত হইতেছে, উহার ভিত্তিতে ঋণ প্রসার ঘটিতেছে। ফলে দেশে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। ভারতের পরিকল্পনাটি নিতান্ত ছোট নয়, ইহাতে দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া মুদ্রাস্ফীতি নিশ্চয় ঘটিতে পারে। সুতরাং আমাদের আর্থিক নীতির কাজই হইবে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে

অর্থের প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ একযোগে করিতে হয়

মুদ্রাস্ফীতির এই চাপ অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বানচাল করিতে না পারে। আবার কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণের কাজ ইহার একমাত্র লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান ইহার কর্তব্য। ভারতের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এইরূপ উভয় সংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর এই সমস্যার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে এমন ধরনের কাজে বিনিয়োগের ব্যয় বেশি হইতেছে যাহা হইতে দ্রুত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন হয় না। ফলে বর্তমানেই লোকের হাতে যে টাকা বাড়ে, সেই টাকার সাহায্যে ক্রয়ের উপযোগী নূতন জিনিসপত্র বাজারে আসে না। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক (inflationary gap) দেখা দেয় এবং বহুমুখী চাপে দ্রব্যসামগ্রীর মূল স্তর বাড়িতে সুরু করে, টাকায় মূল্যক্ষয় সুরু হয়। আবার অপরদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত টাকা ঢালিয়া দেওয়া দরকার, উহা ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসারের পাশাপাশি ব্যক্তি-ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রসার হইতে পারে না। আমরা এতদিন পর্যন্ত বৈদেশিক মজুত হইতে বিদেশী মুদ্রা লইয়া আসিয়া দেশের মধ্যে টাকার পরিমাণ কিছুটা বাড়াইতে সাহায্য করিয়াছি, ইহাতে আরও বেশি মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দেয় নাই। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের-ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; তাই বর্তমানে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মুদ্রাস্ফীতি-সম্ভাব্যতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। এই অবস্থায় আরও একটি বিষয় দেখা যায়। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল স্তরের যুগে ফাটকাবাজির সম্ভাবনা বেশি থাকে, কারণ শিল্পে নিয়োগ অপেক্ষা দ্রব্যসামগ্রীর মজুত হইতে লাভের পরিমাণ বেশি হয়। এই কারণে ব্যাঙ্ক ঋণের একটি বড় অংশ ফাট্‌কা নিয়োগে চলিয়া যাইতে চায়। ইহা রোধ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির- প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তি সহজ ও সুলভ করিয়া তোলা দরকার। আবার একই সঙ্গে অপর কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণপ্রাপ্তি কঠিন ও দুর্লভ করিয়া তোলা প্রয়োজন।

বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ততটা ঘটে না, তাই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতেছে

অনেকে দেশ সুদের হার কম রাখিয়া ঋণের প্রসার ঘটাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষপাতী। শিল্পোন্নত দেশে সংকটের যুগে অর্থনৈতিক মন্দা কাটাইয়া উঠার উদ্দেশ্যে অনেকে টাকার বাজার-দর অর্থাৎ সুদের হার কম রাখিতে চান, আশা করেন ইহাতে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। শুধু তাহাই নহে। সুদের হার কম রাখিলে সরকারের নিজস্ব ঋণের উপর কম সুদ বহন

করিতে হইবে। ইহাও বিশেষ সুবিধাজনক। কিন্তু অনেক ধনবিজ্ঞানী ক্লাসিকাল মতের প্রতিধ্বনি করিয়া ইহাতে আপত্তি করেন এবং বলেন যে, সুদের হার কম রাখিলে দেশে সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ কমিয়া যাইবে, সঞ্চয় হইতে আয় কম হওয়ায় তাহারা সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে না।

অনেকে বলেন উন্নয়নের জন্ম সুদের হার কম রাখা দরকার

তাহারা আরও বলেন যে, ইহাতে দেশে অহেতুক বিনিযোগ বাড়িবে, ফাটকা নিযোগ হইবে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে বেশি দাম দিয়া সরকারকে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইবে, ফলে কম সুদের হার রাখিয়া যতটুকু লাভ তাহা অপেক্ষা সরকারের ক্ষতির পরিমাণ হইবে অনেক বেশি। সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।

তাই এই সকল ধনবিজ্ঞানী টাকার বাজার দর বা সুদের হার উচ্চ রাখার পক্ষপাতী। ইহারা আরও বলেন যে যুদ্ধের সময় হইতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কম রাখিযাছে কারণ সরকারী ঋণপত্রের সুদের ভার ইহাতে কম থাকিবে। সরকারের ফিস্‌কাল এজেণ্ট হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যুদ্ধের সময়ে প্রভূত পরিমাণে সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিয়াছিল, বণ্ডের দামে উঠানামা ঘটিতে দেয় নাই, অর্থাৎ সুদের হার সমান স্তরে রক্ষা করিয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে থাকা সত্ত্বেও সুদের হার বাড়ায় নাই, অর্থাৎ আর্থিক নীতিকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে পারে নাই। বর্তমানেও এই নীতির সার্থক প্রয়োগ বিশেষ দেখা যাইতেছে না।

কিন্তু এই নীতি বিপদজনক মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিয়াছে

মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ বা টাকার মূল্যে ক্রমাগত ক্ষয় রোধ করা অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে সুদের হার বাড়ান এবং ঋণ সংকোচন করার স্বাধীনতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতেই থাকা উচিত এবং এই স্বাধীনতার পরিধি বাড়ান দরকার। সরকারী ঋণপত্রের দরুণ সুদের খাতে বেশি ব্যয় হইলেও এই নীতি সমর্থন যোগ্য, কারণ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উপকারিতা উহাপেক্ষা অনেক বেশি। এমনভাবে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো দরকার যেন তাহাতে কিছুতেই মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে। দেশে টাকার পরিমাণ বা আয়তন (size of the money stock) ঠিক কতটা হওয়া উচিত? টাকার পরিমাণ এত বেশি হওয়া উচিত যাহা দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তরকে উচ্চ মাত্রায় ধরিয়া রাখিতে পারে, অথচ দেশে ব্যয়ের

কখন টাকার পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে হয়

স্রোত-ধারা এতটা বৃদ্ধি না পায় যে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ছাপাইয়া দামস্তর বাড়িয়া চলে। কোন উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক দেহ নিজের পরিপুষ্টির জন্য ক্রমশ বেশি পরিমাণে টাকার যোগান পাইতে চাহে। জনসাধারণ যতটা টাকা ধরিয়া রাখিতে চায় তাহাতে পরিবর্তন অনুযায়ী বিভিন্ন মরসুমে টাকার পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া চলিতে হয়। যেমন, কোন সময়ে, দেশের চল্‌তি অর্থের পরিমাণ দ্রুতহারে ব্যবহার হইতে থাকার সময়ে, (অর্থাৎ প্রচলন বেগ বাড়িয়া যাওয়ায়) ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেল। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরের কাছাকাছি, যখন দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়ান আর বিশেষ সম্ভব নয়, তখন এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ হ্রাস না করিলে নিশ্চয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে। আবার যখন শ্রমিকদের গড় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা দেশের কৃষি-উৎপাদন অতিরিক্ত হার বাড়ে, তখনই টাকার যোগান বাড়ান দরকার, তাহা না হইলে দামস্তর হ্রাস পাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোর্ড অব্‌ ডিরেক্টারস্‌ টাকার মূল্য রক্ষা করার জন্য যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। "কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন উন্নয়নের হার রক্ষা করার চেষ্টা করিলেই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত সকলে মানিয়া লইলেও ইহা সফলভাবে কার্যকরী করিতে যে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ও বাহ্য সাহায্যের দরকার হইবে তাহার তাৎপর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ বোধ আমাদের মনে সঞ্চারিত হইতেছে না। উপযুক্ত আভ্যন্তরীণ উপকরণ ও বৈদেশিক সাহায্য যদি না আসে তাহা হইলে এত বেশি ব্যয়ের কার্যসূচী দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থায়িত্বকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিবে, ইহাতে ঐ ব্যয়ের কার্যসূচীই সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ক্রমশ বেশি অংশ বিনিয়োগের দিকে পাঠান দরকার, কিন্তু ক্রমশই এই উপকরণ সংগ্রহ করার (mobilization of resources) কাজ দুরূহ হইয়া উঠে, কারণ সারা অর্থনৈতিক দেহে এই বর্ধিত নূতন আয় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়ে ও অধিকাংশ জনসাধারণের আয় হইতে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের পর নিতান্ত অল্প অংশ উদ্বৃত্ত থাকে। এই কাজে সাফল্য সীমিত থাকে একদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাংগঠনিক ও শাসনতান্ত্রিক বাধা দ্বারা, এবং অপর দিকে উন্নয়নের কাজে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কতটা কাজে লাগান যায় তাহার

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে মুদ্রাস্ফীতি এখন বিপদ্‌জনক রূপ লইয়াছে

দ্বারা। উপযুক্ত পরিমাণে উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে না, ইহা প্রকাশ পায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধির মধ্য দিয়া. এবং এইরূপ দাম-বৃদ্ধি বিশেষভাবে আঘাত করে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীদের, ইহাদের মধ্যে কৃষি মজুররাও আছেন। দামস্তরে বৃদ্ধি এইরূপে অর্থনৈতিক অসাম্য তীক্ষ্ণতর করে এবং মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ বাড়াইয়া তোলে। উন্নয়ন-ধারার পথে আর্থিক স্থায়িত্ব রক্ষা করা তাই উন্নয়নের লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্যেই প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।"* এই চেতনা আসিয়াছে বলিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনাতে ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ কিছুটা কম ধরা হইয়াছে। শুধু ঘাট্‌তি ব্যয় নয়, পরিকল্পনার সময়ে দেশের লেনদেন ব্যালান্সের শাসনও যে মানিয়া লইতে হয়, তাহার চেতনাও তৃতীয় পরিকল্পনায় দেখা গিয়াছে। এইরূপে টাকার মূল্য রক্ষা করার নীতি ও প্রচেষ্টা বর্তমানে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

---

* "An effort to secure even the rate of growth projected for the Second Plan would involve during the Third Plan a higher order of investment. While this conclusion seems to find ready and general acceptance there appears to be insufficient appreciation of its implications in terms of the measure of internal effort and external assistance required for its successful accomplishment. Unless the requisite internal resources and foreign aid are forthcoming such larger expenditure programmes are likely to jeopardise economic and monetary stability to the point of endangering their very fulfilment. With rising national income it should be possible to direct a progressively large proportion of it into movement but the task of mobilization of resources is made difficult by the wide dispersion of new income over the economy and the generally small surplus over subsistence in the incomes of the mass of population. Success in this task is conditioned on the one hand by the organizational administrative difficulties of the system and on the other by the extent to which the constructive energies and enthusiasm of the people can be released and channelled into the service of development. A shortfall in resources manifests itself in a rise in prices especially of essential commodities which affects particularly adversely the economic position of the weakest and most vulnerable sections of the community including landless agricultural labourers. A rise in prices thus accentuates economic inequality and in turn sets up strong pressures for a rise in wages and for other adjustments which are liable to disturb seriously the course of development. The maintenance of monetary stability during the process of development thus becomes an objective of prime importance in the very interest of successful achievement of the targets of development itself." Report of the *Central Board of Directors, Reserve Bank of India*, for the year ended June, 1959. P. 16.

২৬

দামস্তর ও মূল্যনীতি

Price level & the Price Policy

ভারতের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি (Present Inflation in India)

উন্নত দেশগুলিতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর তৎক্ষণাৎ না-ও বাড়িতে পারে। অর্থের যোগান বাড়িলে সাধারণত দেশে স্থদের হার কমে। লোকেরা যদি সেই অর্থ ব্যয় না করিয়া নগদ অবস্থায় হাতে ধরিয়া না রাখিয়া ধার দিতে চায় তবে স্থদের হার কমিয়া যাইবে। কিন্তু ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে লোকের আর্থিক আয় বাড়িলে উহা ভোগের জন্য ব্যয়িত হয় এবং ফলে সরাসরি দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তব বাড়িবাব ঝোঁক দেখা দেয়।

অর্থের যোগান ও দামস্তর

তবে যদি বর্ধিত অর্থের যোগান প্রধানত ধনিক শ্রেণীর আয় বাড়াইয়া তোলে, তাহা হইলে দামস্তর না-ও বাড়িতে পারে, কারণ ধনীশ্রেণীর ভোগ-প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই কারণেই, অর্থের যোগান যে পরিমাণ বাড়িয়াছিল দামস্তর সেই তুলনায় বাড়ে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই অর্থের যোগান ততটা না বাড়িলেও দামস্তর বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ হইল, (ক) উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিশৃংখলার দরুন উৎপাদন ততটা বাড়িতে না পারা, (খ) যুদ্ধকালীন মজুত টাকা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লগ্নী হইয়া সাধারণ লোকের মধ্যে আয় সৃষ্টি করা, এবং (গ) সেই মজুত করা টাকায় ফাটকাবাজি বৃদ্ধি পাওয়া।

যুদ্ধোত্তর কালে দামস্তর বৃদ্ধির কারণ

১৯৩৯ সালের দামস্তরকে ১০০ ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে, ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে পণ্যমূল্যের সাধারণ-সূচক (General Commodity Index) ছিল ৩৪৯·৭। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দরুন কিছুটা উৎপাদন বৃদ্ধি, ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষিজাত দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি, এবং পূর্বেকার মুদ্রাস্ফীতির বিরোধী সরকারী ব্যবস্থার কিছুটা সাফল্যের ফলে দামস্তর অনেক পরিমাণে আয়ত্তের

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতে উহা মুদ্রাস্ফীতির আকার গ্রহণ করে

মধ্যে আসিয়াছিল, ঐ সময়ের পর হইতে দামস্তর বাড়িতে সুরু করিয়াছে এবং বর্তমানের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে।

বর্তমান ভারতের মুদ্রাস্ফীতি প্রধানত চারিটি কারণে ঘটিতেছে বলিয়া মনে করা হয়। (১) ঘাটতি বাজেট সৃষ্টি করিয়া সরকার প্রচুর পরিমাণ লগ্নী ব্যয় করিতেছেন. সেই টাকা ব্যাঙ্কে পৌঁছিতেছে। নগদ জমার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্ক ঋণও অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হইতেছে। ফলে দেশে মোট অর্থের যোগান ক্রমশ বাড়িতেছে। ১৯৫৫ সালের মালের মাঝামাঝি দেশে নগদ অর্থ প্রচলনের পরিমাণ ছিল ১৯৭৭ কোটি টাকা; বর্তমানে উহা বাড়িয়া ২৫০০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। (২) এই বর্ধিত অর্থ লোকের হাতে আয় হিসাবে পৌঁছিতেছে, এবং দেশ দরিদ্র বলিয়া দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইয়া তুলিতেছে। পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ সফল হইলে দ্রব সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িত, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিত না। কিন্তু জাতীয় উৎপাদন অনুরূপভাবে বাড়ে নাই, বরং কৃষির উৎপাদন তো সম্প্রতি কমিয়াই গিয়াছে। (৩) যুদ্ধের সময় হইতেই আমাদের দেশে দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা এবং উহা লইয়া ফাটকা ব্যবসায় সুরু হইয়াছে; সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির ইহাও একটি অন্যতম প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথমযুগে দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন-ব্যবস্থা বা বিক্রয়-কাঠামো সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া না আনায় এইরূপ ঘটিতেছে।* (৪) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের খুব বেশি অংশ এখনও পর্যন্ত অসমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত। এই সকল দেশে বাণিজ্যচক্রের প্রভাব উগ্রভাবে কার্যকরী হয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের মাধ্যমে সেই প্রভাব ভারতেও প্রসারিত হইয়া পড়ে। যখন ঐ সকল দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে সেই সময়

মুদ্রাস্ফীতির কারণ:
১। ঘাটতি ব্যয়
২। উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া
৩। মজুতদারি ও ফাটকাদারি

* বিক্রয়ের সূত্রগুলিকে সরকারী মালিকানায় লইয়া আসিলে বর্তমানে ফাটকাদারীতে নিযুক্ত টাকা নিজস্ব তাগিদে (ক) ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিল্পে নিয়োগের পথ খুঁজিয়া লইত, অথবা (খ) সরকারী ঋণভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া পরিকল্পিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইতে পারিত, এবং (গ) উৎপাদকেরা এই মজুতদার ও ফাটকাদারদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বেশি দাম পাইত।

আমাদের আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়ে। আমরা সাধারণত খাদ্য, কাঁচামাল,

৪। বিদেশী মুদ্রাস্ফীতির ভারতে প্রবেশ

মূলধনী ও ভোগদ্রব্য আমদানি করিয়া থাকি, ইহাদের দাম বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফাতির ইহাও একটি কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বলা চলে যে এই মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল ভাল হইতেছে না। আমাদের দেশে অনেক পণ্ডিত ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ রক্ষা করার জন্য মৃদু বর্ধনশীল দামস্তর (a slowly rising price level) বজায় রাখিতে চান, এইজন্য অল্প একটু

অনেকে বলেন ইহা ব্যবসায় বাণিজ্যে উৎসাহ আনে

মুদ্রাস্ফীতি (a little or mild dose of inflation) পছন্দ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বুঝিতে পারিলে এই নীতির তাৎপর্য বোঝা যাইবে। উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবার ফলে দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হইতে পারে, উহা জনসাধারণের পক্ষে লাভজনক হইলেও মালিকদের পক্ষে নয়। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা যে গতিতে বাড়ে সেই তুলনায় তাহাদের আসল আয় যাহাতে বাড়িতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা মুদ্রাস্ফীতির নীতি সুচিন্তিতভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে এড়াইবার জন্য (আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে) শ্রমিকেরা নিজেদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইবার অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে, বেশি ওভারটাইম খাটে ও কারখানার উৎপাদনের বেগ বাড়াইয়া তুলিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শ্রমিকের আর্থিক আয় যে হারে বাড়ে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিজের কর্মদক্ষতা বাড়াইয়াও সে তাহার আসল আয় কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। শ্রেণী হিসাবে সরকারী ও বেসরকারী মালিকদের হাতে মুনাফা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু ইহা ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন। এই পদ্ধতিকে তাই "গোপন কর আদায়ের নীতি" (Concealed Taxation) বলে—এই পথে সমাজতান্ত্রিক

কিন্তু এই পথে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন সফল হয় না

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমগ্র জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার করা, ইহাই সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে অদৃশ্যভাবে শোষিত হইয়া বেসরকারী মালিকানার প্রসারের নীতি কেহ সমর্থন করিতে পারে না। সরকারী

পরিকল্পনার সহিত জনসহযোগিতার অভাব এই সকল কারণেই দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের জন্য সাময়িকভাবে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে অথবা গ্রহণ করা দরকার উহা আলোচনা করা প্রয়োজন। (১) প্রধান প্রধান ভোগ্য দ্রব্যগুলির দাম নিয়ন্ত্রণ করা এবং দেশে সরকারী বাণিজ্য সংগঠন গড়িয়া তোলা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের একটি অন্যতম প্রধান উপায়। খাদ্যশস্য ও ভোগ্যসামগ্রীর বাজার বেসরকার ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখার নীতি না বদলাইলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকালে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

১। দাম নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী বাণিজ্য

(২) আমাদের মত অপূর্ণোন্নত দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের দামই সাধারণ দামস্তরের প্রধান ভরকেন্দ্র—ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার কখনই সম্ভব নয়।

২। প্রধানত খাদ্য ও বস্ত্র

(৩) মজুত-দাবি ও ফাটকাদাবি রোধ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন (Selective credit control) যাহাতে ব্যাঙ্কগুলি খাদ্যশস্য মজুতের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের টাকা না দেয়। ইহা সঠিক নীতি বটে, তবে দেশীয় মহাজন ও ব্যাঙ্কারদের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ইহা কতটা কার্যকরী হইতেছে তাহা বলা শক্ত। শিল্পজাত কাঁচামালের ক্ষেত্রে (যেমন সরিষা, পাট প্রভৃতি) যাহাতে ফাটকাদারি দেখা না দেয়, সেই উদ্দেশ্যে সরকার ফরওয়ার্ড বাজার লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে ফরওয়ার্ড চুক্তিসমূহ খোলাবাজার হইতে সরিয়া গিয়া কালোবাজারে প্রবেশ করিয়াছে।

৩। মজুতদারি ও ফাট্‌কাদারি নিয়ন্ত্রণ

(৪) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা যাহাতে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে খাদ্য পায় সেই জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলিয়াছেন এবং স্বল্প পরিবর্তিত রেশনিং-প্রথা (Modified Rationing) ব্যাপকভাবে চালু করিতেছেন। ইহাদের সম্পর্কে বলা চলে যে : (ক) প্রয়োজনের তুলনায় ইহারা সংখ্যায় কম ; (খ) গ্রাম ও সহর সকল অঞ্চলেই ইহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে ; এবং (গ) এই সকল দোকান যাহাতে নিয়মিত ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পায় সেই উদ্দেশ্যেই খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির প্রসার প্রয়োজন। (৫) অনেকে বলেন,

৪। রেশনিং

ঘাটতি ব্যয় না কমাইলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইতে পারে না। সাধারণভাবে এই যুক্তিতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে উচ্চাভিলাষী বলা হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকে "বাস্তবাভিমুখী" ও "ছোট" করার কথা প্রচার করা হয়। বলা হয় যে, তাহা না হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া ভারতে বিপর্যয় আসিবে। কিন্তু এই যুক্তি মানিয়া লওয়া যায় না। ভারতে যদি বিপর্যয়কারী মুদ্রাস্ফীতি কখনও দেখা দেয় তাহার জন্য বর্তমানের ঘাটতি ব্যয়কে দায়ী করা চলে না। দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, ও অব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপকরণের দিকে তাকাইয়া এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়কে খুব বেশি বলা চলে না। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতেছে এবং আরও ঘটিবে কারণ দেশে দ্রুত উৎপাদন বাড়ান হইতেছে না। ভুল পথে পরিকল্পনা রচনা করা অথবা সঠিক পরিকল্পনা ভুল পথে কার্যকরী করার চেষ্টা করা—ইহাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ, ইহা ভুলিলে চলিবে না। মুদ্রাস্ফীতিকে অজুহাত (scape goat) হিসাব ব্যবহার করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকে ছাঁটকাট করার এই নীতি অবিলম্বে বর্জন করা দরকার। কারণ তাহাতেই মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বাড়িবে। উহাপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতির অর্থ নৈতিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বল গ্রন্থিগুলিকে সবল করিয়া তোলাই অধিকতর কার্যকরী ও যুক্তিসঙ্গত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকে বলেন ঘাটতি ব্যয় কমাও

কিন্তু পরিকল্পনা ছোট করিলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িবে

মূল্যস্তর ও পরিকল্পনা (Prices and the Plans)

কোন উন্নয়নকালীন অর্থনীতিতে মূল্যনীতির দুইটি প্রধান লক্ষ্য থাকা দরকার : (ক) পরিকল্পনায় যে-প্রকার অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ঠিক সেই অনুযায়ী যেন দ্রব্যসামগ্রীর আপেক্ষিক দামে পরিবর্তন আসে; এবং (খ) নিম্ন আয়গোষ্ঠীর ভোগে প্রবেশ করে এইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দামে বৃদ্ধি যেন রোধ করা সম্ভব হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পরিকল্পনাতেই এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং মূল্যস্তরের অবাঞ্ছিত গতি রোধ করার জন্য বিবিধ পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রথম পরিকল্পনায় মূল্যস্তরে বিশেষ উঠানামা ঘটে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহা ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হইয়া চলিয়াছে

মূল্যনীতির দুইটি লক্ষ্য

তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে পাইকারী দামস্তর এবং জীবনযাত্রার ব্যয়স্তর বেশ উঁচুতে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল্যনীতির লক্ষ্য হইল "it is essential to ensure that there is no accentuation of inflationary pressure in the course of the Third Plan and that the levels of living of the more vulnerable classes in society are safeguarded."*

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে কোরিয়ার যুদ্ধের প্রভাবের দরুন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর স্বাভাবিক অবস্থার তুলনার উঁচুতে ছিল। কোরিযার যুদ্ধের অবসান এবং ঐ সময়ে সরকার মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী যে ফিস্‌কাল ও আর্থিক উপায় অবলম্বন করেন তাহার দরুন মূল স্তর দ্রুত হ্রাস পায়, ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ইহার সূচক ছিল ১২৫·৩, ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ইহা হয় ৯৯·৯। পরবর্তী দুই বৎসরে দামস্তর মোটামুটি একরূপ থাকে। ১৯৫৩-৫৪ সালে বিপুল পরিমাণ শস্য উৎপাদন হয়, ফলে দামস্তর হ্রাস পায়, বিশেষত খাদ্যশস্যের দাম অনেকটা কমিয়া আসে। এই অবস্থায় পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যসূচীর প্রসার ঘটান হয়, তাহাদের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায় এবং সরকারী খাতে খাদ্যশস্যের ক্রয় সুরু হয়। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আবার দামস্তরের ঊর্ধ্বমুখিতা সুরু হয়, ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম পরিকল্পনার শেষকালে ইহা ছিল ৯৮·১।

প্রথম পরিকল্পনায় মূল্যস্তরে উঠানামা

সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দামস্তর ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হইয়া আসিয়াছে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, পাইকারী দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ; খাদ্যদ্রব্যে বৃদ্ধি প্রায় ২৭% এবং শিল্পগত কাঁচামালে প্রায় ৪৫%, ও উৎপন্ন দ্রব্যে ২৫%-এর উপরে। পাইকারী দামস্তরে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বমুখিতার কারণ আমরা চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই বিচার করিতে পারি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এবং আর্থিক আয়ে বৃদ্ধি সকল কিছু মিলিয়া চাহিদার চাপ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যোগানের প্রভাবও কম ছিল না। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ৬ মিলিয়ন টন কম ছিল। আবার ১৯৫৯-৬০ সালে, খাদ্যশস্যের

দ্বিতীয় পরিকল্পনা: মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী

Third Five Year Plan P. 119.

উৎপাদন পূর্ব-বৎসর অপেক্ষা ৪ মিলিয়ন টন কম ছিল। কৃষি উৎপাদনে হ্রাস দামস্তরের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যদ্রব্যের দামস্তরকে খুব বেশি বলিয়া মনে করা চলে না, কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাকালে ইহার বৃদ্ধির পরিমাণ হইল ৩৭%।

ফলে জীবন ধারণের ব্যয়স্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ইহার সূচক ছিল ১০০, আর পরিকল্পনার শেষে ইহার সূচক হইল ১১৪। পরিকল্পনার প্রথম যুগে ইহার কারণ ছিল প্রধানত খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি, কিন্তু শেষ দিকে খাদ্যশস্য ছাড়াও জীবনধারণের অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন দেশে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করিয়াও দামস্তর কতটা স্থির রাখিতে পারা যায় তাহা প্রধানত নির্ভর করে কৃষি-উৎপাদনের উপর বিশেষত, খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদনের উপর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে শিল্প, খনি ও পরিবহন নিশ্চয় বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু উহা কতটা বাড়ান চলে তাহা নির্ভর করে কৃষিজ দ্রব্যের, প্রধানত খাদ্যের যোগানের উপর। দেশের কৃষি-উৎপাদন যদি মৌসুমী বায়ুর খেয়াল-খুশিতে চলিতে থাকে তাহা হইলে এই সকল সাময়িক ঘাট্তি প্রতিরোধের উপযোগী খাদ্যের মজুত সরকারের হাতে সর্বদা রাখা দরকার। তাহা না হইলে দ্রুত শিল্পপ্রসারের চেষ্টায় অর্থনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দিবে। উপরন্তু ফাট্কা মজুতের চাপেও খাদ্যের বাজারে কিরূপ কৃত্রিম ঘাট্তি সৃষ্টি করা যায়, সেই বিষয়েও আমাদের অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে।

মূল্যস্তর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে দামস্তর সম্পর্কে কিরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে? পরিকল্পনা কমিশন চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই দামস্তরের সম্ভাব্য গতিকে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে চাহিদার শক্তিগুলির টান স্বভাবতই উর্ধ্বমুখী। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ১১% হইতে ১৪%-এ তোলা হইবে বলা হইয়াছে। ইহাতে যে বর্ধিত আর্থিক আয় দেখা দিবে তাহার পিছনে অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাকা দরকার। এত অধিক বিনিয়োগ করার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইবে কর আরোপনের দ্বারা বা অন্য ফিস্‌কাল উপায়ে, ফলে

তাহাতেও কোন কোন ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইবে। পরিকল্পনায় প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় বাড়াইবার কথা বলা হইয়াছে. জাতীয় আয়ের ৮.৫% হইতে ১১.৫%-এ তোলার কথা বলা হইয়াছে। যদি সকল প্রকার ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা মিটাইতে অনুমতি দেওয়া হয় তবে ইহা কোনমতে সম্ভব হইবে না তাই কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ সংকুচিত করিয়া বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপকরণগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ ছাড়িয়া দিতে হইবে। উপরন্তু, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের অবস্থা বর্তমানে অনেক খারাপ। তাই তখন যেরূপ মুদ্রাস্ফীতির চাপ রোধ করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের একাংশ ব্যবহার করা হইয়াছিল বর্তমানে আর সেই সুবিধা নাই। বরং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন খুবই বেশি, তাই রপ্তানির পরিমাণ অনেকটা বাড়াইতে হইবে। ফলে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ দাম বৃদ্ধি পাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা-কালীন সম্ভাবনা: চাহিদার দিক

এখন যোগানের দিক আলোচনা করা যাউক। পরিকল্পনাতে ভোগ্যদ্রব্য ও কাঁচামালসমূহের উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করার সময়ে আভ্যন্তরীণ ভোগের প্রয়োজন ও রপ্তানি উভয় দিকই বিচার করা হইয়াছে। যেমন, খাদ্যের উৎপাদনে ৩০% বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির দরুণ চাহিদা বাড়িবে তাহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, উপরন্তু আমদানি কমাইবার কথাও চিন্তা করা হইয়াছে। বর্তমানের স্তর অপেক্ষা তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ৩৭%, তৈলবীজের ৩৮%, চিনির ও বস্ত্রের ২৫% ধার্য করা হইয়াছে, ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে। সরকারের হাতে প্রভূত পরিমাণে ধান ও গম মজুত আছে এবং PL 480 খাতে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। তাই আশা করা যায় যে, খাদ্যের যোগান কম পড়িবে না, এবং দামস্তর ততটা ঊর্ধ্বমুখী হইবে না; সার, বিদ্যুৎ, পথঘাট, ইস্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতির উৎপাদন বাড়াইয়া আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাও অনেকটা বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কমান হইয়াছে। এইরূপে মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রতিরোধের দিকে নজর রাখিয়া এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যালান্স রক্ষা করিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

যোগানের দিক

পরিকল্পনা কমিশনের মতে, এই সকল ব্যালান্স ও সাবধানতা সত্ত্বেও

আগামী পাঁচ বছরে প্রভূত পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রথমত মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে চিরাচরিত অনিশ্চয়তা এখনও রহিয়া গিয়াছে। কোন এক বৎসরে কৃষি উৎপাদন শতকরা পাঁচভাগ হ্রাস পাইলে বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ভয়ানক কমিয়া যায় এবং উহাপেক্ষা অনেক বেশি অনুপাতে দাম বৃদ্ধি পায়।

তবুও দাম বাড়িবে কেন

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার অন্তর্গত ভোগ-সংকোচনের বিবিধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরী না ও হইতে পারে, ফলে পরিকল্পনা-কালের কিছু অংশে বাড়্তি চাহিদার (excess demand) অবস্থা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, যদিও পরিকল্পনাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যালান্স রক্ষার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে কিছুটা ভারসাম্যহীনতা নিশ্চিতভাবে দেখা দিতে পারে। কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকের বিনিয়োগ ও উৎপাদনে সুনিশ্চিত হিসাবনিকাশ রক্ষিত হয় না, পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন ও বণ্টনের কাঠামোতে ফাঁক' দেখা দিতে পারে।*

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মূল্যনীতির রূপ (Price Policy in a developing economy):

দেশের মূল্যনীতিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের অঙ্গ হিসাবে মনে করিতে হইবে, কোন বিশেষ দ্রব্যের দামে উঠানামা উচিত কি উচিত নয়, সেইরূপ আংশিক দৃষ্টিতে ইহাকে বিচার করা চলে না। মিশ্র অর্থনীতিতে দামের সাধারণ স্তর এবং দাম কাঠামো নির্ভর করে কিছুটা সরকারী সিদ্ধান্তের উপর, কিন্তু অনেকটাই উৎপাদক, ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের

* "These balances and safeguards notwithstanding, the possibilities of significant—and even disturbing—price rises cannot be entirely eliminated. *Firstly*, there is the usual uncertainty with regard to monsoons. A five per cent shortfall in agricultural output in a single year can reduce the marketable surpluses substantially and raise prices more than proportionately. *Secondly*, the various restraints on consumption implicit in the plan may not always operate to the full extent, so that a situation of excess demand may well persist over a part of the Plan period. *Thirdly*, while the Plan envisages a certain balance between the rates of growth in various sectors some imbalance is almost certain to appear from time to time; investments and outputs in various lines cannot, in actual practice, be phased out with precision; there might well be 'lags' in the system at various stages." *Third Five Year Plan*, P. 125.

কাজকর্মের উপর। ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে নিজস্ব লাভালাভের সম্ভাবনা অনুযায়ী কাজকর্ম করিয়া থাকেন। তাই স্বল্পকালে দামস্তরের গতিবিধি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে এই মিশ্রকাঠামোতে সম্পূর্ণ সম্ভব হয় না। আরও একটি কথা। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রত্যেকটি কৌশল দামস্তরের উপর এক বিশেষ ধরনের প্রভাব ফেলে। যেমন, বিনিয়োগের পরিমাণ কতটা হইল, স্বল্পকালীন ও দ্রুত ফলপ্রসূ বিনিয়োগের উপর কতটা অগ্রাধিকার দেওয়া হইল, অর্থসংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন ধরনের পদ্ধতির উপর তুলনামূলক গুরুত্ব আরোপিত হইল, রপ্তানির কোটা কমান বা বাড়ান হইল—এই ধরনের সকল সিদ্ধান্তের মধ্যেই দাম পরিবর্তন সম্পর্কে বিশেষ ধরনের আন্দাজ ধরিয়া লওয়া হয়। তাই পরিকল্পনা কমিশন একবার এইরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করার পরে দামস্তরে বা দাম-কাঠামোকে খুশিমত ও স্বল্পকালীন পরিবর্তন আনিতে পারেন না, এই বিষয়ে তাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ হইযা পড়ে।

অর্থ নৈতিক কৌশলের দ্বারা মূল্যনীতি সীমাবদ্ধ

অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার মত কয়েকটি চাপ অন্তর্নিহিত থাকে এবং তাহাদের মানিয়া লওয়া দরকার। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ধারার মধ্য দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় অধিক হারে আর্থিক আয় সৃষ্টি হয়। বিনিযোগের দরুণ আসল জাতীয় আয় বাড়ে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে। কোন কোন বিনিয়োগ ফলপ্রসূ হইতে অধিক সময় অতিবাহিত হয়। বিনিয়োগের মাত্রা যত বেশি, দামস্তরের উপর চাপও তত অধিক। বিনিয়োগ যত দীর্ঘকালপ্রসূ, দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপর চাপ তত বেশি। জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণের যত বেশি অংশকে পুরানো কাজ হইতে সরাইয়া আনিযা নূতন ধরনের কাজে খাটাইতে হয় ততই তাহাদের আর্থিক পুরস্কার বেশি দিতে হয়। ইহাও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ।

উন্নয়নের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় কেন

অপরপক্ষে, ইহারই পাশাপাশি, কতকগুলি বিষয় কাজ করে যাহার ফলে দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি কিছুটা দমিত থাকে। এই সকল সংযমনশীল শক্তিসমূহের (moderating factors) প্রভাবের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি হাত ছাড়া হইয়া ব্যাপক ক্ষতি ঘটাইতে পারে না। অব্যবহৃত উপকরণসমূহ যতটা টানিয়া আনা যায়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষিতে, কম বিনিয়োগের সাহায্যে

ও দ্রুত যতটা উৎপাদন বাড়ান চলে ততই মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বাড়িতে পারে না। অতীতের বিনিয়োগ হইতে বর্তমানে কিছুটা উৎপাদন শুরু হইতে থাকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও উন্নয়ন কেন বিপুল মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না

টেক্‌নোলজি ও সাংগঠনিক দক্ষতা যত বৃদ্ধি পায় ততই ব্যয় না বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। উৎপাদন ও সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সরকারী নীতি এবং সঠিক দাম নীতি—এই সকল কিছু মিলিয়া উন্নয়নের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা অনেকটা রোধ করিতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে মুদ্রাস্ফীতির বর্ধনশীল ও সংযমনশীল শক্তিসমূহের মধ্যে ভারসাম্য সর্বদা পরিবর্তিত হয় এবং ইহা অনেকটা অনিশ্চিতও বটে। অপূর্ণোন্নত দেশকে বেশ কিছুকাল ধরিয়া বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয় এবং অদক্ষ গ্রাম্য চাষাকে দক্ষ শ্রমিক ও টেকনিশিয়ান করিয়া তুলিতে হয়।

উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা দরকার

এই রূপান্তরণের পথে বহু প্রকার প্রতিবন্ধক দেখা দিতে পারে। টাকা দিয়া সমাজের আসল উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে হয় এবং যে ক্ষেত্রকে দ্রুত প্রসারিত করিতে হইবে সেখানে মুনাফার হার একটু বেশি রাখার দরকার হইয়া পড়ে। ফলে অল্প কিছু মাত্রায় দামস্তরে বৃদ্ধি মানিয়া লইতে হয়, এবং ইহারই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দামে বৃদ্ধি রোধ করার উদ্দেশ্যে সকল প্রচেষ্টা সংহত করিতে হয়।

মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কেও সচেতন থাকা বিশেষ প্রয়োজন। যদি দামস্তর প্রভূত মাত্রায় বাড়াইয়া পরিকল্পনার আর্থিক ব্যয় মেটান হয় তবে সেই পরিকল্পনার আসল ফলাফল অনেকটা হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ উপকরণসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয় না। ইহা আপেক্ষিক দামের কাঠামোতে বিকৃতি আনে এবং সামাজিক গুরুত্বের দিক হইতে যে-সকল ব্যবহারে নিযুক্ত হওয়া উচিত তাহা হইতে উপকরণগুলিকে অপসারিত করে।

মূল্যবৃদ্ধির বিপদসমূহ

সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর লোকদের আয়ই স্থায়ী ধরনের—তাহাদের আসল জীবনযাত্রার মান ক্রমশ ক্ষয় পাইতে থাকিবে, ইহা বেশিদিন চলিতে পারে না। আবার যদি সমাজের বিস্তৃততর অংশে আর্থিক আয় বাড়িতে দেওয়া হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির ঘূর্ণিচক্র তীব্রতরই হইতে থাকিবে। তাই সমস্যা হইল কতটা পরিমাণে, কোন পদ্ধতিতে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা দরকার সেই সম্পর্কে সর্বদা বিচার করিতে থাকা।

মূল্যনীতি গঠনকারী বিষয়সমূহ (Constituents of Price Policy)

উন্নয়নশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোতে মূল্যনীতির প্রধান অঙ্গ হইল ফিস্‌কাল ও আর্থিক কৌশল অবলম্বন করা। দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা বাড়্‌তি চাহিদার চাপ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, এই বাড়তি ক্রয়শক্তি ছাঁকিয়া তুলিয়া আনাই ফিস্‌কাল নীতির কাজ। অর্থাৎ পরিকল্পনার নির্ধারিত স্তরে যাহাতে ভোগ সীমিত থাকে সেই অনুযায়ী করের পরিমাণ স্থির হওয়া দরকার। নূতন ক্রয়শক্তি সৃষ্টি না করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতেই বিনিয়োগের জন্য উপকরণ সরকারী ক্ষেত্রে সরাইয়া আনা প্রয়োজন। অর্থাৎ ফিস্‌কালনীতির সামগ্রিক লক্ষ্য হইবে ভোগ সংকুচিত করা এবং সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া সরকারের হাতে তুলিযা আনা।

১। ফিস্‌কাল নীতি

ফিস্‌কাল নীতির পাশাপাশি উপযুক্ত আর্থিক নীতি থাকা প্রয়োজন। ফিস্‌কাল নীতির কাজ হইল সরকারী কাজকর্মের দরুণ যাহাতে জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়শক্তি না পৌঁছে সেই ব্যবস্থা করা; অপরপক্ষে আর্থিক নীতির কাজ হইল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টির বেগ নিয়ন্ত্রণ করা। উন্নয়নশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ঋণের প্রয়োজন ক্রমশ বাড়ে এবং যাহাতে ব্যাঙ্কগুলি প্রযোজনমত ঋণ বাড়াইতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ঋণ প্রসারের মাত্রা যাহাতে প্রযোজনের স্তর ছাড়াইযা যাইতে না পারে সেই দিকে অতি অবশ্য লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যেন পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বিশেষ বাড়িতে না পারে, কারণ তাহা হইলে বিনিয়োগযোগ্য সীমাবদ্ধ উপকরণের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িবে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আর্থিক নীতি প্রযুক্ত হইবে। দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ফাটকাদারি অথবা উহা মজুত করা বিশেষভাবে বাধা দিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এতদিন বাছাই-করা ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি (selective credit control) প্রয়োগ করিতেছিল। বর্তমানে উহা ব্যাঙ্কব্যবস্থার সামগ্রিক ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও ব্যাঙ্করেট বাড়ান হয় নাই, তবুও নির্দিষ্ট সীমার ঊর্ধ্বে ধার করিলে শাস্তিমূলক হার (penal rates) দিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২। আর্থিক নীতি

মূল্যস্তরে উর্ধ্বগতি রোধ করার কাজে বাণিজ্যিক নীতিও (commercial policy) প্রয়োগ করা চলে; ইহা দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর আভ্যন্তরীণ দুষ্প্রাপ্যতা অনেকটা দূর করা সম্ভব। কিন্তু আরও অনেককাল ধরিয়া আমাদের আমদানি কমাইয়া রপ্তানি বাড়াইতে হইবে, তাই আভ্যন্তরীণ দামের উপর চাপ চলিতেই থাকিবে। বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার প্রয়োজন খুবই বেশি, তাই জাতীয় উৎপাদনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া উহা বাহিরে পাঠাইতেই হইবে এবং এই পথে দেশের অভ্যন্তরে মূল্যবৃদ্ধি মানিয়া লইতে হইবে।*

৩। বাণিজ্যিক নীতি

মূল্যনীতির মধ্যে ফিস্‌কাল, আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যতীত অন্যান্য কৌশলও আছে। ফিস্‌কাল ও আর্থিক নীতির যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া এই কৌশলগুলি ততটা কার্যকরী হইতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র ফিস্‌কাল ও আর্থিক নীতিসমূহ অনেক সময় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর আপেক্ষিক দামের মধ্যে সঠিক অনুপাত বজায় রাখিতে পারে না অথবা নিম্ন ও স্থির আয়ের লোকজনের কষ্ট দূর করিতে পারে না। তাই অনেক সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমাণগত নির্দেশ এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সমূহ (physical allocations and direct controls) প্রয়োগ করা দরকার। যেমন, যতদিন ইস্পাত দুষ্প্রাপ্য থাকিবে, ততদিন কোন এক প্রকার অগ্রাধিকারের নীতি মানিযা লইয়া উহাকে বিভিন্ন ব্যবহারে বণ্টন করিযা দিতে হইবে। কোন দুষ্প্রাপ্য জিনিসের দাম অতিরিক্ত বাড়িয়া গেলে একমাত্র যাহারা সেই উচ্চ দাম দিতে পারে তাহারাই দ্রব্যটি পাইবে, কিন্তু অনেকের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটিতে পারিবে না। তাই পরিমাণগত ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দরকার। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ সর্বক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ দরকার হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামগুলি মোটামুটি স্থির রাখা দরকার; যে-সকল দ্রব্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, যাহাদের "আরামী" বা "বিলাসী" দ্রব্য বলা হয়, তাহাদের মূল্যবৃদ্ধি স্বীকার করা চলে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের কৌশল বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হইতে পারে; কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হইল উৎপাদন বাড়ান।

৪। অন্যান্য নীতিসমূহ

---

*"In the foreign exchange situation that the country is facing, if the choice is between an enlargement of foreign exchange earnings and a rise in the prices to be paid by the domestic consumer, the former must have a decided preference." *Third Five Year Plan.* P. 128.

অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী মজুত, বণ্টন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং কিছু পরিমাণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হইয়া উঠিতে পারে।

খাদ্যদ্রব্যের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি, উহার প্রতিকার ও সরকারী ব্যবস্থাবলী (Recent rise in food prices, its remedies and government steps) :

১৯৬৪ সালের বাজেট অধিবেশনে আগামী ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট পেশ করিবাব পূর্বে অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারি একটি 'আর্থিক পর্যালোচনা' প্রকাশ করেন। এই সরকারী 'পর্যালোচনায়' তিনটি বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমত, সরকার অনেক চেষ্টা করিযাছেন কিন্তু তবুও তাঁহারা নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রেব দাম ঊর্ধ্বগতি কোনমতেই রোধ করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুঃসহ হইযা উঠিযাছে, এবং পবিকল্পনার প্রতি জনসাধাবণের অবিশ্বাস দেখা দিযাছে। দ্বিতীয়ত, শিল্প ও কৃষি উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদনের হার কমিয়া গিযাছে, কৃষিতে উৎপাদন হ্রাসের ঝোঁক অনেক বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও কৃষির বিভিন্ন দিকে যে লক্ষ্যসমূহ ধার্য করা হইযাছিল, তাহা হইতে উৎপাদন অনেক কম। তৃতীয়ত, জিনিসপত্রের দাম ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ছাড়াও জনসাধারণের উপর করভার ক্রমশ বাড়িয়া চলিযাছে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছিতে না পারিলেও কর আদাযের নির্ধারিত লক্ষ্য হইতে অনেক বেশি আদায় করা হইযাছে। আমরা এই পর্যালোচনার প্রথম বিষযটি, অর্থাৎ সাম্প্রতিক নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি লইয়া আলোচনা কবিব।

কৃষ্ণমাচারীব অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ কতটা সেই বিষয়ে জানা দরকার। এই অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বলা হইয়াছে: "The normal seasonal tendency for wholesale prices in general over the second half of the fiscal year (September, 1963 to March, 1964) has not been in evidence during the current year. The wholesale price index (1952-53=100) which has reached 136 at end of October, 1963 declined to 134 by the end of November, but it rose again in December and on January 26, it was 137." এই হিসাব হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় চলতি বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এত অধিক যে অন্যান্য বৎসরের মত

মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ

নূতন শস্য বাজারে আসিবার পরেও দাম কমিতেছে না। বরং এই অবস্থায় সকল পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেই পাইকারী দামস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। পাইকারী দামই যদি এই হয়, তবে খুচরা-দামে কি অবস্থা তাহা সহজেই অনুমেয়। 'আর্থিক পর্যালোচনা' হিসাব দিয়াছেন ১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত। কিন্তু প্রতি মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিন হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, পাইকারী ও খুচরা দামস্তর জানুয়ারীর তুলনায় অন্তত শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্য, বিশেষভাবে চাউলের দামে বিপুল বৃদ্ধি হইযাছে। শুধু তাহাই নহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাষায় বলিতে গেলে "The most disturbing fact, however, is that there has been a marked increase in prices of wheat, inferior cereals like jower and of cotton in recent times." রাজস্থান, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে গমের দাম প্রতি মণ ২০ টাকা হইতে ৩২ টাকায় পৌঁছিয়াছে, মার্কিনী গম দামের উপর কোন প্রভাব ফেলিতে পারে নাই।

সাধারণ ক্রেতাদের জীবনযাত্রার মানের উপর এইরূপ দাম বৃদ্ধির প্রকৃত ফলাফল কি তাহা বুঝা যায় শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী (cost of Living Index for working class) কি ভাবে বাড়িয়াছে, উহা আলোচনা করিলে। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বরের মধ্যে উহা ১৩১ হইতে ১৩৮ হইয়াছে; ঐ সূচীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দামসূচী বাড়িয়াছে ১৩০ হইতে ১৪০। লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী রচিত হয় ১৯৪৯ সালকে ভিত্তি করিয়া (base year), অথচ পাইকারী দামসূচীর হিসাব হয় ১৯৫২ সালকে ভিত্তি করিয়া। ১৯৫২ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে দামস্তর বেশি ছিল। ফলে ক্রেতাদের খুচরা দামস্তরে বৃদ্ধির অনেকটা গোপনে ঢাকা পড়ে। তবুও, ১৯৪৯ সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরিলেও গত পাঁচ ছয় বছর পূর্বের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা অতীব বিপদের কথা। গত ছয় মাসে দ্রব্য-সামগ্রীর দাম আরও বাড়িয়া অবস্থা খুবই ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। সর্বোপরি, খুচরা দামে বৃদ্ধির হার এত বেশি যে সরকারী হিসাবে তথ্যে উহার প্রকৃত রূপ আর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যাইতেছে না।

জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী

এইরূপ অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণ কি ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইতেছে। সরকার মনে করেন যে, এই অবস্থা ঘটিতে পারে ভাবিয়াই গত বৎসরের বাজেটে ঘাটতি ব্যয় ও পরোক্ষ কর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং ইহারা এই দাম বৃদ্ধির কারণ নয়। "Accordingly apart from

limiting the scale of deficit financing the budget for 1963-64 had avoided large increase in indirect taxation on items of mass consumption which were produced domestically." এই দুইটি কাজ করা সত্ত্বেও (ইহাদেরই সরকার পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন) "Even so, there has been a steady upward pressure on prices in general over most of the year. Sugar prices had started rising from January 1963 and rice price which had declined between October 1962 to March 1963 by 3 percent went up between April and October 1963 by 17½ percent." সরকারের মতে এই হারে দামবৃদ্ধির কারণ হিসাবে দায়ী হইল "কৃষি উৎপাদনে হ্রাস এবং উহার ফলে ভোগদ্রব্যাদির যোগানে দুষ্প্রাপ্যতা।" কথা হইল: কৃষি উৎপাদনের স্বল্পতাই এইরূপ অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধির কারণ তাহা ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। কৃষি উৎপাদন বাড়ে নাই বটে, কিন্তু যতটুকু কমিয়াছে, তাহা অপেক্ষা নূতন আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি। সুতরাং খাদ্যশস্যের মোট যোগান পূর্বের বৎসরের তুলনায় কমে নাই। তাহা হইলেও দাম বাড়ে কেন?

এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ কি

অর্থনীতিবিদ্গণের মতে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পিছনে দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, দেশরক্ষা ও উন্নয়ন উভয়ের চাপ একযোগে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে টাকা-প্রচলনের পরিমাণ অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই টাকা এমনভাবে এমন স্থানে ব্যয়িত হইয়াছে যে ভোগদ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান সেখানে সম্ভব নয়। ১৯৬২-৬৩ সালে দেশরক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫০৫ কোটি টাকা। চলতি বছরে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের বাজেট ৮৬৭ কোটি টাকা, পরিকল্পনার খাতে বাজেটে-ধরা ১৪১৪ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়া ১৬৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পরিকল্পনা ও দেশরক্ষা—উভয় ধরনের ব্যয়ই এমন ধরনের যে তাহা হইতে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হয় না। এত টাকা লোকের হাতে পৌঁছিলে ভোগ্যদ্রব্যাদির দাম ঘূর্ণিগতিতে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর, এত টাকার হঠাৎ প্রচলনের সময়েই যদি কৃষি উৎপাদন বা কোন কোন নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন অল্প একটুও হ্রাস পায় তবে অবস্থা আরও ঘোরালো হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১। দেশরক্ষা ও উন্নয়ন—টাকার প্রচলন হঠাৎ খুবই বেশি

দ্বিতীয়ত, গত কয়েক বৎসর যাবৎ কৃষিজাত পণ্যের উচ্চদাম পাইয়া ভারতের প্রতি গ্রামেই—জমির মালিকশ্রেণীর বা বড় চাষীদের হাতে বিপুল পরিমাণ কাঁচা টাকা জমিয়াছে। কৃষি-আয়কর এই টাকা উহাদের হাত হইতে তুলিয়া লইতে পারে নাই। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে নাই, যতটুকু ঘটিয়াছে উহার বেশির ভাগই পুরাতন বনেদী শিল্পপতিদের একচেটিয়া অধিকারের প্রসার। ফলে গ্রামের এই টাকা শিল্পের শেয়ার কিনিতে পারে নাই। ধান, চাউল, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্য লইয়া ফাট্‌কাদারি এখন ইহাদের পক্ষে অর্থোপার্জনের অন্যতম প্রধান পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারাই "সমবায় সমিতি" গঠন করিয়াছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকা সমবায় সমিতির সূত্র বাহিয়া ইহাদের ফাট্‌কাদারির মূলধনে পরিণত হইয়াছে। এ বৎসরের দামস্তরে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি খাদ্যশস্যের বণ্টন কাঠামো বেসরকারী উদ্যোগের হাতে থাকার বিষময় ফল বলিয়া অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন।

২। অত্যধিক ফাটকাদারি

এই অবস্থা দূরীকরণের পথ কি এবং সরকার কি পথ গ্রহণ করিবেন তাহা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গের দাম অনুসন্ধানী কমিশনের কথা (দত্ত কমিশন) উল্লেখ করিতে পারি। এই কমিশন সম্প্রতি (জুন, ১৯৬৪) রাজ্য সরকারের নিকট উহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে অতিরিক্ত সরকারী অর্থব্যয় এবং বণ্টন-কাঠামোতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মুনাফালোভিতা মিলিয়া দামস্তরে এই ঘূর্ণাবর্ত দেখা গিয়াছে। কমিশনের মতে সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম-কাঠামোর ভরকেন্দ্র হইল খাদ্যদ্রব্যের দাম। খাদ্যশস্যের দাম কম থাকিলে নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর যেমন, ডাল, সরিষার তেল, কাপড় প্রভৃতির দাম বিশেষ বাড়ে না। কমিশনের মতে চাষীদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট দামে ফসল কেনা হইতে শুরু করিয়া ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় পর্যন্ত সকল স্তর সরকারের মালিকানায় উহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হওয়া উচিত। স্থায়ী ধরনের সেইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা পর্যন্ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য পাঁচ প্রকার শাসনতান্ত্রিক কাজ সুপারিশ করিয়াছেন :

প্রতিরোধের পথ কি? দত্ত কমিশন

খাদ্যের ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়করণ—তবে বর্তমানে পাঁচদফা কাজ

"Licensing of producers, importers, wholesalers and retailers in all areas; regulation of markets

mainly at the wholesale stage; setting up of price advisory boards and subcommittees for each major commoditty; maintenance of buffer stocks and enforcement of decisions by Government orders and not on the "gentleman's agreement" basis.

কমিটির মধ্যে চাউল কল মালিকদের প্রতিনিধিরা এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সহিত ঐক্যমত হন নাই। তাঁহাদের মতে বর্ধিত আবগারি শুল্ক বিক্রয় কর এবং রেলভাড়ার কথা কমিটি একেবারেই বিবেচনা করেন নাই। তাঁহাদের মতে ক্রেতা যে দাম দেয় তাহার খুব বেশি ব্যবসায়ীদের পকেটে যায় এবং উৎপাদক দাম পায় না, এই কথা ঠিক নয়। তাঁহাদের মতে দ্রব্যের বণ্টন বা বিক্রয়ের ব্যাপারে সমবায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। খাদ্য শস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বিফল হইবে কারণ ইহাতে বিপুল শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা। রাজ্য সরকার এখনও এই কমিটির সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই, তবে বিভিন্ন স্তরের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং, দুই একটি পণ্যের ঊর্ধ্বতম দাম বাঁধিয়া দেওয়া, প্রভৃতি কাজ শুরু করিয়াছেন।

অনুশীলনী

1. Account for the sharp rise in the general price level from June, 1950. What factors brought about a steep decline in Indian Prices in February—March, 1952? (C. U. B. Com. 1955)

2. How do you explain the phenomenon of war-time inflation in India? What measures were adopted by the government to fight this inflation?

3. Examine the main causes explaining the continuous rise in prices in India. What steps would you suggest for checking this rise?

4. Give a critical survey of the measures adopted by the Government of India for checking the rise in prices.

২৭

বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থা ও টাকার বৈদেশিক মূল্য

Present currency system and external value of the Rupee

নোট প্রচলনের রীতি ও রিজার্ভ ব্যবস্থা (System of Note Issue and Reserve System)

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে, নোট প্রচলন এবং ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজকর্ম করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি পৃথক দপ্তর আছে: ইস্যু দপ্তর ও ব্যাঙ্কিং দপ্তর। ইস্যু দপ্তরে জমা রাখা সম্পত্তির (assets) ভিত্তিতে নোট প্রচলন করা হয়; ইহা ব্যাঙ্কিং দপ্তর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

জনসাধারণের নিকটে টাকা ছাড়িয়া দেওয়া এবং আবার প্রচলনশীল টাকা দরকারমত ব্যাঙ্কে তুলিয়া আনা—সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্কিং দপ্তরের কাজ। ইস্যু দপ্তরে কিছু সম্পদ মজুত রাখিতে হয়, আইনে উহার পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে, তাহার ভিত্তিতে সে ব্যাঙ্কিং দপ্তরের নিকট কাগজের নোট পাঠাইয়া দেয়। ব্যাঙ্কিং দপ্তর উহা প্রযোজনমত দেশে প্রচলনের ব্যবস্থা করে। আইন অনুসারে ইস্যু দপ্তরের যে সম্পদ বা সম্পত্তির বিনিময়ে কাগজী নোট ইস্যু হইবে উহার মধ্যে থাকে স্বর্ণমুদ্রা বা ধাতু, বৈদেশিক সিকিউরিটি, রৌপ্যমুদ্রা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি এবং কিছু কিছু বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোট, যাহা ভারতে পরিশোধ্য।*

ইস্যু ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের কাজ

প্রথম দিকের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে নিয়ম ছিল যে, মোট কাগজী মুদ্রার নির্দিষ্ট অনুপাত, ৪০% মজুত রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থার নাম ছিল আনুপাতিক রিজার্ভ ব্যবস্থা। এই ৪০% রিজার্ভ রাখিতে হইবে স্বর্ণ ও ষ্টার্লিং সিকিউরিটিতে এবং এই রিজার্ভের মধ্যে অন্তত ৪০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ থাকা চাই।

১৯৩৫ সালের আইন

---

* বাস্তবে কিন্তু এইরূপ বিল ও প্রমিসরি নোট এখন পর্যন্ত মজুত হিসাবে কাজ করে নাই, কারণ ভারতে উপযুক্ত বিল মার্কেট গড়িয়া উঠে নাই।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার সময়ে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্য হয়। এই মুদ্রা তহবিলের সদস্য হিসাবে ভারতকে কেবলমাত্র স্টার্লিং-এর সহিত মূল্য সমতা রক্ষা করিলেই চলে না, পৃথিবী অন্যান্য বহু বৈদেশিক মুদ্রার সহিতও টাকার মূল্য-সমতা রক্ষা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের সরকারী সিকিউরিটি-ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে থাকা দরকার। তাই এই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া নিয়ম করা হয় যে; কেবলমাত্র স্টার্লিং নয়, অন্যান্য বৈদেশিক সিকিউরিটি মজুত রাখিলেও চলিবে।

১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

কোন দেশের কাগজী মুদ্রার পিছনে বৈদেশিক সিকিউরিটি মজুত রাখার এই নীতি সাধারণভাবে গৃহীত হইত যখন আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল: বর্তমানে ইহার প্রয়োজন কম। বস্তুত, যুদ্ধের সময়ে বা পরবর্তীকালে পৃথিবীর প্রায় সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আইনেই দেশীয় কাগজী নোটকে বিদেশী সিকিউরিটি জমা হইতে পৃথক করিয়া হইয়াছে। বর্তমানে সকলেই মনে করেন যে, বৈদেশিক মুদ্রা মজুত রাখাব নীতির পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হইল লেনদেন ব্যালান্সে সাময়িক প্রতিকূলতা কাটাইয়া উঠা। তাহা ছাড়া, ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসারিত হয় ও প্রভূত পরিমাণ কাগজী নোট বাজারে ছাড়া দরকার হইয়া পড়ে। লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকে, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুত বৈদেশিক সিকিউরিটির পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়া আসে।

কেন পরিবর্তন দরকার হইয়া পড়িয়াছে

এই সকল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইন পাস হয় এবং আনুপাতিক রিজার্ভ নীতি পরিত্যাগ করিয়া ন্যূনতম রিজার্ভ আইননীতি গ্রহণ করা হয়। এই আইনে স্থির হয় যে, ভারতীয় কাগজী মুদ্রার পিছনে ন্যূনতম রিজার্ভ থাকিবে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সিকিউরিটি। ব্যাঙ্কের পুরাতন স্বর্ণের দাম ছিল কম, বর্তমানে স্বর্ণের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক স্বীকৃত) নূতন বর্ধিত দামে হিসাব করিয়া স্বর্ণের মূল্য নূতনভাবে ধার্য করা হইল।

১৯৫৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট তীব্রতর হইতে থাকায় রিজার্ভ রাখার নীতিতে পুনরায় পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৫৭ সালে একটি অর্ডিন্যান্স জারি

করা হয়, পরে উহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৫৭-এ পরিণত করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সে বা সংশোধনী আইনে স্থির হয় যে, ভারতের কাগজী মুদ্রার পিছনে মজুতের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকার কম হইবে না, ইহার মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ ১১৫ কোটি টাকার কম হইবে না। অর্থাৎ বাকী ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক সিকিউরিটি থাকিলেও চলিবে। এই সংশোধনী আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি লইয়া এই রিজার্ভ-এর মধ্যে বৈদেশিক সিকিউরিটি কিছুমাত্র না রাখিলেও চলিবে ; কেবলমাত্র ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ মজুত রাখিয়াই নোট প্রচলন সম্ভব হইবে।

'৫৬ ও '৫৭ সালের সংশোধনী আইন

টাকার বহির্মূল্য হ্রাস (Devaluation of the Rupee)

১৯২৬ সাল হইতে টাকার বহির্মূল্য ছিল ১ টাকা ১ শিঃ ৬ পেঃ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারত সরকার এবং তাহার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার এই বৈদেশিক মূল্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দামে স্টার্লিং-এর বিনিময়ে টাকার ক্রয় বিক্রয় করিতেন। যুদ্ধের সময়েও, ভারতের লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল, থাকিলেও, টাকার বহির্মূল্য বাড়িতে দেওয়া হয় নাই। অনুকূল ব্যালান্স হইতে প্রাপ্ত স্টার্লিং বিলাতে জমাইয়া রাখা হইত এবং তাহার বিনিময়ে এই দেশে ভারতীয় টাকা বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। দেশে এত বেশি টাকা ছাড়িবার দরুণ দামস্তর বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গেল। সাধারণ অবস্থায় দামস্তর এতটা বাড়িলে রপ্তানি কমিয়া যায়, আমদানি বাড়ে এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাট্‌তি দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আমদানির উপযোগী জিনিসপত্রের অভাব ছিল এবং দেশের মধ্যে দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়াও রপ্তানি বাড়ান হইয়াছিল। ফলে আভ্যন্তরীণ দামস্তরে বৃদ্ধি লেনদেন ব্যালান্সের অনুকূলতাকে দূর করিতে পারে নাই।

যুদ্ধকালীন অবস্থা

যুদ্ধের ঠিক পরেই দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ বিদেশ হইতে আমদানি বৃদ্ধি পাইল এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাট্‌তি দেখা গেল। দেশবিভাগের ফলে ভারত কতকগুলি রপ্তানি দ্রব্য হারাইল এবং উহারই সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান হইতে কতকগুলি কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গেল। ইহার ফলে

লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা আরও প্রতিকূল হইয়া উঠিল। এই চাপ মিটাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার হইতে ভারতকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ করিতে হইল। আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ কঠিনতর করা হইল। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার (Hard currency) অভাব ঘনীভূত হইল। দেশের মধ্যে সুউচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বজায় থাকায় বাহিরে রপ্তানি বাড়ান সম্ভব হইল না, বরং রপ্তানি হ্রাস পাইতে লাগিল। এইরূপ সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ এমন এক সমাধানের পথ খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছিল যাহা একই সঙ্গে আমদানি কমাইবে, রপ্তানি বাড়াইবে এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবে। এই বহুমুখী সমাধানের পথ হিসাবে ভারত ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাকার বহির্মূল্য হ্রাস ঘোষণা করিল। স্বর্ণ বা ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময় মুল্য প্রায় ৩০% কমাইয়া দেওয়া হইল।

যুদ্ধের পরের অবস্থা

১৯৪৫ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার সভ্য প্রতিটি দেশকে নিজ মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের অঙ্কে প্রকাশ করিতে হয। এইরূপে ভারতীয় টাকার মূল্য স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত থাকে (১ টাকা = প্রায় ৮·৭ গ্রেণ সোনা)। বিলাতে স্টার্লিংও এইরূপে স্বর্ণের সহিত নিজেব বিনিময় মূল্য ঘোষণা করে। উভযের সাধারণ যোগসূত্র ছিল স্বর্ণ, সেই হিসাব অনুসারে টাকা-স্টার্লিং অনুপাত স্থির ছিল (১ টাকা = ১ শিঃ ৬ পেঃ)। স্বর্ণের সহিত উভয় মুদ্রার সাধারণ যোগসূত্র অনুসাবে টাকা-ডলারের অনুপাত নির্দিষ্ট ছিল (১ টাকা = প্রায় ৩৩ সেণ্ট)। বহির্মূল্য হ্রাসের সময় ভারত স্বর্ণের সহিত টাকার বিনিময়মূল্যের অনুপাত কমাইযা দিল, টাকার নূতন স্বর্ণমূল্য হইল ১ টাকা = ৫·৯ গ্রেণ স্বর্ণ। অর্থাৎ যে সকল দেশ নিজ নিজ মুদ্রার বহির্মূল্য সমান রাখিল, তাহাদের মুদ্রার মূল্য টাকার তুলনায় বাড়িয়া গেল। যেমন, বহির্মূল্য হ্রাসের পরে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য দাঁড়াইল ১ টাকা = প্রায় ২১ সেণ্ট। স্বর্ণের তুলনায় স্টার্লিং ও নিজের মূল্য কমাইয়া দিয়াছিল, তাই টাকা-স্টার্লিং অনুপাত পূর্বের ন্যায় একই রহিল (অর্থাৎ ১ টাকা = ১ শিঃ ৬ পেঃ)।

বহির্মূল্য হ্রাসের পরিমাণ

বহির্মূল্য হ্রাসের আর একটি কারণ হইল টাকার বহির্মূল্যকে উহার আভ্যন্তরীণ মূল্যে পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়ান। দেশের মধ্যে সুউচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ভারতীয় টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য অনেকখানি ক্ষয়

পাইয়াছিল। কিন্তু উহার বহির্মূল্য বহুদিন যাবৎ পুরাতন স্তরেই নির্দিষ্ট ছিল। এই স্বাভাবিক বা স্ববিরোধী অবস্থা বেশিদিন চলিতে পারে না। তাই টাকার বহির্মূল্য হ্রাস দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

বহির্মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাট্‌তি অতি দ্রুত কমিয়া আসিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে বাণিজ্য-ব্যালান্সে ঘাট্‌তির পরিমাণ ছিল ১১৮·৮৯ কোটি টাকা, ১৯৪৯-৫০ সালে ঘাট্‌তির পরিমাণ কমিয়া দাঁড়াইল ২২·০৫ কোটি টাকা। বহির্মূল্য হ্রাসের ফল পৃথক ভাবে নির্ণয় করা খুবই অসুবিধাজনক, কারণ বহুবিধ ঘটনা ও কার্যকারণের সংঘাতে লেনদেন ব্যালান্সের গতিবিধি নিরূপিত হয়। যেমন, বহির্মূল্য হ্রাস ঘোষণার পরেই সরকারের আমদানি নীতি নিরতিশয় কঠোর হইয়া পড়ে। কয়েক মাস পরেই কোরিয়াতে যুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং ফলে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্য মার্কিনী চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাঞ্চল হইতে প্রভূত আয় হওয়ায় ১৯৫০-৫১ সালের লেনদেন ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হইলে আবার ইহা প্রতিকূল হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রতিকূলতার পরিমাণ কমিয়া যায়, অন্তত, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাঞ্চলে রপ্তানি বাড়িতেই থাকে। তাই, অন্যান্য প্রভাব কাজ করিলেও, বহির্মূল্য হ্রাসের প্রভাব একেবারে অনুকূল হয় নাই, ইহা বলা চলে না।

বহির্মূল্য হ্রাসের ফলাফল

১৯৪৯ সালের বহির্মূল্য হ্রাসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা যায়। ডাঃ জন মাথাই-এর মতে ১৯৫০-৫১ সালে ডলারের তুলনায় টাকার বৈদেশিক মূল্য নিচু হারে ধার্য করা হইয়াছিল (undervalued), এবং ইহারই দরুণ কৃত্রিমভাবে রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ও বেশি দামে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির ফলে দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ দেখা দিয়াছে। তিনি তাই বলেন যে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে হইলে টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধি প্রয়োজন (revaluation)। তাঁহার এই যুক্তি অবশ্য ডাঃ দেশমুখ ও আরও অনেক পণ্ডিত মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে টাকার বহির্মূল্য নিম্নস্তরে ধার্য থাকিলে যে সকল লক্ষণ দেখা দিতে পারে, ভারতের ক্ষেত্রে তাহা দেখা দেয় নাই। যেমন লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হয় নাই, তুলনামূলকভাবে উচ্চমূল্য মুদ্রাঞ্চল হইতে আমদানি হ্রাস পায় নাই, রপ্তানি বৃদ্ধি পায় নাই, বিদেশে হইতে মূলধন ভারতে প্রবেশ করে

বহির্মূল্য হ্রাসের পরিমাণ বেশি হইয়াছিল কি না

নাই। সুতরাং তাঁহারা ১৯৪৯-৫০ সালে টাকার বহির্মূল্যকে কৃত্রিম ভাবে নিচু রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না।*

বর্তমানে বহির্মূল্যে আরও হ্রাস অথবা বহির্মূল্য বৃদ্ধি (Further Devaluation or Revaluation) :

বহির্মূল্য হ্রাসের পর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে; মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার প্রতিরোধ গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে অনেক অর্থনীতিবিদ্ টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধি করার দাবী জানাইতে থাকেন। ডাঃ জন মাথাই-এর মতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের চিরাচরিত পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে এবং বহির্মূল্য বৃদ্ধি ছাড়া ইহার আর কোন পথ খোলা নাই। "করের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের স্তর পর্যন্ত ঠেলা হইয়াছে। স্বেচ্ছামত সঞ্চয় আর সম্ভব হইতেছে না, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গুরুতর শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা দেখা দিবে। সরকারের কষ্টকর প্রচেষ্টার ফলেও সরকারী খরচার ক্ষেত্রে কোন ব্যয়সংকোচের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অন্যান্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ঋণ নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সফল হয়, ভারতে উহার ততটা প্রয়োগ নাই। আমাদের দেশে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া ফাটকা চলে প্রধানত দেশের অসংগঠিত অর্থভাণ্ডার দ্বারা, যে টাকা অভ্যাসের দরুণ মজুত হইয়াছে বা কর ফাঁকি দিবার জন্য যে টাকা অন্ধগুহায় সঞ্চিত হইয়াছে বা মূল্যবান ধাতু বিক্রয় করিয়া যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, অথবা সুসংগঠিত ব্যাঙ্কব্যবস্থার বাহিরে মহাজনেরা সে-টাকা ধার দিয়াছে। ফাট্কা নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই সকল টাকার উৎস নিয়ন্ত্রণ করিতে সরকারের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে কোন পদ্ধতি বিফল হইতে বাধ্য। বর্তমানে উন্নয়ন-স্কীমগুলি শীঘ্র উৎপাদন শুরু করার স্তরে পৌঁছিবে না, অথচ যন্ত্রপাতির নবীকরণ ও প্রসারণের কাজে মূলধনের স্বল্পতা ও উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা বাধা দিয়া আসিতেছে। দামনিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা অসুবিধাজনক তো বটেই, উপরন্তু ইহা মুদ্রাস্ফীতি দূর করে না, কেবলমাত্র ইহার কয়েকটি লক্ষণকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে মাত্র।" † এই সকল কারণে ডাঃ জন মাথাই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধির কথা বলিয়াছিলেন।

জন মাথাই বলেন মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য

---

* *Appreciation of the Indian Rupee,* **Venkatagiri Gowda, P. 18-25**

† **"If the main purpose for which revaluation is suggested is to check**

তিনি টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধির স্বপক্ষে আরও অনেক যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, ভারতের বর্তমান অবস্থাতেও অনেক অর্থনীতিবিদ্ সেই সকল যুক্তির অবতারণা করিতে চান। তাঁহাদের মতে টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ১ শি. ৮ পে. অর্থাৎ ১ পাউণ্ড=১২ টাকা ধার্য করা উচিত। তাঁহার যুক্তি হইল যে, ইহার ফলে, (ক) লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইবে না, কারণ ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলির (পরিবর্ত দ্রব্য না থাকায়) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক: (খ) বাণিজ্যহার আমাদের অনুকূলে আসিবে; (গ) আমদানি-করা খাদ্যদ্রব্য, শিল্পগত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দাম টাকার হিসাবে কম দিতে হইবে।

বহির্মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে অন্যান্য যুক্তি

অন্যান্য অর্থনীতিবিদ্‌রা উপরের এই যুক্তিগুলি মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এখনও স্থিতিশীলতা আসে নাই এবং এককভাবে ভারত ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তাহার কোন লাভ হইতে পারে না। এই বিষয়ে ১৯৫১ সালের পার্লামেণ্টে যে বিতর্ক হয় তাহাতে শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বলেন যে ইহাতে দেশের উপকার না হইয়া অপকার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কেন উপরের যুক্তিগুলি মানা চলে না

inflation, the question may well be asked whether internal action will not provide a more suitable remedy. The answer is that, so far as we can see at the present,[1] the recognised internal remedies for inflation by themselves are not likely to be immediately operative in India. Taxation has already been pushed to the point of diminishing returns. Savings on a voluntary basis are difficult to come by and schemes of compulsory saving will encounter serious administrative difficulties. No substantial economies in public expenditure are within sight inspite of the Government's strenuous efforts. Credit control which in other countries is frequently put forward as a means of combating inflation has little application in India. Speculation in commodities is financed primarily by unorganised funds in the shape of money hoarded by force of habit or driven underground in order to avoid taxation or obtained by the sale of bullion or advanced by money-lenders outside the organised banking system. Any measures adopted by Government or the Reserve Bank to control funds derived from these sources for speculative purposes will be ineffective. The development schemes now in progress are not expected to reach the stage of production for some years to come while scarcity of materials and lack of capital for replacement and expansion are hampering existing industries. Price control, besides being increasingly difficult to administer, is in reality no remedy for inflation but only serves to spare some of its obvious symptoms." ***Dr. John Mathai*, Tata Quarterly, July, 1951. P. 56.**

"রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে টাকার বহির্মূল্যে ১৫% বৃদ্ধির দরুণ লেনদেন ব্যালান্সে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে এবং ৩০% বৃদ্ধির দরুণ ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১৪৫ কোটি টাকা। আর যদি আমরা টাকার বহির্মূল্যে বৃদ্ধি না ঘটাই, তবে বোধ হয় উভয় দিক সমান রাখিতে পারিব।" বহির্মূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাণিজ্যহার (terms of trade) আমাদের পক্ষে আসিবে কি না তাহাও বলা যায় না, কারণ আন্তর্জাতিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে পূর্ব হইতে কোন কিছু আন্দাজ করা চলে না। আর আমদানি-দ্রব্যের দাম টাকার হিসাবে কম দিতে হইবে এই যুক্তি সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া চলে না, কারণ বিদেশের নিকট হইতে আপেক্ষিক সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করিলেই তাহারা সেই সকল দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দিবে। তাই বর্তমানে দেশের অধিক সংখ্যক অর্থনীতিবিদ্‌ই বহির্মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে নন।

বরং ভারতের কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী টাকার বর্তমান বিনিময়-হারকে ভারসাম্য-হার বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা আরও কিছুটা টাকার বহির্মূল্য হ্রাসের পক্ষপাতী। সম্প্রতি (১৯৬৫ সালে) বিশ্বব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন। যেমন অধ্যাপক শেনয় (Prof. Shenoy) বলেন যে, যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলনায় যুদ্ধোত্তর রপ্তানি মাত্র ৭২% এবং যুদ্ধোত্তর আমদানি প্রায় ৯৮%। ইহার ভিত্তিতে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "টাকার বর্তমান বিনিময়-হার ভারসাম্য-হার নয়। আমাদের রপ্তানির পথে ইহা বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে এবং ইহা এতটা আমদানির সহায়ক যে লেনদেন ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া দেশের লেনদেন ব্যালান্সকে রক্ষা করা কোনমতে সম্ভব নয়।" টাকার বহির্মূল্য যে উচ্চস্তরে ধরা আছে তাহা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব অনুসারে ভারত ও ইংলণ্ডের দামস্তরের মধ্যে তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "In 1957 relatively to 1937 money supply in India had risen to nearly 7½ times The corresponding rise in the U. K. was 3½ times. During the same internal the cost of living in India had risen to over 3 times and in U. K. to 2·5 times."*

অপরপক্ষে শেনয় বলেন বহির্মূল্য আরও হ্রাস করো

* B. R. Shenoy, "The Indian Economic Scene", *Indian Economic Journal*, 1957-58.

1. Explain the circumstances that led to the devaluation of the Indian rupee in September, 1948. What have been the effects of the devaluation upon India's balance of payments ?

2. What do you understand by the Gold Exchange Standard ? How does it differ from the Gold Standard ?

3. What are the circumstances in which the rupee was devalued in September, 1949 ? Is a revaluation desirable ?

4. What do you mean by "sterling balances" ? Critically consider the present position of these balances.

5. Discuss the main features of the present currency system of India.

What changes have been recently introduced in the law relating to the paper currency reserve ?

6. What are the causes of the recent increase in the volume of note-issue in India ? What measures would you suggest to control any inflationary effect the increase may have on the price level ?

7. Examine the present system for the issue and regulation of paper currency in India.

8. Narrate briefly the circumstances under which it was decided to devalue the rupee in September, 1949. Did subsequent happenings justify this step ?

২৮

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

Public Finance

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যা (The Problems of Federal Public Finance)

ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চুক্তি দ্বারা গড়িয়া উঠে নাই, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয় শাসনের ভার ক্রমে ক্রমে রাজ্যসরকারগুলির হাতে ছাড়িয়া দিয়া যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক রীতি পদ্ধতিও একটু পৃথক ধরনের। এই দেশে প্রধান সমস্যা হইল রাষ্ট্রীয় আয়ের সকল উৎসগুলিকে এমনভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে (ক) প্রত্যেকের নির্দিষ্ট বিষয়গুলি শাসনের কোন অসুবিধা না হয়, (খ) দেশের কোন অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না আসিয়া পড়ে, (গ) সকল অঞ্চলের উন্নতি সম্ভব হইতে পারে, এবং (ঘ) কর শাসনের কাজ ব্যয়বহুল, ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ না হইয়া পড়ে।

সমস্যার রূপ কি

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আর্থিক ব্যবস্থায় আরও কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে। সাধারণত, পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প বা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং রাজ্যসরকারগুলিকে কোন্ কোন্ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন। পরিকল্পনার রূপ 'জাতীয়', অর্থাৎ সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া তাহার দৃষ্টিভংগী, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে উহার বাস্তব রূপায়নের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত। সুতরাং রাজ্যসরকারের জন্য এমন কয়েকটি আয়ের উৎস রাখা দরকার যাহাতে রাজ্যসরকারগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালাইতে পারে। ইহাও সত্য যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বা কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রভাব হইতে রাজ্যসরকারের স্বাধীনতা তখনই

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর পরিকল্পনার চাপ

বজায় থাকা সম্ভব যদি সংবিধানে স্বাধীন আয়ের উৎস তাহার জন্য পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের খেয়ালখুশি বা কেন্দ্রীয় বাজেটের উঠানামার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে না হয়। অপর দিকে ইহাও সত্য যে, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সফল করার কাজে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সর্বাধিক, কেন্দ্রের আয়ের উৎসগুলি সংকুচিত করাও তাই সম্ভব নয়।

সুতরাং, (ক) করশাসনের সুবিধা, (খ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির শুল্ক-স্বাধীনতা এবং (গ) পরিকল্পনার পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্রমবর্ধমানশীল অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা—এই তিন দিক হইতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক সমস্যাটিকে বিচার করা প্রয়োজন। দেশের মোট সম্বল বণ্টন করার সময়ে আমাদের সুবিধা (convenience), ব্যয়সংকোচ (economy), এবং দক্ষতা (efficiency) সকল দিকেই লক্ষ্য রাখা দরকার। যে কর্তৃপক্ষ সহজে, কম ব্যয়ে এবং দক্ষতার সহিত কর আদায় করিতে পারে, আদায়ের ভার তাহারই উপর ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। আদায়ীকৃত অর্থ বণ্টনের সময়ে এমন নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাহাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার—উভয়পক্ষের স্বাধীনতা বজায় থাকে, একটিকে অপরটির খয়রাত বা অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিতে না হয়।

বর্তমানের ভারতে আর্থিক উৎসসমূহের বণ্টন-কাঠামো মোটামুটি পুরাতন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা নির্ধারিত। ১৯৫০ সালের নূতন সংবিধানের আর্থিক ধারাগুলি এবং ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টে পুরানো কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। এই কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, করশাসন-সুবিধার দিক হইতে বিচার করিলে বর্তমানের উৎস-বণ্টন সমর্থনযোগ্য। আয়কর, বহিঃশুল্ক (Customs), রেলওয়ে প্রভৃতি কেন্দ্রীয় উৎস এবং তাহাদের কেন্দ্রিকতার দরুণ দক্ষতা, সমতা ও ব্যয়সংকোচ প্রভৃতি সুবিধা পাওয়া যায়।

বর্তমানের বণ্টন কাঠামো

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ও ব্যয়ের বিষয়সমূহ
(Main sources of revenue and heads of expenditure of the Central Government)

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হইল আমদানি রপ্তানি শুল্ক.

আবগারি শুল্ক, আয়কর (কৃষি আয় বাদে) ও করপোরেশন কর এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফা, সম্পদ কর, ব্যয় কর, সম্পত্তি কর, রেলপথ ও ডাক তার বিভাগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সরকারী শিল্প ব্যবসায় হইতে প্রাপ্ত নীট উদ্বৃত্ত। ইহার মধ্যে ৩৫টি দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত আবগারি শুল্কের ২০%, আয়করের ৬৬⅔%, সম্পত্তিকরের ও রেলপথ হইতে আয়ের কিছু অংশ রাজ্য সরকারগুলিকে ভাগ করিয়া দিয়া দিতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের প্রধান বিষয়গুলি হইল দেশরক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক শাসনবিভাগ, ঋণ পরিশোধ ও সুদপ্রদান, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম রাজ্য সরকারসমূহদের অর্থ সাহায্য, অন্যান্য বিবিধ ব্যয় প্রভৃতি।

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট আলোচনা করিলেই আয়ের উৎস ও ব্যয়ের বিষয়গুলি বোঝা যাইবে।

আয়ের উৎস			টাকার পরিমাণ : লক্ষ টাকার হিসাবে
১। আমদানি রপ্তানি শুল্ক	...	...	২২১২০
২। কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক	...	...	৫৮৩৯৬
৩। করপোরেশন কর	...	...	১৯৬০০
৪। আয় কর	...	...	১৭৯০০
৫। সম্পত্তি কর	...	...	৪০০
৬। সম্পদ কর	...	...	৯০০
৭। রেলভাড়ার উপর কর	...	...	———
৮। ব্যয় কর	...	...	১০
৯। দান কর	...	...	৯৫
১০। অন্যান্য বিষয় হইতে	...	...	১৮৩৭
১১। সুদ	...	...	২১৭০৫
১২। শাসনতান্ত্রিক আদায়	..	...	৬৭৬
১৩। সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম	...	...	৩১৬১
১৪। বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা	...	...	৪৫
১৫। কারেন্সী ও মিণ্ট হইতে মুনাফা	...	...	৭৩৬৮
১৬। বেসামরিক নির্মাণ কার্য	...	...	৪৩৮
১৭। বিবিধ	...	...	২৪৯৩
১৮। পরিবহন ও সংযোগ	...	...	৭৪৬
১৯। রেলপথ ও অন্যান্য এইরূপ পাওনা	...	...	২৭৬৬
২০। অপ্রত্যাশিত উৎস	---		৮১০০

ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে

১। রাজ্য সরকারের দেয় আয়করের অংশ	... ...	৯৭৯৫
২। রাজ্য সরকারদের দেয় সম্পত্তি-করের অংশ	... ...	৩৮৮
	মোট	১৫৮৫৭৩

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের বিষয়গুলি নিচে দেওয়া হইল :

ব্যয়ের বিষয়		টাকার পরিমাণ : লক্ষ টাকার হিসাবে
১। কর ও শুল্ক আদায়	... ...	২৩৮৩
২। বহুমুখী নদী পরিকল্পনা	... ...	১৯৬
৩। ঋণশোধ ও সুদ প্রভৃতি	... ...	২৮০২৪
৪। শাসনতান্ত্রিক কাজকর্ম	... ..	৮৮২৮
৫। সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজ	.. ...	১৫৫৪০
৬। কারেন্সী ও মিণ্ট	... ...	১৭২৪
৭। বেসামরিক নির্মাণকার্য	... ..	২০৯৪
৮। বিবিধ	... ...	১১০৯৮
৯। দেশরক্ষা বিভাগ	... ...	৭০৮৫১
১০। সাহায্য ইত্যাদি	... ...	৩৪৯০৪
১১। অস্বাভাবিক বিষয়সমূহ	... ...	৮৬১৯
১২। পরিবহন ও সংযোজন	... ...	৯৭৯
		১৮৫২৪০

ফিনান্স কমিশনসমূহ (Finance Commissions) :

ভারতের সংবিধানে লিখিত আছে যে সংবিধান কার্যকরী হইবার দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি একটি ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করিবেন এবং তাহার পর হইতে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অথবা প্রয়োজন হইলে উহার পূর্বে একটি ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হইবে। ১৯৫১ সালে কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হয়, ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা করা দরকার। (ক) আয়করের বণ্টন সম্পর্কে কমিশন বলেন যে রাজ্যসরকারগুলি নীট আদায়ীকৃত আয়করের ৫৫% অংশ পাইবে (পূর্বে ছিল ৫০%)। বণ্টনযোগ্য মোট পরিমাণের

প্রথম ফিনান্স কমিশন

মধ্যে কোন রাজ্য কতটা পাইবে তাহার জন্য জনসংখ্যা (৮০%) এবং করের উৎসস্থান (২০%) এই দুইটি বিষয় গণ্য করা হইবে। (খ) কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছিলেন যে তামাক, দিয়াশলাই এবং বনস্পতি ধরনের দ্রব্যসামগ্রী হইতে প্রাপ্ত আবগারি শুল্কের কিছু অংশ (৪০%) বণ্টিত হইবে। ইহার জন্য কমিশন রাজ্যের জনসংখ্যাকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিলেন। (গ) পাটশুল্কের বিনিময়ে অর্থ সাহায্যের বিষয়ে কমিশন নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ অর্থ দিবার কথা বলিলেন। (ঘ) অন্যান্য অর্থ সাহায্যের বিষয়ে কমিশন কয়েকটি নীতি নিরূপণ করিলেন, যেমন রাজ্যের বাজেটীয় প্রয়োজনীয়তা, জনকল্যাণমূলক কাজকর্মগুলি রক্ষা করা, জাতীয় গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষ কোন দায়িত্ব বা ভার বহন (যেমন দেশবিভাগের দরুণ কিছু ভার বহন প্রভৃতি) এবং অনুন্নত রাজ্যগুলির দ্রুত উন্নয়ন, প্রভৃতি। ভারত সরকার কমিশনের সকল সুপারিশ গ্রহণ করিলেন এবং এইরূপে ফিনান্স কমিশনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

মিঃ শন্তনামের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রথম কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে রাজ্যসমূহ বৎসরে ৯৩ কোটি টাকা পাইয়াছিল, দ্বিতীয় কমিশনের রিপোর্টে তাহারা বৎসরে মোট ১৪০ কোটি টাকা পাইল। রাজ্যগুলির প্রয়োজন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, এবং ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন—এই সকল পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কমিশন সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করিলেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন

প্রধানত পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টিভংগী অনুসরণ করিয়া ন্যায়বিচারের দিকে কম ঝুঁকিয়া প্রধানত উন্নয়নের উপর অধিক জোর দিলেন। (ক) আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশ ৫৫% হইতে ৬০% করা হইল। আন্তরাজ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে কর-আদায়ের উৎসস্থান মোটেই বিবেচ্য নয়, কেবলমাত্র জনসংখ্যাই একমাত্র বিবেচ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। তবে একসঙ্গেই ইহা না করিয়া উহার অংশ করা হইল যথাক্রমে ১০% এবং ৯০%। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং যুক্তপ্রদেশ লাভবান হইল। (খ) আবগারি শুল্কের বণ্টন ব্যাপারে বণ্টনযোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া ৩ হইতে ৮ হইল, কিন্তু ইহাদের উপর শুল্ক আদায়ের বণ্টনযোগ্য অংশ ৪০% হইতে কমাইয়া ২৫% করিলেন। কমিশন আরও

বলিলেন যে অন্তঃরাজ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে ইহার ৯০% বন্টিত হইবে জনসংখ্যা অনুসারে। (গ) সম্পত্তিকরের বিষয়ে কমিশন বলেন যে মোট আদায়ের ১% কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দিবার পরে কিছু অংশ প্রতি রাজ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী রাজ্যগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়া দরকার। অবশিষ্ট অংশ জনসংখ্যা অনুসারে বিভক্ত হইবে। (ঘ) রেলপথ হইতে আদায়ের অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হইবে উহাদের অঞ্চলে রেল লাইনের পরিমাণ অনুযায়ী। ঙ) উন্নয়নের প্রয়োজন মনে রাখিয়া দ্বিতীয় কমিশন রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট (Report of the Third Finance Commission):

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে মিঃ এ. কে. চন্দের সভাপতিত্বে গঠিত তৃতীয় ফিনান্স কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন। ইহাতে (ক) রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য আয়করের অংশ ৬৬⅔% করা হইল (পূর্বে ছিল ৬০%)। ইহার মধ্যে ৮০% দেওয়া হইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং ২০% করের উৎসস্থান অনুযায়ী (প্রথম ফিনান্স কমিশনের অনুরূপ)। এই সুপারিশের ফলে পূর্বের তুলনায় রাজ্যগুলি এখন হইতে মোট ৩৫ কোটি টাকা বেশি পাইবে। (খ) আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে বণ্টনযোগ্য আদায়ের পরিধি বাড়াইয়া ৮টি দ্রব্য হইতে ৩৫টি করা হইল, কিন্তু এই সকল দ্রব্য হইতে মোট আদায়ের ২০ রাজ্য সরকারগুলিকে দেয় বলিয়া ঘোষিত হইল। (গ) সম্পত্তিকরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের নীতি রক্ষা হইল। (ঘ) রেলের ক্ষেত্রে স্থির হইল রেলযাত্রীদের উপর কর আদায়ের অধিকারের বদলে রাজ্যসমূহ মোট ১২.৫ কোটি টাকা পাইবে। (চ) রাজ্যসমূহ অর্থসাহায্য হিসাবে পাইবে মোট ১২০.২৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৫২ কোটি টাকা দেওয়া হইবে কয়েকটি রাজ্যকে বাদ দিয়া, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র। অন্যান্য রাজ্যের বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে এই টাকা দেওয়া হইবে; ৫৮.২৫ কোটি টাকা বন্টিত হইবে রাজ্য পরিকল্পনাগুলির দরুণ রেভিনিউর আদায়ের পরিমাণ অনুসারে। (চ) করপোরেশন কর হইতে আদায় সম্পূর্ণ পাইবে কেন্দ্রীয় সরকার। (ছ) পথ পরিবহন উন্নয়নের জন্য বৎসরে ৯ কোটি টাকা ১০টি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কমিশনের নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

তৃতীয় ফিনান্স কমিশন

মনে রাখা দরকার যে ফিনান্স কমিশনের সুপারিশগুলি কেবলমাত্র নিয়মিত সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারদের পৃথক পৃথক টাকা দিয়া থাকেন। এই ধরনের "সাহায্য" ফিনান্স কমিশনের আলোচনার বিষয় নয়, তাহা কেন্দ্রীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ফল। অনেকে মনে করেন যে ফিনান্স কমিশনের কাজ বর্তমানকালে পরিকল্পনা কমিশনের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। সংক্ষেপে বলা চলে যে অধিকাংশ সুপারিশই "অনুন্নত" রাজ্যগুলিকে (যেমন উড়িষ্যা ও রাজস্থান) অধিকতর সাহায্য করিবে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে উন্নত রাজ্যগুলিকে (যেমন পশ্চিমবঙ্গ) ততটা সাহায্য করিবে না। একমাত্র আয়করের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার ত্রুটি হইল এই যে পরিকল্পনার কাজে যে রাজ্য যত কম প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং ফলে অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে তাহাদের এই অলসতা-ই সর্বাধিক পুরস্কৃত হইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া তাই তৃতীয় ফিনান্স কমিশন উপদেশ দিয়াছেন যে প্রত্যেক রাজ্যের উচিত নিজের অর্থসংগ্রহের উৎস বাড়াইবার চেষ্টায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং সকল রাজ্যের উচিত মোটামুটি সমান হারে করগুলি আরোপ করা।

কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, অনেক রাজ্য মনে করে যে, কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক বাড়িতেছে। অর্থসংগ্রহ ও কাজকর্মের বণ্টন দিক হইতে প্রতিটি রাজ্যসরকার কেন্দ্রের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে।

কর অনুসন্ধানী কমিশনের বিবরণী (Report of the Taxation Enqury Commission)

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার ডাঃ জন মাথাই-এর নেতৃত্বে একটি করব্যবস্থা অনুসন্ধানী কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের উপর সারা ভারতের কর-কাঠামো বিশ্লেষণ করা এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর কাঠামোর পরিবর্তন করা যায় কিরূপে, ভারতীয় কর ব্যবস্থায় করপাত (incidence) কিরূপ, আয় ও সম্পদে বৈষম্যের পরিধি হ্রাস করা যায় কি উপায়ে, দেশে মূলধন-গঠন ও শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধির উপর

কর-অনুসন্ধানী কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও কার্যভার

আয় করের প্রভাব কিরূপ ; মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের সময়ে কর-ব্যবস্থাকে কতদূর প্রতিরোধক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর, এই সকল বিষয় আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে সরকার এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেন।* রিপোর্টের প্রধান বক্তব্য ও সুপারিশগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

সরকারী আয়ের গতিবিধি (Trends in Public Revenue)—সম্পর্কে **কমিশন বলেন যে** (ক) যুদ্ধ পূর্ব যুগ হইতে রাষ্ট্রীয় আয়ের বৃদ্ধির কারণ হইল দেশে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ আর্থিক আয় বৃদ্ধি। জাতীয় আয়ের অনুপাতে কর-আদায়ের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই অনুপাত বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। (খ) মোট কর আদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে পাওয়া যাইত ১২% ; ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহা ছিল ৪৫% ; কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হ্রাস পাইয়া হইয়াছিল ২৪%। দ্রব্যসামগ্রীর উপর কর, যাহা ব্যক্তির ভোগের উপর চাপ দেয় তাহা হইল মোট কর-আদায়ের ৪৫%। ইহারাই কর-কাঠামোর প্রধান ভিত্তি। (গ) কেন্দ্রীয় আবগারী করের হার ও ব্যাপকতা বাড়িয়া যাওয়ায় এবং রাজ্যসরকারগুলির বাজেটে বিক্রয় কর ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠায় দ্রব্যসামগ্রীর উপর উভয়েই চাপ দিয়াছে, ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি উৎসের উপর রাজ্যসরকারসমূহ ক্রমশ অধিকতর ভাগ বসাইতেছে এবং কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে।

সরকারী আয়ের গতিধারা

সরকারী ব্যয়ের গতিবিধি (Trends in Public Expenditure) **সম্পর্কে কমিশন বলেন যে,** (ক) মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে উৎপাদক ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। (খ) মূলধনী খাতে এবং উন্নয়নের কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। (গ) সরকারী ব্যয়ের ফলে আয়-বৈষম্য বিশেষ হ্রাস পায় নাই, কারণ মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম (১১%) এবং সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যয় ও অর্থ সাহায্যের দরুণ নিম্ন-আয় শ্রেণীতে বিশেষ আয়ের অপসারণ ঘটে নাই। (ঘ) সমাজকল্যাণমূলক কার্যে ব্যয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি

সরকারী ব্যয়ের গতিবিধি

* ইহা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ— সামগ্রিক কর-কাঠামো ; কেন্দ্রীয় কর ; এবং রাজ্য ও স্থানীয় কর।

পাওয়ায় কর-কাঠামো সম্পর্কে অপ্রীতিকর মনোভাব হ্রাস পাইয়াছে এবং উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুন ভবিষ্যতের করবহন যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

করপাত বিশ্লেষণ

করপাত (Incidence) আলোচনা করিয়া কমিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে (ক) সাধারণভাবে সহরে করের ভার গ্রামের সকল আয়স্তরের তুলনাতেই বেশি ; কিন্তু মাঝারি ও নিম্ন আয়স্তরে এই পার্থক্য খুব বেশি নয়। (খ) গ্রাম্য করের তুলনায় সহরে পরোক্ষ কর অল্প একটু বেশি প্রগতিশীল (progressive)। (গ) গ্রামে বর্ধিত আয়ের উপর করহার বৃদ্ধির সুযোগ আছে বলিয়া মনে করা চলে। (ঘ) ভূমি রাজস্বের ভার আর অনুভবযোগ্য নাই বলিলেই চলে। (ঙ) গ্রাম্য অর্থনীতির মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ আর্থিক বিনিময় প্রথার বাহিরে, তাহাদের কর-বহন যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে কম। অর্থ-বিনিময় প্রথার অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রে (monetised sector) করবৃদ্ধির সুযোগ বেশি। (চ) সীমাবদ্ধভাবে (আরও বেশি দ্রব্য-সামগ্রীর উপর কর বসাইয়া) পরোক্ষ করকে কিছুটা প্রগতিশীল (progressive) করিয়া তোলার সুযোগ রহিয়াছে। (ছ) সহরাঞ্চল হইতে গ্রামাঞ্চলে আয় ও সম্পদ খুব বেশি অপসারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় সহরাঞ্চলে মোট করভার কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কর সম্পর্কীয় কয়েকটি সাধারণ নীতি

করনীতি সম্পর্কে কমিশন কয়েকটি সাধারণ নীতি গ্রহণের কথা বলিয়াছেন (general principles of Tax policy)। (ক) সকল শ্রেণীর ভোগ যথাসম্ভব বেশি কমাইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য অধিক অর্থ এমনভাবে সংগৃহীত হওয়া উচিত যাহাতে ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য অর্থহ্রাসের পরিমাণ খুব কম হয়। নিম্ন-আয় শ্রেণীর তুলনায় উচ্চ-আয় শ্রেণীর ভোগ সংকোচন অধিক হওয়া উচিত। বিলাস বা আধা বিলাস সামগ্রীর উপর অধিক হারে কর আরোপিত হওয়া দরকার। (খ) দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ভোগ-স্তরে পার্থক্য থাকা অধিকাংশ শ্রমিক-কৃষকের মনের উপর বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করিতেছে। তাই ব্যক্তির সর্বোচ্চ আয় (কর দিবার পরে) দেশের গড় পরিবার-প্রতি আয়ের ৩০ গুণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এই ঊর্ধ্ব সীমা নির্দিষ্ট করার কাজে ক্রমশ স্তরে স্তরে পৌঁছান যাইতে পারে। (গ) অবশ্য সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং শিল্পপ্রসার বৃদ্ধির জন্য করকাঠামোতে উপযুক্ত প্রেরণামূলক ব্যবস্থা (tax-incentives) থাকা প্রয়োজন। (ঘ) কর আদায় বাড়াইবার জন্য

আয়কর বাড়ানি এবং সঙ্গে সঙ্গে করপোরেশন কর কমান দরকার (যাহাতে কোম্পানীগুলির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। আবগারী কর অধিক পরিমাণে বাড়ান দরকার, কর ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে আয় বাড়াইবার জন্য সরকারী দ্রব্য সামগ্রীর উপযুক্ত দাম নির্ধারণ করা দরকার: ভূমি-রাজস্বের উপর অল্পহারে সারচার্জ বসান দরকার ও কৃষি-আযকরের আঞ্চলিক সীমানা বাড়ান প্রয়োজন; সম্পত্তিকর আরও ব্যাপকভাবে আরোপ করা দরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর করহার বৃদ্ধি করা দরকার; এবং বিক্রয় করের ব্যাপ্তি ও করহার ক্রমে ক্রমে বাড়ান প্রযোজন। দীর্ঘকালে রাষ্ট্রীয় শিল্প সংস্থাসমূহ হইতে যাহাতে লাভ হয় ও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় এইরূপ দাম নীতি গ্রহণ করা দরকার। রেলপথে ভ্রমণের উপর কর বসানো (অর্থাৎ ভাড়া বাড়ান) বিষয়ে কমিশনের কোন আপত্তি নাই। ইহা ব্যতীত কমিশন প্রত্যেকটি কর সম্পর্কে পৃথকভাবে সুপারিশ দিয়াছিলেন।

কর আদায় বাড়াইবার পদ্ধতি সমূহ

করব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালডরের রিপোর্ট
(Report on Indian Tax Reform by Prof. Kaldor)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা দরকার তাহার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক ডাঃ নিকোলাস্ ক্যাল্ডর-এর উপর ভারত সরকার ভার আরোপ করিয়াছিলেন। আয়-বৈষম্য হ্রাস এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা বৃদ্ধি—এই দুইটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কিরূপে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে কর-আদায়ের পরিমাণ বাড়ান যায়—ইহা নির্ধারণ করাই ছিল তাহার বিশেষ কাজ। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এই রিপোর্টে তিনি ভারতীয় কর ব্যবস্থার বহুবিধ সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইহার পুনর্গঠনের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের মোট কর আদায়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭%-এর অল্প কিছু বেশি এবং গত ৫।৬ বৎসরে ইহার পরিমাণে উপযুক্ত বৃদ্ধি ঘটে নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন কর-আদায় হইতে ৪৫০ কোটি টাকা, ঘাট্তি ব্যয় দ্বারা ১২০০ কোটি টাকা এবং ১২০০ কোটি টাকার অনির্ধারিত ফাঁক ধরিয়া লইয়া হিসাব করা হইয়াছে। তিনি এই পদ্ধতি সঠিক বলিয়া মনে করিতে পারেন

নাই। তাঁহার মতে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো ১২০০ কোটি টাকার ঘাট্‌তি ব্যস আত্মস্থ করিতে পারিবে না। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য নূতন কর-আদায় হইতে পাঁচ বৎসরে মোট ১২৫০ কোটি টাকা তোলা দরকার; তাঁহার মতে কর আদায় হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করা বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে না। "যদি সমস্যাটিকে সাহসের সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা হয় এবং কর ব্যবস্থায় আমূল ও ব্যাপক সংস্কার সাধন ঘটে।*" এই সংস্কার সাধন আরও প্রয়োজন, কারণ তাঁহার মতে ভারতের কর-ব্যবস্থা অন্যায্য এবং অযোগ্য ("inequitable and inefficient")। ইহা অন্যায্য, কারণ করের "ভিত্ত" অর্থাৎ আইনের ব্যাখ্যায় যাহা "আয়" উহা লোকের করবহন যোগ্যতার সঠিক পরিমাপ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া কয়েক শ্রেণীর করদাতা ইহা সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। ইহা অযোগ্য, কারণ প্রতিটি করদাতা নিজ আয় ব্যয়ের খুব সীমাবদ্ধ কয়েকটি মাত্র সংবাদ দেয়, উহার পূর্ণ চিত্র বা সংবাদ পাইবার মত ব্যবস্থা এই কাঠামোতে নাই। তিনি বলিয়াছেন যে ১½ লক্ষ টাকার উপরে আয় শ্রেণীতে আয়-করের হার অত্যন্ত বেশি এবং ফলে লোকের উদ্যোগহীনতা দেখা দিতে পারে এবং কর-ফাঁকির প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। আয়করের সর্বাধিক হার, তাহার মতে ৪৫%-এর উপর হওয়া উচিত নয়। অতি উচ্চ করহার যাহা কার্যকরী করা চলে না উহাপেক্ষা ছিদ্রশূন্য ব্যবস্থায় অল্প হার থাকা ভাল। "আয়ের" ভুল সংজ্ঞা এবং প্রশাসনিক ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য, তাঁহার মতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫৭৬ কোটি টাকার আয় হইতে কর আদায় হইতেছে না, সুতরাং এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা দরকার।

কালডর কর্তৃক কর ব্যবস্থার সমালোচনা

বর্তমান কর-ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তির উপর কর আরোপের (Personal Taxation) বিষয়ে ডাঃ ক্যালডর একত্রে পাঁচটি কর চালু করার প্রস্তাব করিয়াছেন, যেমন, আয়কর (Income Tax), মূলধনী লাভের উপর কর (Capital Gains Tax), সম্পদের উপর বাৎসরিক কর (Wealth Tax), সাধারণ দান কর (Gift Tax), এবং ব্যক্তিগত ব্যয় কর (Personal

কর সংস্কারের সুপারিশ—ব্যক্তির উপর কর

* "Provided the problem is tackled on bold lines and the tax system is substituted by a thorough and comprehensive reform."

Expenditure Tax)। একটি ব্যাপক বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও তালিকার (a comprehensive annual return) ভিত্তিতে ব্যক্তির উপরে এই করগুলি একযোগে ধার্য করা হইবে। ক্যাল্ডরের মতে এইগুলি একসঙ্গে ("simultaneously") আরোপ করা দরকার, কারণ ইহারা একে অন্যের সহিত সংলগ্ন ও পরস্পর নির্ভরশীল (selfchecking in character)। ইহাদের মধ্যে কোন একটি কর ফাঁকি বা কম দিবার চেষ্টা করিলে অপর কর তাহাকে বেশি দিতে হইবে এবং এক ব্যক্তির দাখিল করা হিসাবে অন্যান্য ব্যক্তিদের আয়ব্যয়ের সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। অতি উচ্চ আয়ের উপরেও ৪৫%-এর বেশি হারে কর ধার্য করা উচিত নয়, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই সঞ্চয় বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগের উপর ততটা বিরূপ প্রভাব হইবে না। ব্যক্তির আয় হইতে কম কর হইলে তাহার হাতে যে টাকা থাকিয়া যাইবে তাহা নূতন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইবে, ইহা আশা করা যায়। নূতন বিনিয়োগ না করিয়া সে যদি ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করে তবে সম্পদ কর দিতে হইবে। যদি সম্পদ না বাড়াইয়া অপর কাহাকেও দান করে তবে দান কর দিতে হইবে। যদি নিজের সম্পদ না বাড়াইয়া এবং দান না করিয়া ব্যক্তিগত ভোগলিপ্সা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ভোগ-ব্যয় বাড়াইতে চায় তবে ব্যয়-কর দিতে হইবে। এইরূপে প্রতিটি কর অপর কয়টির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং একে অন্যের রক্ষক হিসাবে কাজ করিবে। ব্যবসায়ের উপর কর (Business taxation) সম্পর্কে ক্যাল্ডর বলিয়াছেন যে, আয় হইতে যে সকল ব্যয় এখন বাদ দিয়া কর আরোপযোগ্য আয়ের (Taxable income) হিসাব করা যায় সেই সকল ব্যয়ের পরিমাণ ও ধরন সম্পর্কে আরও কড়াকড়ি করিতে হইতে হইবে। তাহা ছাড়া কোম্পানীর উপর আয়কর ও অধি-কর (Income tax and super tax on companies) একত্রে মিলাইয়া টাকায় ৭ আনা হিসাবে একটি অপরিশোধনীয় করপোরেশন কর আরোপ করিতে হইবে।

ও ব্যবসায়ের উপর কর

ভারত সরকার ক্রমে ক্রমে ডাঃ ক্যাল্ডর প্রস্তাবিত করসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন; অবশ্য তিনি এই করগুলিকে একত্রে আরোপ করার কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতেই মূলধনী লাভ কর আরোপিত হইল। ১৯৫৭-৫৮ সালে ব্যক্তিগত সম্পদ কর ও ব্যয় কর গ্রহণ করা হইল, এবং

ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ

১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে দানকর আরোপ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে ব্যক্তিগত ব্যয়-কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কয়েকটি কারণে ডাঃ ক্যালডর-প্রস্তাবিত কর আরোপের সুফল ভারতে পাওয়া যাইতেছে না। করগুলি একসঙ্গে আরোপিত হইলে দেশের কর-দাতাদের মনে যে চেতনা সৃষ্টি হইত তাহা ঘটে নাই। করগুলি অত্যন্ত অল্প হারে আরোপিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইতেছে না। আয়করের হার হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় নাই, ফলে ব্যক্তির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায় নাই। ক্যালডরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'আয়'-এর সংজ্ঞা পুনর্নিধারিত করা হয় নাই। সর্বোপরি ব্যক্তির আয় ব্যয়ের পরিপূর্ণ তথ্য সম্বলিত একটি বিস্তৃত হিসাবের ভিত্তিতে সকল কর আরোপিত হইবে ইহাই ডাঃ ক্যালডরের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ভারত সরকার কর ফাঁকির বিরুদ্ধে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। এই সকল কারণের ফলে ক্যালডর প্রস্তাবিত কর-সংস্কারের সুপারিশ গৃহীত হইয়াও কর আদায়ের পরিমাণে ও কর-কাঠামোর সংস্কার সাধনে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই।

রাজ্যসরকারগুলির আয় ও ব্যয় (Revenue and Expenditure of the State Governments)

রাজ্যসরকারগুলির আয়ের প্রধান উৎসসমূহ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়:

১। রাজ্যসরকার কর্তৃক আরোপিত ও সংগৃহীত কর: ভূমি রাজস্ব; ঔষধ ও মাদক দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক; স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি এবং রেজিস্ট্রেশন; বন; কৃষি আয়কর; বিক্রয় কর; প্রমোদ কর; লটারীর উপর কর।

২। কেন্দ্রীয় করসমূহের অংশ: আয়কর; পাট রপ্তানি কর এবং তামাক, দিয়াশলাই ও ভেজিটেবল ঘি প্রভৃতির উপর আবগারী কর।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও রাজ্যসরকারকে প্রদত্ত বাণিজ্যিক দলিলের উপর স্ট্যাম্প এবং সীমানা কর; কৃষি-সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য।

এতদিন পর্যন্ত ভূমিরাজস্বই রাজ্য সরকারগুলির আয়ের প্রধান উৎস বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিরাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন

পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তবে প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধন করায় বর্তমানে এই উৎস হইতে সকল রাজ্যসরকারের আয়ের পরিমাণই কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সরাসরি চাষীর নিকট হইতে এই রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ভূমি রাজস্ব

ঔষধ ও মাদক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর রাজ্যসরকারের আবগারী শুল্ক আরোপিত আছে। দেশী মদ হইতে আয়ের পরিমাণই বেশি তবে বর্তমান সরকার মাদক দ্রব্যের বর্জন নীতি গ্রহণ করায় ক্রমে এই উৎস হইতে আয় সংকুচিত হইতেছে। মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এবং দলিল প্রভৃতি রেজিস্ট্রির সময়ে যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয় তাহা হইতে রাজ্যসরকারগুলির আয় হইয়া থাকে। বন হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গোচারণ ফি এবং কাঠ-কাটা ও শিকারের লাইসেন্স বিক্রয় করিয়া রাজ্যসরকারগুলির কিছু আয় হইয়া থাকে।

আবগারী, স্ট্যাম্প ও বন

সাইমন কমিশনের আর্থিক উপদেষ্টা স্যার ওয়ালটার লিটন বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি আয়ের উপর আয়কর আরোপ করার কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উহার ফলে দেশের কর কাঠামোর একটি বড় ত্রুটি দূর হইবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির আর্থিক সঙ্গতি কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে তাই প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে এই ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাংলা, বিহার ও আসামের সরকারসমূহ এই আইন আরোপ করিয়াছেন। বাংলা দেশে ১৯৪৪ সালেই কৃষি আয়কর আইন পাস হইয়াছে। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে জমি হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে মজুতদারী ও খাদ্যশস্যের ফাটকাদারী বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এখন এই উৎস হইতে আরও বেশি হারে কর আদায় করা উচিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে গ্রামাঞ্চল হইতে উদ্বৃত্ত অপসারণ করিয়া শিল্পপ্রসারে উহাকে নিয়োগ করা উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য পদক্ষেপ। সেইদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি আয়কর উভয় পদ্ধতিকে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করা দরকার।

কৃষিআয়কর ও উহার বর্তমান গুরুত্ব

দ্রব্যের বিক্রেতার উপর দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য কর (sales tax) আরোপ করা হয়, এবং সাধারণত দ্রব্যের ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেতা এই কর আদায় করে। ১৯৩৮ সালে প্রথমে মধ্য প্রদেশ সরকার পেট্রলের উপর বিক্রয়-

কর আরোপ করে। উহার পরে মাদ্রাজ প্রদেশ একটি সাধারণ বিক্রয় কর (General sales tax) ধার্য করে। তাহার পর বাংলা দেশে কেবল মাত্র খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং বৎসরে ১০০০০ টাকার অধিক মূল্যের কারবারীদের উপর এই কর আরোপিত হয়। কয়েক ধরনের দ্রব্য, যেমন খাদ্যদ্রব্য, কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কুইনাইন, কেরোসিন, ও পুস্তক প্রভৃতিকে কর হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রথম বাংলা দেশে যখন এই কর আরোপিত হয় তখন উহার হার ছিল টাকায় ১ পয়সা; ১৯৪৪ সালে উহা বাড়াইয়া দুই পয়সা করা হইয়াছিল; ১৯৪৯ সালে টাকায় তিন পয়সা (বর্তমানে পাঁচ নয়া পয়সা) করা হইয়াছে।

বিক্রয় করের ইতিহাস

ভারতের সকল রাজ্যে বিক্রয়কর আরোপিত হইয়াছে, অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই করের হার এবং আরোপ পদ্ধতিতে বহু পার্থক্য আছে। মোটামুটি দুই ধরনের বিক্রয় কর আছে: একবিন্দু কর (Single-Point Tax) ও বহুবিন্দু কর (Multi-point Tax)। উৎপাদকের হাত হইতে ভোগকারীর হাত পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথে একটি দ্রব্য বহু স্তরের বিক্রেতাদের মধ্য দিয়া পার হয়। যদি প্রত্যেকটি স্তরে বিক্রয়ের উপরই কর আদায় করা হয়, তবে তাহাকে বহুবিন্দু বিক্রয় কর বলে (যেমন মাদ্রাজ)। যদি বিক্রয়ের যে কোন একটি স্তরে এই কর আদায় করা হয়, তবে তাহাকে একবিন্দু বিক্রয়কর বলে (যেমন পশ্চিমবংগ)। বোম্বাইতে বিক্রয়কর দুইটি স্তরে আদায় করা হয়, প্রথম বিক্রয় ও শেষ বিক্রয়। পশ্চিমবংগে খুচরা বিক্রয়ের স্তরে ভোগকারীদের নিকট হইতে ইহা আদায় করা হয়। অনেক রাজ্যে উৎপাদক বা আমদানীকারী ব্যবসায়ী যখন প্রথম বিক্রয় করেন তখনই এই কর আদায় করা হয়।

অনেক ধরনের বিক্রয় কর

সংবিধানের ২৮৬ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলি বিক্রয়কর আরোপ করিতে পারে না: (ক) যখন ক্রয় বা বিক্রয় রাজ্যের বাহিরে ঘটে, (খ) যখন আমদানি ও রপ্তানি হিসাবে দ্রব্যসামগ্রী চলাচলের পথে অবস্থিত (Goods in transit as imports or exports), (গ) যখন আন্তরাজ্য ব্যবসায়ে ক্রয় বা বিক্রয় ঘটিতেছে, (ঘ) যখন পার্লামেণ্ট কোন দ্রব্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া ঘোষণা করে।

সংবিধান সম্মত নিষেধ

সরকারের তরফ হইতে দেখিতে গেলে বিক্রয়করের সুবিধা অনেক। ইহা খুবই উৎপাদনক্ষম। ইহা হইতে যে কর আদায় হয় তাহা স্থায়ী ও নিয়মিত। সহজে ইহা কেহ ফাঁকি দিতে পারে না। উন্নয়নের যুগে দামস্তরে বৃদ্ধি ঘটে, তাহার ফলে সরকারের হাতে আদায়ের পরিমাণও বাড়ে। কিন্তু করদাতার দিক হইতে দেখিতে গেলে বিক্রয় কর সমর্থনযোগ্য নহে। ধনী গরীব সকলকেই সমান হারে কর দিতে হয়, তাই উহা প্রগতিবিরোধী (regressive)। ভোগের পরিমাণ কমাইয়া ইহা একদিকে ব্যবসায় বাণিজ্য ও অপরদিকে জীবনযাত্রার মান সংকুচিত করে। বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রাখিতে হয় বলিয়া ইহা খুবই ব্যয়শীল। সর্বোপরি, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়কর আরোপ ও আদায়ের রীতিনীতিতে পার্থক্য এত বেশি যে ইহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিক্রয়করের সুবিধা ও দোষত্রুটি

কর অনুসন্ধানী কমিশনের মতে নিম্ন আয় শ্রেণীর লোকজনকে কর-দানে বাধ্য করিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হইল বিক্রয় কর। তাই কমিশন কমহারে বহুবিন্দু এবং একই সঙ্গে ধনী ব্যবসায়ীর উপর (৩০০০০ টাকা মূল্যের অধিক কারবারী) উচ্চহারে বিক্রয় কর ধার্য করার সুপারিশ করিয়াছিলেন। আন্তঃরাজ্য বিক্রয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর আরোপ করা উচিত, কমিশন তাহাও বলিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যে আদায়ের রীতিনীতি যতটা সম্ভব একরকম হয় এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়কর দফ্তরের অফিসারদের মধ্যে মধ্যে একত্রে আলাপ আলোচনার কথাও কমিশন বলিয়াছিলেন।

কর অনুসন্ধানী কমিশনের সুপারিশ

ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি কর আদায় করিয়া ফিনান্স কমিশনের নীতি অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে উহার কিয়দংশ বিভক্ত করিয়া দেন। যেমন, দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আয়করের শতকরা ৬০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। জনসংখ্যা ও কর আদায়ের উৎস—উভয় নীতি অনুযায়ীই এইরূপ বিভাগ ঘটে। পাট-রপ্তানি শুল্ক হইতে পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি নিম্নলিখিত অংশ পায়; পশ্চিমবঙ্গ ১৫০ লক্ষ, বিহার ৭৫ লক্ষ, আসাম ৭৫ লক্ষ, উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ। তামাক, দিয়াশলাই ও ভেজিটেবল ঘি-র উপর কেন্দ্রীয়

কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করিয়া রাজ্যকে দেয়

আবগারী শুল্কের ২৫% জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। বর্তমানে তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই সকল বিষয়ে বণ্টনের নূতন হার নির্ধারিত হইয়াছে।

সর্বোপরি, কয়েকটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পায় (grant-in-aid or subvention)। অধিকাংশ সাহায্যই রাজ্যসরকারগুলি খুশিমত ব্যবহার করিতে পারে। আজকাল রাজ্যসরকারগুলি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্থসাহায্যের জন্য নির্ভরশীলতা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য পৃথকভাবেও কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময় অর্থসাহায্য করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থ সাহায্য

রাজ্য সরকারের ব্যয়ের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনের ব্যয় আছে, উন্নয়নমূলক ব্যয় এবং অনুন্নয়নমূলক ব্যয়। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে পড়ে শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি, পশুচিকিৎসা, সমবায়, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, গ্রাম ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, সরকারী গৃহনির্মাণ, শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক দপ্তরসমূহ। অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে হইল প্রশাসনিক ব্যয়, ঋণ, সুদ পরিশোধ, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা রিলিফ, পেনশন, পুলিশ ও জেল, বিচার বিভাগ প্রভৃতির জন্য ব্যয়। স্বাধীনতার পর হইতে রাজ্যসরকারগুলির আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রাজ্যসরকার সমূহের ব্যয়

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় (Local Finance):

করপোরেশন, মিউনিসিপালিটি এবং গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়কে স্বায়ত্ত-প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি (Local Finance) বলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের সকল মিউনিসিপালিটি মিলিয়া ৪২ কোটি টাকা এবং সকল গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান মিলিয়া ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাদের মোট ব্যয় ছিল ভারতের মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ১১%। ইহার পাশাপাশি দেখা যায় যে, ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ এর স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মিলিয়া ১৯২৯-৩০ সালে ব্যয় করিতেন ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ভারতে মোট ব্যয়ের প্রায় ১৯ গুণ।

ভারতের স্থানীয় আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কম

ভারতের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় হয় (১) কর, (২) রাজ্য সরকারের সাহায্য, এবং (৩) ফি প্রভৃতি বিবিধ উৎস হইতে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটিই প্রধান, তবে গ্রামাঞ্চলে ও সহরাঞ্চলে ইহাদের পরিমাণে ও অনুপাতে পার্থক্য আছে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিভিন্ন উৎস

ভারতের করপোরেশন ও মিউনিসিপালিটিসমূহ যে ধরনের কর আরোপ করেন তাহা বহু প্রকার। উহার মধ্যে আছে (ক অক্ট্রয় (octroi) ; এবং সীমানা কর (Terminal Tax) ; (খ) বাড়ি ও জায়গার উপর কর ; (গ) গাড়ি ও জীবজন্তুর উপর কর ; (ঘ) জীবিকা ও ব্যবসাযের উপর কর ; রাস্তা ও ফেরীর উপর কর (toils) ; (ঙ) তীর্থযাত্রী বা ভৃত্যদের উপর আরোপিত কর। ইহাদের মধ্যে বাড়ি ও জায়গার উপর আরোপিত কর হইতেছে প্রধান। তাহার পরের স্থান হইল অক্ট্রয। আয়ের বাকি অংশ আসে জল, আলো প্রভৃতি হইতে আদায় করিযা। গ্রামাঞ্চলে সর্বপ্রধান হইল জমি ও বাড়ির উপর হইতে আদায়।

স্থানীয় কর কাঠামো জনবিরোধী

জমি ও বাড়ির উপর আরোপিত কর এবং সীমানা কর উভয়ই দরিদ্রদের উপর অধিকতর চাপ দেয। গ্রামাঞ্চলে লোকের আয়ের উপর ক্রমবর্ধনশীল হারে কর আরোপিত ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয কর কাঠামো (local tax-structure) এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া আছে।

ব্যয়ের বিভিন্ন বিষয়

স্থানীয প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যযের তালিকার মধ্যে প্রধান হইল সাধারণ শাসন পরিচালনা ও কর আদায়ের খরচ, জন-নিরাপত্তা, আলোকদান, গ্রাম্য পুলিশ, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, জন-স্বাস্থ্য ও জল সরবরাহ, আবর্জনা নিষ্কাশন, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তা-ঘাট, শ্মশান, কারখানা, বাজার, পার্ক, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি।

কি কি করা দরকার

ভারতের স্থানীয় অর্থনীতির মূল সমস্যা হইল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে অধিকসংখ্যক এমন ধরনের আয়ের উৎস ছাড়িয়া দেওযা যাহাতে উহাদের স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং উপযুক্ত পরিমাণে কাজ করার জন্য আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে, রাজ্য সরকারের তহবিল হইতে আরও অধিক পরিমাণে সাহায্য করা উচিত,

কারণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ফলে (যেমন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি) দেশে শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আয় বাড়ে। এই বর্ধিত আয়েব আরও বেশি অংশ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া দরকার। কর অনুসন্ধানী কমিটির মতে রাজ্য সরকারের উচিত জমির মূল্যের ২৫%-এর ভিত্তিতে ভূমিরাজস্ব ধার্য করা। ভূমি রাজস্বের অনধিক ¼ অংশ স্থানীয় কর হওয়া উচিত, এবং ইহার উপরে স্থানীয় উদ্দেশ্যেও অতিরিক্ত এবং অস্থায়ী ধরনের সারচার্জ আরোপের ক্ষমতা ইহাদের দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে আয় হইতে পারে এইরূপ শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্যের মালিকানা ও পরিচালনার ভার, জল বা বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাস পরিচালনা, ভূমি উন্নয়ন—ইহাদের নিজের হাতে তুলিয়া লওয়া উচিত। তাহা ছাড়া কম কর ধার্য করা (under-assessment), কর বাকি থাকা এবং ভাল হিসাবপত্র না রাখা—এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা উচিত।

১৯৪৯ সালের কমিটি ও কর অনুসন্ধানী কমিশনের সুপারিশ

১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় আয়ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিটি ইহাদের গুরুত্ব, কার্যাবলী ও আয়ের উৎস বাড়াইবার কথা বলিয়াছিল। কমিটির সকল সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই। কর-অনুসন্ধানী কমিটির মতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অধিকসংখ্যক কাজ না দিয়া নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজ দেওয়া দরকার এবং উচ্চতর স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কমিটির মতে যে সকল কর ইহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল: বাড়ি ও জমির উপর কর; যন্ত্রচালিত ছাড়া অন্যান্য যানবহনের উপর কর; জীবজন্তু এবং নৌকার উপর কর; বিভিন্ন প্রকার জীবিকার উপর কর; সংবাদ-পত্র ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞাপনের উপর কর; থিয়েটার কর; সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর; রাস্তা বা জলপথে মালপত্র ও লোকজনদের চলাচলের উপর কর। মোটর গাড়ীর উপর কর ও ভূমিরাজস্বের অংশ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া উচিত। সাধারণত, রাষ্ট্রের নিকট হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়ান উচিত। দুঃখের বিষয় সরকার এখনও এই সকল সুপারিশ কার্যকরী করেন নাই, এবং সেইরূপ কোন প্রচেষ্টাও দেখা যাইতেছে না।

ভারতের জাতীয় ঋণ (Public Debt of India)

অর্থনীতিশাস্ত্রে জাতীয় ঋণ সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির আবহাওয়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল দেশে ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র প্রসারের যুগে অর্থনীতি শাস্ত্রের উদ্ভব। সরকারী অর্থনৈতিক কাজকর্ম যত কম হয় ততই মঙ্গল, এইরূপ ধারণা প্রধান ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। জাতীয় ঋণ গ্রহণ করা অনুচিত, সরকারী আয় অনুযায়ী ব্যয় হওয়া উচিত, বাজেট খুব ছোট হওয়া উচিত, উহার আয়ব্যয়ে সমতা থাকা উচিত—এইরূপ কথা তাঁহারা বলিতেন। যুদ্ধ বা আপৎকাল ছাড়া ঋণ গ্রহণ উচিত নয়, এইরূপ ধারণা তাঁহাদের ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রাষ্ট্রগুলি যখন রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি কিছু কিছু অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হয় তখন হইতে বলা হয় যে, উৎপাদক কার্যে নিয়োগের জন্য জাতীয় ঋণ গ্রহণ অযৌক্তিক নহে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাই সকল রাষ্ট্রেই জাতীয় ঋণ ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক কালে জাতীয় ঋণ সম্পর্কে ধারণা বদল হইতেছে

ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যত যুদ্ধ হইয়াছে উহার প্রায় সকল ব্যয়ভার ছিল, তদানীন্তন ভারত সরকারের। ব্রিটেনের এবং ভারতের ধনিকদের নিকট হইতে ঋণ করিয়া এক বিপুল অনুৎপাদক ঋণভার সৃষ্টি হইয়াছিল ; ১৯৩৯ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৭০৯·৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই অনুৎপাদক শ্রেণীর ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। ইংরাজ সরকার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুদ্রায় যত ব্যয় হইবে ভারত সরকার (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে) তাহা চালাইয়া যাইবেন। যুদ্ধের পরে ইংরাজ সরকার এই মোট ব্যয়ের নিজ অংশ পরিশোধ করিবেন ভারত সরকারের অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে স্টার্লিং জমা দিয়া। চলতি রাজস্ব হইতে যুদ্ধের জন্য এই প্রভূত ব্যয় ভারত সরকার চালাইতে না পারিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এবং জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলেন।

ব্রিটিশ আমলে অন্যায় ভাবে জাতীয় ঋণ সৃষ্টি

বহুকাল পূর্ব হইতেই রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ব্রিটেন হইতে কিছু স্টার্লিং ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালে এইরূপ

বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬৯'১২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের কিছু কিছু ষ্টার্লিং পাওয়া হয়, ফলে উহা হইতে সেই সকল বৈদেশিক ঋণ অনেকাংশ পরিশোধ করা সম্ভব হয়। ১৯৪৬ সালে ভারতের বৈদেশিক ঋণ কমিয়া ৬৩'৪ কোটি টাকাতে পৌঁছায়। এইরূপে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে ভারতের মোট জাতীয় ঋণ হইল ২৩০৮'৫ কোটি টাকা; উহার মধ্যে বেশির ভাগই আভ্যন্তরীণ।

বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ বৃদ্ধি

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর হইতে ভারত সরকার আরও অধিক পরিমাণ ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। কিন্তু টাকার হিসাবে দেনার পরিমাণ (Rupee debt) ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কর আদায় হইতে সংগ্রহ না করিয়া ঋণের সাহায্যে সংগ্রহ করার নীতি অনেকাংশে অবলম্বিত হইয়াছে। করের সাহায্যে আদায় অপেক্ষা ঋণ করিলে জনসাধারণের উপর উহার ভার কম পড়ে (less burdensome)। যে সকল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হইতে সরকারের এমন আয় সৃষ্টি হইবে, যাহাতে এইরূপ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব, সেইরূপ উৎপাদক ঋণ গ্রহণে বিশেষ কোন ভার থাকিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। অনেক ধরনের ব্যয় আছে যাহা হইতে তৎক্ষণাৎ কোন আয় সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সমগ্র জাতির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেমন পথঘাট নির্মাণ, গবেষণামূলক ল্যাবরেটরি, স্কুল, কলেজ-নির্মাণ প্রভৃতি পরোক্ষভাবে দেশের সম্পদ উৎপাদন-যোগ্যতা বাড়াইয়া তোলে। তাই এই সকল কার্যও অনেকাংশে ঋণের সাহায্যে সম্পাদন করা চলে। ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে উন্নয়নমূলক আর্থিক নীতির মধ্যে ঋণসংগ্রহ নীতির স্থানও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ঋণ-সংগ্রহ পরিমাণ ছিল ৫৮৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট উন্নয়নমূলক ব্যয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট উন্নয়নমূলক ব্যয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ, অর্থাৎ ১২০০ কোটি টাকা ঋণ হইতে পাওয়া যাইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ধরা হইয়াছে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা। আজকাল আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ বিশ্লেষণের সময় কেবল মাত্র উহার আয়তন (size) দেখা হয় তাহা নহে; প্রধানত এইরূপ ঋণের বণ্টনগত প্রভাব (redistributive effects)

পরিকল্পনাকালে ঋণের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে

আলোচনা করা হয়। কম সুদে ঋণ করিয়া এবং সেই অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের কল্যাণ ও উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে পারিলে ঋণের ফলাফল অর্থনৈতিক দিক হইতে ভালই এইরূপ মনে করা হয়। আভ্যন্তরীণ ঋণ খারাপ, অথবা সরকারের পরিশোধ দেওয়ার সাধ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এইরূপ মনে করা ঠিক নয়, কারণ ঋণদানকারী ব্যক্তিদের উপর কর আরোপ করিয়া বা নূতন পর্থ সৃষ্টি করিয়াই সবকার এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, ভারত সরকারের মোট ঋণের মধ্যে অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ কম বলিলেই চলে।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সমস্যা (The Problem of Repayment of Foreign Loans)

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত বৈদেশিক ঋণের একটি বৃহৎ অংশ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পরিশোধ করিতে হইবে—এই সমস্যা আজ ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষ পর্যন্ত যে ১৩০০-১৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সম্বল ভাবতে প্রবেশ করিবে—তাহা পরিশোধ কবার অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা করা দরকার। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই এইসকল ঋণ পরিশোধ সুরু করিযা দিতে হইবে। আমাদের রপ্তানি হইতে যে পাওনা হয় তাহার সাহায্যে দরকারী আমদানিগুলি করার পরেও কিছুটা রপ্তানি উদ্বৃত্ত (export surplus) সৃষ্টি করিতে হইবে। হিসাবে ধরা হইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন দেখা দিবে, ইহার মধ্যে ৪৫০-৫০০ কোটি টাকা পুরাতন ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধে ব্যয় হইযা যাইবে। এই পরিমাণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরা হয় নাই। ভারত হইতে বিদেশী কোম্পানিগুলি ও বিদেশী ব্যক্তিরা নিজের দেশে মুনাফার যে অংশ পাঠাইয়া থাকে, উহা হিসাবে আনা হয় নাই। অথচ তাহার জন্যও বৈদেশিক মুদ্রা জোগাড় করা দরকার হইবে।

রপ্তানি উদ্বৃত্ত চাই

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের কিছু কিছু সুবিধা ভারতের ক্ষেত্রে আছে। যেমন, বৈদেশিক ঋণের কিছু অংশ দেশীয় টাকায় পরিশোধ করিলেও চলিবে। তাহা ছাড়া অধিকাংশ ঋণই দীর্ঘকালীন, ধীরে ধীরে পরিশোধ করা চলে। অবশ্য যে সকল ঋণ দেশীয় টাকায় পরিশোধ করা চলে উহার জন্য রপ্তানি-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা

সুবিধা ও অসুবিধা

পাওয়ার দরকার হয় না ঠিকই, কিন্তু দেশীয় জিনিস-পত্র ছাড়িয়া দিতে হয়। মুদ্রাস্ফীতির আমলে এইরূপ দেশের উপকরণ বা সম্বল বিদেশে যাইতে দেওয়া ঠিক নয়। তদুপরি, দেশের সম্বল বিদেশের ঋণ-পরিশোধে ব্যবহৃত হইলে পরিকল্পনা কিছুটা দুর্বল হইবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ হ্রাস পাইবে ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

ভারতের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা (Capacity to repay) কিরূপ, তাহা লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণভাবে মনে রাখা দরকার, ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত দ্রুত শিল্প প্রসারের উপর। ভবিষ্যতে মরসুমী বৃষ্টিপাত ভাল হইলে, হঠাৎ কোন কারণে বাণিজ্যহার আমাদের অনুকূলে আসিলে, হঠাৎ কোন তৈলখনি বা স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইলে, বা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অল্পসুদে ঋণ দেয় এইরূপ কোন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল গঠিত হইলে ভারতের ঋণ পরিশোধ করা সহজ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বিষয় বাদ দিয়া বর্তমান ঘটনাবলীর ধারা অনুযায়ী আলোচনা করাই ভাল।

ভারতের পরিশোধ ক্ষমতা

সর্বপ্রথমেই বলা যায় যে, ভারতের ঋণ পরিশোধের জন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রার পুঁজি বা মজুত ভাণ্ডার নাই, দ্বিতীয় পরিকল্পনার চাপে উহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, আমদানি নিয়ন্ত্রণ খুবই কঠোর, আর অধিক কমাইবার সম্ভাবনা তো নাই-ই ; বরং দেশে শিল্পপ্রসার ঘটিলে সাধারণত আমদানির পরিমাণ বাড়িতেই থাকে। তৃতীয়ত, আরও বেশি বৈদেশিক সাহায্য পাইলে পরিশোধ যোগ্যতা বাড়ে। এই বিষয়ে কি ঘটিতে পারে, তাহা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। চতুর্থত, রপ্তানি বাড়িলে সমস্যা অনেকখানি মিটিতে পারে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখিয়া উহা সম্ভব নয়। তাহাদের দেশে নির্দিষ্টকালের ব্যবধানে যে নিয়মিত বাণিজ্য সংকট দেখা দেয় তাহাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা। ঐ সকল দেশের মুদ্রাস্ফীতি আমাদের আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়ায়, তাহাদের অর্থনৈতিক সংকটে আমাদের রপ্তানি চাহিদা হ্রাস পায়। তাই বর্তমানের ধারা বজায় থাকিলে ভারতের ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা ভবিষ্যতে বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

পরিশোধের ক্ষমতা নির্ধারণকারী বিষয় সমূহ

সর্বোপরি, ইহা মনে রাখা দরকার যে, ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা প্রধানত নির্ভর করে দেশে সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতার উপর। যত দ্রুত শিল্পপ্রসার ঘটিলে এই যোগ্যতা সৃষ্টি হইতে পারে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এর কথা মনে করিয়া আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে তত দ্রুতহারে আমাদের অর্থ নৈতিক বিকাশ ঘটিতেছে?

অনুশীলনী

1. Consider the financial position of the Government of West-Bengal and suggest measures for improving it. (C. U. B. Com. 1951)

2. Examine critically the existing allocation of financial resources between the Centre and the States in India. (C. U. B. Com. 1952)

Or,

Comment on the distribution of financial resources between the Union and the State Governments in India.

3. Examine critically the recommendations of the Indian Finance Commission so far as they concern West Bengal.

(C. U. B. Com. 1953 ; B. A. 1953)

4. Give a brief outline of the main recommendations of the Indian Taxation Enquiry Commission. (C. U. B. Com 1956 ; B. A. 1957)

5. "The Indian Tax system is regressive". Examine this statement.

(C. U. B. Com. 1957)

6. Describe briefly the Kaldors proposals for Indian tax reform. To what extent have these proposals been implemented ?

(C. U. B. Com. 1959)

7. Give a short description of India's Tax structure. Do you think that it is still possible to increase substantially the tax revenue of the Government ? How ? (C. U. B. Com. 1959)

8. Describe the size and composition of India's Public Debt. Do you regard the Debt position as sound ? Give reasons for your answer.

(C. U. B. A. 1955)

9. Discuss the factor that have been responsible for the growth of public expenditure in India. (C. U. B. A. 1956)

10. What new measures of Taxation have been recently introduced to meet the development expenditure during India's Second Five Year Plan.

(C. U. B. A. 1958)

11. Discuss the attempts that have been recently made to reform the Indian Tax structure. How far do you think the changes introduced would stimulate savings and investment ?

12. Explain briefly the causes of the growth of Public Debt in India since 1947 and the economic effects of Public borrowing. From what sources have the government derived their funds ?

13. Critically examine the present system of allocation of tax resources between the Centre and the States in India.

14. Discuss the main features of Kaldor's proposals for Indian tax reform. To what extent have these proposals been implemented.

15. Explain the present arrangements for the division of revenues between the centre and states in India. What changes would you suggest ?

16, Examine critically Kaldor's proposals for tax reform in the context of the needs of India's developing economy.

17. Write a short note on Public Debts in India and account for their increase since independence.

২৯

কয়েকটি কর ও সামগ্রিক কর-কাঠামো

Few Taxes and the tax-structure

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক (Customs)

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি রপ্তানি শুল্ক হইতেই সর্বাধিক পরিমাণ আয় করিয়া থাকেন। ১৮৫৭-৫৮ সালে এই উৎস হইতে মাত্র ১ কোটি টাকা আয় হইত ; ১৯৪৬-৪৭ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৮৭·৫ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ইহা হইতে ২২১ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে হিসাব করা হইয়াছিল।

১৯২২ সালের পূর্বে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক আরোপ করার প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারী তহবিলে আয় বাড়ান। কিন্তু ১৯২১ সালে ভারতের ফিস্ক্যাল কমিশন সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপ করার নীতি গ্রহণ করায় ইহার লক্ষ্যে বহু পরিবর্তন আসিযাছে। লৌহ ও ইস্পাত, সুতাবস্ত্র, দিয়াশলাই, চিনি প্রভৃতি শিশুশিল্পগুলি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সংরক্ষণী শুল্ক আরোপ করা শুরু হইল। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও আমদানিশুল্ক আরোপিত হইয়াছিল। যেমন, ১৮৯৯ হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে ইউরোপ হইতে বীট চিনির ডাম্পিং প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এবং ১৯৩২-১৯৩৩ সালে জাপানী মুদ্রা ইয়েনের (yen) মূল্য হ্রাসের (depreciation) দরুণ সূতীবস্ত্রের ডাম্পিং প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে শুল্ক আরোপিত হইয়াছিল। অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটিশ দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়কে অধিকতর সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালে পক্ষপাতমূলক শুল্ক ব্যবহার করা হইয়াছিল। ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিস্কাল কমিশনের মতে ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনার অস্ত্র হিসাবেই শুল্ক নীতিকে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

কত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার

বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক আরোপিত আছে, যেমন মোটর গাড়ী, সিনেমা ফিল্ম, ঘড়ি, সিল্কের কাপড়, তামাক, সিগারেট, বিদেশী মদ্য, রূপা, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি। যে সকল দ্রব্যের উপর

রপ্তানি-শুল্ক আছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইল চা, পাট, চামড়া প্রভৃতি। পাট-রপ্তানি শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের একাংশ পাট উৎপাদনকারী রাজ্যসমূহ পাইয়া থাকে। আমদানি শুল্কের ভার (burden) প্রধানত পড়ে বিলাস দ্রব্যাদির উপরে ; সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যের উপরও কিছু চাপ আসে ; মূলধনী দ্রব্যাদি ও কাঁচামালের উপর এই শুল্ক নাই বলিলেই চলে। কেরোসিন ও পেট্রলের উপর শুল্কের ভার প্রধানত গরীব শ্রেণীকেই বহন করিতে হয়। আমদানি শুল্কের প্রধান ফল হইল পণ্যদ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়া। আমদানি-রপ্তানি শুল্ক হইতে রেভিনিউ সাধারণত স্থিতিস্থাপক (elastic)।

কর অনুসন্ধানী কমিশনের (Taxation Enquiry Commission) মতে আমদানি শুল্ক হইতে আরও অধিক অর্থ সংগ্রহ করার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু রপ্তানি শুল্ক হইতে অধিক অর্থ তোলা যায়। বিভিন্ন প্রকার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও রপ্তানি শুল্ক এক সঙ্গে মিলাইয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আভ্যন্তরীণ দামস্তর স্থির রাখা এবং সংরক্ষণ দেওয়া উভয় উদ্দেশ্যেই সাধন করা যাইবে। কমিশনের মতে দাম ও বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দ্রুত ও নিয়মিত ভাবে পাইবার জন্য দেশে ও বিদেশে বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে আমরা কর অনুসন্ধানী কমিশনের এই বক্তব্যের সহিত এক মত হইতে পারি না। উন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে আমদানি কমান এবং রপ্তানি প্রসারের যে বিপুল আয়োজন তৃতীয় পরিকল্পনায় করা হইয়াছে, উহা সফল করিতে হইলে বরং আমদানি শুল্ক বাড়ান উচিত এবং রপ্তানি শুল্ক কমান দরকার।

কর অনুসন্ধানী কমিটির বিবরণ

আয় কর (Income Tax)

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম হইল আয়কর। ভারতীয় আয়করের ইতিহাস অতি বিচিত্র। সকল আয়ের উপর একটি সাধারণ আয়কর (কৃষি-আয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত) স্থাপিত হয় ১৮৬০ সালে সিপাহী বিদ্রোহের খরচ তুলিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে। ১৮৬৫ সাল হইতে এই কর বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬৭ সালে সকল জীবিকা ও ব্যবসায়ের উপর (কৃষিকার্যকেও ইহার মধ্যে ধরা হয়) একটি লাইসেন্স কর (a license tax) বসান হয়। ১৮৭৩ সালে ইহার অবসান ঘোষণা করা হয়, কিন্তু ১৮৭৭ সালে ইহা পুনরায় প্রবর্তিত হয়।

আয়করের ইতিহাস

১৮৮৬ সালে পুরাণো লাইসেন্স করকে একটি সাধারণ আয়করে পরিণত করা হয়। সেই বৎসর হইতে ভারতের করকাঠামোর একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে ইহা চলিয়া আসিয়াছে।

১৯১৪ সালের পূর্বে আয়করের হার ছিল কম এবং উহা হইতে আয়ও হইত কম। আয় বাড়াইবার জন্য ১৯১৬ হইতে একটি ক্রমবর্ধমান হারের কাঠামো প্রবর্তন করা হয় এবং ১৯১৭ সাল হইতে (একটি নির্দিষ্ট সীমার পরবর্তী আয়ে) অধি-কর বা উর্ধ্বকর (Super-tax) স্থাপিত হয়। ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে আয়করের হার বহুবার পরিবর্তন করা হয় এবং কর আদায়ের সংগঠনে পরিবর্তন আনিয়া উহা উন্নত করার প্রচেষ্টা হইতে থাকে। ১৯৩৯ সালে স্ল্যাব্ প্রথা প্রবর্তিত হয়; এই প্রথায় করদাতার আয়ের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন হারের কর ধার্য করা হইয়া থাকে।

ক্রমবর্ধমান হার-কাঠামোর সূত্রপাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে একটি অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profit Tax) প্রবর্তিত হয়; এই ব্যবস্থায় ৩০০০০ টাকার উপরে অস্বাভাবিক যুদ্ধ-কালীন মুনাফার ৫০% কর হিসাবে আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ১৯৪০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বাড়াইবার জন্য সকল আয়করের উপর (অধি-কর ও করপোরেশন কর সহ) ২৫% অতিরিক্ত কর (Surcharge) ধার্য করা হয়। ১৯৪১ সালে অতিরিক্ত মুনাফা করকে ৫০% হইতে বাড়াইয়া ৬৬⅔%-এ তোলা হয় এবং অতিরিক্ত করকে ২৫% হইতে ৩৩⅓%-এ বাড়ান হয়। ১৯৪৩ সালে অতিরিক্ত মুনাফা করের ⅕ অংশ সরকারের নিকট জমা রাখার নীতি ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৪ সালে ইহা বাড়াইয়া ১৯/৬৪ অংশ করা হয়। ফলে ব্যবসায়ীরা কার্যত অতিরিক্ত মুনাফার প্রায় সবটাই সরকারের নিকট জমা রাখিতে বাধ্য হন। ১৯৪৬ সাল হইতে অতিরিক্ত মুনাফা কর তুলিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আয়কর

১৯৪৫ সাল হইতে উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে (Earned Income and unearned Income) পার্থক্য করা হয়। উপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে করমুক্তির নিম্নতম সীমা অনুপার্জিত আয়ের তুলনায় একটু উঁচুতে রাখা হয়।

ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থার তিনটি অংশ : ব্যক্তিগত আয়কর (Tax on

personal incomes), উর্ধ্ব-কর বা অধি-কর (Super-tax) : এবং কর্পোরেশন-কর (corporation-tax)। কোন আর্থিক বৎসরে (এপ্রিল হইতে মার্চ) ব্যক্তির আয়, মুনাফা বা প্রাপ্তি সকল কিছু মিলিয়া যে পরিমাণ অর্থ হাতে আসে, তাহারই উপর এই কর বসান হয়। নির্দিষ্ট নিম্নতম একটি সীমার নীচে বাৎসরিক মোট আয় হইলে কোন কর দিতে হয় না। যৌথ পরিবারকেও ব্যক্তির ন্যায় ধরা হয়, তবে ইহার ক্ষেত্রে এইরূপ করবিহীন নিম্নতম সীমারেখা একটু উর্ধ্বে।

ভারতীয় আয়করের বৈশিষ্ট্য

যাহারা কর দিবার উপযুক্ত এইরূপ সকল ব্যক্তিকে সরকারী আয়কর বিভাগে একটি বাৎসরিক হিসাব (annual return) দাখিল করিতে হয়। কর আদায়ের উদ্দেশ্যে স্ত্রী এবং পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সভ্যদের উপার্জন পরিবারের প্রধান কর্তার আয়ের সহিত যোগ করা হয়। স্ল্যাব প্রথায় কর আরোপ করা হয়। জীবনবীমার প্রিমিয়াম হিসাবে দেয় টাকার উপর রিবেট (rebate) দেওয়া হয়, অবশ্য যদি মোট প্রিমিয়াম মোট আয়ের ⅙ অংশের অধিক না হয়। ভারতীয় আয়করের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল 'আয় করিবার সময়েই দিতে থাক' এই নীতি (Pay-as you-earn system)। এই ব্যবস্থায় করদাতা নিজে চলতি বৎসরে আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে আন্দাজী হিসাব স্থির করেন এবং গত বৎসরে ধার্য করের হিসাবে কর দিতে থাকেন। কোম্পানীসমূহকে অধিক হারে কর দিতে হয়। তাহাদের উপর অধি কর ও আয়কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ রাজ্য সরকারগুলিকে দিতে হয়। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার আয়করের (করপোরেশন কর ব্যতীত) ৩৩⅓ অংশ নিজে রাখেন এবং ৬৬⅔ বিভিন্ন রাজ্য সরকারসমূহকে বণ্টন করিয়া দেন।

ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে কিছু কিছু সমালোচনা করা হইয়া থাকে। যেমন, প্রথমত, ভারতে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর খুব বেশি, টাকার মূল্য কম। সুতরাং করবিহীন নিম্নতম সীমারেখা আরও উর্ধ্বে রাখা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, করদাতার পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে কোন খবর লওয়া হয় না, ১৯৫৭ সাল হইতে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কর হইতে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, এতদিন যাবৎ কৃষি-আয়ের উপর করধার্যের ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে কয়েকটি রাজ্যে কৃষি-আয়কর আরোপিত হইতেছে, কিন্তু সকল রাজ্যে করের

আয়কর ব্যবস্থার ত্রুটি ও সমালোচনা

হার সমান না হওয়ায় ভারতের কর ব্যবস্থাতে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা যাইতেছে। চতুর্থত, উচ্চ-আয় শ্রেণীতে করের হার ব্রিটেন বা আমেরিকার তুলনায় বেশি। ফলে অনেকে মনে করেন যে, সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং বিনিয়োগের ইচ্ছা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সর্বোপরি, আমাদের দেশে কর-ফাঁকির পরিমাণ অত্যধিক। ১৯৪৯ সালের আয়কর অনুসন্ধানী কমিশন (The Income Tax Investigation Commission, 1949) হিসাব করিয়াছেন যে, দেশে গুপ্ত ও লুক্কায়িত কর-ধার্যোপযোগী সম্পদের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকারও বেশি এবং বাৎসরিক প্রায় ৮০ কোটি টাকা আয়ের উপর কর আদায় করা সম্ভব হইতেছে না। ডাঃ ক্যালডরের মতে বৎসরে ৫৭৬ কোটি টাকার আয় হইতে কর ফাঁকি ঘটিতেছে।

মূলধনী লাভ কর (The Capital gains Tax):

১৯৪৭ সালে ভারতে প্রথম মূলধনী লাভ কর স্থাপিত হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১৫০০০ টাকার অধিক লাভ করিলে উহার ক্রমবর্ধনশীল হারে কর আরোপ করা হইবে, স্থির হইয়াছে। ঐ সময়ে মূলধনী দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইতে থাকায় ঐ কর হইতে বিশেষ কিছু আয় হয় নাই। ব্যবসায়ীদের ও শিল্পপতিদের বিরোধিতায় এই কর ১৯৪৯ সালে তুলিয়া লওয়া হয়।

ডাঃ ক্যালডরের সুপারিশ ও ইহার প্রয়োগ

১৯৫৫ সালে ডাঃ ক্যালডর তাহার রিপোর্টে এই কর স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং ১৯৫৬ সালে ইহা পুনঃ স্থাপিত হয়। ৫০০০০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তির উপর ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল ও তাহার পরবর্তী সময়ে এই কর আরোপ করা হইবে ইহা স্থির হয়। মূলধনী লাভ উদ্ভূত হইলে (accrued) কর আরোপিত হইবে না; সম্পত্তির মালিকের হাতে সেই মূলধনী লাভ আসিলে তবেই উহার উপর আরোপ করা হইবে। ধরা যাউক, কোন ব্যক্তি একটি সম্পত্তি ৭০০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিল. বর্তমানে উহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১০০০০০ টাকা। এই পার্থক্য মূলধনী লাভ সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্পত্তি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত উহার উপর কর আরোপিত হইবে না।

নিম্নলিখিত ধরনের মূলধনী করকে আদায় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে: (ক) কৃষি-জমির বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত লাভ; (খ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্য ও

সাংসারিক দিক হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত লাভ; (গ) উপহার দেওয়া, গচ্ছিত রাখা ও অবিভক্ত হিন্দু যৌথ পরিবারের সম্পত্তি বণ্টন হইতে লাভ; (ঘ) একটি কোম্পানী যখন নিজস্ব মালিকানা হইতে অপর কোন কোম্পানীকে সম্পত্তি হস্তান্তর করে, উহা হইতে লাভ; (ঙ) পুরাণো বসত বাড়ি বিক্রয় করিয়া নূতন বসত বাড়ী ক্রয় করিবার সময়ে প্রাপ্ত যে লাভ। এই সকলই আইন এড়াইবার ফাঁক হিসাবে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করিতেছে।

এই সকলই আইন এড়াইবার ফাঁক

বৎসরে ৫০০০ টাকার কম লাভ দেখা দিলে উহার উপর কর আরোপিত হইবে না। অন্যান্য করযোগ্য আয় ও মূলধনী লাভ মিলিয়া মোট ২০০০০ টাকার কম হইলে কর আরোপ করা হইবে না। কোম্পানীসমূহ এই সকল সুবিধা পাইবে না। মূলধনী লাভের উপর কর আয়করের অংশ-বিশেষ এবং উহারই সঙ্গে আরোপিত হইবে ও আদায় হইবে। আয়করের মতই মূলধনী ক্ষতি (৫০০০ টাকার কম ক্ষতি ছাড়া) বৎসরান্তে হিসাব করা হইবে। আয়-করের হারে উহা আদায় করা হইবে এবং ইহার উপর কোন সুপার ট্যাক্স বসান হইবে না।

আইনের অন্যান্য ধারা

ডাঃ ক্যালডর তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছিলেন যে, "দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস যে কোন সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, অথবা অদূর ভবিষ্যতে কতখানি আদায় হইতে পারে—এই সকল বিষয় বিচার না করিয়া যথা শীঘ্র সম্ভব এই করের পুনঃ প্রবর্তন করা দরকার"।* ক্রমবর্ধনশীল করের পক্ষে সকল যুক্তি দ্বারাই মূলধনী লাভের উপর করকে সমর্থন করা চলে—আয়বৈষম্য কমিবে, সরকারী আয় বাড়াইবে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে। ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টার বাহিরে বাহ্য কোন কারণে মূলধনী লাভ দেখা দেয় বলিয়া এই কর ব্যক্তির কর্মোদ্যম ও সঞ্চয় বিনিয়োগের ক্ষমতার উপর বিরূপ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

করের পক্ষে ডাঃ ক্যালডরের যুক্তি

ব্যবসায়ীরা এই করের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

* "The tax ought to be reintroduced as soon as possible and quite irrespective of the immediate prospects of rising or falling prices, or of the immediate expectation of the yield."

—*N. Kaldor, Indian Tax Reform.*

যেমন, উন্নয়নের যুগে মূলধনী লাভ ঘটিতে পারে ইহা ব্যবসায়ীদের হিসাবের মধ্যেই থাকে। তাই উহার উপর কর আরোপ করিলে বিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে উহা সুফলদায়ী নয়।

করের বিপক্ষে যুক্তি-সমূহ: ব্রিটিশ রয়াল কমিশন

১৯৫৫ সালে ইংলণ্ডের একটি রয়াল কমিশন (The Royal Commission on Taxation of Profits and Income) এই কর সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই কমিশন এই কর পছন্দ করিতে পারেন নাই। উহার যুক্তি ছিল যে, (১) মুদ্রাস্ফীতির দরুণ বা সুদের হার হ্রাসের দরুণ সম্পত্তির যে মূল্য-বৃদ্ধি হয় তাহা আসল বৃদ্ধি নয়। টাকার অঙ্কে এই বৃদ্ধি দেখা দিলেও এই লাভ কাল্পনিক। (২) মূলধনী লাভ অত্যন্ত অনিয়মিত। বাধ্যতা-মূলক ভাবে সম্পত্তি দখল করিলে এই লাভকেও বাধ্যতামূলক বলিয়া ধরা যায়। (৩) এই কর অন্যায্য, কারণ মূলধনী ক্ষতিকে হিসাবের মধ্যে আনা হয় না। (৪) যে বৎসর এই লাভ পাওয়া গেল সেই বৎসর এই কর আরোপিত হইবে। কিন্তু পূর্বের কয়েক বৎসর ধরিয়া এই লাভ সৃষ্টি হইতেছিল তাহা হিসাব করা হয় না। ইহা ন্যায্য নহে।* (৫) এই করের ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব দেখা দিবে।†

ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে অবশ্যই এই সকল যুক্তি গ্রহণ করা চলে না। আয় বৈষম্য হ্রাস করা এবং উন্নয়নের কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য মূলধনী লাভের উপর কর বসান খুবই যুক্তিসঙ্গত কাজ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়াও মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা বিশেষ সমর্থন-যোগ্য। উন্নয়নের যুগে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে যে সকল বিনিয়োগ করা হয় তাহাতে সারা দেশে শিল্প বিস্তারের উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে।

কিন্তু ভারতের বিশেষ অবস্থায় ইহার আরোপ খুবই যুক্তিযুক্ত

সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে বেসরকারী ক্ষেত্র সাহায্য করে না। কিন্তু এইরূপ পরিবেশ (বাহ্য ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি) দেখা দিলে মূলধনী দ্রব্য ও সম্পদের বাজার দাম ক্রমশ বাড়িতে থাকে এবং তাহা হইতে ব্যক্তিগত মালিকেরাই লাভবান হন। মিশ্র

* "In a system of highly progressive states such as ours, to treat the whole profit as part of the income of the year of realisation so as to tax it at the marginal rate or rates of the tax-payer concerned, would seem unjust."

† "Would have some, even possibly a serious disincentive effect on the private savings which now take place."

অর্থনীতিতে এইরূপ বেসরকারী মালিকের উন্নতি হয়; তাই রাষ্ট্র কর আরোপ করিয়া মূলধনী লাভ সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। ইহা অতি শ্লাঘ্য। বরং বলা চলে যে, ভারতীয় আইনে সেই লাভ সম্পূর্ণ তুলিয়া লওয়ার কথা বলাই উচিত ছিল, এবং এই আইন এড়াইবার মত বিভিন্ন ফাঁক রাখা একেবারেই উচিত হয় নাই।

সম্পদ কর (Wealth Tax)

ভারতের কর-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে ডাঃ কাল্‌ডর যে সকল নূতন কর বসাইবার সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সম্পদ কর অন্যতম। ১৯৫৭ সালের ১৭ই আগষ্ট সংসদ এই সম্পর্কে আইন পাশ করে এবং ঐ বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে উহা কার্যকরী হয়।

এই আইনে স্থির হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির, হিন্দু যৌথ পরিবারের, বা কোম্পানীর মালিকানায় যে সম্পদ আছে (উহা ভারতের বাহিরে বা মধ্যে যেখানেই থাকুক)—তাহার উপর এই কর আরোপিত হইবে। কোন বিদেশী ব্যক্তি বা বিদেশী কোম্পানীর সম্পদ যদি ভারতে অবস্থিত থাকে তবে তাহার উপর হইতেও এই কর আদায় করা হইবে। নীট সম্পদ ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে; ইহা হইল ব্যক্তির, পরিবারের বা কোম্পানীর মালিকানাস্থিত সকল সম্পদ হইতে ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ। কোন সম্পত্তির মূল্য হিসাব করা হইবে বাজারে সেই সম্পত্তির তৎকালীন মূল্য দ্বারা। কয়েক ধরনের সম্পত্তিকে করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যেমন ট্রাষ্টরক্ষিত সম্পত্তি, আসবাবপত্র, গৃহব্যবহার্য তৈজসপত্র ও বস্ত্রাদি, ২৫০০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত অলংকার, নিজস্ব জীবিকা চালাইবার উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। ব্যক্তির ক্ষেত্রে নীট সম্পদের প্রথম ২ লক্ষ টাকা মূল্যের উপর কোন কর আরোপিত হইবে না। হিন্দু যৌথ পরিবার ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে এইরূপ নিম্নতম করমুক্ত সম্পদের পরিমাণ হইল যথাক্রমে ৪ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ টাকা। ব্যক্তির নীট সম্পদ হিসাব করার সময়ে তাহার স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকন্যার সম্পদও হিসাব করিতে হয়। ½% হইতে ১½% পর্যন্ত ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপিত হইয়াছে।

সম্পদ করের বিভিন্ন ধারা

সম্পদ কর স্থাপনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অনেক যুক্তি রহিয়াছে। এই উৎস

হইতে বৎসরে প্রায় ১২½ কোটি টাকা কর আদায় হইবে বলিয়া মনে হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার কাজে ইহা সাহায্য করিবে। তাহা ছাড়া ভারতীয় আয়কর ব্যক্তির করবহনযোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে পারে না, কারণ সম্পদ হইতে আয় এবং শ্রম হইতে আয় উভয়কেই এক বলিয়া ধরা হইয়াছে। কর্মোদ্যোগ ও বিনিয়োগের ইচ্ছার উপরে আয়করের যে বিরূপ প্রভাব আছে তাহা কিছুটা দূর হইবে এবং কর-কাঠামোতে কিছুটা ভারসাম্য স্থাপিত হইবে। উপরন্তু, আয়-কর থাকার দরুণ লোকে অনুৎপাদক সম্পদে যেমন অলংকার প্রভৃতিতে নিজের আয় আবদ্ধ রাখে, এইরূপে আয়করের হাত এড়াইবার চেষ্টা করে। সম্পদ-কর আরোপিত হইলে অনুৎপাদক উপায়ে সম্পদ মজুত রাখিতে ব্যক্তি সচেষ্ট হইবে না। তাহা ছাড়া আয় গোপন করা সম্ভব, কিন্তু সম্পত্তি ও সম্পদ গোপন করা অসুবিধাজনক। তাই আয় কর ও সম্পদ কর উভয়ে একত্রে আরোপিত হইলে আয় ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ হ্রাস পাইবে। সর্বোপরি, এই করের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদর্শ অনুযায়ী দেশে আয়-বৈষম্য হ্রাস পাইবে।

এই করের পক্ষে যুক্তি

সম্পদ করের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল ইহা কার্যকরী করার অসুবিধা বা প্রশাসনিক অসুবিধা। ইহার মধ্যে প্রধান হইল, সম্পদ বা সম্পত্তির মূল্য নিরূপণে বহুবিধ জটিলতা ও দুর্নীতি দেখা দিবে। অলংকার প্রভৃতি প্রভৃত সম্পদ লুকাইয়া রাখা চলে, তাই কর-ফাঁকি বন্ধ হইবে এই যুক্তি ঠিক নয়। লোকে সম্পত্তি ও সম্পদ মজুত করার উদ্দেশ্যেই আয় বাড়াইবার চেষ্টা করে; সুতরাং এই কর কর্মোদ্যোগ ও সঞ্চয়-বিনিয়োগের ইচ্ছার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অনেক ধরনের সম্পত্তি আছে যাহা হইতে কোন আয় হয় না; উহাদের উপর এই কর আরোপিত হইতে থাকিলে এইরূপ সম্পত্তি বিক্রয় হইতে থাকিবে।

এই করের বিপক্ষে যুক্তি

উপরের এই সকল যুক্তির সারবত্তা তখনই গ্রহণ করা যায় যদি ভারতে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন ঘটিবে ধরিয়া লওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে অধিকতর উদ্বৃত্ত-সৃষ্টি ও মূলধনগঠন ঘটিয়া থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, ব্যক্তিক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হইতে থাকে। তাই ব্যক্তিক্ষেত্রের মজুত সম্পদ সরাইয়া লইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উহাকে মূলধন হিসাবে খাটান খুবই দরকার,

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকেরা নিজেদের দক্ষতা ও কর্মকুশলতা বাড়াইয়া যে অধিকতর উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইবে তাহা যাহাতে ব্যক্তিগত ও বেসরকারী সম্পদ হিসাবে মজুত হইতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়াইয়া চলাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল নীতি এবং তাহাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে। বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে অনুৎপাদক মজুত সম্পদের অপসারণ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণে উহাকে উৎপাদক মূলধনে পরিণত করা এই সম্পদ করের সাহায্যে কিছুটা সম্ভবপর হইবে। তাই ইহা সমর্থনযোগ্য।

সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের যুগে ইহার প্রয়োজন

ব্যয় কর (The Expenditure Tax)

ভারতের করসংস্কার বিষয়ে ডাঃ ক্যালডরের সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হইল ব্যক্তিগত ব্যয় কর (Personal Expenditure Tax)। ১৯৫৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সংসদ এই সম্পর্কে আইন পাশ করে এবং ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই আইন কার্যকরী করা হয়। ভারত ছাড়া অপর কোন দেশে এই কর কখনও আরোপিত হয় নাই। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে ইহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে ইহা পুনরারোপিত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর এই কর আদায় হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ পরিবারের আয় (সকল কর দেওয়ার পরে) পূর্ববর্তী বৎসরের ৩৬০০০ হাজার টাকার বেশি, তাহাদের উপর এই কর আরোপিত হইবে। নিম্নতম কতকগুলি ব্যয় বাদ দিয়া ব্যক্তির সকল ব্যয়ের উপরে (নগদ বা ঋণে) এই কর ধার্য করা হইবে। কোন্ সূত্র হইতে ব্যক্তি ব্যয় করিতেছে, তাহা হিসাব করা হইবে না। মোটামুটি কয়েক ধরণের ব্যয় এই কর হইতে বাদ দেওয়া হইবে: (ক) সঞ্চয়, বিনিয়োগ বা বিশেষ কোন আকারে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্যয়। (খ) যে ব্যয় হইতে ব্যক্তির নিজস্ব কোন লাভের সম্ভাবনা নাই, অথবা বিশেষ কাজে ব্যয়, যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা পিতামাতার ভরণপোষণ প্রভৃতি (ইহাদের জন্য ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট আছে)। (গ) ধর্ম, দান বা সংস্কৃতিমূলক কার্যের জন্য ব্যয়। (ঘ) স্বাভাবিক ব্যয় হিসাবে নিম্নতম করমুক্ত ব্যয়ের সীমা ধরা হইয়াছে ব্যক্তির আয়ের ক্ষেত্রে বৎসরে

করের বিভিন্ন ধারা

৩০০০০ টাকা এবং পরিবারের সকলে মিলিয়া ৬০০০০ টাকা। ক্রমবর্ধনশীল হারে ১০% হইতে ১০০% পর্যন্ত করহার নির্ধারিত করা হইয়াছে। বাৎসরিক ৫০০০০ টাকা ব্যয়ের উপর ১০০% কর ধরা হইয়াছে। হিসাব করা হইয়াছে যে ৫৫০০ ব্যক্তি এবং ১০০০ হিন্দু যৌথ পরিবার এই করের আওতায় পড়িবে।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর আরোপিত কর খুবই যুক্তিসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ ক্যালডর বলিতেছেন যে আয় অপেক্ষা ব্যক্তির ব্যয়ই তাহার করবহন ক্ষমতা পরিমাপ করিতে পারে।* দ্বিতীয়ত, ইহার স্বপক্ষে ডাঃ লিট্‌ল বলিতেছেন, "কাজের আকারে লোকে সমাজের ভাণ্ডারে কি দিতেছে তাহা অপেক্ষা ভোগের আকারে এই ভাণ্ডার হইতে সে কি গ্রহণ করিতেছে তাহাকেই করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হউক।"† তৃতীয়ত, ব্যয়কর স্থাপিত হইলে দেশে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে এবং অতিরিক্ত ভোগ-ব্যয়ের ইচ্ছা হ্রাস পাইবে; ইহা দেশের মূলধন-গঠনে খুবই সাহায্য করিবে।§ সর্বশেষে, বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে বহু ব্যক্তি যেরূপ কর ফাঁকি দিতেছেন ব্যয়কর স্থাপিত হইলে সেইরূপ কর ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে।

স্বপক্ষে যুক্তি

ব্যয়করের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল ইহা কার্যকরী করা খুবই অসুবিধাজনক, এবং এই সকল প্রশাসনিক অসুবিধার জন্য ইহার প্রবর্তন উচিত নয়। যেমন, কোন্ ব্যয় প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় পরিচালনার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং কোন্ ব্যয় ব্যক্তিগত ভোগব্যয় তাহা নিরূপণ করা খুবই শক্ত হইবে। আমাদের আয়কর বিভাগে সুশিক্ষিত কর্মচারীর অভাব। তাহারা বর্তমানের আয়কর ফাঁকিই রোধ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের উপর জটিল কর-আরোপ ও আদায়ের ভার ন্যস্ত করা ঠিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। কোন দেশ এখন পর্যন্ত এইরূপ কর আরোপ করে নাই, উন্নয়নের মুখে দাঁড়াইয়া সঞ্চয় বিনিয়োগ ও মূলধন-গঠনের উৎস লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত নয়, এইরূপও বলা হইতেছে।

বিপক্ষে যুক্তি

* "Let spending itself be the measure of spending power and the basis of taxation." —Dr. Kaldor-*Indian Tax Reform* "

† " Let taxation be on the basis of what one takes out of the pool in the shape of consumption and not only on the basis of what one puts into it in the shape of work." Dr. Little."

§ "It can be a potent instrument for restraining conspicuous expenditure and for promoting savings."

মিসেস্ হিক্সও (Mrs. Hicks) ব্যয়করের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃহৎ পরিবারে অধিক ব্যয় হইলে অথবা হঠাৎ পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় বেশি করিতে হইলে উহার উপর এই কর কষ্ট বাড়াইবে। অবশ্য ডাঃ ক্যালডর ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ পারিবারিক অবস্থার তারতম্য বা হঠাৎ-প্রয়োজন নিশ্চয় হিসাব করিয়া কর আরোপ করা সম্ভবপর।*

হিকসের বিরোধিতা ও কালডরের উত্তর

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এই কর বিশেষ সমর্থনযোগ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশে ভোগ বৈষম্য হ্রাস করা খুবই দরকার, বরং আইনের নিম্নতম করমুক্ত সীমা এত উঁচুতে ধরা হইয়াছিল যে, করের উদ্দেশ্য বহুলাংশে বিফল হইয়াছে। দেশের মাথাপিছু আয়ের ১০ ২০ কি ৩০ গুণ পর্যন্ত ব্যয়ের ঊর্ধ্ব সীমা নির্দিষ্ট রাখিয়া তাহার উপর অতি উচ্চহারে এমন কি ১০০% ব্যয়কর স্থাপন করিলেও তাহা অন্যায্য নহে। যখন জমির এবং আয়ের ঊর্ধ্ব সীমা নির্দিষ্ট করা হইতেছে, তখন ব্যক্তিগত ব্যয়ের নিম্নতম করমুক্ত সীমা নিশ্চয় আরও অনেক নিচে নামান দরকার। শুধু তাহাই নহে। আমাদের দেশে ধনীরা ব্যয় করে প্রধানত বিদেশ হইতে আমদানি করা জিনিসের উপর। তাই ভোগব্যয় আরও বেশি সংকুচিত করিলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট হ্রাস পাইবে, দেশে পরিকল্পনায় বিনিয়োগের উপযোগী মূলধনও বেশি পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া, আমাদের দেশের শিল্পে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য ব্যয় প্রায় সবই কোম্পানী হইতে দেওয়া হয়। এইরূপে কোম্পানীরা ব্যয়ের হিসাব বাড়াইয়া কর ফাঁকি দিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে, তাই ব্যক্তিগত ব্যয় কর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত

দান কর (Gift Tax)

ভারতীয় কর কাঠামোর সংস্কার সম্পর্কে তাহার রিপোর্টে ডাঃ ক্যালডর

---

* "There is no difficulty in principle in making allowances for differences in family circumstances or indeed for unequal incidents of necessitous expenditures arising out of illness, accidents and other hazards of life & property."

কয়েকটি নূতন কর বসাইবার সুপারিশ করিয়াছিলেন ; ইহার মধ্যে দানকর অন্যতম। সম্পদ কর, ব্যয় কর ও উত্তরাধিকার কর যাহাতে ফাঁকি দিতে না পারে সেইজন্য কর-কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক হইল দান করা ; এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য দানকর আরোপ করা প্রয়োজন। এতদিন ভারত সরকার এই ফাঁক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে দান-কর আরোপিত হইয়াছে। উইল করিয়া বা মুখের কথায় কোন ব্যক্তি অপর কাহাকে দান করিলে সেই সম্পদ-গ্রহীতার উপর কর আরোপিত হইয়াছে।

দানকরের নিয়মসমূহ

দান করের স্বপক্ষে বহুবিধ যুক্তি আছে। সম্পদ কর ও মৃত্যুকর এড়াইবার এত বড় ফাঁক কোন মতেই খোলা রাখা উচিত নয়। মৃত্যুকরের পক্ষে সকল যুক্তিই দানকরের পক্ষে প্রযোজ্য। দানগ্রহীতার কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা কোন কিছুই এই করের দ্বারা ব্যাহত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং আরও অন্যান্য দেশে মৃত্যুকরের সহকারী কর হিসাবে এই কর প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও ইহা থাকা প্রয়োজন।

স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

দানকরেব বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল ইহা করকাঠামোর জটিলতা বৃদ্ধি করে। অলংকার প্রভৃতি মাধ্যমে যদি গোপনে দান হইয়া যায়, তবে তাহা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া, এই কর হইতে খুব বেশি আয় হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। এই সকল কারণে কর অনুসন্ধানী কমিশন ভারতে এই কব স্থাপনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে রাষ্ট্রের হাতে অধিক পরিমাণ অর্থ আসা প্রয়োজন, তাহাতে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের দ্রুত প্রসার হইতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

মৃত্যু কর (Death Duty)

মৃত ব্যক্তি যে সম্পত্তি রাখিয়া যায় তাহার উপর কর আরোপ করিয়া ১৯৫৩ সালে একটি আইন পাশ হয় (The Estate Duty Act, 1953)। এই আইনে মৃত ব্যক্তির কৃষিগত ও অকৃষিগত সকল সম্পত্তির উপর এবং জীবনবীমা ও জঙ্গম সম্পত্তিসমূহ (movable properties) সকল কিছুর উপরই কর আরোপ করা হয়। কৃষি সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার কর সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারকে দেওয়া হয়। আদায়ীকৃত করের অবশিষ্ট অংশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট অনুপাতে কেন্দ্রীয়

ভারতীয় মৃত্যুকরের বিভিন্ন ধারা

ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। মিতাক্ষরা, মারুমাক্কাটায়াম বা আলিয়াশান্তন আইনে পরিচালিত পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১০০০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির ঊর্ধ্বে এই কর বর্তমানে আরোপিত আছে। মোটামুটি যুক্তিসঙ্গতভাবে শেষ কৃত্যাদি করা এবং দেনা মেটান প্রভৃতির দরুণ সম্পত্তির মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হয়। মৃত্যুর পূর্বে দুই বৎসরের মধ্যে যে উপহার বা দান করা তাহার উপর কর ধরা হয়। স্ল্যাব প্রথায় এবং ক্রমবর্ধনশীল হারে কর আরোপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উত্তরাধিকারীগণ দ্রুত মারা গেলে একই সম্পত্তির উপর বার বার কর দিতে হইবে: উহা কষ্টসাধ্য এবং অন্যায্য। তাই এই সম্পর্কে আইনে কিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, (ক) একটি মৃত্যুব পরে উত্তরাধিকার কর দেওয়া হইল, উহার পরে তিন মাসের মধ্যে পুনবায় মৃত্যু হইলে সেই মৃত্যুকে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইবে না (খ) একই সম্পত্তির উত্তরাধিকার ৫ বৎসরেব মধ্যে বারংবার বদল হইলে করের পরিমাণে পরিবর্তন হইবে। যেমন ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটিলে করের হার যথাক্রমে ৫০%, ৪০%, ৩০%, ২০% ও ১০% হ্রাস পাইবে। মৃত্যু করের স্বপক্ষে বলা যায় যে ইহা ভারতীয় কব কাঠামোর একটি বিশেষ ত্রুটি দূব করিয়া ইহাকে কিছুটা প্রগতিশীল করিয়াছে। যাহাদের করবহনযোগ্যতা বেশি তাহাদেরই উপর এই কর আরোপিত হয়। ব্রিটেনের কল্‌উইন কমিটিও বলিয়াছেন যে আয়করের সঙ্গে মৃত্যুকর থাকিলে উহা করবহন যোগ্যতার সঠিক পরিমাপ করিতে পারে। সমাজের সম্পদ-বৈষম্য ইহাতে হ্রাস পাইবে। ধনী ব্যক্তিরা পরিশ্রম না করিয়া কেবল মাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির দ্বারা কালাতিপাত করিবে, তাহা ঠিক নয়। এই কর তাহাদের কর্মোদ্যম বাড়াইতে সাহায্য করিবে। কেইন্‌সের মতে মৃত্যুকরের ফলে বণ্টন-সমতা আসিলে সমাজে ভোগপ্রবণতা বাড়িয়া মোট বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয় অনুন্নত দেশের উন্নয়ন-কার্যে অর্থসংগ্রহের পথ প্রশস্ত হইবে।

করের স্বপক্ষে যুক্তি সমূহ

এই করের বিপক্ষে বলা হয় যে, ইহাতে ধনী ব্যক্তিদের বিনিয়োগের ইচ্ছা হ্রাস হইবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, (ক) অধিক সরকারী বিনিয়োগ এবং (খ) অধিক ভোগপ্রবণতার দরুণ সমাজে মোট বিনিয়োগ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইবে। অবশ্য কিছু কিছু

বিপক্ষে যুক্তি সমূহ

প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। মূল্যবান ধাতু ও অলংকারের মারফৎ এই কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইবে।

কর অনুসন্ধানী কমিশন বলিযাছেন যে, সরকারের উচিত বর্তমান নিম্নতম করমুক্তির সীমা আরও নিচে নামাইয়া দেওয়া। কমিশন দানকর প্রবর্তন করা পছন্দ না করিলেও বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে ২ বৎসরের স্থলে ৫ বৎসরের মধ্যে দান-এর উপর কর ধার্য করা উচিত। এই করের প্রয়োগ-পদ্ধতি ও ফলাফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বাড়িয়া চলিলে করের হার বাড়ান উচিত।

কর-কমিশনের সুপারিশ

আবশ্যিক সঞ্চয়-আমানত পরিকল্পনা (Compulsory Savings Deposit Scheme)

প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন, এই দুইটি উদ্দেশ্যে জাতির সম্মুখে এখন প্রধান দায়িত্ব হইল সঞ্চয় বাড়ানো এবং সেই সঞ্চিত মূলধন রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া। ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশে এই দুই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারে এমন পরিমাণ মূলধন 'স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের' মাধ্যমে রাষ্ট্রের হাতে আসিয়া পৌঁছায় না। এইজন্য রাষ্ট্রের হাতে সঞ্চয় বৃদ্ধির তিনটি উপায় আছে: করনীতি, মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো এবং বাধ্যতামূলক জমা (Compulsory deposit)। এখন এই তিনটি উপায়কেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

রাষ্ট্রের হাতে সঞ্চয় বাড়াইবার তিনটি পথ

বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও অধিক কর বসাইলে তাহা কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়-স্পৃহাকে কমাইয়া দিবে। করদাতাগণ যদি করের বোঝা ক্রেতাগণের উপর চাপাইতে পারেন তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হইবে। সর্বপ্রকার জিনিসের যোগান কম থাকার দরুণ প্রতিনিয়ত এইরূপই স্বাভাবিকভাবে ঘটিতেছে।

১। কর

সঞ্চয় বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার মুদ্রাস্ফীতি। বাজারে নতুন টাকার যোগান দিয়া রাষ্ট্র দেশের উপকরণের বহুলাংশ কিনিয়া লইয়া ব্যক্তির ব্যবহার হইতে সরাইয়া লইতে পারে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এইগুলিকে নিযুক্ত করিতে পারে। রাষ্ট্র এইভাবে জনসাধারণকে উপকরণ ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিকে ঠেকানো যায় না। কারণ সরকার উপকরণগুলি কিনিয়া লইলে জনসাধারণের হাতে যে নূতন ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে তাহার চাপে দামস্তর

২। মুদ্রাস্ফীতি

বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেকটি সম্পদ বা উপকরণের দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, বাজারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং জনগণের মনে হতাশা সঞ্চারিত হইতে থাকে।

৩। আবশ্যিক সঞ্চয়

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের একটি অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে এবং পাঁচ বৎসর পরে সুদসহ ঐ টাকা রাষ্ট্র ফিরাইয়া দিবে। যদিও এই ধরনের সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যাপারে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, তথাপি তত্ত্বগতভাবে এই ব্যবস্থাকে অন্য দুইটির তুলনায় অনেক বেশি সার্থক বলিয়া মনে করা যায়।

এই পরিকল্পনায় ব্যক্তির সঞ্চয় কমিয়া গেলেও সম্পদ কমে না। করের ন্যায় ইহাতে যে টাকা তাহার হাত হইতে চলিয়া গেল সেই টাকার উপর মালিকানা চিরকালের জন্য চলিযা যায় না; অথচ বর্তমানে এই পরিকল্পনার যাহা মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ, ভোগপ্রবণতাকে কমাইয়া দেওয়া, ইহাও সফল হয়। আবশ্যিক সঞ্চয়ের ফলে ব্যক্তি দরিদ্র হয় না, বরং সঞ্চয় বাড়ে বলিযা ধনী হয় এবং ভোগও একটি নির্দিষ্ট স্তরের উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। সমাজে ভোগের স্তরকে সংযত রাখিলে একদিকে সরকারের নিকট যে মূলধন সংগৃহীত হইবে তাহাকে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের কার্যে সার্থকভাবে ব্যবহৃত করিতে পারিবে। অন্যদিকে জাতীয় সংকটের মুহূর্তে দাম-স্তরকে রক্ষা করিবে। তদুপরি জনসাধারণের মনে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের কার্যে সক্রিয় সহযোগিতার চেতনাবোধ জাগ্রত করিবে।

ইহার পক্ষে কি যুক্তি

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখানো হইয়া থাকে যে ইহার ফলে আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নামিয়া যাইবে। কারণ ইহা দ্বারা ভোগের স্তর নামিয়া গেলে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং স্বভাবতই এই ক্ষেত্রে আয় ও কর্মসংস্থান কম হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। ইহা মনে রাখা উচিত যে জনগণের নিকট হইতে যে অর্থ রাষ্ট্র 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের' মাধ্যমে সংগ্রহ করিল তাহা নিশ্চয়ই সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবে না, বরং 'উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাতে' সেই অর্থ নিযুক্ত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের স্তরকে বাড়াইয়া দিবে। তাই ভোগের স্তরকে কমাইলেও আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নামিবে না, দেশের সঞ্চয়ও কমিয়া যাইবে না। উপরন্তু প্রচুর উৎপাদক-দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরবর্তী স্তরে নূতন সম্পদ

সৃষ্টি করিবে।[৫] যে নতুন আয়ও সম্পদের সৃষ্টি হইবে উহার কিয়দংশ রাষ্ট্র সুদসহ জনগণকে ফেরৎ দিতে পারিবে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিপক্ষেও কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রথমত, ইহা ধরিয়াই লওয়া হয় যে, ইহা একপ্রকার জবরদস্তি ঋণ হইলেও রাষ্ট্র এই টাকা লইলে প্রকারান্তরে 'সঞ্চয়' হইল। কিন্তু যাহারা এখনই ভোগের নিম্নতম স্তরে আছে সেই নিম্ন আয়-স্তরের লোকেরা এখন কি করিবে? সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। অতএব হয় তাহাকে ঘটিবাটি বিক্রয় করিতে হইবে অথবা অন্যের নিকট ঋণ করিয়া চালাইতে হইবে। আর যাহারা একেবারে নিম্ন-আয়-স্তরের লোক নহে, অর্থাৎ যাহারা কিছু পরিমাণ সঞ্চয় আপনা হইতেই করে, তাহদের যদি আবশ্যিক সঞ্চয়ে টাকা জমা দিতে হয় তাহা হইলে কিন্তু দেশের মোট মূলধন সমানই থাকে। শুধু যাহা ছিল ইচ্ছাপ্রণোদিত জমা (voluntary), তাহার রূপ পালটাইয়া হয় বাধ্যতামূলক জমা (compulsory)। যে সকল মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকেরা আয়কর দিতেছেন তাহাদের ইচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা জীবন-বীমার প্রিমিযাম বাবদ কোনো কনসেশন দেওয়া হয না। তাঁহারাও নতুন কোনো সঞ্চয় না করিয়া ঐ সঞ্চয়কেই 'আবিশ্যিক সঞ্চযে' রূপান্তরিত করিবেন। অতএব 'আবশ্যিক সঞ্চয় পরিকল্পনা' প্রকৃতই দেশের মোট সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে পারিবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আবশ্যিক-সঞ্চয় পরিকল্পনা আয়-বণ্টনের বৈষম্য কমায় এই যুক্তিও অস্বীকৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র নিম্ন-আয় স্তরের ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই স্কীম প্রযোজ্য হইতেছে, বলিয়া এই স্কীম প্রগতিবিরোধী চরিত্রের। অধোগতিমূলক করের তুলনায় এই পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত ভাল—কারণ ইহাতে তাহার সঞ্চিত অর্থের উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে, অবশ্য সরকার যদি ভবিষ্যতে প্রগতিমূলক করের মাধ্যমেই দেয় অর্থ উঠাইতে পারেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যে বাড়তি করের বোঝা ঘাড়ে চাপিবে তাহা যে অধোগতিমূলক হইবে না—এমন নিশ্চয়তাই কোথায়? ভবিষ্যতে যদি এইরূপ অধোগতিমূলক কর অথবা ঘাটতি ব্যয়-এর দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ দিতে হয়—তাহা হইলে আর এমন দাবী করা চলে না যে আবশ্যিক সঞ্চয় অধোগতিমূলক কর অপেক্ষা উন্নত। উহাদের মধ্যে এইটুকুই মাত্র ব্যবধান যে কোনটির ক্ষেত্রে এখনই এবং কোনোটির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ব্যক্তির উপর এই বোঝা আসিবা পড়িবে।

ইহার বিপক্ষে কি যুক্তি

সর্বোপরি, আবশ্যিক সঞ্চয়ে মোট সংগ্রহের তুলনায় ইহার সংগ্রহ ব্যয় খুব বেশি। ইহার প্রশাসনিক দুর্বলতা এই নীতির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা জোরালো যুক্তি। অবশ্য তুরস্ক, ঘানা, বৃটিশ গায়না এবং অন্যান্য কয়েকটি অনুন্নত দেশ আবশ্যিক সঞ্চয়ের এই নীতি অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণত, ঐ সকল দেশে আয়করের সহিত একই সঙ্গে অথবা মার্কেটিং বোর্ডের নিকট হইতে নগদ মূল্যে শস্য (cash crop) কিনিবার কালে ঐ জমা সংগৃহীত হয়। অধ্যাপক কালডরের মতে "যে দেশ উন্নয়নের সেই স্তরে পৌঁছিয়াছে যেখানে জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ কর দেয় অথবা দেশের কেন্দ্রীয় মার্কেটিং বোর্ড নির্দিষ্ট দামে সেই দেশের কোনো প্রধান শস্য (cash crop) কিনিয়া লয় একমাত্র তখনই সেই দেশে বাধ্যতামূলক-সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রচলিত হওয়া উচিত।"

ভারতের কর-কাঠামো ও তাহার বৈশিষ্ট্য (Indian Tax-structure and its characteristics)

ভারতের বর্তমান কর-কাঠামো বহুদিন যাবৎ ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা অনেক বিবর্তনের ফল। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এদেশে দুই ধরনের কর প্রচলিত ছিল, ভূমি-রাজস্ব এবং দ্রব্যসামগ্রীর চলাচলের উপর কর। প্রথম যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও এই দুইটি করের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ক্রমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং আমদানি-রপ্তানি শুল্ক গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। ভূমিরাজস্ব ছাড়া ভারতের প্রথম প্রত্যক্ষ কর স্থাপিত হয় ১৮৬০ সালে, কয়েক ধরনের জীবিকার উপর এই কর আরোপিত হয়। ১৮৭৫ সালে এই ধরনের কর বাদ দেওয়া হয়, পরে আবার প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইহা আরোপিত হইয়াছিল। দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকায় আবগারি শুল্ক আরোপিত হইল, বর্তমানে ইহা আমদানি-রপ্তানি শুল্কের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২২ সালে আয়কর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত হয়।

কোন ধরনের কর লইয়া কর কাঠামো গঠিত

বর্তমানে যৌথ কোম্পানীসমূহের আয়ের উপর কর, অর্থাৎ করপোরেশন কর পৃথকভাবে বসান আছে। উভয়ে মিলিয়া এখন সরকারী আয়ের সর্ববৃহৎ উৎস। দেশের মধ্যে মালচলাচলের উপর কর এখন আর আরোপিত নাই, তবে কোন কোন মিউনিসিপালিটি এখনও নিজ এলাকায় কোন কোন দ্রব্য সামগ্রীর

আগমন ও নির্গমনের উপর কর আদায় করেন (ootroi)। দেশে কর কাঠামোর অপর একটি স্তম্ভ হইল বিক্রয় কর, বর্তমানে ইহা ভারতের রাজ্য-সরকারগুলির আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ইহা এখন ভূমি রাজস্ব হইতেও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল প্রধান কর ছাড়া দেশে আরও কতকগুলি অপ্রধান কর আছে যেমন ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলা, বিদ্যুৎ-ব্যবহার প্রভৃতির উপর কর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দুইটি নূতন ধরনের কর ভারতে প্রচলিত হয়: উত্তরাধিকার কর ও মূলধনী লাভ কর। বর্তমানে ডাঃ ক্যালডরের সুপারিশক্রমে ব্যক্তির উপর ব্যয়কর, সম্পদকর ও দানকর আরোপিত হইয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে ব্যয়কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল বিভিন্ন কর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কেহ না কেহ আরোপ করেন এবং আদায় করেন। ভারতের নূতন সংবিধান সকল করকে পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন: (ক) কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল কর আরোপ করেন, আদায় করেন, এবং ভোগ করেন, যেমন আমদানি-রপ্তানি শুল্ক; (খ) কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল কর আরোপ করেন ও আদায় করেন, কিন্তু কিছু অংশ রাজ্যসরকারগুলিকে দেন, যেমন আয়কর এবং কোন কোন দ্রব্যের উপর আবগারি কর; (গ) কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল কর আরোপ করেন ও আদায় করেন, কিন্তু যাহার নীট আদায় কেবলমাত্র রাজ্যসরকারগুলির মধ্যেই ভাগ হইয়া যায়, যেমন উত্তরাধিকার কর; (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল কর আরোপ করেন কিন্তু রাজ্যসরকার যাহাদের আদায় ও ভোগ করেন, এবং (ঙ) রাজ্যসরকার যে সকল কর আরোপ, আদায় ও ভোগ করেন যেমন ভূমি রাজস্ব, বিক্রয় কর, মাদক দ্রব্যাদির উপর কর প্রভৃতি। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রপতি এক একটি ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করিয়া বিভিন্ন করের বণ্টনযোগ্য অংশ সম্পর্কে সুপারিশ করেন; বর্তমানে ১৯৬২ সালের তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ চলিতেছে।

ইহাদের সংবিধান শ্রেণীবিভাগ

উপরে বর্ণিত ভারতের এই কর-কাঠামো কেবলমাত্র ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি; দেশে এই কর-কাঠামোর প্রভাব বা অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক চরিত্র বুঝিতে গেলে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা দরকার। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মতে ভারতের মোট কর-আদায়ের পরিমাণ বর্তমানে তাহার জাতীয় আয়ের ৮·৯%

মাত্র, নূতন কর আরোপন এবং করহার বৃদ্ধির ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার পরিমাণ হইবে ১১·৪%। এত কম পরিমাণ কর আদায়ের কারণ দুইটি: ভারতে মাথাপিছু আয়ের বা উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণই কম, এবং কর-ফাঁকির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। জাতীয় আয়ের আরও অধিক অংশ সঞ্চয় না-হইলে এবং করের সাহায্যে সরকারের হাতে চলিয়া না আসিলে পরিকল্পনার প্রসার ঘটান যাইবে না, দেশেও স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে পৌঁছিতে পারিবে না। ইংলণ্ড, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহলের মোট কর-আদায়ের সহিত জাতীয় আয়ের অনুপাত হইল যথাক্রমে ৩৫, ২৩, ২২ এবং ২০। কর অনুসন্ধানী কমিশনের মতেও, **"Indian taxation on the basis of its existing structure and rates has not fully tapped the taxable resources of the country."**

১। জাতীয় আয়ের সহিত অনুপাত কম

আমাদের কর কাঠামোর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল দেশের জনসংখ্যার অতি কম অংশ করের আওতার মধ্যে আসে। জনসংখ্যার ১% এর ⅓ ভাগ প্রত্যক্ষ কর দেয়, কিন্তু উন্নত শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে জনসংখ্যার ৩০% হইতে ৫০% ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করের অধীন।*

তৃতীয়ত, আমাদের মোট কর-পরিমাণের মধ্যে প্রায় ২৮% আসে প্রত্যক্ষ কর হইতে এবং ১৭% আসে আমদানি-শুল্ক হইতে। আবগারি শুল্ক হইতে প্রভূত অংশ পাওয়া যায়, এবং যে সকল দ্রব্যের উপর আবগারি শুল্ক আরোপিত উহা সাধারণত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরাই ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য অপূর্ণোন্নত দেশে বেশির ভাগ লোকের মাথাপিছু আয় কম বলিয়া এইরূপ অবস্থা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি করের আওতার মধ্যে আসে বলিয়া তাহাদের কর-ভারও বেশি। এই কারণে ভারতে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কর আরোপন, অর্থাৎ পরোক্ষ করের উপর এত বেশি জোর দেওয়া হয় যাহাতে কর-প্রদানকারী লোকের সংখ্যা বাড়ানো চলে।

২। করদাতার সংখ্যা কম;

৩। পরোক্ষ করের প্রয়োগ বেশি

* **"In a total population of 370 millions, the number of assesses for direct taxation is less than one-third of the one percent in India, whereas in advanced industrial countries 30 to 50 percent of the population are the assessees to direct taxes."** *A. D. Shroff*, **The New Pattern of Taxation (1963). P. 10.**

ভারতের 'কর-কাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে অর্থ সংগ্রহ করার পক্ষে কতটা উপযোগী? ইহার বর্তমান রূপ কি উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করিতে পারে? উন্নয়নমূলক কর-কাঠামো ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। যে কর-কাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে সাহায্য করিতে পারে তাহার তিনটি প্রধান লক্ষ্য থাকে। (ক) এমন কতকগুলি কর লইয়া সেই কাঠামো গঠিত থাকিবে যাহারা বর্ধিত আর্থিক আয়ের বৃহদাংশ রাষ্ট্রের হাতে সরাইয়া লইয়া আসিতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে সকলের হাতেই কিছু বেশি টাকা আয় হইতে থাকে, দেশে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে আর্থিক আয় বাড়াইয়া উপকরণগুলিকে পরিকল্পনার কাজে টানিয়া আনা দরকাব হয়। এই বাড়্তি আর্থিক আয় যদি করের সাহায্যে ছাঁকিয়া তোলা না যায়, তবে নিশ্চয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে, পরিকল্পনাব কাজ ব্যাহত হইবে এবং উন্নয়নের বেগ হ্রাস পাইবে। ভারতের কর-কাঠামোতে এমন ধবনেব করের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বিভিন্ন আয়স্তরের মধ্যে সেই করগুলিব প্রান্তিক হার এমন যে বর্ধিত আযের বেশির ভাগ রাষ্ট্রের হাতে চলিযা আসিতে পাবে। কর-ফাঁকির পরিমাণ বিপুল, কর-আদায় ব্যবস্থা বা কর-শাসন কাঠামোর যোগ্যতাও কম। উন্নয়নের যুগে বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে আয়-বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি, যেমন অধিক জমির মালিকদের। অথচ আমাদের কৃষি আয়কর কাঠামো এমন অনুন্নত যে এই বর্ধিত আয় উপযুক্ত-ভাবে তুলিয়া লওয়া সম্ভব হইতেছে না। এই সকল কারণে ভারতের কর-কাঠামো মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে সক্ষম হইতেছে না। (খ) দ্বিতীয়ত, উন্নয়নমূলক কর-কাঠামোর অপর লক্ষণ হইল যেন রাষ্ট্রীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সরকারের হাতে ক্রমশ বেশি পরিমাণ টাকা চলিয়া আসিতে থাকে, অথচ বেসরকারী ব্যবসাদারদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা হ্রাস না পায়। ভারতের কর-কাঠামোতে বেসরকারী ব্যবসাদারদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনেক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যেমন 'কর-ছুটি' (tax holiday), মুনাফা মূলধন হিসাবে খাটাইলে কম হারে কর আদায় প্রভৃতি। এই সকল সুযোগের মধ্য দিয়া বেসরকারী ক্ষেত্র লাভবান হইতেছে এবং স্বাস্থ্য কর ফাঁকি দিবার প্রেরণা

এই করকাঠামো কতটা উন্নয়নে সাহায্য করে?

১। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে পারে না

২। সরকারের হাতে বেশি টাকা আসিতে পারে না

লাভ করায় সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপযোগী টাকা সংগৃহীত হইতে পারিতেছে না। (গ) তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নমূলক কর-কাঠামোর আর একটি লক্ষণ হইল অনুৎপাদক শ্রেণীর আসল আয় ক্রমাগত কমাইয়া উৎপাদক শ্রেণীর আসল আয় বাড়াইতে সাহায্য করা। অর্থাৎ কর-কাঠামো এমন থাকিবে যাহাতে সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর উপর করভার (burden of tax) বেশি, কিন্তু শ্রমজীবি জনসাধারণের উপর করভার কম। আমাদের দেশে মোট কর আদায়ের মধ্যে পরোক্ষ করের অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মুদ্রাস্ফীতিতে বিব্রত শ্রমজীবি জনসাধারণের উপরই ক্রমশ অধিক করভার চাপান হইতেছে। আমদানি শুল্ক ও আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে বিলাসদ্রব্যাদির উপর আরও অধিক হারে কর আরোপ করিয়া প্রযোজনীয় দ্রব্যাদির উপর কর-হার লাঘব করিলে এই ত্রুটি দূর হইতে পাবে। শ্রমজীবি জনসাধারণ যাহাতে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে আসল আয় বাড়াইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিযা কর-কাঠামোতে এইরূপ পবিবর্তন আনা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা চলে। আমাদের শিল্পপতিদেব বা কোম্পানী-সমূহের উপর কব যতই বৃদ্ধি হইতেছে ততই তাহারা সেই কর ভোগকারী বা ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করিযা দিতেছে। দাম বাড়াইয়া, কাঁচামালের দাম কমাইয়া, উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি সত্ত্বেও মজুরদের মজুরি না বাড়াইয়া, শিল্পপতিরা নীট মুনাফার পরিমাণ বাড়াইয়া চলিযাছে। এইরূপে করের প্রকৃত ভার বা করপাত জনসাধারণের উপর বর্তাইতেছে। করবৃদ্ধি এবং দ্রব্যাদির দামে বৃদ্ধি, এই উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে ইহা দেখা যাইবে। বর্ধিত করভার প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ক্রেতা জণসাধারন বহন করিতে বাধ্য হইতেছে।* এই সকল কারণে আমরা বলিতে পারি যে আদায়ের পরিমাণ, শ্রমজীবিদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং করভারের ন্যায়সংগত বণ্টন কোনদিক হইতেই ভারতের বর্তমান কর কাঠামো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে উপযোগী নয়।

৩। করভার শ্রমজীবি জনসাধারণের উপর বর্তাইতেছে

সম্প্রতি ভারতের কর-কাঠামো সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে আমাদের কর-কাঠামো একান্ত অস্থিতিস্থাপক। ১৯৫১-৫২ সাল

---

* G. N. Arora, *Taxation and Industry.*

হইতে ১৯৫৭-৫৯ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ পরিকল্পনাকালের প্রথম সাতবৎসর পর্যন্ত হিসাব করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় করগুলির স্থিতিস্থাপকতা মাত্র ০·৬১৩, আর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির একত্রে হিসাব করিলে ইহা হইল ০·৮৩৩। অর্থাৎ জাতীয় আয় ১% বৃদ্ধি পাইলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর একত্রে বৃদ্ধি পায় মাত্র ০·৮৩৩ এবং কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কর বাড়ে ০·৬১৩। ইহা কোন সুদক্ষ কর-কাঠামোর লক্ষণ নয়। কর কাঠামোর ক্রমবর্ধনশীলতা (progressiveness) প্রমাণিত হয় যদি স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশি হয়। অনুন্নত দেশের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ক্রমশ বর্ধিত আয়ের অধিকতর অংশ রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসা খুবই দরকার। আমাদের কর-কাঠামোর মধ্যে উন্নয়নের উপযোগী এইরূপ অঙ্গলগ্ন-নমনীয়তা বা স্থিতিস্থাপকতা দরকার। নূতন কর আরোপ করার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বাধা খুবই বেশি। করব্যবস্থার ভিত্তি প্রসারিত করা তাই সর্বদা সম্ভব হয় না। কিন্তু কর কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন করের প্রান্তিক হার এমনভাবে সাজান দরকার যাহাতে এইরূপ অঙ্গলগ্ন নমনীয়তা বা স্থিতিস্থাপকতা (Built-in flexibility or elasticity) দেখা দেয়।* একমাত্র তাহা হইলেই ভারতের কর-কাঠামো উন্নয়নমূলক অর্থসংগ্রহের উপযোগী হইয়া উঠিতে পারে।

স্থিতিস্থাপকতা নিতান্ত কম

* "When a country passes from a stage of comparative backwardness in economic development to one of self-sustaining growth and economic maturity, it does so mainly by using part of the funds that arise in the process of economic development as increments in national income resulting from economic growth. The tax system is a major instrument for the mobilisation of these funds. It must be noted, however, that there are severe political and administrative limitations on the extent to which additional taxation by way of either expansion of tax bases or increase in tax rates or imposition of new taxes can be resorted to for increasing the flow of tax receipts. For enlarging tax receipts, therefore, the tax system will have to rely largely on its built-in flexibility. The structure of the tax-system should be such that an increasing proportion of the increments to national income gets automatically syphoned off into the public exchequer without involving any additional tax effort on the part of the government." *V. K. R. V. Rao*, Preface to *Indian Tax Structure and Economic Development, by Sahota.* P, *xxiii—xxiv.*

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের উৎস হিসাবে করপদ্ধতি
(Taxation as a source of Development Finance)

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে করপদ্ধতির সর্বাধিক প্রয়োগ সকলেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। অর্থসংগ্রহের প্রতিটি পদ্ধতিই বিশেষভাবে ব্যবহার করা কর্তব্য, কিন্তু কর ব্যতীত অন্যান্য উৎসের অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র সরকারী ক্ষেত্র নয়, বেসরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগের উদ্দেশ্যেও অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হয়, তাই কর পদ্ধতির সাহায্যে এমনভাবে অর্থ তোলা দরকার যাহাতে উন্নয়নের উপকরণগুলি সরকারী আয়ত্তে আসে আবার বেসরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অত্যন্ত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।*

করপদ্ধতির গুরুত্ব অনেক। উন্নয়নের দরুন সমাজে যে আর্থিক আয় দেখা দিতে থাকে, উহা তুলিয়া না লইলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। করের সাহায্যে ব্যয়ের স্রোতধারা সংকুচিত করিয়া মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক (gap) ছোট করা চলে। সরকার যদি নিজে বিনিয়োগ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইতে চান, তবে নূতন টাকা ছাপানো অপেক্ষা অধিকতর কর আদায় করা ভাল। সমাজে যন্ত্রপাতি, মাটি, মানুষ, ইট, কাঠ প্রভৃতি উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যদি বাহির হইতে টাকা ঢালিয়া উন্নয়নের চেষ্টা হয়, তবে সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উহাদের লইয়া টানাটানি চলিবে, উহাদের দাম বাড়িয়া মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। উহাপেক্ষা, করের সাহায্যে কিছু অর্থ সরকার নিজের হাতে তুলিয়া লইলে বেসরকারী ক্ষেত্র এই সকল উপকরণ কিছুটা কম কিনিতে পারিবে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা অনেকটা হ্রাস পাইবে। দাম-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পদ্ধতি অপেক্ষা করপদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিতে (physical controls) ক্রেতার স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে সংকুচিত থাকে। সর্বোপরি,

* "In underdeveloped countries, where Government has decided to step up on its own rate of investment, it is very important to ensure that the resources are canalized into the government sector in such a way that the private incentives to invest and to produce are harmed the least." I. S. Gulati. *Capital Taxation in a Developing Economy*. P. 71.

করের মাধ্যমে প্রত্যেকের প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী উন্নয়নের ব্যয়ভার বহন করা চলে।

এই সকল কারণ ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় করের ব্যবহার আরও অনেক কারণে গ্রহণযোগ্য। সমাজে ব্যক্তিদের হাতে বিক্ষিপ্তভাবে যে সঞ্চয় ঘটে, তাহা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিতে হইলে ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত পন্থা নাই। অপূর্ণোন্নত দেশে আয়-বৈষম্যের পারিধি খুবই বিস্তৃত, উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত বিলাসসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় উন্নয়ন ঘটায় না, উহার প্রদর্শন-প্রভাবে (demonstration effect) সঞ্চয়াকাঙ্ক্ষা ও উৎপাদনী মনোবল হ্রাস পায়। উপরন্তু ইহারা প্রধানত বিদেশ হইতে আমদানি হয়, ফলে লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল থাকে, এবং দুষ্প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রার অপচয় ঘটে। কিন্তু কর-পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে যে আয়বণ্টন ঘটে (redistribution of income) তাহাতে এই সকল দোষত্রুটি অনেকটা দূরীভূত হয়। মূলধনী দ্রব্য আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়, আয়বণ্টনের দরুন আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হয়, শিল্পপ্রসারের পথ প্রশস্ত হয়।

করপদ্ধতি প্রয়োগের অসুবিধাগুলির কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইহারাই এই পদ্ধতির কার্য-পরিধি ও সীমা (scope and limits) নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতেছে। উচ্চ আয়-শ্রেণীর ভোগ সংকুচিত করিতে পারিলে ইহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য হয়, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক সময় কর-পদ্ধতির দরুন দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণের ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। অনেক সময় ধনী ব্যক্তিদের ভোগ সংকোচন না ঘটিয়া তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ও ইচ্ছা হ্রাস পায়, সমাজে উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ কমিয়া যায়। ফলে কর আদায়ের দরুন যে অর্থ সরকারের হাতে আসিল দেশের মোট বিনিয়োগে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটান যায় না। তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশে অর্থসম্পর্ক-বিরহিত যে লেনদেন চলে অর্থনৈতিক কাঠামোর সেই অংশে (non-monetised sector) সাধারণ কর-পদ্ধতি পৌঁছিতে পারে না। সর্বোপরি, এই সকল দেশে শিক্ষার অভাব ও চারিত্রিক উন্নতির মান নিচু থাকায় কর-শাসন কাঠামো বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

করপদ্ধতির এই সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইহাকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে অনেকটা সুফল দেখা দিতে পারে। ধনীদের আয়ের মধ্যে

সঞ্চয় ছাড়াও বিলাস দ্রব্যাদিতে ব্যয়ের অংশ বিশেষ কম নয়; করের সাহায্যে এই প্রদর্শনীয় ভোগের (conspicuous consumption) কিছু অংশ নিশ্চয় কমাইয়া ফেলা চলে। ধনীদের হাত হইতে তাহাদের সঞ্চয়ের কিছু অংশ সরকারের হাতে লইয়া আসা প্রয়োজন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাতে থাকিলে এই সঞ্চয় সমাজের দিক হইতে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মূলধনরূপে না-ও নিযুক্ত হইতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়াইবার উদ্দেশ্যেও করপদ্ধতি ব্যবহৃত হইতে পারে—বিশেষ ধরনের কর-আরোপণ, কর-অব্যাহতি এবং কর-হার নির্ধারণের মধ্য দিয়া এই উদ্দেশ্যে সফল করা সম্ভব। তাহা ছাড়া, অনেকেই বলেন যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর উচ্চ করহারের বিরূপ প্রভাবের কথা যতটা বলা হয়, বাস্তবে ইহা তত তীব্র নয়।

কর-কাঠামো সম্পর্কে অল্প কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। অপূর্ণোন্নত দেশে প্রত্যক্ষ করের আঁওতায় বেশিসংখ্যক ব্যক্তিকে আনা যায় না, কারণ উচ্চ আয়ের গণ্ডীতে করদাতার সংখ্যা সাধারণত সীমাবদ্ধ। তবুও এমন ধরনের প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা দরকার যাহা আয়বৈষম্য দূর করিতে সাহায্য করে, সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী আয়বণ্টনে সাহায্য করে এবং প্রদর্শনীয় ভোগ কমাইয়া দেয়। অপরপক্ষে, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভর করিলে উন্নয়নের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা যায় না, তাই পরোক্ষ কর ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। রপ্তানির উপর উচ্চ হারে আরোপণ করিলে দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইতে পারে। অপূর্ণোন্নত দেশের রপ্তানি দ্রব্যগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একচেটিয়া অধিকার দেখা দেয়, যেমন পেট্রোল, রবার ইত্যাদি, সুতরাং রপ্তানি শুল্ক হইতে প্রভূত আয়ও হইতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে বাড়তি আয় বিক্ষিপ্তভাবে ব্যক্তিদের হাতে সৃষ্ট হইতে থাকে পরোক্ষ করের সাহায্যে তাহা ছাঁকিয়া লওয়া সম্ভবপর। প্রত্যক্ষ করের সু-উচ্চ প্রান্তিক হার ব্যক্তির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে ব্যাহত করে, কিন্তু পরোক্ষ করের মোট করভার বেশি হইলেও এইরূপ বিরূপ প্রভাব দেখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে কর-আরোপণের আয়-প্রভাব এবং পরিবর্ত-প্রভাব আমরা আলোচনা করিতে পারি। কর-আরোপণের আয়-প্রভাব (income-effect) নির্ভর করে বিভিন্ন করের সাহায্যে মোট কত টাকা তুলিয়া লওয়া হইল তাহার উপরে, এবং পরিবর্ত প্রভাব (substitution-effect) নির্ভর করে

কর-সমূহের প্রান্তিক হার-এর উপর। মোট করভার বাড়িলে লোকের জীবনযাত্রার মান আহত হয়; অর্থাৎ, করের এইরূপ আয়-প্রভাবের দরুন লোকে অধিক পরিশ্রম ও আয় করিতে চেষ্টা করে। অপরপক্ষে করের পরিবর্ত-প্রভাব লোকের কর্মপ্রেরণাকে কমাইয়া দেয়, অধিকতর পরিশ্রম করিয়া আয় বাড়াইবার পরিবর্তে তাহারা অধিকতর বিশ্রাম পছন্দ করে (substitute leisure for work)। তাই করসমূহের প্রান্তিক হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, ইহার ফলে সরকারী রাজস্বের যে ঘাটতি দেখা দিবে তাহা পূরণ করা প্রয়োজন কর-কাঠামোর ভিত্তিকে প্রসারিত করিয়া এবং নূতন ধরনের কর আরোপ করিয়া।

দেশরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য অর্থসংগ্রহ ও বিবিধ সমস্যা (Resources for Defence and Development and various problems)

ভারত-চীন সংঘর্ষের প্রধান অর্থনৈতিক তাৎপর্য ভারতকে আগামী কয়েক বৎসর যাবৎ দেশরক্ষাখাতে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ব্যয় করিতে হইবে। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাদের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক স্তরে তুলিতে হইবে। সৈন্য ও মাল চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট ও সংযোজন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৯৬২-৬৩ সালে দেশরক্ষাখাতে ধরা হইয়াছিল ৩৬০ কোটি টাকা। ভবিষ্যতের বৎসরগুলিতে দেশরক্ষাখাতে এই ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ দ্বিগুণ রাখিতে হইবে বলিয়া ধরা যায়। দেশরক্ষা বিষয়ে অতীতের অসম্পূর্ণতাগুলি দূর করিতেও বেশ কিছু অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। মোটামুটি হিসাবে বলা চলে আক্রমণের পর তৃতীয় পরিকল্পনাকালে স্বাভাবিক পরিমাণের অতিরিক্ত আরও ১৫০০ কোটি টাকা দেশরক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। কথা হইল, যদি আমরা দেশরক্ষা ও উন্নয়ন একই সঙ্গে চালাইতে চাই, তবে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উপরে এই টাকা আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে।

দেশরক্ষার জন্য অতিরিক্ত কত টাকা তুলিতে হইবে

তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থসংগ্রহের উৎসগুলি এই প্রসঙ্গে মনে করা দরকার। এই উৎসগুলি হইল (কোটি টাকার হিসাবে): (ক) সরকারী উদ্যোগগুলি হইতে উদ্বৃত্ত এবং ব্যালান্স ১৩৭৫: (খ) জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ-

স্বল্প সঞ্চয় এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি জমা ১৬৬৫ ; (গ) অতিরিক্ত কর আদায় ১৭১০ ; (ঘ) বৈদেশিক সাহায্য ২২০০ ; (ঙ) ঘাটতি ব্যয় ৫৫০ ; এই উৎসগুলির মধ্যে প্রথমটি হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফল, অর্থাৎ যে অবস্থায় আমরা তৃতীয় পরিকল্পনা সুরু করিয়াছি, ইহা বাড়ান আর আমাদের সাধ্যের মধ্যে নাই। বৈদেশিক সাহায্য হইতে আয়ও আলোচনার বাহিরে রাখা উচিত, কারণ উহাও আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, পরিমাণও অনিশ্চিত। তাই তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যে আমাদের ১৫০০ কোটি টাকা তোলার জন্য বাকি তিনটি উৎসেব উপর নির্ভব করিতে হইবে : (১) আভ্যন্তরীণ ঋণ ও সঞ্চয, (২) অতিবিক্ত কব আদায এবং (৩) ঘাট্‌তি ব্যয়।

এই অর্থের জন্য কোন্ উৎসগুলির উপর আমাদের নির্ভরতা

অতিরিক্ত কব আদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার তুলিবে ১১০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়া ৬১০ কোটি টাকা। গত তিন বৎসরের বাজেটে কেন্দ্রীয সরকার যে ভাবে কর হার বৃদ্ধি করিযাছেন তাহাতে কেন্দ্রীয সবকারের লক্ষ্য ছাপাইয়া বহুদূর অগ্রসর হইবে। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি তিন বৎসবে তাহাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যের অর্ধেক পূবণ করিতে পারিয়াছেন মাত্র। সুতরাং দেশরক্ষার জন্য অতিরিক্ত কর আরোপণ করিতে হইলে উহার দায়িত্ব প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকাবকেই বহন কবিতে হইবে।

১। অতিবিক্ত কব প্রধানত কেন্দ্রেব ভার

আমরা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের করগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি : (ক) আয় ও ব্যয়ের উপর ; (খ) সম্পত্তি ও মূলধনের লেনদেনের উপর (গ) দ্রব্যসামগ্রীর উপর। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দুইটি প্রধান উৎস হইল করপোরেশন কর এবং আয় কর। করপোরেশন কর হইতে আদায় গত কয়েক বৎসরে বিপুল বাড়িয়া গিয়াছে (১৯৫৬-৫৭ সালে ছিল ৫১ কোটি, ১৯৬২-৬৩ তে হয ১৭৯ কোটি), কিন্তু আয়কর হইতে আদায় বাড়ে নাই বলিলেই চলে (ঐ সময়ের মধ্যে ১৫২ কোটি হইতে ১৬৩ কোটি)। ব্যয় কর হইতে বৎসরে ১ কোটি টাকার বেশি কখনও পাওয়া যায় নাই, বর্তমানে ইহা তুলিয়া দেওযা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করগুলির অর্থাৎ সম্পত্তি ও মূলধনেব লেনদেনের উপর করগুলির গুরুত্ব অনেক কম। তবুও উল্লেখ করা চলে যে উত্তরাধিকার কর

(ক) আয় ও ব্যয় কর হইতে সম্ভাবনা কিরূপ

(খ) সম্পত্তি ও সম্পদ কর হইতে ?

হইতে আয় ক্রমশ বাড়িতেছে, কিন্তু সম্পদ কর হইতে আদায়ের কোনো নির্দিষ্ট গতি পাওয়া যায় না। তৃতীয় শ্রেণীর করগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ: কাষ্টমস ও এক্সাইজ (আবগারি)। এই দুই শ্রেণীর কর হইতে আদায়ের গতি অনেকটা পৃথক। কাষ্টমস্ হইতে আদায় বাড়িযাছে খুবই ধীরগতিতে (১৯৫৬ ৫৭ সালেব ১৭৩ কোটি হইতে ১৯৬২ ৬৩ তে ২০০ কোটি); কিন্তু আবগারি হইতে আদায় অতি দ্রুতগতিতে (১৯০ কোটি হইতে ৫২৬ কোটিতে)। সুতরাং বর্তমানের ধরন সম্পূর্ণ বজায় বাখিলে কেন্দ্রীয সবকাবকে আরও অর্থ তুলিবার জন্য স্বভাবতই এই দুইটি উৎসেব, অর্থাৎ কবপোবেশন কব ও আবগারিব উপর ভবসা কবিতে হইবে।

(গ) কাষ্টমস্ ও এক্সাইজ

ঠিক একইভাবে, রাজ্যসবকাবগুলিব বাজেট বিশ্লেষণ কবিলে আমরা দেখিব কৃষি আযকরেব বিশেষ গুরুত্ব নাই (৬ কোটি হইতে ৮ কোটি), ভূমিবাজস্ব অনড ও অচল (৯৩ কোটি হইতে ১০৩ কোটি), বিক্রযকবই প্রধান (৭১ কোটি হইতে ১৬৬ কোটি), পেট্রল ও মোটর গাড়ীব উপব কবও অনেকটা প্রসারমান (২৩ কোটি হইতে ৬১ কোটি)। ইহা ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইল প্রমোদ কব, বিদ্যুৎ কর এবং অপবাপব দ্রব্যসামগ্রীব উপব কব। ভাবতেব কর-কাঠামো, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে উভয ক্ষেত্রেই, প্রধানত দ্রব্যসামগ্রীর উপব কবের উপর ক্রমশ বেশি নির্ভব কবিতেছে।

রাজ্য সবকারগুলির আযেব উৎসসমূহের অবস্থা কি

এই অবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে আমবা প্রত্যক্ষ কব বাডাইবাব জন্য কয়েকটি সুপাবিশ করিতে পাবি। প্রথমত, ভাবতে আমবা অর্থনৈতিক উন্নযনেব এমন স্তরে পৌঁছিযাছি যখন কৃষি-আযকে পৃথক বলিয়া গণ্য কবার এবং উহাব প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার দিন চলিযা গিযাছে। উহাকে এখন কেন্দ্রীয সরকারের শাসনাধীনে আনিযা ফেলা দরকার। দ্বিতীযত, আয়করের মধ্যেস্তরের হার-কাঠামো (rate structure) আরও উঁচুতে তোলা উচিত। এতদিন উহাতে বহু বাধা ছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে ঐ সকল বাধা আর ততটা কার্যকরী হইবে না। তৃতীযত, এতদিন যাবৎ জরুবী অবস্থা চলিলেও কর-ফাঁকি বন্ধ হয় নাই, ধনীদের অত্যুচ্চ ব্যয়ের মাত্রাও বিশেষ হ্রাস পায় নাই। শেয়ার বাজার এবং সোনারূপার বাজারের হালচালে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ-

কি করা যায়?
(ক) প্রত্যক্ষ করেব সম্পর্কে

যোগ্য অর্থের পরিমাণও বিশেষ কম নাই। এই সকল বন্ধ করার জন্য সঠিক পথে কার্যকরী উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই জন্য সর্বপ্রথমে দরকার আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করা। কর-অনুসন্ধানী কমিশন বলিয়াছিলেন উহা গড় পারিবারিক আযের তিবিশগুণ ধার্য করা উচিত। বর্তমানের অবস্থায়, আমাদের মতে, উহা কখনই বিশগুণের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। করপোরেশন করের হারও আরও বাড়ান উচিত বলিযা অনেকে মনে কবেন।

(খ) পরোক্ষ করের সম্পর্কে

প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলাইযা উহাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিলেও দ্রব্যসামগ্রীব উপব কর-ভার বৃদ্ধি করিতেই হইবে। দ্রব্যের উপর কব-আরোপণের যুক্তি হইল উহার দামের মধ্যে যে একচেটিযা মুনাফার অংশ থাকে তাহার কিছুটা রাষ্ট্রের হাতে তুলিযা লওযা। কিন্তু বাস্তবে ঐ একচেটিযার দরুণও কর অপসবণ (shifting) সম্ভব হয এবং দাম বাডাইযা ক্রেতাদের উপর কর ভার চাপান হয। তাই জরুবী অবস্থাব পবিপ্রেক্ষিতে বাষ্ট্রেব কর্তব্য জীবনধারণের প্রযোজনীয দ্রব্যাদিব বণ্টন নিজ হাতে তুলিযা লওযা। মাদক বর্জন নীতি পবিহাব কবা এবং লবণ কবেব পুনরাবোপণ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

২। ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় প্রভৃতি ও
৩। ঘাট্‌তি ব্যয

অর্থসংগ্রহেব দ্বিতীয সম্ভাব্য উৎস আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ, স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রভৃতি। দেশে সঞ্চয বাডাইবাব চেষ্টা প্রসারের সত্যসত্যই প্রচুর সুযোগ আছে। ইহার মূল কথা দেশেব ক্রেতারা ভোগ্য দ্রব্যের ক্রয যতদূব সম্ভব কমাইযা দিবে, ফলে ভোগ্যদ্রব্যেব উৎপাদনে দেশের উপকরণ আর ততটা নিযোজিত হইবে না। এই বিষযে কতকগুলি নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভাল হয। লোকেবা যে বিভিন্ন পরিমাণে এবং বিভিন্ন রূপে আয করে উহাদের সহিত সামঞ্জস্য বাখিযা স্বল্প সঞ্চয় বাড়াইবার পদ্ধতি-গুলির রূপ স্থির হওযা দরকার। এই পদ্ধতিগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যে উহারা প্রত্যক্ষ ও সবল। সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে বক্ষিত হওয়া দরকার যেন সঞ্চযকারী উহা দেখিতে পায এবং সঞ্চযের ঐ সকল পদ্ধতি তাহার পূর্ব হইতেই সুপরিচিত থাকে। প্রযোজনের সময়ে সে যেন উহা হইতে কিছু অংশ অন্তত তুলিয়া লইতে পারে। তৃতীয় উৎস ঘাট্‌তি ব্যয় সম্পর্কে বলা চলে যে এই উৎস যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল।

এতক্ষণের আলোচনা হইতে মনে হইতে পারে যে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের

একমাত্র সমস্যা হইল কিরূপে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায়। সমস্যা কেবল ইহাই নয়। অর্থ সংগ্রহের ফলে এবং দেশরক্ষা ও উন্নয়নের দরুন সেই বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে সমাজের নানাদিকে কষ্ট ও চাপ দেখা দেয়, অর্থাৎ কতকগুলি দিকে ভারসাম্যহীনতার সূত্রপাত হয়। কর এবং ঋণের বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করিয়া যাহাদের নিকট হইতে টাকা তোলা হইল, দেশরক্ষার ব্যয়ের টাকা ঠিক যদি তাহাদেরই হাতে গিয়া এবং সমান পরিমাণে উপস্থিত হইত, তবে কোন সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু তাহা কখনই হয় না। যে-পরিমাণে দেশরক্ষার দরুন নূতন ব্যয় হইবে, ঠিক সেই পরিমাণে ভোগব্যয় সংকুচিত করার দরকার। একমাত্র তবেই কোনরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে না। কিন্তু সকল শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তোলা গেল না বলিয়া এবং কোন কোন শ্রেণীর হাতে বেশি টাকা গেল বলিয়া কোন কোন দ্রব্যের যোগান ও দামের উপর বিশেষ বা আংশিক চাপ দেখা দিতে পারে। অর্থ সংগ্রহের সমস্যা পূর্ণরূপে মিটিলেও দ্রব্যসামগ্রীর ভোগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ তাই এই অবস্থায় কোন মতে এড়ান যায় না।

সমস্যা কেবল টাকার নয়

১। দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন ও ভোগনিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার যে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের মধ্যে বিরোধ যতটা গভীর মনে করা হয়, আসলে এই বিরোধিতা ততটা তীব্র নয়। আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান দিক শিল্পপ্রসার এবং তাহার জন্য মূল ও ভারী শিল্পের উপর সর্বদা জোর দেওয়া। আমাদের দেশরক্ষার জন্যও শিল্পপ্রসার প্রয়োজন। দেশরক্ষার জন্য যে শিল্পগুলি প্রধানত প্রয়োজন, আমাদের পরিকল্পনার মোটামুটি অগ্রাধিকার-তালিকাও তাই। কেবল কয়েকটিমাত্র ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অগ্রাধিকার তালিকায় সামান্য রদবদল দরকার হইতে পারে। তৃতীয়ত, দেশের কোন কোন কারখানাতে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেশরক্ষার সরঞ্জাম উৎপাদন সুরু হইতে পারে; অথবা, সেই ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে না দিয়া সরাসরি সৈন্যসামন্তদের জন্য লওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় স্বভাবতই ভোগ্যদ্রব্যের কিছু কিছু ঘাটতি দেখা দিবে। অনেক দ্রব্য রাষ্ট্রের নিজের উৎপাদন না করিলে চলিবে না, কারণ ব্যক্তিক্ষেত্র তত দ্রুত উহা যোগান দিতে পারিতেছে না। এই সকল কারণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার উৎপাদন ও

২। অগ্রাধিকার-তালিকায় উপযুক্ত রদবদল

ব্যবসায় উভয় দিকেই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের দামকাঠামোর ভরকেন্দ্র হইল খাদ্যের দাম। খাদ্যের যোগান লইয়া ফাট্‌কাবাজি সুরু হইয়াছে, অবস্থা ঘোরালো হইয়াছে। আর দেরী না করিয়া এখনই "লেভী" প্রথায় উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহ এবং নির্দিষ্ট দামে সহরাঞ্চলে বিক্রয়ের উপযোগী সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩। সরকারী বাণিজ্য

চতুর্থত, এই অবস্থায় সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট দাম-নীতি থাকা দরকার। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি কার্যকরী করিলে তবেই এইরূপ নির্দিষ্ট দাম বজায় রাখা সম্ভব। অস্পষ্টভাবে দাম স্তর সমান রাখার কথা বলিলেই সমস্যার কোন সমাধান হয় না। তাহা ছাড়া দামস্তর বাড়িবে না এইরূপ নীতি গ্রহণ করাও এই অবস্থায় বিপদ-জনক। কোন কোন দ্রব্যের দামকে বাড়িতে দিতে হইবে, যাহাতে ঐ দ্রব্যগুলি জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়, এবং উহাদের সরবরাহের হাতে লইয়া আসা যায়। আবার কোন কোন দ্রব্যের দাম, যেমন নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দাম, অনেকটা কমান দরকার। পছন্দমত ও প্রয়োজনমত দ্রব্যাদির দাম কমাইবার এই সকল নীতি কার্যকরী করার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৪। সুনির্দিষ্ট দামনীতি ও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান

উপরের এই সকল প্রয়োজন হইতে বোঝা যায় যে আমাদের সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বদল না করিলে দেশরক্ষা ও উন্নয়ন একই যোগে সফল হইতে পারে না। পরিকল্পনা বলিলে বোঝা যায় দেশের উন্নয়নের জন্য বুদ্ধি-দীপ্ত, সুসংহত সুশৃংখলার সহিত সকলের মিলিত প্রচেষ্টা। ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের হার সম্প্রতি এত কমিয়া গিয়াছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উহা কিছুই নয়। পুরানো বেকারি জমিয়া রহিয়াছে, নূতন বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। কৃষির বেশির ভাগ অংশে অচলায়তন অবস্থা। এই অবস্থায় বিপুল দেশরক্ষার ব্যয় করিতে গেলে স্বভাবতই সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ খুবই বেশি হওয়া দরকার। সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবই জনসাধারণের মধ্যে শৃংখলার অভাব আনে। নিয়ন্ত্রণই এই অবস্থায় সমাজের শৃংখলারক্ষা করিতে পারে। সমাজতন্ত্রের দিকে আরও

মূল কথা—অর্থনৈতিক নীতিতে পরিবর্তন আনা—সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া

দ্রুত অগ্রসর না হইলে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের সমস্যা এই সকল কারণেই কোন মতে সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

অনুশীলনী

1. Argue the case *for* and *against* the imposition of Death Duties in India. (C. U. B. Com. 1953 ; B. A. 1953)

2. Discuss, in the light of their incidence and effect, the justifiability of the existing central excise duties in India. (C. U. B. Com. 1954)

3. Examine the arguments for and against the imposition of Estate Duty in India. (C. U. B. Com. 1954 ; B. A. 1953)

4. Discuss the scope and importance of income-tax in India. (C. U. B. Com. 1951 ; 1956)

5. Examine the role of excise duties in the Indian Tax system.

6. Critically examine the main features of the wealth Tax and the Expenditure Tax recently introduced in India.

7. Discuss the question of imposing an inheritance tax in India. (C. U. B. A. 1952)

8. Describe the main features of the Estate Duty Act, 1953, which has been recently passed in India (C. U. B. A. 1954)

9. Examine the part played by customs and excise duties in the Indian Revenue system. (C. U. B. A. 1954)

10. Examine the case for and against the imposition of the Expenditure Tax and the Wealth Tax in India. (C. U. B. A. 1959)

11. State the case for and against the introduction of the Capital Gains Tax or the Expenditure Tax in India.

12. Describe the recent changes in India's Tax Structure.

13. Give an account of the principal changes made in recent years in the system of taxation in this country.

14. Indicate the main features of the Indian Income Tax and consider the desirability of supplementing it by other direct taxes.

15. "The need for financing the five year plans has caused farreaching changes in the Indian Tax structure." Comment.

16. How far is the present tax structure in India effective in encouraging rapid economic development ?

17. Write short notes on Compulsory Savings Deposit Scheme, 1963.

18. Examine the case for a capital gains tax in the context of India's economic development.

৩০

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

First Five Year Plan

স্বাধীনতার পূর্বে পরিকল্পনার প্রচেষ্টা (Attempts for Planning before Independence) :

১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব এবং উহার পরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্য রুশ জনসাধারণের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে আগ্রহ আনিয়া দিয়াছে। দেশের রাষ্ট্র সকল ব্যাপারে স্বাধীন না হইলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সময়ে দেশের জনসাধারণের সম্মুখে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য ঘোষিত হইয়াছিল, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি স্থাপিত হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে সকল শ্রেণীর দরিদ্র জনসাধারণের সমর্থন পাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ নীতি গৃহীত হইয়াছিল।

স্বাধীনতার পূর্বেই, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস দলের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীজহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায় এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রবিরোধী বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রচলিত থাকায় সেই কমিটি কোন সুগঠিত পরিকল্পনা গঠন করিতে পারে নাই, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সেই কমিটির কাজ আবদ্ধ ছিল।

কংগ্রেসের পরিকল্পনা

ভারতে পুঁজিতন্ত্রের দ্রুত বিকাশের উদ্দেশ্যে মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ইহা বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ সালে বোম্বাই হইতে কয়েকজন পুঁজিপতি মিলিয়া 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে একটি রূপরেখা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ১৫ বছরের মধ্যে ১০০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাথা-পিছু আয় দ্বিগুণ করা। উহার পরে

প্রকাশিত হয় এম্, এন্, রায়ের গণ পরিকল্পনা (People's Plan)। ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়া ১০ বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান ইহার লক্ষ্য ছিল। এই সময়ে ওয়ার্ধা হইতে শ্রী এস্, এম্, আগরওয়ালার 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনা' প্রকাশিত হয়। যন্ত্রশিল্পকে বাদ দিয়া প্রধানত কৃষি ও কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়া বিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার জন্য ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা এই পরিকল্পনাতে বলা হয়। যুদ্ধের সময় ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। একমাত্র স্বাধীনতা পাইবার পরেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের উপযোগী সম্ভাবনা গড়িয়া উঠে। কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায় এবং ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তিগুলি প্রবল থাকায় মূল্যবান কয়েকটি বৎসর বিনা পরিকল্পনাতেই কাটিয়া যায়। যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই ভারতের গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তাহারা 'বাজারের' শক্তির প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল; পুঁজির প্রভাবে উৎপাদন ও বিক্রয়-সংগঠন গঠিত হইতেছিল। যুদ্ধের মধ্যে বাজারে বিক্রয়ের জন্য 'পণ্য' উৎপাদন এবং কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাই গান্ধীবাদী পরিকল্পনা গ্রহণের বাস্তব অবস্থা দেশে ছিল না: শিল্পোন্নয়নই ভারতীয় ইতিহাসের পরবর্তী স্তর। ইতিমধ্যে কংগ্রেস দল পূর্ণ সমাজতন্ত্রের নীতি পরিত্যাগ করেন এবং শিল্পোন্নয়ন ও মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে আলাপ আলোচনার জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা রচিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকারে গৃহীত হয়।

বোম্বাই পরিকল্পনা

অন্যান্য পরিকল্পনা

প্রথম পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত সার (Summary of the First Plan):

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল ধরা হইয়াছিল। চূড়ান্ত পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সরকারীক্ষেত্রে ২০৬৮·৮ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক ব্যয় ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকার নূতন বিনিয়োগ করা হইবে ইহা স্থির হইয়াছিল। পরে পরিবর্তিত করিয়া সরকারী

টাকার হিসাব

ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ ২৩৭৮ কোটি টাকা হইবে এইরূপ ধরা হইয়াছিল। সরকারীক্ষেত্রে উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে কত ব্যয় স্থির হইয়াছিল এবং তাহা মোট ব্যয়ের কত অংশ তাহা তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল :

বিষয়	কোটি টাকা	শতকরা কত অংশ
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৩৫৪	১৪.৯
জলসেচ ও বিদ্যুৎ	৬৪৮	২৭.২
শিল্প ও খনি	১৮৮	৭.৯
পরিবহন ও সংযোজন	৫৭১	২৪.০
সমাজসেবা ও পুনর্বাসন	৫৩২	২২.৪
বিবিধ	৮৬	৩.৬
মোট	২৩৭৮	১০০

সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যোগ্য সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ কোথা হইতে আসিবে, তাহা পরিকল্পনায় বলা হয় নাই, ১৭০৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিচে ইহা তালিকার আকারে দেওয়া হইল :

চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	৫৬৮ কোটি টাকা
রেলওয়ে উদ্বৃত্ত	১৭০ " "
জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	১১৫ " "
স্বল্প সঞ্চয় প্রভৃতি	২৭০ " "
সরকারের নিকট জমা প্রভৃতি	১৩৫ " "
বিদেশী সাহায্য	১৫৬ " "
ঘাটতি ব্যয়	২৯০ " "
মোট	১৭০৪ " "

আরও ৬৭৪ কোটি টাকা কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে সেই সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলা ছিল না। বলা হইয়াছিল যে আরও বিদেশী সাহায্য, আভ্যন্তরীণ করবৃদ্ধি বা ঋণ সংগ্রহ এবং ঘাটতি ব্যয় হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইবে।*

* "This gap has to be met from further external resources, or in the absence of it, by additional taxation and borrowing and from deficit financing." —*First Five Year Plan.*

এইরূপ ব্যয় করিতে থাকিলে পাঁচ বছরে (১৯৫৬ সালের প্রথমে) ভারতের জাতীয় আয় ১০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে ইহা বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ সালে ৯০০০ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১০০০০ কোটি টাকায় পরিণত হইবে (অর্থাৎ ১১% বৃদ্ধি পাইবে)। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, বর্ধিত আয়ের ২০% যদি লোকেরা সঞ্চয় করে এবং বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করে, তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ অব্যাহত থাকিতে পারিবে। ফলে, মোট জাতীয় আয় বাৎসরিক ২% হারে বাড়িলেও সমাজের মোট ভোগব্যয় ততদূর বাড়িতে পারিবে না। তাহা ছাড়া, ইতিমধ্যে জনসংখ্যাও কিছু বাড়িবে তাই মাথা-পিছু আয় ততটা বৃদ্ধি পাইবে না। তাই বলা হইয়াছিল, প্রথম পরিকল্পনাতেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান খুব বেশি উন্নত হইবে না, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন-যোগ্যতা (production potential) বৃদ্ধি পাইবে।

জাতীয় আয় ও মাথা-পিছু আয়ের উপর ইহার প্রভাব

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কৃষি (First Five year plan and Agriculture) :

প্রথম পরিকল্পনার কার্যসূচীর অগ্রাধিকার তালিকা (schedule of priorities) বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কৃষির উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। মোট ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ৩৫৪ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ ও সেচ খাতে ৬৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। অর্থাৎ মোট ১০০১ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের ৪২.১%) বরাদ্দ হইয়াছিল কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। ভারতের কৃষি যাহাতে প্রকৃতির খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করিয়া না থাকে সেইজন্য মোট ব্যয়ের প্রায় ২১% জলসেচের কার্যে খাটান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, বলা হইয়াছিল যে মোট জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রের (irrigated area) পরিমাণ ৫ কোটি একর হইতে বাড়িয়া ৬.৯৭ কোটি একর হইবে।

কৃষির উপর গুরুত্ব ও বরাদ্দের হিসাব

জলসেচ ছাড়াও প্রথম পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কারের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া প্রকৃত চাষীর

নিজের হাতে জমি ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছিল। বড় চাষীরা নিজেরা জমি চাষ করে না, তাই একজন চাষী কি-পরিমাণ জমি নিজের মালিকানায় রাখিতে পারে তাহার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছিল। ইহাতে গ্রামাঞ্চলের জমিদারী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ দূর হইবে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের হার কমিয়া আসিবে, রাষ্ট্রের সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। সমবায় সমিতি জোর করিয়া স্থাপিত হইবে না, তবে চাষীদের সমবায় সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়া হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল। নিম্নতম জমির পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিগুলির একত্রীকরণ করিতে হইবে, স্বাধীন চাষী ৫ হইতে ১০ বৎসরের জন্য জমি চাষের পরোয়ানা পাইবে। শ্রমের উপযুক্ত মূল্য যাহাতে পায় এইরূপ খাজনার হার স্থির করা হইবে, উৎপন্ন ফসলের ¼ বা ⅕ ভাগের বেশি খাজনার হার হইবে না—ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সকল নীতি ঘোষিত হইয়াছিল।

ভূমিসংস্কারের নীতিসমূহ

পরিকল্পনা কমিশন কৃষির উন্নয়নের জন্য আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যেমন বড় ছোট মাঝারি জলসেচ ব্যবস্থা, গবেষণা কাযের ফল প্রয়োগ করিয়া জমি উদ্ধার ও উহার প্রগাঢ়-চাষ করিতে হইবে। সমবায় গ্রামব্যবস্থা, সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা গড়িয়া তুলিতে হইবে, গ্রামবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি ঘটাইতে হইবে। কৃষির জন্য ঋণ, কৃষিদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজার প্রভৃতি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে; পশুপালন ও মিশ্র কৃষিকার্য (mixed farming) সংগঠিত করিতে হইবে। বনাঞ্চলের প্রসারণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, এবং মৎস্য চাষকেন্দ্র (fisheries) উন্নয়ন—এই সকল বিষয়ও পরিকল্পনা কমিশনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল কার্যসূচী সফল হইলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৪% বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনও পরিকল্পিত লক্ষ্যে (planned targets) পৌঁছাইতে পারিবে—এইরূপ বলা হইয়াছিল।

কৃষি উন্নয়নের অন্যান্য কর্মসূচী

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম পরিকল্পনায় অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এইরূপ গুরুত্ব আরোপ করার স্বপক্ষে কমিশন বহু যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। প্রথমত, ভারতের

অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তিই হইল কৃষিকার্য, জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক আসে কৃষি হইতে, শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক সরাসরি কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। গুরুত্বপূর্ণ সেই ভিত্তি সুদৃঢ় না করিয়া উহার উপরে বিরাট শিল্পের কাঠামো গড়িয়া তোলা যাইবে না। দ্বিতীয়ত, খাদ্যের উৎপাদন না বাড়াইলে শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, গ্রামাঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীদের এবং নূতন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদাও মিটান দরকার। সুতরাং কৃষির উপর জোর দেওয়া খুবই প্রয়োজন। তৃতীয়ত, দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম-কাঠামোর (price-structure) মধ্যে খাদ্যশস্যের দামই মুখ্য, উহার দামের পরিবর্তনের উপরই (অন্তত অপূর্ণোন্নত দেশে) অন্যান্য দ্রব্যের দামস্তরে উঠানামা নির্ভর করে। তাই খাদ্যশস্যের উৎপাদন না বাড়িলে উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে, আমদানি বাড়িয়া বৈদেশিক মুদ্রাসংকট বাড়িবে, এবং পরিকল্পনার ব্যয়-ভার বাড়িয়া যাইবে। চতুর্থত, অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো অংশে কিছুটা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি না হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বাড়ান সম্ভব হয় না। কৃষিতে কম মূলধনের সাহায্যে অল্প প্রচেষ্টাতেই বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সম্ভব, শিল্পক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বাড়াইতে হইলে প্রথমে অধিক মূলধন দরকার। সর্বোপরি, শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং সস্তায় মজুত পাইতে হইলে সর্বাগ্রে কৃষিক্ষেত্রের সংস্কার প্রযোজন।

এইরূপ নীতির পক্ষে কমিশনের যুক্তি

অনেকে অবশ্য কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া সঠিক হইয়াছে এইরূপ মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের অভাব আছে—কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা তাহার লক্ষণ। সুতরাং ভারসাম্য ফিরাইয়া আনার জন্য শিল্পের দ্রুত বিস্তার বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া, ভারতীয় কৃষির রূপ হইল জীবন-ধারণোপযোগী কৃষিকার্য (subsistence farming), এই স্তর হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে হইলে ছোট-খাট কৃষিসংস্কারের সাহায্যে সম্ভব হইবে না, ইহার জন্য দরকার যৌথখামার ব্যবস্থা, কৃষির যন্ত্রীকরণ, এবং মাটি ও মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা (productivity) বাড়ান। অল্প কিছু কৃষিসংস্কারের উপর জোর দিয়া তাই কোন লাভ নাই। সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের

এই নীতি সঠিক হইয়াছে বলা চলে না, কারণ শিল্পের অল্প কিছু প্রসারই কৃষির উন্নয়ন ঘটাইতে পারে

ভিত্তিই হইল কৃষির উন্নতি কিন্তু তাহার জন্য প্রথমে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপযোগী শিল্পের বিস্তার করা দরকার। প্রথম পরিকল্পনার সীমাবদ্ধ সাফল্য হইলেও দেশে দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি-প্রস্তুতি এই কারণেই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা ও শিল্প (The Plan and Industries)

বৃহৎ শিল্প, খনি ও শিল্পগবেষণা কার্যের জন্য ১৩৯ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৫.৮%) ধরা হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৪৯ কোটি টাকা (অর্থাৎ ২.১% খরচ হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল। অর্থাৎ বৃহৎ ও কুটিরশিল্প সকলে মিলিয়া মোট ১৮৮ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের ৮% ব্যয় হইবে এইরূপ ধার্য হইয়াছিল।*

সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ

সরকারী ক্ষেত্রে এই ব্যয় ছাড়াও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের জন্য ২৩৩ কোটি টাকা বিনিযোগ হইবে, কমিশন এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। কমিশন আরও বলিযাছিলেন যে, কারখানা ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। দৈনন্দিন কাজ চালাইবার উপযোগী পুঁজি (working capital) ও অন্যান্য হিসাব ধরিয়া ৭৫০ কোটি টাকা বেসরকারী ব্যবসাদারেরা বিনিয়োগ করিবে এইরূপ মনে করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন মনে করিয়াছিলেন যে ইহার মধ্যে ৬০০ কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যবসায়ীরা নিজেরাই সংগ্রহ করিবে এবং সরকার ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রকে সাহায্য করিবে।

বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ

পরিকল্পনা কমিশন শিল্পোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার নীতি (principle of priority) স্থির করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে মূলধনী ও উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পগুলির প্রসার করিতে হইবে, যেমন লৌহ ও ইস্পাত, এলুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সার উৎপাদনের কারখানা, ভারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও মেশিন টুল প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, প্রধান ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলি সম্বন্ধে (যেমন বস্ত্র, চিনি, সাবান, বনস্পতি, রং

শিল্পক্ষেত্রের অগ্রাধিকার নীতি

* অগ্রগতির রিপোর্ট (Progress Report) হইতে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১০০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। অনভিজ্ঞতা, দরকারী যন্ত্রপাতি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং সরকারী দীর্ঘসূত্রতা—এই সকল কারণে শিল্পসম্প্রসারণের কার্যসূচী সফল হয় নাই।

প্রভৃতি) স্থির হইল যে, নূতন কেন্দ্র স্থাপন না করিয়া বর্তমানে শিল্পগুলির অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার (unused capacity) পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। তৃতীয়ত, উৎপাদনের সেই সকল অংশে নূতন কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে উহাদের অভাব (rectifying the existing lacunae)। চতুর্থত, যে সকল শিল্পে কিছুটা মূলধনী ব্যয় করা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর ভরসা

সরকারী ক্ষেত্রে বহু নূতন নূতন শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা করা হইয়াছিল। একটি নূতন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা, মহীশূর মেশিন টুল কারখানা, সিন্ধ্রী সার উৎপাদন কারখানা, বিশাখাপত্তনম্-এ জাহাজ-নির্মাণ কারখানার উন্নতি, প্রভৃতি কাযসূচী গৃহীত হইয়াছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের ৮০% হইবে মূলধনী ও উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদনে, এইরূপ আশা করা হইয়াছিল। এইরূপে শিল্পের উন্নয়নের ভার বেসরকারী শিল্পমালিকদের উপরই প্রধানত অর্পণ করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ ৪২টি শিল্পের উন্নযনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারিত করিযা দিয়াছিলেন।

শিল্প সম্প্রসারণের এইরূপ কার্যসূচী স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর প্রথম পরিকল্পনায কোন জোর ছিল না। ইহার কারণ হিসাবে কমিশন বলেন, দেশে উদ্বৃত্ত বা মূলধন খুব কম থাকায় কৃষি ও জলসেচের জন্য ব্যয় করিয়া শিল্পের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। শিল্পের উপর আরও জোর দিতে হইলে ঘাটতি ব্যয অথবা করের হার, অথবা উভয়ই বাড়াইতে হইত, জনসাধারণের কষ্ট বাড়িয়া যাইত।

তাহাদের প্রসার ভালই হইয়াছে

প্রথম পরিকল্পনা কালের শেষে দেখা গিয়াছে, বেসরকারী শিল্প-মালিকেরা পরিকল্পনা কমিশনের নীতি অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন। সরকারী ঋণ উঠান সত্ত্বেও বাজার হইতে তাঁহারা মূলধন তুলিয়া বিনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন। ১৯৪৬ সালকে ১০০ ধরিয়া ১৯৫০ সালে শিল্পোৎপাদনের সূচক ছিল ১০৫, ১৯৫৫ সালে উহা দাঁড়াইয়াছে ১৬১।

প্রথম পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ (Financing the First Five Year Plan)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ২৩৭৮ কোটি

টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। অর্থের হিসাবে দাম দিয়াই বিভিন্ন কার্যে জমি শ্রম ও মূলধন খাটান হয়, তাই অর্থের হিসাবেই এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপযুক্ত এই ২৩৭৮ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? ঋণ করিয়া ও কর বাড়াইয়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলিয়া মোট ১২৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে। (ষ্টার্লিং ব্যালান্সের পরিবর্তে) ২৯০ কোটি টাকার নূতন নোট দেশে ছড়ান হইবে বা ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ৮৩০ কোটি টাকার ফাঁক (gap) রহিয়া গিয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে, বৈদেশিক সাহায্য অথবা আরও ঋণ অথবা আরও ঘাট্‌তি ব্যয়—এই সকল উপায়ে ফাঁক পূরণ করা হইবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে ঋণ সংগ্রহ ও কর স্থাপন (অর্থাৎ budgetary sources) দ্বারা ১২৭৭ কোটি টাকা এবং ২০৩ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ফলে নির্ধারিত ২৯০ কোটি টাকার স্থলে ৫৩২ কোটি টাকার মত ঘাট্‌তি ব্যয় করিতে হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংগ্রহের সূত্রগুলি

কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য অর্থসংগ্রহের চারিটি উপায় আছে—ঋণগ্রহণ, করস্থাপন, ঘাট্‌তি ব্যয়, ও বৈদেশিক সাহায্য। প্রথম পরিকল্পনায় উহাদের প্রত্যেকটি উপায় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা দরকার। (১) প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময়ে মূলধনের বা সঞ্চয়ের বাজার এত সংকুচিত ছিল যে, ঋণ সংগ্রহের ততটা সুবিধা দেখা দেয় নাই। পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে বাজার তেজী হওয়ায় পরিকল্পনার নির্ধারিত পরিমাণ হইতে মোট পাঁচ বৎসরে ৮৭ কোটি টাকা অধিক ঋণ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে; ১১৫ কোটির স্থলে ২০২ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের (প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রভৃতি) পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকার স্থলে ৩০৪ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় ঋণ গ্রহণ

(২) প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে করের সাহায্যে জাতীয় আয়ের ৬·৬% রাষ্ট্র তুলিয়া লইত, পরিকল্পনার শেষে ৭% তোলা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ মিলিয়া করবৃদ্ধির মোট পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে বলিতে হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে কর হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৬২৬ কোটি টাকা; ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার পরিমাণ হইল ৭৫০ কোটি টাকা; অর্থাৎ মাত্র ১২৪ কোটি টাকা

কর-আদায়

কর-আদায় বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য করের সাহায্যে আরও অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল।

(৩) অপূর্ণোন্নত দেশের শ্রমশক্তি ও উপকরণসমূহ প্রধানত অব্যবহৃত থাকে। এইরূপ অবস্থায় নূতন নোট ছাপাইয়া অর্থাৎ ঘাটতি ব্যয় করিয়া রাষ্ট্র নূতন নূতন শিল্প স্থাপন করিতে পারে। অব্যবহৃত উপকরণগুলির নিয়োগ ঘটে, ক্রমশ তাহাদের ব্যবহার হইতে থাকে; আয়, কর্ম-সংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন একই সঙ্গে ঘটিতে থাকে।* সুতরাং অপূর্ণোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয়-নীতি সীমাবদ্ধ-ভাবে সর্বদাই সমর্থনযোগ্য। এই ঘাটতি ব্যয়-নীতির প্রয়োগ-পদ্ধতি আমাদের জানা দরকার। শাসনখাতে বা মূলধনী খাতে ব্যয় অপেক্ষা রাষ্ট্রের আয় যখন কম পড়ে, তখন কর, ঋণ প্রভৃতির দ্বারা সম্ভব না হইলে রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ নেয়, অর্থাৎ নূতন নোট ছাপাইয়া এই ফাঁক পূরণ করে। ইহাকেই বলে ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি। দেশে নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও বাড়ে। এই বিনিয়োগের দ্বারা যদি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া যায় তবে মুদ্রাস্ফীতি হইবে না, কিন্তু তাহা না হইলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধির ফাঁক দেখা দিবে। তাই ঘাটতি ব্যয়-নীতি খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার: ইহাকে চালাইতে পারিলে ভালই, কিন্তু ইহা চালক হইলেই বিপদ।

ঘাটতি-ব্যয় কাহাকে বলে

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের নীতি বিশেষ সাবধানতার সহিত ও সীমাবদ্ধ পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ২৯০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছিল. ঠিক এই পরিমাণ ষ্টার্লিং ব্যালান্স ইংলণ্ড হইতে ফেরত পাওয়া যাইবে স্থির ছিল, কোনরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবার সম্ভাবনা ছিল না, পরিকল্পনার কাজ অব্যাহত থাকিবে এইরূপ ধরা হইয়াছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, (পরিবর্তিত হিসাবের) ৮৩০ কোটি টাকার ফাঁক

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ

* বর্তমানে সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক বিনিয়োগ করিলে ভবিষ্যতে নূতন আয় হইতে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইয়া পড়িবে।

পূরণ করিতে আরও কিছু ঘাটতি ব্যয় করা দরকার হইতে পারে। 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা'-তে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পরিকল্পনা-কালের মধ্যে মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৫৩২ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনার বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ

(৪) অপূর্ণোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈদেশিক সাহায্য পাইলে অনেকটা বৃদ্ধি পাইতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের দুইটি ফল: ইহার দ্বারা দেশে মূলধন আসে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবও অনেকটা মেটে। প্রথম পরিকল্পনায় বিদেশ হইতে মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি টাকা, উহার মধ্যে পাঁচ বৎসরে মোট ২০৩.২ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল (Achievements of the First Five Year Plan) :

প্রথম পরিকল্পনার শেষে পরিকল্পনা কমিশন একটি পর্যালোচনা (Review) প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে, এবং তৃতীয় পরিকল্পনার আলোচনাতে প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতির কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মোট ব্যয় কত হইয়াছে

১৯৫২ সালের প্রথমে স্থির হয় যে, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ২০৬৯ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। পরে পরিকল্পনা বাড়াইয়া ও অনেক প্রকার সংশোধন করিয়া উহার আয়তন ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হইল। পরিকল্পনার শেষে দেখা গিয়াছে যে, ইহার মধ্যে মোট ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। প্রায় সকল খাতেই এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ বিভিন্ন হারে কমিয়া গিয়াছে। নিচে সেই তালিকা দেওয়া হইল:

বিষয়	ব্যয়	শতকরা কত অংশ
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	২৯১	১৫
বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ	৩১০	১৬
শক্তি	২৬০	১৩
গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২
শিল্প ও খনি	৭৪	৪
পরিবহন ও সংযোজন	৫২৩	২৭
সমাজ সেবা ও বিবিধ	৪৫৯	২৩
	মোট ১৯৬০	১০০

এই ১৯৬০ কোটি টাকা মোট ব্যয়ের মধ্যে ১৫৬০ কোটি টাকার বিনিয়োগ। ইহা ব্যতীত বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ১৮০০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনায় দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৩৬০ কোটি টাকা।

পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় ১১% এর স্থলে ১৮% বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির অগ্রগতি সমান তালে হয় নাই। ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে, প্রধানত কৃষি উৎপাদন বাড়িবার দরুণই জাতীয় আয় অধিক হারে বাড়িয়াছে। তাহার পরের বৎসর বৃদ্ধির হার খুবই হ্রাস পাইযাছে। পরিকল্পনাকালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ১০·৫% বাড়িযাছে। মরসুম ভাল থাকায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে কতখানি পরিকল্পনার ফল বলা চলে তাহা বিচার করা দরকার।

জাতীয় আয় কিরূপ বাড়িয়াছে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির আলোচনায় প্রথমেই কৃষির কথা ধরা যাউক। ১৯৪৯ ৫০=১০০ ধরিয়া লইলে ১৯৫০-৫১ সালের কৃষি উৎপাদনের সূচক ছিল ৯৬ ; পরিকল্পনার শেষে ইহা হইযাছিল ১১৭। খাদ্যের উৎপাদন লক্ষ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে (প্রায় ২৪ লক্ষ টন অধিক); ৫ কোটি ২০ লক্ষ টন হইতে ৬-কোটি ৫০ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। তৈলবীজ তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বাড়িয়া লক্ষ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। পাট ও চিনির উৎপাদন বাড়িযাছে, কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই। জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রভৃতি লক্ষ্য ছাপাইয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কৃষিক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি

শিল্পের ক্ষেত্রে পাঁচবৎসরে উৎপাদন বাড়িয়াছে ৩৯%। পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় (১৯৫০ সালকে ১০০ ধরিলে) ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ১৩৯-তে পৌঁছিয়াছে। পরিকল্পনার লক্ষ্যের তুলনায় মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৪০ কোটি গজ বেশি হইয়াছে। চিনি, সেলাইকল, বাইসাইকেল, কাগজ ও কাগজের বোর্ড প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য ছাড়াইয়া গিয়াছে। উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন, যেমন সিমেণ্ট, ভারি রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন অনেকখানি বাড়িয়াছে। বহু নূতন নূতন দ্রব্যের উৎপাদন সুরু হইয়াছে এবং নূতন নূতন অনেক শিল্প স্থাপিত হইয়াছে, যেমন পেট্রল রিফাইনারি, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেলওয়ে ওয়াগন,

শিল্পের ক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি

পেনিসিলিন, ডি, ডি, টি প্রভৃতি। সিন্ধ্রির সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, টেলিফোন শিল্প, রেলবগি কারখানা প্রভৃতির অগ্রগতি সন্তোষজনক। তবে পরিকল্পিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, কাগজের কারখানা ও বিহারের সুপারফস্‌ফেট কারখানা পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই।

পরিবহনের ক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে পরিবহন ও সংযোজন খাতে মোট ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ৫২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং ৪৩০ মাইল রেল-পথের সংস্কার হইয়াছে। বিভিন্ন রাজপথগুলির সংযোজনে ৬৩৬ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে, ৩০টি বড় বড় পুল গঠিত হইয়াছে, বর্তমানের ৪০০০ মাইল রাস্তার সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

দামস্তর ও বাণিজ্য ব্যালান্স

এই সকল উৎপাদন বৃদ্ধির ফল দেখা দিয়াছে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর। ১৯৫২-৫৩ সালের দামস্তরকে ১০০ ধরিয়া লইলে পাইকারী দামস্তর ১৯৫০ সালে ছিল ১০৬'৪, উহা কমিয়া ১৯৫৭ সালে উহা হইয়াছে ৯৮'১। দেশে খাদ্য উৎপাদন বেশি হইয়াছে, পরিকল্পনায় শিল্পের উপর জোর না দেওয়ায় যন্ত্রপাতি আমদানি বাড়াইতে হয় নাই—ফলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দেয় নাই। কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন, মোট ২৯০ কোটি টাকার স্টার্লিং ব্যালান্স খরচ করা হইবে। কিন্তু ১৩৮ কোটি টাকার বেশি স্টার্লিং ব্যালান্স ব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই।

প্রথম পরিকল্পনার বিচার (Appraisal of the First Plan) :

সীমাবদ্ধ সাফল্য

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ছিল। যুদ্ধ ও দেশবিভাগজনিত অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, খাদ্য ও শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব, সরকারের নীতি কি হইবে সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা, যন্ত্রপাতি পুনঃসংস্কারের সমস্যা সকল কিছু মিলিয়া ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিল যাহাতে উন্নয়নের তীব্র গতিবেগ সুরু করা সম্ভব ছিল না। প্রথম পরিকল্পনাতে সকল বিষয়ের লক্ষ্য (targets) ছিল খুবই নিচুতে, অল্প আয়াসেই সেই লক্ষ্য-

সমূহে পৌঁছান তাই সম্ভব হইয়াছে। দুইটি ভাল মরসুমী বৃষ্টিপাত, প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়, উৎপাদন কাঠামোতে অব্যবহৃত শক্তির (কল-কারখানায়) পূর্ণ ব্যবহার, সরকারী খাতে কম ব্যয়ের পরিমাণ--এই সকল কারণে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট বা 'মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার এইরূপ সীমাবদ্ধ সাফল্য সত্ত্বেও এই পরিকল্পনার কৌশল (technique) ও প্রয়োগ (execution) বহুবিধ সমালোচনার বিষয়।

সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, প্রথম পরিকল্পনা গঠন করার সময়ে দেশের উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে এই পরিকল্পনা রচনা করা হয় নাই।

কেবল অর্থের হিসাবে পরিকল্পনা হয় না

কেবলমাত্র অর্থের হিসাবে আয় ব্যয়ের তালিকা সাজাইলে তাহাকে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বলা চলে না। অর্থের হিসাবে একটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নিখুঁত হইলেও দেশে বিভিন্ন উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ও ব্যালান্স সঠিক না রাখিলে পরিকল্পনা কখনই সফল হইতে পারে না। অনেকে তাই প্রথম পরিকল্পনাকে পাঁচ বৎসরে রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের তালিকা বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বলেন না।*

দ্বিতীয়ত, অর্থের হিসাবে গৃহীত হইলেও এই পরিকল্পনা অর্থের আয় ব্যয়ের দিক হইতেও সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই। ২৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ের স্থলে মাত্র ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। পরিকল্পনা কালের মধ্যে উদ্ভূত

বরাদ্দ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয় নাই

অতিরিক্ত আয়ের একপঞ্চমাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইবে, দেশের দুঃস্থ অবস্থার কথা মনে করিয়া পরিকল্পনা কমিশনের এতদূর আশা করা উচিত হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা, উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর বেহিসাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে কমিশনের পূর্বে চিন্তা করা উচিত ছিল।

তৃতীয়ত, কৃষির উপর জোর না দিয়া যে সকল শিল্প কৃষি উৎপাদন-বৃদ্ধির উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে, তাহাদের উপর জোর দেওয়া উচিত ছিল। সেইরূপ যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির যন্ত্রীকরণের

* **"We had rather an easy time in the First Five Year Plan, because really we had not stretched ourselves. We had not make any particular effort. We just took what was there and called it a plan."**

Jawaharlal Nehru.

দ্বারা কৃষিক্ষেত্র হইতে খাদ্য ও কাঁচামাল পাওয়া যাইত, কৃষিক্ষেত্রের অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা হইত। ছোট ছোট কৃষিসংস্কারের ফলে কৃষির উন্নতি উপযুক্ত পরিমাণে হয় নাই, এই সকল ব্যয় অতি সাধারণ খয়রাতি সাহায্যে পরিণত হইয়াছে। অথচ ইহার সাহায্যে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা চলিত।

কৃষির উপর অত জোর না দিয়া কৃষিযন্ত্রের উপর অধিক জোর দেওয়া উচিত ছিল

চতুর্থত, পরিকল্পনা কমিশন শিল্পোন্নতির প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর ছাড়িয়া দিয়া ভাল করেন নাই। কারণ, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার আরও দ্রুত হওয়া দরকার। কিন্তু কমিশন বেসরকারী ব্যবসাদারদের উপর ভার দিলেও বাজার হইতে নিজেরা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিযা তাহাদেব কার্যে বাধা দিয়াছেন। অনেক শিল্পপতির মতে ২৩৩ কোটি টাকার নূতন মূলধন এবং ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫০ কোটি টাকা—ইহার সাহায্যে বেসরকারী শিল্পের পরিকল্পিত লক্ষ্যে (planned targets) পৌঁছান যায় না।

বেসরকারী ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা দরকার ছিল

সর্বোপরি, প্রথম পরিকল্পনার সর্বাধিক ত্রুটি হইল জনসাধারণের উদ্বুদ্ধ করিতে না পারা, তাহাদের মধ্যে উদ্দীপনা, চেতনা ও নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন কাঠামো গড়িয়া না তোলা। পরিকল্পনার কাজ হইল সমগ্র সমাজ-মানসকে একাগ্রভাবে সঞ্চালিত করা, যাহাতে পরিকল্পনার স্বয়ংচালিত গতি সৃষ্টি হয়, কর্মোদ্যোগের ধারক ও বাহক শক্তি নিজেই নিজেকে চালনা করিতে পারে। প্রথম পরিকল্পনায় এই গণ-উদ্যোগের গতিবেগ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। এই-খানেই ইহার প্রধান অসাফল্য।

গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি হয় নাই

অনুশীলনী

1. Give an outline of the main features of the First Five Year Plan prepared by the Indian planning commission. (C. U. B. A. 1952)

2. The Five Year plan has accorded the highest priority to agriculture. How far do you think this emphasis on agriculture justified?

3. Comment on the programme of industrial development in the First Five Year Plan for India. How is this programme proposed to be financed?
(C. U. B. A. 1954)

4. Describe and comment upon the manner in which the Planning commission have proposed to finance the First Five Year Plan.
(C. U. B. A. 1955)

5. Account for the emphasis placed in the First Five Year Plan upon agriculture and irrigation. How far would you like to shift this emphasis in the Second Five Year Plan. (C. U. B. A. 1956)

6. Give a brief survey of the progress of the Indian economy during the First Five Year Plan. (C. U. B. A. 1957; B. Com. 1956)

৩১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

The Second Five Year Plan

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার (A Summary of the Second Five Year Plan) :

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনাব ফলাফল এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সাহসী। ইহা আকারে বড় এবং প্রকৃতিতেও বহুলাংশে বৈজ্ঞানিক। প্রথম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নেব যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা তাহাকেই অগ্রসর করিতে উদ্যোগী হইল। প্রধানত মূল ও ভারী শিল্পেব উপর জোর দিয়া দ্রুত শিল্প বিস্তার না করিলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যাইবে না—এই সত্য স্বীকার করিযা দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি সাধারণ লক্ষ ছিল : (ক) জাতীয় আযে প্রতি বৎসর ৫% বৃদ্ধি ; (খ) পাঁচ বৎসবে ১ কোটি হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া বেকারির পরিমাণ কমান, (গ) মূল ও ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া দ্রুততর শিল্পবিস্তার। (ঘ) আয়বৈষম্য কমাইয়া অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত করা। অর্থনৈতিক উন্নযনের ফল যাহাতে কযেকজন ব্যক্তিব হাতে কেন্দ্রীভূত না হইযা সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বাড়াইযা তোলে ইহাই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যগুলি পরস্পর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

দেশের জনশক্তি অব্যবহৃত থাকিলে জাতীয় সম্পদের উৎপাদন বাড়িতে পারে না, এইরূপ বেকারি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজও গড়িয়া তুলিতে পারে না। জাতীয় আয় বৎসরে ৫% হারে বাড়াইতে হইলে খনিজ দ্রব্য, মূল ও ভারী শিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে প্রভূত অর্থব্যয় করা দরকার, কেবলমাত্র কৃষির

উৎপাদন বাড়াইয়া এই হারে জাতীয় আয় বাড়ান চলে না। সুতরাং এই সকল লক্ষ্য একে অন্যের পরিপূরক।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কৌশল (basic strategy) হইল কৃষির তুলনায় শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং এইরূপ ভারসাম্যবিহীন উন্নয়নের (unbalanced growth) পথে অগ্রসর হওয়া। শিল্পের মধ্যেও সকল প্রকার শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত হইবে না, ভোগ্য-দ্রব্যের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের, অর্থাৎ মূল ও ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইবে। মোট বরাদ্দের প্রায় শতকরা ১৮ ভাগই এই সকল দ্রব্যের উৎপাদনে খাটান হইবে। বৃহৎ শিল্প, শিল্প গবেষণা ও খনিজ দ্রব্যের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইয়াছিল ৬৯০ কোটি টাকা।

শিল্পের উপর গুরুত্ব

ভারসাম্যবিহীন উন্নয়নের পথে (path of unbalanced growth) অগ্রসর হওয়ার মূল পদ্ধতিই হইল মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া। এই সকল শিল্পের উপর জোর দিলে দেশে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপযোগী কলকারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিবে, ভবিষ্যতে কৃষির পুনঃসংগঠন করা চলিবে, এবং কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সরাইয়া আনা চলিবে। শিল্পের প্রসার হইলেই কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে প্রসারিত হইবে, ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে তাহা কৃষিজাত দ্রব্যের দামস্তর কমাইবে না।

মূল ও ভারি শিল্পের উপর

এই সকল মূল ও ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর মূলধন দরকার, কিন্তু সেই তুলনায় ইহাতে জনশক্তির নিযোগ কম হয়। প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা হইলে লোকের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়ে, ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সকল বিনিয়োগের ধরন এমন যে, ইহাতে বর্তমানেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে না। তাই দেশে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার গুরুভার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদন বাড়াইতে তুলনামূলকভাবে মূলধন প্রয়োজন হয় কম, দরিদ্র দেশের পক্ষে তাই এই পদ্ধতি ভাল। তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন-পদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় (labour-intensive); কম মূলধন খাটাইয়া অধিক সংখ্যক শ্রমিক ইহাতে নিয়োগ করা চলে। মূল ও ভারি শিল্পের উপর

জোর দিয়া দেশের শিল্প-ভিত্তি (industrial base) গড়িয়া তুলিতে কুটির শিল্প এইরূপে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবে। ভারতের গ্রামগুলিতে অপূর্ণ নিয়োগের পরিমাণ বেশি, কৃষি-কাঠামোর মধ্যে ও বাহিরে সমাজের শ্রমশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। বৎসরের অধিক সময়ে তাহাদের কাজ নাই, কাজ থাকিলে উহার পরিমাণ কম, কৃষকের শারীরিক ও মানসিক শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পের সাহায্যে এই সম্ভাব্য সম্পদ উৎপাদনকারী শ্রমশক্তিকে (potential wealth-producing labour-power) উৎপাদনের কার্যে খাটাইতে পারিলে ভোগ্যদ্রব্যের অভাব মেটে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর এই সকল অংশ হইতে সঞ্চয় বা বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে। অপূর্ণোন্নত ও জনবহুল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই মূল কৌশলের উপর ভিত্তি করিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

দ্রুত শিল্প উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা

অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জড়তা নাশ করিয়া উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে কিরূপ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা আলোচিত হইল:

ব্যয় বরাদ্দ

বিষয়	বরাদ্দ ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে)	মোট ব্যয়ের শতকরা কত অংশ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	১১·৮
২। জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	৯১৩	১৯·৯
৩। শিল্প ও খনি	৮৯০	১৮·৫
৪। পরিবহন ও সংযোজন	১৩৮৫	২৮·৮
৫। সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন	৯৪৫	১৯·৭
বিবিধ	৯৯	২·১
মোট	৪৮০০	১০০

এই ব্যয়বরাদ্দের খাতগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। মোট ব্যয়ের অর্ধেক বরাদ্দ হইয়াছিল শিল্প, খনি, পরিবহন ও সংযোজন-এর

উপর। প্রথম পরিকল্পনায় ইহাদের মিলিত অংশ ছিল ⅓ ভাগ। শক্তি-উৎপাদনকে শিল্পের মধ্যে ধরিলে এই অনুপাত দাঁড়ায় ৫৭%। কৃষি ও জলসেচ খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ২১%।

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্বিগুণ। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ২০০০ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৫০০ কোটি টাকার মত উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ, আর ৫০০ কোটি টাকার মত বিভিন্ন সমাজ-সেবা খাতে ব্যয়। স্থির হইয়াছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে—ইহার মধ্যে ৩৮০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ১০০০ কোটি টাকার মত চল্‌তি উন্নয়নের ব্যয়। প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছিল ১৬০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ বিনিয়োগ হইল ২৪০০ কোটি টাকা। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের হিসাব ছিল ৬২০০ কোটি টাকা। ইহা প্রথম পরিকল্পনার ঠিক দ্বিগুণ।

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল দ্বিগুণ

পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ধার্য করিয়াছিলেন। কৃষির উৎপাদন বাড়িবে ১৮%; ইহার মধ্যে খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ১৫%। জলসিঞ্চিত জমির পরিমাণ বাড়িবে ২ কোটি ১০ লক্ষ একর। জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ লোককে আনা হইবে। পূর্ণোৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ (finished steel) ১৯৫৫-৫৬ সালে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইবে; কয়লার উৎপাদন ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ৬ কোটি টন হইবে; সিমেন্টের উৎপাদন ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ১ কোটি টনে পরিণত হইবে। এইরূপ বিভিন্ন দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় বাড়িবে ২৫%; ১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে ১৩৪৮০ কোটি টাকায় পৌঁছিবে। জাতীয় আয়ের সহিত বিনিয়োগের অনুপাত ৭% হইতে বাড়িয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১২% হইবে।† মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ২৮০ টাকা হইতে বাড়িয়া

বিভিন্ন দিকে উৎপাদনের বা অগ্রগতির লক্ষ্য

† বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বাদ দিলেও ইহা ১০% হইবে, দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা খুব কম নয়।

১৯৬০-৬১ সালে বার্ষিক ৩৩০ টাকা হইবে, অর্থাৎ ১৮% বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহা বাড়িয়াছিল ১০%। যদি আগামী পরিকল্পনাকালসমুহে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২৫% হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে ইহা দ্বিগুণ হইতে পারিবে।

সরকারী ক্ষেত্রে এই ৪৮০০ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? নিচের তালিকাতে তাহা দেওয়া হইল:

উৎস		কোটি টাকা হিসাবে
১। চল্‌তি আয়ের উদ্বৃত্ত		৮০০
(ক) পূর্বেকার কর হার অনুযায়ী	৩৫০	
(খ) বাড়্‌তি কর হার অনুযায়ী	৪৫০	
২। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ ...		১২০০
(ক) বাজার হইতে ঋণ	৭০০	
(খ) ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ঋণ	৫০০	
৩। অন্যান্য বাজেটভুক্ত উৎস		৪০০
(ক) রেলওযে	১৫০	
(খ) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড	২৫০	
৪। বিদেশী সাহায্য .. .		৮০০
৫। ঘাট্‌তি ব্যয়		১২০০
৬। অনির্ধারিত ফাঁক		৪০০

অর্থসংগ্রহের এই তালিকা বিচার করা দরকার বৈদেশিক ব্যালান্সের পরিপ্রেক্ষিতে। কমিশন হিসাব করিযাছিলেন যে. পাঁচ বছরে ১১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার স্টার্লিং উদ্বৃত্ত বিলাতে মজুত আছে, বিদেশী বেসরকারী মূলধন আসিবে ১০০ কোটি টাকা এবং বাকি ৮০০ কোটি টাকা (উপরের তালিকার ৪নং) বিদেশী সাহায্যে পাওয়া যাইবে এইরূপ আশা করা হইয়াছিল।

অর্থসংগ্রহ ও বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন

ইহাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মনে রাখা দরকার, তিন বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা পূর্ণ কার্যকরী হইবার পথে

কতকগুলি 'বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ফলে পরিকল্পনার আকৃতি (structure) ও প্রকৃতিতে (nature) অনেক পরিবর্তন আনার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। পরিকল্পনা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব অবস্থার চাপে দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপরেখা অনেকটা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল।

পরিকল্পনার পরিবর্তন

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও কৃষি (The Second Plan and Agriculture)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়া রচিত হইলেও কৃষিব উন্নয়নের প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৫৪ কোটি টাকা. উহার মধ্যে ২৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হইযাছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ৫৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইযাছিল। প্রথম পরিকল্পনায় জলসেচ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৮৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল ৪৮৬ কোটি টাকা। যে সকল কাজ পূর্বে সুরু হইযাছিল তাহাবা চলিবেই এইরূপ স্থির হইয়াছিল, উহা ব্যতীত ১৯৫টি নূতন জলসেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল। লক্ষ্য হিসাবে অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টন, তুলা ১০ লক্ষ ৩০ হাজার বেল্; তৈলবীজ ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন; ১০ লক্ষ বেল্ পাট এবং ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইক্ষু (গুড়ের হিসাবে)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দ ও লক্ষ্য

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন ও আয বৃদ্ধি পাইযাছিল, ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্রে কাঁচামালের উৎপাদন বাড়িয়াছিল তাই শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির পূর্ণ নিয়োগ ও ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় বিনিয়োগ বাড়ান সম্ভব হইয়াছিল, তাই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া পরিকল্পনা ও ঘাটতি ব্যয়ের নীতি বানচাল করিতে পারে নাই। কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় বাড়িয়াছিল, শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রসারিত হইয়াছিল, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পথে ইহা সাহায্য করিয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ সাফল্য

জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে (Subsistence sector) যত দ্রুত হারে উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে পারা যায়, সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে

ক্রমবৃদ্ধির হার তত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা শিল্পে বা মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইবার জন্য সরিয়া আসিতে পারে। কৃষি উৎপাদন যদি প্রকৃতির খেয়াল-খুশীতে উঠানামা করে তবে অধিক বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিকল্পনা ভাল বা খারাপ কোন মরসুমেই গ্রহণ করা চলে না। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনা খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনের খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, জনসংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের কথাও ভাবা দরকার।

কৃষি ব্যয়ের পরিমাণ বেশি

কৃষিতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে কেবল পতিত জমির উদ্ধার এবং জমিতে অধিক শ্রমিক নিয়োগের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, প্রগাঢ়-চাষ ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রচলন করা দরকার। প্রগাঢ়-চাষ ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রধান বাধা তিনটি : (ক) জমিতে চাষীর ব্যক্তিগত মালিকানা, ফলে ইতস্তত খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিগুলি, (খ) সমবায় চাষ সুরু করার উপযুক্ত মনোবৃত্তি ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অভাব, এবং (গ) উন্নত চাষপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা অর্থাভাবে উহা গ্রহণ করার অসুবিধা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অধিকতর জলসেচ, সার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সাহায্য করা ছাড়াও জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া জমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনিয়া উহাকে জমিহীন বা গরীব চাষীদের মধ্যে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি হইলেও সমবায় সমিতি করার কথা বলা হইয়াছিল। উন্নত চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করা এবং এই বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়নের জন্য দ্বিগুণের বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং ১৯৬১ সালের মধ্যে সমগ্র দেশকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল।*

কৃষি উন্নয়নের কার্যসূচী

অনেকের মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নের কার্যসূচী যত অধিক হওয়া দরকার ছিল ততটা হয় নাই। ১৯৫৫-৫৬ সালের স্তর হইতে খাদ্যোৎপাদন ১ কোটি টন (১৫.৫%) এবং খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যাদির উৎপাদন ২২.৩%

* এই সকল কার্যসূচীর জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ৪৬ কোটি টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ২০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

বাড়াইবার কথা হইয়াছিল। খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্য ধরা হইয়াছিল খুব কম। যে-হারে ও যে-পরিধির শিল্পোন্নয়ন ঘটিবে, দেশের খাদ্যসম্পদের ভিত্তি ততটা সুগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। ভাল মরসুমে খাদ্য মজুত করিয়া রাখার নীতির উপর জোর দেওয়া হয় নাই, একমাত্র এইরূপ যথেষ্ট মজুত থাকিলেই খারাপ মরসুমে শিল্পোৎপাদনের গতি হ্রাস পাইবে না। তাহা ছাড়া, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতেও এই খাদ্যোৎপাদন বিশেষ সহায়তা করিবে না। বর্তমানের ২২০০ ক্যালোরির তুলনায় লোকে ২৪৫০ ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু সকলেই জানেন যে ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্যের কম স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বজায় থাকিতে পারে না। এই জন্যই মনে করা হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের দরকার ছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির অনুন্নতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকেও বানচাল করিতেছে

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পরেই সরকার ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রভূত উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুণ খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় তাই প্রায় সকল খাদ্যশস্যাদির উৎপাদন-লক্ষ্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে, যদি সম্ভব হয় তবে ইহা হইতে রপ্তানিও করা হইবে। অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১°কোটি ৫৫½ লক্ষ টন; অতিরিক্ত তুলা উৎপাদন ২৩ লক্ষ বেল; অতিরিক্ত তৈলবীজের উৎপাদন ২১ লক্ষ টন; পাট উৎপাদন ১৫ লক্ষ বেল এবং (গুড়ের হিসাবে) ২০ লক্ষ টন ইক্ষু।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও শিল্প (The Second Plan and Industries)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল তাহার প্রধান ভিত্তি ছিল সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রেই মূল ও ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। মূল শিল্পের উপর জোর দিবার ফলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দ্রুততর হইবে এবং দ্বিতীয়ত, ভোগ দ্রব্যের উৎপাদন ভার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, ইহাতে কম মূলধনে অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান ঘটান সম্ভব হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছিল।

শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকল শিল্পে ৫৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ভারি শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইল ৫৪৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯৭%। ব্যক্তি ক্ষেত্রে

সকল শিল্পে বিনিয়োগ হইল ৫৩৫ কোটি টাকা—ইহার মধে ভারি শিল্পের অংশ হইল ৩৬৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৬৮ ৮% ।

অপূর্ণোন্নত কোন দেশ যখন উন্নয়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিতে চায় তখনই তাহার সম্মুখে এইরূপ নির্বাচনের সমস্যা উপস্থিত হয়, ভোগ্য দ্রব্যের শিল্প অথবা উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প—কিসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। দেশে মূলধনের পরিমাণ কম, তাই এই নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনকে বহন করিতে হয়। অপরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের পরিবেশে প্রধানত ব্যক্তি উদ্যোগী শিল্পপতিরা যে শিল্পে অধিক মুনাফা পাওয়া যাইবে সেই শিল্পে বিনিয়োগ করেন, তাঁহাদের নির্বাচন বাজারের শক্তিগুলির দ্বারা প্রভাবিত ও মুনাফামুখী। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিনিয়োগের ধরন নির্বাচনে মুনাফা প্রধান বিচার্য বিষয় নয়; এক্ষেত্রে বিনিয়োগের ধরন নির্বাচিত হয় ভবিষ্যতে কিরূপ ক্রমবৃদ্ধি বা উন্নয়নের হার দরকার সেই অনুযায়ী। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের হার অধিক চাহিলে বর্তমানে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে গুরুত্ব কম হইবে, উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প অধিক পরিমাণে প্রসারিত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভারি শিল্পের উপর এইরূপ গুরুত্ব আরোপ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল, কারণ একমাত্র এই পথেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বেগকে ছাপাইয়া অগ্রসর হইতে পারে।

উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ নীতি সঠিক সন্দেহ নাই

অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে উন্নয়নের যাত্রাপথ বিচার করিলে দেখা যায় প্রথমে হাল্কা ধরনের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলি (light consumer goods industries) স্থাপিত হইতে থাকে, কারণ উন্নয়নের প্রথম যুগে (ক) মূলধনের পরিমাণ কম, (খ) উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ও ঝুঁকি বেশি, ও (গ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব। প্রথমে ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প স্থাপিত হইয়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়িলে, উৎপাদক দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে ও যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, পরে উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পে প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিল্পায়নের এই ধারা ভিন্নরূপ হইতে পারে। এখানে দেশের শিল্প-কাঠামোর (Industrial structure) মধ্যে ভোগ্যশিল্প ও উৎপাদকশিল্পের অনুপাত প্রথম হইতে এমন-

ভোগ্যদ্রব্য বা উৎপাদক দ্রব্য—ব্যালান্স-বিচ্যুত উন্নয়নের পথ

ভাবে স্থির করা চলে যাহাতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িতে পারে ; ভবিষ্যতে ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে উৎপাদকদ্রব্যের শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলে। এইরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপাদক শিল্পের উপর জোর দিয়া নূতন আয় সৃষ্টি করিয়া ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করান যাইতে পারে এবং পরবর্তী পরিকল্পনা-কালসমূহে (time-periods) ভোগ দ্রব্যের শিল্প গড়িয়া তোলা চলে। তাই ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া ঠিকই হইয়াছিল, ইহা আমরা বলিতে পারি।

তাহা ছাড়া, শিল্প প্রসারের সম্ভাবনাও প্রচুর

তাহা ছাড়া ভারতেব প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদ মূল ও ভারি শিল্পের উৎপাদনের পক্ষে খুবই উপযোগী ইহাতে সন্দেহ নাই। লোহা, ম্যাঙ্গানীজ বক্সাইট ও অভ্র সবই এই দেশে আছে। অন্যান্য অনেক দেশকেই বিদেশ হইতে এই সকল মূল খনিজদ্রব্য আমদানি করিয়া ভারি শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। সেই তুলনায় ভারতের অবস্থা খুবই ভাল বলিতে হইবে। যুদ্ধেব সময়ে বা বর্তমানের ভারি শিল্পগুলিতে ভারতীয় শ্রমিকদেব উন্নত কর্মক্ষমতা ও যন্ত্রদক্ষতার প্রমাণ হইযা গিযাছে। উৎপাদক দ্রব্যেব বাজারও কম বড় নয় ; ভারতের নিজস্ব আয়তন এবং প্রতিবেশী অনুন্নত দেশগুলির বাজার ইহারা মিলিয়া বৃহৎমাত্রায় উৎপাদক দ্রব্য স্থরু করা অর্থনৈতিক দিক হইতে মোটেই ক্ষতিজনক নয়।

অন্য পন্থা ছিল কি না

অবশ্য অনেকেই উৎপাদক দ্রব্যের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা পছন্দ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে অনেক ধরনেব যুক্তি প্রদর্শন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ভারী শিল্পের উন্নতি কত দ্রুত করা দরকার তাহা স্থির করার জন্য দুইটি বিষয় বিবেচনা কর প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের মধ্যে যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকের যোগান, এবং দ্বিতীযত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভারি শিল্পের উপর জোর দিলেও উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রদক্ষতা সৃষ্টি করার মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করেন নাই। তাহা ছাড়া অনেক ভারি শিল্পের দ্রব্য দেশে প্রস্তুত না করিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিলে খরচ কম পড়িত। সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা ছিল সমগ্র পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন, তাই

সকল প্রকার উৎপাদক-শিল্প নিজেকেই বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া গুরুতর ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এত ত্যাগ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। ইঁহারা তাই বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের উচিত ছিল, (ক) বিদেশ হইতে কিছুটা ভোগ্যদ্রব্য-উৎপাদকারী যন্ত্রপাতি আমদানি করা, এবং (খ) (চীনের মত) দেশের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সাহায্যে শ্রম প্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বারা যতদূর সম্ভব উৎপাদক দ্রব্য উৎপন্ন করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা (Progress and experiences of the Second Five Year Plan):

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়াছে। বহু আলোচিত এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আমরা বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষে পরিকল্পনার দশ বৎসরকাল শেষ হইল; অনেক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বিভিন্ন দিকে গত পরিকল্পনার অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতাই বর্তমান পরিকল্পনা রচনার সময়ে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইতেছে। তাই আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি আলোচনা করা দরকার।

আমরা জানি, প্রথম পরিকল্পনা ছিল কতকগুলি সরকারী কার্যসূচীর তালিকা-মাত্র; উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে ব্যালান্স রক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য পরিকল্পিত চেষ্টা দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতেই সুরু হইয়াছে। প্রথমের তুলনায় দ্বিতীয়তে অধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের কথা বলা হইয়াছে, ইহা বলিলেও সম্পূর্ণ বলা হয় না—দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যই ছিল দেশে দ্রুত উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা। মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া, বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের অধিকতর প্রসার ঘটান, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দ্রুততর উন্নয়নের উপযোগী অনুকুল পরিবেশ গড়িয়া তোলা, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ান, আয় ও বৈষম্যের পরিধি সংকুচিত করা—এই সকল বিষয়ের দায়িত্ব দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপর অর্পিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ইহাতে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছে?

স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এই পরিকল্পনা কালে ভারতে বিনিয়োগের হার

অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মিলিয়া মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৩৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে উহার পরিমাণ হইয়াছিল ৬৭৫০ কোটি টাকা।

বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং পরিচালনযোগ্যতার অভাব প্রভৃতি বাধা থাকা সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিকে নানারূপ অগ্রগতি হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উপযোগী জলসেচ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে। মূল্যবান ধাতুসমূহের অনুসন্ধানকার্য শেষ হইয়াছে। পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়ে না হইলেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রজেক্ট খোলা হইয়াছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৬৫ মিলিয়ন টন হইতে ৭৬ মিলিয়ন টনে পরিণত হইয়াছে। সংগঠিত শিল্পগুলির নীট উৎ-পাদন প্রায় দেড়গুণ হইযাছে। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের অংশ ছিল ১·৫%, ইহা বাড়িয়া হইয়াছে ৮·৪%। এই বৃদ্ধির অনেকটাই ইস্পাত, কয়লাখনি এবং ভারি রাসায়নিক প্রভৃতি মূল ও ভারি শিল্পে। সাধারণভাবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতার এবং দেশের পরিবহন ও সংযোজন ব্যবস্থার প্রসার ঘটিযাছে; প্রধানত ইহা ঘটিয়াছে সরকারী ক্ষেত্রে। বেসরকারী সংগঠিত শিল্পেরও প্রভূত প্রসার ঘটিয়াছে, যৌথ কোম্পানীগুলির মোট মূলধনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইযাছে। গ্রাম্য ও কুটির শিল্পগুলিও পিছাইয়া নাই। সাধারণ টেকনিকাল শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়াছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসালযের সংখ্যা বাড়িয়াছে। দেশে স্বাস্থ্যের সাধারণ মান উন্নত হইযাছে। জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের দামস্তরের হিসাবে, ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১২১৩০ কোটি টাকা; বর্তমানে ১৯৬০ ৬১ সালে ইহা হইয়াছে ১৪৫০০ কোটি টাকা।

দামস্তরের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দামস্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। পাইকারী দামস্তর প্রায ৩০% বৃদ্ধি হইয়াছে; খাদ্যদ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি হইল ২৭%; শিল্পের কাঁচামালগুলিতে ৪৫%। শিল্পজাত দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়াছে ২৫%-এর বেশি। শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-যাত্রার মান (১৯৪৯- ১০০) ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১০০; পরিকল্পনার শেষে ইহা হইয়াছে ১২৪। দামস্তরে এইরূপ ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রধানত দুইটি কারণ: (ক) বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ আয়স্রোত প্রসারিত হওয়া, এবং (খ) তুলনামূলক ভাবে কৃষিউৎপাদন সংকুচিত হওয়া। ইহা ছাড়া

ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে বড় বা চাষীদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল হওয়ায় নিজেদের টাকায় খাদ্যশস্য মজুত করা প্রভৃতিও দেশের দামস্তর বাড়িতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বিদেশে দামস্তরে বৃদ্ধিও দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বাড়িতে সাহায্য করিয়াছে।

মূল ও ভারি শিল্পের উপর বিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং ফলে আয়স্রোতে বৃদ্ধি—ইহাদের ফলে দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সের ঘাট্‌তি বাড়িয়া গিয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ছিল, উহার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য আসিবে। কিন্তু ইহাপেক্ষা অধিক ঘাট্‌তি দেখা দিতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরু হইতে এই ঘাটতি বাড়িবার প্রধান কারণ হইল বিপুল পরিমাণে আমদানি বৃদ্ধি।

বৈদেশিক ব্যালান্সের ঘাট্‌তি

আমদানি বাড়িবার কারণ ছিল সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হওয়া এবং খাদ্যের আমদানি বাড়িয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া আমাদের রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া গিয়াও এই সমস্যা তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। আমেরিকাতে মৃদু অর্থনৈতিক অবনতি, সুয়েজ সমস্যার দরুণ ইংলণ্ডে মালপত্র মজুত করার পরিমাণে (stock pilling) হ্রাস এবং দেশের মধ্যে ভোগের পরিমাণে বৃদ্ধি—এই সকল মিলিয়া রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া গিয়াছিল। প্রধানত এই সকল কারণেই ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনাটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিদেশী মুদ্রার জমা হইতে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ৮৭২ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে আমরা বহুবিধ অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমত, দেশের কৃষি-কাঠামোর রূপান্তর না ঘটাইয়া কেবলমাত্র জল বীজ ও ঋণ সরবরাহ করিলে উৎপাদন উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ভূমির

কৃষির প্রসার শিল্প বিস্তারের প্রয়োজনীয় সর্ত

সম্পত্তিগত মালিকানা পরিবর্তন না করিয়া এবং গ্রামাঞ্চলে জমিদারী ও মহাজনী প্রথার পূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটাইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিলে উহারা প্রকৃত চাষীদের সম্মিলিত কর্মোদ্যমকে বাধা দেয় এবং জমিদার-মহাজনদের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। কৃষির যন্ত্রীকরণ এবং বৃহৎ মাত্রায় চাষ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। কৃষির প্রসারের এই বাধা সমগ্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ সীমিত রাখে। দামস্তর বৃদ্ধি পায়, পরিকল্পনার হিসাব নিকাশ,

শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল, বৈদেশিক রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সকল কিছু কমাইয়া দেয়।* ফলে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা, বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি; এবং বিদেশী মূলধনকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, শিল্পের ক্ষেত্রেও আমাদের অনেক প্রকার অভিজ্ঞতা হইয়াছে। আমরা জানিয়াছি যে, সরকারী শিল্পগুলির তুলনায় বেসরকারীক্ষেত্র দ্রুততর প্রসারিত হইতে পারে, তাহাদের পরিচালন-যোগ্যতার মান সরকারী ক্ষেত্রের পরিচালনা অপেক্ষা উন্নততর। আমরা জানিয়াছি যে, শ্রমিক শ্রেণীকে পরিচালনা ক্ষমতা হইতে নির্বাসিত রাখিলে উৎপাদন-ক্ষমতা কিছুতেই বেশি বাড়িতে পারে না। শ্রমিকেরা উৎপাদন পরিকল্পনা, পরিচালনা ও মুনাফার অংশ না পাইলে স্বেচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন বাড়াইতে উদ্বুদ্ধ হন না। তখন মালিক এবং রাষ্ট্র উৎপাদন বাড়াইবার জন্য উৎপাদন-পদ্ধতিতে অধিকতর মূলধনীকরণ সুরু করে অর্থাৎ উহাকে অধিকতর মূলধন-প্রগাঢ় করিয়া তোলে। ইহার ফলে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎপাদন বাড়িলেও বেকারি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা এই এই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে পারি।

২। শিল্প প্রসারের গতিবেগ সীমাবদ্ধ, কারণ জনসাধারণের সহযোগিতা নাই

তৃতীয়ত, বিগত পরিকল্পনা হইতে আমাদের এই অভিজ্ঞতাই লাভ হয় যে, আয় ও বৈষম্য হ্রাস করা এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করার লক্ষ্য হইতে আমরা ক্রমাগত দূরে সরিয়া আসিয়াছি। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর সরকারীনীতির বাস্তব ফল হইল দেশে ধনতান্ত্রিক কাঠামো এবং উহার উপযোগী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে গড়িয়া তোলা। কারণ দেশে উৎপাদন ও বণ্টনের যে সকল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার রূপ নির্ধারণ করিতেছে দেশের বিভিন্ন সম্পত্তির মালিকানা ব্যবস্থা। জমি ও মূলধনের মালিকানাই নিজের

* "The experience of the Second Plan period reinforces the point that given a substantial investment programme, the degree to which prices can be kept relatively steady depends vitally on how for agricultural production, that is, the production of food as well as raw materials, can be increased. Industry, mining and transport have to develop rapidly if an adequate rate of growth of the economy is to be achieved. But all this development must rest on the foundation of a more efficient and progressive agriculture." *Third Five Year Plan.* P. 123.

প্রসারের প্রয়োজনে শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণ, সময় ও দিক নির্ণয় করে, এবং অনুরূপ উদ্যোগ ব্যবস্থা (entrepreneurship) ও প্রতিষ্ঠান (institutions) গড়িয়া তোলে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ আশা করা হইলেও ইতিমধ্যে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠানগুলির মৌলিক রূপ পরিবর্তিত হয় নাই, কারণ আমাদের ইচ্ছামত দিকে উহারা আপন আপনি বদলায় না। উৎপাদন ও বণ্টনের প্রতিষ্ঠান বদলায় একমাত্র যদি জমি ও মূলধনের মালিকানার কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। ইহা অতি বাস্তব সত্যরূপে দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়িতেছে।

৩। সামাজিক লক্ষ্য-গুলি অপূর্ণ থাকিবেই

সুতরাং, উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে সামাজিক নব রূপায়ণের আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরা হইয়াছিল তাহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। বরং আমরা আয় ও সম্পদের অধিকতর বৈষম্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, মূলধন ও সম্পদের অধিকতর কেন্দ্রিকতা (concentration) দেখিতে পাইতেছি। একচেটিয়া শক্তির প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকৃত মানে প্রসার ঘটে নাই, পরিকল্পনার কাজে জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত উন্মুখ সহযোগিতা প্রকাশ পায় নাই। দুঃখের বিষয় হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রচেষ্টা হইতে আমরা এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি দিক সম্পর্কে সমালোচনা (Critical evaluation of some of the aspects of the Second Plan)

বহু দিক হইতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমালোচনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক মহলানবীশ যে কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন সেই কাঠামোকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিয়া বহুপ্রকার স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে নিছক অর্থের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা এবং সদিচ্ছা ভারত সরকারের নাই। দশ বছর পরিকল্পনার পরেও শেয়ার বাজারের ফাটকাদারীর সাহায্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যবসাদার যদি শিল্পসাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে তবে তাহাতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। যদি পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

পরিকল্পনার মূল তিনটি ত্রুটি উহার ভুল দর্শন হইতে উদ্ভূত

শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তবে পরিকল্পনায় জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরিকল্পনার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ত্রুটি তিনটি: (ক) দ্রব্যভিত্তিক পরিকল্পনা গঠন না করা, (খ) ব্যক্তিক্ষেত্রকে আরও সংকোচন না করা, এবং (গ) শ্রমিক কৃষকের সহযোগিতায় উৎপাদন ও বণ্টন কাঠামো গড়িয়া না তোলা। ইহারাই মূল ত্রুটি, পরিকল্পনা কৌশলের ছোটখাটো বিচ্যুতিসমূহ দেশের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা নহে।

পরিকল্পনা কৌশলের বহু ত্রুটির মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, পরিকল্পনার বৃহৎ কার্যসূচীগুলিতে (যেমন, ইস্পাত কারখানা) কত পরিমাণ আমদানি করা দরকার তাহার হিসাবে ত্রুটি ছিল। সেই সকল আমদানি পরিকল্পনাকালের প্রথম দিকেই করিতে হইবে তাহা ধরিয়া লওয়া উচিত ছিল। ভোগ্যবস্তুর আমদানি আরও কমাইলে চলিত। পরিকল্পনা কমিশনের নীতি আমদানি-নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষ মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দগুলির হিসাব খুবই সঠিক হওয়া দরকার। যদি হিসাবগুলি বেঠিক হয় তবে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের ভারসাম্যবিহীনতা দেখা দিতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুমিত হিসাব অপেক্ষা বাস্তবে ব্যয় বেশি হইতে থাকে। তৃতীয়ত, অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা উচ্চাভিলাষী (ambitious) হইয়াছিল। এই সমালোচনা সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার।

আমদানির হিসাবে গলদ

অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা সকল ক্ষেত্রেই বাস্তব ব্যয় বেশি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথাই হইল দেশে শিল্প প্রসার। শিল্প বাড়াইতে হইলে প্রথম দিকে মূল ও ভারি শিল্প বাড়ান প্রয়োজন, কারণ ইহারাই যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে পারে। দেশে মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারির ভিত্তি যত শক্ত ও প্রশস্ত (strengthened and broadened) হয়, ততই দেশটিতে শিল্প প্রসারের গতি দ্রুততর হইবার সম্ভাবনা। সেই দিক হইতে বিচার করিলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছাপাইয়া উন্নয়নের হার রক্ষা করিতে হইতে এইরূপ বৃহৎ ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া নিশ্চয় সঠিক হইয়াছিল।

উচ্চাভিলাষিতার অভিযোগ ঠিক নহে

এইরূপ পরিকল্পনা সফল হইতে হইলে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়:

(ক) ভারি শিল্প প্রসারের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রকৃত উপকরণ (real resources) দেশে আছে কি না, এবং (খ) ভারি শিল্প বিনিয়োগের দরুণ দেশে যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চারিত হইবে তাহার চাপ সহ্য করার মত ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবে কি না। এই দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করা হইলে বহুবিধ অসুবিধা দেখা দিতে থাকে।

কথা হইল কার্যকরী করা

ভারতে ভারি শিল্প প্রসারের উপযুক্ত উপকরণের অভাব নাই, কেবল যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক এবং কতিপয় যন্ত্র ও কাঁচামাল বিদেশ হইতে আনা দরকার। সুতরাং, সেই দিক হইতে পরিকল্পনা কমিশন কোন ভুল করেন নাই এবং জনসংখ্যার গতি বিচার করিলে বর্তমানের প্রকৃত উপকরণগুলিকে মূল ও ভারি শিল্পে নিয়োগের প্রস্তাব খুবই গ্রহণযোগ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন ভোগ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বৈজ্ঞানিক যুগে কুটির শিল্পের সাহায্যে উৎপাদন কতখানি বাড়ান যায়, তাহা সন্দেহের বিষয়। তাহাতে খরচও বেশি পড়ে। তাহা ছাড়া, মূলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইলে উহাদের সাহায্যে ভবিষ্যতে ভোগ্যদ্রব্যের কলকারখানা গড়িতেই হইবে, তাহা না হইলে উহারা কি গুদামজাত হইয়া নষ্ট হইবে? ইহাদের উৎপাদনে খাটাইতে হইবে। তখন এই সকল কুটিব শিল্প কি উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পাবিবে অথবা কেবলমাত্র সংস্কারের বশে এই সকল প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক ব্যয়বহুল উৎপাদনপদ্ধতি চালু রাখার জন্য রাষ্ট্র ক্রমাগত উহাদের সাহায্য করিতে থাকিবে? সুতরাং কুটির শিল্পেব জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ না করিযা উহার সাহায্যে কয়েকটি ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পস্থাপন করিলেই ভাল হইত, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। ভারতের জনসাধারণ দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট ভবিষ্যৎ উন্নতির সঠিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে তাহারা নিশ্চয় কষ্ট স্বীকারে রাজি হইত। সকলের কষ্টেব পরিমাণ সমান না হইলে লোকে ত্যাগ স্বীকারে রাজি হয় না, কেবলমাত্র দেশপ্রেমের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে চাহে না। সুতরাং রেশনিং-এর সাহায্যে ভোগ্য-দ্রব্যের সমান বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার দরকার ছিল, তাহা করিলেই মূল ও ভারি শিল্পের উৎপাদন কৌশল সাফল্য লাভ করিতে

প্রকৃত উপকরণের অভাব নাই

কুটির শিল্পের উপর অপব্যয় না করিয়া

পারে, উৎপাদনী-ক্ষমতা বাড়ান দেশপ্রেমিক কাজ বলিয়া গণ্য হয়, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না, বা ঘটিলেও সহ্য করার মত মনোবল গড়িয়া উঠে। খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থা বেসরকারী ফাট্‌কাদার ব্যক্তিদের হাতে ছাড়িয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব নয়, জনসাধারণও ধনীকে আরও ধনী করার এবং গরীবকে আরও গরীব করার এইরূপ পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসে না। ইহা অতি নিষ্ঠুর সত্য যে, এই পথে চলিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে নাই; খাতায়-পত্রে হিসাবে তথ্যে সফলতা দেখান গেলেও দেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ সম্ভব হয় নাই।

জনসাধারণের সহযোগিতায় ভোগ্য দ্রব্যের বণ্টন রাষ্ট্রের হাতে তোলা উচিত

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনা (Comparison of the two Plans)

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য ছিল না। উভয় পরিকল্পনাতেই বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল, বিভিন্ন খাতে কত ব্যয় হইবে তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছিল, অর্থের হিসাবেই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আকৃতিগত মিলের অন্তরালে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যই বেশি চোখে পড়ে। ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ, কোন্ বিষয়েব উপর কতখানি গুরুত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে ভারসাম্য স্থাপনের পদ্ধতি, জনসাধারণের ত্যাগের পবিমাণ, ক্রমবৃদ্ধির হার, এই সকল বিষয়ে ভারতেব এই দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্যই গভীর।

আকৃতিতে মিল থাকিলেও প্রকৃতিতে গরমিল

এই দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়াছিল দুই দিক হইতে। দুইটি পরিকল্পনার রচনাকালীন ভারতীয় বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা (objective conditions) পৃথক ছিল, ফলে উহাদের প্রকৃতিও পৃথক। তাহা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনা হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দৃষ্টিভঙ্গীর (attitude) পরিবর্তনও কম নয়, প্রথম পরিকল্পনা ছিল সাধারণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে (subjective condition) ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছিল।

এই গরমিলের দুইটি কারণ: (১) বাস্তব অবস্থা, ও (২) দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

বাস্তব অবস্থার পার্থক্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময়ে ভারতবর্ষ যুদ্ধোত্তর ও দেশবিভাগজনিত অর্থনৈতিক বিশৃংখলা পার হইতে পারে নাই। সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর ও কৃষিজাত কাঁচামালের অভাব ছিল। খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব মিটাইবার জন্যই কৃষি ও জলসেচের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার দরকার ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হইয়াছিল কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির যুগে—বর্ধিত কৃষিজ উৎপাদনই তাহার অগ্রগমনের ভিত্তি। তাই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচের জন্য মোট ব্যয়ের ৩৫% বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইল ২২%। শিল্পের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৭·৬%; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইল ১৮·৫%।

বাস্তব অবস্থা বিচারানুযায়ী দুইটি পার্থক্য (১) কৃষি ও শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্ব

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে কাঁচামালের স্বল্পতা, বাজারের অভাব এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধের দরুণ ভারতের প্রায় সকল শিল্পই স্বাভাবিক শক্তির তুলনায় কম উৎপাদন করিতেছিল। প্রথম পরিকল্পনায় অব বহৃত উৎপাদন শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করাই ছিল প্রধান কার্যসূচী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন উৎপাদনী-ক্ষমতা সৃষ্টি করার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল, শিল্প-প্রসারের ভিত্তি প্রশস্ত করার জন্য মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল।

(২) বর্তমান উৎপাদন শক্তির ব্যবহার ও নূতন উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিস্থাপন

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শের উপর জোর দেওয়ায় দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বহুভাবে প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের ভার ছিল প্রধানত বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রায় বেশির ভাগই স্থাপিত হইবে সরকারী ক্ষেত্রে এবং সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারই হইবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি, এইরূপ বলা হইয়াছিল। কেবল শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, প্রথম পরিকল্পনায় দেশে মোট বিনিয়োগের অর্ধেকের কিছু কম ছিল সরকারী ক্ষেত্রে (৩০০০ কোটির মধ্যে ১৫০০ কোটি)। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের অধিকাংশই (প্রায় ৬০%) সরকারী ক্ষেত্রে (৬২০০ কোটির মধ্যে ৩৮০০ টাকা)।

ভাবাদর্শের বিচার অনুযায়ী পার্থক্য (১) বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের অধিকতর প্রসার

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের ভাবাদর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ করা অন্যতম *প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় তাই* এই লক্ষ্যের অনুরূপ কার্যসূচী ছিল না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার বহুবিধ সাহায্য করিবে এরূপ বলা হইয়াছিল, সমবায় প্রথার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল, ব্যক্তির হাতে জমির ও আয়ের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য ও এই সকল কার্যসূচী এত সুস্পষ্ট ছিল না।

(২) অর্থনৈতিক শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের উপযোগী কার্যসূচী

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক বড় এবং ইহার প্রচেষ্টাও অনেক ব্যাপক। উভয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণের দিকে তাকাইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল ২৪০০ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ছিল ৪৮০০ কোটি টাকা, দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণও দ্বিগুণ করা হইয়াছিল (৩০০০ কোটি হইতে ৬২০০ কোটি টাকা)।

(৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক বড় ও ব্যাপক

কর্ম সংস্থানের প্রসার ঘটান প্রথম পরিকল্পনার কোন লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মনিযোগের প্রসার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল।

(৪) ইহাতে কর্ম সংস্থান

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পবিকল্পনায ঘাটতি ব্যয পদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় (মোট ব্যয়ের প্রায় $\frac{1}{7}$ অংশ), কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ে লক্ষ্য ছিল ১২০০ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ)। তাই প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্যতা অনেক বেশি।

(৫) ঘাটতি ব্যয়ের উপর অধিক জোর

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ (Financing the Second Five Year Plan)

প্রথম পরিকল্পনার ন্যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিও প্রধানত অর্থের হিসাবে রচনা করা হইয়াছিল। সরকারী ক্ষেত্রে যে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা

হইবে তাহা কোন্ কোন্ উৎস হইতে কিরূপে পাওয়া যাইবে পরিকল্পনা কমিশন তাহা আলোচনা করিয়াছিলেন। নিচে তাহাদের তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল :

উৎস	কোটি টাকার হিসাবে
১। চলতি আয়ের উদ্বৃত্ত	৮০০
(ক) পূর্বেকার করহার অনুযায়ী ৩৫০ (খ) বাড়তি কর বা করহার অনুযায়ী ৪৫০	
২। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	১২০০
(ক) বাজার হইতে ঋণ ৭০০ (খ) ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ঋণ ৫০০	
৩। অন্যান্য বাজেটভুক্ত উৎস	৪০০
(ক) রেলওয়ে ১৫০ (খ) প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ইত্যাদি ২৫০	
৪। বিদেশী সাহায্য	৮০০
৫। ঘাটতি ব্যয়	১২০০
৬। অনির্ধারিত ফাঁক	৪০০

উপরের এই তালিকা হইতে দেখা যায়, সরকারী বাজেট ও ঋণ প্রভৃতি সূত্র হইতেই মোট ২৪০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ১২০০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ¼ অংশ) ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা পাওয়া যাইবে ; বিদেশ হইতে সাহায্যের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা। ইহাতেও মোট ৪০০ কোটি টাকার ফাঁক থাকিয়া যাইবে, ইহাও আভ্যন্তরীণ উপায়ে তুলিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

১। কর আদায় (Taxation) : অপূর্ণোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার বেশির ভাগ অংশ ক্রমশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লইয়া আসিতে পারিলে উন্নয়নের গতিবেগ বাড়িতে পারে। কর-ধার্য করা হইল এই সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লইয়া আসার প্রধান অস্ত্র। পরিকল্পনাকালে জনসাধারণের হাত হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি তুলিয়া লওয়া যায়, ততই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে ও বিনিয়োগ

বাড়িতে পারে। এই কথা মনে করিয়াই ভারতীয় কর-কাঠামোর সংস্কার করা দরকার। যাহাতে কর-ভিত্তি (Tax-base) গভীরতর এবং প্রশস্ততর হয় (deeper and wider), সেই চেষ্টা করাই ভারত সরকারের কাজ। তাহা ছাড়া, উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে লোকের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় ভোগদ্রব্যের উৎপাদন তৎক্ষণাৎ বাড়িতে পারে না। ফলে কম পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্যের উপর অধিক অর্থ চাপ দিতে থাকে, ভোগ্য দ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায় ও কালক্রমে এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি সমগ্র পরিকল্পনা-টিকেই বানচাল করিয়া দিতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ধার্যের দ্বারা জনসাধারণের হাত হইতে এই অর্থ তুলিয়া লওয়া তাই বিশেষভাবে প্রয়োজন। সর্বোপরি, দেশের করব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করিতেও যথেষ্ট সাহায্য করে। আয়-বৈষম্য কমাইয়া ধনীর হাত হইতে অধিক অর্থ সরাইয়া আনিয়া বিনিয়োগের সাহায্যে বা সমাজ সেবামূলক কার্যাদির মাধ্যমে গরীবদের হাতে সেই অর্থ পৌঁছাইয়া দেওয়া কর-ব্যবস্থার কাজ।

উন্নয়নমূলক কর-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর আরোপের উপর বেশ জোর দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালের কর হার অনুযায়ী যে ৫০০০ কোটি টাকা এই পাঁচ বছরে পাওয়া যাইবে তাহা হইতে ৪৫৫০ কোটি টাকা অনুন্নয়নমূলক (non-development) ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় (maintenance expenditure) হিসাবে বাদ দিয়া এই ৩৬০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে এইরূপ ধরা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল যে, নূতন কর আরোপ করিয়া বা পুরাতন করগুলির হার বাড়াইয়া কমপক্ষে ৪৫০ কোটি টাকা তুলিতেই হইবে, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি উভয়ে ২২ কোটি করিয়া তুলিবে। এইরূপে মোট ৮০০ কোটি টাকাকেও পরিকল্পনা কমিশন পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। যে ৪০০ কোটি টাকার অনির্ধারিত ফাঁক ছিল তাহাও কর-ধার্যের দ্বারা তুলিলে ভাল হয়, ইহাই পরিকল্পনা কমিশনের মত ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে বিভিন্ন প্রকার নূতন নূতন কর ধার্য করা হইলেও কর আদায়ের পরিমাণ ততটা বৃদ্ধি পায় নাই।

কর-আদায়ের পরিমাণ

প্রথম পরিকল্পনাকালের সুরুতে ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের ৬·৬% কর আদায় হইত, পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা ৭·৯% হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া পরিকল্পনা-

কালের শেষে বৎসরে ১২% করার কথা বলা হইয়াছে। এই পরিমাণ কর উঠান বিশেষ সম্ভবপর হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কর আরোপের ফলে দেশের সঞ্চয় ব্যক্তিক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়া রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য সরকারী মূলধনে পরিণত হয়, ইহা ঠিকই। কিন্তু করব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাহাতে (ক) ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ কম না পড়ে, এবং (খ) ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ক্ষতিজনক হইয়া না পড়ে। ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা বজায় রাখিয়া উন্নয়নমূলক করব্যবস্থার (developmental taxation) এইরূপ কাঠামোই গড়িয়া তোলা দরকার।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত আয়ের অধিকাংশই সৃষ্টি হইয়াছে কৃষির ক্ষেত্রে। কর অনুসন্ধানী কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, সহরাঞ্চলে করপাতের (incidence of taxation) পরিমাণ (৬·৫%) গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৫·৩%)। তাহা ছাড়া সহরে কলকারখানায় তৈয়ারী জিনিষ গ্রামের লোকেরা কমই ব্যবহার করে তাই দ্রব্যাদির উপর উপজ কর (excise duties) তাহারা অনেকটা এড়াইয়া যাইতে পারে। তাই পরোক্ষকর আরোপ না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে কৃষি আয়করের উপর জোর দিয়াই গ্রামাঞ্চল হইতে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ান দরকার ছিল।

আয় বাড়িবে কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু কর বাড়িবে শিল্পক্ষেত্রে

২। **জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ (Borrowing from the Public :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ সফল করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয়কে বিনিয়োগের কাজে লাগান যায়। যদি এমন ধরনের বিনিয়োগে উহাকে নিয়োগ করা হয় যে তাহা হইতে রাষ্ট্রের আয় ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে তবে সেইরূপ ঋণ গ্রহণ করা ভালই।

ঋণ গ্রহণের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ঋণ করিয়া বিনিয়োগের ধরন যদি সঠিক না হয় তবে সেই ঋণের ভার দেশের সাধারণ লোকের উপর চাপিয়া বসে। তখন সুদ ও ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে গরীবশ্রেণীর নিকট হইতে টাকা ঋণদানকারী ধনীশ্রেণীর নিকট চলিয়া আসে। সর্বোপরি, ঋণদানের পথ উন্মুক্ত থাকিলে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের মনে শিল্পে অর্থবিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া যাইতে পারে,

ঋণের সুবিধা ও বিপদ

সাধারণভাবে ঝুঁকিবিহীন সরকারী ঋণপত্রে মূলধন খাটাইবার ইচ্ছা বাড়িতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল খুব কম. তাই সেই পরিকল্পনায় এই সূত্র হইতে ১১৫ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে এইরূপ মনে করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল যে, ইহা অপেক্ষা ৮৯ কোটি টাকা অধিক ঋণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসাধারণের নিকট হইতে ৭০০ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করা হইবে বলা হইয়াছিল। সাধারণভাবে ইহাকে খুব বেশি বলা চলে না, তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্ব-ঋণের মধ্যে ৪৩০ কোটি টাকা পরিশোধ-যোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে, ফলে স্থূল ঋণ হইয়াছে ১১৩০ কোটি টাকা। ইহা কম নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঋণের স্থান

ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৫০০ কোটি টাকা। এই উপায়ে আরও অধিক অর্থ তোলা চলিতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। লোকে কর দেওয়া অপেক্ষা নিশ্চয়ই ঋণ দেওয়া অধিক পছন্দ করে। বর্তমানে পরিকল্পনার দরুন যে আয় বাড়িতেছে, তাহা সবই যদি রাষ্ট্র ঋণ হিসাব তুলিয়া লয় এবং সুদসহ ভবিষ্যতে শোধ দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা হইলে স্বল্প আয়কারীদের ঋণ দিতে বাধা থাকিবে না। বরং তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিলে আয়বৈষম্য কমিতে পারে।

৩। অন্যান্য উৎস (Other Sources):

বলা হইয়াছিল যে, সরকারীক্ষেত্রে পরিচালিত রেলপথ হইতে পাওয়া যাইবে ১৫০ কোটি টাকা (কিন্তু এই রেলপথ উন্নয়নের জন্য খরচ হইবে ৯০০ কোটি টাকা)। প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রেলবোর্ড ১১০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় তাহাদের দেয় ১৫০ কোটি টাকা খুবই কম বলিতে হইবে।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও অন্যান্য জমার খাতা হইতে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে, তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী এই হিসাব গণনা করা হইয়াছিল (projection of the current trend)। বাস্তবে এতটা পাওয়া যায় নাই।

৮০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে বলা হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য (ঋণ ও সাহায্য) পাওয়া গিয়াছে ২৯৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৮৮ কোটি টাকা পাঁচ বৎসরে ব্যবহৃত হইয়াছে, অবশিষ্ট ১০৮ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হইবে বলিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি বৈদেশিক মূলধন ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ হইল ৮৭২ কোটি টাকা; P. L. 480 অনুযায়ী পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৫৩৪ কোটি টাকা এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার হইতে তোলা হইয়াছে ৫৫ কোটি টাকা।

৪। ঘাট্‌তি ব্যয় (Deficit Financing):

প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৪২০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মোট ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে বিদেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার স্টার্লিং পাওয়া সম্ভব হইবে, তাই ভারতের অর্থনৈতিক দেহে মোট ১০০০ কোটি টাকার মত অর্থ বৃদ্ধি করা হইবে বলা হইয়াছিল। ইহার ফলে ব্যাঙ্কগুলিতে জমার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় উহারা ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। ইহা ছাড়া অনির্ধারিত ৪০০ কোটি টাকা কোথাও হইতে না পাওয়া গেলে ঘাট্‌তি ব্যয়ের চেষ্টা করা হইবে এরূপ বলা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে মোট ৯৪৮ কোটি ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইয়াছে। বর্তমানের ঊর্ধ্বগতি দামস্তর বিচার করিয়া এতটা ঘাট্‌তি ব্যয় করা উচিত কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়। তাহা ছাড়া, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে কিছুটা হ্রাসের ফলে আরও অধিক অর্থ বাজারে ছাড়া উচিত কি না তাহাও সন্দেহজনক। আরও বেশি ঘাট্‌তি ব্যয় করার আগে সরকারের উচিত: (ক) কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, (খ) শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো; ও (গ) বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করা। তবেই মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে তাই ঘাট্‌তি ব্যয়ের উপর ততটা জোর দেওয়া হয় নাই।

বিগত দশকের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (A decade of Planning and India's economic Progress):

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তির ফলে ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি দশক শেষ হইল। এই দশকে ভারতের

অর্থনীতিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল আদর্শগুলি এবং দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্যসমূহ সফল করার বাস্তব সম্ভাবনার ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরিকল্পনার ফলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিশেষত উন্নয়নের হার বাড়িতে পারে এই সকল দিকেই বিনিয়োগগুলি ঘটিয়াছে।

দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িয়াছে

ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় প্রকার মিলিয়া মোট বিনিয়োগ প্রথম পরিকল্পনার সুরুর দিকে ছিল ৫০০ কোটি টাকা; শেষের দিকে ৮৫০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে ছিল ১৬০০ কোটি টাকা। চল্‌তি দামস্তরের হিসাবে দুই পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হইয়াছে ১০,১১০ কোটি টাকা, সরকারী ক্ষেত্রে ৫২১০ কোটি এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৪৯০০ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় তুলনামূলকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদনের দিকে অধিক নজর ছিল। ফলে কৃষি ও জলসেচে বিনিয়োগের ৩১% চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্য চাপ থাকে, শিল্প ও খনিতে বিনিয়োগ ৪% হইতে বাড়িয়া ২০% হয়। উভয় পরিকল্পনাতেই পরিবহন ও সংযোজনের উপর মোটামুটি সমান নজর দেওয়া হয়।

অর্থ সংগ্রহের দিকে তাকাইলে দেখা যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর-সংগ্রহের উপর অধিক চাপ দেওয়া হয়, কয়েকটি নূতন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বসে। উপকরণের অভাব মিটান হয় ঘাট্‌তি ব্যয় এবং বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রকৃত ঘাট্‌তি ব্যয় ছিল ৯৪৮ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনায় লেনদেন ব্যালান্সের কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই। সমগ্র পরিকল্পনা কালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩১৮ কোটি টাকা। ইহা মিটান

লেনদেন ব্যালান্স

হইয়াছিল ১৯৬ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা এবং ১২২ কোটি টাকা সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয় করিয়া। শিল্পের উপর জোর দেওয়ার ফলে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি কমাইতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই বৈদেশিক মুদ্রার অভাব তীব্রতর হওয়ায় পরিকল্পনা অনেকটা কমাইতে হয়।

গত বৎসরে উন্নয়ন সর্বদা সমতালে অগ্রসর হয় নাই, উন্নয়নের হার কখনও ছিল উঁচু, কখনও-বা খুবই নীচু। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি

ভাল হওয়ায় জাতীয় আয় ১৮% বাড়ে, লক্ষ্য ছিল ১২%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ২৫%, কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ২০%।

সমগ্র দশকটিকে একত্রে ধরিলে মোটামুটি সকল দিকে উন্নয়ন ঘটিতেছে বলিতে হইবে। কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের মূল সুযোগ সুবিধাগুলি, যেমন জলসেচ, শক্তি ও পরিবহন, বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার উন্মোচিত হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা এবং অনভিজ্ঞতার দরুণ অল্পস্বল্প দেরি হইলেও বেশ কয়েকটি কলকারখানা পূর্ণভাবে কাজ সুরু করিয়াছে অথবা করার মত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৪১% এবং খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ৪৬%। সংগঠিত যন্ত্রশিল্পগুলির নীট উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পগুলির অংশ ১.৫% হইতে ৮.৪%-এ পৌঁছিয়াছে এবং ইহার বেশির ভাগই ইস্পাত, কয়লা খনি এবং ভারি রাসায়নিক দ্রব্য। ইহারই সহিত প্রসার হইয়াছে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা এবং দেশের পরিবহন ও সংযোজন ব্যবস্থা, প্রধানত সরকারী ক্ষেত্রে। সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের বিপুল প্রসার হইয়াছে, কোম্পানীগুলির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি হইয়াছে। একই সঙ্গে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষা ও টেক্‌নিকাল শিক্ষা পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে অনেক প্রসারিত। হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারির সংখ্যা বাড়িয়াছে, ম্যালেরিয়া নিবারিত হইয়াছে, স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছে, জীবনধারণের সম্ভাবনার হার (survival rate) যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত দশকে জাতীয় আয় বাড়িয়াছে ৪২%; জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছে ১৬%।

বিগত দশকে কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও জলসেচে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫৫১ কোটি টাকা। নীট জলসিঞ্চিত এলাকার পরিমাণ ৫১.৫ মিলিয়ন একর হইতে ৭০ মিলিয়ন একরে পৌঁছিয়াছে। আর এই দুই পরিকল্পনায় যে সকল বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ হইলে আরও ৩৮ মিলিয়ন একর জলসিঞ্চিত হইবে। দেশের সকল চাষের এলাকা যাহাতে উন্নত বীজের সাহায্য পায় সেই জন্ম ৪০০০ বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমিতে নূতন আবাদ করা সম্ভব

কৃষি ও আনুষঙ্গিক উন্নয়ন

হইয়াছে। সেচ, মৎসচাষ, দুগ্ধোৎপাদন, ফলের বাগিচা এবং অরণ্য সম্পদ—সকল দিকেই উৎপাদন কমবেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যস্বত্ব বিলোপের চেষ্টা করা হইয়াছে, ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সমবায়-চাষের বাস্তব ভিত্তি রচিত হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়নের কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে।

বিগত দশকে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—উন্নয়নের হারও বেশি এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় দিকে ইহার প্রসারও ঘটিয়াছে। শিল্পোন্নয়নের সাধারণ সূচক বৎসরে ৭% হারে ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ক্রমাগত বাড়িয়াছে। মূল ও ভারি শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহারই ভবিষ্যতের দ্রুত উন্নয়ন আনিবে। সরকারী ক্ষেত্রের প্রধান ভূমিকা স্বীকৃত হইয়াছে। তিনটি সুবৃহৎ ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এমন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যাহাতে আমদানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ কমিয়া আসে। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিতেও প্রসার বেশ বেশি।

উপসংহারে আমরা দেখিতে পাই, গত দশ বৎসরে জাতীয় জীবনের সকল শাখা প্রশাখাতেই গতির সঞ্চয় হইয়াছে। তবুও আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় এই অগ্রগতির পথে নানারূপ বাধাবিপত্তি ও টানা পোড়েনের চাপ দেখা গিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বল্পতা, খাদ্যাভাব, ঘাটতি ব্যয়ের ফলে প্রভূত মুদ্রাস্ফীতি, অনভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘসূত্রতার দরুণ পরিকল্পনাগুলি সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে না-পারা, পরিবহন ও সংযোজনে নানা প্রতিবন্ধকতা, বেকারি দূর করিতে না-পারা এমন কি কমাইতেও না-পারা—এইরূপ বহুদিকে আমাদের অভিজ্ঞতা এখন অনেক বেশি। এই সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনা রচনা করা অনেক সহজ।

বাধাবিপত্তি হইতেই নূতন অভিজ্ঞতা লাভ

মনে রাখা দরকার, এই সকল চাপ ও কষ্ট এড়াইবার কোন উপায় নাই, সমাজ-দেহের সুগভীর অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলায়তনের শিকড় টানিয়া বাহির করিতে হইলে এই কষ্ট ও চাপ হইতেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সৃজনের বেদনা। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলে:* "In every direction new ground has been broken

* *Third Five Year Plan*. P. 47.

and valuable experience gained. Doubtless, there have been failures and errors that might have been avoided. There are many weaknesses in the econonic and social structure that still persist. The country's potential for development is far from being realised. Yet, all these are part of an inspiring period in nation's history—a story of continuous endeavour reaching into the far corners of the land and drawing within its fold all sections of the people."

পরিশিষ্ট

অপূর্ণোন্নত দেশে ঘাট্‌তি ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি ও মূলধন-গঠন
(Deficit financing, Inflation and capital formation in an underdeveloped economy)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা ধরিয়া লইতেন যে, সমাজে আপনা-আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকে। তাঁহারা তাই অর্থের পরিমাণতত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র যদি বাজেটের ঘাট্‌তি পূরণ করার জন্য নূতন টাকা অর্থ-নৈতিক দেহে ঢালিয়া দেয়, তবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবেই। এই অবস্থায় দেশে টাকার পরিমাণ ও দামস্তর বাড়িয়া যাইবে ঠিকই, তবে সঞ্চয় ও মূলধনের পরিমাণ বাড়িবে না। কিন্তু আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সমাজ আপনাআপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকে না; বরং উন্নত দেশগুলিতে কর্ম নিয়োগের পরিমাণ পূর্ণ স্তর অপেক্ষা নিচুতেই থাকা। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়াইলে সমাজের অনিযুক্ত উপকরণগুলিকে টানিয়া আনিয়া উৎপাদনের কাজে খাটানো চলে। বেকারি ও উপকরণের অনিয়োগের অবস্থায় তাই আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা বাজেটে ঘাট্‌তি ঘটাইয়া, নূতন টাকার সাহায্যে তাহা পূরণ করিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইবার নীতি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন। ঘাট্‌তি ব্যয় পদ্ধতির দ্বারা এইরূপে মূলধন গঠন করা সম্ভবপর, ইহাই তাঁহাদের মত।

ক্লাসিকাল ও আধুনিক মত : কেন ইহা গ্রহণযোগ্য

কিন্তু আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের এই তত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী কেবল উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা চলে। অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই নীতি উন্নত দেশের ন্যায় সমভাবে কার্যকরী নয়।

উন্নত দেশে উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি বেকার অবস্থায় আছে, টাকার সাহায্যে দাম দিয়া তাহাদের কিনিয়া আনিয়া উৎপাদনে খাটানোই একমাত্র সমস্যা। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে উপকরণগুলি স্বভাবতই বেকার অবস্থায় নাই, উহারা কম আয়ে কম উৎপাদনশীল কোন উৎপাদনক্ষেত্রে আপনা-আপনি নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি একেবারে অনিযুক্ত অবস্থায় নাই, উপকরণগুলির উৎপাদনক্ষমতা একেবারে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে এইরূপ বিশেষ দেখা যায় না। এই সকল দেশে তাই অতি নিম্ন পরিমাণ উৎপাদন, আয় ও কর্মদক্ষতার স্তরে একপ্রকার "ক্লাসিকাল" পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় সমাজ কাল কাটাইতে থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়িল, আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইল, চাহিদা প্রসারিত হইল এবং ইহার চাপে তৎক্ষণাৎ অনিযুক্ত যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও শ্রমিক প্রভৃতির নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকিল, এইরূপ সহজ সরল ধারাপথ অপূর্ণোন্নত দেশে দেখা যায় না। যন্ত্রপাতি বা আসল মূলধন এবং যন্ত্রদক্ষতা প্রভৃতির ব্যাপক অভাব থাকায় উপকরণগুলির তৎক্ষণাৎ নিয়োগ এইরূপ দেশে তাই সম্ভবপর হয় না। বাজেটের ঘাটতি ঘটাইয়া বা নূতন টাকা তৈয়ার করিয়া লোকের আর্থিক আয় বাড়াইয়া তুলিলে, এই অবস্থায়, দেশের বর্তমান ভোগ্যদ্রব্যের উপরই চাপ সৃষ্টি হয়, দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।*

অপূর্ণোন্নত দেশে কেন ইহার মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়

ঘাটতি ব্যয়ের দরুন কতটুকু মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে তাহা কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (ক) অল্প পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করিলে, এবং যাহাতে দ্রুত ফল পাওয়া যায় এমন ক্ষেত্রে সেই টাকা খাটাইলে, ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি না-ও ঘটিতে পারে। এই নূতন টাকা কৃষির কাজে বিনিয়োগ করিলে বা কুটিরশিল্প গড়িয়া তুলিলে তাই দামস্তরে হঠাৎ বৃদ্ধি না-ও দেখা দিতে পারে। তাহা ছাড়া, উন্নয়নের প্রথম যুগে মূলধনের পরিমাণ

* "The additional money income created by budget-deficit will therefore increase the demand to be met from the existing supply of consumer goods, without leading to significanly greater production, and, therefore, greater saving to offset the inflationary impact of the development expenditure". *Second Five Year Plan.*

কম, তাই কিছুটা ঘাটতি ব্যয় সমর্থন করাও চলে। কিন্তু এই, সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হয় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কতটা এবং কোন ধরনের কাজে উহার ব্যয় হইতেছে। (খ) দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র যদি করের সাহায্যে নূতন-চালিয়া-দেওয়া টাকার সবটা বা কিছুটা অন্তত তুলিয়া আনিতে পারে, তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা কম। ইহা প্রধানত নির্ভর করে কর-কাঠামোর যোগ্যতার উপর। (গ) তৃতীয়ত, বাজেট ঘাটতি বা ঘাটতি ব্যয়ের ফলে কতটা মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে দেশে দ্রব্য ও দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির সফলতার উপর (success of physical controls)।

কি কি বিষয়ের উপর মুদ্রাস্ফীতির পরিধি নির্ভর করে

সাধারণত দেখা যায় অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ব্যবসায়িক সততা তুলনামূলকভাবে কম, ফলে কর ফাঁকি দিবার প্রবণতা বেশি। তাহা ছাড়া, এইরূপ দেশে সরকারী করবিভাগের যোগ্যতারও অভাব দেখা যায়। এই সকল দেশে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ততটা নাই, ইহার ফলে অত্যুচ্চ হারে কর বসাইতে শাসন কর্তৃপক্ষ ততটা রাজি নয়। অত্যুচ্চ হারে কর বসাইলে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক বিনিয়োগ ব্যাহত হয় এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও ক্ষমতা হ্রাস পায়। দেশে উন্নয়নের প্রতিকূল পরিবেশ গড়িয়া উঠে। এই সকল কারণে করের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা ততটা কার্যকরী হয় না। শাসনতান্ত্রিক অক্ষমতা ও জনসাধারণের মানসিক অনুন্নতির দরুন দ্রব্য ও দামনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তাই এইরূপ দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা বিশেষ সম্ভবপর হয় না। অপরপক্ষে, অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জড়তা কাটাইবার জন্ম খুব কম পরিমাণে ঘাট্‌তি ব্যয় করিলে লাভ নাই; জাতির অর্থনৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটাইতে হইলে ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হওয়া দরকার। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, ঘাট্‌তি বাজেট পদ্ধতির দরুন মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে।

ঘাটতি ব্যয়ের ফল মুদ্রাস্ফীতি

অপূর্ণোন্নত দেশে ঘাট্‌তি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবেই, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলেই উহার ফল খারাপ, এমন কথা বিনা বিচারে মানিয়া লওয়া চলে কি? মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে যদি মূলধন-গঠনের বেগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় তবে আমরা নিশ্চয় এইরূপ মুদ্রাস্ফীতিকে অনেকটা সমর্থন করিতে পারি। সেই অবস্থায়

কথা হইল মুদ্রাস্ফীতি মূলধন-গঠন করে কিনা

বাজেট-ঘাট্‌তি বা ঘাট্‌তি ব্যয়ের নীতিও সমর্থনের যোগ্য। তাই এখন বিচার করা প্রয়োজন যে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে উহার ফলে মূলধন-গঠন দ্রুততর হইতে পারে কি না।

১। চাহিদা ও মুনাফা বাড়ায় তাই উৎপাদন বাড়ে

অপূর্ণোন্নত দেশে মূলধন-গঠনের পদ্ধতি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতিকে গ্রহণ করার স্বপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল ইহার ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং ক্রমাগত দামবৃদ্ধির দরুন মুনাফার পরিমাণ বাড়ে। এই সকল কারণে উদ্যোক্তারা উৎপাদন বাড়াইতে সচেষ্ট হয়। আর সকল দিকে উৎপাদন বাড়ানোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথা।

২। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মূলধন-গঠনে সাহায্য করে

শুধু তাহাই নহে। অপূর্ণোন্নত দেশে স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ কম এবং কর আদায়ের মারফত বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ। এই সকল দেশে মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে মূলধন-গঠনের হার কিছুটা দ্রুততর করা সম্ভবপর। কর-আদায়ের সাহায্যে সঞ্চয় সংগ্রহ করিতে হইলে শাসন বিভাগীয় দক্ষতা দরকার, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিতে ইহার প্রয়োজন ততটা নাই। মুদ্রাস্ফীতির দরুন প্রত্যক্ষভাবে মূলধন-গঠন সম্ভব হয়, কারণ এই নূতন টাকা তৎক্ষণাৎ ও সরাসরি বিনিযোগে খাটানো চলে। আর পরোক্ষভাবে ইহা মূলধন-গঠনে সহায়তা করে, কারণ দাম বাড়িয়াছে বলিয়া বেশির ভাগ অধিবাসীর ভোগের পরিমাণই কমিয়া আসে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করা দরকার যে, এই পদ্ধতিতে জনসাধারণের উপর বেশ কিছুটা কষ্ট ও চাপ সৃষ্টি হয়। তবে এই ধরনের সকল পদ্ধতিতেই এইরূপ বাধ্যতামূলক ত্যাগ স্বীকার অবশ্যম্ভাবী; কথা হইল কোন্ পদ্ধতিতে এই ত্যাগ স্বীকার ঘটানো যায়। উন্নয়ন প্রজেক্টগুলি ক্রমে ফলপ্রসূ হইতে থাকে, উৎপাদন-বৃদ্ধি পাইতে সুরু করে এবং ভবিষ্যতের বাজেটগুলিতে আরও ঘাট্‌তি পূরণ করার উপযোগী নূতন সঞ্চয় ও কর পাওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, উৎপাদনের প্রতিবন্ধকগুলি (production bottlenecks) যত তাড়াতাড়ি অপসারিত হয়, ততই বিনিয়োগের নূতন সুযোগ-সুবিধাগুলি দেখা দিতে থাকে। এই সকল সুযোগ-সুবিধা নিজেরাই অধিকতর সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দিবে। তাই বলা হয় যে, মুদ্রাস্ফীতির বিনিময়ে আমরা পাইব রাস্তাঘাট, নদী উপত্যকার বাঁধ, জলবিদ্যুৎ ও সেচের খাল। রক্ষণশীল গোঁড়া ধরনের বাজেট-রচনার পদ্ধতি মানিয়া

চলিলে এই সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া, অন্তত উন্নয়নের প্রথম যুগে, সহজ কথা নয়।

কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির স্বপক্ষে এই তত্ত্বমূলক আলোচনা খুব সাবধানতার সঙ্গে মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি মুদ্রাস্ফীতির দরুন অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসনবিষয়ক সমস্যার উদ্ভব হয়, আর সেই সমস্যাগুলির চাপে সমাজে এই ধারার স্ববিরোধী এই গুরুতর প্রভাব দেখা দেয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই পদ্ধতির বিপদ ইহার সুফলের তুলনায় অনেক বেশি।

কত রকমের বিপদ দেখা দেয়

আমরা জানি, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দাম বাড়ে, দরিদ্র জনসাধারণের ভোগ কমিয়া যায়, তাহাদের জীবনযাত্রার আসল মান হ্রাস পায়, ধনিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে মূলধন-গঠন ত্বরান্বিত হয় বটে, কিন্তু সামাজিক ন্যায় বিচারের গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষিত হয় না। অনেক সময় শ্রমিকের বা অন্যান্য চাপসৃষ্টিকারী দাবিদার জনসমষ্টির দাম-বৃদ্ধির সমান বা অধিক হারে তাহাদের মজুরি বাড়াইতে পারে (ফলে দাম-মজুরির উদ্‌ঘূর্ণ্যমান ধারা সৃষ্টি হয়)। ইহা সম্ভব হইলে মুদ্রাস্ফীতির স্বপক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তিও যেমন টেঁকে না, আবার উহার বিরুদ্ধে সামাজিক যুক্তিও তেমনি দুর্বল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে মূলধন-গঠনের বেগ দ্রুততর করিয়া তোলার ধারা দুর্বল হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ টাকার মূল্য হ্রাস পায়, লোকেরা নিজেদের সঞ্চয় তরল টাকার আকারে না রাখিয়া তারল্যহীন আসল সম্পত্তিতে আবদ্ধ করে বা দেশের বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। এই অবস্থা দেখা দিলে বাস্তবে মূলধন-গঠনের হার কমিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। উন্নয়নের কাজে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সময়ে নির্দিষ্ট সুদের হারে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজে টাকা সংগ্রহ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। একবার মুদ্রাস্ফীতি সুরু হইয়া গেলে টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য মূল্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে লোকের মনে বিশ্বাস টুটিয়া যায়, বিনিয়োগকারীরা আর ঋণপত্র ক্রয়ের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে না।

সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়, মজুরি বাড়াইতে হয়

মূলধন অতরল রূপ লয়, বিদেশে চলিয়া যায়, দীর্ঘকালীন বিনি-য়োগ ঘটে না

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির ফল অনেকটা

নির্ভর করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রচলিত ঐতিহ্যের উপর। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এমন লোক থাকে যাহাদের শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশি, মুনাফা পুনর্নিয়োগের অভ্যাস ও ইচ্ছা আছে এবং ব্যবসায় প্রসারে উৎসাহী, তবে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুনাফা কলকারখানার প্রসার ঘটায় এবং যন্ত্রোৎপাদন বাড়াইয়া তোলে। অপরপক্ষে, যদি ব্যবসায়ীদের ঐতিহ্য প্রধানত লেনদেনী-বাণিজ্যিক ও মহাজনী-তেজারতীমূলক হয়, তবে ব্যবসায়ীদের মুনাফা দেশের ফাট্‌কা-বাজারেই ঘোরাঘুরি করে, টাকার নিজের লেনদেন ফাঁপিয়া উঠে, এমন কি অসামাজিক বিলাস ব্যসন ও অবাঞ্ছিত ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যখন অর্থনৈতিক দেহে এইরূপ কালোবাজারী প্রভাব দেখা দেয় এবং ফাট্‌কাবাজি সুরু হয় তখন দেশের উৎপাদনধারার বিকৃতি ঘটে, মূলধন-নিয়োগ দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্রে নিযুক্ত না হইয়া সর্বাধিক মুনাফা-প্রদানকারী ক্ষেত্রে উহার নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। তাই মিশ্র অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে, যেখানে উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর সামাজিক মালিকানা নাই সেই সকল উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা মূলধন-গঠনের চেষ্টা করা বিশেষ বিপদজনক।

ব্যবসায়ীদের ঐতিহ্যও চরিত্রের উপর ইহা নির্ভরশীল

মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক অর্থসংগ্রহের এই কৌশল কার্যকরী করিতে হইলে উহার বিরূপ প্রভাবসমূহ প্রতিরোধের উপযোগী বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দরকার হয়। উচ্চহারে কর আরোপের সঙ্গে সঙ্গে দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং, বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, মূলধনের রপ্তানির বাধা-নিষেধ, এবং অনুরূপ আরও অনেক কার্যসূচী প্রয়োগ করা দরকার হইয়া পড়ে। এই সকল কর নিয়ন্ত্রণের নীতি এড়াইবার জন্যই ঘাটতি-বাজেটের পথ গৃহীত হইয়াছিল। তাই অনেক দেশ অনিচ্ছার সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির পথ গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গেই এই সকল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি গড়িয়া তোলে *

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

* "A major safeguard is building up of sufficiently large stocks of foodgrains in order to counteract inflationary pressures that may emerge from time to time. No amount of prudence in financial management can by itself eliminate completely the risk of inflation in an economy attempting to develop rapidly. The best defence against inflation is, in a sense, to keep clear of it, but a policy of playing safe is not always conducive

অনুশীলনী

1. Account for the emphasis placed in the First Five Year Plan upon agriculture and irrigation. How far would you like to shift this emphasis in the Second Five Year Plan ?

2. Examine the justification for the relatively greater emphasis placed in the Second Five Year Plan on small scale industries on the one hand and heavy & basic industries on the other hand, than on the large scale consumer's goods industries.

3. Discuss the main features of India's Second Five Year Plan. In what important respects does the Second Plan differ from the First Five Year Plan.

4. "Deficit finance in underdeveloped countries tends to be inflationary finance." Discuss the statement in the present Indian context,

5. Discuss the stresses and strains to which the Second Five Year Plan has been subjected ever since its commencement. Give in this connection a critical estimate of the progress of the plan.

to development. A measure of risk has to be undertaken and the most effective insurance against this risk is command over reserve stocks of foodgrains—and a few other essential commodities—which can be used to augment the supplies in the market as and when necessary. Prices of food and cloth occupy a strategic position in the Indian economy, and a sharp rise in these prices had to be prevented by the use of all available devices. So long as these prices can be maintained at reasonable levels, the cost of living of the large bulk of the population can be kept under control, increases in prices of other commodities would be a matter of comparative unimportance, although any excessive rise in prices anywhere in the system does carry the danger of drawing away of resources into low-priority uses. Corrective action can, however, take care of such a situation. A further defence against inflation is discriminating but prompt use of the instrument of taxation to prevent excessive increase in consumption in certain lines and to mop up the excess profits or windfall gains that deficit financing tends to generate. Finally, physical controls, including rationing and allocations, can be used to prevent consumption from increasing beyond a particular level and for economising scarce materials, or scarce productive resources. But experience of the past suggests that physical controls especially on essential and staple consumer goods are not a device that can be relied upon to function effectively or equitably for any great length of time. This makes it all the more necessary to utilise to the full all the other available safeguards and correctives, for a curtailment of the plan itself can, in the nature of things, be thought of only in a situation of extreme difficulty."

—*Second Five Year Plan*. P. 86-87.

6. Give a critical estimate of the achievement of India's First and Second Five Year Plans.

7. "Deficit financing is an effective instrument for financing the country's economic development." Discuss with reference to India.

8. What do you understand by 'deficit financing" ? How far and under what circumstances can this be justified ?

9. Discuss the scheme of financing the investment in public sector under the Second Five Year Plan and give your views on the adequacy of the steps taken up till now.

10. Analyse the main differences between the Indian First and Second Five Year Plans and explain why the Second Plan is facing difficulties which did not appear during the First Five Year Plan period.

11. What are the circumstances in which you would justify infiationary financing of development expenditure ? Do these circumstances exist in India ?

12. Briefly recapitulate the main achievements of the Second Five Year Plan and consider the difficulties that it has come up against so far.

13. Comment on the proposal for giving priority to agriculture in India's economic plans.

14. Give a critical estimate of the main achievements of the Second Five Year Plan.

15. Discuss the aims and objectives of India's' Second Five Year Plan. To what extent have these objectives been realised ?

16. On what considerations would you justify the emphasis placed on heavy industrirs in India's Five Year Plans ?

৩২

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

Third Five Year Plan

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা (An outline of the Third Five Year Plan)

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে ভারতেব অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল একান্তভাবে গতিহীন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অতি অল্প একটু বেশি হারে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটিতেছিল। ভোগ, সঞ্চয় উৎপাদন-ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান—সকল বিষয়ে বৃদ্ধির হার ছিল কম। তবে গত দশ বৎসরে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রভাবে উন্নয়নেব হার কিছুটা বৃদ্ধি পাইযাছে। গড়ে বৎসরে প্রায ৪% হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়াছে, দুইটি পরিকল্পনা মিলিয়া সামগ্রিক জাতীয় আয প্রায ৪২% বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল যে জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণই বাড়িয়া গিয়াছে তাহা নহে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষমতা (growth potential) বৃদ্ধি পাইযাছে। যেমন পূর্বে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেকই ছিল কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, ইহা বাড়িযাছে ⅓ অংশ ; কিন্তু সংগঠিত কারখানা-ক্ষেত্র হইতে আয় হইয়াছে দুই গুণ। আবার, এই সংগঠিত শিল্পের মধ্যেও (প্রসারের গড়-হারের তুলনায়) মূলধনী দ্রব্যের প্রসারের হার ছিল বেশি। কিন্তু দেশে অর্থনৈতিক প্রসারের প্রযোজনীয়তা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রচলিত ধারণার তুলনায় অধিকতর হারে জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, গত পাঁচ বছরে মাথাপিছু আয বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ১৬%। একই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির দ্রুত প্রসার হইয়াছে, ফলে অপূর্ণোন্নত দেশগুলির তুলনায় তাহাদের অবস্থার পার্থক্যের পরিধি অধিকতর বাড়িয়া চলিয়াছে। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা হইতে তাই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ভারতের বেশ কিছু সংখ্যক জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে উল্লেখযোগ্যরূপে প্রভাবিত করিতে হইলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক

তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার পরিবেশ কিরূপ

উন্নয়নের হার উহার অনেক উর্ধ্বে তুলিয়া রাখা দরকার। এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখিয়াই ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে পাঁচটি বিষয় ধরা হইয়াছে:

(১) বাৎসরিক প্রায় ৬% হারে জাতীয় আয় বাড়ানো, এবং পরবর্তী পরিকল্পনা কালগুলিতেও উন্নয়নের এই হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের ধরণ রচনা করা;

(২) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্প ও রপ্তানির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি;

(৩) ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প, জ্বালানি এবং শক্তি প্রভৃতি মূল শিল্পের প্রসার এবং যন্ত্রোৎপাদন ক্ষমতা গড়িয়া তোলা, যাহাতে প্রধানত দেশের নিজস্ব উপকরণ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে অধিকতর শিল্পায়নের প্রয়োজন মিটানো যায়;

(৪) দেশের জনসম্পদকে যথাসম্ভব পূর্ণতম ব্যবহার করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার প্রভূত প্রসারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৫) অধিবাসীদের মধ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণে সুযোগ-সুবিধার সমান ব্যবস্থা করা, আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমাইয়া দেওয়া এবং অর্থ নৈতিক ক্ষমতাকে অধিকতর সমান ভাবে বণ্টন করা।

বিগত দশ বৎসরের পরিকল্পনার ফলে ভারতে দ্রুততর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। এই ভিত্তির উপর আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী গ্রহণ করিব। ইহা হইবে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে পৌঁছাইবার প্রথম ধাপ।

তৃতীয় পরিকল্পনার গঠন-রীতি অনেকাংশে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কৌশল ও অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায়, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইহার ঝোঁক একটু পৃথক। বিশেষত, কৃষি-কাঠামোকে আরও অনেক সুগঠিত ও দৃঢ় করিয়া তোলা ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রথম দুইটির, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ভারতের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির একটি অন্যতম প্রধান বাধা হইল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বল্প হার। তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যগুলি সফল করিয়া তুলিতেই হইবে; ইহার জন্য অর্থ বরাদ্দের ত্রুটি করিলে

চলিবে না, এই উদ্দেশ্যে দেশের সকল অঞ্চলের মাটি ও মানুষের পূর্ণতম ব্যবহার করিতে হইবে।*

গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা মূলত নির্ভর করিবে জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায়ের উপর। তাহারা নিজ নিজ অঞ্চলের জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিবে।

উপরের এই সকল লক্ষ্য অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। এই সকল সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে অর্থনৈতিক দেহের বিভিন্ন অংশের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় অনেক বাড়াইতে হইবে। মণ-টন, লক্ষ কোটির হিসাবে প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন কতটা বাড়াইতে হইবে সেই সকল পরিমাণগত লক্ষ্য (physical targets) আমাদের জানা উচিত।

সাধারণভাবে কৃষি-উৎপাদন সূচক (১৯৪৯—৫০ সালকে ১০০ ধরিলে) বর্তমানে আছে ১৩৫, তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ইহা হইবে ১৭৬, অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়াইতে হইবে। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৭৬ মিলিয়ন টন হইতে ১০০ মিলিয়ন টন করিতে হইবে। মোট জলসিঞ্চিত অঞ্চলের পরিমাণ ৭০ মিলিয়ন একর হইতে ৯০ মিলিয়ন একর করিতে হইবে। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দানের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা হইতে ৫৩০ কোটি টাকায় তুলিতে হইবে।

কৃষি-উৎপাদনের লক্ষ্য

সাধারণ শিল্প-উৎপাদনের সূচক (১৯৫০—৫১ সালকে ১০০ ধরিলে) বর্তমানে আছে ১৯৪, তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ইহা হইবে ৩২৯ ; অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগ বাড়াইতে হইবে। ইস্পাত ও পেট্রলজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথাক্রমে ১৬৩% এবং ৭০% বাড়িবে। বস্ত্রের উৎপাদন ৭৪৭৬ মিলিয়ন গজ হইতে ৯৩০০ মিলিয়ন গজ, অর্থাৎ ২৪% বৃদ্ধি পাইবে। লৌহের উৎপাদন ১০·৭ মিলিয়ন টন হইতে

শিল্প-উৎপাদনের বিভিন্ন লক্ষ্য

* "The general pattern of development in the Third Plan necessarily flows, in large part, from the basic approach and experience of the Second Plan. However, in some important respects it represents a wider view of the problems of development and calls forth for more intensive effort and greater sense of urgency...... In the scheme of development during the Third Plan the first priorito necessarily belongs to agriculture. Experience in first two plans, and especially in the second, has shown that the rate of growth in agricultural production is one of the main limiting factors in the progress of the Indian economy." *Third Five Year Plan*, Ch. IV, P. 49.

৩০ মিলিয়ন টন হইবে অর্থাৎ ১৮০% বাড়িয়া যাইবে। কয়লার উৎপাদন বাড়িবে ৫৪.৬ মিলিয়ন হইতে ৯৭ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ ৭৬%। শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ৫.৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট হইতে ১৭.২ মিলিয়ন কিলোওয়াট হইবে। মালবহনের হিসাবে রেলপথের ক্ষমতা ১০৫ মিলিয়ন টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ২৪৫ মিলিয়ন টন।

শিক্ষা ও ভোগ

উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষার প্রসার না ঘটাইলে এত বড় পরিকল্পনা সফল করা যায় না। সাধারণত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ৪৩.৫ মিলিয়ন হইতে ৬৩.৯ মিলিয়ন হইবে। কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা ১৩.৯ হাজার হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৯.১ হাজারে তুলিতে হইবে। ভোগের স্তরও বাড়াইতে হইবে; মাথাপ্রতি দৈনিক ক্যালোরির পরিমাণ ২১০০ হইতে ২৩০০ করিতে হইবে। বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বাৎসরিক মাথাপিছু ১৫.৫ গজ হইতে বাড়াইয়া ১৭.২ গজ করিতে হইবে। দামস্তর আর বাড়িতে দেওয়া চলিবে না, বিশেষত সরকারী গুদামের সংখ্যা বাড়াইয়া খাদ্যশস্যের দাম সমান রাখিতে হইবে।

কর্মসংস্থানের পরিমাণ হিসাব করিয়া বলা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরে কর্মে যোগদানেচ্ছু লোকের সংখ্যা হইবে ১৭ মিলিয়ন। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচীগুলি হইতে ১৪ মিলিয়ন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

আয় ও কর্মসংস্থান

যদি সকল কার্যসূচী পূর্ণ পরিমাণে সফল হয়, তবে পরিকল্পনাকালের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে ৩৪%। তবে সকল কার্যসূচীর পূর্ণ সাফল্য সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন ততটা সুনিশ্চিত নন। তাই তাঁহাদের মতে জাতীয় আয় অন্তত ৩০% বৃদ্ধি পাইবে: ১৯৬০—৬১ সালের দামস্তরের হিসাবে বর্তমানের ১৪৫০০ কোটি টাকা হইতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯০০০ কোটি টাকা হইবে। বর্তমান জনসংখ্যার হিসাবে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ১৯৬০-৬১ সালের ৩৩০ টাকার তুলনায় ৩৮৫ টাকায় পৌঁছিবে।

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, (ক) জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (খ) জনসাধারণের মনে ক্রমপ্রসারমান প্রত্যাশা, এবং (গ) আগামী দুই তিনটি পরিকল্পনার মধ্যেই স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে পৌঁছাইবার প্রয়োজনীয়তা—এই সকল কারণের দরুণ উপরের লক্ষ্যসমূহ অতি অবশ্যই আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে

পূরণ করা দরকার। তাহা ছাড়া, তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচীর মধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনা কালের জন্য কিছু কিছু কাজ করিয়া রাখাও প্রয়োজন। লক্ষ্যসমূহ ধার্য করার সময়ে সেই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উপরের এই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবে সফল করিতে হইলে সরকারী ক্ষেত্রে ৮০০০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তি ক্ষেত্রে ৪১০০ কোটি টাকা মোট ব্যয় করিতে হইবে। পরিকল্পনার ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়াইবার বিভিন্ন কার্যসূচী সময় ও অগ্রাধিকারের দিক হইতে পরস্পরের উপর ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল; সকলে মিলিয়া উৎপাদন যত বাড়াইয়া তুলিবে ততই পরিকল্পনায় ব্যয়ভার বহন করা সহজ ও সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। উৎপাদন হইতেই আয় সৃষ্টি হয়, সেই আয় মূলধনরূপে খাটাইতে পারিলে উৎপাদন বাড়িতে পারে। তাই পরিকল্পনা রচনার সময়ে দেশে উপকরণ ও মূলধনের স্বল্পতা পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে পরিকল্পনা কমিশন দেখিতে পাইয়াছেন যে, পরিকল্পনার রচনা-কালে অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের উপযোগী পরিকল্পনা তৈয়ারী করা উচিত নয়; কারণ তাহাতে ইহা কার্যকরী করার সময়ে সকল সুযোগ ও সুবিধা পূর্ণরূপে ব্যবহার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমরা যতই বিভিন্ন উৎপাদনের লক্ষ্যসমূহে পৌঁছাইতে থাকিব, পরিকল্পনার জন্য ততই বেশি পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করার সম্ভাবনা বাড়িতে থাকিবে।

পরিকল্পনাকে অনেকটা নমনীয় রাখা হইয়াছে

বর্তমানে তাই, বিভিন্ন প্রকার সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য মোট ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের কথা চিন্তা করা হইয়াছে। এই ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ হইল ৬৩০০ কোটি টাকা এবং চলতি খরচা হইল ১২০০ কোটি টাকা। বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪১০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রকার মূলধনী সম্পত্তি গড়িয়া তুলিতে যে ব্যয় তাহাই বিনিয়োগ (যেমন ঘরবাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি). ইহার সঙ্গে এই কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের মাহিনাও ধরা হয়। অর্থাৎ মূলধনী খাতে সকল ব্যয়ের মোট পরিমাণই হইল বিনিয়োগ। আর চলতি খরচা বলিলে বোঝা যায়

বিনিয়োগ ও চলতি খরচায় পার্থক্য কি

'বিনিয়োগ' ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়।* পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলির উপর সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মিলিয়া বিনিয়োগের ধরন কি হইবে তাহা নিচের তালিকাতে দেখানো হইল (কোটি টাকার হিসাবে):

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা				তৃতীয় পরিকল্পনা			
বিষয়	সরকারী	বেসরকারী	মোট	শতকরা	সরকারী	বেসরকারী	মোট	শতকরা
১। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	২১০	৬২৫	৮৩৫	১২	৬৬০	৮০০	১৪৬০	১৪
২। প্রধান ও মাঝারি জলসেচ	৪২০	*	৪২০	৬	৬৫০	*	৬৫০	৬
৩। শক্তি	৪৪৫	৪০	৪৮৫	৭	১০১২	৫০	১০৬২	১০
৪। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প	৯০	১৭৫	২৬৫	৪	১৫০	২৭৫	৪২৫	৪
৫। সংগঠিত শিল্প ও খনি	৮৭০	৬৭৫	১৫৪৫	২৩	১৫২০	১০৫০	২৫৭০	২৫
৬। পরিবহন ও সংযোগ	১২৭৫	১৩৫	১৪১০	২১	১৪৮৬	২৫০	১৭৩৬	১৭
৭। সামাজিক সেবাকার্য ও বিবিধ	৩৪০	৯৫০	১২৯০	১৯	৬২২	১০৭৫	১৬৯৭	১৬
৮। মজুত	—	৫০০	৫০০	৮	২০০	৬০০	৮০০	৮
মোট	৩৬৫০	৩১০০	৬৭৫০	১০০	৬৩০০	৪১০০	১০৪০০	১০০

উপরের এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ১৪%—ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে

* "Investment is expenditure on the creation of physical assets (e. g. buildings, plant and equipment), including expenditure on personnel required for putting up these assets. The expression corresponds broadly to expenditure on capital account."

"Current outlay corresponds broadly in expenditure on revenue account on plan schemes; it is experditure other than that classified investment". —*Third Five Year Plan*, P. 58 (foot-note).

বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িবে ৭০% এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৩২%। এই সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো কতটা সম্ভবপর হইবে তাহা অনেকটা অনিশ্চিত। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট নির্ভর করিবে কতটা বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে এবং ঠিক কখন প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া বসানো যাইবে তাহার উপর। অনেকগুলি প্রজেক্টই পরস্পর-নির্ভরশীল এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট ; একটিতে বিনিয়োগের ঘাট্‌তি ঘটিলে অপরগুলির প্রসার ঘটিতে পারে না। আভ্যন্তরীণ সকল উপকরণ পূর্ণ সংগ্রহ করিয়া অতি দ্রুত বিভিন্ন প্রজেক্টগুলি শুরু করা দরকার। এই কথা মনে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন ; ইহার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ১২০০ কোটি টাকার চলতি খরচা। একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। সরকারী ক্ষেত্রে ৬৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্য হইতে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা হইবে। তাই প্রকৃতপক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইল ৪৩০০ কোটি টাকা এবং সরকারী ক্ষেত্রের ৬১০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই ২০০ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করিতে হইবে ; তাই অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা হইল বেসরকারী ক্ষেত্রের ৪১০০ কোটি টাকা এবং সরকারী ক্ষেত্রের ৬৩০০ কোটি টাকা।

বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা

পাঁচ বৎসরে মোট ১০৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হইলে বর্তমানে জাতীয় আয়ের ১১% হইতে পরিকল্পনার শেষে বিনিয়োগ ঘটিবে প্রায় ১৪%। এই বিনিয়োগের কিছু অংশ বৈদেশিক মূলধন হইতে আসিবে ; তাই ইহার সবটাই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ফল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার হইল বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৮.৫% ; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা হইবে ১১.৫%।

অপূর্ণোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার উন্নত করার প্রধান সমস্যাই হইল উপকরণ সংগ্রহ করা। উপকরণ সংগ্রহের সমস্যাটিকে দুইদিক হইতে দেখা চলে। প্রথমত, উৎপাদন-ধারায় বিনিয়োগের উপযোগী প্রকৃত দ্রব্যসামগ্রী কি পরিমাণে কোথায় অবস্থিত আছে, কিরূপে উহাদের উৎপাদন-কেন্দ্রে পৌঁছান যায় ও নিয়োগ করা চলে—এইরূপ দৃষ্টিতে আমরা ইহা বিচার করিতে পারি।

অথবা, দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যসূচী সফল করিতে হইলে টাকার অংকে হিসাব করিয়া উহাদের জন্য মোট কত ব্যয় হয় এবং সেই টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে—এইরূপ দৃষ্টিতেও বিচার করা চলে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, উভয় পদ্ধতিতে কোন একটিই আমরা গ্রহণ করি না কেন, সঠিকভাবে হিসাব করিলে উভয়ের ফল সমানই হইবে। প্রকৃত দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে উপকরণগুলি সারা দেশময় বিক্ষিপ্ত এবং বহু বিচিত্র ও পৃথক ধরনের জিনিষপত্র ইহার মধ্যে ধরিতে হয়। ভারতবর্ষে অতটা তথ্য আমাদের জানা নাই। তাহা ছাড়া, দেশের সকল সম্পত্তি বা উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা স্থাপন করিলে তবেই এইরূপ প্রকৃত উপকরণ লইয়া হিসাব করা সম্ভবপর। জমি, খাল, বিল, নদী, খনি, কলকারখানা, হাট-বাজার রাস্তাঘাট—সবই যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধীন রাখা হয় তবে দ্রব্যসামগ্রীসমূহ হিসাব করা অসুবিধা এবং হিসাব পাইলেও মালিকেরা সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য সরকারের হাতে উহাদের ছাড়িয়া দিতে রাজি হইবে কি না বলা মুস্কিল। তাই ঐ সকল উপকরণকে আমরা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা পণ্য হিসাবে ধরিয়া লইয়া উহাদের বাজার হইতে টাকা দিয়া কিনিয়া আনিতে কত খরচ হইবে সেই হিসাব করিয়া পরিকল্পনার ব্যয়ভার গণনা করি।

আমরা উপকরণের হিসাব করি টাকার অংকে

যদিও সরকারীক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যয়ভার ৮০০০ কোটি টাকা, তবুও কমিশন বর্তমানে ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের হিসাব দিয়াছেন। কোন্ কোন্ উৎস হইতে এই টাকা পাওয়া যাইবে তাহা তালিকার আকারে নিচে দেওয়া হইল :

(কোটি টাকার হিসাবে)

উৎস	দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রাথমিক হিসাব	দ্বিতীয় পরিকল্পনা পরিবর্তিত হিসাব	তৃতীয় পরিকল্পনা
১। চলতি কর হইতে উদ্বৃত্ত (অতিরিক্ত কর বাদে)	৩৫০	—৫০	৫৫০
২। রেলওয়ে হইতে প্রাপ্ত	১৫০	১৫০ (ক) †	১০০
৩। অন্যান্য সরকারী উদ্যোগের উদ্বৃত্ত	(খ)	(খ)	৪৫০
৪। জন সাধারণের নিকট হইতে ঋণ (নীট)	৭০০	৭৮০ (গ)	৮০০
৫। স্বল্প সঞ্চয় (নীট)	৫০০	৪০০	৬০০
৬। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড (নীট)		১৭০	২৬৫
৭। ইস্পাত সমীকরণ তহবিল			
৮। পরিকল্পনার বহির্ভূত খরচায় উপরে বিবিধ মূলধনী আয়ের	২৫০	৩৮	১০৫
ব্যালান্স		২২	১৭০
৯। ১ হইতে ৮ পর্যন্ত মোট	১৯৫০	১৫১০	৩০৪০
১০। সরকারী উদ্যোগ হইতে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সহ অধিকতর কর আদায়	৪৫০ (ঘ)	১০৫২	১৭১০
১১। বৈদেশিক সাহায্য	৮০০	১০০০	২২০০
১২। ঘাট্‌তি ব্যয়	১২০০	৯৪৮	৫৫০
মোট	৪৮০০	৪৬০০	৭৫০০

তৃতীয় পরিকল্পনা ও কৃষি (Third Plan and Agriculture)

আমরা জানি যে আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৃষির উপর জোর দিয়া রচিত হইয়াছিল। এই নীতির স্বপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যেমন, যুদ্ধোত্তর ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যাভাবের গুরুতর চাপ ছিল, দেশ বিভাগের ফলে ভারতে খাদ্যের স্বল্পতা আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তুলা ও পাট প্রভৃতি কাঁচামালের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম। তাহা ছাড়া, আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক আসে কৃষিক্ষেত্র হইতে; শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। কৃষির ভিত্তি দৃঢ় না করিয়া

প্রথম পরিকল্পনা ও কৃষি

† (ক) ভাড়া বৃদ্ধি হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লওয়া। (খ) তালিকার (১) ও (৮) নং-এর অন্তর্ভুক্ত। (গ) ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক P. L. 480 ভাণ্ডার হইতে বিনিয়োগ ইহার অন্তর্ভুক্ত। (ঘ) ইহার উপরেও ৪০০ কোটির টাকার ফাঁক রাখা হইয়াছিল; ইহা অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে আদায় করা হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল।

শিল্প প্রসার সুরু করা সম্ভবপর ছিল না। গ্রাম হইতে প্রচ্ছন্ন বেকারদের সরাইয়া আনিয়া শহরে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিতে হইলেও কৃষিতে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা দরকার—এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'উদ্বৃত্ত' সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সকল কারণেই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রথম পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যসূচীর ফলে আমাদের কৃষি-কাঠামোর ভিত্তি কিছুটা সুদৃঢ় হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে তাই শিল্পের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচী পরিত্যাগ করা হয় না; তবে মূল ও ভারি শিল্পের প্রসারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রধানত দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। সহরাঞ্চলে বড় বড় কলকারখানায় অধিক বিনিয়োগ হওয়ায় দেশে আর্থিক আয়সৃষ্টির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে, খাদ্যশস্যের জন্য চাহিদা তাই বিশেষরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। উৎপাদন ততটা বৃদ্ধি পায় নাই, তাই ফাট্‌কাদারি সুরু হইয়াছে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, পরিকল্পনার ব্যয়ভার বাড়িয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও কৃষি

তৃতীয় পরিকল্পনায় তাই পুনরায় কৃষির উপর জোর দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কমিশনের ভাষায় বলা চলে যে "ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্মুখে প্রধান সীমা হইল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার।"* দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ৯৫০ কোটি টাকার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপরে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ১৭১৮ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে কৃষি, জলসেচ এবং সমষ্টি উন্নয়নের কার্যসূচীকে ধরা হইয়াছে। এই সকল কার্যসূচীর লক্ষ্য হইল আগামী পাঁচ বৎসরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ করিয়া তোলা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িবার সম্ভাবনা ৩০% এবং অন্যান্য শস্যের ৩১%।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর

এত অধিক উন্নয়ন-হার পাইতে হইলে বিভিন্ন দিকে গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা করা

* "In the scheme of development during the Third plan the first priority necessarily belongs to agriculture. Experience in first two plans, and especially in the Second, has shown that the rate of growth in agriculture production is one of the main limiting factors in the progress of the Indian economy." *Third Five Year Plan.* P. 49.

দরকার। প্রথমত, বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার জলসেচের কার্যসূচীই গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইহাদের ফলে প্রায় ২০ মিলিয়ন একর জমিতে সেচব্যবস্থা প্রসারিত হইবে। নীট জলসিঞ্চিত এলাকার পরিমাণ ৯০ মিলিয়ন একরে পৌঁছিবে। দ্বিতীয়ত, শুষ্ক চাষ পদ্ধতির প্রসার ঘটাইতে হইবে অন্তত ২২ মিলিয়ন একরে; এবং ১১ মিলিয়ন একর জমির ক্ষয় রোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত, সারের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় ৫'৬ গুণ বাড়ান দরকার। সবুজ সারের অধীনে জমির পরিমাণ ১১'৮ মিলিয়ন একর হইতে বাড়াইয়া ৪১ মিলিয়ন একরে পরিণত করিতে হইবে। অতিরিক্ত ৫০ একর জমিতে বৃক্ষসংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। চতুর্থত, উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রসারের বৃহৎ কার্যসূচীর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আধুনিক টেক্‌নোলজি প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে—ইহার মধ্যে থাকিবে প্রতিটি রাজ্যে এক একটি কেন্দ্র যেখানে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির পরীক্ষা, রূপাংকন, টেক্‌নিকাল নির্দেশদান এবং উৎপাদন হইতে থাকিবে। এই কেন্দ্রগুলির আরও কাজ হইবে উৎপাদকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা; উন্নত যন্ত্রপাতির যোগান ক্রয় ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণ সরবরাহ করা; এবং রাজ্যে কৃষি এন্‌জিনিয়ারিং-এ দক্ষ ব্যক্তির অভাব পূরণ করা। পঞ্চমত, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সমষ্টি উন্নয়নের কার্যসূচী সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পৌঁছান হইবে—এইরূপে টেক্‌নিকাল সাহায্য এবং যোগান দেশের সকল চাষীর নিকট উপস্থিত হইবে। সকল গ্রামই পঞ্চায়েৎ এবং সমবায়ের দ্বারা পরিচালিত হইবে। জিলা ও ব্লক স্তরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিয়া উন্নয়নের দায়িত্ব ও উৎসাহ প্রতিটি অঞ্চলের জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সেবা-সমবায় সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৩৭ মিলিয়নে পৌঁছিবে, অর্থাৎ মোট কৃষি-পরিবারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সমবায়ী ঋণের বিপুল প্রসার করিতে হইবে, ৫৩০ কোটি টাকার মাঝারি ও স্বল্পকালীন ঋণ এবং ১৫০ কোটি টাকার দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া হইবে। সমবায় বিক্রয় সমিতির সংখ্যা বাড়াইয়া ১৮৬৯ হইতে ২৪৭০ করা হইবে। বিভিন্ন কৃষিপণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে প্রায় ৯৮০টি নূতন গুদাম তৈয়ারি হইবে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে ৯২০০টি ছোট গুদাম প্রস্তুত হইবে।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচী

সমবাযেব ভিত্তিতে ২০টি নূতন চিনিব কারখানা স্থাপিত হইবে এবং চাল, তুলা, পাট, চীনাবাদাম, ফল প্রভৃতি পরিশোধনের জন্য সমবাযী কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ২২০০টি প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি এবং ৫০টি পাইকারী সমিতি গঠিত হইবে। সমবায চাষপ্রথাকে জনপ্রিয করিযা তোলাব চেষ্টা হইবে এবং সারা দেশে পবীক্ষামূলকভাবে ৩২০০ সমবাযী ফার্ম স্থাপিত হইবে। ষষ্ঠত, উপযুক্ত সেচব্যবস্থা আছে এবং নিশ্চিত বৃষ্টিপাতেব সম্ভাবনা আছে এইরূপ কয়েকটি জিলাতে প্রগাঢভাবে সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত কবা হইবে যাতে কৃষি উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পাবে। প্রথম দিকে প্রতিটি রাজ্য হইতে এইরূপ এক একটি জিলা বাছিযা লওযা হইবে। এই গুরুত্বপূর্ণ নূতন কর্মসূচীর ফলে গ্রাম পঞ্চাযেৎ এবং সমবাযেব মাধ্যমে একসঙ্গে টেকনিকাল সাহায্য, সার, উন্নত ধবনেব ঋণ এবং অন্যান্য প্রযোজনীয সকল কিছু প্রতিটি চাষীর নিকটে পৌছিবে—খাদ্যশস্যেব উৎপাদন ও বিক্রযযোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল কা স্থচী সফল হইলে একব-প্রতি উৎপাদন বহু পবিমাণে বাড়িযা যাইবে। যেমন, উদাহবণস্বরূপ তৃতীয় পবিকল্পনাকালে ধানেব উৎপাদন গড়ে প্রতি-একরে ৮০৭ পাউণ্ড হইতে বাড়িযা ১০৩০ পাউণ্ডে দাঁড়াইবে।

এই সবল কার্যসূচী সমাপ্ত হইলে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বযংসম্পূর্ণ হইযা উঠিবে এবং মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য ভোগেব পবিমাণ বর্তমানেব ১৬ আউন্স হইতে বাড়িযা ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭.৫ আউন্সে পবিণত হইবে। ১৯৬০-৬১ সালে বস্ত্রেব ব্যবহার ছিল মাথাপিছু বৎসবে ১৫.৫ গজ, ইহা হইতে ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭.২ গজে পৌছিবে। ফলমূল ও তবীতবকাবীর উৎপাদন, শোধন ও ব্যবহাব বাড়ান হইবে। বপ্তানি বাড়ান বা আমদানি কমান যায এইরূপ দ্রব্যেব উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়াইবাব চেষ্টা কবিতে হইবে, কাবণ তাহাতে বৈদেশিক মুদ্রাব সাশ্রয হইবে।

এই কার্যসূচী সফল হইলে ভোগের পরিমাণ কি হইবে

তৃতীয পবিকল্পনা ও কৃষি সম্পর্কে দুইটি দিক হইতে সমালোচনা করা যাইতে পাবে। প্রথমত, কৃষিব উপব অগ্রাধিকার দেওযা উচিত হইযাছে কি না এবং দ্বিতীযত, উৎপাদন বৃদ্ধির যে সকল লক্ষ্য স্থির করা হইযাছে তাহা বর্তমান কর্মসূচী দ্বারা সফল করা সম্ভব হইবে কি না। অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য অযথা

দুইটি সমালোচনা

অতি উচ্চে ধার্য করা হইয়াছে, ইহা নিছক প্রচারমূলক। তাঁহাদের মতে খাদ্যের বাজারে ফাট্কাদারি বন্ধ করিতে পারিলে, দামনিয়ন্ত্রণ, কণ্ট্রোল ও রেশনিং প্রবর্তন করিলে, অন্ততপক্ষে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইলে কৃষিতে এতটা বিনিয়োগের কোন প্রয়োজন ছিল না। কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত টানিয়া লইয়া আসাই উন্নয়নের প্রথম যুগে মূলধন-গঠনের প্রকৃষ্ট পথ। তাহা না করিয়া বরং যে মূলধন বর্তমানে শিল্পে বিনিয়োগ হইতে পারিত, তাহাকে কৃষিক্ষেত্রে পাঠান হইতেছে। প্রথম দিকে শিল্পের প্রসার ঘটাইলে পরে সেই শিল্প হইতে কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইবে; ইহাতেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হইয়া একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদন-ক্ষমতা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার এই নীতির ফলে, তাই উন্নয়নের হার হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়ত, অনেকের মতে কৃষি উৎপাদনের কর্মসূচীতে মূল সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে না। বেশি পরিমাণে সার, জল, গুদাম, ঋণ প্রভৃতি তাহারাই পাইয়াছে, যাহারা জমির মালিক, প্রকৃত চাষী নয়। ভূ-সম্পত্তির মালিকানা-কাঠামোতে বদল হয় নাই, জমিদারী আইন এড়াইয়া জমির কেন্দ্রিকতা বাড়িয়াছে। নগদ টাকায় মজুরি দিয়া চাষ করাইবার ধনতান্ত্রিক প্রথা ভারতে সুরু হইয়াছে—এই প্রথার প্রসারের জন্যই সমবায়ী ঋণ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা সকলেই জানেন। এইরূপে সমবায় সমিতিগুলি প্রকাশ্যে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু জমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার দরুণ বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন, শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রীকরণ সম্ভব হইতেছে না। তাই জমির মালিকেরা মিলিয়া জমি একত্রে মিলাইয়া "যৌথ-ব্যবসায়" গঠন করিয়া "স্বাধীন" শ্রমিকের সাহায্যে যাহাতে চাষ করিতে পারে সেইরূপ প্রচেষ্টা হইতেছে। সম্পত্তি কাঠামো বজায় রাখিয়া একমাত্র এই পথেই "কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও যন্ত্রীকরণ" সম্ভব হইতে পারে; এবং কার্যত তাহাই ঘটিতেছে।

১। প্রথম দিকে আরও অধিক হারে শিল্প-প্রসার বাঞ্ছনীয়

২। এই কার্যসূচীতে ধনতান্ত্রিক কৃষি দেখা দিবে: "সমাজতান্ত্রিক" নয়

তৃতীয় পরিকল্পনা ও শিল্প (Third Plan and Industries)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে শিল্পের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই; তাহা ছাড়া প্রধানত ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে ইহার প্রসারের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে শিল্পের উপর তুলনা-

মূলকভাবে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়. মূল ও ভারি শিল্প প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ব্যক্তিক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের গতি দ্রুততর করিয়া তোলার প্রচেষ্টা হইতে থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ধারা বজায় রাখার কথা বলা হইয়াছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে ইস্পাত, জ্বালানি, শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রোৎপাদন ও রাসায়নিক শিল্পের প্রসার প্রভৃতি মূল কাজ। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলিতে গেলে "These industries largely determine the pace at which the economy can become self-reliant and self-generating."

মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর

সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রকে একত্র ধরিয়া, সমগ্র দেশের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাতে শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচী রচনা করা হইয়াছে। যদিও এই বিষয়ে ব্যক্তিক্ষেত্রের কাজকর্মের বিপুল প্রসার ঘটিবে, তবুও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নে সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে। প্রসারশীল সরকারী ক্ষেত্র, বিশেষভাবে মূল শিল্পের প্রসার ঘটাইয়া এবং উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিয়া নিজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার পক্ষে অন্যতম প্রধান শক্তি হইয়া উঠিবে। উপরন্তু, তৃতীয় পরিকল্পনাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা হইবে যাহাতে ইহা শিল্প-কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইয়া উঠে। ইহা সম্ভব হইবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রমাত্রার শিল্পের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, শিল্পোন্নয়নের সুযোগ সুবিধাগুলিকে গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট সহরে প্রসারিত করিয়া এবং চিরাচরিত গ্রাম্য শিল্পগুলিতে উন্নততর টেকনিক প্রবর্তন করিয়া। ১৯৬০-৬১ সালে সু-সংগঠিত কারখানা শিল্পে নীট উৎপাদনের এক-দশমাংশ উৎপন্ন হয় সরকারীক্ষেত্রে, ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহার অংশ দাঁড়াইবে এক-চতুর্থাংশ। ইহার মধ্যে বেশির ভাগই হইল মূলধনীদ্রব্য ও উৎপাদক দ্রব্য। শিল্প ও খনির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মোট ১৮৮২ কোটি টাকার কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে ১৫২০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহার উপরে আশা করা যায় যে ব্যক্তিক্ষেত্র ১০৫০ কোটি টাকা নিয়োগ করিবে। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিক্ষেত্রের উপর আরও ভার দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি যুদ্ধ-পূর্ব শিল্পের আধুনিকীকরণ ও বকেয়া পুনঃসংস্থাপনের

সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

কাজে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের আরও ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে এমন ধরনের শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে (১) যাহারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্ব-নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে পারে, যেমন, ইস্পাত, যন্ত্র উৎপাদনকারী কারখানা এবং উৎপাদনদ্রব্য তৈয়ারীর কারখানা; এবং (২) যাহারা বিদেশ হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অতি দ্রুত কমাইতে পারে ও রপ্তানির ভিত্তি প্রশস্ত করিতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে হইবে, তবে ইহা প্রধানত নির্ভর করিবে ব্যক্তিক্ষেত্রের উপর। এই সকল উন্নয়নের ফলে শিল্প উৎপাদন প্রায় ৭০%-এর কাছাকাছি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মোট পরিমাণ অপেক্ষাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হইল লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের প্রসার। নিচের তালিকা হইতে ইহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে :

কান ধরনের শিল্পপ্রসার

শিল্প উৎপাদনের সূচক

(১৯৫০-৫১=১০০) ৬৬৫ লক্ষ

	বিষয়	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	শতকরা বৃদ্ধি
১।	সাধারণ সূচক	১৯৪	৩২৯	৭০
২।	তুলাজাত বস্ত্রদ্রব্য	১৩৩	১৫৭	১৮
৩।	লৌহ ও ইস্পাত	২৩৮	৬৩৭	১৬৮
৪।	যন্ত্রপাতি (সকল প্রকার মিলিয়া)	৫০৩	১২২৪	১৪৩
৫।	রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী	২৮৮	৭২০	১৫০

তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারীক্ষেত্রে বহু উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রজেক্ট গৃহীত হইবে। ইহার মধ্যে প্রধান হইল মেটালারজি, শিল্প-যন্ত্র, মেশিনটুল, সার, মূল রাসায়নিক দ্রব্য এবং অর্ধনির্মিত দ্রব্য, বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এবং পেট্রল পরিশোধন কেন্দ্র প্রভৃতি। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন-ক্ষমতা দাঁড়াইবে ১০.২ মিলিয়ন টন তৈয়ারী ইস্পাত এবং ১.৫ মিলিয়ন টন কাঁচা লোহা। রুরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরের সরকারী ইস্পাত কেন্দ্রগুলিকে প্রসারিত করিয়া এবং বোকারোতে চতুর্থ সরকারী ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিয়া এই লক্ষ্য সফল করা হইবে। ব্যক্তিক্ষেত্রেও ইস্পাত উৎপাদনের

কিছুটা প্রসার হইবে।* ব্যক্তিক্ষেত্রে বিকেন্দ্রিক ভিত্তিতে ২ লক্ষ টন কাঁচা লোহা উৎপাদন হইবে স্থির হইয়াছে। লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ৮০ হাজার টন এবং দেশে প্রথম দস্তা গলাইবার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, ইহার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ১৫ হাজার টন। আশা করা যায় যে, তামার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৮৯০০ টন হইতে ২০ হাজার টন।

তৃতীয় পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হইবে যন্ত্রোৎপাদন ও এন্‌জিনিয়ারিং শিল্পের দ্রুতহারে বৃদ্ধি। যন্ত্রোৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রয়োজন হইল ফাউণ্ড্রি ফোর্জ ক্ষমতা (Foundry Forge Capacity); সরকারীক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার বিপুল প্রসার ঘটিবে। রাঁচি সহরের নিকটে যে ভারি যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, উহার ক্ষমতা বাড়াইয়া বৎসরে ৮০ হাজার টন উৎপাদনের উপযোগী করিয়া তোলা হইবে। এই কেন্দ্র হইতে এমন যন্ত্রপাতি যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে যাহা দ্বারা প্রতি বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সরকারী ক্ষেত্রে কোন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইবে

বিদ্যুৎ-প্রসারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনটি ভারি বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতির প্রজেক্ট প্রতিষ্ঠা করা হইবে, স্থির হইয়াছে। ইহার ফলে ১৯৭১ সালের পর হইতে দেশে প্রতি বৎসর ২ মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন সম্ভবপর হইবে। মেশিন টুলের ক্ষেত্রে বর্তমান কারখানাটির সম্প্রসারণ এবং সরকারী ক্ষেত্রে নূতন দুইটি কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। ব্যক্তি ক্ষেত্রেও মেশিন টুলের উৎপাদন প্রসারিত হইবে আশা করা হইতেছে, ইহার উৎপাদনের লক্ষ্য মোট ৩০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। মোটর গাড়ি উৎপাদনের লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ৩০০০০ খানা যাত্রীবাহী গাড়ি এবং ৬০০০০ মালবাহী গাড়ি। সার ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভোগদ্রব্যের ক্ষেত্রে বস্ত্র, কাগজ, চিনি, তৈল, খড়ি প্রভৃতি সকল কিছু দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়ান হইবে বলা হইয়াছে।

শিল্প প্রসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইল খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ান। আমাদের কতকগুলি খনিজ সম্পদ অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিতে পারে। কয়লার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৯৭ মিলিয়ন

* "There will be some expansion of capacity for steel in the private sector mainly through the installation of scrap-based electric furnaces which will augment the supplies of billets to re-rollers." *Third Five Year Plan* P. 65.

টন। অর্থাৎ ৫ বছরে ৩৭ মিলিয়ন টন অধিক কয়লা উত্তোলন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ২০ মিলিয়ন টন এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ১৭ মিলিয়ন টন উৎপন্ন হইবে। ভারতে লৌহমাক্ষিকের প্রয়োজন হইবে ২০ মিলিয়ন টন, আর রপ্তানি হইবে ১০ মিলিয়ন টন, তাই লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ৩২ মিলিয়ন টন। নূতন নূতন খনি ও খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান কার্য বিপুলবেগে চালান হইতে থাকিবে। খনিজ তৈলের অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের কাজকর্ম প্রসারিত করা হইয়াছে। বৈদেশিক কয়েকটি ফার্মকে অনুসন্ধান ও পরিশোধনের ভার দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশের মোট তৈল প্রয়োজনের ৪৭% আভ্যন্তরীণ স্থত্র হইতেই পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে।

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন

বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি, গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার চলিতে থাকিবে, কারণ ইহাতে দেশের কর্মসংস্থান, ভোগ্যদ্রব্যের যোগান এবং কিছুটা পরিমাণে মূলধনী দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রভূত প্রসার ঘটিয়াছে, ইহাতে আধুনিক টেক্‌নোলজি ও শক্তির ব্যবহার হইতেছে এবং উহারই সহিত কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটান সম্ভব হইতেছে। ছোটখাটো উদ্যোক্তা এবং সমবায় সমিতিগুলির পক্ষেও এই ধরনের উৎপাদন পরিচালনা সম্ভবপর হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহারা আরও দ্রুত প্রসার লাভ করিবে এবং ছোট শহরে ও গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, উহার স্থলে এই পরিকল্পনায় ২৬৪ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। ব্যক্তিক্ষেত্রেও ২৭৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ ঘটিবে মনে করা যায়। ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যাঙ্কঋণের পিছনে সরকারী গ্যারান্টি দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০টি স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩০০টি নূতন শিল্প-এষ্টেট গঠনের কথা হইয়াছে নির্ধারিত গ্রাম্য অঞ্চলে 'গ্রাম্য শিল্প এষ্টেট' গঠিত হইবে, সেখানে শক্তি, জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইবে। 'খাদি ও গ্রাম শিল্প কমিশন' এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার কতটা

"তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত শিল্পোন্নয়ন হইতে বহুদিকে বহুবিধ সুবিধা পাওয়া যাইবে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ও উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের লক্ষ্য আরও বেশ কিছুটা অগ্রসর করিয়া দিবে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কৃষি, বিদ্যুৎশক্তি, রেলপথ, মোটরযান প্রভৃতি বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের আমদানির উপর নির্ভর করে—এই নির্ভরশীলতা অনেকটা কমিয়া যাইবে। শিল্প-কাঠামোর নিজের মধ্যেই ভারি এন্‌জিনিয়ারিং ও যন্ত্রোৎপাদনের প্রসারের দরুন শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও বর্তমানে আমদানিকৃত প্রচুর পরিমাণ মূলধনী যন্ত্রপাতি দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হইবে। কয়েকটি প্রধান শিল্প সচল রাখার জন্য যে আমদানি দরকার হইতেছে, তাহার পরিমাণ কমিয়া যাইবে, কারণ মূল কাঁচামালসমূহ দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হইবে।...... এইরূপে তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্পপ্রসারের কার্যসূচী সমাপ্ত হইলে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপিত হইবে।"*

ইহার ফলে ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়ন দ্রুততর হইবে

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা
(An extensive discussion on financing the Third Five Year Plan)

সরকারী ক্ষেত্রে উন্নয়নের সকল কার্যসূচী সফল করিতে হইলে আগামী পাঁচ বছরে মোট ৮০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা দরকার। তবে এই বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ব্যয়ের এই হিসাব একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত হইতে পারে না, কারণ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রজেক্টের ব্যাপারে (ক) কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে, এবং (খ) কি ধরনের যন্ত্রপাতি কোন্ সময়ে আমদানি করা সম্ভব হইবে—এই সকল বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। প্রধান প্রজেক্টগুলির মধ্যে কোন একটির অগ্রগতি নির্ভর করে অপরটির অগ্রগতির উপর, এইরূপে একটি অপরটির সহিত সংশ্লিষ্ট। যদিও কর্মসূচীর প্রতিটি প্রজেক্ট সফল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে, তবুও পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিমাণে ব্যয় করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন অনেক বেশি, কিন্তু ২১০০ কোটি টাকার বেশি পাওয়া যাইবে বলিয়া কমিশন আশা করেন না। এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে: ইহার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা নীট

কত টাকা তোলার কথা বলা হইয়াছে

বিনিয়োগ এবং ১২০০ কোটি টাকার সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের চলতি ব্যয়।*

সরকারীক্ষেত্রে এই ৬৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত করিতে হইবে (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ কৃষি, শিল্প, গৃহনির্মাণ প্রভৃতিতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ ও সাহায্য ইত্যাদির মাধ্যমে)। তৃতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪৩০০ কোটি টাকা; উপরোক্ত এই কারণে তাহাদের ৪১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিলেই চলিবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের কার্যসূচী তাই ১০৪০০ কোটি টাকার; সরকারী ক্ষেত্রে ৬০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৪৩০০ কোটি টাকা। সরকারী ক্ষেত্রকে সংগ্রহ করিতে হইবে মোট ৭৫০০ কোটি টাকা; ৬১০০ কোটি টাকার নিজস্ব বিনিয়োগ+বেসরকারী ক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ+১২০০ কোটি টাকার চলতি খরচা।

সরকারী ক্ষেত্রের জন্য কত টাকা তোলা দরকার

আগামী পাঁচ বৎসরে ১০৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করার ফলে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে জাতীয় আয়ের ১১% হইতে ১৪%-এ পৌঁছিবে। এই বিনিয়োগের এক অংশ বিদেশী সাহায্য হইতে পাওয়া যাইবে, তাই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৮·৫% হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় ১১·৫%-এ পৌঁছিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সরকারীক্ষেত্রে পরিকল্পনার সকল কার্যসূচী সফল করিতে হইলে ৮০০০ কোটি টাকা দরকার। কিন্তু উপকরণ সংগ্রহের সকল

* "Bearing these considerations in mind, financial outlays in the Third Plan are being taken at Rs. 7500 crores: Rs. 6300 crores by way of Investment expenditure and Rs. 1200 crores by way of current outlays on social services and other developmental but recurring items. The financial provisions envisaged at present could it is felt, be improved upon it production and saving increase sufficiently; the objective must be to implement the physical programmes accepted by raising resources beyond the level indicated by the present estimates." *Third Five Year Plan*. P. 90.

দিক বিবেচনা করিয়া বর্তমানে ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের হিসাব দেখান হইয়াছে। পরিকল্পনার কার্যসূচী সফল হইতে থাকিলে আরও বেশি উপকরণ সংগ্রহ করার সুবিধা হইবে। আবার ভবিষ্যতে উপকরণ সংগ্রহের অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনার আয়তন ও কার্যসূচীকে পরিবর্তন করা হইবে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগ্রহ করিতে হইবে ৬০৩৮ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়া সংগ্রহ করিবে ১৪৬২ কোটি টাকা। তাই এই পরিকল্পনাকে কিছুটা নমনীয় রাখা হইয়াছে। অর্থসংগ্রহের বর্তমান হিসাব নিচের তালিকাতে দেওয়া হইল :

	উৎস	কোটি টাকা
১।	চল্‌তি রেভিনিউ হইতে উদ্বৃত্ত (অতিরিক্ত কর বাদে)	৫৫০
২।	রেলপথের দেয়	১০০
৩।	অন্যান্য সরকারী শিল্প হইতে উদ্বৃত্ত	৪৫০
৪।	জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	৮০০
৫।	স্বল্প সঞ্চয়	৬০০
৬।	প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড	২৬৫
৭।	ইস্পাত সমীকরণ তহবিল	১০৫
৮।	পরিকল্পনার বহির্ভূত ব্যয়ের উপর বিবিধ মূলধনী আয়ের ব্যালান্স	১৭০
৯।	সরকারী উদ্যোগগুলি হইতে অতিরিক্ত মুনাফাসহ অতিরিক্ত কর	১৭১০
১০।	বৈদেশিক সাহায্যের সরকারী অংশ	২২০০
১১।	ঘাট্‌তি ব্যয়	৫৫০
	মোট	৭৫০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে বলা হইয়াছে যে উপরের এই তালিকার প্রতিটি উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের এই হিসাব বাস্তবে বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। মোটামুটিভাবে টাকার বিষয়ে পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য কি না পরিকল্পনাকালে শুরুতে তাহা বিচারের উপযোগী তালিকা দেওয়া হইতেছে। আগামী কয়েক বৎসরে কিরূপ আয় সৃষ্টি হয়, কিরূপ কর আদায় হয়, সরকারী ব্যয় কিরূপ হয়, জনসাধারণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও ক্ষমতাতে কিরূপ

পরিবর্তন আসে সেই সম্পর্কে তাই অত্যন্ত স্পষ্ট কিছু বলা চলে না। ইহার আরও একটি কারণ হইল যে, কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব লইয়া ইহা রচিত হয় নাই; পনেরটি রাজ্যসরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তাহা ছাড়া, রেলপথ ব্যতীত অন্যান্য সরকারী শিল্প হইতে উদ্বৃত্ত হিসাব অনেকটা আন্দাজের ভিত্তিতে রচিত।

এই হিসাব অনেকটা আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত

কমিশন মনে করে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ টানাটানি ও কষ্টকর অবস্থা চলিতেই থাকিবে। জাতীয় আয় ও উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির হার যাহাতে উপযুক্ত স্তরে পৌঁছে, আমাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অন্তত সেই পর্যায়ে তুলিতেই হইবে—ইহাই এই পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমাদের ধারণা হইতে কত বেশি, এইবারকার আদমসুমারি হইতে আমরা তাহা বুঝিয়াছি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে-উন্নয়নের হারে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, সেই হার রক্ষা তো করিতেই হইবে, উপরন্তু তাহা দ্রুততর করা প্রয়োজন। তাই এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণের উৎসাহ ও চেতনা সৃষ্টি হইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িবে, কর-আদায় ও ঋণ-আদায়ের উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারিলে সেই সঞ্চয় সংগ্রহ করাও সম্ভব হইবে। তাই পরিকল্পনা কমিশনের মতে অর্থসংগ্রহের চরমতম সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট কিছু নাই, ইহা অনেকাংশে নির্ভর করে বিভিন্নরূপ প্রচেষ্টার তীব্রতার উপর। কত দ্রুত প্রজেক্টগুলি সফল হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের উদ্বৃত্ত হাতে আসিয়া পড়িতেছে, ফিস্‌কাল ও অন্যান্য উপায়ে ভোগ ও অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হইতে উপকরণ সরাইয়া আনা যাইতেছে—এই সকল বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। গত দশ বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইতে কত দ্রুত কতটা পরিমাণ বেশি টাকা তোলা যাইবে, উহাই বড় কথা। এমন সময় আসিয়াছে যখন উন্নয়নকে স্বনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে হইবে; অতীত বিনিয়োগ হইতে উদ্বৃত্তই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পাথেয় হইবে, উহার আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে। তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিনিয়োগগুলি এমনভাবে নির্বাচন করিতে হইবে যাহা হইতে শীঘ্র উপযুক্ত ফল পাওয়া সম্ভব হয়।*

ভবিষ্যত উন্নয়নের উপর এই অর্থসংগ্রহের সাফল্য নিহিত

* "The limit to financial resources is never an absolute one, it is related to the quality of effort that is brought to bear on implementation of projects; on garnering of their surpluses, and on prevention, through

অর্থসংগ্রহের উৎস সম্পর্কে বিস্তৃততর ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সহিত তুলনামূলক আলোচনা (A closer examination of the sources of finance and a comparison with the Second Plan)

১। রেভিনিউ হইতে উদ্বৃত্ত (Balance from Revenues) :

সমগ্র তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়া ৯২৫০ কোটি টাকার রেভিনিউ আদায় হইবে। ১৯৬০-৬১ সালে, এক বৎসরের বাজেটে ইহার পরিমাণ হইল ১৬০০ কোটি টাকা। চলতি উন্নয়নমূলক বা উন্নয়ন-বহির্ভূত মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৭০০ কোটি টাকা। তাই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয়ের উপযোগী ৫৫০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে। আগামী কয়েক বছরের রেভিনিউ হিসাব করার সময়ে প্রধান কয়েকটি দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয়ে সম্ভাব্য বৃদ্ধির কথা হিসাব করা হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে অতীত অবস্থার ধারা ভবিষ্যতে বজায় থাকিবে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে (past trends have been projected)। অবশ্য সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথাও হিসাব করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রজেক্টগুলির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উহার ব্যয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত, উহাতে কাজকর্ম শুরু হইলেই তাহার পরিচালনার খরচা তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রেভিনিউ-ব্যয়ের হিসাবভুক্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রেভিনিউ হইতে সম্ভাব্য ব্যালান্স এত বেশি হিসাব করার কারণ হইল গত দুই বৎসরে কর হইতে আদায়ের পরিমাণ

---

fiscal and other measures, of leakages of resources into consumption or non-priority investment. Substantial investments have been made to ensure that they yield an adequate surplus on the basis of which to plan further. Development has in due course to become self-financing ; the surpluses from past investments constitute the source for further development. It is important that in choosing their projects for implementation, the central as well as state governments keep constantly in mind the need to get results from these investments as quickly as possible. Even a comparatively small delay in completing a project and putting it into productive use can make a significant difference to the resources available for investment. The point is that as an economy develops even marginal improvements in planning and execution over a number of points can yield a large return in the aggregate. With adequate attention to these aspects of the problem, resources can be raised beyond the limits that are at present indicated." *Third Five Year Plan.* P 116.

বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসারিত হওয়ায় এবং কর আদায়ের চেষ্টা তীব্রতর হওয়ায় এইরূপ সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটে কর-আদায় এই হিসাবের মধ্যে নাই; কারণ উহা তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১৭১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর-আদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২। রেলপথের দেয় (Contribution of the Railways)

সমগ্র পরিকল্পনাকালে রেলের পরিচালন ব্যয়, ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ বাবদ অর্থ, এবং বর্তমান ব্যবস্থা ও চুক্তি অনুযায়ী সুদ ও ডিভিডেণ্ড দিবার পরে সম্ভাব্য চলতি আয় হইতে তাহার যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা এই খাতে হিসাব করা হয়। নূতন লাইন খোলা প্রভৃতিতে বিনিয়োগকে ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ হইতে ১৫০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যাত্রী ও মালের ভাড়া বাড়ান হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই উৎস হইতে ১০০ কোটি টাকা পাওযা যাইবে বলা হইয়াছে। কিন্তু এইবারের এই হিসাবের মধ্যে যাত্রী ও মালের ভাড়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাদ দিয়া ধরা হইয়াছে।

৩। অন্যান্য সরকারী উদ্যোগ হইতে উদ্বৃত্ত (Surpluses of other Public enterprises)

সরকারী উদ্যোগসমূহের পরিচালন ব্যয়, স্বাভাবিক পুনসংস্থাপনের খরচা, এবং সুদ ও ডিভিডেণ্ড প্রভৃতি মিটাইয়া ইহাদের চলতি আয় হইতে যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা এই খাতে হিসাব করা হয। অর্থাৎ, ইহার মধ্যে কেবল যে নীট মুনাফা ধরা হয তাহা নহে, উপরন্তু ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিলে রক্ষিত টাকাও আমরা হিসাব করি, কারণ আমরা ধরিয়া লই যে এই টাকা এই সকল শিল্পোদ্যোগের প্রসারের কাজেই ব্যয়িত হইবে। এই খাতের গৃহীত হিসাব খুবই আন্দাজী ধরনের, কারণ যে সকল তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব রচিত তাহাদের সম্পূর্ণ সঠিক বলা চলে না। মোট ৪৫০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পোদ্যোগসমূহ হইতে ৩০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারের শিল্পোদ্যোগ-সমূহ হইতে ১৫০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

৪। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ (Loans from the Public)—দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বাজার হইতে সরকারী ঋণের পরিমাণ হইল ৪৮০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে লক্ষ্য হইল ৮০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সহিত তুলনা করিয়া এই খাতে আরও বেশি

ধরা হয় নাই তাহার কারণ হইল গত পরিকল্পনাতে P L 480 খাতে প্রাপ্ত টাকা হইতে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজে প্রভৃত সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে P L 480 খাতে প্রাপ্ত টাকাকে বৈদেশিক সাহায্যের হিসাবে ধরা হইয়াছে। আর ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিলে উহা ঘাট্‌তি ব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে ৮০০ টাকা তুলিবার সময়ে জীবনবীমা করপোরেশন, বিভিন্ন প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডগুলি এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃত পরিমাণে সরকারী ঋণপত্র কিনিবে তাহা ধরা হইয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্করাও কিছুটা কিনিবে তাহা আমরা মনে করিতে পারি। রাজ্যসরকারের শিল্পোদ্যোগসমূহ যে ঋণ তুলিবে তাহা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাজেটে ধরা হইয়াছে। অবশ্য সমবায়ী ক্ষেত্রের প্রয়োজন ও ঋণগ্রহণ এই হিসাবে ধরা হয় নাই। পরিকল্পনায় সমবায়ী ক্ষেত্রকে প্রসার করার কথা বলা হইয়াছে; তাই মূলধনের বাজার হইতে সরকারী ঋণ তোলার সময়ে এই ক্ষেত্রের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। এতখানি সরকারী ঋণ তুলিবার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে অর্থের প্রসার হইবে ইহা ধরিতে হইবে এবং ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রকে অতি সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই উৎসের সম্ভাবনা কতখানি

৫। **স্বল্প সঞ্চয় (Small savings) :** দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্বল্প সঞ্চয়ের লক্ষ্য ছিল ৫০০ কোটি টাকা; দেখা গিয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। স্বল্প সঞ্চয়ের উৎস হইতে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রচুর এবং আয় প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের এই আন্দোলন এখনও পর্যন্ত প্রধানত সহর ও আধা-সহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ আছে। আগামী কয়েক বৎসরে গ্রাম্য সঞ্চয়ের এক বিরাট অংশ সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলিয়া যাইবে। সরকারী ক্ষেত্রে টাকা চলিয়া আসার গুরুত্বের মতনই সমবায়ীক্ষেত্রে টাকা প্রবেশ করার গুরুত্ব কম নয়।

৬। **প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ইস্পাত সমীকরণ তহবিল এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের উর্ধে বিবিধ মূলধনী আয় (Provident funds, Steel Equalisation Fund and Balance of Miscellaneous capital receipts over non-plan disbursements):** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে নীট ১৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে,

তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার হিসাব হইল ২৬৫ কোটি টাকা। ইহার কারণ হইল কেন্দ্রে বা রাজ্যে কয়েকটি শ্রেণীর কর্মচারীদের বর্ধিত মাহিনার হার এবং কেন্দ্রে একটি বাধ্যতামূলক প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। ইস্পাত সমীকরণ তহবিলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নীট ১৫০ কোটি টাকা জমা হইবে। মূলধনী আদায়ের অন্যান্য খাত (উন্নয়ন আদায়, ফাণ্ড ও জমা সহ) হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাওয়া গিয়াছে ২২ কোটি টাকা; তৃতীয় পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে ১৭০ কোটি টাকা। ইহা মূলধনী খাতে বিপুলসংখ্যক আয় ও ব্যয়ের বিষয়গুলি যুক্ত হওয়ার নীট ফল। আয়েব প্রধান উৎসগুলি হইল উন্নয়ন-আদায় (betterment levy), স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, কৃষক প্রভৃতির নিকট হইতে ঋণ ও অ্যাডভান্স আদায়, রেভিনিউ তহবিলে অপসারণ, বিবিধ আমানতী ফাণ্ড প্রভৃতি হইতে আদায়। ব্যয়ের দিকে প্রধান হইল উদ্বাস্তু ও জমিদারদের অর্থ সাহায্য, চাষীদের ঋণ ও অ্যাড্‌ভান্স দেওয়া, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের লোকসান পূরণ, এবং পরিকল্পনার বহির্ভূত কোন কোন ব্যয়। অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলীর চলতি ধারা মনে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাতে ১৭০ কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছে। হিসাবে ধরা হইয়াছে যে পরিকল্পনার বহির্ভূত ব্যয় খুব কম থাকিবে এবং বকেয়া ঋণ ও অ্যাড্‌ভান্স পূর্বাপেক্ষা বেশি আদায় হইতে থাকিবে।

এই সকল উৎস কাহাকে বলে

৭। **বৈদেশিক সাহায্য হইতে প্রাপ্ত বাজেটীয় আয় (Budgetary receipts corresponding to external assistance):** তৃতীয় পরিকল্পনাতে ধরা হইয়াছে যে, পরিকল্পনাকালে দেশে বৈদেশিক মূলধন আগমনের পরিমাণ ৩২০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই টাকার সবটাই সরকারী তহবিলে বা বাজেটে জমা পড়ে না। এই টাকার মধ্যে ৪৫০-৫০০ কোটি টাকা পুরাতন ঋণের পরিশোধে ব্যয় হইয়া যাইবে। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যক্তিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মারফৎ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিমত কিছু টাকা (Rupee resources) হাতে ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এবং PL 480 ধারা অনুযায়ী আমদানির জন্য দ্রব্যসামগ্রীর মজুতের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ২০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। এইরূপে মোট

বৈদেশিক মূলধনের হিসাব

১০০০ কোটি টাকা বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য পাওয়া যাইবে না। তাই মোট ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য হইতে প্রায় ২২০০ কোটি টাকা এই খাতে পাওয়া যাইবে।

৮। **ঘাটতি ব্যয় (Deficit financing):** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর প্রভুত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, সেই সময়ে ভারতের বেশ কিছুটা বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল; প্রয়োজন মত ঘাট্‌তি ব্যয়ের বদলে উহাকে ব্যবহার করা যাইত। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাতে এইরূপ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল প্রায় শূন্য বলিলেও চলে; উহা হইতে টাকা খরচের আর সুযোগ নাই। এই সকল কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ খুব কম রাখা হইয়াছে। পরিকল্পনার আয়তন, জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রভৃতি হিসাব করিলে মোট ৫৫০ কোটি টাকার ঘাট্‌তি ব্যয়কে মোটেই বেশি বলা চলে না। দেশে উৎপাদন বাড়িবে, সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন বাড়িবে তাই স্বভাবতই অর্থনৈতিক দেহে টাকার সঞ্চালন বাড়াইবার দরকার হইবে। সেই প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ ধার্য করা হইয়াছে। ঘাট্‌তি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা পরিমাপ করার কোন সহজ পথ নাই। কেবলমাত্র সরকারের বাজেটীয় কাজকর্মের মাধ্যমেই দেশের মধ্যে টাকার যোগান বৃদ্ধি পায়, তাহা নহে: ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ঋণপ্রসারের দ্বারাও ইহা বাড়িয়া যায়। তাই এই দুইটিকে একত্রে হিসাব করিতে হয় এবং ইহাদের উপযুক্ত সীমা নির্ধারণের সময়ে উহাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের কথা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কতখানি গ্রহণ করিতে পারে সেই কথা মনে রাখিতে হয়। মোটামুটিভাবে এই সকল বিষয়কে হিসাবের মধ্যে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঘাট্‌তি ব্যয় ৫৫০ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অবশ্য সমবায়ী সংস্থাগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেয় তাহার পরিমাণ এই হিসাবে ধরা হয় নাই। প্রতি বৎসর বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ পুনর্বিবেচনা করা দরকার হইবে। সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য দরকার হইল আসল বা প্রকৃত উপকরণ (real resources) এবং ইহা নির্ভর করে কি হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণ ভোগের পরিমাণ কতটা কম রাখে এবং কতটা সঞ্চয় করে, অর্থাৎ বিনিয়োগের কাজে

দ্বিতীয়ের তুলনায় ঘাট্‌তি ব্যয় কম কেন

খাটাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বা ব্যবসায়ীর হাতে কতটা ছাড়িয়া দেয়। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সীমা মানিয়া লইয়া সাধারণত কিছু পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের স্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু যখন ইহাকে কমাইয়া রাখা প্রয়োজন, তখন যদি ইহা সমাজের ক্রয়শক্তি বাড়াইয়া তোলে, তবে ভোগ-সংকোচনের পরিকল্পনা বাতিল হইয়া যায়, পরিকল্পনার হিসাবনিকাশ ও কাজকর্মে বহু প্রকার অসুবিধা দেখা দেয়, তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কম ধার্য করা হইয়াছে।

৯। **অতিরিক্ত কর আদায় (Additional Taxation):** দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে প্রথমে অতিরিক্ত কর-আদায়ের লক্ষ্য ধার্য করা হয় ৪৫০ কোটি টাকা। পরে দেখা যায় যে ৪০০ কোটি টাকার অনির্ধারিত ফাঁকের বেশির ভাগই অতিরিক্ত কর-আদায় করিয়া তুলিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১০৫২ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া তোলা হইয়াছে। এতখানি অতিরিক্ত কর আযের পরেও দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে মোট কর-রাজস্ব ছিল জাতীয় আয়ের ৭·৫%, পরিকল্পনার শেষে ইহা হইয়াছে মাত্র ৮·৯%। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কর-আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, উহার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৭১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর-আদায় করা হইবে স্থির হইয়াছে। ইহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট জাতীয় আয়ের ১১·৪% অংশ মাত্র কর-আদায় সম্ভব হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং সম্ভাব্য আয়বৃদ্ধির কথা বিচার করিয়া এই পরিমাণ কর-আদায় প্রয়োজনও বটে এবং অসম্ভবও নয়। ১৯৬১-৬২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই দিকে অনেকটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

কেন এই খাতে অর্থ-সংগ্রহ বাড়িয়া যাইবে

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পরিকল্পনাতেই বলা হইয়াছে যে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থসংগ্রহের জন্য সরকারী সঞ্চয়ের ক্রমবর্ধমান প্রসার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কর-আদায়ের নির্দিষ্ট কতকগুলি সীমা আছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে কর-আরোপনের ব্যাপারে কয়েকটি জটিল অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য বিষয় জড়িত আছে। বেসরকারীক্ষেত্রে উদ্ভূত মোট সঞ্চয়ের এক অংশ সরকারী তহবিলে টানিয়া আনিয়া দেশের সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কর্মসূচী কার্যকরী করার টাকা অনেকাংশে যোগাড় করিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর,

সরকারী উদ্বৃত্তই ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ

এই উদ্দেশ্যেই সরকারী ঋণ নীতি ও স্বল্প সঞ্চয়ের করনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ চালাইবার টাকা সরকারী সঞ্চয় হইতেই তোলা দরকার; অর্থাৎ সরকারী শিল্পোদ্যোগের উদ্বৃত্ত, অবিনিয়োগী ব্যয়ের উপর রেভিনিউর উদ্বৃত্ত এবং সরকারী শিল্পজাত দ্রব্যের দাম স্থির করার সময়ে উদ্বৃত্ত সর্বাধিক করার প্রয়োজনের কথাই ভাবিতে হইবে। সরকারী শিল্পোদ্যোগের লাভ বাড়ান এবং উহাকে পুনরায় বিনিয়োগের কাজে খাটান—উন্নয়নমূলক অর্থসংগ্রহের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

কর-আরোপনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে নির্বাচন বা বাছাই করার সময়ে করের বর্তমান স্তর এবং প্রতিটি দিকে করবৃদ্ধির সম্ভাব্য করপাত ও ফলাফল বিচার করিতে হইবে। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার কর হইতেই আদায়ের পরিমাণ বাড়াইবার সুযোগ আছে। প্রত্যক্ষ কর ভোগকে সংকুচিত করে, এবং ব্যয়োপযোগী আয় (disposable income) কমাইয়া দিয়া বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়াইয়া তোলে। আর পরোক্ষ করের দরুণ দেখা যায় যে, ব্যয়ের সময়ে সেই আয়ের বিনিময়ে ব্যক্তি দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ কম পাইয়া থাকে। ইহাতেও ব্যক্তির ভোগ হ্রাস পায়। বাস্তব অবস্থা ও ঘটনা বিচার করিয়া করের বিভিন্ন রূপের তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে। প্রধান কাজ হইল উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর ঠিক কোন বিন্দুতে নূতন আয় দেখা দিতেছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা ও সেই দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা, যাহাতে অতিরিক্ত কর-আরোপন সঠিক পথে চালান যায়। প্রতি বৎসর যে নূতন অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা দিবে তাহা বিচার করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় কর-আরোপনের খুঁটিনাটি দিক স্থির করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। মোট কর-আদায়ের পরিমাণ যদি কম হয় তবে কেবল যে বিনিয়োগের উপযোগী অর্থসংগ্রহ কম পড়িবে তাহাই নহে, উপরন্তু ইহা আভ্যন্তরীণ দামের উপর চাপ দিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে, উৎপাদন-কাঠামো বিকৃত হইবে এবং অর্থনৈতিক অসাম্য বাড়িয়া চলিবে।

কোন্ ধরনের কর বাছাই করিতে হইবে

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আয়কর সম্পর্কে বলা চলে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাঝে মাঝেই কোন কোন আয়স্তরে করের হার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইবে। এই সকল পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হইল সরকারের হাতে বেশি টাকা

তোলা এবং বিভিন্ন আয়-স্তরের মধ্যে যথাসম্ভব ন্যায়সঙ্গত ভাবে কর-ভার বণ্টন করা। বর্তমানে ব্যক্তির আয় ও সম্পদের উপর আরও কয়েক প্রকার কর আছে, যেমন সম্পদ কর, মূলধনী লাভ-কর, ব্যয়-কর এবং উত্তরাধিকার কর। মিলিত ভাবে ইহাদের উদ্দেশ্য হইল সরকারী কোষাগারে বেশি টাকা তোলা এবং অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা। কর ফাঁকি দিবার বর্তমান সকল উপায় বন্ধ করিতে হইবে। যৌথ কোম্পানীর উপর আয়ের ক্ষেত্রে এখন কতকগুলি কর-রেহাই ও কর-হ্রাসের ব্যবস্থা আছে। গত পাঁচ বৎসরে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে ইহাদের প্রভাব কম নহে। এই কর-রেহাই ও কর-হ্রাসের সুযোগ অব্যাহত রাখা হইবে, তবে সর্বদা দৃষ্টি থাকিবে যাহাতে পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার-যুক্ত শিল্পোদ্যোগ অধিকতর সুবিধা পায়। এই সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় বলিয়াই ইহাদের খরচের হিসাব অতি সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ করগুলির ভূমিকা

মনে রাখা দরকার যে, তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরোক্ষ কর-আদায়ের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বাড়ান হইবে। ভারতে প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যা খুব কম। যদিও ইহা সঠিক যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রত্যক্ষ করগুলি হইতে আদায় বাড়িবে, তবুও বহুবিস্তৃত দ্রব্য-সামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর আরোপ করিয়া ভোগ সংকোচন না করিলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বশেষ ভোগের বিন্দুতে এইরূপ কর বিশেষ কার্যকরী; অন্যান্য ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্তরের দ্রব্য বা কাঁচামালের উপর অধিকতর কর আরোপন সুবিধাজনক। এইরূপ সকল প্রকার পরোক্ষ করের দরুণ ক্রেতাকে বেশি দাম দিয়া দ্রব্যগুলি ক্রয় করিতে হয়। পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে এই ত্যাগ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, কর-আদায়ের পরিমাণ কম হইলে অন্যায় মুনাফার আকারে দালাল ও মধ্যস্তরের ব্যবসায়ীরা সুবিধা পাইবে। এই সকল পরোক্ষ করের মধ্যে কতকগুলি দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের আঘাত দেয় ইহা ঠিকই, তবে অনেকগুলি অধিক আয়ের ব্যক্তির উপর বেশি চাপ দেয়। অর্থাৎ, এমন কি পরোক্ষ করের ব্যাপারেও, করহারের ক্রমবর্ধনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই কথা মনে রাখা দরকার যে, ভারতের ন্যায় দেশে যেখানে বেশির ভাগ লোকই দরিদ্র, সেখানে

পরোক্ষ করের উপর জোর বেশি কেন

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিতে হইলে সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা ও মূল্য নির্ণয় (Critical evaluation of the Third Five Year Plan)

আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল আকারে ক্ষুদ্র এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও দেশবিভাগজনিত বিশৃংখলা দূর করা। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। কোন দেশ যখন বিপুল বেগে শিল্পপ্রসার ঘটাইতে চায় তখন তাহার কৃষিজাত খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া তাই সঠিক নীতি বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল দ্রুত শিল্পপ্রসার, সেই উদ্দেশ্যে বৃহৎ মূল ও ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। দেশের এই সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকের হাতে আর্থিক আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেল, কিন্তু কৃষির উৎপাদন ততটা বৃদ্ধি না হওয়ায় খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাইল, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি বাড়াইতে হইল, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দিল। কুটির শিল্পের উপযুক্ত প্রসার না হওয়ায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার অব্যাহত থাকায় বেকারির পরিমাণ বাড়িয়া গেল। নানারূপ চাপ ও টানাটানির মধ্য দিয়া (stresses and strains) দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়া ভারতে তৃতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইল।

তৃতীয় পরিকল্পনার পটভূমি

এই পটভূমিতে রচিত তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার নীতি, অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি এবং পরিকল্পনাটির সামগ্রিক চরিত্র—এই সকল বিষয়ে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে বলা হইয়াছে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; "সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে দরিদ্রশ্রেণীর হাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল পৌঁছান উচিত এবং আয়, সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ক্রমশ হ্রাস পাওয়া উচিত।" কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাতে আলোচনা করিয়া দেখা হয় নাই, কেন পূর্ববর্তী দুইটি পরিকল্পনার ফলে আয়-

বৈষম্য বাড়িয়াই গিয়াছে; আয়, সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ কতিপয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে কেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সর্বসাধারণের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য মাথা পিছু আয় বা গড়-আয়ের (Per capita income) মাপকাঠিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা হইয়াছে; কিন্তু তুলনামূলক ভাবে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতির হার কতখানি, তাহা পরিমাপের কোন বাস্তব মাপকাঠি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। বর্তমানের সম্পত্তিগত সম্পর্ক বা উৎপাদন-সম্পর্ক সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া উৎপাদন বাড়াইলে বর্ধিত আয় ও সম্পদের অধিকাংশ স্বভাবতই মালিকদের হাতে চলিয়া যায়। উহাকে মূলধনরূপে খাটাইয়া তাহারাই আবার অধিকতর ধনী হইয়া উঠে। ব্যক্তির হাতে আয় ও সম্পদের উৎস হইল বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি ও মূলধনের উপর তাহার মালিকানা। তাই এই সম্পত্তিগত সম্পর্ক বদ্‌লাইয়া অধিকতর ব্যক্তির হাতে উহার মালিকানা ন্যস্ত করিলে তবেই আয় ও সম্পদের দ্রুত কেন্দ্রীভবনের গতি রুদ্ধ হইবে।

লক্ষ্যে পৌছাইবার উপযোগী পরিকল্পনা ইহা নয়

কারণ:
১। উৎপাদন সম্পর্কে কোনরূপ পরিবর্তন আনা হয় নাই

তৃতীয় পরিকল্পনার এই লক্ষ্য আরও একটি কারণ বিফল হইবে। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বারংবার ঘোষণা করেন যে আমাদের দেশে ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার ঘটান হইবেই এবং কখনই উহাদের অপসারণ ঘটিবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে "this is based on the assumption that the private sector accepts the broad discipline and values implied in the national plan and will function in unison with the public sector." ব্যক্তিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক মুনাফামুখিতা এবং ছলে, বলে ও কৌশলে সর্বাধিক মুনাফার নীতি বর্তমান। কখনও কোন অবস্থাতে সম্পত্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও ব্যক্তিক্ষেত্র সরকারের এই 'সমাজতান্ত্রিক নীতির' সহিত 'সহযোগিতা' করিবে—ইহা আশা করা ভুল। অবশ্য ব্যক্তিক্ষেত্রকে সহযোগিতা করিতে কিছুটা বাধ্য করা চলে, কিন্তু তাহা তখনই সম্ভব হয় যখন তুলনামূলকভাবে দ্রুত হারে রাষ্ট্র-ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। তিনটি পরিকল্পনার ফলেই ব্যক্তিক্ষেত্রের অভূতপূর্ব প্রসার হইয়াছে; তাহাদের জন্য বাহ্য ব্যয়সংকোচের ব্যবস্থা হইতেছে, সুতরাং লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদ এবং আয় ও সম্পদের

২। ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার ঘটান হইতেছে

বৈষম্য লোপ করা ঘোষণা করা হইলেও বাস্তবে নিজস্ব নিয়মের তাগিদেই ভারতে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারা সুরু হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা কেন তাহার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিবে না তাহা আরও বুঝা যাইবে যদি এই পরিকল্পনারব্যয়ের কাঠামো (pattern of expenditure) আমরা বিশ্লেষণ করি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাব তুলনায তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যক্তিক্ষেত্র তুলনা-মূলকভাবে অধিকতর প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে পূর্বের ১½ গুণ, কিন্তু ব্যক্তিক্ষেত্রে ব্যয় হইবে পূর্বের তুলনায় ১⅔ গুণ। বিনিয়োগের ধরন আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে গত পরিকল্পনাব তুলনায় এই পরিকল্পনায় কৃষির উপর ব্যয় অনেক বেশি, এমন কি শিল্প ও খনির তুলনাতে ইহার পরিমাপ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্প প্রসারের গতি ইহাতে দ্রুততর না হইবার সম্ভাবনাই বেশি।

বিভিন্ন দিকে অগ্রগতির লক্ষ্য বিচাব করিলে দেখা যায যে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নহে। সাধারণত অনুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের হাব পরিমাপের জন্য দুইটি মাপকাঠি ব্যবহার করে: মাথা-পিছু আযের বৃদ্ধি অথবা কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই দুইটি মাপকাঠি অনুযায়ীই তৃতীয পরিকল্পনাকে বিচার করিয়া দেখা দরকাব। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে প্রতি বৎসর প্রায় ৬% হারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বৎসরে ২%, ফলে মাথা পিছু আয় মাত্র ৩% বৃদ্ধি পাইতে পারে। সরকারী ভোগব্যয় বাদ দিলে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ২%-এর সামান্য কিছু বেশি হারে বৃদ্ধি পাইবে, মনে করা চলে। জনসাধারণের উদাসীনতা, অসহযোগিতা এবং সরকারী অযোগ্যতা মিলিয়া ভারতে যে পরিবেশ দেখা দিয়াছে—তাহাতে সামান্য এই বৃদ্ধিটুকুও বাস্তবে ঘটিবে বলিয়া মনে করা চলে.না। মাথাপিছু আসল আয়ে বৎসামান্য এই বৃদ্ধির ফলে আকাঙ্খিত স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে আমরা কবে প্রবেশ করিতে পারিব, তাহা বলা শক্ত। কর্মসংস্থানের কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পরিকল্পনা কমিশন ও দেশের দায়িত্বশীল নেতাগণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাকালে ৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যা দূর করিয়া দিবার কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রধানত এই যুক্তির ভরসাতেই তাঁহারা কুটির ও গ্রাম্য শিল্প প্রসারের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন দ্বিতীয় পরিকল্পনার নানাবিধ সাফল্যের কথা প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু বাস্তবে তৃতীয়

ফলে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয

পরিকল্পনায় বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হইতেছে না।* কেন এইরূপ ঘটিতেছে তাহার বিজ্ঞান সম্মত চুলচেরা বিচার না করিয়া কেবল হতাশার সুরে বলা হইতেছে যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইবে, ১৯৫৫-৫৬ সালে বেকারের পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ, বর্তমানে ইহার পরিমাণ ৭৩ লক্ষ, এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইবে ৮৫ লক্ষ। মনে রাখা দরকার, ইহা কৃষিক্ষেত্রের বাহিরের হিসাব; গ্রামের খবর এই সংখ্যা-চিত্রে প্রতিফলিত নাই। তাহা ছাড়া, এই তথ্য সবগুলিই কমাইয়া বলা হইয়াছে। এই হিসাবে ধরা হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি কার্যে ১৫ লক্ষ লোক নূতন কাজ পাইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৩৫ লক্ষ ব্যক্তি সেখানে নূতন কাজ পাইবে। কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি সরাইয়া আনাই যেখানে মূলধন-গঠনের প্রধান সমস্যা, সেখানে এত বেশি লোককে নূতন করিয়া কৃষিক্ষেত্রেই নিয়োগ করার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এইরূপ কিছু ঘটে নাই, তৃতীয় পরিকল্পনাতেও ঘটিতে পারে না। তাই আমরা বলিতে পারি যে, বেকারের পরিমাণ, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াইবে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ।

বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে

তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য হইল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা। খাদ্যের পরিমাণগত লক্ষ্য সম্পর্কে দুইটি সমালোচনা করা দরকার। প্রথমত, এই লক্ষ্য এত উঁচুতে ধরা হইয়াছে যাহার পিছনে বৈজ্ঞানিক কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাথাপিছু আয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব সঠিক ধরিয়া লইলেও খাদ্যশস্য যোগানের লক্ষ্য ১০০ হইতে ১০৫ মিলিয়ন টন ধরার কোন কারণ নাই। ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় খাদ্যের জন্য চাহিদা ৩৩%—৪০% বাড়িবে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। খাদ্যের চাহিদার উপর বর্ধিত আয়ের বিপুল

খাদ্যে লক্ষ্য অবাস্তব

* কেবল হতাশা ও দুঃখের সুরে বলা হইয়াছে: "The increase in employment during the Second Plan has not kept pace with the growth of the labour force. It was hoped that the development programmes envisaged would lead to the creation of 8 million additional jobs outside agriculture. The achievement for the Plan period is at present estimated at about 6·5 millon."

প্রভাব ধরিয়া লইলেও, ইহা ১৯৬০-৬১ সালের অপেক্ষা ২০%এর বেশি হইতে পারে না। অর্থাৎ যেখানে ৯০ মিলিয়ন টন ধরিলেই চলিত, সেখানে বৈজ্ঞানিক হিসাব বাদ দিয়া অত্যুচ্চ কোন লক্ষ্য ধার্য করা নিছক প্রচারমূলক বলিয়া মনে হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ১০০।১০৫ মিলিয়ন টন উৎপাদন হইবে ইহা নিতান্ত কল্পনামূলক। সরকারী হিসাবেই দেখান হইয়াছে যে ১৯৫২ সাল হইতে কৃষি উৎপাদন বৎসরে ৪.৫% হারে বাড়িয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর ব্যয় দ্বিগুণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উৎপাদন দ্বিগুণ হইবে না, আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চাষের ভিত্তি এবং ভাগচাষী বা মজুর দিয়া চাষ করাইবার প্রথা দূর করিয়া যৌথচাষের ভিত্তিতে নূতন কৃষি-সংগঠন গড়িয়া না তুলিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কৃষির খাতে এই বিপুল ব্যয় জমির মালিকদের হাতে সার বীজ ও ধান তুলিয়া দিবে মাত্র; বৃহৎ মাত্রায় চাষ, শ্রম বিভাগের প্রবর্তন, মিশ্র-চাষ, আধুনিকতম যন্ত্রপাতির ব্যবহার কেবল ইহাতেই সম্ভব হইবে না। জমিদারী ব্যবস্থার সংস্কার এবং যৌথ চাষ প্রবর্তনে সরকারী নিরুৎসাহী মনোভাবের দরুণ খাদ্য উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছন বাস্তবে কখনই সম্ভব হইবে না।

কৃষির কর্মসূচী অসম্পূর্ণ

শিল্প উৎপাদনের লক্ষ্য ও ধরন সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। অপূর্ণোন্নত দেশে দ্রুত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যত পরিমাণ এবং যে ধরণের শিল্প বিস্তারে বিনিয়োগ হওয়া দরকার, এই পরিকল্পনায় সেইরূপ করা হয় নাই। শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের শিল্পে বিনিয়োগের অনুপাত এমনভাবে সাজান হইয়াছে যে, ইহাতে 'স্বনির্ভরশীল স্তরে পৌঁছান-র জয়যাত্রা' সুরু হইবে এমন বলা চলে না। শিল্পক্ষেত্রে বেশির ভাগ বিনিয়োগ হইবে পুরানো অর্ধনির্মিত উৎপাদনক্ষেত্রে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও যাহারা লক্ষ্য অনুযায়ী উৎপাদন করিতে পারে নাই অথবা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যাহাদের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা হয় নাই সেইরূপ শিল্পক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত হয় নাই। তাই পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টই বলিতেছেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার অনেক কাজ চতুর্থ পরিকল্পনায় করিতে হইবে; "to the probability that in both sectors there will be a sizeable spillover into the Fourth

সরকারী শিল্পক্ষেত্র প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত নয়

Plan and the physical targets will not all be achieved by the end of the Third plan period."

ব্যক্তিক্ষেত্রে এই কথা আরও সত্য। সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে বহু বিচিত্র রকমের ভোগ্যদ্রব্যের এবং হাল্কা ধরনের শিল্প ভারতে স্থাপিত হইয়াছে; বাসগৃহ, আমোদ প্রমোদ এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অসংখ্য বাড়ি তৈয়ারি হইয়াছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, সৌন্দর্যমণ্ডিত অট্টালিকা নির্মাণ, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ও গাড়ি তৈয়ারী করা—অর্থনৈতিক কাঠামোর তৃতীয় স্তরে (in the tertiary sector of the economy) অভূতপূর্ব প্রসার ও কর্মচাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। ইহাকে সমর্থন করা চলে না। এইরূপ কাজকর্মের ফলে আমাদের দেশে একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দুষ্প্রাপ্য উপকরণগুলিকে এমনভাবে নিয়োগ করা হয় নাই যাহাতে উন্নয়নের হার দ্রুততর হয়, প্রকৃতপক্ষে দেশে শিল্পোন্নয়নের ছবি দেখিলে উপকরণের অপচয় ও অপব্যবহারের কথাই আমাদের বেশি পরিমাণে মনে পড়ে।

ব্যক্তিক্ষেত্রে উপকরণের অপব্যয়

এইবার অর্থসংগ্রহের দিকটি আলোচনা করা যাউক। এই বিষয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে ২২০০ কোটির টাকার বৈদেশিক ঋণ। মনে রাখা দরকার যে, তৃতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ইহা অপেক্ষা অধিক বৈদেশিক ঋণের উপর ভারতকে নির্ভর করিতে হইবে। পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩২০০ কোটি টাকা। এই ২২০০ কোটি টাকা ছাড়াও ইহার মধ্যে আছে (ক) তৃতীয় পরিকল্পনা কালে পরিশোধ্য পূর্ববর্তী ঋণের ৫০০কোটি টাকা, (খ) ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইবে এইরূপ ৩০০ কোটি টাকা, এবং (গ) PL 480 ধারায় প্রাপ্ত ২০০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার মোট সঙ্গতির এক তৃতীয়াংশের জন্যই বিদেশের উপর আমাদের নির্ভর করিতে হইতেছে। এই বিপুল পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইবেই এরূপ প্রতিশ্রুতি কোথাও পাওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে অনিশ্চয়তার ফলে সমগ্র তৃতীয় পরিকল্পনার বাঁধুনি আলগা হইয়া পড়িয়াছে, সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ততায় উহা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে। ভবিষ্যতে পাওয়া গেলেও (যে কোন রাজনৈতিক দামের বিনিময়ে) উহা বর্তমান

বৈদেশিক মূলধনের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলতা ও অনিশ্চয়তা

পরিকল্পনার সময়-সূচী (time table) সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিতে পারে ; পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স রক্ষিত না-ও হইতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই হিসাবের আরও একটি দিক বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে ৫৭৫০ কোটি টাকার ; ইহার মধ্যে ৩৭০০ কোটি টাকা রপ্তানি হইতে আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্তমানে গড়ে বাৎসরিক রপ্তানির তুলনায় প্রতি বৎসর ৭৩ কোটি টাকা অধিক রপ্তানি হইবে ইহা ধরিয়া লইয়া এই হিসাব রচিত হইয়াছে। রপ্তানির এতটা বৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই সম্ভব কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। স্বনির্ভরশীল উন্নযনের স্তর হইতে ভারতের অর্থনৈতিক দেহ কত দূরে তাহা বৈদেশিক সাহায্যের উপর এইরূপ অস্বাভাবিক নির্ভরশীলতা হইতেই বুঝা যায়।*

"সাহায্য" ব্যতীত উপায় নাই—রপ্তানির আয়ে হ্রাস

অর্থসঙ্গতির দ্বিতীয় প্রধান উৎস হইল সরকারী শিল্পক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্ত সহ অধিকতর কর আদায় ('additional taxation including measures to increase the surpluses of the public enterprises')। এই উৎস হইতে ১৭১০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে ধরা হইয়াছে। দুঃখের কথা যে, এই উৎসের দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই। তবে 'রেলপথ ব্যতীত অন্যান্য সরকারী শিল্পের উদ্বৃত্ত' এই নামে পৃথক একটি উৎস হইতে ৪৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে ধরা হইয়াছে। তাই বলা চলে যে ১৭১০ কোটি টাকার বেশির ভাগই কর আদায হইতে পাওয়া যাইবে। অধিক কর বসাইয়া পরিকল্পনাব জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা দরকার এবং নীতি হিসাবে ইহা সঠিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান সরকার বেশির ভাগ করই

সরকারী শিল্পগুলি হইতে উপযুক্ত লাভ হয় না

* দেশের মধ্যে সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটাইয়া সম্ভাব্য উদ্বৃত্তকে প্রকৃত উদ্বৃত্তে পরিণত না করিলে এইরূপই ঘটে। চতুর্থ পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনের উপর এইরূপ নির্ভরশীলতা বাড়িয়াই চলিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাতেই বলা হইয়াছে "it should not be forgotten that, on the other hand, import-saving that takes place as a result of the increased levels of production within the country will be offset in part by the increased requirements for new types of imports as the economy develops."

আদায় করিবেন পরোক্ষ সূত্রে, অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণকে অধিকতর দরিদ্র করিয়া। ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট সরকারী আদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশ ৬০% হইতে ২৭·৪%-এ নামিয়া আসিয়াছে। তাহার পরেও তৃতীয় পরিকল্পনা ঘোষণা করিতেছে যে, "Third Plan will involve a substantial increase in indrect taxation"। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কর হইতে আদায়ের পরিমাণ হইল ১০৫২ কোটি টাকা—ইহার ৮০% আদায় করা হইয়াছে পরোক্ষ কর হইতে। ইহার উপর তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ করা হইবে বলা হইতেছে। অথচ ফাটকাবাজ, দালাল এবং পারমিটধারীদের উপর চাপ দেওয়া হইবে না; ব্যবসায়ে 'উৎসাহ' বজায় রাখার নামে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিভিন্ন খাতে কর ফাঁকি দিবার সুবিধা দেওয়া হইবে।

তাই জনসাধারণের উপর পরোক্ষ করের চাপ

বৃহৎ ব্যবসায়ীদের না ঘাঁটাইয়া এবং তাহাদের সুবিধা বাড়াইবার অপর একটি নীতি হইল ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম হিসাবে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২০০ কোটি টাকা এবং সংশোধিত হিসাবে ছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। আর তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে মাত্র ৫৫০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন, "দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ প্রস্তাব করা হইতেছে যে তৃতীয় পরিকল্পনাতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ যেন অর্থনৈতিক দেহের প্রকৃত আর্থিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নিম্নতম পরিমাণে ধার্য করা হয়।" ইহা সকলেই জানেন যে, ঘাট্‌তি ব্যয়ের ফলে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে বলিয়া দামস্তরের উপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়। এইরূপ মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতির রেশনিং ও দাম-নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, ফাট্‌কাদারির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। এই সকল ব্যবস্থা না করিয়া নিছক ঘাট্‌তি ব্যয় করিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে ফাটকাদার ধরণের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী-দেরই সুবিধা হয়। সুতরাং দাম-বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কারণ হইতেছে কর্মক্ষম সরকারী নীতির অভাব, ইহারই ফলে ঘাট্‌তি ব্যয় ভৃত্যের ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঘাট্‌তি ব্যয় কম ধরা হইয়াছে

ঘাট্‌তি ব্যয়ের ফলে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে

ইহা যেমন ঠিক, সেইরূপ সমাজে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াও মুদ্রার যোগান বাড়াইতে পারে। তাহাতেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক-ঋণের প্রসার প্রধানত প্রবেশ করে খাদ্যশস্য বা শেয়ারের বাজারে ফাট্‌কা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ইহা বহুবার স্বীকার করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি (Selective credit control policies) এইরূপ ফাট্‌কাদারি বন্ধ করিতে সক্ষম। বৃহৎ ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের হাতে মুদ্রার যোগান এবং ফাট্‌কা ব্যবসার দ্বারা দামস্তর বাড়াইবার এই ক্ষমতা সরাইয়া আনার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাতে কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানগত ও সাংগঠনিক পরিবর্তন আনিয়াই ইহা সম্ভবপর; ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়-করণ না করিলে মুদ্রার যোগান এবং দামস্তর নিয়ন্ত্রণ করা তাই চলে না। তৃতীয় পরিকল্পনাতে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অবহেলা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের এই নীতির ফল হইল যে, মুদ্রার যোগান বাড়াইবার উপর সরকারের নিজের নিয়ন্ত্রণ রহিল না, কিন্তু এই বিষয়ে ব্যক্তি-ক্ষেত্রের অবাধ স্বাধীনতা রক্ষিত হইল।

টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নাই

ঘাট্‌তি ব্যয় নীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন দামনীতি (Price Polcy) আলোচনা করা যাউক। পরিকল্পনা কমিশন নিজেই বলিয়াছেন যে, ১৯৫৬—৬১ সালের মধ্যে পাইকারী দ্রব্যের দামস্তর ৩০% বাড়িয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, দামস্তর বৃদ্ধির এই হিসাব রচনার পদ্ধতি সম্পূর্ণ সঠিক নয়, দামস্তরে বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণ আরও বেশি। আর ইহাও আমরা রোজই দেখিতে পাই যে পাইকারী দামস্তরে অল্প একটু বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর খুচরা দাম উহা অপেক্ষা অধিক হারে বাড়িয়া যায়। তাই ১৯৫৬ সালের তুলনায় পাইকারী দামস্তর ৩০% বাড়িলেও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার ব্যয় নিশ্চয় উহার তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে সাধারণ লোকের মনে সক্রিয় ও স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়াছে; অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হইয়াছে; সর্বোপরি পরিকল্পনার ব্যয়ভার বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ সমান পরিমাণ উৎপাদনের জন্য এখন বেশি খরচ করিতে হইতেছে, একই কার্যসূচী বা লক্ষ্য সফল করিতে এখন বেশি ব্যয় করা দরকার হইয়া পড়িতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কমিশন এই বিষয় লক্ষ্য

দামনীতি বলিয়া সক্রিয় কর্মপন্থা কিছুই নাই

করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বরং তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে দামস্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহা রোধ করার চেষ্টা করা উচিত, শুধু মাত্র এই কথা বলিয়া কোন দেশের পরিকল্পনা কমিশনের কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ করা যায় না। এই বিষয়ে সঠিক নীতি ঘোষণা করিতে হয়, সেই কার্যসূচী সফল করার প্রচেষ্টা করিতে হয়। সেইরূপ কোন আভাস তৃতীয় পরিকল্পনায় নাই।*

ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করা হইল না, বৃহৎ ব্যক্তিগত ফাটকাদার ও শেয়ার ব্যবসায়ীদের হাত হইতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা সরাইয়া লওয়া হইল না, এমন কি তাঁহাদের ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে না কমাইয়া খাদ্যবস্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রসারের কথাও বলা হইল না। সমবায়ী বিক্রয়ব্যবস্থা এবং ক্রেতা সমবায়ের কথা ঘোষিত হইল মাত্র। কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে কোনরূপ কার্যসূচী গৃহীত হইল না। এমন কি কেন বর্তমানে দেশের সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়াইতে পারিতেছে না, কেন উহাদের চরিত্র আর প্রকৃত সমবায়ী থাকিতেছে না, তাহার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও করা হইল না। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও বৃহৎ জমির মালিকদের হাতে অর্থনৈতিক লাগামের রশি ছাড়িয়া দিলে তাহাদের নেতৃত্বে কখনই নিচের তলায় সুস্থ ও সবল সমবায় সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই সকল তথাকথিত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক-কৃষক ও উৎপাদকদের স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে না, বৃহৎ ব্যবসায়ী-স্বার্থের অনুগত শোষণকারী ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আরও টাকা বরাদ্দ করিলে এবং আরও সমবায়ী "শিক্ষার" ব্যবস্থা করিলে, সেই

সমবায় আন্দোলনের রূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে

* "The situation in respect of foreign exchange reserves is much more difficult than in the Second Plan. The part of inflationary pressures generated by the growth of investment in the Second Plan was neutralised by the drawing down of foreign exchange reserves. This moderating factor is not available in the Third Plan. In fact, the Third Plan calls for fullest effort to raise exports. This would tend to raise the prices of exportable commodities for the domestic consumers." অপর এক জায়গায় তাঁহারা বলিতেছেন, "These balances and safeguards not withstanding, the possibilities of significant—and even disturbing—price rises cannot be entirely eliminated." *Third Five Year Plan,* P. 125.

পুরাতন জিনিসই বেশি পরিমাণে করা হইল মাত্র; সমাজে প্রতিষ্ঠানগত ও সাংগঠনিক পরিবর্তন আনিয়া উন্নততর স্তরে ইহাদের রূপান্তর ঘটানো হইল না।*

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রতিটি দিকের ত্রুটিরই মূল উৎস হইল একটি: বর্তমান অর্থনৈতিক ও মালিকানার সম্পর্কগুলিতে কোন প্রকার পরিবর্তন না আনা। এই সম্পর্কগুলিকে বজায় রাখিয়া দেশের বর্তমান উন্নয়নের স্তরে উপকরণ, সঙ্গতি ও পরিবেশ অনুযায়ী যতদূর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান যায় তাহার কার্যসূচীই হইল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তাহাদের একচেটিয়া অধিকারগুলি বজায় রাখিয়া, ব্যক্তিক্ষেত্রেরই প্রসার ঘটাইবার জন্য উপযুক্ত "বাহ্য ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি" গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে সরকারীক্ষেত্রের উৎপাদন ও কার্যসূচী গ্রহণ করা—ইহাকে নিশ্চয় ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা বলা চলে। তবে ধনতন্ত্র প্রসারের উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে ইংলণ্ড আমেরিকা ও জাপানে যে-ধরনের ধনতান্ত্রিক প্রসার ঘটিয়াছিল আমাদের দেশে সেই একই রূপ অর্থনৈতিক কাঠামো ও উহার উৎপাদন, মালিকানা ও বণ্টন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইতেছে। তবে যুগ ও কালের পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাই উহাদের সহিত বাহ্য অনেকগুলি বিষয়েই আমাদের আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানীদের অনেক "তত্ত্ব" এবং সমাজবিজ্ঞানীদের অনেক "ভাবাদর্শ" ইহার উপর প্রভাব ফেলিতেছে এইরূপ মনে হইলেও ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোর

ইহাতে ধনতন্ত্রের প্রসার হইবে, সমাজতন্ত্রের নয়

* "The Plan Report scarcely pauses to examine the elements in our society or economy, which have transmogrified the cooperative movement into something very much like a vested interest. Instead of seeking out the institutions'......which have tended to make the cooperatives subservient to the interests of the already strong and suggesting ways and means of replacing or transforming them, the Plan proceeds to lay down a programme for doing more of the same old things. All that needs to be done, apparently, is to provide more funds and more training facilities to cooperators; the rest is left to emerge as "the processes of economic and social change gather force and rural community attains higher levels of skill and productivity." *Economic weekly*, August 1961.

সহিত আমাদের দেশে যে ভবিষ্যৎ কাঠামো বর্তমানের প্রতি মুহূর্তে গড়িয়া উঠিতেছে ইহাদের মধ্যে চরিত্রগত কোন মৌলিক প্রভেদ নাই।

ভারতের তিনটি পরিকল্পনার তুলনা (A Comparison of the three Plans) :

স্বাধীনতার পরে ভারতের দুইটি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা-কাল শেষ হইয়াছে এবং ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস হইতে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হইয়াছে। গত দুইটি পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনা করিতে পারি, অন্তত সেইরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা, পূর্ববর্তী কোনও একটি পরিকল্পনার কার্যসূচীর সহিত পরবর্তী কোনও পরিকল্পনার কার্যসূচীকে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়। পূর্বের পরিকল্পনার ফলাফল ও রূপায়ণের উপরই পরবর্তী পরিকল্পনার চরিত্র ও রূপ নির্ভর করে। প্রতিটি পাঁচ বৎসরের পরিকল্পনার মধ্যে পরিকল্পিত বিভিন্ন দিকে বিনিয়োগের ফলে যে গতি ও উন্নতি সৃষ্টি হয়. পরবর্তী পরিকল্পনার কাজ হইল সেই গতিবেগকে ধারণ করা এবং বাড়াইয়া তোলার চেষ্টা করা ; পূর্বের পরিকল্পনাটি যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাদের ভিত্তিতে পরবর্তী পরিকল্পনাটি রচনা করা। এই অবিচ্ছিন্ন ধাবার বিভিন্ন কালাংশে নূতন অভিজ্ঞতা ও তথ্যের সাহায্যে দেশের অবস্থা ও জাতির প্রয়োজন নূতন করিয়া বিচার করা হয় এবং জাতির সম্মুখে সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু লক্ষ্য উপস্থিত করা হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে একটি পরিকল্পনার কাঠামো ও চরিত্রের সহিত অপর পরিকল্পনার কাঠামো ও চরিত্র পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা কয়েকটি দিক হইতে লক্ষ্য করিব যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য দেখা যাইতেছে।

এক অবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন-ধারার বিভিন্ন স্তর

প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে ভারতবর্ষে দেশবিভাগজনিত অর্থ নৈতিক বিশৃংখলা চলিতেছিল। দেশে খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব ছিল। উহার সমাধান করাই ছিল তখনকার দিনে প্রধান সমস্যা। ব্যযবরাদ্দের অধিক অংশ কৃষির উপর ধার্য কবা হইয়াছিল। পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকারের কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না ; বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের তৎকালীন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে একত্র তালিকার আকারে সাজাইয়া উহাকে পরিকল্পনা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

তিনটি পরিকল্পনার পরিবেশ-কাল পৃথক

যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, নিষ্ঠা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক ভাবাদর্শের প্রতি বিশ্বাস প্রয়োজন তাহা প্রথম পরিকল্পনায় দেখা যায় না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সাময়িকভাবে হইলেও খাদ্য ও কাঁচামালের সমস্যা অনেকটা সমাধান হইয়াছিল। বিরাট শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। পরিকল্পনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও চিন্তা ইহাতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল, উৎপাদন ক্ষেত্রের বা সমাজ-দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হইয়াছিল; গাণিতিক হিসাবনিকাশের ভিত্তিতে রচিত এই পরিকল্পনাতে আভ্যন্তরীণ ব্যালান্সগুলি অনেকটা পরিরক্ষিত হইয়াছিল। বিরাট শিল্প-প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাঠামো রচিত হইয়াছিল।

এই পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনা রূপ পাইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম হইতে কয়েকটি গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া এই পরিকল্পনায় বাঞ্ছিত অগ্রগতির হার আমরা লাভ করিতে পারি নাই। প্রথম হইতেই খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের অভাব দেখা গেল, বিপুল মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া পরিকল্পনার সূক্ষ্ম ও চুলচেরা হিসাব বানচাল করিয়া দিল, সমগ্র পরিকল্পনাটির সংশোধন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে। বিরাট শিল্প প্রসারের জন্য বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হওয়ায় সরকারী বিভিন্ন দপ্তর অতি দ্রুত নিজ নিজ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করিল, ফলে ভারতবর্ষ বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের সম্মুখীন হইল। এই দুইটি অভিজ্ঞতা তৃতীয় পরিকল্পনাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও একটি বিষয়ে পরিবর্তন আসিয়াছে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনার সময় আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১·২৫% ধরিয়া লইয়াছিলাম। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেল যে. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরের ২%-এর কাছাকাছি। শিল্পপ্রসার এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মানে দ্রুত উন্নতি— এই দুইটি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাতেও শিল্পের উপর জোর কমানো হয় নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের স্বল্পতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারকে পিছন হইতে টানিয়া

দ্বিতীয়ের অভিজ্ঞতার আলোক তৃতীয়টি রচিত

কমাইয়া রাখিয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতেছে, শিল্পপ্রসারের কর্মসূচীর অধিকতর সাফল্যকে সুনিশ্চিত করিতেছে না। তাই কৃষির উপর গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষি উন্নয়নের জন্য ব্যয়বরাদ্দ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ধার্য করা হইয়াছে।

বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে অর্থসংগ্রহের পদ্ধতিতে কিরূপ পার্থক্য তাহাও আলোচনা করা দরকার। স্বাভাবিক ধরনের বাজেটীয় পদ্ধতি বলিলে বুঝা যায়, কর আদায় হইতে উদ্বৃত্ত, রেলপথ ও সরকারী শিল্প ও ব্যবসায় হইতে উদ্বৃত্ত; এবং সরকারী ঋণ প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত বৈদেশিক ঋণ ও ঘাটতি ব্যয় প্রভৃতিকে আমরা অস্বাভাবিক ধরনের অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম পরিকল্পনায় স্বাভাবিক অর্থ সংগ্রহেব পরিমাণ ছিল ৭০%; কিন্তু দ্বিতীয় পরিবকল্পনায ইহার পরিমাণ হইল ৭৩%। প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যেব পরিমাণ ছিল মোট ব্যয়ের ৯%; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহা হইয়াছিল ২১%। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ঘাট্‌তি ব্যয়ের অংশ ছিল যথাক্রমে ২০% এবং ২৬%। তৃতীয় পরিকল্পনায় দেখা যাইতেছে যে মোটামুটি হিসাবে স্বাভাবিক বাজেটীয পদ্ধতি হইতে পাওযা যাইবে ৬২%; বৈদেশিক সাহায্য ৩০% আর ঘাট্‌তি ব্যয ৮%। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক কমাইযা দেওযার প্রস্তাব করা হইযাছে। পূর্ববর্তী দুইটি পরিকল্পনাব তুলনাতেই তৃতীয পরিকল্পনাতে পরোক্ষ করেব উপর নির্ভবতা অনেক বেশি হইযাছে।

অর্থসংগ্রহের পদ্ধতিতে পার্থক্য

পূর্বের দুইটি পরিকল্পনায অর্থ সংগ্রহের যে উৎসটি ছিল না; বর্তমানে ও উহাব পরবর্তী পরিকল্পনাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সরকাবী উদ্যোগগুলি হইতে মুনাফা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বাপেক্ষা বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু রপ্তানি-যোগ্যতা বিশেষ বাড়ে নাই। তাই আমরা ক্রমশ বৈদেশিক মূলধনের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। প্রথম পরিকল্পনার সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব দেখা দেয় নাই, কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে আমাদের রপ্তানির বাজার ছিল তেজী, আর ইংলণ্ডে স্টার্লিং মজুতের পরিমাণও নিতান্ত কম ছিল না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে বহু অপ্রয়োজনীয় আমদানি হইয়াছে। রপ্তানি-উদ্বৃত্তও আমরা বিশেষ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে তাই আমাদের অবস্থা প্রায় নিঃস্ব; প্রয়োজন বা বিপদ-আপদের

সময় নির্ভর করা যায় এইরূপ বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল আর আমাদের নাই। শুধু ইহাই নহে, "ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে" বৃটেন যোগদান করিতে চলিয়াছে, আমাদের রপ্তানির বর্তমান পরিমাণ বজায় রাখাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

দীর্ঘকালীন বা দূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতেও তিনটি পরিকল্পনার মধ্যে বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২৫% ধরিয়া লইয়া প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে ১৯৫০-৫১ সালের জাতীয় আয়ের স্তর ১৯৭০-৭১ সালে দ্বিগুণ করা যাইবে এবং মাথাপিছু আয় ১৯৭৭-৭৮ সালে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল অধিকতর আশাবাদী, উহার ধারণা ছিল যে, জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইবে ১৯৬৭-৬৮ সালে এবং মাথাপিছু আয় ১৯৭৩-৭৪ সালে দ্বিগুণ হইতে পারিবে। কিন্তু বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরা হইতেছে বৎসরে প্রায় ২%-এর কাছাকাছি, অন্যান্য অসুবিধাগুলির কথাও চিন্তা করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে তাই সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের সম্ভাবনা বা দীর্ঘকালীন চিত্র ভিন্নরূপ দাঁড়াইযাছে। বলা হইতেছে যে, বৎসরে ৬% হারে জাতীয় বৃদ্ধি পাইলেও পঞ্চম পরিকল্পনার মাঝামাঝি ১৯৫০-৫১ সালের মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করা যাইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। জনবৃদ্ধির হার ছাপাইয়া মাথাপিছু উন্নয়নের হার বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে যাত্রা (take-off to self-sustained growth) সুরু হইতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, ১৫ বৎসর পরে আমরা স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে পৌঁছিতে পারিব। তখন দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আপনা-আপনি উন্নয়নের সেই হার বজায় রাখিতে পারিবে। এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা তৃতীয় পরিকল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরিকল্পনার কাজই হইল নিম্নতম এমন এক প্রচেষ্টা যাহাতে এই যাত্রা সুরু হইতে পারে। এই নিম্নতম চরম প্রচেষ্টার কথা (Minimum critical effort) তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে।

দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক

স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের উপর গুরুত্ব

তৃতীয় পরিকল্পনার আর এক বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার নমনীয়তা (flexibility)। দামস্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে, বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজনের সময়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া না যাইতে পারে এবং

প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে কৃষির উৎপাদনে উঠানামা ঘটিতে পারে। এতগুলি অনিশ্চয়তা সম্মুখে রাখিয়া সুনিশ্চিত কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলে না। তাই বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি সম্মুখে রাখিয়া উহার আভ্যন্তরীণ ব্যালান্সে খুঁটিনাটি পরিবর্তন আনা দরকার হইতে পারে। এইরূপ স্বীকৃতি অন্যান্য পরিকল্পনাতে দেখা যায় নাই।

নমনীয়তা

অন্যান্য পরিকল্পনার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার সুর একটু ভিন্নরূপ। এই পরিকল্পনাতে সর্বপ্রথম আঞ্চলিক পরিকল্পনার (regional planning) কথা বলা হইয়াছে; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প প্রসারের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে যথা সম্ভব অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কালে একটি সুনির্দিষ্ট দাম নীতি (price policy) থাকা প্রয়োজন, ইহার ঘোষণা এই পরিকল্পনার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহা ছাড়া বিভিন্ন কার্যসূচীর মধ্যে পরস্পর-সংলগ্নতা, নির্ভরশীলতা এবং উৎপাদন-কাল ও ধারার সংযুক্তির কথা এই পরিকল্পনায় বারবার ঘোষণা করা হইয়াছে (links in phasing and timing)।

অন্যান্য দিকে ইহার নূতনত্ব

দেশরক্ষা ও তৃতীয় পরিকল্পনা (Defence and the Third Plan)

তৃতীয় পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের দুইটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে: একটি হইল পরিকল্পনার সমগ্র কর্মসূচী সফল করিতে কত টাকা দরকার হইবে (৮৬০০ কোটি); এবং অপরটি হইল বর্তমানে কত টাকা তোলা সম্ভব (৭৫০০ কোটি)। কমিশন আশা করিয়াছেন যে ব্যক্তিক্ষেত্র ৪১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবে। অর্থাৎ সমগ্র কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য ১২৭০০ কোটি টাকা দরকার, ইহার স্থলে মোট ১১৬০০ কোটি টাকা পর্যন্ত সংগ্রহের কথা চিন্তা করা হইয়াছে।

মোট ব্যয়ের আদি হিসাব

পরিকল্পনার এই হিসাব প্রথম দুই বছরের মধ্যেই পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। যখন প্রজেক্টগুলি রচনা করা সুরু হইল তখন দেখা গেল যে

উহাদের জন্য আরও বেশি বিনিয়োগ দরকার। কমিশনের দেওয়া হিসাব মতে সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের প্রয়োজন ৮৯০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১৩০০০ কোটি টাকা।

মোট ব্যয়ের পরিবর্তিত হিসাব

প্রথম দিকে কমিশন যে মোট আমদানির পরিমাণ হিসাব করিয়াছিলেন, পরবর্তী দুই বৎসরে সেই হিসাবও বদলাইতে হইয়াছে। পরিকল্পনার জন্য প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয় আমদানির (Direct import requirement) পরিমাণ ধরা ছিল ১৯০০ কোটি, পরে সেই হিসাব দাঁড়াইয়াছে ২৬০০ কোটি টাকা। পরোক্ষ আমদানির (Indirect imports) পরিমাণ পূর্বের মতন ২০০ কোটি টাকাই ধরিয়া রাখা হইয়াছে। চলতি কাজকর্মের জন্য আমদানির (Maintenance imports) প্রয়োজন প্রথমে ধরা হইয়াছিল ৩৬৫০ কোটি টাকা; পরে হিসাব বদলাইয়া উহা ধরা হইল ৪০৫০ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত, পরিকল্পনার কমসূচী শ্লথগতিতে অগ্রসর হওয়ায় আমাদের আমদানির প্রত্যাশিত পরিমাণ কমান গেল না, বিশেষত ইস্পাতের ক্ষেত্রে (৪০০ কোটি টাকা)। এইরূপে মোট চলতি কাজকর্মের দরুণ প্রয়োজনীয় আমদানির পরিমাণ দাঁড়াইল ৪৫০০ কোটি টাকা।

মোট প্রয়োজনীয় আমদানির হিসাব

মূলধনীখাতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের মোট ৫৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। তাই আমাদেব মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইল (২৬০০+২০০+৪৫০০+৫৫০)=৭৮৫০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে রপ্তানি হইতে মোট আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৩৭০০ কোটি টাকা, —এত টাকার রপ্তানি বেশ কঠিন ব্যাপার। বর্তমানের ঝোঁক বজায় থাকিলে খুব বেশি হইলে ৩৫২০ কোটি টাকার রপ্তানি হইতে পাবে। তাই আমাদের ঘাট্‌তি পড়িতেছে ৪৩৩০ কোটি টাকা। এই ঘাট্‌তি পূরণ হইতে পারে একমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে।

সর্বমোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা

পরিকল্পনার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়্‌তি ব্যয়ের কথা আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। অনুমান করা হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার তিন বৎসর যাবৎ বছরে ৪০০ কোটি টাকা বাড়্‌তি ব্যয় দরকার হইবে। এই ৪০০ কোটি টাকার

দেশরক্ষার জন্য প্রত্যাশিত বাড়্‌তি ব্যয়

মধ্যে প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। দেশরক্ষার চাপ যোগ করিলে, তাই, বৈদেশিক মুদ্রার মোট ঘাট্‌তি দাঁড়াইবে ৫৬৩০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে এ বৎসর পর্যন্ত প্রায় ২৩০০ কোটি টাকার আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। আমরা তাই আরও ঐ পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের চেষ্টায় রহিয়াছি।

"যদি" ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় এবং "যদি" পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচী প্রত্যাশিত হারে অগ্রসর হয়, একমাত্র তবেই দেশের মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কোনরূপ ভোগ সংকোচন না করিয়া উন্নয়ন ও দেশরক্ষা একযোগে সফল করার উপযোগী উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। উপরের এই সর্তগুলি বজায় থাকিলে তবেই আমাদের পরিকল্পিত ভোগবৃদ্ধি (২০%) মাত্র অল্প একটু কমাইলেই (১%) চলিবে। এই পরিমাণ ভোগবৃদ্ধি করিতে হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ৩০%। পরিকল্পনার অন্তবর্তীকালীন হিসাবে দেখা যাইতেছে যে উন্নয়নের হার অনেক কম।

ভোগ না কমাইয়া চলে কি না

যে অল্প হারে পরিকল্পনার অগ্রগতি হইতেছে, তাহাতে দেশরক্ষা ও উন্নয়ন একই সঙ্গে চালাইতে গেলে সমগ্র পরিকল্পনা কালে ভোগ বৃদ্ধি ৯%-এর বেশি ঘটিতে পারিবে না। ইহা মোট ভোগ-ব্যয়ের হিসাব। মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ বাড়িবে অনেক কম, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশ বেশি। মোট ভোগব্যয়ে ৯% বৃদ্ধিতে মাথাপিছু ভোগবৃদ্ধি হইতে পারে ৪%। আভ্যন্তরীণ উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই অবস্থা।

উন্নয়নের হার কম বলিয়া ভোগ কমিবেই

বৈদেশিক সাহয্যের কথায় আবার ফিরিয়া আসা যাউক। পূর্বে দেখিয়াছি যে, দেশরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আমাদের ৪০০০ হইতে ৫০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। ইহা পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ৩০%। এই পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব কি না কিংবা পাইলেও উহার বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা পৃথক কথা। কিন্তু দশ বৎসরের পরিকল্পিত উন্নয়নের পরও যদি ভারতের এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য দরকার হয়, তবে পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নীতি এবং ইহাকে

বিদেশী সাহায্যের উপরই নির্ভর

কার্যকরী করিয়া তোলা কোনটিই উপযুক্ত নয়—এই সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছাইতে হইবে।

আমাদের পরিকল্পনার কৌশল (strategy) তত্ত্বের দিক হইতে খাঁটি, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মূল ও ভারিশিল্পের উপর অগ্রাধিকার দিয়াছি, ইহাতেই আমদানি-পরিবর্তিতা (import-substitution) হইতে পারে, ফলে ক্রমশ বৈদেশিক মুদ্রার সীমাবদ্ধতা দূর হইতে থাকিবে। কিন্তু দশ বৎসরের পরিকল্পনার পর আমরা কি নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারি না যে, পরিকল্পনার প্রতিটি কর্মসূচী কার্যকরী করার সময়ে আমাদের গৃহীত নীতিসমূহ প্রতি পদে পদে বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়াছে? পরিকল্পনা কার্যকরী করার স্তরগুলি যদি দ্বিধাগ্রস্ত না হইত তবে আমাদের আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কেবল বহু পূর্বেই হ্রাস পাইত তাহা নহে, আমরা রপ্তানি-প্রসারের নূতন দিগন্ত বিস্তৃত করিতে পারিতাম।

নীতি সঠিক, কিন্তু বাস্তবে বিকৃত হইয়া যায়

এই অবস্থায় আমাদের শিল্পনীতির নূতন মানদণ্ড (new criteria) হইবে দেশরক্ষার প্রয়োজন এবং পরিকল্পিত স্থায়ী উন্নয়নের প্রয়োজনকে একত্র সংযোজিত করা। এই নূতন মানদণ্ডের ফলে প্রথমেই আমাদের অগ্রাধিকার নীতির পুনর্বিবেচনা দরকার। অগ্রাধিকার তালিকায় প্রথমে থাকা দরকার ইস্পাত, যন্ত্র-উৎপাদক শিল্প এবং কৃষি। ইহার জন্য প্রয়োজন টেক্‌নিকাল শিক্ষার কার্যসূচীকে প্রাধান্য দান এবং এই বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি আন্তরিক প্রচেষ্টা। পরিবহন, শক্তি প্রভৃতি অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে (*sectors*) উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত করিয়া পুনর্বিবেচনা করা দরকার; ইহাদের ক্ষেত্রে অপর কোন মানদণ্ড প্রয়োগ না-করাই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত পক্ষে, পরিবহন ও শক্তির প্রসার নির্ভর করে ইস্পাত ও যন্ত্রোৎপাদনের উপর। সহরে এবং সীমান্তে যে অধিক সংখ্যক শ্রমিক ও যোদ্ধা প্রয়োজন তাহাদের জীবনধারণের জন্য কৃষিক্ষেত্রের বিপুল প্রসার দরকার। দেশের মধ্যে ভোগ্যদ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, প্রতিটি রাজ্য সরকারের উচিত দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা প্রচলিত করা।

দেশরক্ষা ও উন্নয়নের উপযোগী নূতন অগ্রাধিকার নীতি

তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি : অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা (Progress of the Third Plan : the Mid-term Appraisal) :

তৃতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতের সময়ে বলা হইয়াছিল যে ইহা হইল "the first stage of a decade or more of intensive development leading to a self-reliant and self-generating economy." ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদনে ৩০% বৃদ্ধি, শিল্পোৎপাদনে ৭০% বৃদ্ধি, এবং জাতীয় আয়ে ৩০% বৃদ্ধি। ১৯৬৩ সালে পরিকল্পনা কমিশন দেশের সম্মুখে দুই বৎসরের অগ্রগতির যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাই অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বা Mid-term Appraisal নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে পরিকল্পনার অগ্রগতি সকল দিকেই অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, ফলে উৎপাদন প্রসারের নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহে পৌঁছান যাইবে না।

দুই বছরের অগ্রগতির রিপোর্ট

পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির বাৎসরিক হার দাঁড়াইয়াছে ২.৫%-এর কাছাকাছি, পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ৫%-এর উপরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কোনমতে তাল মিলাইয়া এত কম হারে উন্নয়নের ফলে আমাদের মাথাপিছু আয় সমানই আছে। পরিকল্পনায় মাথাপিছু আয় পাঁচ বছরে ১৭% বাড়িবে এইরূপ ধরা হইয়াছিল, অর্থাৎ বাৎসরিক ৩% হারে বাড়িবে এইরূপ আশা ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য যদি পূরণ করিতে হয়, তবে বাকি তিন বছরে বাৎসরিক উন্নয়নের হার হইতে হইবে প্রায় ৮%। এত উচ্চহার কোনো মতেই সম্ভব নয়। তৃতীয় পরিকল্পনার সকল দিকে সার্থক রূপায়ণ ঘটিলেও চতুর্থ পরিকল্পনায় উন্নয়নের এত উচ্চ হার আমরা কল্পনা করিতেছি না।

জাতীয় আয় অল্প হারে বাড়িয়াছে

জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির এত স্বল্প হারের প্রধান কারণ হইল কৃষি উৎপাদনের অনগ্রসরতা। এখনও কৃষি উৎপাদনই জাতীয় আয়ের মধ্যে সর্বাধিক অংশ। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল গড়ে ৫% বাৎসরিক বৃদ্ধি, বাস্তবে ১৯৬১-৬২ সালে কৃষি উৎপাদন ১% বাড়ে, পরের বৎসর ৩% কমে, ফলে পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে, আমাদের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া যায়। কৃষি উৎপাদনের অনড়তা এই অবস্থার জন্য দায়ী ঠিকই, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন বিশেষ বাড়ে নাই। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল বৎসরে ১১% বৃদ্ধি, প্রথম দুই বছরে ইহার হার ছিল ৬.৫%

ইহার কারণ কৃষির অনগ্রসরতা

এবং ৮%। মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী এবং মধ্যস্তরের (Capital and intermediate goods) দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের হার সমগ্র শিল্পোৎপাদনের হার অপেক্ষা বেশি আছে ঠিকই, কিন্তু পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য অপেক্ষা উহা কম। কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি না হওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাপেক্ষা আরও বিপদজনক শিল্পপ্রসারের মূল খুঁটিগুলি শক্ত না হওয়া। লক্ষ্যের তুলনায় উৎপাদন কম হইয়াছে লৌহ ও ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, মেশিনটুল, ভারি রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সার, ইত্যাদিতে। এমন কি পরিকল্পনা কমিশনও মনে করেন না যে অবশিষ্ট বৎসরগুলির মধ্যে এই ঘাটতি পূরণ করা যাইবে। ফলে, প্রশস্ত ও সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি লইয়া চতুর্থ পরিকল্পনা সুরু করা যাইবে না।*

শিল্প বৃদ্ধির স্বল্প হার

উৎপাদনের দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আমরা যদি বিনিয়োগ ও ব্যয়ের দিকে তাকাই, তবে কিন্তু এক পৃথক চিত্র দেখা যায়। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি মিলিয়া ১৯৬১-৬৪ সালের মধ্যে এই তিন বছরে প্রায় ৪২০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ পাঁচ বছরের মোট বরাদ্দের ৫৬% ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। যে হারে ব্যয় বাড়িতেছে, তাহাতে ব্যয়ের লক্ষ্য নিশ্চিত পূরণ হইবে, বরং বরাদ্দে কিছু টান পড়িতে পারে। ব্যক্তিক্ষেত্র মোটামুটি পরিকল্পিত হারেই বিনিয়োগ করিয়া চলিয়াছে।

বিনিযোগ ও ব্যয় কিন্তু এই তিন বছরে বেশ বাড়িয়াছে

সরকারী ক্ষেত্রের জন্য ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা দরকার, এইরূপ লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল এবং কোন্ ধরনের উৎস হইতে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাহাও মোটামুটি নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এই তিন বছরে অর্থসংগ্রহের সূত্রগুলি একটু ভিন্নরূপ হইয়াছে, পরিকল্পনার অনুরূপ হইতেছে না। চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছিল ৫৫০ কোটি টাকা, উহা এখনও পাওয়া যায় নাই, মনে হইতেছে, পঞ্চবর্ষের শেষেও এই খাত হইতে কোন টাকা পাওয়া যাইবে না। পরিকল্পনায় ধরা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার ১১০০ কোটি টাকা নূতন কর হইতে আদায় করিবেন। প্রথম তিন বছরে ইহার ৬৮ ভাগ উঠিয়া গিয়াছে, পরিকল্পনা কালের শেষে এই নূতন করগুলি হইতে ১৯০০ কোটি টাকার বেশি

অর্থসংগ্রহের নির্ধারিত রূপ বাস্তবে দেখা যাইতেছে না

* "The targets in several industries would be fulfilled or at any considerable advance made...... There will, however, be shortfalls in certain *crucial* sectors. As a result the full benefits from the programmes envisaged in the Third Plan would be available only after a year or two and the Fourth Plan will start at a comparatively lower base than originally envisaged."

পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ লক্ষ্য ছাড়াইয়া আরও ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। নূতন কর বসাইয়া রাজ্য সরকারগুলির ৬১০ কোটি টাকা তোলার কথা ছিল। এই দিকে প্রচেষ্টার বহর তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তিন বৎসরের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় রেল হইতে নির্ধারিত ১০০ কোটি টাকার বেশি পাওয়া যাইবে, ৪০ হইতে ৫০ কোটি টাকা বেশি আদায় হইবে। অপর কোন সরকারী শিল্পোদ্যোগ হইতে কোন উদ্বৃত্ত এই দুই বছরে পাওয়া যায় নাই, পাঁচ বছরের শেষে এই খাতে অনুমিত ৫০০ কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। সরকারী ঋণ আদায়ের হার বেশ বেশি, রাজ্য সরকারগুলিই এই চেষ্টাতে অধিক সফল হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের লক্ষ্য ছিল ৫৫০ কোটি টাকা, কিন্তু তিন বছরে ইহার পরিমাণ ৬২৪ কোটি টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় তাই বলা হইয়াছে যে "বৈদেশিক সাহায্য এবং স্বল্পসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অনুমানমত আদায় হইলে, পরিকল্পনার আন্দাজ অনুযায়ী ৮০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি পাওয়া যাইবে।"

লেনদেন ব্যালান্সের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার হিসাব ছিল যে আমাদের রপ্তানির ক্ষমতা ও আমদানির প্রযোজনের মধ্যে ২৬০০ কোটি টাকার ফাঁক আছে।

লেনদেন ব্যালান্স একই রকম

প্রথম দুই বছরে ৭৪৯ (=৩৯০+৩৫৯) কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছে। রপ্তানির আয় মোটামুটি পরিকল্পনার হিসাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই চলিতেছে। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস পযন্ত ১৮৬৫ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি না-পাওয়া এবং অর্থের বিনিয়োগ বেশি হওয়া—এই দুই-এর ফলে দামের উপর তীব্র চাপ দেখা দিযাছে। এই চাপ দেখা দেয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস হইতে দামস্তর ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী,

দামস্তরে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

খাদ্যশস্যের দামে বৃদ্ধির হার অন্যান্য দ্রব্যের বৃদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশি। ১৯৬৩ সালে এই বৃদ্ধির বেগ আরও বাড়ে, পরিকল্পনার সুরুর তুলনায় দামের সাধারণ সূচক শতকরা ৮ ভাগ বাড়ে। চাল, চিনি ও গুড়—এই তিনটি দ্রব্যের দাম সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। দামে এতটা বৃদ্ধি দুই কারণে বিশেষ বিপদজনক: প্রথমত, ইহার পূর্বে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে দামস্তর ৩০% বাড়িয়াছিল, ফলে সাধারণ লোকের অবস্থা এমনিতেই বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত, এবং দ্বিতীয়ত, গত তিন বছর ধরিয়া দাম বাড়িয়াছে প্রধানত খাদ্যদ্রব্যের। দামস্তরে এতটা বৃদ্ধির ফল হইল পরিকল্পনার

ব্যয়ভার বাড়িয়া যাওয়া। এই কারণে পরিকল্পনায় টাকা খরচ বেশি হইয়াছে, কিন্তু আসল উৎপাদন ততটা বাড়ে নাই।

সাধারণভাবে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন পরিকল্পিত লক্ষ্য হইতে অনেক কম হওয়ার কারণ কেবল প্রাকৃতিক নয়। পরিকল্পনাতে নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল অত্যধিক আশাবাদী, শাসনতান্ত্রিক অক্ষমতার জন্য ঠিক সময়মত কাজগুলি করাও হয় নাই, জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতাও বিশেষ দেখা যায় নাই, সারের উৎপাদন লক্ষ্য অনুযায়ী ততটা বাড়ে নাই, উন্নত বীজের উৎপাদন দুই বছরে লক্ষ্যের এক তৃতীয়াংশ কম উৎপন্ন হইয়াছে, আর কৃষি যন্ত্রপাতির বিষয়ে এই পর্যালোচনায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে: "progress in the introduction of new implements and equipment has been generally slow." সমগ্র কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্য তাই পরিকল্পনার শেষে পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভূমি সংস্কার "tends to be defeated because of inadequate measures for preventing transfers of land." কৃষককে ভূমিতে স্বত্বের নিরাপত্তা দান প্রসঙ্গে পর্যালোচনায় বলা হইয়াছে, "both administrative and legislative action taken so far have fallen short of the recommendations in the plan in several states."

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম কেন

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে, ভারতের সকল গ্রাম এখন এইরূপ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কৃষি-সমবায়ের অগ্রগতি একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়, কমিশনের ভাষায় "despite increased coverage in terms of villages and population, the overall impact of the co-operative movement is still relatively small." তৃতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় চাষের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং কেরালাতে সমবায় চাষ মোটামুটি অগ্রসর হইয়াছে, তবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে "co-operative farming is still in its early beginnings."

অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় দেখান হইয়াছে যে শিল্প ও খনির ক্ষেত্রে অনুমিত ১৮০০ কোটি টাকার স্থলে এখনকার পরিবর্তিত হিসাব হইল ২২৯২ কোটি টাকা। পর্যালোচনায় ইহার কারণ দেখান হইয়াছে: "when the Third Plan was prepared estimates of the cost of certain projects

had not been made and such preliminary indication of cost as could be had was taken into account. Estimates of costs have now been made on receipt of more detailed information on the basis of project reports There has also been a general increase in construction costs. Moreover, in some cases the scope of the projects was enlarged."

শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম কেন

ভারতে সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন (Concentration of wealth and economic power in India)

গত কয়েক বৎসরে ভারতে সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিরূপে বন্টিত হইয়া আছে সেই সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে আমরা গ্রহণ করিয়াছি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ পার্লামেণ্টারী রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলা। বৃটিশ শাসনের সময় হইতেই ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় দেশী ও বিদেশী মালিকদের হাতে প্রভূত অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের দেশে যে শিল্পপ্রসার শুরু হইয়াছে তাহার ফলে অনেকে মনে করেন যে এই কেন্দ্রিকতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দ্রুত উন্নয়নের ফলে পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলি তাহাদের আয়তন বাড়াইবার সুযোগ পায় বেশি এবং স্বভাবতই নূতন ফার্মগুলির তুলনায় তাহাদের অগ্রগতির হার কম থাকে। নূতন বা ক্ষুদ্র ফার্মের তুলনায় তাহাদের সংগঠন ও দক্ষতা, মূলধনের বাজারে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা বৈদেশিক সাহায্য আকৃষ্ট করার ক্ষমতা এবং সহজে কাচামাল পাইবার ক্ষমতা বেশি থাকে। কতকগুলি শিল্পে যন্ত্রগত কারণেই বিপুল আয়তনের ফার্ম স্থাপিত হওয়া দরকার, ইহাতে মূলধন কম প্রয়োজন হয় এবং ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কম থাকে। দেশের উন্নয়নের পক্ষে এইরূপ সুবৃহৎ শিল্পস্থাপন অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী, কিন্তু মাত্র কয়েকজনের হাতে মালিকানা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বেশি অংশ পুঞ্জীভূত হইলে উহা স্বাভাবিক সামাজিক শক্তি-সাম্য বিপর্যস্ত করিয়া গণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়া তোলে, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাতে তারতম্য ঘটে। শ্রেণী সংঘর্ষ তীব্রতর হইয়া উঠে। সমাজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিপদগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি, 'সকলের জন্য সমান অর্থনৈতিক সুবিধা' এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতি সমাজে কার্যকরী হইয়া উঠে না।

১৯৫৫ সালে ভারতবর্ষে একটি হিসাবে দেখা যায় যে (census of manufactures) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ শিল্পোৎপাদনের মোট মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ তৈয়ার করে। ৬০০টি বড় ফার্মের মধ্যে ২৫০টিকে এখনও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে মাত্র ৯টি ইংরাজ ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস (Managing Agency House)। ইহা ব্যতীত ২২০টি বড় ফার্ম নিয়ন্ত্রণ করে ১১টি ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্ট। অর্থাৎ ৬০০টি ফার্মের মধ্যে ৪৭০টি ফার্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কর্তৃত্ব মাত্র ২০টি দেশী ও বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সীর উপর। ডাঃ মেহ্‌তা বলিতেছেন "for all practical purposes a few leading families in India control and guide the industrial destinies of the country. Fresh and young blood seldom find the opportunity to enter the closely reserved and well organised oligarchy."*

গত কয়েক বৎসর করিয়া ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌গণ সরকারকে এই বলিয়া সতর্ক করিতেছেন যে আমাদের দেশে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল জনসাধারণের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হইতেছে না। শিল্পে কেন্দ্রিকতা আরও বাড়িতেছে। পুরাতন ফার্মগুলি একচেটিয়ার মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। ধনীরা ধনী হইতেছে. তুলনামূলকভাবে দরিদ্রেরা আরও দরিদ্র হইতেছে। এই বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নীতি নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার অধ্যাপক মহলানবীশের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এপ্রিল ১৯৬৪ উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন বলেন যে প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালের মধ্যে আয়ের বণ্টনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না: "there is no clear indication of a significant change"। কমিশনের মতে সাধারণ কর্মচারীদের আয় দেশে গড় আয় বৃদ্ধির হারের সমান, তবে কৃষি মজুরদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে, ইহারা "do not seem to have shared in the increase of income." আয়কর হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঘাঁটিয়া কমিটি বলেন দেশে, কণ্ট্রাক্টারদের আয় সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর আয়ে বৃদ্ধি, "very much higher than the rise in the income per employed persons for the country as a whole." কমিটির মতে ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত বা অনুন্নত দেশের তুলনায় বেশি নয়

* Dr. N. M. Mehta, Structure of Indian Industries.

এবং সহরাঞ্চলে এই বণ্টন-বৈষম্য গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি। কমিশন মনে করেন যে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে আর বেশি একচেটিয়া দেখা না দেয় এইজন্য একটি স্থায়ী একচেটিয়া কমিশন (Monopoly Commission) গঠন করা দরকার। সম্প্রতি ভারত সরকার এই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া একটি মনোপলি কমিশন নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন রোধ করার জন্য নানাবিধ নীতি গ্রহণ করা উচিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সরকার সম্প্রতি এই বিষয়ে সফল নীতি গ্রহণের কথা চিন্তা করিতেছেন। কমিশনের মতে, প্রথমত, বৃহৎ আয়তন ও বেশি মূলধন দরকার এইরূপ সংস্থাগুলি প্রধানত সরকারী ক্ষেত্রে স্থাপিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, শিল্পক্ষেত্রে নূতন প্রবেশকারী এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র আয়তনের ফার্মগুলি এবং সমবায়ী প্রতিষ্ঠান-গুলিকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। তৃতীয়ত, সরকারের উচিত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাগুলিকে অধিকতর কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা এবং উপযুক্ত করনীতি অবলম্বন করা।

কমিশনের মতে, প্রথমত, অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণের মাত্রা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দুই ভাবে কাজ করিবে। ইহা অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল অভাব ও অসম্পূর্ণতা দূর করিবে এবং ব্যক্তির হাতে প্রভূত সম্পদ ও আয় পুঞ্জীভূত হওয়ার সুযোগ কমাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ক্ষেত্রের নূতন প্রতিষ্ঠান, মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। লাইসেন্স দানের ব্যাপারে সরকারের এই বিষয়ে আরও সতর্ক এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকা উচিত। পুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণদান নীতিও এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে করনীতি সরকারের হাতে একটি প্রধান অস্ত্র। অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা ভাঙ্গিবার জন্য নূতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রিবেট, কনসেশন এবং এইরূপ নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হইবে। কর-ফাঁকি বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন। কমিশনের মতে "To sum up, in dealing with the problems of concentration of economic power, there is already general agreement on the broad objectives, and the necessary legislative and other sanctions needed are in fact available for the greater part."

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সমাজতন্ত্র : গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সমস্যা (Planning and Socialism : The Problems of Democratic Socialism)

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি সমাজতান্ত্রিক কি না এই বিষয়ে বর্তমানে বহু প্রকার বিতর্ক চলিতেছে। প্রথম পরিকল্পনায় আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 'লক্ষ্য' বা 'আদর্শ' হিসাবে সমাজতন্ত্রের কোন উল্লেখ ছিল না, দারিদ্র মোচন ও কল্যাণ রাষ্ট্রের (welfare state) কথা বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বে কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে জাতির লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয় 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা' (Socialist Pattern of Society)। কিন্তু তখনও এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন চিন্তা বা ধারণা দানা বাঁধে নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন বলিতেছেন : "The socialist pattern of society is not to be regarded as some fixed or rigid pattern. It is not rooted in any doctrine or dogma." সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ জীবন যাপনের এক প্রকার ধারা বা পদ্ধতি মাত্র, বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো নয় ("a way of life rather than a particular set of institutional arrangements ")। দেশের সম্মুখে, জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য অতীব বাস্তব অথচ ভবিষ্যতের স্বপ্ন এইরূপ কোন আদর্শ না থাকিলে পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র তাই জনসাধারণকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না। এই সকল ব্যাখ্যাতেই দেখা গিয়াছে কতকগুলি লক্ষ্যের (objective) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু সেই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবে পরিণত করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বা সাংগঠনিক রূপান্তরণের কথা বলা হয় নাই। যেমন, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কমিশন বলিতেছেন, "The accent of the socialist pattern of society is on the attainment of positive goals, the raising of living standards, the enlargement of opportunities for all, the promotion of enterprise among the disadvantaged class and the creation of a sense of partnership among all sections of the community." এই লক্ষ্যসমূহকে সমাজতান্ত্রিক মনে করিলে পৃথিবীর যে-কোন উন্নত আধুনিক

প্রথম পরিকল্পনায় কোন উল্লেখ ছিল না

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য : সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা কি

রাষ্ট্রকেই সমাজতান্ত্রিক মনে করা চলে। এই অবস্থায় যে কল্যাণরাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়াই পরিচালিত হয় উহার সহিত সমাজতন্ত্রের পার্থক্য করা যায় কি উপায়ে? অবশ্য ইহা ঠিক যে, সরকারী ক্ষেত্রের (public sector) ভূমিকা কল্যাণরাষ্ট্রে গৌণ, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহারই ভূমিকা প্রধান ও ক্রমপ্রসারশীল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা কি ভাবে দেখা হইয়াছিল? ইহাকে 'দেশে দ্রুত মূলধন গঠনের প্রধান উৎস এবং শিল্প প্রসারের গতি-নির্ধারক প্রধান শক্তি হিসাবে দেখা হয় নাই, ইহার কাজ ছিল দেশে এমন কতকগুলি মৌলিক সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা যাহাতে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যম যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়া উন্নয়নের উপযুক্ত হার বজায় রাখিতে পারে ("creating basic conditions in the economy within which private enterprise may get enough stimulus for maintaining an adequate rate of growth")।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই ধরনের বাধা এবং অস্পষ্টতা অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্রকে কেবলমাত্র কতকগুলি উচ্চ লক্ষ্যের সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয় নাই, ইহাকে পদ্ধতি বা method হিসাবে ধরা হইয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমাগত অধিকতর প্রসার ঘটান পরিকল্পনার লক্ষ্যসাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়—এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। "It is a basic premise in India's five year plans that, through democracy and widespread public participation, development along socialist lines will secure rapid economic growth and expansion of employment, reduction of disparities in income and wealth, prevention of concentration of economic power, and creation of the values and attitudes of a free and equal society."*

এখানে সমাজতন্ত্রকে পথ বা উপায় (means) বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, যে পথের মাধ্যমে আমরা পরিকল্পনার উচ্চ আদর্শগুলিকে বাস্তবে রূপ দান করিতে পারিব। এই বিষয়ে চিন্তা আরও স্পষ্ট হইয়াছে যখন বলা হইল "the

* *Third Five year Plan*, P. 206.

development of a large public sector and a co-operative sector are among the principal means for effecting the transition towards socialism."

কমিশন বলেন যে, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে অগ্রগতি বিভিন্ন দিক হইতে অগ্রসর হইবে, একটি পথ অপরটিকে সরল ও মসৃণ করিয়া তুলিবে। কমিশনের মতে "Above all, a socialist economy must be efficient, progressive in its approach to science and technology and capable of growing steadily to a level at which the well-being of the mass of the population can be secured." প্রথমত, অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নেব উচ্চহার এবং বৃহৎ সরকারী ক্ষেত্র ও সমবায়ী ক্ষেত্র সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রধান উপায়। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিটি নাগবিকেব সম্মুখে সমান সুযোগ খোলা রাখিবে। ইহার প্রথম স্তর হিসাবে এই কাঠামো জীবনযাত্রাব মূল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্যবস্থা করিবে; বিশেষত খাদ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষার সুযোগ স্বাস্থ্যোন্নয়নেব ব্যবস্থা, গৃহ নির্মাণের অবস্থা এবং মোটামুটি জীবনযাপনেব উপযোগী নিম্নতম আয়। তৃতীয়ত, সরকারী নীতি এমনভাবে রচিত হইবে যাহাতে পুবানো আয় ও সম্পদ বৈষম্যের হ্রাস ঘটে এবং নূতনভাবে অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদেব কেন্দ্রীভবন এবং একচেটিয়ার সৃষ্টি না হয়। সর্বোপরি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রেব ভিত্তিতে উন্নয়নশীল কোন সমাজ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিবে সামাজিক মূল্য ও প্রেরণার উপর এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ স্বার্থ ও দায়িত্ববোধের উপর।

কমিশনের মতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর রূপ কি হইবে

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের তিনটি মূল সমস্যা লইয়া দেশে চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়াছে, অর্থনীতিবিদগণ এই বিষয়ে এখনও মোটামুটি একমত হইতে পারেন নাই। প্রথমত, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলিলে বোঝা যায় পার্লামেণ্টারী প্রথাতে সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া এবং উহার রীতিনীতি ও ভাবাদর্শ দেশের মধ্যে প্রসার করিয়া স্তরে স্তরে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাইতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে কোন শ্রেণী লাভবান হয়, পুরাতন কোন শ্রেণীর ক্ষতি হয় অথবা আর্থিক ক্ষতি না-হইলেও সামাজিক পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে শ্রেণী সংঘর্ষ তীব্রতর হয়

যতটুকু পরিবর্তন করা সম্ভব, এই পদ্ধতিতে ঠিক তখনই তাহার বেশি পরিবর্তন করা হইবে না।

এই প্রসঙ্গে বহু সমস্যা আলোচিত হইতেছে। যেমন, দেশের পার্লামেণ্টে যে শ্রেণী হইতে বেশি প্রতিনিধি যাইবে সেই শ্রেণীর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটিবে। অপরাপর শ্রেণীসমূহের কম প্রতিনিধিত্বের দরুণ তাহাদের প্রতি অবিচাব করা হইবে। তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এই পদ্ধতিতে সম্ভব হইবে না।

পার্লামেণ্টারী পথে উহা মেটান যায় কি না

যেমন, বিভিন্ন রাজ্যের ভূমিসংস্কার আইনগুলিকে পাকা করিয়া তোলার জন্য সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন হইল, পার্লামেণ্টে সরকার পক্ষের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত হইলেন না। শ্রমিক ও কৃষকেরা কর ও দামের ভারে জর্জরিত, দেশের বেশির ভাগ মানুষের দাবি থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের আইন-সভাগুলিতে জমির মালিকদের প্রাধান্য থাকায খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীযকবণ সম্ভব হইল না। এইরূপ অবস্থা ভারতে বাববার দেখা দিতেছে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয সমস্যা হইল বর্তমানের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন করা যায় কি উপাযে। সমাজতন্ত্রের জন্য পুরানো প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি দরকার এবং নূতন প্রতিষ্ঠানের গঠন দরকার। যেমন শিল্পক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা ভাঙিযা দেওযা প্রয়োজন এবং এন্‌জিনিয়াব অর্থনীতিবিদ্‌, পরিচালনার উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তি ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইযা গঠিত পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা দবকার। যেমন কৃষিক্ষেত্রে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানাব অবলোপ দরকার এবং নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় বা স্বেচ্ছামূলক সমবায প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার। গণতান্ত্রিক পথে যাঁহারা সমাজতন্ত্র গঠন করিতে চান তাঁহারা বলেন যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবলুপ্তি এখনই এবং দ্রুত না ঘটাইয়া কিছুদিন যাবৎ চেষ্টা করা উচিত যাহাতে পুরানো প্রতিষ্ঠান-গুলিকেই সংস্কার করিয়া এবং উহাদের মধ্যে নূতন ভাবাদর্শ ও প্রেরণা প্রবেশ করাইয়া উহাদের সমাজতন্ত্রের পক্ষে উপযোগী করিয়া তোলা যায়। যেমন ম্যানেজিং এজেণ্টদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করা হইল, উহাদের কাজকর্মের পরিধি নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে রাখা হইল, ক্রমে চাপ দিয়া শ্রমিকদের প্রতিনিধি পরিচালকমণ্ডলীতে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইল। যেমন, জমির ব্যক্তিগত মালিকানার পূর্ণ অবলুপ্তি না-ঘটাইয়া মালিক, ভাগচাষী ও কৃষি মজুরদের লইয়া

২। পুরানো প্রতিষ্ঠান গুলির অবলুপ্তি ও নূতন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটান

গঠিত সমবায় চাষ সমিতি গঠনের চেষ্টা হইল। এমনভাবে উহারা গঠিত হইল যে সমিতিব মধ্যে সংখ্যায় মালিকদের তুলনায় কিষাণ ও মজুর বেশি থাকে, এবং আইন করিয়া মালিকানা হইতে প্রাপ্তব্য অংশ ক্রমশ কমাইয়া দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলেন যে, ভারতের বর্তমান দারিদ্র্য এত গভীর এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত বেশি যে আমাদের অগ্রগতির হার অনেক বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু পুবানো প্রতিষ্ঠানের ক্রমসংস্কার করিলে উহারা বিভিন্ন দিকে দ্বিধাগ্রস্ত হইযাও বাধা পাইযা পূর্ণ বেগে সমাজতান্ত্রিক পবিবর্তন আনিতে পারে না। পদে পদে এই দ্বিধা ও বাধার জালে তাহাদের চলার গতি রুদ্ধ হইতে থাকে। এই কারণে আমবা পুবানো প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংস্কার কবিবার কাজ চালাইতে পাবি না। ইহা সম্ভব হয যে-দেশে জীবন-যাত্রাব মান এখনই উঁচুতে বেশি তাড়াতাড়িব কোন দবকার নাই, যেমন ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। সেই সকল দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তবণ গণতন্ত্রের পথে নিশ্চয় ঘটিতে পাবে। কিন্তু ভারতের অবস্থা ভিন্নরূপ বলিযা প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের আশু প্রযোজন দেখা দিযাছে। তাঁহাবা আবও বলেন যে প্রতিষ্ঠানগত কোনো পবিবর্তন ঘটলেই উহাতে গণতন্ত্রেব ক্ষতি হয না, ববং অনেকক্ষেত্রে গণতন্ত্রেব প্রসাবই ঘটে। এই নূতন সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি গণতন্ত্রের প্রসাব ঘটাইবে এবং অর্থনৈতিক উন্নযনকে ত্বরান্বিত কবিবে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রেব আব একটি সমস্যা হইল এই ব্যবস্থায় সরকারের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিসমূহ প্রকৃতক্ষেত্রে সঠিকভাবে কার্যকবী হয না। পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রশাসনিক বিভাগেব কর্মী ও পবিচালকেরা কোনো দল মত বা শ্রেণীগত স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিযা পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখিযা কাজ চালাইবেন। তথাকথিত নিবপেক্ষতা এবং সঙ্কীর্ণ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দীর্ঘসূত্রতা, তাই পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার অঙ্গলগ্ন বিষয়। কিন্তু দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কবিতে হইলে আইনগুলিকে সচেতনভাবে কার্যকরী করিতে হয। সরকারী কর্মচারীদের প্রতিটি আইন প্রযোগের সময়েই শ্রেণী-বিরোধ ও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি স্মরণ বাখিতে হয় নিরপেক্ষতার কোন ভাণ বা ভঙ্গী না রাখিযা জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইযা কাজ করিতে হয়। ইহাতে সরকারী কর্মচারীদের তথাকথিত নিরপেক্ষতা ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিতে হয, তাহাদের সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-

৩। তীক্ষ্ণ, একাগ্র, ও অনিরপেক্ষ প্রশাসনবিভাগ গড়িযা উঠে না বলিয়া সমাজতন্ত্রেব গতিবেগ কম থাকে

কামী সচেতন সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। পণ্ডিত নেহেরুর ভাষায় বলা চলে "planning is a continuous movement towards desired goals and, because of this, all major decisions have to be made by agencies informed of these goals and the social purpose behind them" কিন্তু পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ঐতিহ্য বা ভাবধারা এইরূপ প্রশাসনিক নবরূপায়ণে সর্বদা বাধা দিতে থাকে।

উপসংহারে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র বলিলে কি বোঝা যায় সেই বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত, একেবারে দ্বিমতবিহীন কোন মত নাই। ইহা অনেকটা টুপির মতন, বিভিন্ন ব্যক্তির মাথায় চড়িয়া উহা বিভিন্ন আকৃতিতে প্রতিভাত হয়। তাহা ছাড়া, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মাত্র একপ্রকার পথ আছে, এমন কথাও আজকাল অনেকে মানেন না। সকল দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তরে নাই, সকল দেশের শ্রেণীবিন্যাসও সমান নয়। তাই প্রতিটি দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ পৃথক। আলজিরিয়া হইতে বড় বড় কৃষি ফার্ম ছাড়িয়া দিয়া ফরাসীরা নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন, স্বাধীনতাকামী সৈনিকেরা সেই জমি দখল করিয়া প্রথম হইতেই সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া তুলিলেন। ঘানা, গিনি, মালি, প্রভৃতি দেশ হইতে খনি ও বাগিচা ছাড়িয়া বিদেশীরা চলিয়া গেল, উহাদের মালিকানা সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিল। বার্মা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের এবং খাদ্যশস্য ও কাঠের ব্যবসায় বিদেশীদের হাতে ছিল, স্বাধীনতার পরে ইহাদের জাতীয়করণ আপনা-আপনি একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এইরূপে দেখা যায় সকল দেশের সমাজতন্ত্রের রূপ, মাত্রা এবং গতিধারা একেবারে সমান হইতে পারে না। পূর্ণ সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী উন্নয়নের এইরূপ অধ্যায়কে আজকাল অনেক অর্থনীতিবিদ অধনতান্ত্রিক-উন্নয়নের পথ (non-capitalist path) বলিয়া বর্ণনা করেন। এই দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক নয়, কারণ সমাজতন্ত্রের মূল কথা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গঠিত সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার এবং উহার নেতৃত্বে শিল্পপ্রসার। এই সকল দেশে স্বেচ্ছামূলক সমবায় বা গ্রামগোষ্ঠীর মালিকানায় অর্থনীতি পরিচালিত হইতেছে, ইহারা তাই একেবারে ধনতান্ত্রিকও নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ইহাদের শিল্পায়ণ ঘটিতেছে না বলিয়া ইহারা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিকও নয়। পৃথিবীর সকল দেশে ধনতন্ত্রের রূপ এবং কাঠামোও

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নানা পথ

যেমন সমান নয়, আজ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে সকল দেশ একই ছাঁদের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো লইয়া গড়িয়া উঠিবে, এমনও মনে করা যায় না।

চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট (Report of the Fourth Finance Commission)

১৯৬৪ সালের মে মাসে যে চতুর্থ ফিনান্স কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের আগষ্টে। এই রিপোর্টের সুপারিশসমূহ ১৯৬৬ সালের এপ্রিল হইতে সুরু হইয়া পাঁচ বৎসরের জন্য কার্যকরী হওয়ার কথা।

বিগত তিনটি ফিনান্স কমিশন অপেক্ষা চতুর্থ ফিনান্স কমিশন অপেক্ষা চতুর্থ ফিনান্স কমিশনেব আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ছিল বিস্তৃততর। বর্তমানের বা চলতি বিষয়বস্তুগুলি ছাড়াও কমিশনের উপর আরও নূতন ধরণের অনেক ভার অর্পিত হইয়াছিল, যেমন নানা দ্রব্যের উৎপাদন, ভোগ ও রপ্তানির উপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয় করের সম্মিলিত করপাত।

উপরন্তু রাজ্যগুলিকে সাহায্য দানের সুপারিশের সময়ে কমিশনকে বিবেচনা করিতে বলা হইয়াছিল যে রাজ্যগুলির ঋণ ও সুদ পরিশোধের যোগ্যতা কতদূর, ইহার জন্য রাজ্যগুলির অতিরিক্ত ব্যয় কিরূপ হইতে পারে। কমিশনকে ইহাও বিবেচনা করিতে বলা হইয়াছিল যে কেমন করিয়া বাড়তি সম্পত্তি কর হইতে (চাষের জমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির উপর) রাজ্যসরকার কেন্দ্রকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

আয়কর-এর হইতে নীট আদায় সম্পর্কে প্রত্যেকটি রাজ্যসরকার রাজ্যের ভাগ, বর্তমানের অংশ অর্থাৎ ৬৬$\frac{২}{৩}$% হইতে আরও বাড়াইবার দাবী করিয়াছিল। তাহাদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া স্থির হইয়াছে যে নীট আদায়ের ৭৫% রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে। প্রতিটি রাজ্য কতটা পাইবে তাহা স্থির হয় জনসংখ্যা এবং ঐ রাজ্য হইতে কতটা আদায় হইল এই দুইটি মানদণ্ড অনুযায়ী। তৃতীয় ফিনান্স কমিশন ঠিক করিয়াছিলেন যে রাজ্যগুলি প্রাপ্য অংশের ৮০ ভাগ পাইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং ২০ ভাগ পাইবে উৎসস্থানের ভিত্তিতে। নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্বের দিকে তাকাইয়া পুরাতন মানদণ্ড দুইটি ও উহার অনুপাত বজায় রাখা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের (বা অন্তঃ শুল্কের) ক্ষেত্রেও চতুর্থ কমিশন

-রাজ্যগুলির অংশ তৃতীয় কমিশনের অনুরূপ, অর্থাৎ ২০% রাখিয়াছেন। তবে তৃতীয় কমিশনে স্থির ছিল যে ৩৫টি দ্রব্যের শুল্ক হইতে আদায় রাজ্যগুলির মধ্যে বিভাগযোগ্য বিবেচিত হইবে। চতুর্থ কমিশন এইরূপ সীমা তুলিয়া দিয়াছেন, যে-দ্রব্যের উপর এইরূপ অন্তঃ শুল্ক আছে, বা আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আরোপিত হইবে, সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই নীট আদায়ের ২০% রাজ্যগুলির প্রাপ্য হইবে। বিক্রয় করের পরিবর্তে বর্ধিত অন্তঃশুল্কের সবটাই, সংগ্রহের খরচ-খরচা বাদ দিয়া রাজ্যসরকার পাইবে।

রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্য এই ২০% অংশ হইতে প্রতিটি রাজ্যের কতটা পাওনা হইবে তাহার জন্য চতুর্থ কমিশন দুইটি মানদণ্ড সুপারিশ করিয়াছেন, শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনুন্নতির মাত্রা অনুযায়ী। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় মানদণ্ডটি এতদিনের মধ্যে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। কমিশন কোন রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনুন্নতি পরিমাপ করার পদ্ধতিও নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা হইল মাথা পিছু কৃষি উৎপাদন, মাথা-পিছু শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধি, মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্প শ্রমিকের অনুপাত প্রভৃতি। এইরূপে চতুর্থ কমিশন কোন রাজ্যের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অনুন্নতি এবং আর্থিক দুর্বলতা—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। কমিশনের মতে "it is possible that a state may be economically backward and poor in social service and yet it may have a comfortable position on revenue account. The present commission is of the view that financial weakness as a criterion would be more appropriate in determining the grants than in allocating shared taxes."

কৃষি জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উপর কর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিভক্ত হইবে। দ্বিতীয় কমিশনের এই সুপারিশ চতুর্থ কমিশনও রক্ষা করিয়াছেন। তবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অংশ ১% হইতে বাড়াইয়া ২% করার সুপারিশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৯৮% পাইবে রাজ্যগুলি। তবে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের নীতির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। পূর্বেরই ন্যায় রাজ্যগুলির অস্থাবর সম্পত্তির অংশ বিভক্ত হইবে জনসংখ্যার অনুপাতে এবং স্থাবর সম্পত্তির অংশ বিভক্ত হইবে ঐরূপ সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী।

রেলের যাত্রীভাড়াগুলের উপর করের পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে যে অনুদান দেওয়া হইবে তাহা এই কর প্রত্যাহারের পূর্বে রাজ্যগুলি যে যে রূপে টাকা পাইবে সেই অনুযায়ী স্থির হইবে। রেলওয়ে কনভেনসন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্য টাকার পরিমাণ স্থির হইবে।

রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্যের (Grants-in-aid) ব্যাপারে তৃতীয় ফিনান্স কমিশন ৫২ কোটি টাকা সুপারিশ করিয়াছিলেন উহাদের রেভিনিউ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে এবং ৫৮·২৫ কোটি টাকা সুপারিশ করিয়াছিলেন রাজ্যগুলির পরিকল্পনার রেভিনিউ অংশের ৭০% বহন করার উদ্দেশ্যে। চতুর্থ কমিশন হিসাব করিয়াছেন মোট রেভিনিউ আদায় ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের অনুপাত অনুসারে। আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য কমিশনের সুপারিশ হইল বৎসরের মোট ১২১·৮৯ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য হিসাবে দেওয়া হউক। তৃতীয় কমিশন বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে (যেমন পথ নির্মাণ) সাহায্যদানের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থ কমিশন এইরূপ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সাহায্য দানের পক্ষপাতী নয়।

চতুর্থ ফিনান্স কমিশন তাহার রিপোর্টে সাধারণভাবে অনেক আলোচনা ও সুপারিশ করিয়াছেন। যেমন, সাধারণ আর্থিক স্বার্থের বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনার জন্য স্থায়ী কোনরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করা, ভবিষ্যৎ ফিনান্স কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরে একটি স্থায়ী সংগঠন তৈয়ার করা, এবং রাজ্যগুলির ঋণ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সমগ্রভাবে ও খুঁটিনাটি আলোচনার উপযুক্ত একটি দক্ষ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা, প্রভৃতি। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক ঋণগ্রহণ যুক্তিযুক্ত কি না, চতুর্থ কমিশন সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করার পক্ষপাতী।

চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টে মোহনলাল গৌতম তাঁহার ভিন্নমত (minute of dissent) সংযুক্ত করিয়াছেন। রাজ্যগুলির আয় ও ব্যয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক বণ্টনের মানদণ্ড সম্পর্কে কমিশনের অপর সকলের সহিত তিনি একমত হইতে পারেন নাই। ইহা ব্যতীত রিপোর্টে সভাপতি রাজামান্নার এবং অন্যতম প্রধান সভ্য অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাঁহাদের নিজস্ব কয়েকটি অতিরিক্ত মতামত সংযুক্ত করিয়াছেন। অধ্যাপক দত্তের অভিমতে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন : (১) পরিকল্পনা কমিশন ও ফিনান্স কমিশনের সুস্পষ্টভাবে আর্থিক দায়িত্ব বিভাগের জন্য ; (২) কোন

কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত ঘাট্‌তি ও প্রভূত সাহায্যের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উপযুক্ত আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরণের (devolution) ব্যবস্থার জন্য, এবং (৩) বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অসমান হারে উন্নয়নের দরুণ যে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতেছে তাহা সমাধানের উপযোগী কোনরূপ ব্যবস্থার জন্য।

বর্তমান খাদ্য ঘাট্‌তি ও উহার প্রতিকার (Recent food shortage and its remedies)

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ কয়েক বৎসরে ভারতে যে বিরাট খাদ্য সমস্যা দেখা গিয়াছে, তাহার ছায়া চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন, অগ্রগতির হার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও অগ্রাধিকার তালিকা এবং অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি—সকল কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচয়িতাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে খাদ্যের স্বল্পতা নানা দিক হইতে শিল্পপ্রসারের গতিবেগ শ্লথ করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামে খাদ্য উৎপাদন উপযুক্ত হারে বাড়ে নাই, শিল্প-প্রধান সহরাঞ্চল গড়িয়া তুলিলে সেখানে খাদ্যের যোগান দেওয়া যাইবে কি উপায়ে? সৌদি আরবের মত কোন দেশ প্রভূত পরিমাণ তৈল বা প্রাকৃতিক কোন সম্পদের অধিকারী হইলে উহার বিনিময়ে খাদ্য আমদানি করিয়া নিজ দেশের শিল্পপ্রসার ঘটাইতে পারে। কিন্তু ভারতে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত বিশেষ নাই অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু। তাহার পক্ষে খাদ্যের উৎপাদন না বাড়াইয়া শিল্প প্রসার মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। খাদ্যের আমদানি সাময়িক ঘাটতি মিটাইয়া দুর্ভিক্ষ ঠেকাইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালীন শিল্পপ্রসারের কোন পরিকল্পনা খাদ্য-আমদানির ভরসায় রচনা করা চলে না। আর শিল্পপ্রসার বলিলে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রকেও মূলধন-প্রগাঢ় করিয়া তোলা বোঝায়; বিশাল সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত চারিদিকে বিস্তৃত অনুন্নত কৃষি অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি কারখানা-নগরী বোঝায় না। কলকারখানা অধিক হারে প্রতিষ্ঠা করিলে শস্যসামগ্রীর বিক্রয় বাড়িতে থাকে, কৃষির বাণিজ্যীকরণ ঘটে, মুনাফা বাড়ে, ফলে যন্ত্রীকরণের তাগিদ সৃষ্টি হয়। কৃষি পণ্যের ব্যবসায়িক মুনাফা হইতে অধিক হারে মূলধন-গঠন দেখা দেয়, শেয়ার, বণ্ড, বীমা ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে সেই মূলধন আসিয়া পড়ে। এইরূপে সহরাঞ্চলে অধিকতর শিল্পপ্রসার এবং কৃষির শিল্পায়ন

উভয় ধারা পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হয়। অপরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামোতে কৃষিক্ষেত্রের উৎপন্ন খাদ্যশস্যকে সহরাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য টানিয়া আনা হয় বাজারের অদৃশ্য শক্তিসমূহের মাধ্যমে, দাম ক্রমশ বাড়িয়া গিয়া খাদ্যের যোগান ও বিক্রয় বাড়িয়া চলে। আবার পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামোতে গ্রামাঞ্চলের ঐ উদ্বৃত্ত শহরে আনিতে হয় প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, লেভি ও প্রোকিওরমেণ্টের মাধ্যমে। আমাদের খাদ্য উৎপাদনের স্বল্পতা চাষীর আয় বাড়ায় নাই, ফলে শিল্পদ্রব্যের বাজার প্রসারিত হয় নাই। গ্রামাঞ্চল হইতে সঞ্চয় ও মূলধন সহরের কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে নাই। খাদ্য আমদানির প্রয়োজন বাড়িয়া যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া আমরা যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারি নাই। খাদ্যের দাম বাড়িয়াছে, ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম-ও বাড়িয়াছে, পরিকল্পনার প্রতিটি কার্যসূচীর ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্য অপেক্ষা কম উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন খাদ্য ও কৃষিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনা করিয়াছেন এমন বলা যায় না। প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষির উপর অগ্রাধিকার ছিল, অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৭৩ লক্ষ টন। ভাল মরসুমের দরুণ খাদ্যের উৎপাদনও এই লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল মূলত শিল্পপ্রধান। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল মোট ১০ কোটি টন খাদ্যোৎপাদন, বিভিন্ন হিসাব হইতে দেখা যায় যে ৯ কোটি টনের বেশি খাদ্য ভারতে উৎপন্ন হইতেছে না। আগামী চতুর্থ পরিকল্পনার রচয়িতাগণ মোট খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১১·৬ কোটি টন ধার্য করার কথা বলিয়াছেন।

ছোট ছোট ও বিচ্ছিন্ন জোতগুলিকে একত্রীকরণ সম্ভব হইতে পারে একমাত্র সমবায় চাষ সমিতির মাধ্যমে। সমবায় ঋণদান সমিতি, ক্রয় বা বিক্রয় সমিতি প্রভৃতি ব্যবস্থাতে চাষীর হাতে কিছু মূলধন বা উপকরণ পৌঁছান সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের কোন পদ্ধতির মাধ্যমেই কৃষি উৎপাদনের উৎপাদন-ফর্মূলা বা উপকরণ সংস্থানে (production formula or resource-use) কোন উন্নতি ঘটান সম্ভব নয়। ছোট ও বড় চাষী-মালিকদের পারিলে বুঝাইয়া, বা না-পারিলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করিয়া, দাম, বীজ, করভার ও ঋণ প্রভৃতি

বিষয়ে সুবিধা দিয়া, একত্র করিয়া জমিখণ্ডগুলির আইল ভাঙিয়া সমবায় চাষ সমিতি গঠন করা এবং সমিতির হাতে বড় বড় জোত ক[illegible]র।

এইরূপ বড় বড় সমবায় চাষ সমিতি যে কেবলমাত্র উৎপাদন বাড়াইতে সাহায্য করিবে তাহা নহে, উপরন্তু বর্তমানের বণ্টনগত বাধা অনেকাংশে দূর করিবে। কোটি কোটি বিচ্ছিন্ন চাষীর নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে একান্ত অসম্ভব। যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত বড় বড় ধনী চাষীর বৃহৎ কৃষি জোত আমাদের দেশে দেখা দেয় অথবা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম বা অন্যান্য স্কাণ্ডিনেভীয় দেশগুলির মত কৃষিক্ষেত্রে সুবৃহৎ যৌথ কোম্পানী গড়িয়া ওঠে তাহা হইলেও ইহারা দাম বাড়াইয়া বা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিবে। রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন ও পরিচালনায় সমবায় চাষ সমিতির হাত হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। সহরাঞ্চলে শিল্পপ্রসারের জন্য নির্দিষ্ট দামে ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় খাদ্যের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে। বর্ধিত উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন একই যোগে নিশ্চয় করা সম্ভব আমরা যদি সমবায় চাষ সমিতি গঠন করিতে পারি।

খাদ্য ঘাট্‌তি দূর করার উপযোগী কয়েকটি স্বল্পকালীন পদ্ধতির কথা আমরা এখানে আলোচনা করিতে পারি। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি ছাড়া আর একটি মাত্র পথ গ্রহণের কথা চিন্তা করা সম্ভব। উহা হইল রাষ্ট্রের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চল হইতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ এবং সহরাঞ্চলে রেশনিং-এব মাধ্যমে সেই খাদ্যের বণ্টন।

দেশরক্ষা ও উন্নয়ন (Defence and Development)

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা রচয়িতাগণকে চতুর্থ পরিকল্পনা রচনার প্রারম্ভে একটি বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে, ভারতবর্ষকে যুধ্যমান প্রতিবেশীদের লইয়াই বসবাস করিতে হইবে। এই অবস্থায় দেশরক্ষা ও উন্নয়নের কথা একই সঙ্গে চিন্তা করিতে হইবে। সহজেই বুঝা যায় যে দেশরক্ষা ও উন্নয়ন স্বল্পকালে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যে দেশে মূলধন স্বল্প সেই দেশে একমাত্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার স্তর আরও সংকুচিত করিয়া অধিকতর মূলধন পাওয়া যাইতে পারে। চলতি উন্নয়নের উপরে দেশরক্ষার জন্য উপকরণ সংগ্রহের চাপ যুক্ত হইলে জনসাধারণের ভোগের মান

নিশ্চয় আরও কিছুটা কমাইতে হইবে। বর্তমান ভারতে মাথাপিছু আয় এত কম যে ভোগের [illegible] সংকুচিত করিয়া দেশরক্ষার ব্যয় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। উপরন্তু স্বল্পকালে প্রধান সমস্যা হইল বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা। আমাদের দেশের ভোগের স্তর যদি আমরা আরও কিছুটা কমাইয়াও দিই, তাহা হইলেও এই উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করা সহজসাধ্য নয়, ফলে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা-না ও আয় হইতে পারে। সুতরাং, স্বল্পকালে দেশরক্ষার ব্যয় মিটাইবার জন্য উন্নয়নের ব্যয় নিশ্চয় কিছুটা কমাইতে হইবে। বন্দুকের জন্য মাখন ত্যাগ করিতে হইবে, যুদ্ধ-শিবিরের জন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে।

পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গত দুই বৎসর যাবৎ, বিশেষ করিয়া 1966 সালের সুরু হইতে ভারতে খাদ্য-দ্রব্যের দাম অতি উচ্চহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিভিন্ন অঞ্চলে কম বেশি পরিমাণে খাদ্যের স্বল্পতা দেখা দিয়াছে। সাম্প্রতিক এই খাদ্য সমস্যার মূলে নানা অর্থনৈতিক কারণ আছে, কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ লুক্কায়িত আছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতির মধ্যে, যে উপায়ে শিল্প প্রসার ঘটাইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহারই মধ্যে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পে এমনভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বিশেষ বাড়ে নাই, ঘাটতি ব্যয় ও ঋণসৃষ্টি বাড়াইয়া টাকার পরিমাণ লোকের হাতে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুন্নত দেশের নিম্ন জীবনযাত্রার স্তরের মানুষ স্বভাবতই খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক কালে দেশে টাকার হস্তান্তরন প্রচলনবেগ (transactions velocity) এবং আয়গত প্রচলনবেগ (income velocity) উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয়ত, লোকের হাতে অর্থের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বেশি পৌঁছিলেও দেশে খাদ্যের যোগান সেই হারে বাড়ে নাই; অপরপক্ষে গত বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব বৎসরগুলি অপেক্ষা একটু কমই হইয়াছে। চতুর্থত, অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার স্তর এত নীচুতে যে সমাজে খাদ্যের বাজারে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা খুবই বেশি, অর্থাৎ যে হারে আয় বাড়ে উহাপেক্ষা অধিক হারে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমত, আর্থিক আয় বৃদ্ধির দরুন খাদ্যশস্যের ভোগ ও চাহিদার ধরণ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে; যাহারা বাজরা ও জোয়ার খাইত, তাহারা গম ও চাউলের খোঁজ করিতেছে, চিরাচরিত গমভোজীরাও বর্তমানে চাউলভোজী শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে। ষষ্ঠত, শিল্পপ্রসারের দরুন দেশে, একদিকে যেমন

নূতন সহরাঞ্চলগুলি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমাইতেছে, অন্যদিকে তেমনই গ্রাম হইতে উদ্বৃত্ত শস্য সহরে আকৃষ্ট হওয়ার বা[illegible] প্রস্তুত করিয়াছে। জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত থাকায় যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে এই বিক্রয়-যোগ্য উদ্বৃত্ত সংগৃহীত হইতেছে তাহারা আর অল্প মূল্যে সেই শস্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। সরকারী ও সমবায়ী ঋণ প্রভৃতির সাহায্যে চাষ ও মজুত করার টাকা তাহাদের হাতে পৌঁছাইতেছে বলিয়া খোলা বাজারে এই উদ্বৃত্ত অবিলম্বে ও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করার তাগিদ আর তাহারা অনুভব করিতেছে না।

খাদ্যদ্রব্যের এই অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জন্য দুই ধরণের উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে: (ক) খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ান, এবং (খ) গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত সহরে টানিয়া আনার ব্যবস্থা, অর্থাৎ নূতন খাদ্যবণ্টন পদ্ধতি গড়িয়া তোলা। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিতে পারি।

আর যখন আবাদযোগ্য জমি বিশেষ নাই, তখন কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িতে পারে যদি কৃষক প্রতি বা একর-প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইহা সম্ভব প্রগাঢ় চাষের দ্বারা (intensive cultivation) অর্থাৎ চাষে মূলধন প্রগাঢ়তা (capital intensity) বাড়াইয়া তুলিয়া। বেশি জল, বেশি ও ভাল সার, উন্নত বীজ, নানাবিধ পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের হাত হইতে ফসল সংরক্ষণ, উন্নত ধরণের গুদাম সংরক্ষণ ও শস্যশোধন (processing) প্রভৃতি নানা ইন্‌পুটের পরিমাণ বাড়াইলে তবেই আউটপুট বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিভিন্ন ইন্‌পুটগুলি একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সকলে সকলকে রূপান্তরিত করিয়া সর্বশেষে আউটপুট রূপে দেখা দেয়। উৎপাদন বা আউটপুট বাড়িতে পারে কেবলমাত্র উপকরণ বা ইন্‌পুট বাড়াইলে। এই বস্তুগত ইনপুটগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি মানবিক বিষয় আছে, চাষীর শারীরিক কর্মক্ষমতা, তাহার কর্মদক্ষতা এবং উৎসাহ ও প্রেরণা। যেখানে কোন জলের ব্যবস্থা নাই সেখানে সার সরবরাহের প্রান্তিক বৃদ্ধি অপেক্ষা জলই অধিকতর উৎপাদনক্ষম; আবার যেখানে জলের ব্যবস্থা কিছুটা আছে, সেখানে সার সরবরাহের প্রান্তিক বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে উৎপাদন বেশি বাড়াইবে। জল না থাকিলে বা কম থাকিলে উন্নত সার বীজ ও প্রেরণা কোন কিছুই ততটা কার্যকরী হইতে পারে না। তাই এই সকল ইন্‌পুটগুলি সব একসঙ্গে পাওয়া না গেলেও ইহাদের মধ্যে জলকেই অগ্রাধিকার দিতে হইবে, তৃষ্ণার্ত কৃষি ক্ষেত্রকে জলদানই প্রাথমিক কর্তব্য।

অধিক পরিমাণে এবং উন্নত ধরণের ইন্‌পুট ব্যবহার করা, অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির মূলধন-প্রগাঢ়তা বাড়াইয়া তোলার প্রধান বাধা হইল আমাদের দেশে চাষীর মাথাপিছু চাষের জমির ক্ষুদ্র আয়তন এবং বিচ্ছিন্নতা। হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিতে স্থির অনড় ও অচল এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো (institutional structure), যাহা ক্রমশ কৃষিজোতগুলিকে আয়তনে ছোট করিয়া ফেলিতেছে এবং বিচ্ছিন্নতা বাড়াইয়া তুলিতেছে—ইহাই আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদনে মূলধন-প্রগাঢ়তা বাড়াইবার প্রধান অন্তরায়। আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মত বড় বড় জোত না থাকিলে চাষী-মালিক কিরূপে অন্যান্য ইন্‌পুট বাড়াইবার কথা চিন্তা করিতে পারে?

কিন্তু দীর্ঘকালে দেশরক্ষা ও উন্নয়ন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরস্পর নির্ভরশীল। এমন কি সূত্রের আকারে আমরা বলিতে পারি 'উন্নয়নই দেশরক্ষা'। অর্থনৈতিক বিচারে আধুনিক যুদ্ধের প্রতিটি দ্রব্য একান্তভাবে মূলধন-প্রগাঢ় দ্রব্যসামগ্রী। ভারতের ন্যায় কোন অনুন্নত দেশ যদি কোন উন্নত দেশকে রাজনৈতিক বন্ধু হিসাবে পায়, তবে বাণিজ্যের মাধ্যমে, ঋণের সাহায্যে অথবা সাহায্য হিসাবে এই মূলধন প্রগাঢ় যন্ত্রগুলি পাইতে পারে। তবে সুসময়ের কোন বন্ধু অসময়ে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে এবং কোন দেশই দেশরক্ষার এই আধুনিক উপকরণগুলির জন্য একান্তভাবে পরমুখাপেক্ষী থাকিতে পারে না। আবার কোন অনুন্নত দেশের পক্ষে বা উন্নয়নের প্রথম স্তরে অবস্থিত কোন দেশের পক্ষে তাহার স্বল্প প্রশস্ত মূলধন-ভিত্তির উপর ভরসা করিয়া এবং কেবলমাত্র দেশীয় উপকরণের ভিত্তিতে আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী যন্ত্রপাতি গড়িয়া তোলা-ও সহসা সম্ভব নয়।

দেশরক্ষার জন্য তাই একদিকে যেমন উপযুক্ত রাজনৈতিক বন্ধু থাকা দরকার ঠিক তেমনই মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের ভিত্তি দৃঢ়তর করা প্রয়োজন। শান্তির সময়েও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করিয়া মজুত করা (stockpiling) প্রয়োজন। যুদ্ধের প্রয়োজনে দরকার লৌহ ও ইস্পাত, মেশিনটুল এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি (precision tools), হাল্কা ও ভারী রাসায়নিক শিল্প, লৌহ ব্যতীত অপরাপর ধাতুগুলি, রাবার, পেট্রোলিয়াম, দ্রুত ও ভারী দ্রব্যসামগ্রী বহনের উপযোগী উন্নত ধরনের যানবাহন ও রাস্তাঘাট, বিশেষ ধরণের কাঁচ ইত্যাদি। এই সকল বিষয় উৎপাদনের উপযোগী জটিল শিল্প-কাঠামো (industrial complex) গড়িয়া তোলা স্বভাবতই অনেক উন্নত দেশের পক্ষেও সহজ নয়, যেমন হল্যাণ্ড

ও ডেনমার্ক। অনুন্নত দেশের অপ্রশস্ত মূলধন-গঠনের ভিত্তিতে ইহা মোটামুটি একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে আমাদের জানা বা অজানা নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান যোগান অনুযায়ী এই জটিল শিল্প কাঠামো গড়িয়া তোলা অসম্ভব নয়। মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইয়া আমাদের পক্ষে ইহা সম্ভব। আমরা জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুরুতে রাসায়নিক শিল্পের অভাবের জন্য ইংলণ্ড কতটা বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্পেনের লৌহ মাক্ষিকের জন্য নির্ভরশীল থাকায় ইংলণ্ডের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের এবং জাপানের মূলধনী দ্রব্যের শিল্প-কাঠামো অনেকাংশে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও তাহারা এইরূপ জটিল ও সুউন্নত মূলধন-প্রগাঢ় শিল্পোৎপাদন গড়িয়া তুলিতে কোন দ্বিধা করে নাই। ভারতের ক্ষেত্রে তাই দেশরক্ষায় স্বনির্ভরশীল হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, বরং তুলনামূলকভাবে বেশি সম্ভব। ভারতের সহিত তুলনীয় বিপুল জনসংখ্যা এবং বিরাট আয়তনের অপর তিনটি দেশ (আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন) কেহই যুদ্ধাস্ত্রের জন্য আমদানির উপর ভরসা করে না, ইহারা প্রত্যেকে স্বনির্ভরশীল। দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে তাই ভারতকেও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে যথাসম্ভব অধিক আত্মনির্ভর হইতে হইবে।

আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এত দ্রুত যে মূলধন-প্রগাঢ় এই যন্ত্রগুলি অতি দ্রুত হারে প্রাচীনত্ব পাইতেছে, অর্থাৎ প্রতিনিয়তই ইহারা আধুনিকত্ব হারাইয়া অকেজো হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধাস্ত্রগুলির দ্রুত ক্ষয়-ক্ষতি হওয়া উন্নত দেশগুলির পক্ষেও এক বিরাট সমস্যা হইয়া দেখা দিতেছে। তবুও অনুন্নত দেশগুলিকে দেশরক্ষার জন্য প্রতিবেশীদের সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিতেই হইবে। ইহা পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নয়, একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই দেশরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা—এই কথার একমাত্র অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল ক্রমাগত ও অতি দ্রুত হারে সর্বদাই যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটানো।

একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আজ যদি ভারতবর্ষ দেশরক্ষার উপযোগী শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হয় তবে উহারই প্রভাবে, উহাদেরই নিজস্ব তাগিদে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিতে থাকিবে। সামরিক আউটপুটের জন্য ইনপুটগুলি উৎপাদন করিতে গেলে স্বভাবতই শিল্পপ্রসার ঘটিবে। দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ইনপুট-আউটপুট সম্পর্ক দ্রুত হারে পরিবর্তিত হওয়া

শিল্পপ্রসারের লক্ষণ। যু[illegible]নির্মাণের প্রয়োজনে উপকরণাদি তৈয়ার করিবার পথে, ঐ ধারার [illegible] অনুন্নত দেশের ইন্‌পুট-আউটপুট সম্পর্কে পরিবর্তন আসিয়া উন্নত দেশের অনুরূপ সম্পর্ক ও কাঠামো গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য ইহা ঠিকই যে মাথাপিছু আসল আয়ে বৃদ্ধি বা ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহারে বৃদ্ধি দেশে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের মধ্য দিয়া ঘটিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক দেহের একটি বিশেষ শাখা, উহার একটি বিশেষ অংশের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। উহা হইল দেশের খাদ্যোৎপাদন ক্ষেত্র। শান্তির সময়ে খাদ্যে উদ্বৃত্ত থাকিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত ঘটিবে এমন বলা যায় না। কিন্তু যুধ্যমান কোন দেশ খাদ্য আমদানির বিষয়ে অপরের উপর কখনই নির্ভরশীল থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময়ে দেশপ্রেমের আহ্বানে খাদ্য রেশনিং করিয়া কম খাদ্যের দ্বারা কাজ চালান সম্ভব; কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে খাদ্যের রেশনিং লোকে সহজে স্বীকার করিবে না। অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ে খাদ্যের উৎপাদন শান্তির সময় অপেক্ষা কম হইলেও চলে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দেশরক্ষা ও উন্নয়ন একই সঙ্গে চালাইতে গেলে অগ্রাধিকার তালিকায় কিছুটা বদল করিতে হয়। এইজন্য কৃষির তুলনায় শিল্পের উপর জোর দিতে হয়, এবং শিল্পের মধ্যেও ভোগ্যশিল্পের তুলনায় মূলধনী শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। কোন দেশই রপ্তানির আয় হইতে সামরিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, তাই আমদানি-পরিবর্ততা (import substitution) লক্ষ্য রাখিয়া বিনিয়োগের মানদণ্ড (investment criteria) স্থির করিতে হয়।

দেশরক্ষা ও উন্নয়নের যুগ্ম প্রয়োজন মিটাইতে হইলে অর্থের বাজারে প্রচুর টাকা ঢালিয়া দিতে হয়, কিন্তু বাজারে বিক্রয়যোগ্য ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ততটা বাড়ে না। তাই মুদ্রাস্ফীতির ঝোঁক তীব্রভাবে দেখা দেয়। তখন মুনাফা লাভের সম্ভাবনা বাড়ে বলিয়া উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন বাড়াইতে সচেষ্ট হন। উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম বাড়ে, এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বানচাল হইবার উপক্রম হয়, কারণ প্রতিটি পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। এই সকল কারণে দাম ও বণ্টনের উপর কিছু কিছু প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে হয়, আর্থিক ও করনীতির মাধ্যমে যথাসম্ভব অতিরিক্ত টাকা লোকের হাত হইতে তুলিয়া লইতে হয়। সরকারী এই সকল নীতি সফল করিতে পারিলে দেশরক্ষা ও উন্নয়ন একই সঙ্গে সম্ভবপর।

ভারতের সাম্প্রতিক মুদ্রামূল্য হ্রাস (India's recent Devalution)

1966 সালের জুন মাসে ভারত সরকার টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত করেন। ডলার, ষ্টার্লিং প্রভৃতি বিদেশী মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্য ৩৬ ৫% কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীনতার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সরকারের আর কোন সিদ্ধান্ত দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে এতটা আঘাত দেয় নাই। টেক্‌নিকাল ভাষা ব্যবহার না করিয়া আমরা সরকারী বক্তব্য এবং উহা কতটা যুক্তিসম্মত তাহা বিচার করার চেষ্টা করিব।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের অর্থনীতিতে তেমন গতিবেগ নাই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। কলকারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ বাড়িতেছে না, দ্রব্যসামগ্রীর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে দ্রুত বিক্রয়ের কোনো আশা দেখা যাইতেছে না। দেশের শতকরা সত্তরজন চাষের কাজে নিযুক্ত, তাই আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার বা সঙ্কোচন—সবই চাষের উন্নতি ও অনুন্নতির উপর নির্ভরশীল। একদিকে ছোট ও বিচ্ছিন্ন চাষের জোত, ভূমিহীন চাষী মজুর, জল ও বীজের অপ্রতুলতা ; অন্য দিকে ছোট চাষী বা মাঝারি চাষীর শস্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া মজুত করা ও সুউচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া অর্থ আহরণ করা, অর্থাৎ ছোট চাষী বেশি দাম পাইবার সুবিধা না-পাওয়া—এই সকল মিলিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে আমাদের চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন, দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি দ্রব সামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় বাড়াইয়া দেওয়ায় আমাদের দ্রব্যাদির বাহিরে বিক্রয়যোগ্যতা দ্রুত হ্রাসমান। এই সঙ্কটের সম্মুখে ভারত সরকার টাকার বহির্মূল্য হ্রাস করিযাছেন।

টাকার বহির্মূল্য হ্রাস করিলে কি ঘটে ? কোনো টেক্‌নিকাল ভাষার সাহায্য না-লইয়াই আমরা ইহা বুঝিতে পারি। টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কম পাওয়া গেলে, অর্থাৎ বিদেশীরা তাহাদের কম মুদ্রা দিয়া ভারতের টাকা পাইলে তাহাকে বলা হয় টাকার বহির্মূল্য হ্রাস। টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কম পাইলে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে একটি টাকা দিয়া কম বিদেশী দ্রব্য পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ পূর্বের সমান পরিমাণ বিদেশী জিনিষ কিনিতে বেশি টাকা দিতে হইবে। অপরদিকে, বিদেশীরা এখন তাহাদের কম মুদ্রা খরচা করিয়া পূর্বের সমান পরিমাণ ভারতের জিনিসপত্র পাইবে। আমাদের দেশীয় টাকার হিসাবে

পরিমাণে বেশি টাকা দিয়া [illegible] দ্রব্য কিনিতে হইবে, বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে। সে[illegible] বিদেশীরা তাহাদের মুদ্রা কম দিয়া আমাদের জিনিসপত্র কিনিতে পারিবে বলিয়া আমাদের দ্রব্য সামগ্রী তাহাদের দেশে সস্তা হইবে। আমাদের দেশের মধ্যে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহার জন্ত চাহিদা হ্রাস পাইবে, এবং বিদেশে আমাদের রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমিলে উহার জন্ত চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের রপ্তানি হইতে আয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই, অথচ বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা দেশের মধ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী মুদ্রার বাজারে চোরাকারবার হইতেছে, অর্থাৎ টাকার বেসরকারী দাম অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। বিদেশী মুদ্রার অভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খাদ্য, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। এইরূপ সঙ্কটের সম্মুখে টাকার বহির্মূল্য হ্রাস ঘোষণা করা হইয়াছে।

সরকার-পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে ইহার ফলে আমাদের রপ্তানি বাড়িবে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে আমাদের রপ্তানি বাড়িবার সম্ভাবনা বিশেষ নাই। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ২১% হইল পাট, উহার চাহিদা খুবই অস্থিতিস্থাপক। ভারতের প্রধান প্রতিযোগী পাকিস্তান, উহার সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আমাদের বাড়িবে এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানে কাঁচা পাটের যোগান বেশি, পাট ও ভাল। তাহা ছাড়া বর্তমানে পাকিস্তান পাটের রপ্তানিকে অর্থসাহায্য (subsidy) করিতেছে। এখন সে অর্থসাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। চা-এর চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক, দাম কমাইলে চাহিদা বেশি বাড়ে না। সিংহলের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের চা আঁটিয়া উঠিতেছে না কারণ সিংহল চা-এর রপ্তানিকারকদের আর্থিক সাহায্য দিতেছে, সে এই আর্থিক সাহায্য বাড়াইয়া দিলে ভারতের চা বিক্রয় কোন মতে বর্ধিত হইবে না। আমাদের কাপড় বিক্রয় বৃদ্ধি পাইতে পারিত, কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই টাকার মাধ্যমে ভারতের বস্ত্র আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে কি পাইবে? অভ্র-ক্ষেত্রে দেখা যায় উহা আমাদের একচেটিয়া, উহার বিক্রয় বাড়াইবার জন্ত দাম কমাইবার সার্থকতা কি? অবশিষ্ট যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য আমরা রপ্তানি করি তাহাদের উৎপাদনের জন্ত আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের উপর আমরা

নির্ভরশীল। তাহাদের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় শ[illegible]৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি ১৯৪৯ সালের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় [illegible]র বহির্মূল্যহ্রাসে রপ্তানি বিশেষ বাড়ে না।

বরং ইহার ফলে অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের ভার পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাইতেছে, সমান পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার জন্য বিদেশী ফার্মগুলি দেশ হইতে মুনাফার আরও বেশি অংশ সৎ বা অসদুপায়ে বাহিরে পাঠাইবার চেষ্টা করিবে। সরকারের বাজেটের উপরে বিশেষ চাপ পড়ায় করভার আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে। টাকার বহির্মূল্য হ্রাসের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মুদ্রা কম দিয়া ভারতের শিল্প কলকারখানার শেয়ার কিনিতে পারিবে। ইহার ফলে আমাদের বিনিয়োগ ও উৎপাদনের এক অংশ হইতে মুনাফা স্থায়ীভাবে বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পথ প্রশস্ত হইতেছে।

সর্বোপরি, ভারতে প্রকৃত কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করা আর সম্ভব নয় বলিলেই চলে। দেশের মধ্যে কত বৈদেশিক মূলধন, কোন্ কোন্ খাতে আসিবে, কোন কিছুর উপরই পরিকল্পনা কমিশনের আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকিতেছে না। ভারতের পরিকল্পনার মূল কথা ছিল আমদানি-পরিবর্ততা (import-substitution), কিন্তু বর্তমানে প্রধানত রপ্তানি-বৃদ্ধিই (export-promotion) আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উহার প্রাণশক্তি হারাইতেছে, প্রধানত অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক পরিবেশে উন্নয়নের প্রচেষ্টা সুরু হইতেছে।

আগামী চতুর্থ পরিকল্পনার আভাস (A Glimpse of the Fourth Five Year Plan)

টাকার বহির্মূল্য হ্রাস, সরকারীখাতে পরিকল্পনার কাজে অর্থসাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনিচ্ছা এবং ভারতসরকারের মনে ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়নের মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর্থপরিকল্পনার ভবিষ্যৎ বর্তমানে একেবারে অনিশ্চিত। তবুও পরিকল্পনার দূরপ্রসারী পরিপ্রেক্ষণ বিভাগ (long term perspective division) চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ার রূপরেখা সম্পর্কে বহুপূর্বে যে আলাপ আলোচনা সুরু করিয়াছিলেন আমরা তাহা আলোচনা করিতে পারি। কমিশন সেই খসড়া অনুমোদন করিলে উহার ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত হইবে, এইরূপ কথা ছিল। সাধারণভাবে

স্থির ছিল যে তৃতীয় প[illegible]র তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন অনেক বড় হইবে এবং [illegible]রি আরও অধিক গুরুত্ব দিবে।

দূরপ্রসারী পরিপ্রেক্ষণ বিভাগ হিসাব করিয়াছিলেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় নির্ধারিত ১৯,০০০ কোটি টাকার স্থলে ১৮,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছিবে। যদি ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে আমরা মাথাপিছু প্রতিমাসে ২০ টাকা আয় পাইতে চাই তবে এই সময়ের মধ্যে জাতীয় আয়কে দ্বিগুণের বেশি করিয়া তুলিতে হইবে, ৩৭,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছিতে হইবে। যদি আমরা দেশে উন্নয়নের হার বৎসরে শতকরা ৭ ভাগ রাখিতে পারি একমাত্র তবেই জাতীয় আয় ১৯৭০-৭১ সালে হইবে ২৬,০০০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ইহা পৌঁছিবে ৩৭,০০০ কোটি টাকায়। ধরা হইয়াছে যে এই দুই স্তরে জনসংখ্যার পরিমাণ হইবে ৫০ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ। জাতীয় আয় এত পরিমাণ বাড়ানো খুবই উচ্চাশা সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমরা অবিলম্বে এই কাজ সুরু না করি তবে খসড়া রচয়িতারা মনে করেন যে জনসাধারণের দারিদ্র্য অনাবশ্যক ভাবে চলিতে দেওয়া হইবে ("needlessly prolonged")।

দূরপ্রসারী পরিপ্রেক্ষণ বিভাগ মনে করেন যে উন্নয়নের এই উচ্চ হার পাইতে হইলে দেশে মূলধন গঠনের হার চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে বিপুল বেগে বাড়া দরকার। তাহাদের হিসাবে ইহা ১৯৬৫-৬৬ সালের জাতীয় আয়ের ১৪।১৫% হইতে ১৯৭০-৭১ সালের জাতীয় আয়ের শতকরা ২১% ভাগ করা উচিত। তাহাদের হিসাবে বলা হইয়াছে যে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমিয়া আসিবে। বর্তমানে বিনিয়োগের ২৫ ভাগের বেশি বৈদেশিক সাহায্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। ১৯৭০-৭৫ এ ইহা হইবে শতকরা ৭% ভাগ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ইহার আর কোনো প্রয়োজন হইবে না।

এই সকল হিসাবের ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন ও প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা চলিতেছিল। অনেক তর্কবিতর্ক ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়া ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে পরিকল্পনা কমিশন স্থির করিয়াছিলেন যে উহার আয়তন হইবে ২১,৫০০ কোটি টাকার। প্রকৃতির দিক হইতে এই পরিকল্পনা হইবে কৃষিমুখী, খাদ্যদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনাই ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিদেশ হইতে খাদ্য আনয়ন করিয়া এত বৃহৎ জনবহুল কোন দেশ শিল্পোন্নত

হইতে পারে না। যদি বা শিল্পোন্নতি ঘটেও তবু [illegible]র অধিকাংশ অধিবাসী কৃষকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ই[illegible] হয় না। খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন স্বল্পতা আরও নানাভাবে শিল্পপ্রসারে বাধা দেয়। তাই চতুর্থ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কৃষির উপর বিনিয়োগ বাড়াইয়া উৎপাদনে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি।

আয়তন ও প্রকৃতি

পরিকল্পনার এই আয়তন সম্পর্কে নানারূপ বিতর্ক চলিতেছে। ইহার সমর্থকেরা মনে করেন যে (ক) দেশে অগ্রগতির বেগ হ্রাস করিলে দারিদ্র্য গভীরতর ও দীর্ঘতর হইবে, এবং (খ) পুরানো পরিকল্পনাগুলির ফলে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন এতটা বাড়িয়াছে যে ছোট পরিকল্পনা রচনা কর আর সম্ভবপর নয়, কারণ উৎপন্ন দ্রব্য ও উপকরণগুলি তাহাতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের (২১,৫০০ কোটি টাকা) পূর্বে তিন দিক হইতে ইহার সমালোচনা চলিতেছিল। প্রথমত, বিশ্বব্যাঙ্ক ও উহার মতাবলম্বী কৃষ্ণমাচারির বক্তব্য ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার আয়তন কমাইয়া ১৮০০০ কোটির কাছাকাছি করা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বণিকসঙ্ঘের বক্তব্য ছিল পঞ্চবর্ষের স্থলে সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, অর্থাৎ বাৎসরিক বিনিয়োগের হার কমানো। তৃতীয়ত, প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই দুই মতের চাপে পড়িয়া বলিতেছিলেন যে সুরুতে এক বৎসরকাল চতুর্থ পরিকল্পনা পিছাইয়া দেওয়া দরকার (Plan holiday)। অর্থাৎ, একদিকে তৃতীয় পরিকল্পনার অসমাপ্ত কার্যসূচী শেষ করা এবং অপরদিকে সেই বছরটিতে কৃষি উৎপাদনকে সতেজ ও সবল করিয়া তোলা।

তিন ধরণের মত

সর্বোপরি, একটি বিষয় ভালভাবে বুঝা দরকার। পরিকল্পনায় আয়তন ও প্রকৃতি কি হইবে তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ ও সুযোগ কমই, কারণ ইহার নিজস্ব একটি গতিবেগ আছে। এই কথা মনে রাখিয়া স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে পরিকল্পনার পরিচালনা করা ধাবমান ব্যাঘ্রের পিঠে সওয়ার থাকার মত। গতি শ্লথ করিলে বা থামিলে বিপদ, উহাকে সর্বদা ছুটাইতে হইবে এবং উহার দ্রুতগতি বজায় রাখিতেই হইবে। কথাটির তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনাতে যে সিমেণ্ট, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা সৃষ্টি হইল, সেই উৎপাদন ক্ষমতা নিজেই দেশে আরও নূতন বিনিয়োগের প্রয়োজন সৃষ্টি করিতেছে। উৎপন্ন সেই সিমেণ্ট, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত যাইবে কোথায়? উহাদের মজুত করিয়া ফেলিয়া রাখিলে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া দেশে অর্থনৈতিক সংকট ডাকিয়া আনিবে। ভারতবর্ষ আর অনুন্নত দেশ নাই যে বাণিজ্যচক্র অনুপস্থিত থাকিবে। ইহা এখন অর্ধোন্নত দেশ, এবং হঠাৎ এইরূপ বিনিয়োগের হ্রাস দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনাইয়া তুলিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সেই সকল উপকরণ দিয়া [illegible] নূতন কারখানা খোলার কথা তাই চতুর্থ পরিকল্পনার প্রধান [illegible] ইহা আর ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় নয়. সংকট এড়াইবার জন্যই এখন প্রতি পরিকল্পনার আয়তন পূর্বের তুলনায় ক্রমশ বড় করিতে হইবে। কোন্ ধরনের উপকরণ পূর্বের পরিকল্পনা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অনেকটা তাহারই ভিত্তিতে পরবর্তী পরিকল্পনাটির প্রকৃতিও স্থির হইবে।

সর্বোপরি, আরও একটি গতিশীল শক্তির প্রভাবে ভারতের চতুর্থ পরিকল্পনাকে বৃহৎ ও শিল্পমুখী হইতেই হইবে। এখানেও পরিকল্পনা কমিশনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাহিরের শক্তি পরিকল্পনার আয়তন ও প্রকৃতি নিরূপণ করিবে। ইহা হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুণ দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখিতে হইবে, ফলে একটি নির্দিষ্ট হারে অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী থাকে। পরিকল্পনার আয়তন ও প্রকৃতি অনেকটা এই অমোঘ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল কারণে অর্থনীতিবিদদের লইয়া গঠিত পরিকল্পনা কমিশনের হাতে পরিকল্পনার আয়তন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভার ছাড়িয়া দেওয়া দরকার. রাজনৈতিক নেতাদের হাতে বা অর্থনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অদক্ষ ব্যক্তিদের হাতে এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের ভার ছাড়িয়া না-দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

অনুশীলনী

1. Briefly discuss the principal objectives of the Third Five Year Plan of India and show how the resources required to fulfill the objectives may be found. (B. U B. A. 1961)

2. Give a critical estimate of the progress of industrialisation in India since the introduction of the First Five Year Plan. (C. U. B. A. 1962)

3. Indicate the main feature and objectives of India's Third Five Year Plan. In what respects, if any, does it differ from the two previous plans? (C. U. B. A. 1963; B. U. B. Com. 1963)

4. Comment on the principal measures that have been adopted in India to increase agricultural productivity since 1951. (B. U. B A. 1963)

5. Give a brief outline of the programme of economic development as envisaged in India's Third Five Year Plan. (C. U. B Com. 1963)

6. Discuss how far the emphasis put on agriculture in India's Five Year Plans is justified or adequate. (B. U. B. Com, Part I, 1963)

Or,

Examine the opinion that the priority given to agriculture in our Third Plan is not so very well marked as the importance of agriculture in the economy would justify. (B. U. B. A. Part II, 1965)

7. Examine the position regarding the internal and external sources of finance in India's Third Five Year Plan. (B. U. B. A. 1963)

8. "The general pattern of development followed in the Third Plan necessarily flows, in large part from the basic approach and experience of the Second Plan." Discuss. (B. U. B. Com 1964)

9. In what respects does the Third Five Year Plan of India differ from the second? (C. U. B. Com. 1964)

10. Give a critical estimate of the sch[illegible] financing investment in the Public sector in the Third Five Year [illegible] In wh[illegible] respects it differs from that of the Second Five Year Plan ? [illegible] A Part. II, 1964)

11. "In its approach and objective the [illegible] Five Year Plan is essentially a continuation of the Second Five Year Plan, but there are some important distinguishing feature." Explain and illustrate.

(B. U. B. A. Mod. 1964)

12. How far are India's Five Year Plans stimulating both agricultural and industrial development ? (B. U. B. A. Mod. 1964)

13. What are objectives of economic planning in India ? Discuss whether and how far the Indian Plans fulfil their objectives.